তাফসীরে
সূরা তাওবা

تفسير فى ظلال سورة التوبة

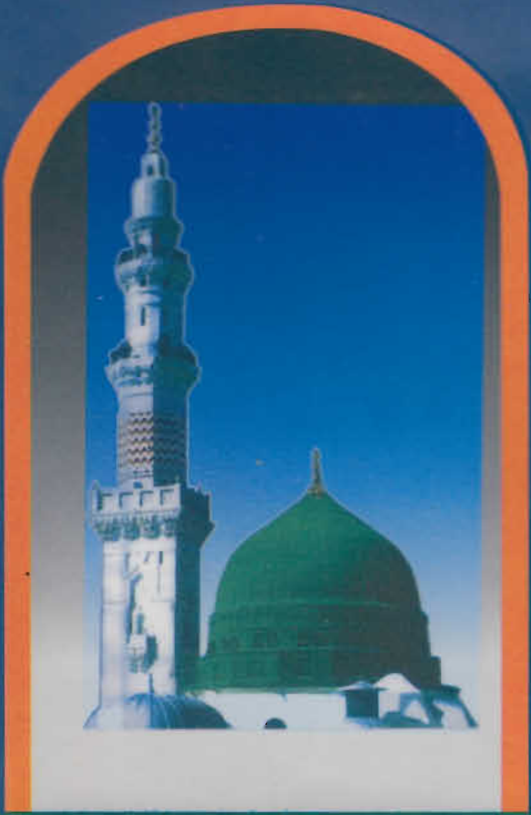

ড. শহীদ আব্দুল্লাহ আয়্‌যাম (রহ)

তাফসীরে সূরা তওবা

تفسير فى ظلال سورة التوبة

মূল
ড. শহীদ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ)

অনুবাদ
মাওলানা নাসীম আরাফাত
মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ
মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭

নানূতবী রহ. প্রকাশনী
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২ ই.

প্রকাশক ❑ নানুতবী রহ. প্রকাশনী ৫০, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, প্রকাশনা কর্তৃক স্বত্ব সংরক্ষিত, প্রচ্ছদ ❑ জি.এম. মাওলা, বর্ণবিন্যাস ❑ এম. হক কম্পিউটার্স, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ৪৫০ টাকা মাত্র

পরিবেশনায়

মাকতাবাতুল ইরশাদ
৩৩৪/ডি, যাত্রাবাড়ি,
ঢাকা।

হাবিবিয়া বুক ডিপো
বায়তুল মোকাররম,
ঢাকা-১০০০।

রফরফ বুক পয়েন্ট
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

উৎসর্গ

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ)
তাঁর শহীদ পুত্রদ্বয়
এবং
সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে জিহাদের ময়দানে
শাহাদাত বরণকারী
মুজাহিদদের উদ্দেশে

অনুবাদকের অভিব্যক্তি

বক্ষমান গ্রন্থটি কোন তাফসীর গ্রন্থ নয়। শহীদ ড. আল্লামা আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) এর বক্তৃতামালার সংকলন গ্রন্থ। তাহলে কী হবে! বহু তাফসীর গ্রন্থের মাঝে তা আজ অনন্য। অতুলনীয়। স্বীয় মহিমায় ভাস্বর। অভিজ্ঞতার বর্ণনায় দীপ্তিময়। উদ্ভাসিত। একেবারে বিরল। বর্তমান সময়ে এ ধরনের গ্রন্থ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কারণ, আফগান রণাঙ্গনে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ ব্যূহ রচিত হয়েছিল তা ছিল প্রকৃত জিহাদ। যারা জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন তারা ছিলেন মুজাহিদ। বহু ঘটনা, অলৌকিক কাহিনী তার উজ্জ্বল প্রমাণ। সেই মুজাহিদদের মাঝে যিনি শিক্ষা-দীক্ষায় ছিলেন স্বনামধন্য; যার খ্যাতি ছিল দুনিয়াজোড়া; যিনি ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের ছিলেন প্রজ্জোল উপমা; তিনি যখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন; গোটা আফগানিস্তান চষে ফিরলেন; স্বচক্ষে দেখলেন রণাঙ্গনের সবকিছু; এর আগেও যিনি ফিলিস্তিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন; সেখানকার মুজাহিদদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন; তাঁর জন্য অনেক কিছু বোঝা, অনুভব করা, উপলব্ধি করা অত্যন্ত সহজ ছিল, যা অন্য কারো জন্য সম্ভব ছিল না। তাঁর সেই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল আলোকমালাই তিনি বক্তৃতার পরতে পরতে রেখে গেছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যা বর্তমান সময়ে কেউ রেখে যেতে পারেনি। তাই এ গ্রন্থটি একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। যা যুগ যুগ ধরে আলোর মশাল নিয়ে দিশেহারা পথভ্রষ্ট সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের দিশা দিবে। হিদায়াতের উজ্জ্বল আলোকিত পথ দেখাবে।

আমাদের দেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। অনেক বেশী। আমরা গর্ব বোধ করি। কিন্তু অজ্ঞতাও বেশী। অনেক অনেক বেশী। যা চিন্তা করলে লজ্জায় মুখ মলিন হয়ে যায়। তাই আমাদের কর্ণধার শ্রেণীর লোকেরাও জিহাদ আর সন্ত্রাসের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। তারা মুজাহিদদের সন্ত্রাসী বলে ঈমান হারায়। জিহাদ সম্পর্কে কটূক্তি করে বেঈমান হয়। অথচ এর অনুভূতিও তাদের নেই।

এহেন পরিস্থিতিতে জিহাদ কী? জিহাদ কী চায়? কেন প্রত্যেক মুসলমানকে মুজাহিদ হতে হবে? কারা জিহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে? কিভাবে করছে? কেন পাশ্চাত্য জগত জিহাদকে ভয় পায়? কেন মুজাহিদকে সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করে? আর জিহাদকে সন্ত্রাস বলে? এ ধরনের হাজারো বিচিত্র প্রশ্নের সাবলীল সুন্দর যুক্তিপূর্ণ সমাধান এ গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে আছে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন ও আকাবিরে উম্মতের বহু বিরল ঘটনাবলী। যা হৃদয়কে বিগলিত করে। চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সঠিক চিন্তা ও চেতনায় টইটম্বুর হয় হৃদয়। জেগে উঠে ঘুমন্ত নির্জীব প্রাণ।

তাই এ গ্রন্থটি এক অনন্য গ্রন্থ। বিরল গ্রন্থ। জাগো মুজাহিদ ও রহমত পত্রিকায় এর অনুবাদ প্রকাশকালে সুবিজ্ঞ পাঠক মহলের অনুভূতি, মতামত ও আবেগ-উচ্ছাসের বহিঃপ্রকাশই তার প্রমাণ।

হাজারো বাধার বিন্ধ্যাচল পেরিয়ে গ্রন্থাকারে যখন তা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তখন অনেকের কথাই মানসপটে ভেসে উঠছে। আমি সবাইকে শুকরিয়া জানাই। সবার নিকট দুআ চাই। আমিও দুআ করি যেন আল্লাহ এ শ্রমকে কবুল করেন। আমাদের নাজাতের উসীলা বানান।

আমীন... ..ছুম্মা আমীন।...

নাসীম আরাফাত
৪০৩/এ, খিলগাঁও চৌরাস্তা
ঢাকা - ১২১৯

শায়খ আব্দুল হাফিজ মক্কী (দা.বা.) এর দুআ ও অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد فقد عرض على فضيلة الشيخ المحدث مولانا
نسيم عرفات وهو مدرس الحديث الشريف في
الجامعة الشرعية مالي باغ في دهاكا عاصمة
بنغلاديش ترجمته لكتاب « في ظلال سورة
التوبة » للمجاهد العلامة الجليل الشهيد الدكتور
عبد الله عزام رحمه الله وقد ترجمه من اللغة
العربية إلى اللغة البنغالية ليستفيد منه المسلمون
الناطقون بهذه اللغة.
فجزاه الله خيرا كثيرا وأرجو من الله أن ينفع بهذا الكتاب
المبارك المسلمين الناطقين بهذه اللغة كما نفع
بها الناطقين بالعربية ويجعل ذلك في ميزان حسنات
المؤلف والمترجم أكرمهما الله بكل خير وحفظهما من كل
شر ورزق هذا الكتاب القبول لديه فينفع به آمين
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد إمام المجاهدين وسيد الأنبياء
والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم

كتبه الفقير إلى الله الكريم
عبد الحفيظ المكي - دهاكا
ليلة الخميس ٣/٣٠ ١٤٣٣هـ

শায়খ আব্দুল হাফিজ মক্কী (দা.বা.) এর দুআ ও অভিমত এর অনুবাদ

সকল প্রশংসা এক আল্লাহর। দরূদ ও সালাম তাঁর জন্য যার পর কোন নবী নেই। আর তাঁর পরিজন ও সকল সাহাবীর জন্য।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ এর শিক্ষক বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা নাসীম আরাফাত সাহেব এলেন এবং শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) এর ফি জিলালি সূরাতিত তাওবাহ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখালেন। বাংলা ভাষাভাষীদের উপকারার্থে আরবি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় তিনি তা অনুবাদ করেছেন।

আল্লাহ তাঁকে প্রভূত কল্যাণ দান করুন। আল্লাহর নিকট দুআ করি, তিনি যেন এ গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষীদের উপকৃত করেন যেমন আরবদের উপকৃত করেছেন। সংকলক ও অনুবাদকের পুণ্যের পাল্লায় তাকে রেখে দেন। আল্লাহ তা'আলা সব কল্যাণ দ্বারা তাদের মর্যাদাবান করেন। সব ধরনের অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে হেফাজত করেন। নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় এ গ্রন্থটি কবুল করে নেন। আমীন।

মুজাহিদদের ইমাম, নবী-রাসূলদের সর্দার, নেককার ও পুণ্যবানদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীবর্গের উপর আল্লাহ তা'আলা দরূদ ও সালাম বর্ষিত করুন।

মুহতাজ বান্দা
আব্দুল হাফিজ মক্কী, ঢাকা
৩০ রবিউল আউয়াল, ১৪৩৩ হিজরি।

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

আসবাহ আল হারতিয়া। ফিলিস্তিনের জেনিন প্রদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের পাতায় এ গ্রামের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ। কারণ এ গ্রাম জন্ম দিয়েছে বহু মহামানবকে। বহু মুজাহিদ আর সমরবিদকে। বহু দার্শনিক আর চিন্তাবিদকে। বহু সাহিত্যিক আর ভাষাবিদকে।

১৯৪১ সাল। আসবাহ আল হারতিয়া তখন পরাধীন। ইহুদীদের পদভারে রক্তাক্ত। তার দুরন্ত বায়ুর বুকে সন্তানহারা মায়ের আহাজারি। এতীম শিশুদের আর্তচিৎকার। অসহায় বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাদের চোখে চোখে অশ্রুর বান। কৌমার্যছিন্ন যুবতী আর তরুণীদের চোখে প্রতিশোধের লেলিহান আগুন। ঠিক তখন আসবাহ আল হারতিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এক নবজাত সন্তান। আব্দুল্লাহ ইউসুফ আযযাম। পারিবারিক ঐতিহ্যে লালিত হন ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে। মহব্বত করতে শিখেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে; আল্লাহর পথে জিহাদে রত বীর বাহাদুরদেরকে; সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদেরকে। আখিরাতের চিন্তা-ফিকির আর শাহাদাতের তামান্না শৈশব থেকেই তার চরিত্রে ফুটে উঠতে থাকে।

আব্দুল্লাহ আযযাম এক ব্যতিক্রমধর্মী কিশোর। সদা গম্ভীর, নিষ্ঠাবান, চিন্তায় ডুবে থাকা এক কিশোর। নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা তার চরিত্রকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অল্প বয়সেই তিনি দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে মুসলমানদের মাঝে জাগ্রত করতে পেরেশান হয়ে পড়েন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায়ই তাঁর অসাধারণ গুণাবলী দেখে শিক্ষকরা হতবাক হয়ে যান। তাঁরা ভাবতে থাকেন, আমাদের এ সন্তান কালের ব্যবধানে নিশ্চয় বড় কিছু হবে। হয়তো আল্লাহ তার দ্বারা ইসলামের সংস্কারের কাজ নিবেন। সুনামের সাথেই তিনি লেখাপড়া করতে থাকেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া সুনামের সাথেই শেষ করেন। ক্লাসে সবার চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও তিনি সবচেয়ে বেশী সুদর্শন ও মেধাবী ছিলেন। এরপর তিনি এগ্রিকালচারাল কাদরী কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই ডিপেস্নামা ডিগ্রি লাভ করেন।

তারপর দক্ষিণ জর্দানের আদ্দির নামক গ্রামে শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। কিন্তু তাঁর পিপাসার্ত মন তখনো ছিল অস্থির-উতলা। তাই দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে শরিয়াহ বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৬৬ সালে শরিয়াহ(ইসলামী আইন) এর উপর বিএ ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৬৭ সাল। ইহুদীরা পশ্চিম তীর দখল করে নিল। রক্তে রঞ্জিত হল পশ্চিমতীর। চোখের সামনে দেখলেন, নির্যাতন আর নিপীড়নের ভয়াল চিত্র। বুক ফাটা আহাজারি, কান্না আর বিলাপের অসহনীয় বেদনায় টনটন করতে থাকে তাঁর হৃদয়। চোখেই জমাট বেঁধে যায় অশ্রু। তিনি শপথ করলেন, না, আর নয়। ইহুদীদের দখলদারিত্বের অধীনে তিনি আর থাকবেন না। তাঁর পেশীতে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠে। চির চেনা শান্ত সমাহিত সেই আযযাম যেন জ্বলন্ত অঙ্গার। তবে অত্যন্ত নিরব। দারুণ চিন্তাশীল। সময়ের ব্যবধানে হলেও তিনি সফলতার মুখ দেখতে চান। অত্যাচারীর হাত চিরতরে গুড়িয়ে দিতে চান।

১৯৭০ সাল। তিনি তখন জর্দানে। ইসরাঈলী আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি জিহাদে যোগ দিলেন। শুরু হল তাঁর জীবনের আরেক অধ্যায়। চিন্তায় লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথে দৃঢ়পদে এগিয়ে চললেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তিনি অনুভব করলেন, না, তাঁকে আরো পড়তে হবে।

তাঁকে শিখতে হবে। অল্প বিদ্যা নিয়ে সামনে চলা বড়ই কঠিন। অত্যন্ত দুষ্কর। তাই তিনি চলে এলেন মিসরে। ভর্তি হলেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার তিনি ইসলামী আইন শাস্ত্রে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করলেন। ১৯৭১ সালে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাণ্ডিত্যের পুরস্কার লাভ করেন। সে বৎসরই তিনি ইসলামি আইনের বিজ্ঞান ও দর্শন (উসূলুল ফিকহ) এর উপর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৩ সালে মিশরে অবস্থানকালে শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব (রহ) এর (১৯০৬-১৯৬৬) পরিবারের খোঁজখবর নিতে যান।

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ্ আযযাম দেড় বৎসর ফিলিস্তিনের জিহাদে অতিবাহিত করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জিহাদের কার্যক্রম চালিয়ে যান। কিন্তু এ সময় তিনি মানসিকভাবে প্রশান্ত ছিলেন না। কারণ তিনি দেখতেন, যারা ফিলিস্তিনের জিহাদে রত তাদের অনেকেই ইসলাম থেকে অনেক দূরে। মাঝে মধ্যেই তিনি দুঃখ করে বলতেন, ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য এটা কোন ধরনের জিহাদ হচ্ছে, যেখানে মুজাহিদ ভাইয়েরা পেস্নইং কার্ড, গান শোনা আর টেলিভিশনের অশস্নীল ছবি দেখে রাত কাটিয়ে দিচ্ছে! তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতেন, হাজারো মানুষের জনবহুল জায়গায় সালাতের জন্য আহবান করা হলে একেবারেই অল্পসংখ্যক লোক উপস্থিত হয় যাদের হাতের আঙ্গুলী দিয়ে গোনা সম্ভব, এদের দিয়ে কী জিহাদ হবে! তাই তিনি তাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তারা তাঁকে প্রতিহত করত। বাধা দিত। একদিন তিনি এক মুজাহিদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ফিলিস্তিনের এই অভ্যুত্থানের সাথে কি দ্বীনের কোন সম্পর্ক আছে? তখন সেই মুজাহিদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বলল, এই অভ্যুত্থানের পশ্চাতে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই।

এ কথা শোনার পর তাঁর মন ভেঙে যায়। তিনি ফিলিস্তিনের রণাঙ্গন ত্যাগ করে সৌদি আরবে চলে আসেন। জেদ্দায় অবস্থিত বাদশাহ্ আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মাঝে ইসলামের নির্মল চেতনা ও জিহাদী জযবা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাঠদান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তখন উপলব্ধি করতে পারেন, মুসলিম উম্মাহর বিজয় ফিরিয়ে আনতে পারবে ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র বাহিনী। এ ছাড়া বিজয় সম্ভব নয়। তখন থেকে জিহাদ আর বন্দুক হয়ে যায় তার প্রধান কাজ আর বিনোদনের সঙ্গী। তিনি অত্যন্ত জোড়ালো ভাষায় ঘোষণা করতে থাকেন, আর কোন সমঝোতা নয়, নয় কোন আলাপ আর আলোচনা। জিহাদ আর রাইফেলই হবে সমাধানের একমাত্র পথ।

১৯৮০ সাল। হজ্জে এসেছেন এক আফগান মুজাহিদ। সহসা তার সাথে দেখা হয়ে যায় ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) এর। কথার তালে তালে সখ্যতা বৃদ্ধি পেল। একের পর এক শুনলেন আফগান জিহাদের অবিশ্বাস্য কাহিনীমালা। মুজাহিদদের ত্যাগ, কুরবানী আর আল্লাহর মদদের কাহিনীমালা শুনতে শুনতে ড. আব্দুল্লাহ্ আযযাম অভিভূত হয়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন, এতোদিন ধরে তিনি এ পথটিই খুঁজে ফিরছেন। এরই তালাশে আছেন। এরপর তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠে। অশান্ত হয়ে উঠে। তিনি বাদশাহ্ আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ করে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে চলে আসেন। শুরুতে তিনি ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ইতোমধ্যে বেশ কিছু আফগান মুজাহিদ নেতার সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠে। তখন আফগান জিহাদ সম্পর্কে তিনি বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করেন। নানা বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। চলমান জিহাদের রূপরেখা অনুধাবন করেন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে পুরোপুরিভাবে আফগান জিহাদে আত্মনিয়োগ করেন। হৃদয়-মন, মেধা-যোগ্যতা, অর্থ-সম্পদ সবকিছু অকাতরে উজাড় করে দান

করেন। আত্মতৃপ্ত শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের কণ্ঠ চিরে বার বার রাসূলের এই বাণীটি মুজাহিদদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ত, "আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা ষাট বৎসর ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" তারপর তা তাদের হৃদয় ছুঁয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করত। শাহাদাতের আশায় তাদের অস্থির করে ছাড়ত। ব্যাকুল করে দিত।

আব্দুল্লাহ আযযাম ও তাঁর প্রিয় শিষ্য উসামা বিন লাদেন পেশোয়ারে অবস্থানকালে মুজাহিদদের সেবা সংস্থা বায়তুল আনসারে যোগ দেন। এ সংস্থা আফগান মুজাহিদদের সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করত। নতুন মুজাহিদদের পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দিয়ে আফগানিস্তানে সম্মুখ যুদ্ধে প্রেরণ করত। ইতোমধ্যে তিনি তাঁর পরিবারকেও নিয়ে আসেন।

এরপর আব্দুল্লাহ আযযাম আরো সামনে অগ্রসর হলেন। জিহাদের প্রথম কাতারে গিয়ে শামিল হলেন। হাতে তুলে নিলেন অস্ত্র। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সম্মুখ লড়াইয়ে। অসম সাহসিকতায় বীরের মত যুদ্ধ করতে লাগলেন। আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার জন্য তিনি উতলা হয়ে উঠলেন। ছুটে চললেন এক ফ্রন্ট থেকে আরেক ফ্রন্টে। এক রণক্ষেত্র থেকে আরেক রণক্ষেত্রে। আহ! এ যেন আরেক জীবন। এ জীবনের কোন মৃত্যু নেই। এর স্বাদ, রঙ, রূপ আর প্রকৃতি একেবারে আলাদা। অনন্য। তিনি আফগানিস্তানের অধিকাংশ প্রদেশে ছুটে গেলেন। লোগার, কান্দাহার, হিন্দুকুশ পর্বতমালা, পাঞ্জশির উপত্যকা, কাবুল আর জালালাবাদে ছুটে চললেন বিরামহীন গতিতে। ফলে আফগান রণাঙ্গনের সাধারণ যোদ্ধা ও মুজাহিদদের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। সখ্যতা হয়। বন্ধুত্ব হয়। সবাই তাঁকে তাঁর হৃদয়ের উদারতা, জিহাদী জযবা, আল্লাহর রাহে জীবন দেয়ার আকুতি, মুসলিম উম্মাহর দরদী 'ব্যক্তিত্ব্যের কারণে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে থাকে। মহব্বত করতে থাকে।

এরপর তিনি আবার ফিরে আসেন পেশোয়ারে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় এবার তিনি একেবারে টইটম্বুর। গোটা আফগান রণাঙ্গনের সমস্যা-সমাধান তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে। জিহাদের এই কাফেলাকে সঠিক পথে পরিচালনার ও চূড়ান্ত বিজয়ের পথে নিয়ে যাওয়ার তামান্নায় তিনি অধীর অস্থির। তাই মুজাহিদদের মাঝে সংস্কারমূলক বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। মুজাহিদদের পরিশুদ্ধ করতে লাগলেন। জিহাদের পথে নানা বিভ্রান্তির আলোচনা করতে লাগলেন। বিভক্ত মুজাহিদদের গ্রুপগুলোকে একই কাতারে নিয়ে আসতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কেঁদে কেঁদে দুআ করতে লাগলেন। যারা কখনো জিহাদের কাতারে শামিল হয়নি; সম্মুখ লড়াইয়ে অংশ নেয়নি তাদের প্রথম কাতারে শামিল হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের সেই বক্তৃতা সংকলনই পরবর্তীতে 'ফি জিলালি সুরাতিত তাওবা' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়। বক্ষমান তাফসীর গ্রন্থটি তারই বাংলা অনুবাদ।

আফগান মুজাহিদ নেতাদের মাঝে তাঁর প্রভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাই সবাই তাঁকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন। তাঁর প্রস্তাব, পরিকল্পনাকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারত না।

এরপর তিনি মুসলিম উম্মাহকে আফগান জিহাদের ব্যাপারে জাগ্রত করার দিকে মনোনিবেশ করেন। আফগান জিহাদের পবিত্র আহবানকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে ছুটে যান বিশ্বের বহু দেশে। সাক্ষাৎ করেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও সমাজসেবক ব্যক্তিত্বদের সাথে। সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিতে থাকেন। চারদিকে ছুটতে থাকে অনল প্রবাহ। তিনি দ্বীনের হেফাজতের জন্য, শত্রুদের হাত থেকে মুসলমানদের লুণ্ঠিত ভূমিকে উদ্ধারের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। ফাঁকে ফাঁকে তার কলমও ছুটতে থাকে। তিনি

জিহাদ বিষয়ে বেশ কয়েকটি পুস্তকও রচনা করেন। যা এখনো পাঠককে আন্দোলিত করে। আলোড়িত করে। জিহাদের পথে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। পুস্তকগুলোর শীর্ষে রয়েছে– এসো কাফেলাবদ্ধ হই, আফগান জিহাদে রহমানের নিদর্শনসমূহ, মুসলিম ভূমিসমূহের প্রতিরক্ষা, কারা জান্নাতের কুমারীদের ভালবাসে ইত্যাদি।

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযামের অবিরাম প্রচেষ্ঠা, মেহনত-মুজাহাদা সফলতার আলো দেখতে পায়। তিনি বিশ্বের মুসলমানদেরকে আফগান জিহাদের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। ফলে আফগান জিহাদ শুধু আফগান জনতার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানরা আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ছুটে আসতে থাকে। তারা ইহুদী-খৃস্টানদের হাতে নিপীড়িত-নির্যাতিত মুসলিম মা-বোনদের উদ্ধারে শপথ গ্রহণ করতে থাকে এবং প্রত্যেক লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে।

তিনি তার মানসপটে একটি চিত্রই এঁকেছিলেন। তাহল, জিহাদের মাধ্যমে খিলাফতের পুন:প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বিশ্বাস করতেন এবং বারবার বলতেন, পৃথিবীর বুকে খিলাফত প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। তাই তিনি বহুবার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার প্রস্তাবকে অকুণ্ঠ চিত্তে প্রত্যাখান করেছেন। আর দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হয় তিনি বিজয়ী হবেন, নতুবা তাকে হত্যা করা হবে।

আফগান রণাঙ্গন ছিল তাঁর স্বপ্নের চারণভূমি। তাই তিনি বলতেন, আমি কখনো জিহাদের ভূমি পরিত্যাগ করব না, তিনটি অবস্থা ছাড়া। হয় আমি আফগানিস্তানে নিহত হব, নতুবা পেশোয়ারে নিহত হব, নতুবা হাত বাঁধা অবস্থায় আমাকে পাকিস্তান থেকে বহিস্কার করা হবে।

একদিন মিম্বারে খুতবা দানকালে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন, "আমি মনে করি, আমার প্রকৃত বয়স হচ্ছে নয় বৎসর। সাড়ে সাত বৎসর কেটেছে আফগান জিহাদে আর দেড় বৎসর কেটেছে ফিলিস্তিনের জিহাদে। এছাড়া আমার জীবনের বাকী সময়গুলোর কোন মূল্য আমার কাছে নেই।" তিনি আরো বললেন, জিহাদ পরিত্যাগ করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এক আল্লাহর ইবাদত করা হবে। এ জিহাদ চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা হবে। জিহাদ চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সব নির্যাতিত মানুষকে মুক্ত করা হবে। জিহাদ চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের সম্মান ও লুণ্ঠিত ভূমিগুলো ফিরিয়ে আনা হবে। জিহাদ হল চিরস্থায়ী মর্যাদার পথ।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে জুমআর খুতবায় বলতেন, মুসলিম জাতি কখনো অন্য জাতি দ্বারা পরাজিত হয়নি। আমরা মুসলমানরা কখনো আমাদের শত্রুর কাছে পরাজিত হইনি। বরং আমরা আমাদের নিজেদের লোকদের কাছেই পরাজিত হয়েছি।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মানুরাগ, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, সংযমশীলতা ছিল তাঁর চারিত্রিক অলংকার। তিনি কখনো কারো সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করতেন না। তরুণদের তিনি ভিন্ন চোখে দেখতেন। তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। সব ধরনের ভয়-ভীতি মাড়িয়ে হৃদয়ের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি নিয়মিত সিয়াম পালন করতেন। বিশেষ করে দাউদ আলাইহিস সালামের সুন্নাহ অনুযায়ী অর্থাৎ একদিন সিয়াম পালন করতেন আরেকদিন বিরত থাকতেন। এভাবে তিনি সারা বৎসর সিয়াম পালন করতেন। সোমবার ও

বৃহস্পতিবার তিনি সিয়াম পালন করতেন এবং অন্যদেরও এ দু'দিন সিয়াম পালন করতে উৎসাহিত করতেন।

একদা এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। পেশোয়ারে কিছু উগ্র স্বভাবের লোক ঘোষণা দিল, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম কাফের হয়ে গেছে। কারণ তিনি মুসলমানদের সম্পদ অপচয় করছেন।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম এ সংবাদ শুনে বিস্মিত হলেন না। ক্ষিপ্তও হলেন না। তাদের সাথে কোন রূঢ় আচরণও করলেন না। বরং তাদের জন্য কিছু উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে দিলেন। এরপরও কিছু লোক বিরত হল না। তারা তাঁর বিরুদ্ধে কটু কথা বলতে লাগল। অপবাদ ছড়াতে লাগল। শাইখ আযযাম কিন্তু একেবারেই নিরব। নির্বিকার। তিনি তাদের সম্পর্কে কিছুই বললেন না। বরং নিয়মিত তাদের নিকট উপহার সামগ্রী পাঠাতে লাগলেন। তারপর একসময় তাদের ভুল ভাঙল। তখন তারা বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! আমরা কখনোই শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের মত মানুষ দেখিনি। তিনি আমাদের নিয়মিত অর্থ ও উপহার সামগ্রী দিয়ে যেতেন অথচ আমরা তার বিরুদ্ধে কটুবাক্য বলতাম।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযামের চেষ্টা ও মুজাহাদার ফলে আফগানিস্তানের বেশ কয়েকটি মুজাহিদ গ্রুপ একত্রিত হল। তারা একই আমীরের নির্দেশে চলতে লাগল, ফলে শত্রুদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। মুজাহিদরা প্রত্যেক ফ্রন্টে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনতে লাগল। এ অবস্থায় শত্রুরা তাকে সহ্য করতে পারল না। তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করল। তাকে হত্যার কৌশল খুঁজতে লাগল।

পেশোয়ারে তিনি এক মসজিদে নিয়মিত জুমআর নামায পড়াতেন। নামাযের আগে অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিতেন। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ তার বক্তৃতা শুনতে ছুটে আসত। ১৯৮৯ সালে শত্রুরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে তার মিম্বারের নিচে একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী টিএনটি বিস্ফোরক রেখে দিল। এটা এতোই ভয়াবহ ছিল যে তা বিস্ফোরিত হলে পুরো মসজিদটি ধ্বসে পড়ত। মসজিদের কেউ বাঁচত না। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা ছিল ভিন্ন। তাই তা বিস্ফোরিত হয়নি।

এ দিকে শত্রুরা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে লাগল। ১৯৮৯ সালের ২৪শে নভেম্বর। শুক্রবার। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম যে পথ দিয়ে জুমআর নামায আদায় করতে যেতেন সে পথে শত্রুরা তিনটি বোমা পুঁতে রাখল। রাস্তাটি ছিল সরু। একটির বেশি গাড়ি তা দিয়ে অতিক্রম করতে পারত না। দুপুর ১২.৩০ মিনিটে শাইখের গাড়িটি ঠিক বোমা যেখানে পুঁতে রাখা হয়েছিল সেখানে এসে থামল। সে গাড়িতে ছিলেন শাইখ ও তাঁর দুই ছেলে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ। তাঁর আরেক পুত্র তামীম আদনানী আরেকটি গাড়িতে করে পিছনে পিছনে আসছিল। শাইখ গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলেন। আর তখনই বিকট শব্দ করে শত্রুদের পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরিত হল। বিস্ফোরণের ভয়াবহ আওয়াজে কেঁপে উঠল শহর। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই মসজিদ ও আশপাশের মানুষেরা দৌড়ে এল। ইতোমধ্যে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। অকুস্থলে তারা গাড়ির বিক্ষপ্ত টুকরো ছাড়া আর কিছুই পেলনা। বিস্ফোরণের ফলে শাইখের দুই ছেলের দেহ ১০০ মিটার উপরে উঠে গিয়েছিল। তাদের দেহ বিভিন্ন গাছের ডালে, বৈদ্যুতিক তারের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযামের দেহকে রক্ষা করলেন। দেহটি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় একটি দেয়ালের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তার শাহাদাতের সংবাদে চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে এলো। কান্নার রোল পড়ে গেল। মুজাহিদদের শিবিরে শিবিরে সে কান্না ছড়িয়ে পড়ল। স্তব্ধ হয়ে গেল তার বন্ধু-বান্ধব আর নিকটতম ব্যক্তিরা।

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ —

'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার নূরের পূর্ণ বিকাশ ছাড়া আর কিছুই চান না। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।'

১৯৯৯ সাল। আল জাজিরা টিভি চ্যানেল শাইখ উসামা বিন লাদেনের এক সাক্ষাৎকার নিল। তিনি তাতে বললেন, "শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম একক কোন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি একাই ছিলেন একটি উম্মাহ। একটি জাতি। তার শাহাদাতের পর মুসলিম মায়েরা তাঁর মতো দ্বিতীয় আরেক সন্তান জন্ম দিতে পারেনি।"

টাইম ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে, "বিংশ শতাব্দীতে জিহাদকে পুনঃর্জাগরণে তিনিই দায়ী।"

চেচনিয়া জিহাদের ফিল্ড কমান্ডার ইবনুল খাত্তাব রহ. বলতেন, "১৯৮০-এর দশকে শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম ছিলেন এমন একটি মুদ্রিত নাম যার কথা চেচনিয়ার জিহাদের ময়দানগুলোতে আজও বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে চলছে। তিনি(আব্দুল্লাহ আযযাম) মুজাহিদীনদের ব্যাপারে বলতেন, যে কেউ জিহাদের ময়দানে মারা গেল সে যেন শরীক হল, 'শহীদী কাফিলার সাথে'।"

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা
প্রথম মজলিস ১৭
তরজমা ১৭
নাম ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ১৭
বিসমিল্লাহ না লিখা ও তার প্রাসঙ্গিক আলোচনা ১৮
তাফসীর ১৯
দ্বিতীয় মজলিস ২৮
তৃতীয় মজলিস ৩৮
চতুর্থ মজলিস ৫০
পঞ্চম মজলিস ৬৬
ষষ্ঠ মজলিস ৯০
সপ্তম মজলিস ৯৬
অষ্টম মজলিস ১০৬
নবম মজলিস ১২১
দশম মজলিস ১৪২
একাদশ মজলিস ১৪৬
দ্বাদশ মজলিস ১৫৮
ত্রয়োদশ মজলিস ১৭১
চতুর্দশ মজলিস ১৯৮
পঞ্চদশ মজলিস ২০৫
ষোড়শ মজলিস ২১৯
সপ্তদশ মজলিস ২৩৫
অষ্টাদশ মজলিস ২৪৮
ঊনবিংশ মজলিস ২৫৯
বিংশ মজলিস ২৭৩
একবিংশ মজলিস ২৮৫
দ্বাবিংশ মজলিস ২৯৬
ত্রয়োবিংশ মজলিস ৩০৮
চতুর্বিংশ মজলিস ৩১৭
পঞ্চবিংশ মজলিস ৩২৯
ষড়বিংশ মজলিস ৩৪০
সপ্তবিংশ মজলিস ৩৫৪
অষ্টাবিংশ মজলিস ৩৬৫

বিষয় পৃষ্ঠা
উনত্রিংশ মজলিস ৩৭৪
ত্রিংশ মজলিস ৩৯৫
একত্রিংশ মজলিস ৪০৪
দ্বাত্রিংশ মজলিস ৪১৩
ত্রয়স্ত্রিংশ মজলিস ৪২৭
চতুস্ত্রিংশ মজলিস ৪৩৯
পঞ্চত্রিংশ মজলিস ৪৪৯

প্রথম মজলিস

সূরা তাওবা : আয়াত ১, ২, ৩

سورة التوبة

(١) بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ (٢) فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ
وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۝ (٣) وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ
الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ ۝ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ
مُعْجِزِى اللّٰهِ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

তরজমা

(১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা হল, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। (২) সুতরাং তোমরা চার মাস এদেশে নির্বিঘ্নে পরিভ্রমণ কর। আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন। (৩) আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে লোকদের নিকট ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি বিমুখ হও, তাহলে জেনে নাও, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। আর আপনি কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

নাম ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এটি মদীনায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা। আয়াতের সংখ্যা ১২৯। এ সূরায় মুসলিম সমাজের সাথে অন্যান্য সমাজের সম্পর্কের চূড়ান্ত স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে। তাছাড়া মুসলমানদের সাথে কাফের ও মুনাফিকদের সম্পর্কের সীমাও নির্ধারিত হয়েছে।

এ সূরার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম তাওবা। কারণ, এ সূরায় ১১৭নং আয়াতে আল্লাহর পক্ষ হতে ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের তওবা কবুল করে তাদের উপর অনুগ্রহ করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ১১৮নং আয়াতে বিশেষভাবে তিনজন সাহাবী কা'ব ইবনে মালিক, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা ইবনে রবী (রাঃ)-এর তাওবা কবুল করে তাদের উপর অনুগ্রহ করার ঘোষণা বিবৃত হয়েছে।

এ সূরাটি সূরাতুল বারাআ নামেও প্রসিদ্ধ। বারাআ শব্দের অর্থ সম্পর্ক ছিন্ন করা। এ সূরায় মক্কার সকল গোত্রের সাথে কৃত মুসলমানদের সকল চুক্তি ছিন্ন ও বাতিল করা হয় এবং তাদের চার মাস সময় প্রদান করা হয়। এর মধ্যে যেন তারা যেদিকে সুবিধা চলে যায় বা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়।

এ সূরার আরেক নাম আল-ফাজিহা। ফাজিহা শব্দের অর্থ অপমানকারী, লাঞ্ছনাকারী। কারণ, এ সূরায় মুনাফিকদের অপমান ও লাঞ্ছনার কথা বিবৃত হয়েছে। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি আব্বাস (রাঃ)-কে সূরা বারাআ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি ফাজিহা (অপমানকারী)। কারণ, এ সূরায় বিভিন্ন আয়াতে মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে–

و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا ... منهم الذين يؤذون النبي... و منهم من عاهد الله ... و منهم من يلمزك في الصدقات...

অর্থ : যারা জেদের বশে মসজিদ নির্মাণ করেছে... আর তারা যারা নবীকে কষ্ট দিয়েছে... আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছে (অতঃপর ভঙ্গ করেছে)...যারা সদকা বন্টনে আপনাকে (নবীকে) দোষারোপ করে...।

এভাবে মুনাফিকদের প্রসঙ্গে আলোচনা অবতীর্ণ হতে থাকে। শেষে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম, হয়তো কারো উল্লেখ-ই বাদ পড়বে না। এভাবে এ সূরা মুনাফিকদের সকল ভেদ ও গোপন বিষয়ের আলোচনা করে তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছে। এ কারণে এ সূরাকে সূরাতুল বুহুস ও সূরাতুল মুবাসারাও বলা হয়। বুহুস ও মুবাসারা অর্থ আলোচনা। এ সূরায় মুনাফিকদের গোপন ও রহস্যময় বিষয়সমূহের আলোচনা করা হয়েছে।

বিসমিল্লাহ্ না লিখা ও তার প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ সূরাটিই কুরআনের একমাত্র সূরা, যার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখা হয়নি। কেন লিখা হয়নি? এ প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি অভিমত রয়েছে।

১. জাহিলী যুগে আরবদের নিয়ম ছিল, তারা যদি কোন চুক্তি ভঙ্গ ও ছিন্ন করার ইচ্ছা করত, তখন তারা পত্র লিখে প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দিত। আর সে পত্রে 'বিসমিল্লাহ' লিখত না। আল্লাহ তা'আলা এ সূরার মাধ্যমে রাসূল ও মুশরিকদের মাঝে বিদ্যমান চুক্তি ছিন্ন ও ভঙ্গের ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাদের চার মাসের অবকাশ দিয়েছেন। তাই এ সূরাটি 'বিসমিল্লাহ' ছাড়া অবতীর্ণ হয়েছে।

২. ইমাম নাসায়ী (রহঃ) তাঁর সূত্র পরম্পরায় হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন– আমাদেরকে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি ওসমান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যে নিয়মে কুরআনের সূরাগুলোর বিন্যাস করা হয় অর্থাৎ প্রথম দিকে শতাধিক আয়াত সম্বলিত সূরাগুলো রাখা হয়। পরিভাষায় এ সূরাগুলোকে মিয়ীন বলা হয়। তারপর শতের কম আয়াত সম্বলিত সূরাগুলো রাখা হয়। পরিভাষায় এ সূরাগুলোকে মাসানী বলা হয়। সুতরাং কুরআন বিন্যাসের এই নিয়ম হিসাবে আগে সূরা তাওবা তার পর সূরা আনফাল লিখার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কেন আপনি তার ব্যতিক্রম করলেন? তদুপরি এ সূরা দু'টিকে মিলিয়ে লিখেছেন, মাঝে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখেননি। এর কারণ কি?

জবাবে ওসমান (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কোন আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি যাদের দ্বারা অহী লিখাতেন, তাদের কাউকে ডাকতেন। তারপর বলতেন, এটা অমুক সূরার সাথে লিখে রাখ। সূরা আনফাল মদীনায় প্রথম অবতীর্ণ সূরাগুলোর একটি। আর সূরা তাওবা মদীনায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা। অথচ উভয় সূরার আলোচ্য বিষয় ও ঘটনাবলি প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইন্তেকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের স্পষ্টভাবে বলে যাননি যে, সূরা তাওবা সূরা আনফালের অংশ নয়। আমরা তখন ধারণা করলাম যে, সূরা তাওবা সূরা আনফালেরই অংশ। তাই এক সাথে মিশিয়ে লিখেছি এবং উভয় সূরার মাঝে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখিনি।

৩. খারীজা, আবূ ইসমা প্রমুখ কুরআন বিশারদ তাবেঈ বলেছেন– হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে কুরআন সংকলন শুরু হলে রাসূলের সাহাবীদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিল। কতিপয় সাহাবী বললেন, তাওবা ও আনফাল একই সূরা। আর অন্যান্য সাহাবী বললেন, না, বরং দু'টি দুই সূরা। তাই যারা বলেছিলেন, দুই সূরা, তাদের মতের প্রতি লক্ষ্য রেখে দুই সূরার মাঝখানে কিছু জায়গা খালি রাখা হল। আর যারা এক সূরা বলেছিলেন তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখা থেকে বিরত থাকা হল। এতে উভয় মতের সাহাবীগণ সন্তুষ্ট হলেন এবং উভয়ের মতামত কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হল।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সূরা তাওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' কেন লিখা হল না? উত্তরে তিনি বললেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম রয়েছে। অথচ, সূরা তাওবায় শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তিগুলো নাকচ করে জিহাদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখা হয়নি।

৫. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, সূরা তাওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' লিখা হয়নি। তার কারণ, জিবরাঈল (আঃ) তা নিয়ে অবতীর্ণ হননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কিছুই লিখতেন না। জিবরাঈল (আঃ) নিয়ে এলে তবেই তিনি লিখতেন। এখানে জিবরাঈল (আঃ) বিসমিল্লাহ নিয়ে আসেননি, তাই তা লিখা হয়নি।

তাফসীর

এ সূরাটি নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। এতে তাবুকের যুদ্ধ, যুদ্ধের প্রস্তুতি, যুদ্ধের পূর্বের ও পরের মদীনাবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরার কিয়দাংশ যুদ্ধের পূর্বে এবং কিয়দাংশ যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়। নবম হিজরীর রজব মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এটিই শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধের পর রাসূল অন্য কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা হল, ১. বদরের যুদ্ধ। দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে তা সংঘটিত হয়েছিল। ২. ওহুদের যুদ্ধ। তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে তা সংঘটিত হয়েছিল। ৩. বনু নাজীরের যুদ্ধ। তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। ৪. মুরাইসী' বা বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তা চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল আর অন্যরা বলেন, তা ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। ৫. খন্দকের যুদ্ধ, যা পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। ৬. হুদায়বিয়ার যুদ্ধ। সপ্তম হিজরীতে তা সংঘটিত হয়েছিল। ৭. খায়বরের যুদ্ধ। সপ্তম হিজরীতে তা সংঘটিত হয়েছিল। ৮. মূতার যুদ্ধ। অষ্টম হিজরীতে তা সংঘটিত হয়েছিল। ৯. মক্কা বিজয়। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে। ১০। হুনাইনের যুদ্ধ। অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে। ১১. তায়েফের যুদ্ধ। অষ্টম হিজরীর শেষ দিকে সংঘটিত হয়েছিল। ১২. তাবূকের যুদ্ধ। নবম হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন, তিনি বাইতুল্লাহয় উমরা পালন করছেন, তাওয়াফ করছেন। তখন তিনি ও তাঁর চৌদ্দশ' বা পনেরশ' সাহাবী মক্কার পথে রওনা হলেন। ষষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাসে তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন। কুরাইশরা যখন শুনল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফ করতে আসছেন, তাদের উপস্থিতিতেই মুসলমানরা মক্কায় প্রবেশ করবে, তখন তারা দারুণ ক্ষিপ্ত হল। বলল আমাদের উপস্থিতিতে কিছুতেই তারা মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। এ পরিস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়ার যে অংশ হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেখানে অবস্থান নিলেন। নামাযের সময় হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারামের অংশে প্রবেশ করে নামায আদায় করতেন। তারপর পূর্বের স্থানে ফিরে আসতেন। হারামে নামায আদায়ের ফযীলত অর্জনের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার কথা শুনে বললেন, 'হায় কুরাইশের ধ্বংস! যুদ্ধই তাদের তিলে তিলে শেষ করে দিল! তাদের কী হত, যদি আরবদের জন্য আমার পথ উন্মুক্ত করে দিত? তাদের কী ক্ষতি হত, যদি আবরদের জন্য আমাকে ছেড়ে দিত? যদি তারা আমার উপর বিজয়ী হয়, তবে তারা তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে। আর যদি আমি বিজয়ী হই, তবে তারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হবে। আর যদি তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তাদের তা করার শক্তি আছে। কিন্তু কুরাইশরা কী ধারণা করে? যিনি

আমাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করা পর্যন্ত **আমি এই** ধর্মের প্রচার করতেই থাকব কিংবা এ পথেই আমি নিঃশেষ হয়ে যাব।'

হুদায়বিয়ায় পৌঁছলে রাসূলের উট বসে পড়ল। প্রহার করার পরও তা উঠল না। সবাই বলাবলি করতে লাগল, 'কাছওয়া (রাসূলের উষ্ট্রীর নাম) অবাধ্য হয়ে গেছে। কাছওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কাছওয়া অবাধ্য হয়নি। এটা তার চরিত্রও নয়। তবে আবরাহার হাতিকে যিনি আটকিয়েছিলেন, তিনিই তাকে আটকিয়েছেন।' তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ কুরাইশরা যে প্রস্তাব নিয়ে আসবে, আমি তা-ই মেনে নেব। কুরাইশরা একের পর এক লোক পাঠাতে লাগল। তারা উরওয়া ইবনে মাসউদকে পাঠাল। উরওয়া ছকীফ গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তি। তায়েফের সম্পদশালী ও সরদারদের অন্যতম। সে ছিল অন্ধ। সে এসে বলল, 'মুহাম্মদ! তুমি কি আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের একত্রিত করে নিজের গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছ, সে হাত বাড়িয়ে রাসূলের দাড়ি মোবারক ধরতে চাচ্ছিল। সে যখনই দাড়ি ধরার জন্য হাত বাড়াত, তখনই মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) তরবারীর বাট দ্বারা তা প্রতিহত করতেন। মুগীরা (রাঃ)ও ছাকীফ গোত্রেরই লোক ছিলেন।

অবশেষে তিনি বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি স্পর্শ কর না। উরওয়া বলল, কে এই লোকটি? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, মুগীরা। তখন উরওয়া বলল, হে লজ্জায় কাতর ব্যক্তি! তুমি কি তোমার লজ্জা বিষয়টি ঢেকে রেখেছ? জাহেলী যুগে মুগীরা (রাঃ) লুণ্ঠন করতেন। অত্যন্ত শক্তিধর ছিলেন। একদা তিনি কতিপয় লোককে হত্যা করে ফেললে উরওয়া ইবনে মাসউদ তাদের রক্তপণ আদায় করে দিয়েছিল এবং বিষয়টি গোপন রেখেছিল। উরওয়া সে দিকেই ইঙ্গিত করেছিল।

মক্কার লোকেরা একের পর এক লোক পাঠাতে লাগল। অবশেষে সুহাইল ইবনে আমরকে পাঠাল। তার সাথেই সন্ধিচুক্তির বিষয় চূড়ান্ত হয় এবং চারটি শর্তে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ হয়–

১. মুসলমানদের কেউ ইসলাম ত্যাগ করে কুরাইশদের নিকট ফিরে এলে কুরাইশরা তাকে গ্রহণ করে নিবে। কাফেরদের কেউ মুসলমান হয়ে রাসূলের নিকট এলে রাসূল তাঁকে গ্রহণ করবেন না।

২. এ সন্ধি চুক্তির বলে যে কোন গোত্র রাসূলের সঙ্গে যোগ দিতে চাইলে যোগ দিতে পারবে। আর কুরাইশদের সাথে শামিল হতে চাইলে শামিল হতে পারবে। এ ধারা মতে খুজা'আ গোত্র রাসূলের সাথে শামিল হল আর বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে শামিল হল।

৩. দশ বৎসরের জন্য পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হল।

৪. এ বৎসর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীগণ মদীনায় ফিরে যাবেন। উমরা আদায় করবেন না। আগামী বৎসর তরবারী কোষবদ্ধ করে আসবেন এবং উমরা পালন করবেন।

এ ধরনের শর্তের কথা শুনে সাহাবীগণ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। ওমর (রাঃ) ধারণা করলেন যে, এতে মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও ক্ষতি রয়েছে। তাই তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই? রাসূল বললেন, হ্যাঁ, আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ওমর (রাঃ) বললেন, তারা কি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? রাসূল বললেন, হ্যাঁ, তারা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। এবার ওমর (রাঃ) বললেন, তাহলে আমরা কেন আমাদের ধর্মে লাঞ্ছনার বিষয় অনুপ্রবেশের সুযোগ দিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয় তিনি আমার রব। তিনি আমার ক্ষতি করবেন না। নিশ্চয় তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি কিছুতেই তাঁর নির্দেশ অমান্য করব না।

এরপর ওমর (রাঃ) আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। বললেন, আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই? আবূ বকর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ওমর (রাঃ) বললেন, তারা কি মিথ্যার উপর

প্রতিষ্ঠিত নয়? আবূ বকর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তারা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তাহলে কেন আমরা আমাদের ধর্মে লাঞ্ছনার বিষয় অনুপ্রবেশের সুযোগ দিব?

আবূ বকর (রাঃ) বললেন, 'নিশ্চয় তিনি সত্যের উপর রয়েছেন। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিন। নিশ্চয় তিনি সত্যের উপর রয়েছেন। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিন।'

মুসলমানদের মনোকষ্ট আরো তীব্র আকার ধারণ করল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইল ইবনে আমরকে বললেন, লিখ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' আর সুহাইল বলল, আমি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে কিছু জানি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে 'বিসমিল্লাহ' বা 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখ। সুহাইল বলল, বেশ বেশ এটা লিখছি। তারপর রাসূল বললেন, লিখ, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ এই কথায় চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন। সুহাইল বলল, আমি এ কথা স্বীকার করি না যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। যদি স্বীকারই করতাম, তাহলে তো আপনারই অনুসরণ করতাম। তখন রাসূল বললেন, তাহলে লিখ, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ এই কথায় চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন।

এভাবে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ হচ্ছিল। ঠিক তখন আবু জানদাল ইবনে সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় এসে উপস্থিত হলেন। পিতা সুহাইল তার পুত্র আবু জানদালকে দেখেই বলে উঠল, ইয়া মুহাম্মদ! সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তখন আবু জানদাল (রাঃ) চিৎকার করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি আমাকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দেন, তাহলে তারা আমাকে নির্মম নিপীড়ন ও নির্যাতন করবে। আমাকে ধর্মচ্যুত হতে বাধ্য করবে। রাসূল বললেন, 'হে আবু জানদাল! তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ তোমার ও তোমার মত অন্যান্যদের জন্য পরিত্রাণের পথ খুলে দেবেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে তাদের উট কুরবানী করতে হুকুম দিলেন। কিন্তু সাহাবীগণ ইতস্তত করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালামা (রাঃ)-এর নিকট গমন করে বললেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তো ধ্বংস হয়ে গেল! এরা ধ্বংস হয়ে গেল! এরা আমার অবাধ্য হয়েছে। এরা ধ্বংস হয়ে গেল! উম্মে সালামা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার উট যবাহ করুন এবং চুল কেঁটে ফেলুন। তাহলে তারা আপনার অনুসরণ করবে। তখন রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গিয়ে তাঁর উট যবাহ করলেন। মাথার চুল কাঁটালেন। সাহাবীগণও তাঁর অনুসরণ করলেন। তারপর রাসূল মক্কা থেকে চলে এলেন। তখন সূরা ফাতাহ নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন–

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ٥

অর্থ : 'নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।'

এবং এ সূরায়-ই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ٥

অর্থ : "আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। আর শত্রুদের হাত তোমাদের থেকে বিরত রেখেছেন, যেন এটা মু'মিনদের জন্য নিদর্শন হয় আর তোমাদের সরল পথে পরিচালিত করেন। এবং আরো কিছু বিজয় রয়েছে, যা তোমরা এখনো অর্জন করতে পারনি। আর আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন।"

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য বিজয়ের প্রতি ইংগিত করেছেন।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিলহজ্জ মাসে মদীনায় পৌছলেন এবং জিলহজ্জ মাস মদীনায়ই অবস্থান করলেন। এরপর খায়বারের যুদ্ধে গেলেন। এ যুদ্ধে রাসূল শুধুমাত্র তাদেরই অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন, যারা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কারণ, তিনি কুরআনের আয়াতের ইঙ্গিতে বুঝেছিলেন যে, খায়বারের যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করবে। খায়বার বিজয়ের পর খায়বারের সমুদয় বিষয়-সম্পত্তিকে দুই ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগ খায়বারের ইহুদীদের প্রদান করলেন। তবে তারা উৎপন্ন শস্যাদির অর্ধাংশ রাজস্ব স্বরূপ মদীনায় পাঠাবে। আরেক ভাগ সাহাবীদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। খায়বারের যুদ্ধে চৌদ্দশ' সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে দুশ' সাহাবী অশ্বারোহী ছিলেন। প্রত্যেক অশ্বারোহী তিন ভাগ পায়। এক ভাগ নিজের আর দুইভাগ অশ্বের। আর পদাতিকদের প্রত্যেকে এক ভাগ পায়। তাই যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির দ্বিতীয় অংশকে সর্বমোট ১৮শত ভাগে ভাগ করে পদাতিক ১২শত সাহাবীকে ১২শত ভাগ দেয়া হল আর ২শত অশ্বারোহী সাহাবীকে ৬শত ভাগ দেয়া হল।

খায়বারের যুদ্ধের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থান করছিলেন। তখন আবুল বাছীর (রাঃ) মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় পৌছেন। এদিকে কুরাইশরা তাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য দু'জন লোক পাঠাল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী আমরা আবুল বাছীরকে ফিরিয়ে নিতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আবুল বাছীর (রাঃ)কে তাদের সাথে ফিরিয়ে দিলেন। আবুল বাছীর (রাঃ) রাসূলকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দিচ্ছেন! তারা তো আমাকে নির্যাতন-নিপীড়ন করে ধর্ম থেকে ফিরাতে চাইবে। রাসূল তখন সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–

اصبر فإن الله جاعل لك و لمن معك مخرجا

অর্থ : ধৈর্য ধারণ কর! নিশ্চয় আল্লাহ তোমার ও তোমার মত অন্যান্যদের জন্য মুক্তির পথ সৃষ্টি করবেন।

দু'জন কাফেরের সাথে আবুল বাছীর (রাঃ) ফিরে চললেন। পথে তাদের একজন এক বাগানে খেজুর খেতে গেল আরেকজন তার সাথে বসে ছিল। তখন আবুল বাছীর (রাঃ) তার পাশের লোকটিকে বললেন, আরে তোমার তরবারীটি তো ভারী চমৎকার! একটু দেখি তো। দেখার জন্য আবুল বাছীর (রাঃ) তরবারিটি হাতে নিয়েই কাফেরের গর্দানে আঘাত করলেন এবং অপরজনকেও আঘাত করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু সে অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে মদীনায় ফিরে গেল এবং রাসূলকে ঘটনা শুনাল। ঘটনা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিস্মিত হয়ে বললেন–

ويح... إنه مسعر حرب ، لو كان معه رجال...

অর্থ : হায়, হায়, সে তো যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিল। হায়! নিহত ব্যক্তিটির সাথে যদি আরো লোক থাকত।

তারপর সেই লোকটি মক্কায় ফিরে গেলেও আবুল বাছীর (রাঃ) আর মদীনায় ফিরে এলেন না। তিনি মদীনার পশ্চিমে লোহিত সাগরের উপকূলে ঈ'সের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করলেন, যার সদস্য সংখ্যা মাত্র একজন। এ ঘাঁটির সেনাপ্রধান যিনি, সিপাহীও তিনি। তিনি হলেন আবুল বাছীর (রাঃ)।

মক্কার নিপীড়িত মুসলমানদের নিকট সংবাদ পৌছল, আবুল বাছীর (রাঃ) ঈ'সের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন। ব্যাস! আবু জানদাল (রাঃ)ও এসে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। এভাবে একে একে বেশ কয়েকজন সাহাবী এসে একত্রিত হলেন। তারপর তারা প্রতিজ্ঞা করলেন, আমরা কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ করব, শামের বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ করে দিব। তারপর থেকে কুরাইশদের যে কাফেলাই শামে যেত বা শাম থেকে আসত, তার উপর আবুল বাছীর (রাঃ)-এর বাহিনী আক্রমণ করে অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে আনত। কুরাইশদের

বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। খাদ্যের অনটন দেখা দিল। বাধ্য হয়ে মক্কার লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দূত পাঠিয়ে আবেদন করল, হে মুহাম্মদ! আপনি তাদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে আনুন। তাদের অনিষ্ট থেকে আমাদের মুক্তি দিন।

ইয়া আল্লাহ! মাত্র অল্প কয়েকজন যুবক। অথচ একটি শহরকে শাসাচ্ছে। মক্কার সব কাফের তাদের ভয়ে কাঁপছে। এ যুগেও এমনটি সম্ভব। কিছু লোক মৃত্যুর জন্য শপথ নিলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাহসী জীবন দান করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আবুল বাছীর (রাঃ)-এর নিকট চিঠি লিখে পাঠালেন, 'তুমি এবং তোমার সঙ্গী-সাথীরা আমার নিকট চলে এস।'

ইতিপূর্বেই আবুল বাছীর (রাঃ) কাফেরদের এক কাফেলায় হামলা করেছিলেন। কয়েকজনকে হত্যা করেছিলেন। কয়েকজনকে আহত করেছিলেন। নিজেও আহত হয়েছিলেন। মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি রাসূলের পত্র পেলেন এবং পত্রটি বুকে রেখেই ইন্তেকাল করলেন।

এদিকে আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল। হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তিতে বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে ছিল আর বনু খুজা'আ গোত্র ছিল রাসূলের সাথে। বনু বকর ও বনু খুজা'আ গোত্র দু'টির মাঝে দীর্ঘদিন যাবৎ দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। হঠাৎ একদিন বনু বকর গোত্রের লোকেরা রাতের অন্ধকারে বনু খুজাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করে বসে। তারা তখন ওতীর নামক স্থান থেকে পানি সংগ্রহ করছিল। আকস্মিক আক্রমণের কারণে বনু খুজা'আ গোত্রের অনেক লোক নিহত হল। এ আক্রমণে কুরাইশরা অস্ত্র ও জনবল দ্বারা বনু বকর গোত্রকে সাহায্য করেছিল।

আক্রমণের সময় আমর ইবনে খুজায়ী পালিয়ে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হল এবং মসজিদে নববীর আঙিনায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করে রাসূলকে শুনাল–

يارب إني ناشد محمدا حلف أبينا و أبيه ألا تلد

و قدكنتم ولدا وكنا ولدا ثم أسلمنا فلم نبزع يدا

إن قريشا أخلفوك الموعدا و نقضوا ميثاقك المؤيد

وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أقل و أذل عـــددا

و هم بينونا بالوتير جهدا و قتلونا ركعا و سجدا

অর্থ : হে আমার রব! আমি মুহাম্মদকে আমাদের ও তাঁর পূর্বপুরুষদের কসম দিয়ে বলছি, তোমরা সন্তান ছিলে আর আমরা পিতা ছিলাম। অর্থাৎ আমাদের মাঝে আত্মীয়তা সম্পর্ক বিদ্যমান। তারপর আমরা আত্মসমর্পণ করলাম। অতঃপর আমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি। নিশ্চয় কুরাইশরা আপনার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে এবং আপনার সাথে কৃত মজবুত প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেছে। আর তারা ধারণা করেছে যে, আমি কাউকে ডাকব না। অথচ তারা সংখ্যায় অল্প, মর্যাদায় নিচু। তারা রাতের অন্ধকারে ওতীর-এ আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। আমাদেরকে নত ও শায়িত অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কবিতা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং বললেন–

نصرت ، يا عمرو بن سالم

অর্থ : হে আমর ইবনে সালেম! আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে।

তারপর রাসূল একখণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই মেঘখণ্ড বনু খুজা'আর সাহায্যের সংবাদ নিয়ে আসছে। এরপর রাসূল তাদের সংবাদ দিলেন যে, সত্বর আবু সুফিয়ান সন্ধিচুক্তি নবায়ন করতে আসবে।

সত্যিই আবূ সুফিয়ান এলেন এবং তার মেয়ে উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা রাদিআল্লাহু আনহা-এর গৃহে বিছানায় গিয়ে বসলেন। উম্মে হাবীবা রাদিআল্লাহু আনহা তখন বিছানা সরিয়ে ফেলতে লাগলেন। আবূ সুফিয়ান তার মেয়ের আচরণে বিস্মিত হয়ে বললেন, হে মেয়ে! এই শয্যা আমার অযোগ্য নাকি আমি এর যোগ্য নই?

উম্মে হাবীবা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা আর আপনি একজন নাপাক মুশরিক।

কী আশ্চর্য! মক্কার শাসক তার পিতা। অথচ পিতাকে এমন কথা বলছেন। তার নেতৃত্বের প্রভাব ব্যাপক। তার সম্পদ প্রচুর। মর্যাদায় সে অনেক উঁচু আবূ জাহেলের মৃত্যুর পর এখন তিনি মক্কা শাসন করছেন। অথচ তাকে লক্ষ্য করে তার মেয়ে বলছেন, আপনি একজন নাপাক মুশরিক। নিশ্চয় এমন কঠিন কথা স্বচ্ছ আকীদা ও দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। অন্য কিছুর কারণে নয়।

অথচ আজকে পৃথিবীর পরিস্থিতি অন্য রকম। আজ পিতার খাতিরে ভাই তার মুসলমান ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পিতার সামনে ছেলে নামায না পড়ে সিগারেট পান করে। কেউ জাতীয়তাবাদী, কেউ সমাজতন্ত্রী, কেউ গণতন্ত্রী। কেউ পিতার পক্ষ হয়ে নিজের মুবাল্লিগ মুজাহিদ ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ইসলামের সেই আকীদা বিশ্বাস আজ কোথায়? কোথায় ঈমানী শক্তি? কোথায় মু'মিনদের মর্যাদাবোধ?

এরপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় গেলেন। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় হল। তারপর হুনাইনের যুদ্ধে গেলেন। অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে তাদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরপর তায়েফ অবরোধ করেন। কিন্তু তা বিজয় করতে সক্ষম হননি। তায়েফের যুদ্ধে রাসূল মিনজানিক (প্রস্তর নিক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র) ব্যবহার করেন। সালমান ফারসী (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই রাসূল মিনজানিক ব্যবহার করেছিলেন।

ঐ দিকে ছাকীফ গোত্রের যোদ্ধারা সাহাবীদের উপর তীর বর্ষণ করছিল। অনেক সাহাবীর চোখে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। আবূ সুফিয়ান (রাঃ) সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার চোখেও কাফেরদের নিক্ষিপ্ত তীর বিদ্ধ হল। তিনি চোখটি হাতে করে নিয়ে রাসূলের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্বাতাদাহ ইবনে নুমায়েরের চোখের ন্যায় আমার চোখটিও ভাল করে দিন। সম্ভবত খায়বারের যুদ্ধে ক্বাতাদাহ (রাঃ)-এর চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা যথাস্থানে রেখে হাত দিয়ে মুছে দিয়েছিলেন। ফলে তার চোখ পূর্বের চেয়েও সুন্দর ও স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-এর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি চাইলে আমি আপনার চোখ ভাল করে দিতে পারি। আর যদি চান, তবে এর সওয়াব আল্লাহর নিকট থেকে গ্রহণ করতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনার মত কি হে আবূ সুফিয়ান?

আবূ সুফিয়ান (রাঃ) একথা শুনে বললেন, আমি আল্লাহর নিকটই এর সওয়াব চাই। তারপর তিনি তার চোখটি পায়ের নীচে রেখে পিষে ফেললেন।

আবূ সুফিয়ান (রাঃ) যথার্থরূপে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার বয়স ছিল বেশি। আশির কম ছিল না। ইয়ারমুকের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করলেন। কিন্তু যুদ্ধ করা তার দ্বারা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি মহিলাদের সাথে লাঠি নিয়ে রণাঙ্গনের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুসলমানদের কেউ পালিয়ে পিছনে গেলে তিনি লাঠি দ্বারা পিটিয়ে তাড়িয়ে তাকে রণক্ষেত্রে পাঠাতেন।

তাবূকের যুদ্ধ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে আসার পর সূরা 'বারাআ' অবতীর্ণ হয়। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহকে বরং গোটা মক্কাকে মূর্তির জঞ্জাল থেকে পবিত্র করেন। তিনি আততাব ইবনে উসাইদ (রাঃ) কে মক্কার শাসক নিয়োগ করেন। আততাব (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও পরহেযগার লোক। সে বৎসর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ করেন। আততাব ইবন উসাইদ (রাঃ)-ও সে বৎসরই হজ্জ করেন।

নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জকে মুশরিকদের থেকে এবং বিবস্ত্র লোকদের থেকে পবিত্র করতে চাইলেন। কারণ, আরবের মুশরিকরা বিবস্ত্র অবস্থায় বাইতুল্লাহর তওয়াফ করত এবং বলত, যে কাপড় পড়ে আমরা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছি, তা পরিধান করে কীভাবে তওয়াফ করব। তাই কারো কাছে দেরহাম-দীনার থাকলে সে কুরাইশদের নিকট থেকে কাপড় ভাড়া নিয়ে আসত এবং সে কাপড় পরিধান করে তওয়াফ করত। আর যাদের দেরহাম-দীনার থাকত না, তারা বিবস্ত্র অবস্থায় বাইতুল্লাহ তওয়াফ করত। কিন্তু প্রাচীন জাহেলিয়্যাতের সময়কার বিবস্ত্র হওয়া নব্য জাহেলিয়্যাতের সময়কার বিবস্ত্র হওয়ার ন্যায় নয়। তারা বিবস্ত্র হত ভ্রান্ত বিশ্বাসে, শয়তানের প্ররোচনায়। ধর্মীয় আমেজ থাকত তাতে। তাই তারা বলত, যে কাপড় পরিধান করে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছি, তা পরে কীভাবে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করব। তদুপরি সেখানে কোন অবাধ মেলামেশা ছিল না। দিন শেষে যখন রাতের অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত, তখন মহিলারা বিবস্ত্র হয়ে তওয়াফ করত। আর বলত—

اليوم يبدو بعضه أو كله

و ما بدا منه فلا أحله

অর্থ : "আজ শরীরের কিয়দাংশ অথবা গোটা শরীর বিবস্ত্র হয়ে যাবে। তবে যে অংশ বিবস্ত্র হবে, আমি তা পর পুরুষের জন্য বৈধ করে দিব না।"

এটা হল প্রাচীন জাহেলিয়্যাতের কথা। কিন্তু আজকের আধুনিক জাহেলিয়্যাতের কথা কি কেউ চিন্তা করে দেখেছেন? প্রতিদিন এসব কী হচ্ছে! বেহায়াপনা, বেলাল্লাপনা, উলঙ্গপনা ও নির্লজ্জতার কি শেষ আছে! খুন, ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণ ইত্যাদির কী কোন মাত্রা আছে! প্রাচীন জাহেলিয়্যাতের যুগে নারীদের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ, চারিত্রিক পবিত্রতা ও মানবতাবোধ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

আরবের প্রসিদ্ধ কবি আনতারার সম্ভ্রমের কথা চিন্তা করে দেখুন। তিনি তার ছন্দে বলেন—

و أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى و أري جارتي مـــأواها

অর্থ : আমি আমার আঁখি বন্ধ রাখি, ততক্ষণ পর্যন্ত খুলি না, যতক্ষণ না আমার প্রতিবেশীনী তার গৃহাভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রেম-জগতের কিংবদন্তী কায়েস তার প্রেয়সী লায়লাকে বলেছিল, 'আমাকে একটিবার চুমু দাও।' উত্তরে লায়লা বলল, 'না, আমি তোমাকে চুমু দিব না।' তারপর কায়েস বলল, 'আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি তুমি সত্যিই আমাকে চুমু দিতে, তাহলে তরবারীর আঘাতে আমি তোমাকে দু'টুকরো করে ফেলতাম।'

তাদের মাঝে চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল হিমালয় সমান।

ঐ মহিলার কথা চিন্তা করে দেখুন, যার মাধ্যমে হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ কুরাইশদের নিকট গোপনে চিঠি পাঠিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী এবং জুবাইর (রাঃ) কে ঐ মহিলার সন্ধানে পাঠালেন। পথেই আলী (রাঃ) সেই মহিলাকে পেয়ে বললেন, 'চিঠিটি বের করে দাও,' মহিলা বলল, 'আমার সাথে কোন চিঠি নেই।' তখন আলী (রাঃ) ধমক দিয়ে বললেন, 'যদি চিঠি বের করে না দাও, তাহলে আমি তোমার মাথা আবরণমুক্ত করে ফেলব।' এটাই ছিল সেকালের চূড়ান্ত হুমকি।

মক্কা বিজয় হলে আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-এর স্ত্রী হিন্দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাই'আত গ্রহণ করতে এল। রাসূল তখন তাকে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন—

يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا و لا يسرقن ولا يزنين

অর্থ : হে নবী! যখন মু'মিন নারীরা আপনার নিকট এই মর্মে বাই'আত গ্রহণ করতে আসবে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না এবং চুরি করবে না এবং যিনা করবে না...। (সূরা মুমতাহিনা : ১২)

তখন হিন্দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন স্বাধীন নারী কি যিনা করতে পারে? তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত হয়েই এ প্রশ্নটি করেছিলেন। তারা মুশরিক ছিল, অজ্ঞ ছিল। কিন্তু তাদের মাঝে আখলাক ছিল। উন্নত গুণাবলী ছিল। উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিল তারা।

এবার আধুনিক খোদাদ্রোহী চরিত্রের দিকে তাকান। মিসরের জামাল আব্দুন নাসের কত জঘন্য চরিত্রের লোক ছিল দেখুন। সে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে গ্রেফতার করিয়ে আনত। সাথে সাথে তার সহোদরা বোনদেরকেও নিয়ে আসত। তারপর ভাইয়ের সামনে তার বোনের কৌমার্য ছিন্ন করত। আর জেলার হামযা বাসুনীর বেহায়াপনার কথা লিখতে তো কলম অগ্রসর হতে চায় না। সহোদর দুই ভাই কারারুদ্ধ ঐ নরাধম তাদের পরস্পরকে সমকামিতায় লিপ্ত হতে বাধ্য করত। নতুবা তাদের উপর চালাত কঠিন অত্যাচার। এভাবে মিসরের জেলে যে কত নারী তার কৌমার্য হারিয়েছে, তার হিসাব কে রেখেছে। জয়নব গাজালী তার গ্রন্থ 'আইয়ামুন মিন হায়াতী' (বাংলায় 'কারাগারে রাত-দিন' নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে) এর মাঝে তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আমি দাঁড়াতে পারতাম না। প্রয়োজনে হামীদা কুতুবের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতাম। ওজুর জন্য তিনি আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যেতেন। কারণ, আমি কারারুদ্ধ অবস্থায় পাঁচ বৎসর পাঁচ মিনিটের জন্যও ঘুমাইনি।'

তিনি বলেন, একদিন তারা আমার নিকট একজন পুলিশ পাঠাল। হামযা বাসুনী তাকে বলে সামনে যাও আর সে পিছিয়ে যায়। আবার বলে সামনে যাও আর সে পিছিয়ে যায়। তারপর লোকটি কেঁদে ফেলল এবং হামযা বাসুনীর সামনে দিয়েই দৌড়ে পালিয়ে গেল। এরপর তারা আরেকজন লোক নিয়ে এল। হামযা বাসুনী বলল, যাও। সে আমার সেলে প্রবেশ করল। তারা বলল, কাজ চালাও। যয়নব গাজালী বলেন, 'আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার মন ও শরীরে অসাধারণ সাহস ও শক্তি অনুভব করলাম। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করলেন। আমি তার ঘাড় কামড়ে ধরলাম। লোকটি ওজনে ন্যাকড়ার মত মনে হল। আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম, যেন সে কমলালেবুর বিচি। তিনি বলেন, আমি পশুটিকে আমার সেলেই মেরে ফেললাম।'

এই হল আধুনিক জাহেলিয়্যাতের আখলাক-চরিত্র। এ হল এ শতাব্দীর খোদাদ্রোহীদের চরিত্র। হাফেজ আসাদ, সে তো যিনা করার উদ্দেশ্যে কুমারী মেয়েদের জেলে আবদ্ধ করত। আর সতী-সাধ্বী মেয়েরা কারা প্রকোষ্ঠে থেকে মুজাহিদ ভাইদের নিকট পত্র পাঠাত, এসো হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! আমাদের গর্ভের অবৈধ ভ্রূণ বড় হতে শুরু করেছে; এসো, আরো কিছু ঘটার পূর্বেই এই কারা প্রকোষ্ঠ ধ্বংস করে দাও।

এ হল সমাজবাদী, জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের চরিত্র। এ হল প্রগতিবাদীদের নখরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মানবতার রক্তাক্ত দাস্তান।

যাক, সার কথা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহকে বিবস্ত্র তওয়াফকারী ও মুশরিকদের অপকর্ম থেকে পবিত্র করতে চাইলেন। আর এ মর্মে সূরা বারাআ-এর চল্লিশটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে আয়াতগুলোসহ আলী (রাঃ)কে মক্কায় প্রেরণ করলেন। ইতোপূর্বেই তিনি আবূ বকর (রাঃ)কে হাজীদের আমীর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আলী (রাঃ)-এর হাতে আয়াতগুলোর লিখিত একটি কপি তুলে দিয়ে বললেন, আবূ বকরের সাথে গিয়ে মিলিত হও এবং সমস্ত হাজীর সামনে এ আয়াতগুলো পাঠ করে তাদের শুনিয়ে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রাঃ)কে এ কারণে পাঠালেন যে, আরবদের মাঝে প্রচলিত নিয়ম ছিল, যে ব্যক্তি কোন চুক্তিতে বা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছে, সে নিজে বা তার নিকটাত্মীয় ছাড়া অন্য কেউ সেই চুক্তি ভঙ্গ বা বাতিল করলে তা কার্যকরী হত না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকেই (রাঃ) এ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নির্বাচিত করলেন।

পথে আলী (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হলেন। আলী (রাঃ)কে দেখে আবু বকর (রাঃ) ভড়কে গেলেন। তিনি ভাবলেন, হয়তো তাঁর ব্যাপারে কোন অহী অবতীর্ণ হয়ে থাকবে, হয়ত তাকে দায়িত্ব

থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বদলে আলী (রাঃ)কে আমীর বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আতঙ্কভরা কণ্ঠে তিনি আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, আমীর হয়ে এসেছ, না মামূর (অধীন) হয়ে? আলী (রাঃ) বললেন, মামূর হয়ে। তখন আবূ বকর (রাঃ) আশ্বস্ত হলেন। আলী (রাঃ) বলেন, চারটি বিষয়ের ঘোষণা দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছেন।

যায়দ ইবন নুফাই (রাঃ) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের জন্য আপনাকে হজ্জে প্রেরণ করা হয়েছিল? আলী (রাঃ) বললেন, চারটি কারণে। [চারটি হুকুম সকলকে শুনিয়ে দিতে]। ১. বিবস্ত্র কেউ বাইতুল্লাহ তওয়াফ করতে পারবে না। ২. যার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন চুক্তি আছে, তা তার মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আর চুক্তি না থাকলে তাদের চার মাসের অবকাশ দেয়া হল। ৩. মু'মিন পুরুষ ও নারী ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ৪. এই বৎসরের পর মুসলমান ও মুশরিকরা হজ্জে একত্রিত হতে পারবে না। অর্থাৎ মুশরিকরা হজ্জ করতে পারবে না। (তিরমিযী)।

এমনই ঘটল। নবম হিজরীতে আলী (রাঃ) আরাফার দিনে, কুরবানীর দিনে, জ্বিলহজ্জের বার তারিখে এই ঘোষণা সমস্ত হাজীকে শুনিয়ে ছিলেন—

براءة من الله و رسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر

অর্থ : মুশরিকদের মধ্য থেকে তোমরা যাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ, তাদের থেকে আল্লাহ ও তার রাসূল মুক্ত।

অর্থাৎ চুক্তি শেষ হয়ে গেছে।

সুতরাং চার মাস তোমরা পৃথিবীতে নির্বিঘ্নে ঘুরাফেরা কর। অর্থাৎ জ্বিলহজ্জের দশ তারিখ হতে রবিউস সানীর দশ তারিখ পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেয়া হল। এ সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে। তোমাদের সাথে কেউ যুদ্ধ করবে না। সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে আরব উপদ্বীপের বাইরে চলে যেতে পার। আর ইচ্ছা করলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে পার। এ চার মাস পর তোমাদের বিরুদ্ধে যথার্থ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এভাবেই আলী (রাঃ) নবম হিজরীতে হজ্জের মওসুমে মু'মিন-মুশরিক নির্বিশেষে সকলকে এই ঘোষণা জানান।

দ্বিতীয় মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(١) بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ إِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ (٢) فَسِيحُوْا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ وَأَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكٰفِرِيْنَ ○

অর্থ : (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা হল, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়েছিল। (২) সুতরাং চার মাস তোমরা এদেশে নির্বিঘ্নে পরিভ্রমণ কর আর জেনে রাখ তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন (পরাভূত করবেন)।

আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, সূরা বারাআ বা সূরা তাওবার অনেকগুলো নাম রয়েছে। তন্মধ্যে আল-ফাজিহা ও আল-বুহূস অন্যতম। ফাজিহা অর্থ অপমানকারী এবং বুহূস অর্থ আলোচনা। এ সূরায় মুনাফিকদের আলোচনা ও পরিচয় তুলে ধরে তাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ এক তাবেঈ বলেন, আমি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)-কে দেখলাম, তিনি হিমসে এক মুদ্রা বিনিময়কারীর দোকানে টেবিলে বসে আছেন। তিনি তখন অত্যন্ত মোটা হয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাকে বললাম, আপনি কি এ বৎসর জিহাদে অংশগ্রহণ বাদ দিবেন– শুধু এই বৎসর? তিনি বললেন–

أبيت البحوث و رفضت سورة التوبة؟

অর্থ : তুমি কি সূরা বূহূসকে অস্বীকার করলে? তুমি কি সূরা তাওবাকে প্রত্যাখ্যান করলে?

অথচ সে সময় জিহাদ ফরজে কিফায়া ছিল। কারণ, তখন নতুন অঞ্চল বিজয় করার জন্য জিহাদ হচ্ছিল। মুসলমানদের হৃত ভূখণ্ড উদ্ধারের জন্য জিহাদ হচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও মিকদাদ (রাঃ) বলেছিলেন –

أبيت البحوث

অর্থ : তুমি কি সূরা বুহূসকে অস্বীকার করলে? যে সূরায় আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের কুচরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন– তারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করার ব্যাপারে নানা ওজর-আপত্তি তুলে ধরে।

সূরা তাওবা মদীনায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা। নবম হিজরীর রজব মাসে গাযওয়ায়ে তাবূকের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে অবতীর্ণ হয়েছে এই সূরা। তাই এ সূরা থেকেই জিহাদ সংক্রান্ত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক বিধি-বিধান গ্রহণ করতে হবে। যে বিধি-বিধান কিয়ামত পর্যন্ত আর পরিবর্তন হবে না।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সূরাটি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তাতে মৌলিকভাবে ছয়টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম বিষয় ঃ শুরুর আটাশটি আয়াতে আরব উপদ্বীপের সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি রয়েছে, মেয়াদ পর্যন্ত তাদের চুক্তি রক্ষার হুকুম দেয়া হয়েছে। নতুন চুক্তি নিষেধ করা হয়েছে। আর যুদ্ধ ঘোষণায় এতটুকু অনুকম্পা করা হয়েছে যে, তাদের চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়েছে। এ চার মাসের মধ্যে তারা হয় ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করে ইসলাম গ্রহণ করবে, অন্যথায় যেখানে খুশি চলে যাবে। কারণ, তখন পর্যন্ত দুর্বল-ঈমান মুসলমানদের সাথে কাফেরদের বিভিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মুসলমান ও মুশরিকদের মাঝে বিদ্যমান সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ প্রদান করেন।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, বিশ্বাস ও বাস্তবতার নিরিখে এ ঘোষণা দেয়া হয়। তাছাড়া মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বসহ বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, মন তাদের বিরুদ্ধে তখনি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হত না। তেমনিভাবে আহলে কিতাবের সাথে যুদ্ধ করতেও মনে নানা প্রশ্ন জেগে উঠত। একটা ভয় সৃষ্টি হত। মন বলত, কিভাবে আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, অথচ তাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত কিতাব রয়েছে। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে। পরকালকে বিশ্বাস করে। ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান রাখে। কুরআন তাদের মনের এই সংশয় দূর করে দিয়ে বলেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা না যাবে, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, সে কোন পর্যায়ের অপরাধী ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে না।

মুজাহিদ ভাইয়েরা প্রায়ই আমার নিকট এসে জিজ্ঞেস করে, কমিউনিস্টদের সাথে যে সব মুসলমান সেনা আছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করব! তাদের শিবির থেকে আযানের আওয়াজ ভেসে আসতে শুনি, তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে দেখি। সুতরাং কিভাবে এসব শিবিরে আক্রমণ করব? যতক্ষণ পর্যন্ত একশ'ভাগ নিশ্চয়তার সাথে এ মাসআলাটির উত্তর জানা না যাবে যে, তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা ফরয, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে একটা দ্বিধা থেকেই যাবে। তাই আমি বলছি, যদি কমিউনিস্ট শিবিরের সবাই মুসলমান হয়, তবুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ। কারণ, তারা ইসলাম বিদ্রোহী। তারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছে। নির্বিচারে তাদের হত্যা করছে। মুসলিম নারীদের কৌমার্য ছিন্ন করছে। নামে মুসলমান হলেও এ ধরনের আক্রমণকারী মুরতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে ওয়াজিব। কতিপয়ের নিকট শুধু জায়েয।

এখন বলা যেতে পারে যে, তারা তো বাধ্য হয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে সেখানে আছে এবং যা করছে তা বাধ্য হয়েই করছে। তাহলে আমি বলব, তাদের কাজ কি? তাদের কাজ হল কুফরী শক্তির সহায়তা করা। রুশ বাহিনীর শিবির হেফাজত করা, মুজাহিদদের চলাচলের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, পথ ছিন্ন করা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই নির্দ্বিধায় যুদ্ধ করতে হবে। আমি এ বিষয়ে যুদ্ধের সপক্ষে নয়টি দলীল উপস্থাপন করেছি। আচ্ছা, যদি তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ না করি, তাহলে তাদের কারণে মুসলমানদের অমুসলিম শত্রুদের সাথে যুদ্ধ পরিহার করতে হবে। ফলে এই শত্রুরা, এই কমিউনিস্টরা নিরাপদে থেকে একের পর এক জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে। তাই ঐসব মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

এজন্য আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিপতিত মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যদিও তাতারীদের মধ্যে মুসলমান রয়েছে, তারা নামায আদায় করে, রোযা রাখে, তবুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। শুনে রাখ, যদি তোমরা আমাকেও তাতারীদের সাথে দেখ, আর আমার মাথায় তখন কুরআনও থাকে, তবুও তোমরা আমাকে হত্যা করবে। এভাবেই তিনি এ মাসআলাটি মুসলমানদের নিকট সাহসের সাথে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন।

আর যদি শত্রুরা মুসলমান নারী, শিশু ও বন্দীদের রণক্ষেত্রে ঢালরূপে ব্যবহার করে, তবুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এতে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহৃত মুসলমানদের ক্ষতি, এমনকি হত্যারও পরওয়া করা হবে না। এক্ষেত্রে মুসলমানরা নিহত হলে দিয়্যাত বা কাফফারা কিছুই ওয়াজিব হবে না।

তৃতীয় বিষয় ঃ যারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করে পশ্চাতে থেকে যায়, তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। তিরস্কার করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

(৩৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ○ (৩৯) إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

অর্থ : তোমাদের কি হল? তোমাদের যখন বলা হয় তোমরা আল্লাহর রাহে জিহাদে বেরিয়ে পড়, তখন তোমরা মাটি আঁকড়িয়ে ধর? তোমরা কি পরকালের জীবনের পরিবর্তে ইহকালের জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেছ? অথচ পরকালের তুলনায় ইহকালের জীবনোপকরণ তো একেবারেই তুচ্ছ। যদি তোমরা জিহাদে বেরিয়ে না পড়, তাহলে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করবেন আর অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (তাওবা : ৩৯-৪০)

চতুর্থ বিষয় ঃ মুনাফিকদের চরিত্র ও পাপাচারের আলোচনা। প্রায় অর্ধ সূরা পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

... و منهم من عاهد الله ...

অর্থ : ... আর তাদের কেউ আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ...।

منهم الذين يؤذون النبي...

অর্থ : তাদের মধ্যে এমন লোকেরা রয়েছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয়....।

و منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ...

অর্থ : তাদের কেউ কেউ বলে, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন আর আমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন না... ..।

বলা হয়েছে– و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا

অর্থ : আর যারা ক্ষতি ও কুফরীর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে।

এভাবে প্রায় অর্ধ সূরা পর্যন্ত মুনাফিকদের চরিত্রের ও কুমতির আলোচনা করা হয়েছে। তাই এ সূরার নাম বুহূস (আলোচনা) রাখা হয়েছে। কারণ, এ সূরা মুনাফিকদের কুমতি ও পাপাচারের আলোচনা সম্বলিত।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন–

ما زالت آية التوبة تنزل و تقول ومنهم و منهم حتى قلنا لا تدع أحدا

অর্থ : একের পর এক সূরা তাওবার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়ে 'তাদের কেউ' 'তাদের কেউ' বলে মুনাফিকদের অবস্থা ও চরিত্রের বর্ণনা তুলে ধরা হচ্ছিল। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, কাউকেই ছাড়বে না।

এভাবে ষড়যন্ত্র করা, মুসলিম সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা, জিহাদ থেকে মুসলমানদের নিরুৎসাহিত করা এগুলো ছিল সে যুগের মুনাফিকদের চরিত্র। এ যুগের মুনাফিকদেরও ঠিক একই চরিত্র।

জিহাদ সম্পর্কে অপপ্রচার করা, মুজাহিদদের দোষচর্চা ও কুৎসা রটানো। জিহাদের ব্যাপারে মুসলমানদের নিরুৎসাহিত করা। এগুলো মুনাফিকদের চরিত্র। যদিও এসব কথা অনেক সময় কোন মুখলিস মুসলমানকে বলতে শুনা যায়, সে ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। এ ধরনের লোকদের থেকে মুসলমানদের হুঁশিয়ার করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة

অর্থ : যদি তোমাদের সাথে তারা জিহাদে বের হত, তবে তোমাদের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করত না। আর তারা তোমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অশ্ব ছুটাত।

এদের ব্যাপারে ভয় থাকলেও তেমন বেশি ভয় নেই। বরং প্রকৃত ভয় ঐ মুসলমানদের নিয়ে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○

অর্থ : আর তোমাদের মাঝে তাদের গুপ্তচর রয়েছে। আর আল্লাহ যালিমদের ব্যাপারে খুব ভাল জানেন। (সূরা তাওবা : ৪৭)

ভয় হয় ঐ যুবকদের বিষয়ে, যারা জর্দান, মিশর বা সৌদী আরব থেকে জিহাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে আসে। পেশোয়ারে পৌঁছে তারা গ্রেফতার হয়ে থাকে। বিষাক্ত কথা বলে জিহাদের প্রতি তাদের আগ্রহ নষ্ট করে দেশে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অপপ্রচারে ফেঁসে গিয়ে তারা ফিরে গিয়ে বলে, জিহাদ শেষ হয়ে গেছে। এমন জঘন্য কাজ যারা করে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা 'যালিম' বলে অভিহিত করেছেন।

তাই ফিকাহ বিশারদ আলেমগণ একমত যে, মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক বা সেনা প্রধানের জন্য বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টিকারী ও নিরুৎসাহ প্রদানকারীদের সেনা বাহিনীর সাথে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রদান বৈধ হবে না। এ ধরনের লোকেরাই বলে বেড়ায়, আফগানিস্তান মুনাফিকে ছেয়ে গেছে, আর মুজাহিদরা মুশরিক হয়ে গেছে। সেখানে বিদ'আতের শেষ নেই। এ ধরনের লোকদের জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া বৈধ নয়। আর যদি তারা যেতেই চায়, তবে তাদের ব্যাপারে কুরআনের বিধান হল–

فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ○

অর্থ : আর যদি আল্লাহ আপনাকে তাদের কোন দলের নিকট ফিরিয়ে নেন, তারপর তারা আপনার কাছে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহলে আপনি বলে দিন, তোমরা কখনোই আমার সাথে বেরুবে না এবং আমার সাথে শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধ করবে না। (সূরা তাওবা : ৮৩)

সুতরাং তাদের জিহাদে যাওয়ার কোন অনুমতি নেই। তারপরও যদি তারা যায়, তবে ফিতনার ভয় থাকলে সেনাপ্রধান তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে না। আর সে গনীমত বা ফাই-এর মাল থেকে কিছুই পাবে না।

যারা মুজাহিদদের সম্পর্কে মিথ্যা ও ভূয়া সংবাদ ছড়ায় আর বলে, কাফিরদের বাহিনী প্রচণ্ড শক্তিশালী। রণক্ষেত্রে গেলে তোমরা নিঃশেষ হয়ে যাবে। মৃত্যু অবধারিত। তোমরা তো নিছক পাগল। সুপার পাওয়ারের অধিকারী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও? মাথায় কি ঘিলু আছে? এদেরকেই বলা হয় 'মুরজিফ'।

আর যারা জিহাদ থেকে মানুষকে নিরুৎসাহিত করতে থাকে এবং বলে, প্রচণ্ড গরম, ভীষণ শীত বা চারিদিকে বরফ। দিনরাত শুধুই তুষারপাত হচ্ছে। এরা হল 'মুখযিল'।

শরী'আতের বিধান হল, এই দু'শ্রেণীর মানুষকে জিহাদের ময়দানে যেতে না দেয়া।

পঞ্চম বিষয় ঃ মদীনার মুসলমানদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্তির আলোচনা। ১. মুনাফিক ২. কাফির ৩. দুর্বল মু'মিন ৪. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী মুসলিমগণ। এ প্রকারের মুসলিমগণ ফেরেস্তাদের চেয়ে উত্তম। এ মর্মে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস হল, সাধারণ মুসলিমগণ সাধারণ ফেরেস্তাদের চেয়ে উত্তম আর বিশিষ্ট মুসলিমগণ বিশিষ্ট ফেরেস্তাদের চেয়ে উত্তম। এই চার ধরনের লোক তখন মদীনায় বসবাস করত।

ষষ্ঠ বিষয় ঃ ইসলাম গ্রহণ ও রাসূলের হাতে বাই'আত গ্রহণের দাবী ও চাহিদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ○

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, হত্যা করবে এবং নিহত হবে। (সূরা তাওবা : ১১১)

এ ধরনের মুসলমানের প্রকৃতি হল, তারা কখনো রাসূলের সঙ্গ ত্যাগ করে না। রাসূল যা-ই বলেন, তা-ই নির্দ্বিধায় পালন করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُوا عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ۝

অর্থ : মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রাসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চাতে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। (সূরা তাওবা : ১২০)

কিন্তু এখন যে বিষয়টি জানা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হল মদীনার অধিবাসীরা কিভাবে এতো বিভক্ত হয়ে পড়ল, অথচ মক্কায় তো এমন ছিল না?

মদীনার পল্লীতে যারা বাস করত, তাদের মাঝে মুনাফিক ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُوْنَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۝

অর্থ : আর পল্লীবাসীদের মধ্য হতে আপনার আশে-পাশে কিছু মুনাফিক রয়েছে আর কিছু মদীনাবাসী কঠোর মুনাফেকীতে অনড়। (সূরা তাওবা : ১০১)

অন্যত্র বলেন–

اَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا ۝

অর্থ : পল্লীর বেদুইনরা কুফর ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর। (সূরা তাওবা : ৯৭)

মদীনার পল্লীর বেদুইনদের মাঝে ন্যায়নিষ্ঠ মুসলমানও ছিল। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ۝

অর্থ : বেদুইনদের কতক আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য এবং রাসূলের দু'আ লাভের উপায় হিসেবে গণ্য করে। (সূরা তাওবা : ৯৯)

সুতরাং মদীনায় মু'মিনদের সাথে মুনাফিকরাও বসবাস করত। মক্কায় তো মুনাফিক ছিল না। মদীনায় মুনাফিকদের বিকাশ কিভাবে হল? হ্যাঁ, স্বার্থ ও ফায়দা লুটে নেয়ার সন্ধানেই মানুষ মুনাফিক হয়। মক্কায় কোন বৈষয়িক স্বার্থ ছিল না। যারাই ইসলাম গ্রহণ করত, কালিমা তাইয়্যেবার সাক্ষ্য দিতে তাদের ভোগ করতে হত বিভিন্ন প্রকারের মর্মন্তুদ শাস্তি, নির্দয় নির্যাতন ও নিপীড়ন।

মক্কার কাফিরদের নির্যাতন ও নিপীড়নের হাত থেকে কোন মুসলিম রেহাই পাননি। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও রক্ষা পাননি। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে যেত; অথচ বেলাল (রাঃ)-এর বগলতলে রাখা অল্প কিছু যবের ছাতু ছাড়া তার নিকট খাবারের আর কিছুই থাকত না। দিনের পর দিন তিনি অনাহারে কাটিয়ে দিতেন।

বিলাল (রাঃ)-এর নির্যাতন-নিপীড়নের কথা একটু চিন্তা করে দেখুন। মরু আরবের বালি যখন রোদের উত্তাপে জ্বলে-পুড়ে আগুন হয়ে যেত, তখন তাকে সেই উত্তপ্ত বালিতে শুইয়ে দিয়ে তার বুকে বিরাট পাথর চাপা দেয়া হত। তাকে লাত ও ওযযার পূজায় ফিরে আসতে উৎসাহিত করা হত, আর শাস্তি দেয়া হত। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র 'আহাদ' 'আহাদ' বলতেন। তিনি বলতেন, 'আমি এক আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না'। এই প্রতিধ্বনিই শুধু তার মুখে উচ্চারিত হত। বেলাল (রাঃ)-এর এই কঠিন সময়ে এভাবে আহাদ আহাদ বলা, এতো জ্ঞান বা বুদ্ধির কথা নয়। এটা ছিল তার প্রাণের কথা। বুদ্ধির কথা তো ছিল, তিনি উমাইয়াকে ধোঁকা দিয়ে নির্যাতন থেকে বেঁচে যেতেন আর রাতের অন্ধকারে রাসূলের নিকট এসে বলতেন, আমি উমাইয়াকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে এসেছি। আমি মূর্তি পূজায় ফিরে যাইনি। আমি তাওহীদের সাক্ষ্য দিচ্ছি।

মনে রাখতে হবে, ইসলামের দাওয়াত কখনো প্রতারণা, কপটতা আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিজয় লাভ করে না। যালিমদের সামনে সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের হুকুম ব্যক্ত করার মাধ্যমেই দাওয়াতের বিজয় নিহিত।

আমি বলছিলাম, ইসলাম কখনো প্রতারণা, কপটতা আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিজয় লাভ করে না। যালিমদের সামনে সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম-আহকাম ব্যক্ত করা-ই ইসলামের দাবি। এক্ষেত্রে আমরা রাসূলের জীবনে দেখতে পাই, তিনি কাফিরদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন–

و الله، لو أوضعوا الشمس في يميني و القمر في شمالي على أن اترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.

অর্থ : আল্লাহর শপথ, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র তুলে দেয় এই শর্তে যে, আমি ইসলাম ধর্মের প্রচার ত্যাগ করব, তবুও আমি তা ত্যাগ করব না। যতক্ষণ না আল্লাহ ইসলামের বিজয় দান করেন অথবা ইসলাম ছাড়া সব মতাদর্শের পতন ঘটান।

এ ধরনের দৃঢ় মনোবল ও আদর্শের প্রশ্নে আপোষহীন হওয়াই আল্লাহর কাম্য। নিরাপদে-নিশ্চিন্তে বসে শুধু কিতাবাদি অধ্যয়ন-অধ্যাপনায়রত থাকলে ইসলামের বিজয় প্রহেলিকা হয়ে-ই থাকবে। ইসলামের দাওয়াত এ পর্যায়ে সীমিত থাকলে তার ফলাফল দাঁড়াবে বিরাট এক শূন্য। হ্যাঁ, দাওয়াতের কার্যকারিতা তখন অর্থবহ হয়, যথার্থতা লাভ করে, যখন দীনের দা'য়ীরা দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শরীরের খুন প্রবাহিত করে জীবন বিসর্জন দেয়, ক্ষতস্থান থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরিয়ে সজীব করে তোলে ইসলাম নামক বিশাল বৃক্ষটিকে।

এই আত্মোৎসর্গের মাধ্যমেই সাধারণ লোক দীনের প্রতি প্রভাবিত হয়। দার্শনিকসুলভ তাত্ত্বিক আলোচনা ও ওয়াজে তারা প্রভাবিত হয় না। এতে ইসলামের প্রতি তাদের মমত্ব সৃষ্টি হয় না। ত্যাগের নযরানাই তাদের প্রভাবিত করে। ত্যাগের ময়দানে এসে বুক টান করে দাঁড়াতে এবং এই নযরানাই তাদের আল্লাহর জন্য ভালোবাসাকে অমলিন করে তোলে।

সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ)-কে আদালতের কাঠগড়ায় মুসলিম নামধারী অনৈসলামী আদর্শের শাসক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'সে কাফের।' তখন তাকে তার কয়েকজন ছাত্র জিজ্ঞেস করল, বিচারালয়ে কেন আপনি এতো স্পষ্টভাবে একথা বলতে গেলেন! কথাগুলো একটু কৌশল করে বললে হয়ত বিচারের রায় আমাদের পক্ষে হত। তিনি বললেন, দু'টি কারণে আমি স্পষ্টভাবে বলতে বাধ্য হয়েছি–

১. বিষয়টা ছিল আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে কোন লুকোচুরি চলে না, কোন দ্ব্যর্থবোধক কথা চলে না। যদি আমি উত্তরে বলতাম, আলহামদুলিল্লাহ, লোকটি ভাল। অথবা, যদি বলতাম, শাসক হিসাবে লোকটি মন্দ নয়, একথা হত আমার ঈমান ও আদর্শের সঙ্গে প্রতারণা। ঈমান ও আদর্শের প্রশ্নে এ ধরনের লুকোচুরি ও দ্বিমুখিতা জায়েয নয়।

'খালকে কুরআন' অর্থাৎ কুরআন আল্লাহর মাখলুক কিনা এ মাসআলায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও অন্যান্যদের অবস্থানের মাঝে ব্যাপক ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। জনৈক আলেমকে [কেউ কেউ বলেন, তিনি হলেন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)] যখন শাসকের পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হল, কুরআনের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? কুরআন কি আল্লাহর মাখলুক? তিনি তখন হাতের চারটি আঙ্গুলি গুণে ইংগিতে বললেন, তাওরাত, ইঞ্জিল, জাবুর ও কুরআন এই চারটি আল্লাহর (সৃষ্টি)। এভাবে তিনি হাতের চারটি আঙ্গুল উঁচিয়ে কথার মাঝে লুকোচুরি খেললেন, দ্বিমুখী কথা বললেন।

অপরদিকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর দৃঢ় অবস্থা দেখুন। মারওয়াযী (রহঃ) বলেন, যখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-কে দোররা মারার জন্য নেয়া হল, তখন তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। বললাম, হে আহমদ! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

و لا تقتلوا أنفسكم

অর্থ : তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না।

এরা আপনাকে হত্যার পাঁয়তারা করছে। এদের ষড়যন্ত্র থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা করুন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তখন বললেন, হে মারওয়াযী! জেলখানার বাইরে যাও। দেখ কী হচ্ছে। তারপর আমার নিকট ফিরে এস। মারওয়াযী জেলখানা থেকে বেরিয়ে দেখেন, হাজার হাজার মানুষ খাতা-কলম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? তারা বলল, আমরা কুরআন সম্পর্কে আহমদ ইবনে হাম্বল-এর উত্তর শুনতে দাঁড়িয়ে আছি। মারওয়াযী ফিরে এসে ইমামকে জেলের বাইরের বিবরণ তুলে ধরলেন। তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বললেন, এই হাজার হাজার লোকদের ধোঁকা দেয়ার চেয়ে আমার নিকট মৃত্যুই শ্রেয়।

তাই সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ) বলতেন, আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে লুকোচুরি খেলা ও দ্বিমুখী কথার আশ্রয় নেয়া হারাম। উপরন্তু নেতৃস্থানীয়- যাদেরকে সাধারণ মানুষ অনুসরণ করে, তাদের জন্য সত্যকে কৌশলে আড়াল করাও অপরাধ। জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদি স্ব স্ব স্থানে প্রশংসিত- এ ধরনের কথা ইসলামী আন্দোলনের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পক্ষে বলা বৈধ নয়। হ্যাঁ, যদি সাধারণ কর্মী বা অনুসারী কেউ হয় আর তার অন্তর যদি–

إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان

"তবে যাকে বাধ্য করা হয় আর তার অন্তর ঈমানে প্রশান্ত।" এমন হয়, তবে তার জন্য কৌশলের আশ্রয়ে আত্মরক্ষার পথ গ্রহণ করা জায়েয। সাহাবী আম্মারের মত অনুসারী হলে তার জন্য উপরোক্ত পন্থা গ্রহণ করা জায়েয হবে। কিন্তু রাসূল? তাঁর জন্য সত্যকে কৌশলের আশ্রয়ে আড়াল করা কখনো জায়েয নয়।

সাইয়্যেদ কুতুবকে তাঁর সাথিরা অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন, কৌশলের আশ্রয় নিয়ে যদি আপনি জীবনটা রক্ষা করতেন! শাসকদের বিরুদ্ধে সরাসরি কথা না বলে একটু রাখঢাক করে বলতেন! তখন তিনি বলেছিলেন, যে শাহাদাত আঙ্গুল নামাযে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করে, সে আঙ্গুল খোদাদ্রোহী শাসকের স্বপক্ষে একটি শব্দও লিখতে অস্বীকৃতি জানায়। সেই লোক-সেই আমি কীভাবে তাদের অনুগ্রহ লাভের ইচ্ছা করতে পারি? যদি আমি আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত হয়ে থাকি, তবে আল্লাহর ফয়সালায় আমি সন্তুষ্ট। আমি কোন খোদাদ্রোহী শাসকের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ কামনা করি না।

এ ধরনের তির্যক ভাষণ, এ ধরনের আপোষহীন কার্যকলাপই সাধারণ জনতার মাঝে দারুণ প্রভাব সৃষ্টি করে, যুবকদের উদ্দীপিত করে। আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম তার অনুসরণ করে চলে।

আর তুমি যার মাথা-পা চিন না, পেট-পিঠ জান না, যে বারংবার রং বদলায়, সে কিসের দিকে আহবান করছে, তাও স্পষ্ট নয়, কীভাবে তুমি তার অনুসরণ করবে? প্রত্যেক দিন তাকে একেক রঙে দেখতে পাও। আজ তাকে অমুক শাসকের সাথে দেখ, কাল তাকে অমুক মন্ত্রীর সাথে দেখ। পরশু তাকে আরেক নেতার সাথে দেখ। মেনে নিলাম সে বিদ্বান, বুদ্ধিজীবী ও বিপুল জ্ঞানের অধিকারী। কিতাবের টিকা-টিপ্পনী, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সবকিছু তার নখ-দর্পণে- তবুও কি তাকে অনুসরণ করা যাবে? নিশ্চয় নয়।

বাস্তব ঘটনা যখন আমি শুনি, তখন শিউরে উঠি। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো এক যুবক। তাকে ভয় দেখানোর জন্য সামরিক, প্রশাসনিক কোন লোক নেই। কোন গোপন ষড়যন্ত্রেরও বিষয় নয়। তার সামনে ইসলাম। ইসলামের রক্ষা ও সুপ্রতিষ্ঠা তার স্বপ্ন। ইসলামকে মিশরভূমি থেকে উৎখাত করা হচ্ছে। তার সামনে আহমদ ইবনে হাম্বলের সংকট, তার সামনে ইজ্জ ইবনে সালামের মত বিপদ, তার সামনে হাসানুল বান্না ও সাইয়্যেদ কুতুবের মত উদ্যত খড়গ। এমন কঠিন পরিস্থিতির শিকার হওয়া ব্যক্তির কথায়, তার বক্তব্যে যে প্রতিক্রিয়া হবে, তা জামেয়া আজহারের কোন শাইখের কথায় হবে কি!

মিসরে যারা নিজেদেরকে 'জামা'আতুল মুসলিমীন' বলে দাবি করে, তাদের কথাই ভেবে দেখুন। মাত্র এক বৎসরে তারা মিসরের অসংখ্য যুবককে সংঘটিত করতে সক্ষম হয়েছে। কিসের কারণে? দুঃসাহসিকতা ও স্পষ্টবাদিতার কারণে। তাদের নেতা শাকরী মুস্তফা- যদিও তার মতাদর্শ ও চিন্তার সাথে আমাদের মতানৈক্য রয়েছে, এমনকি তার কোন কোন কার্যকলাপ বিতর্কিতও বটে। তবুও বলতে হয়, সে এক বিস্ময়কর ব্যক্তি। যুবকদের সে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে। যে কোন যুবক তার সাথে আলাপচারিতার পর অবশ্যই তার অনুসারী হয়ে যাবে।

গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা শাকরী মুস্তফার অনুসারী যুবকদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করত, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? বর্তমান শাসক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? উত্তরে যুবকরা বলত, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কেন আমাকে জিজ্ঞেস করছ? তা তো কুফরী। আসলে তোমরা আমাদেরকে আনোয়ার সাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছ। এর উত্তর তো একেবারে সহজ। আনোয়ার সাদাত কাফের। তার কাজে যারা সহযোগিতা করে তারাও কাফের। যারা তাকে অনুসরণ করে তারাও কাফের। যারা তাকে ভালবাসে তারাও কাফের। আর যে তাকে কাফের মনে করে না, সেও কাফের। প্রথম উত্তরেই সে গোয়েন্দাকে সবকিছু শুনিয়ে দিত। এ ধরনের সোজা উত্তরে অনেকেই বিপদে পড়েছে। নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়েছে। তবুও যুবকরা শাকরী মুস্তাফার পিছু ছাড়েনি, কেউ তাকে ভর্ৎসনা করেনি।

আল্লাহ তা'আলা শাইখ মারওয়ান হাদীদকে রহম করুন। তিনি শীর্ষ সম্মেলনের সময় মিসরে ছিলেন। তিনি শীর্ষ সম্মেলনে নেতাদের নিকট খোলা চিঠি লিখলেন–

'তোমাদের উপর ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করা ওয়াজিব। তোমরা এই ওয়াজিব পালন না করে বিভিন্নভাবে ইসলামের বিরোধীতা করছ। তিনি তাদের নিকট ইসলামের বিরোধিতার ফিরিস্তি তুলে ধরেন। এটা এটা করছ।' যারা এসব অপকর্মের শিখন্ডি, তাদের নাম ঠিকানা লিখে দেন। আব্দুন নাসেরসহ সম্মেলনে উপস্থিত অন্যান্য সকলের নিকট চিঠি পৌঁছিয়ে দিলেন।

পত্র পেয়ে আব্দুন নাসের চমকে উঠল। গোয়েন্দাদের বলল, এই লোকটি সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট দাও। এরপর থেকে কোন না কোন গোয়েন্দা তাঁর পিছু লেগে থাকত। তিনি কোথাও বের হলে গোয়েন্দা তাঁর সাথে সাথে যেত। মিসরে বাসে খুব ভীড় হয়। প্রায় সকল বাসের দরজায় বাদুর ঝোলা দিয়ে থাকে সাত-আটজন। এত ভিড় ঠেলে বাসে উঠা দারুণ কষ্টের ব্যাপার। কিন্তু শাইখ মারওয়ান হাদীদের নিস্তার ছিল না। ভিড় ঠেলে তাঁর সাথে গোয়েন্দারাও বাসে উঠত, কখনো তাকে গোয়েন্দারাই হাত ধরে টেনে বাসে তুলত। তিনি গোয়েন্দাদের চিনে ফেলতেন। তখন তিনি বাসের হেলপার ও কন্ট্রাক্টরকে বলতেন, 'এই নাও আমার ভাড়া আর ঐ গোয়েন্দা বেটার ভাড়া'। শাইখ মারওয়ানের কথা শুনে গোয়েন্দার চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যেত। দারুণ লজ্জা পেত। শাইখ তখন বলতেন, ভাই! আমি তোমার ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি। এতে তোমার লজ্জিত হবার কি আছে?

শাইখ মারওয়ান হাদীদ চলে যেতে ইচ্ছে করলেন। গোয়েন্দারা তাঁর পিছু লেগেই আছে। তিনি শুক্রবার দিন চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। ভাবলেন, ভিসা নিবেন। কিন্তু তা নিলেন না। মসজিদে গেলেন। সেখানেও টিকটিকিরা পিছু ছাড়ছে না। আরেকজন তার ফ্ল্যাটের দরজায় সকাল থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত বসে রইল। মসজিদে প্রবেশ করে নামাযে দাঁড়ালেন। এদিকে গোয়েন্দা যখন মসজিদে প্রবেশ করে তাঁকে নামায পড়তে দেখল তখন সেও নামাযে দাঁড়াল। তিনি তখন সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে দ্রুত মসজিদ থেকে বেরিয়েই গাড়ি নিলেন। এভাবে তিনি গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিয়ে সিরিয়ায় চলে এলেন।

এদিকে তখন দামেস্ক রেডিওর তথাকথিত প্রগতিবাদ ও নবজাগরণের গানে সারাদেশ মুখরিত। সকলের মুখে মুখে একই সুর শুনা যাচ্ছিল–

امنت بالبعث ربالا شريك له و بالعروبة دينا ما له ثاني

"পুনর্জাগরণকে আমি আমার রব হিসাবে মেনে নিলাম। তার কোন অংশীদার নেই। আর আরব জাতীয়তাবাদকে আমি ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছি। তার কোন বিকল্প নেই।"

পাশ্চাত্য প্ররোচনায় প্রলুব্ধ প্রগতিবাদী ও নুসাইরী সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত। বিভিন্ন কৌশলে তারা ইসলামের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে হামায় একটি ঘটনা ঘটল। এক শিক্ষক ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলে এক যুবক তার প্রতিবাদ জানায়। এক পর্যায়ে উত্তেজিত যুবক ইসলাম বিদ্বেষী শিক্ষককে মারতে এগিয়ে যায়। তার দেখাদেখি অন্য ছাত্ররা মিলে একযোগে শিক্ষকের উপর আক্রমণ চালায়। লোকটি ক্লাশরুমেই মারা যায়। পুলিশ এসে যুবককে হত্যা করে ফেলল। তখন শাইখ মারওয়ান আদালতে বিচার প্রার্থনা করলেন। কিসাসের বিধান প্রয়োগের দাবি জানালেন। সরকারি লোকেরা বলল, একে তো হত্যার বদলে হত্যা করা হয়েছে। এটাই তো বিধান। শাইখ বললেন, না, একথা ঠিক নয়। কারণ, যুবক মুসলমান আর শিক্ষক কাফের। কাফের হত্যার বদলায় মুসলমানকে হত্যা করা যায় না। শাসক মহল তাঁর দাবি প্রত্যাখ্যান করল। তিনি বললেন, বেশ তাহলে দেখাচ্ছি। তাঁর বাড়ির সামনেই এক মসজিদ। সেখানে সবসময় তাঁর কিছু অনুসারী থাকত। তিনি তাঁর আরও বহু অনুসারীকে সেখানে সমবেত করালেন। তাঁরা মসজিদে সুলতানে একত্রিত হলেন। প্রত্যেকের সাথে গ্রেনেড, পিস্তল ও অন্যান্য অস্ত্র। তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে লাগল। জিহাদ ঘোষণা করল। অবস্থা টালমাটাল। ইতোমধ্যে মসজিদে সুলতানের চারদিকে বহু ট্যাঙ্ক এসে উপস্থিত। তারা মসজিদের উপর ভারী গোলাবর্ষণ শুরু করল। মুজাহিদ যুবকদের উপর মসজিদ ভেঙ্গে পড়ল।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, হামার দীনদার অধিবাসীরা আমাকে বলেছে, ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর আমরা নিহত ওই যুবকদের উপর থেকে ধ্বংসস্তূপ তুলে ফেলছিলাম। তখন আমরা তার ভিতর থেকে তসবীহ ও তাকবীরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কী মহিমা! শাইখ মারওয়ান এই ধ্বংসস্তূপের মাঝেই বেঁচে রইলেন। তাকে গ্রেফতার করে আদালতে উপস্থিত করা হল। আদালত ছিল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। যেন তথাকথিত পুনর্জাগরণ ও সংস্কারবাদীরা একথা বলে বেড়াতে পারে, তারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করছে। বিচার চলাকালে বিদেশী সাংবাদিকদেরও উপস্থিত থাকার অনুমতি ছিল। বিচারক ছিল মুস্তাফা তল্লাস ও সলাহ জাদীদ। মুস্তাফা তল্লাস (নব্বই-এর দশকে) এখন সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর সলাহ জাদীদ হল নুসাইরী সম্প্রদায়ের এক শক্তিধর ব্যক্তি। সলাহ তাকে বলল, কেন তোমরা অস্ত্রধারণ করেছ এবং কেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ? শাইখ মারওয়ান বললেন, একজন নুসাইরী কুকুর আছে। তার নাম সলাহ জাদীদ। সলাহ জাদীদের মুখের উপর তিনি এ কথা বললেন। তারপর বললেন, সুন্নী দাবিদার আরেক কুকুর আছে, তার নাম মুস্তফা তল্লাস। তারা এই দেশে ইসলামকে যবাহ করতে চাচ্ছে। আমরা তার প্রতিবাদ করছি। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি। আদালত প্রাঙ্গণেই প্রগতিবাদীরা তাঁকে হত্যা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু পুলিশ তাদেরকে বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে হেফাজত করল। যেন বিশ্বে একথা প্রচার না হয় যে, প্রকাশ্য আদালতে উত্তেজিত গুন্ডারা তাঁকে হত্যা করেছে। বিচারক বলল, তুমি কি কারো কর্মচারী?

শাইখ বললেন, হ্যাঁ, আমি আল্লাহ তা'আলার কর্মচারী আর মানুষের কর্মচারী হল তোমাদের দল-প্রধান মিসিন গাফলাক। সে আব্দুন নাসের থেকে উনআশি হাজার জুনাইহা (মুদ্রা) গ্রহণ করেছে।

তারা বলল, তোমরা বল মুহাম্মদ হামেদ তোমাদের সাথে রয়েছে। অথচ, তিনি তো তোমাদের অপছন্দ করেন। তিনি বললেন,

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

অর্থ : যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তাদেরকে বল, আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমি তাঁর উপরই ভরসা করছি। আর তিনি মহান আরশের অধিপতি। (তাওবা : ১২৯)

বিচার বিভাগে ইসলাম বিরোধীদের প্রচণ্ড শক্তি ছিল। তাই কয়েকজন যুবকের সাথে তাঁর ফাঁসির হুকুম হল। আর কিছু যুবক নির্দোষ প্রমাণিত হল। যারা মুক্তি পেল তারা কাঁদতে লাগল। আর যাদের ফাঁসির হুকুম হল তারা হাসতে লাগল। বিদেশী সাংবাদিকরা বিস্ময়ে বিমূঢ়। এ কী কাণ্ড! যারা মুক্তি পেল তারা কাঁদছে আর যাদের ফাঁসির হুকুম দেয়া হয়েছে, তারা হাসছে! যাদের ফাঁসির রায় হয়েছে, তারা বলল, আমাদের জান্নাত দেয়া হয়েছে। বাকিরা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাদের জেলে নেয়া হল। জেলে তারা ফাঁসির হুকুম কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। শাইখ মারওয়ান আমাকে বলেছেন– ঐ দিনগুলোর চেয়ে আমোদ ও আরামদায়ক সময় আমি জীবনে কখনো কাটাইনি, যে দিনগুলোতে আমি এবং আমার সঙ্গী যুবকরা ফাঁসির রশিতে ঝোলার অপেক্ষায় ছিলাম।

আমার মনে হয়, সে সময়ে শাইখ এই পংক্তিটি লিখেছিলেন, যা এখনো তার অনুসারী যুবকদের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে–

الروح ستشرق من غدها و ستلقى الله بموعدها

"আগামীকাল হৃদয় নূরে আলোকময় হয়ে উঠবে আর রূহ তার নির্ধারিত সময়ে আল্লাহর সাথে গিয়ে সাক্ষাত করবে।"

আমার সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও মাননীয় ব্যক্তি শাইখ মুহাম্মদ হামেদ প্রেসিডেন্ট আমীন হাফেজের সাথে সাক্ষাত করলেন। বললেন, মারওয়ান হাদীদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী হয়েছে? প্রেসিডেন্ট বলল, তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। শাইখ মুহাম্মদ হামেদ বললেন, আপনি কি সজ্ঞানে একথা বলছেন? আপনি কি ধারণা করেন, হামার অধিবাসীরা নীরবে বসে থাকবে, যখন আপনারা শাইখ মারওয়ান হাদীদকে ফাঁসি দিবেন? এমন ঘটনা ঘটলে আপনারা এমন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবেন, যা থেকে উত্তরণের কোন পথ আপনাদের সামনে খোলা থাকবে না।

প্রেসিডেন্ট বললেন, তাহলে এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?

শাইখ মুহাম্মদ বললেন, আমার মত হল, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হোক।

প্রেসিডেন্ট বললেন, যান, আপনি নিজে গিয়ে জেলখানা থেকে তাদের বের করে আনুন।

শাইখ মারওয়ান হাদীদ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন : শাইখ মুহাম্মদ হামেদ আমাদের সেলে এলেন। বললেন, 'হে আমার সন্তানরা! আমার সাথে এসো। তিনি তাদের উস্তাদ ছিলেন আর তারা তাঁকে ভালবাসত। তারা তাঁকে বলল, কোথায় যাব? তিনি বললেন, রাষ্ট্র তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছে। শাইখ মারওয়ান বলেন, আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। আপনি আমাদের জান্নাত থেকে বঞ্চিত করলেন।

তৃতীয় মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٣) وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖٓ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ○ (٤) إِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوْٓا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○ (٥) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

অর্থ ঃ (৩) আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে নাও যে, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদের মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। (৪) তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর তারা তোমাদের ব্যাপারে ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সাথে কৃতচুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (৫) তারপর নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হলে তোমরা মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও সেখানেই। তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। তারপর যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

তৃতীয় আয়াতে " يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ (মহান হজ্জের দিন)" দ্বারা কোন দিন বুঝানো হয়েছে, এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে দু'টি মতই বেশি শক্তিশালী। প্রথম মত হল, সে দিনটি আরাফার দিন। এর স্বপক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং তাউস ও মুজাহিদ (রহঃ)। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এরও এই মত। ইমাম শাফে'য়ী (রহঃ)ও একথা বলেছেন। আর হযরত আলী, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত ইবনে আবী আউফা, হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বলেন, তা ইয়াওমে নাহর অর্থাৎ দশ তারিখ ঈদের দিন। ইমাম ত্বাবারীও এ-মত পোষণ করেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হজ্জ আদায়কালে ইয়াওমে নাহর-এ অর্থাৎ দশ তারিখে ঈদের দিনে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ কোন দিন? উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, আজ ইয়াওমুন নাহর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ মহান হজ্জের দিন। আজ থেকে কোন বিবস্ত্র ব্যক্তি বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতে পারবে না। সুতরাং মহান হজ্জের দিবস হল ইয়াওমুন নাহর। অর্থাৎ ১০ তারিখে কুরবানীর দিন হল হজ্জের দিন।

একটু চিন্তা-ফিকির ও তত্ত্ব তালাশ করলে বুঝে আসে যে, মহান হজ্জের দিন দ্বারা ইয়াওমুন নাহরকেই বুঝানো হয়েছে। এটাই শক্তিশালী মত। কারণ, হজ্জের অধিকাংশ কাজই ইয়াওমুন নাহরে সংঘটিত হয়।

আরাফায় অবস্থান হয় ইয়াওমুন নাহরের রাতে। বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কুরবানীর রাতে আরাফায় অবস্থান করল, সে হজ্জের রোকন আদায় করল। সেদিন মুযদালিফায় অবস্থান করা হয়, জামরায়ে আক্বাবায় রমী করা হয়, কুরবানী করা হয়, হলক্ব করা হয়। এ কারণেই এই দিনকে বড় হজ্জের দিন– মহান হজ্জের দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

أن الله برئ من المشركين و رسوله

এখানে الواو বর্ণটি استئناف অর্থাৎ নতুন পূর্ণাঙ্গ বাক্য বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ হিসাবে পূর্ণ বাক্য হল ورسوله برئ من المشركين অবশ্য এখানে একটি অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ কিরাত আছে। তা হল ورسوله লামে যের দিয়ে। এ অবস্থায় একটি শব্দ উহ্য মানতে হবে। এ হিসাবে বাক্যটি হবে–

أن الله برئ من المشركين و حق رسوله

তখন অর্থ হবে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং রাসূলের হকও। তবে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণীয় কেরাআত হল- লামে পেশ দিয়ে পড়া।

এখানে একটি ঘটনা আছে। একদা প্রসিদ্ধ তাবেঈ আবুল আসওয়াদ দুয়ালী (রহঃ) কুরআন পাঠরত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে কুরআন তিলাওয়াত করছিল–

و أن الله برئ من المشركين و رسوله

সে রাসূল শব্দের লামে জের দিয়ে তেলাওয়াত করল। এই অবস্থায় বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের এবং তার রাসূল থেকে দায়িত্বমুক্ত। এ ধরনের কেরাআত শুনে আবুল আসওয়াদ দুয়ালী (রহঃ) খুব ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহ কখনো তাঁর রাসূল থেকে দায়িত্বমুক্ত হতে পারেন না। তারপর তিনি সোজা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নিকট গিয়ে বিষয়টি তুলে ধরেন। তখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুরআনে হরকত লাগানোর নির্দেশ দিলেন। এটা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের এক মহান অবদান। তবে হাজ্জাজের ব্যাপারে আলেমগণের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কেউ তাকে কাফের বলেছেন। আবার কেউ তাকে ফাসেক মুসলমান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

জনৈক ব্যক্তি ইমাম শা'বী (রহঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে ইমাম! আমি আমার স্ত্রীকে এই বলে তালাক দিয়েছি যে, যদি হাজ্জাজ জাহান্নামী না হয়, তাহলে তুমি তালাক। এখন কি আমার স্ত্রী তালাক হবে। তখন ইমাম শা'বী (রহঃ) বললেন, ভাই! যাও, গিয়ে স্ত্রীকে উপভোগ কর। এতে তোমার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে না। যদি হাজ্জাজ জান্নাতে যায়, তাহলে জাহান্নামে কেউ যাবে না। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মনে করতেন, হাজ্জাজ কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

কতিপয় আলেম তাকে ফাসেক বা পাপাচারী মুসলমান হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বর্ণিত আছে, একদা উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) মিম্বরে বসে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। নিজে খুব কাঁদলেন, মানুষকেও কাঁদালেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি তার দাড়ি ভিজিয়ে ফেললেন। অবশেষে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে বললেন, হে লোক সকল! বেহুঁশ হওয়ার পর আমি দেখলাম, কেয়ামত হয়ে গেছে। মীযান স্থাপন করা হয়েছে। পুলসিরাতও স্থাপন করা হয়েছে। একজন দীর্ঘ শীর্ণকায় ব্যক্তিকে আনা হল, সহজেই তার হিসাব নেয়া হল। তারপর সে ডানপন্থীদের (জান্নাতী) সাথে গিয়ে মিলিত হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোক কে? বলা হল, ইনি আবূ বকর। তারপর একজন দীর্ঘ দেহের অধিকারী ব্যক্তিকে আনা হল। সহজেই তার হিসাব নেয়া হল। তারপর সে ডানপন্থীদের (জান্নাতী) সাথে গিয়ে মিলিত হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? বলা হল, ইনি উমর। তারপর তৃতীয় আরেক ব্যক্তিকে আনা হল। সহজে হিসাব নেয়া হল এবং ডানপন্থীদের (জান্নাতী) সাথে মিলিত হল। তিনি তার নাম উল্লেখ করেননি। তবে উপস্থিত লোকদের ধারণা তিনি স্বয়ং উমর ইবনে আব্দুল

আযীয (রহঃ)। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। তার জন্য একটি তাঁবু স্থাপন করা হল। তারপর আলী (রাঃ) ও মুআবিয়া (রাঃ) এতে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর আলী (রাঃ) হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন। তিনি বলছিলেন, 'আমার পক্ষেই ফয়সালা হয়েছে' এরপর মুআবিয়া (রাঃ) হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন। 'তিনি বলছিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।'

তিনি বলেছেন– তারপর আমি একটি দুর্গন্ধময় শরীরে পঁচন ধরা মানুষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি অতিষ্ঠ হয়ে বললাম, ছি, ছি, তুমি কে? বলল, 'আমি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ।' আমি বললাম, 'আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? বলল, 'আমি যাদের হত্যা করেছি, তাদের প্রত্যেকের বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে জাহান্নামে একবার হত্যা করেছেন। আর সাঈদ ইবনে যুবাইর এর বদলে আমাকে সত্তরবার হত্যা করা হয়েছে।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

و أن الله برئ من المشركين و رسوله

এ আয়াতের মাধ্যমে মুসলমান ও কাফেরদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আর তার জন্য চার মাসের সময় দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দায়িত্বমুক্ত হলে সকল মু'মিন মুসলমানও দায়িত্ব মুক্ত হবেন।

তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

أن برئ ممن سكن مع المشركين و مات بينهم

"আমি এমন ব্যক্তি থেকে দায়িত্বমুক্ত, যে মুশরিকদের সাথে মিলেমিশে রয়েছে এবং তাদের মাঝেই মৃত্যুবরণ করেছে। এর কারণ, মুশরিকদের সাথে থাকতে থাকতে কমপক্ষে অন্যায় কাজে বাঁধা প্রদানের আগ্রহ দূর হয়ে যাবে এবং এতেই সে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। নিজের অজান্তেই তার আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধ তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। মুশরিক-অমুসলমানদের সাথে থাকার ফলে সে যুবতী-মহিলাদের সাথে অবাধে মেলামেশা করবে। এতে তার চরিত্র কলুষিত হবে। তখন আর পাপ দেখে তার চোখ রক্তিম আকার ধারণ করবে না।"

সবচেয়ে মারাত্মক ও ভয়াবহ হবে তোমার ঐ ছেলে-মেয়েদের অবস্থা, যারা আমেরিকা, ইটালি বা সোভিয়েত ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করে সেখানেই বসবাস করছে। একবারও কি চিন্তা করে দেখেছ, সেই মুসলমান মেয়ের কথা, সহশিক্ষা ছাড়া যার শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই? সেখানে কোন মাদরাসা নেই, কোন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। এমন পরিস্থিতিতে তোমার মেয়ে আমেরিকার যুবকদের সাথে লেখাপড়া করবে, আমেরিকান কাফেরকে ভালবাসবে, তারপর তাকে বিয়ে করবে। অথচ তুমি তার কোন প্রতিবাদ করতে পারবে না। কারণ, তাহলে আমেরিকার আইন তোমাকে জিন্দানখানায় নিক্ষেপ করবে। তুমি কি তোমার মেয়ের উপর হাত তুলতে পারবে, যখন সে কোন আমেরিকান ছেলের হাত ধরে কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে যাবে? তোমার মেয়ে যদি কোন ইটালিয়ান ছেলেকে বয়ফ্রেন্ড হিসেবে বেছে নেয়, তুমি কি তাকে বাঁধা দিতে পারবে? তুমি দেখবে, তোমার নাকের ডগা দিয়ে তারা সমুদ্রের তীরে বেড়াতে যাচ্ছে। কিংবা রৌদ্রস্নান করতে যাচ্ছে। এ ধরনের অনৈতিক ঘটনা ঘটতে থাকবে, অথচ তুমি এর প্রতিবাদও করতে পারবে না। এই হল কাফেরদের সাথে বসবাস করার কুফল।

একবার আমেরিকার এক মুসলিম যুবক আমার নিকট এসে বলল, শাইখ ইউসুফ কারযাবী প্রথম যখন আমেরিকায় আসেন, তখন শিকাগোতে কোন মসজিদ ছিল না। তার আগমনে মুসলমানরা মসজিদ নির্মাণে উৎসাহিত হয়। তারা মসজিদ নির্মাণের জন্য ষাট হাজার ডলার জমা করল। ইঞ্জিনিয়ার যখন মসজিদের প্ল্যান

তৈরি করতে এল, তখন ধনী মুসলমানরা, বিশেষত : যারা মসজিদ নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে, তারা বলল, মসজিদের নীচে অবশ্যই নাচের জন্য হলরুম রাখতে হবে। আমেরিকায় নবাগত যুবক মুসলমানরা তাদের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বলল, অসম্ভব। মসজিদে আবার কিভাবে নাচের হলরুম হতে পারে? তারা বলল, মসজিদের নীচে অবশ্যই নাচের হলরুম হতে হবে। এতে আমাদের মেয়েরা আরব ছেলেদের সাথে নাচবে। তারা একে অপরকে ভালবাসবে। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে। আমেরিকান ছেলেদের বিয়ে করা থেকে তারা বেঁচে যাবে। নবাগত যুবক মুসলমানরা তাদের বুঝাল, এটা তো ইসলামে বৈধ নয়।

এ হল নবাগতদের অবস্থা। আর স্থায়ী বসবাসকারী সম্পদশালী মুসলমানদের অবস্থা যে কত শোচনীয়, তা লিখে বুঝানো যাবে না। তাদের ঈমান নিভু নিভু। আমেরিকার বিষাক্ত পরিবেশে তাদের ঈমান-আক্বীদা, আদব-আখলাক সব শেষ হয়ে গেছে। এ পরিবেশে লোহার মত শক্ত ঈমানও গলে যায়। এ পরিবেশে ঈমান আমল সহীহ্ রাখার কোন উপায় নেই।

যুবক মুসলমানরা যখন বলল, এটা বৈধ নয়, তখন বর্ষিয়ানরা বলল, আমরা আমাদের দেয়া অর্থের বিনিময়ে উপকৃত হতে চাই। যুবকরা তাদের কথায় অটল, আর বর্ষিয়ানরাও তাদের সিদ্ধান্তে অনড়। অবশেষে বর্ষিয়ানরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের দেয়া অর্থ ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

ইতোমধ্যে আল্লাহর অনুগ্রহে এক কুয়েতি এসে মসজিদ নির্মাণের জন্য তিন লাখ ডলার দিলেন । শিকাগো শহরে তখন কিছু ফিলিস্তিনী মহিলা বাস করত। তাদের মাঝে তখনও ইসলাম ও ঈমানের আলো বিদ্যমান ছিল। তারা মসজিদ বানানোর জন্য জায়গা দান করল। সেই ফিলিস্তিনী মহিলাদের জায়গার উপর মসজিদ নির্মিত হল। ধীরে ধীরে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। যুবক মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল। আমি শিকাগোর সেই মসজিদে কয়েকবার গিয়েছি। তারা সেই মসজিদের নাম রেখেছে– Mosque Foundation (মসজিদ ফাউন্ডেশন)। মুসলিম যুবকরা তার পরিচালনার দায়িত্ব নিল। একের পর এক নির্বাচনে কয়েকজন যুবক তার দায়িত্ব পালন করল। অবশেষে এক ডাক্তার যুবক নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তার পরিচালনার দায়িত্ব নিল। তার সময়ে মসজিদে মহিলাদের নামায পড়ার ব্যবস্থা রইল না। তখন মহিলারা ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, এই মসজিদ আমাদের। আমরা অবশ্যই মসজিদে আসব। পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে বলা হল, আপনাদের দাবি কী? আপনারা কী চান? তারা বলল, আমরা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য হতে চাই। আমরা মসজিদের মিটিংয়ে শরীক হব। আমরা আমাদের মতামত তুলে ধরব। ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিশেষে অবস্থা কঠিন আকার ধারণ করল।

শেষে মহিলারা কোর্টে গিয়ে মামলা করল। তারা দাবি করল, এই মসজিদ আমাদের। পুরুষরা আমাদের থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সেই মসজিদের জনৈক দায়িত্বশীল ব্যক্তি আমাকে বলেছে, আমেরিকান বিচারপতি খুব ভাল লোক ছিলেন। তিনি কল্যাণময় কাজকে খুব ভালবাসতেন। ভাল কিছু দেখলে দারুণ আনন্দিত ও বিমোহিত হতেন। তিনি বিষয়টি বুঝলেন এবং লোক পাঠিয়ে আমাদের সংবাদ দিলেন যে, রাষ্ট্রীয় আইন কিন্তু মহিলাদের পক্ষে, যদিও আমার অন্তর আপনাদের পক্ষে। আমি রাষ্ট্রীয় আইনের বিপরীতে রায় দিতে পারব না। সুতরাং মহিলাদের সাথে আপনারা আপোস করে ফেলুন। আলোচনার মাধ্যমে মিটমাট করে ফেলুন। অন্যথায় মসজিদ মহিলাদের হাতে চলে যাবে।

এ হল আমেরিকার অবস্থা। Mosque Foundation (মসজিদ ফাউন্ডেশন)-এর সেই দায়িত্বশীল ব্যক্তি আমার নিকট এক পত্রে লিখেছেন, আমার জন্য দু'আ করবেন। আল্লাহ যেন আমাকে আমেরিকা থেকে মুক্তি দান করেন। ইসলাম নিয়ে কোন মুসলমান আমেরিকায় থাকতে পারে না। ঐ তো শাইখ আবূ উমর। তাকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি সাক্ষী আছেন, কোন মুসলমান ইসলাম নিয়ে আমেরিকায় থাকতে পারেন কি না। নিউইয়র্কের পার্শ্বে অবস্থিত নিউ জার্সি শহরেরও ঐ একই অবস্থা। শাইখ আবূ উমরের সাথে সেখানে আমার

সাক্ষাত হয়েছিল। সেখানে কয়েকটি মুসলিম পরিবার বসবাস করে। আমি তাদের পেয়ে দারুণ আনন্দিত হয়েছিলাম। তারা একটি গির্জা কিনে তা মসজিদে রূপান্তরিত করেছিল। কিন্তু তারপরও পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ইসলামী জীবন-যাপন যে কত কঠিন, তা চিন্তা করাও অসম্ভব। সেখানে সমাজ জীবনের সকল নিয়ম-শৃংখলা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। মানবতাবোধ ও চরিত্র বলতে কিছুই সেখানে অবশিষ্ট নেই। সাধারণ মানুষের কথা আর কি বলব। পাদ্রীদের অবস্থা বেশি খারাপ। পাদ্রীদের দায়িত্ব সমাজ সংস্কার করা আর তারাই যতসব কুকর্মে লিপ্ত।

আমেরিকা থেকে আগত এক মুসলিম যুবক আমাকে বলেছে, একদা এয়ারপোর্টে একদল পাদ্রী দাঁড়িয়ে ছিল এবং তাবলীগ জামাতের একদল মুসলমানও তাদের অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা দেখল, সাদা পোশাকপরা একদল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটুর নীচ পর্যন্ত তাদের সাদা ধবধবে জুব্বা ঝুলে আছে। তাবলীগ জামাতের আরব মুসলমানরা এগিয়ে গিয়ে পাদ্রীদের সাথে সাক্ষাত করল। পাদ্রীরাও এগিয়ে এসে আরব মুসলমানদের সাথে সাক্ষাত করল। পাদ্রীদের সাথে একজন মহিলা পাদ্রী এগিয়ে এল এবং হাত বাড়িয়ে তাবলীগ জামাতের মুসলমানদের সাথে করমর্দন করতে চাইল। কিন্তু মুসলমানরা হাত গুটিয়ে নিল। মহিলা পাদ্রী এতে দারুণ বিস্মিত হল। সে তাদের ঠিকানা নিল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোথায় উঠবেন? তাবলীগের লোকেরা বলল, আমরা অমুক মসজিদে উঠব। তাবলীগ জামাতের লোকেরা তো মসজিদ ছাড়া কোথাও থাকে না। ঠিক তারপরের দিনই সেই মহিলা পাদ্রী মসজিদে গিয়ে উপস্থিত। বলল, আমি জানতে এসেছি, আপনারা কেন আমার সাথে করমর্দন করলেন না। তাবলীগের লোকেরা বলল, পুরুষের জন্য পরনারীর হাতধরা ইসলামে হারাম। এ কথা শোনার পরই মহিলার ভাবান্তর সৃষ্টি হল। সে মুসলমান হয়ে গেল। বলল, আমি ঐ ধর্মমত পরিত্যাগ করলাম। কারণ, পাদ্রীরা করমর্দনের সময় আমার হাত পিষ্ট করে, সুড়সুড়ি দেয়। আমি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে পালাতে চাই। গির্জার কথা আর কী বলব। প্রত্যেকটি গির্জা এখন বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। তাই বলছি, পাশ্চাত্য এক অন্ধকার জগত। এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। পুরুষে পুরুষে আর নারীতে নারীতে সমকামিতার ছড়াছড়ি।

উস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুবের লেখা 'আমার দেখা আমেরিকা' বইটি প্রকাশ হতে পারেনি। বলা হয় প্রেস থেকে বইটি আমেরিকান এম্বেসীর লোকেরা চুরি করে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু 'রিসালা' নামক পত্রিকায় সেই বইয়ের কয়েকটি অংশ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, পাশ্চাত্যের যুবকরা তাদের প্রেমিকার সাথে, তাদের প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাত করতে গির্জায় গিয়ে মিলিত হয়। গির্জা হল প্রেমের অভয়ারণ্য। যে সমাজকে ঘুণে ধরেছে, ধ্বংসের উপক্রম হয়ে পড়েছে, সে সমাজের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে।

তাই আমি বলছিলাম, মুশরিক থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া, তাদের সঙ্গে বসবাস না করা শরী'আতের দৃষ্টিতে ও জ্ঞানের বিচারে যুক্তিযুক্ত। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أن برئ ممن سكن مع المشركين —

"আমি ঐসব লোকদের যিম্মামুক্ত, যারা মুশরিকদের সাথে বসবাস করে।"

আরো বলেছেন–

من سكن المشرك و مات معه فهو منه —

"যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে বসবাস করল এবং তাদের মাঝেই মৃত্যুবরণ করল, সে তাদেরই একজন।"

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে চার-পাঁচটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তাই বলছি, পাশ্চাত্যে জীবন-যাপন করা মানে মুশরিকদের মাঝে জীবন-যাপন করা। বরং তার চেয়েও শতগুণ ক্ষতিকর। তার চেয়ে অনেক কঠিন, কষ্টকর। পাশ্চাত্যের কথা আর কত বলব। বলে শেষ করা যায়

না। জর্দানে জন্ম নেয়া আমার এক ছাত্র এক শীর্ষ সম্মেলনে আমার নিকট এসে বলল, হুজুর! আর আত্মরক্ষা করতে পারছি না। আর বেঁচে থাকতে পারছি না। বিয়ে না করলে বাধ্য হয়েই যিনা করতে হবে। তিন মাস ধৈর্যধারণ করেছি। এখন আর পারছি না। এভাবে বার বার বিভিন্নভাবে তার অসহায়ত্বের কথা আমার নিকট বর্ণনা করছিল। আমি হলফ করে বলতে পারব, কেউ যদি এর বিপরীত কিছু বলে, তবে অবশ্যই সে মিথ্যা বলবে। সেসব দেশে অবিবাহিত নারী-পুরুষ তথাকথিত স্বাধীনতার তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিন্নযৌবনা যুবতীরা অদ্ভুত একখণ্ড কাপড় পরছে। যা পরলে হাঁটুর উপরেও দশ সেন্টিমিটার উন্মুক্ত থাকে। অথচ এরা নারী। এরা যুবতী। এরা রূপসী।

একদা আমি ইসত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাথরুমে গেলাম। অজু করব। দেখলাম, কোন বাথরুমে দরজা নেই। পুরুষদের বাথরুম, মেয়েদের বাথরুম সবগুলোরই একই অবস্থা। এটা কিভাবে হতে পারে? এটা কিভাবে সম্ভব? আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ۔

অর্থ : মহিলা তার ব্যাপারে চিন্তা করেছিল আর সেও মহিলার ব্যাপারে চিন্তা করত। যদি না সে তার প্রতিপালকের মহিমা অবলোকন করতো। (সূরা ইউসুফ : ২৪)

পূতপবিত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এমন কথা বলছেন, যার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সবাই আল্লাহর নবী ছিলেন। তাহলে পাশ্চাত্যের লোকদের পতন সম্পর্কে ভাবা যায় কি!

একদা ইসলামী আন্দোলনের এক কর্মী-ছাত্র আমার নিকট এল। সে অবিবাহিত। আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি বৃটেনে এক ইংরেজ পরিবারের সাথে থাকি। সেখানে ডাক্তারি শিখি। আমার জন্য এটা জায়েয হবে? বললাম, কিভাবে থাক? সে বলল, একই ফ্লাটের একই কামরায় থাকি। আমি বললাম, কিভাবে রান্না কর? বলল, যৌথ। আমি বললাম, গোসলখানা? সে বলল, যৌথ। আমি বললাম, পায়খানা। সে বলল যৌথ। আমি বললাম, তার স্বামী কি বাইরে থাকে? সে বলল, কখনো রাতেও বাইরে থাকে। আর আমি ও তার স্ত্রী একই রুমে থাকি।

আমি বললাম, এটা জায়েয হবে না। এটা জায়েয় হবে না। এটা জায়েয হবে না। সে বলল, তাহলে কী করব? আমরা চাই, মুসলিম ডাক্তার, মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হোক। আমি বললাম, ওদের সাথে চললে সাত বৎসর পর তোমার ইসলামের কি কিছু বাকি থাকবে? সে বলল, তাহলে কি আমি লেখা-পড়া ছেড়ে দিব? আমি কী করব? আমি তাকে বললাম, শিম, তরমুজ, টমেটো ইত্যাদি বিক্রি করে জীবন-যাপন কর। তবুও এভাবে থেক না। একটু ভেবে দেখুন, একজন যুবক একই কামরায় অন্যের স্ত্রীর সাথে রাত কাটায়। একই পাকঘর, একই গোসলখানা, একই বাথরুম ব্যবহার করে, আর রাতের পর রাত তার স্বামী বাইরে কাটায়।

মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি বিভাগের এক অফিসার আমেরিকায় থাকতেন। তিনি আমাকে বলেছেন– এক রাতে পুলিশ আমার নিকট তিনজন যুবককে ধরে নিয়ে এল। তারা এইডস রোগে আক্রান্ত এক নারীর সাথে যিনা করেছে। ফলে তারাও এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এ হল পাশ্চাত্যের সমাজ চিত্র। তাই আমি বলি, স্ত্রী ছাড়া পাশ্চাত্যে থেকে লেখা-পড়া করা হারাম। আমার এই ফতওয়া তোমরা সবার নিকট পৌঁছিয়ে দাও। আবার বলছি, হারাম, হারাম, হারাম। একজন সুস্থ যুবক কিভাবে শুচি-শুদ্ধ, পাকপবিত্র থাকবে, যখন তার প্রতিবেশী পরিবারের সুন্দরী রূপবতী কন্যা তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তার পিতামাতার সামনে তার হাত ধরে বাইরে চলে যাবে? কোথায় ভাই সালাহ? তিনি সুইডেনে ছিলেন। আমার নিকট এলে আমি বললাম, আপনি কি সেখানে ছিলেন? আমার কণ্ঠের বিস্ময়ভাব অনুভব করে বললেন, মধ্যরাতে মেয়েরা এসে দরজায় নক করে। কোথায় পালাব? দরজা তো বন্ধ! তাহলে ঐ সব মেয়েদের অবস্থা কেমন, যারা রাস্তাঘাটে রাত কাটায়? যারা ইতালি বা সুইডেন থেকে এসেছে, তারা জানে, পাশ্চাত্যের সামাজিক পতন কত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

আমার বুঝে আসে না, তারপর কিভাবে মুসলিম যুবকরা জিহাদ ছেড়ে, আফগানের রণাঙ্গন থেকে সুইডেন যায়। কেন যায়? ভ্রমণের জন্য? আল্লাহ তোমার ভ্রমণে কল্যাণ দান করুন। তুমি কি জিহাদের দেশ ছেড়ে পৃথিবীর সবচে' নষ্ট-ভ্রষ্ট দেশে যেতে চাও?

তাই আল্লাহ তা'আলা বললেন, "আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত, তাঁর রাসূলও। আর যদি তোমরা তওবা কর অর্থাৎ ইসলামে ফিরে আস, তাহলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কুফরিতেই বহাল থাক এবং ঘোষণা মেনে না নাও, তাহলে তোমরা জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। দুনিয়াতে যুদ্ধে পরাজয় ও লাঞ্ছনার মাধ্যমে আর আখেরাতে জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তির মাধ্যমে। তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর তারা তোমাদের ব্যাপারে ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর।"

এ বিষয়টি শুধুমাত্র বনু যুমারা-এর সাথেই সম্পৃক্ত। তাদের সাথে রাসূলের চার মাসের চেয়ে কিছু বেশি সময়ের চুক্তি ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা সে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এখানে মনে রাখতে হবে, মাত্র দু'টি পদ্ধতিতেই ইসলামে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েয :

১. চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তখন চুক্তিবদ্ধ লোকদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয। তবে মুস্তাহাব হল, যুদ্ধ শুরু করার আগে তাদেরকে যুদ্ধের কথা জানিয়ে দেয়া।

২. মুশরিকদের পক্ষ থেকে আক্রমণের ভয় থাকলে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েয। তবে সে অবস্থায় দূত পাঠিয়ে তাদের জানিয়ে দিতে হবে যে, আমাদের মধ্যকার চুক্তি শেষ। এখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। সুতরাং তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও। শুধুমাত্র এ দু' ক্ষেত্রে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করা যাবে। অন্য কোন অবস্থায় তা জায়েয নয়। আগে মনে রাখতে হবে, ইসলাম সন্ধিচুক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক।

ফকীহগণ বলেছেন– যদি মুজাহিদ বাহিনী কোন দুর্গ অবরোধ করে এবং মুশরিকদেরকে দুর্গে আবদ্ধ করে ফেলে, তখন যদি কেল্লার প্রাচীরে দাঁড়িয়ে কোন মুশরিক বলে , আপনারা যদি আমার জানের নিরাপত্তা দেন এবং আমাকে হত্যা না করেন, তাহলে আমি আপনাদেরকে গোপন পথ দেখিয়ে দিব। আপনারা সহজেই কেল্লা দখল করতে পারবেন। তখন মুজাহিদরা যদি বলে, হ্যাঁ, তোমাকে জানের নিরাপত্তা দিলাম, তোমাকে কেউ হত্যা করবে না। তারপর সেই কাফের কেল্লায় প্রবেশের গোপন পথ দেখিয়ে দিল এবং সত্যই মুজাহিদরা সেই কেল্লায় প্রবেশ করল। ফলে কেল্লার পতন ঘটল। মুসলমানরা কেল্লা জয় করে নিল। বিজয়ের পর মুজাহিদরা সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, কে সে যাকে জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল? তখন অনেক লোক হাত তুলল। এমন অবস্থায় তাদের কাউকে হত্যা করা যাবে না।

অন্যত্র ফকীহগণ বলেছেন– যদি মুজাহিদ বাহিনী কোন শহর অবরোধ করে এবং শহর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে বলে, যদি আমি তোমাদেরকে শহরে প্রবেশের পথ বলে দেই, যে পথে তোমরা কোন বাঁধার সম্মুখীন হবে না; নির্বিঘ্নে শহর পদানত করতে পারবে, তাহলে কি তোমরা আমাকে শাসক কিংবা আমীর কিংবা অন্য কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির প্রাসাদটি দিয়ে দিবে? এই ব্যক্তির প্রস্তাব শুনে মুসলিম সেনাপতি রাজি হয়ে গেলেন। তখন ঐ ব্যক্তি তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিল। যেই মাত্র তারা শহরে প্রবেশ করতে লাগল, ঠিক তখনই সেই শহরের শাসক সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দূত পাঠাল। তখন মুসলিম সেনাপতির দায়িত্ব হবে সে অবশ্যই সন্ধি চুক্তির সময় উল্লেখ করবে যে, অমুক প্রাসাদটি অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দিতে হবে- যাকে আমরা নিরাপত্তা দিয়েছি। যদি শহরের শাসক এই শর্ত না মানে, তাহলে মুসলমানদের জন্য শাসকের সাথে সন্ধিচুক্তি করা বৈধ হবে না এবং শাসক এই শর্ত না মানার কারণে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ইতিহাসে একটি চমৎকার ঘটনা রয়েছে। মুসলিম সেনাপতি কুতাইবা ইবনে মুসলিম হঠাৎ সমরকন্দ আক্রমণ করে তা পদানত করে ফেললেন। সমরকন্দ শহর বিজিত হয়ে গেলে শহরবাসীরা জানতে পারল যে, ইসলাম নগরবাসীকে তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে। হয় ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, না হয় জিযিয়া (সামরিক কর) দিয়ে থাকতে হবে, অন্যথায় যুদ্ধই ভাগ্যের ফয়সালা করবে। কিন্তু তাদেরকে এ তিনটির একটিরও সুযোগ দেয়া হয়নি। অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের পরাভূত করা হয়েছে। তখন তারা খলীফা উমর উবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর নিকট দূত পাঠালেন। খলীফা সমরকন্দবাসীর বক্তব্য শুনে সেই বাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিক জুমাই বাজীকে এ মামলার বিচারক নির্ধারণ করলেন। খলীফার পক্ষ হতে জুমাই বাজী উভয় পক্ষের লোকদের ডাকলেন। মুসলিম সেনাপতি কুতাইবা ইবনে মুসলিম এলেন এবং মুজাহিদ বাহিনীর বড় বড় অফিসারগণ এলেন, আর সমরকন্দের নেতৃত্বাস্থানীয় ব্যক্তিগণও এলেন, তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনলেন। তারপর জুমাই বাজী ফয়সালা করলেন যে, মুসলিম বাহিনী সমরকন্দ শহর ত্যাগ করে চলে যাবে। সুবহানাল্লাহ! কী চমৎকার ফয়সালা! ঐতিহাসিক বিচার! ফয়সালার পর যখন বিজয়ী মুসলিম বাহিনী সমরকন্দ শহর ছেড়ে চলে যেতে লাগল, তখন শহরবাসীর চৈতন্য ফিরে এল। সাথে সাথে তারা কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ○

অর্থ : অতঃপর তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। (সূরা তাওবা : ৪)

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যামানার ঘটনা। তাঁর ও রোমানদের মাঝে চুক্তি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি রোমানদের উপর আক্রমণ করতে ইচ্ছে করলেন। মুজাহিদ বাহিনী প্রস্তুত করলেন। যাত্রা শুরু করলেন। বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখলেন, পিছন দিক থেকে উস্ত্রীতে আরোহণ করে এক ব্যক্তি ছুটে আসছে আর চিৎকার করে বলছে, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, বিশ্বাসঘাতকতা কর না। এভাবে লোকটি ক্রমাগত চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছিল। মুজাহিদ বাহিনীর লোকেরা পিছনে ফিরে তাকাল। দেখল, উমর উবনে আমবাসা ছুটে আসছে। তিনি এসে সোজা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বললেন, এটা রাসূলের সুন্নতের পরিপন্থী। কুরআনের বিধানের পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۔ فَانۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ○

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এ কথা শুনার পর টু-শব্দটি করলেন না। মুজাহিদ বাহিনীকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও কুরআনের বিধানকে মাথা পেতে বরণ করে নিলেন। ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, দু'জন সাহাবীর সাথে মক্কার কুরাইশদের দেখা হয়। তারা তখন বদর যুদ্ধে যাচ্ছিল। তারা মুসলমান দু'জনকে ধরে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা বলল, আমরা মদীনায় যাচ্ছি। কুরাইশদের লোকেরা বলল, তোমরা কি মুহাম্মদের দলে যোগ দিয়ে মিশে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? তারা বলল, না, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। তারপর তারা তাদের ছেড়ে দিল।

তারা গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বদর যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরাইশরা আমাদের বন্দী করেছিল। পরে এই শর্তে আমাদের ছেড়ে দিয়েছে যে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা শুনে থমকে গেলেন। তারপর বললেন–

نفي لهم بشرطهم و نستعين الله عليهم

"আমরা তাদের নিকট দেয়া শর্ত পূর্ণ করব এবং তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব।"

সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! কাদের সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হচ্ছে! মুশরিকদের সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হচ্ছে। অথচ, আজ আমরা মুসলমান। আমাদের অবস্থা কি? আমরা সবাই তামান্না করি, একান্ত কামনা করি যে, আমার সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি যেন রক্ষা করা হয়। কিন্তু নিজেরা দিনের চুক্তিও রাতে ভঙ্গ করে ফেলি।

দেখুন, আব্দুন নাসের একদিকে ইমাম আহমদকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান আর অন্যদিকে উত্তর ইয়ামেনে বিপ্লব সৃষ্টির জন্য দলে দলে সৈন্য পাঠান। এই তো আমাদের অবস্থা। আমাদের চরিত্র। আমাদের আখলাক। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ۝ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ ۝

অর্থ : অতঃপর তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন। অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর, যেখানে তাদের পাও। (সূরা তাওবা : ৪-৫)

নিষিদ্ধ এই চার মাস হল- জিলহজ্বের দশ তারিখ হতে রবিউস সানি মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা এ চার মাস যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও। পূর্বে যাও, পশ্চিমে যাও। যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। তারপর যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। চার মাস বিগত হওয়ার পর যুদ্ধ শুরু হবে। রবিউস সানির দশ তারিখের পর যেখানেই কাফেরদের পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করা হবে। এ ঘোষণার পর মুশরিকরা আরব থেকে পালিয়ে গেল। ইকরামা ইবনে আবূ জাহেল দিগ্বিদিক ঘুরতে লাগল। কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে কিছুই সে জানে না। হাবশায় চলে গেল। তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে নিরাপত্তার আবেদন পেশ করল। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিরাপত্তা দিলেন। তারপর ইকরামা এসে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এই ইকরামা (রাঃ) ইয়ারমুকের যুদ্ধে এমন সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, যা অকল্পনীয়, অভাবনীয়। চিৎকার করে তিনি বলেছিলেন–

من يبايعني على الموت، من يبايعني على الموت

"কে আমার হাতে মৃত্যুর বাই'আত গ্রহণ করবে? কে আমার হাতে মৃত্যুর বাই'আত গ্রহণ করবে?"

খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-এর তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন- কে মৃত্যুর জন্য আমার নিকট বাই'আত গ্রহণ করবে। খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বললেন, হে ইকরামা! তোমার মৃত্যু মুসলমানদের মাঝে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। ইকরামা (রাঃ) বললেন, কে মৃত্যুর জন্য বাই'আত গ্রহণ করবে! মুসলমানরা তার বেপরওয়াভাব দেখে বলতে লাগল, হে ইকরামা, নিজের প্রতি রহম করুন। কিন্তু ইকরামা (রাঃ)-এর সে দিকে খেয়াল নেই। একাই শত্রু বাহিনীর সারির মাঝে ঢুকে পড়তেন এবং তাদেরকে হত্যা, জখম ও ছত্রভঙ্গ করে বেরিয়ে আসতেন। কেউ যদি তাকে বলত, হে ইকরামা! নিজের প্রতি রহম করুন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ছিলাম অত্যন্ত সাহসী, দুর্বার। এখন কি আমি রাসূলের

শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আরো বেশি সাহসী ও দুর্বার হব না? ইয়ারমুকের প্রান্তরে যুদ্ধ করতে করতে ইকরামা (রাঃ) শহীদ হয়ে যান। সুবহানাল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেন–

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه و بينها ذراع سبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها –

"তোমাদের কেউ কেউ জাহান্নামীদের মত কাজ করতে থাকে। অবশেষে যখন তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকে, তখন তার তাকদীর অগ্রসর হয়। তখন সে জান্নাতীর মত আমল করতে শুরু করে ও জান্নাতে প্রবেশ করে।"

সুতরাং মুশরিক হয় তওবা করবে অথবা তাকে হত্যা করা হবে কিংবা সে আরব উপদ্বীপ থেকে বেরিয়ে যাবে।

কাবুলের এক আফগানী। নাম আবদুস সবুর। বয়স ২৫/২৬ বছর হবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আবদুস সবুর! তুমি কতজন কমিউনিস্টকে হত্যা করেছ? সে বলল, আমি যাদের নিজের হাতে চাকু দ্বারা যবেহ করেছি, তারা ঊনত্রিশজন। আর অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে ব্রাশফায়ার করে যে কতজনকে হত্যা করেছি, তার সংখ্যা জানা নেই। আর তা জানা সম্ভবও নয়। সে আরো বলে, কোন কমিউনিস্টকে ছুরি দ্বারা যবেহ করার সময় ছুরিটা কিন্তু ধারালো হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته –

"আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ক্ষেত্রে সদাচরণকে নির্ধারিত করেছেন। তোমরা যখন কাউকে হত্যা করবে, তখন হত্যার ক্ষেত্রে সদাচরণ করবে। যখন কিছু যবাহ করবে, তখন যবেহ করার ক্ষেত্রে সদাচরণ কর। তোমরা তোমাদের ছুরি ধার করে নেবে, যবাহকৃত পশুকে কষ্ট দেবে না।"

তুমি কাউকে হত্যা করতে চাচ্ছ? দ্রুত হত্যা করে ফেল। তা না করে যদি তুমি তার নাক কাটো, কান কাটো, তাকে নির্যাতন কর, তাহলে তো তা (মুছলা করা) আল্লাহ প্রদত্ত আকৃতিকে বিকৃত করা হল। এমন করা জায়েজ নয়, বৈধ নয়। মৃতের বেলায়ও বৈধ নয়। জীবিতের বেলায়ও বৈধ নয়। মৃত ব্যক্তি থেকে কি তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও? এ কারণেই বাতরীরাক গাককে হত্যা করার পর যখন তার কর্তিত শির হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসা হল, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করে দিলেন। আর উরানীয়ীনদের যে শাস্তি দেয়া হয়েছিল- তাদের চক্ষু অন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, হাত-পা কেটে ফেলা হয়েছিল। তারপর তাদের উত্তপ্ত হাররা অঞ্চলে ফেলে রাখা হয়েছিল। তারা পিপাসায় কাতর হয়ে পানি পানি করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছিল। এ ধরনের শাস্তির বিধান মুছলা অর্থাৎ দেহ বিকৃতি নিষেধের হাদীস দ্বারা রহিত করা হয়েছে। সুতরাং শত্রুকে হত্যা করে ফেলাই যথেষ্ট। আর কোন প্রকার শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন নেই। কাফের অবস্থায় মৃত্যুর চেয়ে আর বড় বিপদ কি হতে পারে? তুমি আর তাকে কতটুকু শাস্তি দিতে পারবে? তার হাত কাটবে? তার পা কাটবে? এই তো! অথচ তার জন্য অপেক্ষা করছে নিঃসীম জাহান্নামের শাস্তি, কবরের ভয়াবহ শাস্তি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○

অর্থ : "আল্লাহ তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন। আর পরকালের আযাব তো অত্যন্ত কঠিন, যদি তারা জানত।" (সূরা যুমার : ২৬)

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আয়াতের দ্ব্যর্থবোধকতার কারণে হয়তো হযরত আবূ বকর (রাঃ) বুঝেছেন যে, তাদের যে কোন পদ্ধতিতে হত্যা করা যাবে। আগুনে পুড়িয়ে, গরম পানিতে ঠেলে দিয়ে, উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করে অথবা যে কোন পদ্ধতিতে। বর্ণিত আছে যে, আবূ বকর (রাঃ)-এর যুগে কতিপয় মুরতাদকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল এবং হযরত আলী (রাঃ) কিছু লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে আলেমদের মতবিরোধ রয়েছে। কারণ, এর বিপরীত একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لا يعذب بالنار إلا رب النار

"আগুনের স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ আগুন দ্বারা শাস্তি দেবে না।"

কিন্তু অধিকাংশ ফকীহই বলেছেন যে, মিনজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র জাতীয় অস্ত্র) দ্বারা কোন পাথর, প্রজ্বলিত সলতে বা গরম পানি নিক্ষেপ করা যেতে পারে। কাফেরদের আগুন দ্বারা হত্যা করা যাবে। অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে হত্যা করা আর আগুন জ্বালিয়ে হত্যা করা তো একই কথা। শত্রুকে যে কোন স্থানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে। হারামে হলেও তাকে হত্যা করবে।

তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হারামের ভিতরে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তেরজন বা এগারজন সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন–

اقتلوهم و لو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة

"তাদেরকে কাঁবার চা'দর আঁকড়ে ধরা অবস্থায় পেলেও হত্যা কর।"

তাদের মাঝে ছিল মিকইয়াস ইবনে ছবাবাহ ও আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল।

আল্লামা ইবনে কায়্যিম (রহঃ) বলেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে খাতালকে কা'বার চাদর আঁকড়ে ধরা অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল।

কেউ কেউ বলেছেন– এ বিষয়টি রাসূলের সাথেই খাস। তবে প্রসিদ্ধ বিধান হল, যদি কোন মুশরিক হারামে প্রবেশ করে আর তার ইচ্ছা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা। তাহলে তাকে ধরে হারামের বাইরে তানঈমে নিয়ে যাবে এবং সেখানে হত্যা করবে। এভাবে উভয় মতের সমন্বয় করা হয়েছে।

আর যাদের সাথে যুদ্ধ করে বন্দী করা হবে, তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হবে?

তাদের ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান চারটি শাস্তির যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। ১. হত্যা করা, ২. গোলাম বানিয়ে নেয়া, ৩. মালের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া, ৪. বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তি দেয়া। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ছাড়া সকল ইমামের মত। আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, মালের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া যাবে না। কারণ, এ বিধান রহিত হয়ে গেছে। বরং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। তাই মালের বিনিময়ে এই ওয়াজিব ত্যাগ করা যাবে না। তবে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহঃ) বলেছেন– যদি মুসলমানরা অর্থ সংকটে থাকে এবং তাদের অর্থের তীব্র প্রয়োজন থাকে, তবে অর্থের বিনিময়েও মুক্তি দেয়া যেতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এ ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন– এক্ষেত্রেও বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তি দেয়া যাবে না। কারণ, তারা মুক্তি লাভ করার পর আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

বলা হয়, ইসলামে প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান আছে। মনে কর, কোন আমেরিকান ভিসা নিয়ে আমাদের দেশে এল। তাহলে এটা একজন মুসলমানের পক্ষ থেকে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হল। এমতাবস্থায় তাকে কিছুতেই হত্যা করা যাবে না।

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন–

فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۔

অর্থ : তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর।

যেমন তুমি কোন অমুসলিমকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললে, আমার দেশে এসো। আমি তোমাকে স্বাগত জানাব। এমন অবস্থায় তুমি কীভাবে তাকে হত্যা করবে? এমনিভাবে যদি আমেরিকানরা পেশোয়ারে আসে, তারা যদি পাকিস্তানের ভিসা নিয়ে আসে, তাহলে তাদের হত্যা করা যাবে না। কারণ, তারা নিরাপত্তা নিয়ে এসেছে। তারা যদি জানত যে, হত্যা করা হবে, তাহলে তো তারা কিছুতেই আসত না। এমনকি সে আফগানিস্তানে প্রবেশ করলেও তাকে কিছু বলা যাবে না। হ্যাঁ, যদি সে মুসলমানদের ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তাকে বলা হবে, তোমার নিরাপত্তার চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গেছে। সুতরাং তুমি ফিরে যাও। অন্যথায় তোমাকে হত্যা করা হবে। এরপরও যদি সে ফিরে না গিয়ে মুসলমানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, ফিতনা সৃষ্টি করতে থাকে, তাহলে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে।

চতুর্থ মজলিস

اعوذ الله من الشيطان الرجيم

(٥) فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۝ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

অর্থ : (৫) তারপর নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হলে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাক। তারপর যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে; তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

'তারপর নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হলে' এর অর্থ হল, স্বাধীনভাবে চলাফেরার শেষ সুযোগ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে দশম হিজরীর জ্বিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে যে চার মাসের সুযোগ দিয়েছিলেন, সে চার মাস। সে বছর হজ্জের আমীর ছিলের হযরত আবূ বকর (রাঃ)। তিনি হাজীদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে যান। পথে হযরত আলী (রাঃ) সূরা তাওবার প্রথম চল্লিশ আয়াত নিয়ে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। হযরত আলী (রাঃ) হাজীদের মাঝে কয়েকটি বিষয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন। বিষয়গুলো হল– এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। বিবস্ত্র অবস্থায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারবে না ইত্যাদি। পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, জাহেলী যুগের লোকেরা বিবস্ত্র অবস্থায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করত। তাই কেউ হজ্জ করতে এলে যদি তার সাথে অর্থকড়ি থাকত, তাহলে মক্কার লোকদের থেকে কাপড় ভাড়া নিয়ে তা পরিধান করে তাওয়াফ করত। আর অর্থকড়ি না থাকলে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত আর বলত, যে কাপড় পরে আল্লাহর নাফরমানী করেছি, তা পরিধান করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করব না। আর ইতোপূর্বে আমি জাহেলী যুগের উলঙ্গপনা আর আমাদের সভ্য যুগের উলঙ্গপনার আলোচনা করেছি। উলঙ্গ হয়ে হলেও সে যুগের মহিলারা তাওয়াফ করত রাতের অন্ধকারে। আর পুরুষরা দিনের বেলায়। মহিলারা তাওয়াফকালে বলত–

اليوم يبدو بعضه أو كله و مابدا منه فلا أحله

"আজ দেহের কিয়দাংশ বা পুরো দেহই প্রকাশিত হলে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তবে দেহের যে অংশ প্রকাশিত হবে, তা কারো জন্য বৈধ হতে দিব না।"

আর আমাদের বিংশ শতাব্দীর উলঙ্গপনা, বেহায়াপনার কথা আর কী বলব। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নামেমাত্র পোশাক ব্যবহার, অশ্লীল নাচগান, ইত্যাদিতে যেন জাহেলী যুগেরও ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে যায়।

যা হোক, মক্কায় হজ্জ করতে আসা সকলের মাঝে ঘোষণা করা হল, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। কেউ বিবস্ত্র হয়ে হজ্জ করতে পারবে না। তবে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কারো কোন চুক্তি থাকে, তবে সে চুক্তি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আর চুক্তি না থাকলে চার মাসের সুযোগ দেয়া হল। এরপর আর কাউকে কোন সুযোগ দেয়া হবে না। আর মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

আলী (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবী এ ঘোষণা দিলেন। আরবের দূরদিগন্ত পর্যন্ত এ ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ল। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা। যে হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের বিদায় জানাবেন, নশ্বর এই দুনিয়াকে বিদায় জানাবেন, সে হজ্জে তিনি বাইতুল্লাহর পাশে কোন বিবস্ত্র ব্যক্তিকে দেখতে চান না। কোন মুশরিককে দেখতে চান না। আরাফাহ আর মিনায় কোন মুশরিকের সাক্ষাৎ কামনা করেন না। বরং তখন গোটা আরব উপদ্বীপে কোন মুশরিক থাকবে না।

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ـ

অর্থ : নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিক্রান্ত হলে যেখানেই মুশরিকদের পাবে হত্যা করবে।

অর্থাৎ আরব উপদ্বীপ মুশরিক, ইহুদী ও খ্রিস্টান থেকে মুক্ত করতে হবে। মুশরিকদের চার মাসের চূড়ান্ত সুযোগ প্রদান করা হল। এ চার মাস তারা নিরাপদে যথা ইচ্ছা যেতে পারবে। তারপরই তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ। যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করা হবে।

তবে ইহুদী ও খ্রিস্টানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত আরব উপদ্বীপেই ছিল। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব উপদ্বীপকে অন্যান্য ধর্মমুক্ত করার নির্দেশ দিলেন। বললেন–

لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ـــ

"আরব উপদ্বীপে দু'টি ধর্ম একত্রিত হবে না।"

আরো বললেন–

أخرجوا اليهود و النصارى من جزيرة العرب ـــ

"তোমরা আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদী-খ্রিস্টানদের বের করে দাও।"

হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে তিনি ইহুদীদের খায়বর থেকে উচ্ছেদ করে তাইমা নামক স্থানে তাড়িয়ে দেন। তাইমা সিরিয়ার অঞ্চল– আরব উপদ্বীপের নয়। তাই হযরত উমর (রাঃ) ইহুদীদের খায়বর থেকে উচ্ছেদ করে তাইমায় পাঠিয়ে দেন।

আর তাগলিব গোত্রের খ্রিস্টানরা আরবে রয়ে গেল। হযরত উমর (রাঃ) তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করলে তারা তা দিতে অস্বীকার করল। বলল, আপনি আমাদের থেকে যত পরিমাণ সম্পদ চান, দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমরা জিযিয়া প্রদান করব না। হযরত উমর (রাঃ) তখন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। সাহাবীরা বললেন, তাদের উপর দ্বিগুণ পরিমাণ কর আরোপ করুন। উমর (রাঃ) তাদের বলে দিলেন, এটাই জিযিয়া। এখন তোমরা একে যা-ই বল। তিনি তাদেরকে দ্বিগুণ পরিমাণ কর প্রদান করতে বাধ্য করেন।

সুতরাং আরব উপদ্বীপ ইসলামের দ্বীপ। এ দ্বীপে অন্য ধর্ম, অন্য মতাদর্শ থাকতে পারে না। ইসলামের দুর্গ হল এ দ্বীপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

إن الإسلام ليأزر إلى الحرمين

"নিশ্চয়ই ইসলাম হারামাইনে (মক্কা-মদীনায়) আশ্রয় নেবে।"

অপর এক বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إن الإسلام ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها

"নিশ্চয়ই ইসলাম মদীনায় আশ্রয় নেবে, যেমন সাপ তার গর্তে আশ্রয় নেয়।"

সুতরাং মক্কা-মদীনা পবিত্র থাকতে হবে। কোন মুশরিক মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এ বিধান অবধারিত হয়ে গেছে। তাই আজো হুদাইবিয়ার নিকটে পবিত্র মক্কা ভূমির প্রারম্ভে অর্থাৎ জিদ্দাতে মক্কা রোডের ১৭ কিলোমিটার পর বিরাট ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে- এটা অমুসলমানদের পথ, এটা মুসলমানদের পথ। তাই অমুসলিমরা হারামের বাইরে দিয়ে চলে যায়। কোন ইহুদী-খ্রিস্টান বা কাফেরের মক্কা-মদীনায় প্রবেশের অনুমতি নেই। কিন্তু হাফেজ আসাদ! এই কাফের হাফেজ আসাদের জন্য মক্কা-মদীনায় প্রবেশে কোন বাঁধা নেই। সকল আলেম একমত যে, হাফেজ আসাদ কাফের। তার মত গাদ্দাফীও বিভ্রান্ত। অথচ তাদের জন্য মক্কা-মদীনার পথ উন্মুক্ত। মক্কা-মদীনায় প্রবেশে তাদের কোন বাঁধা নেই। কারণ, তারা

মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। অথচ এদের আক্বীদা-বিশ্বাস-আমল ইসলামী আদর্শের বিপরীত- এদের মক্কা-মদীনায় প্রবেশের অনুমতি নেই। এদের মত আর যারা মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তাদেরও হারামাইনে প্রবেশের অনুমতি নেই।

সুতরাং যদি হাফেজ আসাদ, গাদ্দাফী বা নুসাইরীদের কেউ আসে, তবে তাদের গাড়ি অমুসলমানদের পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। তাদের বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করা বা মদীনায় মসজিদে নববীতে প্রবেশ করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যে তাদের পবিত্র মক্কা-মদীনায় নিয়ে যাবে, সে হারাম কাজ করবে। যে তাদের হারামাইনে প্রবেশের অনুমতি দিবে, সে পাপাচারে লিপ্ত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۝

অর্থ : নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও।

তাই আরব উপদ্বীপকে কাফের-মুশরিক, ইহুদী-খ্রিস্টান থেকে পবিত্র রাখতে হবে। আরব উপদ্বীপে কোন ইহুদী, নাসারা বা মুশরিকের জমিন ক্রয় করা বৈধ নয়। আরব উপদ্বীপের পরিধিতে কুয়েত, আবুধাবী, আবু গাযাল, কাতার, বাহরাইন এ সবগুলো দেশ শামিল। গোটা আরব উপদ্বীপের কোথাও গির্জা বানানো জায়েয নয়। তবে কুয়েতে অনেক কিছুই হচ্ছে। ভিসা নিয়ে কমিউনিস্টরা, খ্রিস্টান পাদ্রীরা একের পর এক কুয়েত যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দশের চেয়ে অনেক বেশি গির্জা তৈরি হয়ে গেছে। কারণ, রাষ্ট্রের বড় বড় পদে আছে কমিউনিস্ট বর্ণচোরা খ্রিস্টান-ইহুদীরা। তাই কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশে তাদের কোন পরওয়া নেই।

শুধু কি তাই? আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কুয়েত থেকে রাশিয়াকে দু'শ পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে তা বলছি না। বরং কুয়েত থেকে দেয়া হয়েছে। এ অর্থ তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিয়েছে। আর অজানা অংকের পরিমাণ যে কত হতে পারে, তা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

কুরআনের নির্দেশ, আরব দ্বীপকে পবিত্র রাখতে হবে। অথচ কুয়েতে রাশিয়ান দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা তিনশ'। তবে আমেরিকান দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র চল্লিশজন। এই তিনশত লোকের কাজ কী? এরা গোটা আরব উপদ্বীপে গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত। কারণ, কুয়েত ছাড়া আরব উপদ্বীপের কোথাও রাশিয়ার দূতাবাস নেই। এই তিনশ' লোকের কাজ আফগান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো। তারা প্রচার করছে আফগানীরা বিদ্রোহী। আফগানীরা মৌলবাদী, কট্টরপন্থী।

একবার মুজাহিদদের সাত গ্রুপের প্রতিনিধিরা কুয়েতে এক কনফারেন্সে যোগ দেন। তাদের রীতিমত আমন্ত্রণ করে নেয়া হয়েছিল। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে কেউ তাদের স্বাগত জানায়নি। তাদের একটি হোটেলে রেখে তার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। তাদের সাথে কারো যোগাযোগ করার অনুমতি ছিল না। কনফারেন্সে কেউ আগে বেড়ে তাদের সালাম জানিয়ে স্বাগতও জানায়নি। অথচ তারা আমন্ত্রিত মেহমান। আমন্ত্রিত মেহমানদের স্বাগত জানানো রাষ্ট্রীয় নিয়ম। তাদের জন্য থাকবে নির্ধারিত আসন। অথচ আফগানিস্তান থেকে আগত মুজাহিদদের স্বাগত জানান হল না। তাদের জন্য কোন নির্ধারিত আসন বরাদ্দ করা হল না। অথচ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে লোক গিয়ে সর্বসম্মত কাফের নুসাইরী হাফেজ আসাদকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে আসল। আর গাদ্দাফী– যার কাফের হওয়া সম্পর্কে অধিকাংশ আলিম একমত– সে অবশ্য আসেনি। তার প্রতিনিধিকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

শুনে রাখ, স্বাগত তাদের জানাও, যাদের দ্বারা আল্লাহ মুসলিম জাতির শির উন্নত করেছেন। যাদের দ্বারা কনফারেন্স কক্ষেই আল্লাহ তার দীনের ইজ্জতকে বুলন্দ করেছেন। কনফারেন্সে উপস্থিত আমন্ত্রিত মেহমানরা

এই ভয়ে আফগান মুজাহিদদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে চায় যে, ক্যামেরাম্যানরা বুঝি তাদের ঐ ছবি তুলে ফেলবে। কবি বলেন–

ذل من يغبط الذليل بعيش   رب عيش أعز من الحمام

"যে লাঞ্ছিত অপদস্থ ব্যক্তি কারো সুখের জীবন দেখে ঈর্ষান্বিত হয়, সে সত্যই লাঞ্ছিত অপমানিত ও অপদস্থ হল। অনেক সুখময় জীবন রয়েছে, যার চেয়ে মৃত্যুই অধিক শ্রেয়।"

কোন খ্রিস্টানের জন্য আরব উপদ্বীপে থাকা বৈধ নয়। মক্কা-মদীনারও এই একই হুকুম। এমনকি যদি মক্কা খলীফা বা রাষ্ট্র প্রধানের রাজধানী হয় আর কাফেররা এসে তার সাক্ষাৎ কামনা করে; তাহলে খলীফা বা রাষ্ট্র প্রধানের জন্য ওয়াজিব মক্কা থেকে বেরিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা। সাক্ষাতের জন্য কাফেরদের তার নিকট মক্কায় যাওয়া জায়েয নেই। সুতরাং আরব উপদ্বীপ অন্যান্য ধর্মমুক্ত হতে হবে। যেন ইসলামের মর্যাদা চির অক্ষুণ্ন-অম্লান থাকে।

আল্লাহর নির্দেশ–

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ○

অর্থ : নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হলে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম অসীয়ত–

لا يجتمع دينان في جزيرة العرب —

"আরব উপদ্বীপে দু'টি ধর্ম সহাবস্থান করতে পারে না।"

এ হিসেবে আরব উপদ্বীপে কোন গির্জা থাকতে পারে না। অথচ আবুধাবীতে সাতটি গির্জা রয়েছে। এসব এলাকায় গির্জা নির্মাণের অনুমতি দেয়া কোন বাদশাহ, কোন রাষ্ট্র প্রধানের জন্য বৈধ নয়। তাদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে উচ্ছেদ করতেই হবে।

কীভাবে হত্যা করবে? আমি আগেই বলেছি, যেভাবে পার হত্যা কর। তরবারীর আঘাতে, ছুরি দিয়ে, যবেহ করে বা গুলী করে যেভাবে পার হত্যা করো। তবে হত্যার ক্ষেত্রে সদাচরণ করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته —

"যখন তোমরা হত্যা করবে, উত্তমভাবে হত্যা করবে। আর যখন যবেহ করবে, তখন উত্তমভাবে যবেহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং জবাইকৃত প্রাণীকে শান্তি প্রদান করে।"

উল্লেখ্য, কারো দেহ বিকৃত করা হারাম। কান কাটা, চোখ উপড়ে ফেলা ইত্যাদি জীবিত বা মৃত কারো বেলায় জায়েয নেই। আরে, তুমি তো তাকে হত্যা করতে চাও, তাহলে হত্যা করে ফেল। তার রূহকে দেহমুক্ত করে দাও, সে জাহান্নামে চলে যাক। জাহান্নামে যাওয়ার থেকে বড় বিপদ আর কী হতে পারে। তুমি তার কান, নাক কাটায় ব্যস্ত আর সে মুনকির-নাকীর ফেরেস্তার মুখোমুখি। তারা লোহার গুর্জ দ্বারা এমন আঘাত করছে যে, তার বিকট চীৎকারের আওয়াজ মানুষ ও জিন ছাড়া আকাশ ও জমিনের সকলে শুনতে পাচ্ছে।

فإذا انسلخ الأشهر الحرم۔

"যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে।"

এখানে নিষিদ্ধ মাস বলতে জিলক্বদ, জিলহজ্জ, মহররম ও রজব- আরবের সেই প্রসিদ্ধ চার মাস বুঝানো হয়নি। বরং এ আয়াতের উদ্দেশ্য হল, কাফেরদের স্বাধীনভাবে নির্বিঘ্নে চলাফেলার জন্য মেয়াদ বেঁধে দেয়া চার মাস। তাহল, দশম হিজরীর দশই জিলহজ্জ থেকে একাদশ হিজরীর রবিউস সানীর দশ তারিখ পর্যন্ত।

خذوهم "তাদের বন্দী কর।" বন্দী করার পর খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান তার ব্যাপারে নির্ধারিত পাঁচ প্রকার আচরণের যে কোন একটি করতে পারেন।

১. হত্যা করতে পারবেন।

২. অনুগ্রহপূর্বক মুক্তি দিতে পারবেন।

৩. মুক্তিপণের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দিতে পারবেন।

৪. বন্দী করে রাখতে পারবেন।

৫. বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তি দিতে পারবেন।

তবে ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন– মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া বা অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেয়া যাবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহঃ) বলেছেন– যদি মুসলমানদের অর্থের তীব্র প্রয়োজন থাকে, তাহলে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া জায়েয। অন্যথায় জায়েয নয়। আর অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেয়া খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যও বৈধ হবে না।

واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد۔

"তাদের অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাকো।" অর্থাৎ তাদেরকে তাদের দেশে, তাদের কেল্লায় বন্দী কর এবং তাদের সন্ধানে ওঁৎপেতে থাক। যখনই নাগালে পাবে, তখনই আক্রমণ করবে।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে গুপ্ত হত্যা জায়েয। বরং কখনো কখনো গুপ্ত হত্যা ফরয হয়ে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)-এর সঙ্গে তিনজনকে পাঠালেন। তারা গিয়ে কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করল এবং আবূ আতিক (রাঃ)কে ইবনে আবিল হাকীককে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি রাতের অন্ধকারে তাকে তার ঘরেই হত্যা করেছিলেন। প্রথমে তিনি তার কক্ষে প্রবেশ করে তাকে আঘাত করেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন না, তিনি কি তাকে হত্যা করতে পেরেছেন, না পারেননি। তা জানতে চাইলেন। কক্ষ অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাই বললেন, ইবনে আবিল হাকীক! কি হয়েছে? সে বলল, কে যেন আমাকে আঘাত করেছে। তখন হযরত আবূ আতিক (রাঃ) তার কণ্ঠ চিনে ফেললেন এবং কণ্ঠের উৎসস্থল লক্ষ্য করে প্রচণ্ড আঘাত করে তাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিলেন।

فإن تابوا وأقاموا الصلوٰة وآتوا الزكوٰة فخلوا سبيلهم۔

অর্থ : "এরপর যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ উন্মুক্ত করে দাও।"

মুসলমানদের মাঝে থাকার জন্য এটা হল শর্ত। অর্থাৎ তওবা করে কালিমা-ই শাহাদাত পাঠ করতে হবে। আর প্রকৃত তওবার আলামত হল নামায আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে। যদি তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করে, কিন্তু নামায আদায় করে না বরং তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদের হত্যা করা হবে। আর যদি যাকাত প্রদান করাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। কারণ, নামায অস্বীকারকারীকে হত্যা করা হয় আর যাকাত অস্বীকারকারীকে হত্যা করা হয় না। বরং ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধান তার সম্পদের কিয়দাংশ বা অর্ধেক জব্দ করে নেবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

فإما أخذوها و شطرماله – عزمة من عزمات ربنا – ليس لمحمد و لآل محمد منها شيئ —

"তারা তার যাকাত ও তার মালের কিয়দাংশ নিয়ে নেবে। এটা আমাদের প্রতিপালকের একটি হক। এতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার বংশধরের কিছু নেই।"

তবে যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, তার বিধান সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। প্রথমত যে ব্যক্তি নামায না পড়াকে হালাল মনে করে এবং নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, সে সকল ইমামের মতে কাফের। কাফের হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হবে। বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি নামায আদায় কর না কেন? তখন সে যদি বলে, আমি নামায ফরজ হওয়া স্বীকার করি না, তাহলে সে কাফের প্রমাণিত হবে। তাকে হত্যা করা হবে। হত্যা করার পর তাকে গোসল দেয়া হবে না, কাফন পরানো হবে না। তার নামাযে জানাযাও পড়া হবে না। মুসলমানদের কবরস্তানে তাকে দাফন দেয়া হবে না। তার সন্তানরা তার ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না। বরং তাকে ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাথে দাফন করা হবে। এ ধরনের শাস্তি ঐ ব্যক্তিকে দেয়া হবে, যে নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে না, বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি নামায আদায় কর না কেন? তখন সে যদি বলে, নামায ফরয হওয়া অস্বীকার করি না। বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করার পর যদি সে বলে, আমি অলসতার কারণে বা নফসের কুমন্ত্রণায় নামায আদায় করি না, তবে সে নামায না পড়াকে হালাল মনে করে না এবং নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকারও করে না, তাহলে তার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

যে ব্যক্তি নিজের অলসতা, দুর্বলতার কথা স্বীকার করবে, বিচারক তাকে তিন দিন পর্যন্ত জেলে আবদ্ধ করে রাখবে। যদি সে এর মধ্যে নামায আদায় করতে শুরু করে তবে তাকে মুক্ত করে দেবে। নামায আদায় না করলে মৃত্যু পর্যন্ত সে জেলে থাকবে। হ্যাঁ, তবে বিচারক তাকে শাস্তিমূলক বেত্রাঘাত করতে পারে।

আর ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, তাকে হদ (শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি) হিসেবে হত্যা করা হবে, গোসল দেয়া হবে, কাফন পরানো হবে। তার জানাযার নামায পড়া হবে এবং মুসলমানদের কবরস্তানে তাকে দাফন করা হবে।

আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, সে যদি বলে, আমি অলসতার কারণে বা অন্য কোন কারণে নামায আদায় করি না, তাহলে তাকে কাফের হিসেবে হত্যা করা হবে। তাকে গোসল দেয়া হবে না। কাফন পড়ানো হবে না। তার জানাযার নামাযও পড়া হবে না। এমনকি তাকে মুসলমানদের কবরস্তানে দাফন পর্যন্ত দেয়া হবে না। কেউ কেউ বলেছেন– কুকুরের খোরাক হওয়ার জন্য তাকে ফেলে রাখবে। আবার কেউ বলেছেন– তাকে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে দাফন করে দেয়া হবে।

আর যদি কেউ যাকাত আদায় না করে, তবে তাকে কাফের বলা যাবে না। হ্যাঁ, যদি তারা দলবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র অবস্থায় ইসলামের কোন আলামত বা নিদর্শনকে অস্বীকার করে; যদিও তা সুন্নতে মুয়াক্কাদা হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। ইমাম বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের উপর ওয়াজিব তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে প্রয়োজনে যুদ্ধ করে তাদের যাকাত দিতে বাধ্য করা। যেমন, যদি কোন গ্রামের বা গোত্রের লোকেরা বলে, আমরা জামাতের সাথে নামায আদায় করব না। অথবা এর চেয়ে সামান্য কোন বিধান অস্বীকার করল। যেমন বলল, আমরা জামাতে নামায আদায় করব, কিন্তু আযান দিব না। তাহলে ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধানের উপর ওয়াজিব সৈন্য প্রেরণ করে তাদের আযান দিতে বা জামাতের সাথে নামায আদায় করতে বাধ্য করা। প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

তবে যদি একজন, দু'জন বা দশজন যাকাত আদায় না করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। হ্যাঁ, যদি তারা খলীফা বা রাষ্ট্রপতি বা প্রশাসককে বলে, এসো আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে যদি তারা যাকাত না দেয়। তাদের গ্রেফতার করে এনে বন্দী করে রাখা হবে এবং তাদের অর্ধেক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

কারণ, নামায এবং যাকাত দু'টি ফরয বিধান। এর মাঝে ভিন্নতা সৃষ্টি করা যাবে না। এ জন্য হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে যারা যাকাত প্রদানকে অস্বীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবূ বকর (রাঃ) যুদ্ধাভিযান শুরু করেছিলেন। তিনি বলেছেন–

والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة و الصلوة —

"আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যে যাকাত ও নামাযের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে।"

তিনি আরো বলেছেন–

أينقص الدين و أنا حي —

"আমি বেঁচে থাকব আর দীনের অঙ্গহানি হবে!"

তিনি আরো কঠিন ভাষায় বলেছেন–

والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون لرسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم فيها أو أهلك دونها —

"আল্লাহর শপথ করে বলছি! যদি তারা একটি পুচকে ছাগল ছানা দিতেও অস্বীকার করে, যা তারা যাকাতস্বরুপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করত, তাহলে আমি তাও আদায় করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব কিংবা এ পথে আমি জীবন দিব।"

তারপর হযরত আবূ বকর (রাঃ) মুরতাদ এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। অথচ তখন গোটা আরবের পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। গোটা আরব উপদ্বীপের লোকেরা তখন মুরতাদ হয়ে যাচ্ছিল। মাত্র তিনটি মসজিদে আল্লাহর ইবাদত হচ্ছিল। ১. মসজিদে হারাম, ২. মসজিদে নববী, ৩. বাহরাইনের মসজিদে আবদে কাইস। সেই বাহরাইন আজকের ছোট্ট বাহরাইন নয়। সেকালে বাহরাইন বলতে আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলীয় গোটা এলাকাকে বুঝানো হত। তাতে কাতার, কুয়েত ও অন্যান্য সব রাষ্ট্র শামিল ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ উবায়দা (রাঃ) বাহরাইন থেকে সম্পদ নিয়ে এসেছিলেন। তার অর্থ বর্তমানের এই বাহরাইন নয়। বরং আরব উপসাগরের কূলবর্তী গোটা অঞ্চলকেই বাহরাইন বলা হত।

যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী এ ধরনের লোকেরা যদি তওবা করে বা যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে, তাহলে তাদের আহত ব্যক্তিদের হত্যা করা হবে না। তাদের স্ত্রীদের বাঁদী বানানো হবে না। তাদের ধন-সম্পদকে গনীমতের মাল হিসেবে নেয়া হবে না। হ্যাঁ, যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পশ্চাতে এক বিরাট বাহিনী থাকে, যারা তাদের সহায়তা করবে ও করছে, তাহলে তাদের আহতদেরও হত্যা করা হবে এবং তাদের ধাওয়া করে নিঃশেষ করতে হবে।

فإن تابوا و أقيموا الصلوة و آتوا الزكوة فخلوا سبيلهم . إن الله غفور رحيم.

অর্থ : "যদি তারা তওবা করে, নামায আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দয়ালু ও ক্ষমাশীল হওয়ার কারণে তাদের ছেড়ে দেয়ার হুকুম দিচ্ছেন।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة ، فأن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دمآءهم و أموالهم —

"আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং নামায আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে। যদি মানুষ তা করে, তাহলে তারা আমার থেকে রক্ত ও ধন-সম্পদ রক্ষা করে নিল। তবে কালিমার হকের ব্যাপারে কাউকে ক্ষমা করা হবে না।"

আমি দারুণ বিস্মিত হই, যখন দেখি, হযরত আবূ বকর (রাঃ) যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইচ্ছে করেছেন, আর সাহাবায়ে কেরাম তার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে বাঁধাদানের চেষ্টা করছেন। বিশেষভাবে হযরত উমর (রাঃ)-এর বেলায়। তিনি বললেন–

كيف تقاتلهم و هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ؟

"কিভাবে আপনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন; অথচ তারা বলে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল?"

উমর (রাঃ)-এর এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) একই কথা বলেছিলেন–

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله و أن محمدا رسول الله و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة ، فأن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دمآءهم و أموالهم —

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কালিমার হক কি? আলেমগণ বলেছেন– কালিমার হক তিনটি, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বর্ণনা করেছেন–

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الشيب الزاني، والنفس بالنفس،و التارك لدينه المفارق للجماعة —

"তিনটির যে কোন একটি কারণ ছাড়া কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। ১. বিবাহিত যিনাকারী, ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যাকারী, ৩. মুসলমানদের জামাত ত্যাগ করে কাফের হয়ে যাওয়া।"

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

من فرق بين ثلاث فرق الله بينه و بين رحمته يوم القيامة ،من قال: أطيع الله ولا أطيع الرسول و الله تعالى يقول أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ، و من قال:أقيموا الصلوة ولا أتي الزكوة و الله عز وجل يقول و أقيموا الصلوة و آتوا الزكوة و من فرق بين شكرالله و شكر والديه و الله يقول أن اشكر لي و لوالديه —

"যে ব্যক্তি তিনটি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার মাঝে ও স্বীয় রহমতের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেবেন। ১. যে বলবে, আমি আল্লাহর আনুগত্য করব; কিন্তু রাসূলের আনুগত্য করব না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। ২. যে বলবে, আমি নামায আদায় করব; কিন্তু যাকাত প্রদান করব না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা নামায আদায় কর ও যাকাত প্রদান কর। ৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর শুকরিয়া এবং পিতামাতার শুকরিয়ার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করবে, অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আমার শুকরিয়া এবং তোমাদের পিতামাতার শুকরিয়া আদায় কর।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন–

أمرتم بالصلوة و الزكاة فمن لم يزك فلا صلوة له —

"তোমাদের নামায ও যাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করল না, তার নামায আদায় হবে না।"

হযরত ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন–

افترض الله الصلوة و الزكوة و أبى أن يفرق بينهما و أبى أن يقبل الصلوة إلا بالزكوة —

"আল্লাহ তা'আলা নামায এবং যাকাত ফরয করেছেন এবং এ দু'য়ের মাঝে ভুল বিবেচনা করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি যাকাত ছাড়া নামায কবুল করবেন না।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি শেষ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বলেছেন–

كيف يكون للمشركين عهد عندالله و عندرسوله؟

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কীভাবে থাকবে?"

আল্লাহর কাছে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি থাকার অর্থ, আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামত দিবসে তাদের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আর রাসূলের নিকট প্রতিশ্রুতি থাকার অর্থ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– এ ধরনের প্রতিশ্রুতি থাকা কীভাবে সম্ভব? অর্থাৎ এ ধরনের প্রতিশ্রুতি থাকতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام —

অর্থ : "তবে হ্যাঁ, যাদের সাথে মসজিদে হারামের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছ, চুক্তি করেছ, তা বলবৎ থাকবে।"

কেউ কেউ বলেন, তারা হল বনূ বকর। তবে এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। তার কারণ, এ আয়াত নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তখন তো বনূ বকর ও কুরাইশরা রাসূলের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলেছিল। এদের চুক্তি ভঙ্গের ফলে অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় তরান্বিত হয়েছিল। আর এই সূরা নবম হিজরীতে গাযওয়ায়ে তাবূকের পূর্বে, মাঝে ও পরে অবতীর্ণ হয়েছে। আর গাযওয়ায়ে তাবূক সংঘটিত হয়েছিল নবম হিজরীর রজব মাসে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لهم، إن الله يحب المتقين —

অর্থ : তবে যারা মসজিদে হারামের নিকট তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, তারা যতদিন পর্যন্ত তোমাদের সাথে চুক্তিতে অবিচল থাকে, তোমরাও তাদের সাথে অবিচল থাক। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।

চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তাক্বওয়ার আলামত। আর চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকের আলামত। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ثلاثة من كن فيه كان منافقاخالصاو من كانت واحدة فيه ففيه خصلة من خصال النفاق، إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا أؤتمن خان —

"যে ব্যক্তির চরিত্রে এই তিনটি খাসলত থাকবে, সে নিরেট মুনাফিক। আর যার চরিত্রে এর একটি খাসলত থাকবে, তাকে নেফাকে আক্রান্ত বলা যাবে। যখন সে কথা বলবে, মিথ্যা বলবে। যখন সে ওয়াদা করবে, ভঙ্গ করবে। আর যখন তার নিকট আমানত রাখা হবে, সে তার খেয়ানত করবে।"

তাই ইসলাম প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। যদি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে ইসলাম ও মুসলিমের বিরাট উপকার হয়, তবুও ইসলাম তা অনুমোদন করে না। যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে একটি

দেশ বিজয় করার সুযোগ সৃষ্টি হয়, তবুও ইসলাম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অনুমতি প্রদান করে না। যদি মুসলিম দেশের সাথে অন্য দেশের প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি থাকে, তবে তা শুধুমাত্র দু'পদ্ধতিতে ভেঙ্গে যাবে। ১. প্রতিশ্রুতির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ২. কাফিরদের পক্ষ থেকে এ আশংকা করলে যে, তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে। তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, তোমাদের এই আচরণ ও তৎপরতার কারণে আমাদের মাঝে কোন প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি রইল না। সুতরাং তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করব। সুবহানাল্লাহ! কী মহান এই ধর্ম! কী মহান এর আদর্শ!

কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষার এত গুরুত্ব কেন ইসলাম আরোপ করে? কারণ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার কারণে মানবতা অনেক নিপীড়িত-নির্যাতিত হয়েছে। তাই মুসলমানরা কামনা করে, যেন তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলতে পারে। কারণ, তা ওয়াজিব। কাফিরদের সাথে প্রতিশ্রুতি থাকলেও তা রক্ষা করা ওয়াজিব। কিছুতেই তা ভঙ্গ করা যাবে না। কিছুতেই তার খেলাফ করা যাবে না। পূর্বেই আলোচনা করেছিলাম যে, হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ)-এর সাথে রোমানদের চুক্তি ছিল। কিন্তু চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) বিরাট মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে রোমানদের উপর আক্রমণ করতে রওনা হয়ে গেলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখেন, পিছন দিক থেকে এক ব্যক্তি উস্ট্রীতে আরোহণ করে চীৎকার করতে করতে ছুটে আসছে আর বলছে, "প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তার খেলাফ করো না। প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তার খেলাফ করো না।" চিৎকার শুনে মুজাহিদরা পেছনে ফিরে তাকালেন। দেখলেন, তাদের পশ্চাত দিক থেকে হযরত আমর আমবাসা (রাঃ) ছুটে আসছেন। মুজাহিদ কাফেলার ভিতরে ঢুকে হযরত আমবাসা (রাঃ) সোজা হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ)-এর নিকট চলে গেলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বললেন, "আপনার এই পদক্ষেপ কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী। কারণ, আপনি রোমানদের সাথে যুদ্ধ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" হযরত মুআ'বিয়া (রাঃ) তার কথা মেনে নিলেন এবং সাথে সাথে বাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন।

মনে করুন, একজন আফগানী রাশিয়াতে গেল। আর রাশিয়ার সাথে আফগানিস্তানের যুদ্ধ চলছে। রাশিয়ার লোকেরা তাকে ধরে জেলখানায় বন্দী করল। কিছুদিন পর রাশিয়ানরা বলল, এক শর্তে আমরা তোমাকে মুক্ত করে দিতে পারি। শর্ত হল, তুমি কখনো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। আফগানী লোকটি এই শর্ত মেনে নিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এল। সে যখন হাঁটছিল, তখন দেখল, রুশ প্রেসিডেন্ট গর্ভাচেভ একাকী হাঁটছেন। একান্ত একা। কেউ তার সাথে নেই। তাহলে এমন সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ঐ লোকের পক্ষে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। কারণ, রাশিয়ার লোকেরা তার থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিয়েছে, সে কখনো রাশিয়ার মোকাবেলায় যুদ্ধ করবে না। সুতরাং এ প্রতিশ্রুতি কিছুতেই ভঙ্গ করা যাবে না। হ্যাঁ, যদি সে কোন কৌশলে জেল থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য যে কোন রাশিয়ানকে হত্যা করা বৈধ হবে।

তবে আমাদের মাঝে যে কথা প্রচলিত আছে-

الحرب خدعة

অর্থ : যুদ্ধ মানে ধোঁকা। তা যথাস্থানে ঠিক। কিন্তু এ যুক্তিতে কখনোই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যাবে না।

তাই মনে রাখতে হবে, الحرب خدعة এ কথাটি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ উভয়পক্ষের মাঝে কোন প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি না থাকবে। আর যদি প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি থাকে, তাহলে তা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

এটাই হল ইসলাম। এটাই হল ইসলামের সুমহান আদর্শ। সুতরাং মুসলমান হয়ে যদি আমরা তা পালন না করি, তাহলে কে তা পালন করবে? জাতিসংঘ? নিরাপত্তা পরিষদ? আমেরিকা? রাশিয়া? ভারত? নাকি হাফেজ আসাদ? দুনিয়ার মানুষকে সত্যবাদিতা আমাদেরই শিক্ষাদান করতে হবে। যদি আমরা মিথ্যাচার করি, তাহলে দুনিয়াতে কে সত্য বলবে? বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আমাদের কঠিন-কঠোর হতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানকে অবশ্যই সকল ধরনের প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে।

মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন কাফেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে ঘোষণা করলেন–

اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة

"তাদের ক্বাবার চাদর জাপটে ধরা অবস্থায় পেলেও হত্যা করবে।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাদের মাঝে ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আবিস সারহ ও আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল। সাহাবায়ে কেরাম আব্দুল্লাহ ইবনে খাতালকে ক্বাবার চাদর জাপটে ধরা অবস্থায় পেয়ে সেখানেই হত্যা করলেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে আবিস সারহ ছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)-এর দুধভাই। তিনি তার হাত ধরে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে এলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার তওবা কবুল করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব রইলেন। কোন কথা বললেন না। এভাবে তিনবার হযরত উসমান (রাঃ) বললেন, আর তিনবারই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব রইলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত বাড়িয়ে তার তওবা কবুল করলেন। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে আবিস সারহ চলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি অপেক্ষায় ছিলাম যে, তোমরা তার তরবারীটি নিয়ে তাকে হত্যা করবে। তাই আমি দেরি করছিলাম। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি একটিবার চোখের ইঙ্গিতে বলতেন, তাহলেই তাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–

ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين

"কোন নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি চোখের দ্বারাও উত্তম নৈতিকতার খেয়ানত করবেন।"

এটা বৈধ নয়। নবীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সর্বদা এক হবে। মুখে একটা আর অন্তরে একটা, এটা কিছুতেই হতে পারে না। খলীফা বা মুসলিম শাসকরা শাসনের ক্ষেত্রে রাসূলেরই স্থলাভিষিক্ত হন। সুতরাং তারা কখনও ওয়াদা খেলাফ করতে পারেন না। যদি মুসলমানরাই ওয়াদা খেলাফ করে, তাহলে ওয়াদা রক্ষা করবে কারা?

হযরত আবূ উবায়দা (রাঃ) হিমস অবরোধ করলেন এবং হিমস অধিবাসীদের জিযিয়া প্রদান ও যুদ্ধ এ দু'টির যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ দিলেন। হিমসের অধিবাসীরা বলল, আমরা জিযিয়া প্রদান করব। তিনি তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করলেন। এদিকে খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) ইয়ারমূক থেকে বার্তা প্রেরণ করলেন যে, সকল সেনাপতিকে অবিলম্বে ইয়ারমূকে সমবেত হতে হবে। এখন উপায় কি? আবূ উবায়দা (রাঃ) বাধ্য হয়ে হিমস ছেড়ে ইয়ারমূক রওনা হলেন। রওনা হওয়ার প্রাক্কালে হিমসের অধিবাসীদের নিকট তাদের জিযিয়া ফেরত দিলেন। কারণ, জিযিয়া হল সামরিক কর। যতক্ষণ মুসলমানরা সমরশক্তি দ্বারা তাদের হেফাজত করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই কর গ্রহণ করার অধিকার আছে। তাই সমরশক্তি যখন তুলে নিচ্ছে, তখন আর এই কর রাখার অধিকার তাদের নেই। হিমসের অধিবাসীরা মুসলিম সেনাপতির এই কাণ্ড দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি কেন এই জিযিয়া ফিরিয়ে দিচ্ছেন? উত্তরে হযরত আবূ উবায়দা (রাঃ) বললেন, আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণের জিম্মা নিয়ে আমরা আপনাদের থেকে এই কর নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমরা চলে যাচ্ছি। আপনাদের হেফাজতের জন্য আমরা এখানে থাকতে পারছি না। তাই আপনাদের থেকে নেয়া কর আপনাদেরকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। হিমসের অধিবাসীরা এ কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। মুসলমানদের এই অনুপম আদর্শ দেখে সবাই ইসলাম গ্রহণ করল। এ হল মুসলমানদের সততা, মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা। তাদের চরিত্রে গাদ্দারী থাকবে না। কোন প্রতারণা থাকবে না। কোন বিশ্বাসঘাতকতা থাকবে না। কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ থাকবে না।

আবূ রাফে' মক্কার কুরাইশদের দূত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মদীনায় এলেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আবূ রাফে' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ইসলাম আমার অন্তরে আসন গ্রহণ করেছে। আমি আর মক্কার কাফিরদের নিকট ফিরে যাব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে বললেন−

إني لا أخيب العهد و لا أحبس البرد ارجع إليهم ثم قل لهم: أسلمت و ارجع إلي —

"আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারব না। তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও। তারপর বল, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। তারপর আমার নিকট ফিরে এসো।"

জনৈক রাখাল খায়বরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণ করল। সাথে তার মালিকের বিরাট ছাগলের পাল। বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার সাথে মুশরিক মালিকের এই বিরাট ছাগলের পাল। এগুলো কী করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে একথা বললেন না, যাও নিয়ে সবগুলো ছাগল যবেহ করে আনসার ও মুজাহিদদের খাবারের আয়োজন কর। বরং তিনি বললেন−

اذهب بأغنامهم أو كما قال و ارم عليهم حجرا حتى تعود إلى أصحابها ثم ارجع ألي —

"যাও, তুমি তার ছাগল পাল নিয়ে তার নিকট ফিরে যাও"।

অন্য এক বর্ণনা মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি ছাগলগুলোকে পাথর নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দাও, যেন সেগুলো মালিকের নিকট ফিরে যায়। তারপর এসো।

সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! এই তো কুরআনের শিক্ষা। এই তো ইসলামের আদর্শ। কোন ধোঁকা দেয়া যাবে না, ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে না, খেয়ানত করা যাবে না; কিন্তু আমরা এসবই করছি। তারপরও আমরা মুসলমান!

হিজরতের পূর্বের ঘটনা। মক্কার মুশরিকরা রাসূলকে হত্যার জন্য তার ঘরের চারদিক ঘিরে ফেলল। শয্যায় থাকতেই একযোগে আক্রমণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু জেনেশুনেও হযরত আলী (রাঃ) কে তার শয্যায় শুয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন। কেন? রাসূলের নিকট গচ্ছিত মক্কার লোকদের আমানত ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। রাসূল একথা ভাবলেন না, এগুলো মুশরিকদের সম্পদ, কী প্রয়োজন তা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার!

তারা আমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে। আমরাও তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেব। এমন কোন চিন্তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করলেন না। বরং আমানতের সম্পদ মক্কার কাফেরদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আলী (রাঃ)-কে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রাখলেন!

আজকের দিনে মুসলমান যুবকদের চিন্তা-ভাবনাই বাঁকা। ইসলামের আদর্শের সাথে তাদের চরিত্রের কোন মিল নেই। কোন সামঞ্জস্য নেই। তারা বিদ্যুতের মিটারের উপর চুম্বক রেখে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কেন এমন কর? তারা বলল, যেন মিটার না ঘুরে। আমি বললাম, কে তোমাদের এ কাজ করতে শিখিয়েছে? তারা বলল, এটা অনৈসলামিক সরকার। এটা জাহেলী সরকার। এরা আমাদের এই টাকা নিয়ে বিনোদন পার্ক, নাট্যমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি পাপ কাজে ব্যয় করে। তাই এ সরকারের হাতে এ অর্থ দেব না। বরং এর অর্থ আমরা ইসলামী দাওয়াহ ও জিহাদ ফান্ডে ব্যয় করব। আমি তাদের বললাম, এটা আবার কেমন ইসলামী দাওয়াহ, কেমন ইসলামী জিহাদ!

দেখবে, যুবকরা পরীক্ষায় নকল করছে। শিক্ষকদের ধোঁকা দিচ্ছে। মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। আল্লাহ তাদের যেমন নির্বোধ বানিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি নির্বোধ রয়ে গেল। শিক্ষাঙ্গনে যে অবস্থায় গিয়েছিল, ঠিক তেমনি

বেরিয়ে এল, সাথে নিয়ে এল রাশি রাশি সার্টিফিকেট। তাকে জিজ্ঞেস কর, ভাই! তুমি এসব কাজ কেন করছ? এ সব কাজ তো ভাল নয়। সে উত্তরে বলবে, আরে ভাই, আমি তো সার্টিফিকেট নিয়ে ইসলামের খেদমত ও দাওয়াতের কাজ করব। আমি বলছি, তুমি তা করবে না। বরং তুমি ইসলামী রাষ্ট্রে একজন বড় চোর হবে। তুমি এখন থেকেই তোমার শিক্ষকদের ধোঁকা দিচ্ছ। ভূয়া সার্টিফিকেট নিচ্ছ। ভবিষ্যতে তুমি কি না করবে?

তাই যারা ইসলামের মহান খেদমত করার লক্ষ্যে পেশোয়ারের আফগান কলোনিতে গিয়ে নানা সার্টিফিকেট নিয়ে আসে বা পেশোয়ারের দাররা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে টাকা-পয়সা খরচ করে স্নাতক সার্টিফিকেট নিয়ে আসে। অনেকে বলে, আলহামদুলিল্লাহ, আমি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসায় স্নাতক সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছি। তুমি দেখবে, সে ইনজেকশনও পুশ করতে পারে না। আসলে সে তো আফগান কলোনি থেকে পাশ করা ছাত্র। তাই তার অবস্থা এমন হওয়া বিচিত্র নয়। এধরনের ধোঁকা দেয়া, মিথ্যার আশ্রয় নেয়া জায়েয নয়। বৈধ নয়। তোমার পকেটে এখন একটিও পয়সা নেই আর এখনই তুমি ধোঁকা দিচ্ছ! মিথ্যা বলছ! তাহলে আগামীতে যখন তোমাকে অর্থমন্ত্রী বানানো হবে, তখন তোমার কী দশা হবে? এ ধরনের ধোঁকাবাজদের যখন আমরা অস্ত্র দেই, তারা তখন তা নিয়ে গায়েব হয়ে যায়। সোজা পাকিস্তান সীমান্তে তুরমনজিলে গিয়ে তা বিক্রি করে ফেলে। যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, আরে তুমি এটা কী করলে? সে বলবে, আমি এর অধিকার রাখি। ছয়-সাত বছর যাবত যুদ্ধে আছি। অথচ যারা পেশোয়ারে ঘুরছে, ধান্দাবাজি করছে, তারা মিতসুবিসি গাড়ি হাঁকিয়ে চলছে। অথচ আমি আমার সন্তানদের খাবারের আয়োজন করতে পারছি না। তাই আমি এটা বিক্রি করতে পারি। আমার অধিকার আছে। শোন, এটা হল তাদের খেয়ালী দর্শন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাদের আদর্শ, বিশ্বাস ও চরিত্রের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামদের সেই আদর্শে মুগ্ধ হয়েই পৃথিবীর মানুষ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ইন্দোনেশিয়া বল, ফিলিপাইন বল, মালয়েশিয়া বল সর্বত্র একই কারণে ইসলাম তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। ইন্দোনেশিয়ায় একশ' পঞ্চাশ মিলিয়ন মুসলমান। একজন মুজাহিদও সেদেশে পদার্পণ করেনি। বরং এক মুসলিম ব্যবসায়ীর আদর্শ ও চরিত্রগুণে বিমুগ্ধ হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সে ব্যবসায়ী দল এমন চিন্তা করেনি যে, এরা মুশরিক, কাফির; ধোঁকা দিয়ে এদের সম্পদ নিয়ে যাব আর তা দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের খেদমত করব। তারা এমন করেনি। ফলে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম আপন মহিমায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ কারণেই হযরত আবূ উবায়দা (রাঃ) যখন হিমসবাসীকে তাদের সামরিক কর ফিরিয়ে দিলেন, তখন হিমসের অধিবাসীরা বিমুগ্ধ হয়ে নির্দ্বিধায় অকুণ্ঠ চিত্তে বলল–

والله, لعدلكم أحب إلينا من ظلم حكامنا مع أنكم على غير ديننا.

"আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাদের ন্যায়নীতি আমাদের নিকট আমাদের শাসকদের জুলুম থেকে অধিক প্রিয়, অথচ তোমরা আমাদের ধর্মের লোক নও।"

এ ধর্ম পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসেছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ○

অর্থ : আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যেন মানুষ ইসনাফ কায়েম করে। (সূরা হাদীদ : ২৫)

সকল নবী ও রাসূলের আগমন, তাদের সকল ত্যাগ ও কুরবানী পৃথিবীতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)কে খেরাজের খেজুর আনতে খায়বরের ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করলেন, তখন ইহুদীরা তার নিকট তার মনোরঞ্জনের জন্য "জালীত

জুবত" নামক অতি উন্নতমানের খেজুর নিয়ে এল, যেন খেরাজের খেজুরের ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহজ আচরণ করা হয়। তাদের এই কাণ্ড দেখে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন–

يأبناء القردة و الخنازير، والله جئتكم من أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنتم أبغض خلق الله إلي و لكن و الله لا يحملنكم حبي له و بغضي لكم أن أخذ منكم غير ما استحق —

"হে বানর ও শূকরের সন্তানেরা! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি আমার নিকট আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট এসেছি আর তোমরা আমার নিকট আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত। তবুও আল্লাহর শপথ করে বলছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আমার ভালবাসা আর তোমাদের প্রতি আমার ঘৃণা আমাকে অন্যায়ভাবে তোমাদের থেকে কিছু গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে না। তার কথা শুনে ইহুদীরা বলল, এ কারণেই তো তোমরা পৃথিবী পদানত করে চলেছ।"

জুলুমের পরিণতি অত্যন্ত খারাপ। তাই ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন–

الدولة الكافرة العادلة مع شعبها تدوم أكثر من الدولة المسلمة الظالمة مع شعبها —

"ন্যায়পরায়ণ কাফের রাষ্ট্র জালিম মুসলিম রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয়।"

আমেরিকার কথা ভেবে দেখ। কাফের রাষ্ট্র। কিন্তু জনসাধারণের প্রত্যেকে অধিকারের দাবি করতে পারে। এমনকি প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধেও যে কোন সাধারণ মানুষ আদালতে বিচার প্রার্থনা করতে পারে। আফগানে জিহাদরত কিছু ভাইয়ের কথা চিন্তা কর। তারা অনেকে পরিবার-পরিজন আমেরিকায় রেখে এসেছে। তাদের পরিজনের লোকেরা প্রশাসনকে জানিয়েছে, তার স্বামী আমেরিকায় নেই। তাদের ভরণ-পোষণের কেউ নেই। আমেরিকান প্রশাসন তাদের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাদের জন্য প্রত্যেক মাসে পাঁচশ' ডলার অনুদান মঞ্জুর করেছে। আমার এক আত্মীয় আমেরিকায় থাকে। তার স্ত্রী প্রশাসনকে জানিয়েছে, তার স্বামী কাজ করতে অক্ষম। প্রশাসন তার সন্তানসহ সকলের ভরণ-পোষণের জন্য প্রত্যেক মাসে আটশ' ডলার অনুদান মঞ্জুর করেছে। তাছাড়া শিক্ষা ফ্রি। চিকিৎসা ফ্রি। তাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী উৎসবের দিনে তাদের বাড়িতে উপঢৌকন পাঠিয়ে দেয়া হয়। অথচ আমাদের শাসকদের চরিত্র হল, তারা যদি তোমার কাপড় ছিনিয়ে নিতে পারে, তাও ছিনিয়ে নেয়। একদা এমনি এক ঘটনা ঘটল। একবার এক মুচি রাষ্ট্রের নামে গালমন্দ করল। ব্যস! আর যায় কোথায়। কোর্ট তাকে হত্যার নির্দেশ দিল। বেচারা তো বিচারকের ফয়সালা শুনে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। তখন বিচারক তার ব্যাপারে বিবেচনা করে ফয়সালা দিল যে, তাকে হত্যা করা যাবে না, তবে তার সকল সম্পত্তি ও তার গায়ের জামা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হবে। হলও তাই, তার সকল সম্পত্তি নিয়ে নেয়া হল আর তার পরিধেয় বস্ত্র খুলে বিবস্ত্র অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হল। সে বেচারা রাস্তায় বেরিয়ে চীৎকার জুড়ে দিল, ন্যায় বিচার জিন্দাবাদ, ন্যায় বিচার জিন্দাবাদ। আমার দেশে এ হল ন্যায় বিচার। সুতরাং একটু চিন্তা করে দেখুন, আমাদের মুসলিম দেশগুলোতে বলার কি স্বাধীনতা আছে? করার কি স্বাধীনতা আছে?

একটু ভেবে দেখুন! আমেরিকার মত পরদেশে যাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুদের দেশ। কিন্তু সেখানে আইন আছে। সে আইন সবার জন্য সমান। আমার এক সহপাঠী। আমরা একই সাথে পড়েছি। সে বলেছে, আমি একবার ইউনিভার্সিটি কার্যালয়ে পত্রিকা প্রকাশের জন্য অনুমতি নিতে গেলাম। আমাকে বলল, এই অনুমতি প্রার্থনার কারণে তোমার জেল হতে পারে। আমি তো কথা শুনে হতবাক, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়ল আমার কণ্ঠস্বর দিয়ে। বললাম, কেন? বলল, তুমি তোমার এই অনুমতি প্রার্থনার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত করছ যে, এদেশে গণতন্ত্র নেই। কে তোমাকে বলেছে যে, পত্রিকা প্রকাশে অনুমতি লাগে?

পাশ্চাত্যে ধর্ম বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী লোক আছে। তাদের যে কী সম্মান তা বলাই বাহুল্য। তাদের জন্য বাড়ি ভাড়া কম। মেডিকেলে গেলে তাদের চার্জ কম। সুপার মার্কেটে গেলে পণ্য দ্রব্যের দাম কম। তাদেরকে 'ধর্মীয় দিক-নির্দেশক' বলা হয়। আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছে, সে একবার আমেরিকান এম্বেসিতে ভিসা আনতে গেল। উদ্দেশ্য আমেরিকা ভ্রমণ করা। তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি কাজ করেন? সে বলল, ধর্মীয় দিক-নির্দেশক। ব্যস, কেল্লা ফতেহ। তার কথা শুনে সে বলল, আচ্ছা, তাহলে আপনাকে শুধু ভ্রমণ ভিসা দেব কেন? আপনাকে ও আপনার স্ত্রীকে আমেরিকান ন্যাশনালিটি দিয়ে দিচ্ছি।

মুনীর দুল্লী। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের উপদেষ্টা। ৫৫ বছর বয়সে তাকে গ্রেফতার করে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হল। বিচারকরা তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি চান? ইখওয়ানুল মুসলিমীন কি চায়? তিনি বললেন, আমরা গাধা আর খচ্চরের অধিকার চাই। গাধা আর খচ্চর খুশিতে চিৎকার করতে পারে, কিন্তু আমরা তা পারি না। আমাদের স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকারটুকুও নেই। তাই যখন মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চলছিল, তখন এর মুফতীয়ে আযম সুইজারল্যান্ডের পশু কল্যাণ সংস্থায় একটি তারবার্তা প্রেরণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, আমরা আপনাদের নিকট আবেদন করছি, মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের উপর যে নির্যাতন চলছে, সে ক্ষেত্রে আপনারা হস্তক্ষেপ করুন। আপনারা গাধা-খচ্চরের জন্য পৃথিবীতে আন্দোলন করে চলছেন। আপনারা বিশ্বব্যাপী দাবি তুলুন, যেন মিসরের জনগণের সাথে অন্ততপক্ষে পশুর মত আচরণ করা হয়। তাদের বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা চর্চায় যেন বাঁধা দেয়া না হয়।

আইন পরামর্শদাতা আব্দুল্লাহ রিশওয়ান। একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবি। তিনি মুহাম্মদ আওদান সম্পর্কে বলেছেন– তিনি আমাদের শিক্ষকদের ডক্টর উপাধি প্রদান করেছেন। তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের নামকরা শিক্ষক ছিলেন। তার বাড়িতে জামাল আবদুন নাসের, আনোয়ার সাদাত আরো অনেকে প্রতিপালিত হয়েছে। তাকেই বিপ্লবের প্রাণশক্তি মনে করা হত। বিপ্লব সফল হওয়ার পর তাকে জামি'আ আযহারের প্রধান হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তাকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মহাপরিচালক হওয়ার জন্য আবেদন করা হল। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু যখন আবদুন নাসের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদের বন্দী করতে শুরু করল, তখন মুহাম্মদ আওদানকে বন্দী করল এবং কতিপয় কারাবন্দীর উপর চাপ সৃষ্টি করল, তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মদ আওদান আবদুন নাসেরের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে চেয়েছিল এবং তাদেরকে জেল থেকে পালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করছিল। মুহাম্মদ আওদানকে হত্যা করার জন্য তারা এ ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু কোন কারাবন্দীই এ ধরনের মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি হল না।

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় আব্দুল্লাহ রিদওয়ান বলেছেন– আমি যে কারণে বন্দী হয়েছিলাম, তাহল আমাকে একটি আবেদনপত্র পূরণ করতে দেয়া হল। তাতে একটি প্রশ্ন ছিল, আপনি কি ধার্মিক? উত্তরে আমি লিখলাম, হ্যাঁ। তারপর প্রশ্ন ছিল, আপনি কি ধার্মিকতায় গোঁড়া? আমি উত্তরে লিখলাম, হ্যাঁ। পরপর দু'টি প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ লেখার কারণে আমাকে বন্দী করা হল। এগার বছর আমি বন্দী থাকলাম। তিনি বলেছেন– জেলখানায় আমার সেলটি শাইখ মুহাম্মদ আওদানের সেলের একেবারে মুখোমুখি ছিল। একবার শাইখ মুহাম্মদ আওদানের সেলে এক অনুসন্ধানী টিম এল। তার সেল খোলা হল। আমি তার সেলে রক্ষিত কুকুরের সংখ্যা গণনা করতে লাগলাম। দেখলাম, ছাব্বিশটি কুকুর তার সেলে। তাহলে স্বাভাবিকই প্রশ্ন জাগে, এতগুলো কুকুর কোথায় পেশাব করে। কোথায় পায়খানা করে। শাইখের শরীরে, কাপড়ে, মাথার সর্বত্র কুকুরের বিষ্ঠা আর পেশাব। সে এক মর্মান্তিক ব্যাপার। দুর্গন্ধে তারা শাইখের নিকটবর্তী হতে পারল না। ফলে দূর থেকে পানির পাইপ দিয়ে পানি ছিটিয়ে তাকে পরিষ্কার করল। এরপর পুলিশ এসে তার কাপড় পাল্টিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে

দিল। তারপর তাকে অনুসন্ধানী টিমের নিকট পেশ করা হল। হায়রে ইনসাফ! হায়রে ন্যায় বিচার!! একেই **বুঝি** বলা হয় বিচারালয়! জনগণের স্বার্থ রক্ষার কথা বলে এমন বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জনৈক আরব কবি অত্যন্ত চমৎকার বলেছেন–

الكل يعلم ما تريد المحكمة   وضاته سلفاقد ارتشفوا دمه —

"প্রত্যেকেই জানে বিচারালয় কি চায়। অথচ তার বিচারপতিরা পূর্বেই জনগণের রক্ত শুষে নিয়েছে।"

এ জন্যই ইসলাম প্রতিশ্রুতি পূরণের গুরুত্ব দিয়েছে। ন্যায়পরায়ণতার এত তাকীদ দিয়েছে। কারণ, এতেই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। দেশে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দিয়ে একটি মৃতদেহ নেয়া হচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা এক ইহুদীর মৃতদেহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ সে কী! তবে কি এটা মানুষের মৃতদেহ নয়! এটা কি মানুষের মৃতদেহ নয়!

পঞ্চম মজলিস

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٧) كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ إِلاَّ الَّذِيْنَ عَاهَدتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○ (٨) كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبٰى قُلُوْبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ○ (٩) اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ (١٠) لاَ يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلاَ ذِمَّةً وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ○ (١١) فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

অর্থ : (৭) কিভাবে আল্লাহর নিকট ও তাঁর রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি বলবৎ থাকতে পারে? তবে মসজিদুল হারামের নিকট যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ, তার কথা ভিন্ন। অতএব, যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকে, তোমরাও তাদের সাথে সরলভাবে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ সংযমশীলদের পছন্দ করেন। (৮) কিভাবে বলবৎ থাকতে পারে, অথচ তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দিবে না। মুখে মুখে তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করে, অথচ তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। (৯) তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অল্পমূল্যে বিক্রয় করে, তারপর আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাঁধা প্রদান করে। নিশ্চয় তারা যা করছে, তা অতি নিকৃষ্ট। (১০) তারা কোন মু'মিনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের মর্যাদা দেয় না। আর তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। (১১) অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই। আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য বিধানসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি।

উল্লেখিত প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِه বলে নেতিবাচক প্রশ্ন করে বলেন, মুশরিকদের কোন চুক্তিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট বলবৎ থাকতে পারে না। ধর্মের রীতি নয়, যুক্তিগ্রাহ্যও নয় যে, মুশরিকদের সাথে কোন চুক্তিতে বা প্রতিশ্রুতিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আবদ্ধ হবেন। এটা হতে পারে না।

এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে মুশরিকদের সাথে, ইহুদীদের সাথে এবং আহলে কিতাবদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে অনুমতি দিয়েছিলেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহর অনুমতিক্রমে মক্কায় মুশরিকদের সাথে, মদীনায় ইহুদী ও আহলে কিতাবদের সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন! তাহলে উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নেতিবাচক প্রশ্নের মাধ্যমে কীভাবে মুশরিকদের সাথে চুক্তির বিষয়টি উপেক্ষা করতে চাচ্ছেন?

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে, আমরা সবাই জানি যে, ইসলাম একটি বাস্তববাদী বিপ্লবী ধর্ম। পরিস্থিতির মুকাবেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ সামগ্রী নিয়েই সে অগ্রসর হয়। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, এক রাতে বা একদিনে মানুষ বদলে যায় না। ধীরে ধীরে মন-মনন, চিন্তা-চেতনা ও আদর্শে পরিবর্তন ঘটাতে হয়। ইসলাম হল পৃথিবীতে মানব জীবনের জন্য এক অনন্য-অনুপম আদর্শ। আর মানব সমাজ কখনো একটি বক্তৃতার মাধ্যমে বা একটি বুতামে টিপ দেয়ার সাথে সাথে বদলে যায় না। বরং এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময়। এ কারণে ইসলাম মক্কায় জিহাদকে হারাম করেছে। নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আর ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে।

হিজরতের পর যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হল। ইসলামের তরু ধীরে ধীরে মাটির গভীরে তার শিকড় ছড়িয়ে আলো-বাতাসে ডালপালা ছেড়ে মজবুত হতে লাগল, তখন আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে অনুমতি দিলেন, যেন ইহুদীদের সাথে নিরাপদে সহাবস্থানের স্বার্থে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হন, যেন ইসলাম নিরুপদ্রব সময়-সুযোগ পেয়ে নির্বিঘ্নে শক্তি অর্জন করতে পারে। আর বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শনও এটা যে, যারা যুদ্ধ করছে না, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যারা যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসছে এবং যারা নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর, তাদের সাথে প্রবলভাবে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া। রাসূল তা-ই করলেন, মুশরিকদের সাথে প্রবলভাবে যুদ্ধ করার জন্য তিনি মদীনার ইহুদীদের সাথে চুক্তি করলেন। শান্তিচুক্তি- আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। তোমরাও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। আর আমাদের মাঝে উরওয়া ইবনে মাসউদ রইল। সে-ই উভয় পক্ষের হয়ে কাজ করবে। এমনকি আমাদের কেউ কাউকে হত্যা করলে অর্থাৎ যদি কোন ইহুদী কোন আরবকে হত্যা করে, তাহলে তোমরা তার দিয়্যাত অর্থাৎ রক্তপণ প্রদানে অংশগ্রহণ করবে। তেমনিভাবে তোমরা রক্তপণ প্রদানে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবে। রাসূল এ চুক্তিতে কেন আবদ্ধ হলেন? বড় শত্রুর সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার লক্ষ্যে। রাসূলের সাথে আর ক'জন লোক ছিল? খুব বেশি হলে পাঁচশত। তাই ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি করা ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না। তাই তিনি ভাবলেন, কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারলে এবং ইসলামী দাওয়াতের পথে জেঁকে বসা এই পাহাড়ের মূল উপড়ে ফেলতে পারলে পরবর্তীতে ছোট ছোট পাথরগুলোকে উড়িয়ে দেয়া সহজ হবে।

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন। এরপর রাসূল মুশরিকদের সাথে বদরে যুদ্ধ করলেন, উহুদে যুদ্ধ করলেন এবং খন্দকের যুদ্ধে গিয়ে তার পরিসমাপ্তি হল। সে যুদ্ধে সা'আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ) আক্রান্ত হলে আল্লাহর নিকট দু'আ করে বললেন–

اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبين قريش فذني إليك ولا تمتني حتى تقر عيني من قريظة —

"হে আল্লাহ! যদি আমাদের কুরাইশদের মাঝে যুদ্ধের অবসান ঘটে থাকে, তাহলে আমাকে আপনার নিকট তুলে নিন আর বনু কুরাইজার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল হওয়া পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করুন।"

অপর দিকে আরবের সম্মিলিত মুশরিক বাহিনী যখন মদীনার অবরোধ তুলে মক্কায় ফিরে গেল, তখন রাসূল (সাঃ) বললেন–

الآن نغزوهم و لا يغزوننا —

"আজ থেকে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না।"

সা'আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ)-এর অর্ধেক দু'আ কবুল হল। বাকি অর্ধেকও আল্লাহ কবুল করলেন। আরবের সম্মিলিত বাহিনী যখন মদীনায় আক্রমণ করেছিল, তখন বনু কুরাইজা বিশ্বাসঘাতকতা করে কাফিরদের পক্ষ নিয়েছিল। মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তির কোনই পরওয়া করেনি। তাই যুদ্ধ শেষেই আল্লাহ তা'আলা বনূ কুরাইজাকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। মুসলমানদের আক্রমণের কথা জানতে পেরে তারা দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলমানরা দুর্গ অবরোধ করে। পরিশেষে তারা সা'আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ)-এর ফয়সালা মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতিতে আত্মসমর্পণ করে। কারণ, সা'আদ ইবনে মুযায় (রাঃ) ছিলেন আউস গোত্রের সরদার আর আউস গোত্রের সাথে তারা দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী মানুষ। বীরত্বের প্রতীক। তাই বনূ কুরাইজা ধারণা করল, যদি তারা সা'আদ ইবনে মুয়াযের ফয়সালা মেনে নেয়ার শর্তে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে হয়তো তিনি তাদের সাথে কোমল আচরণ করবেন। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের পরিচয় দিবেন। তারা সা'আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ) কে বললেন, আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে ন্যায় বিচার করুন। সা'আদ (রাঃ) বললেন–

لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم ، أحكم فيهم أن تقتل مقاتلهم و تسبى نساءهم و ذراريهم –

"নিশ্চয়ই সা'আদের সময় এসেছে যে, আল্লাহর ব্যাপারে কেউ তাকে তিরস্কার করবে না। আমি তাদের ব্যাপারে ফয়সালা করছি, তাদের যুদ্ধে সক্ষম পুরুষদের হত্যা করা হবে আর নারী ও শিশুদের গোলাম বানানো হবে।"

সা'আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ)-এর ফয়সালা শুনে রাসূল বিমুগ্ধ হয়ে বললেন–

لقد حكمت فيهم حكم الله من فوق سبع أرقعة –

"সপ্ত আকাশের উপরে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ যে ফয়সালা করেছিলেন, তুমি সেই ফয়সালাই করলে।"

এর কারণ বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে কুদসীতে বলেছেন–

لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه ألذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه و لئن استعاذني لأعيذنه —

"নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। আর আমি যখন তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে; আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে; আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে হাঁটে; যদি সে আমার নিকট কিছু চায়, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দান করি।"

সা'আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ) ছিলেন রাসূলের একজন প্রিয় সাহাবী, আল্লাহর মাহবুব বান্দা। তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন, যেন আল্লাহ তা'আলা বনু কুরাইজার ব্যাপারে তার চক্ষুকে শীতল করেন। আর আল্লাহ তার দু'আ সাথে সাথে কবুল করলেন।

ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বহন করে নিয়ে চললেন। তিনি বিশাল দেহের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বহনের সময় তিনি হয়ে গেলেন একেবারে হাল্কা। মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগল, এত একেবারেই হাল্কা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা শুনে বললেন–

إن له حملة غيركم ... إن له حملة غيركم ...

"নিশ্চয় তোমাদের ছাড়াও তাঁর বহনকারী রয়েছে, নিশ্চয় তোমাদের ছাড়াও তাঁর বহনকারী রয়েছে।"

রাসূল আরো বললেন–

اهتز عرش الرحمن لموت سعد —

"সা'আদের বিয়োগ বেদনায় দয়াময় আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে।"

সুবহানাল্লাহ! আরশ কেঁপে উঠেছে! সেই বিশাল আরশ, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ما السموات السبع و الكرسي إلا كدراهم سبعة ترس و ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاة —

"একটি ঢালে সাতটি দেরহাম রাখলে যা হয়, সপ্ত আকাশ ও কুরসী ঠিক তেমনি। আর আরশের তুলনায় কুরসী হল দিগন্ত বিস্তৃত মরুর বুকের একটি বর্ম।"

এই সুবিশাল আরশ একজন সাহাবীর মৃত্যুতে কেঁপে উঠেছে। তিনি কত বিরাট! কত মহান, কত সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন।

জর্দানের এক সবুজ শ্যামল অঞ্চল দূমাতুল জান্দাল। শাসক আকয়াদার। একবার সে জিযিয়ার বস্তুর সাথে কিছু মিহি কাপড় প্রদান করল। হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) তা নিয়ে এলেন। সাহাবীরা এত মিহি কাপড়

আর কখনো দেখেননি। দেখবেনইবা কিভাবে। তাঁরা তো বকরীর চামড়া পরিধান করতে অভ্যস্ত। তাঁরা সেই কাপড়গুলো ধরে ধরে বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থা দেখে বললেন–

أتعجبون من رقة هذا؟لمنادل سعد بن معاذ في الجنة أرق من هذا —

অর্থ : "তোমরা এই মিহি কাপড় দেখে বিস্মিত হচ্ছ! অথচ জান্নাতে সা'আদ ইবনে মুয়ায (রাঃ)-এর রুমাল এর চেয়ে বেশি মিহি।"

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা আজ থেকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। এর পরের বৎসরই অর্থাৎ ৬ষ্ঠ হিজরীর জ্বিলকদ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সাহাবীদের নিয়ে মক্কায় গেলেন। কুরাইশরা মক্কায় প্রবেশ করতে বাঁধা প্রদান করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন–

يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، وماذا عليهم لو خلوا بيني و بين العرب فإنهم أصابوني ، كأن لهم الذي أرادوا وإن كان لنا الظفر دخلوا في الإسلام وافرين مستريحين و لم يقتل منهم أحد، فواالذي نبفسي بيده لا أزال على هذا الأمر حتى يظهره الله أو تنفرد هذا السالفة —

"হায় কুরাইশের ধ্বংস! যুদ্ধ তাদের শেষ করে ফেলল। তাদের কি অসুবিধা হত, যদি তারা আমার ও আরবদের মাঝে পথ উন্মুক্ত করে দিত! এরপর যদি আরবরা আমার ক্ষতি করত, আমাকে হত্যা করত, তাহলে তো তাদের ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হত। আর যদি আমরা বিজয় লাভ করতাম, তাহলে তারা নির্বিঘ্নে হৃষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করত। তাদের কেউ নিহত হত না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, আমি এই ধর্ম মতে অবিচল থাকব। হয় তাকে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, না হয় আমার শির ছিন্ন হয়ে যাবে।"

যেসব রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা ঐসব যুবকের পিছু নিয়েছেন, যারা আফগানিস্তানে জিহাদের জন্য যায়, আমরা তাদের বলছি, আফগানিস্তানের ব্যাপারে তারা মাথা না ঘামালে তাদের ক্ষতি কি? যদি ঐসব যুবক আফগানিস্তানে নিহত হয়, তবে তো তারা যা চাচ্ছে, তা হয়েই যাচ্ছে। আর যারা বেঁচে থাকে, তাদের অধিকাংশই হাত কাঁটা, পা কাঁটা, অন্ধ ইত্যাদি। সুতরাং এদের পিছু নেয়ার তো কোন দরকার নেই।

হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি করলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্ধিটি অপমানজনক হলেও আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্পষ্ট বিজয় রূপে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ○

অর্থ : "নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় সাহাবীদের মাঝে অনেকেই তা সহজে মেনে নিতে পারেননি। এ অসম অপমানজনক সন্ধিতে তারা রাজি ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দূরদর্শী। তদুপরি তিনি আল্লাহ তা'আলার দিক-নির্দেশনায় চলতেন। তাই তিনি তাতে বিজয় দেখতে পেয়েছিলেন।

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়। তখন বাই'আতে রিজওয়ানে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র চৌদ্দশ'। সন্ধি হওয়ার পরে যখন কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল, তখন আরবের লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। কারণ, মানুষ এত দিন কুরাইশদের ভয়ে নিশ্চল ছিল। আর কুরাইশরা যখন সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হল, মানুষ বলাবলি শুরু করল, এবার সুযোগ এসেছে। এই সুযোগে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল।

এর পরের বিষয়টি চিন্তা করা দরকার। হুদাইবিয়ার সন্ধির মাত্র একুশ মাস পর মক্কা বিজয় হয়। আর তখন তাতে দশ হাজার সাহাবী অংশ গ্রহণ করেন। তাহলে এবার চিন্তা করুন, এই একুশ মাসে কত হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। নয় হাজার পাঁচশ' বা নয় হাজার ছয়শ'। নিরাপত্তার হাওয়া বইতে শুরু করলে অবস্থা এমনই হয়।

আচ্ছা, তুমি বলতে পার, সমাজে অনেক মানুষ আছে, যারা তোমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তোমার কল্যাণ কামনা করে, কিন্তু প্রশাসন যখন তোমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তখন তোমাকে সাহায্য-সহায়তা করতে ভয় পায়। এটা কেন হয়?

একবার সাইয়্যেদ কুতুব ও তাঁর পরিবারের উপর মিসরের প্রশাসন দারুণ ক্ষেপে গেল। তখন কেউ তাদেরকে এক দেরহাম পর্যন্ত ঋণ দিতে সাহস করত না। আমি নিজে তাদের বলতে শুনেছি, "সময়ের পরিবর্তনে লোকেরা আমাদের অপরিচিত হয়ে গেছে। কয়েকজন লোকের নিকট ঋণ আনতে গেলাম। তাঁরা বলল, আমরা আপনাদেরকে চিনি না। আমাদের নিকট আসবেন না। আমরাও যাব না।" তারা এতো অন্তরঙ্গ সাথী হওয়া সত্ত্বেও ঋণ দিতে সাহস করল না।

মানুষের মাঝে প্রশাসনের যে কী প্রভাব ও ভীতি থাকে, তা চিন্তাও করতে পারবে না। মিসরের ঘটনা। এক ব্যক্তি কফি বারে বানরের খেলা দেখিয়ে উপার্জন করত। একবার কফি বারে আত্মগোপনকারী কয়েকজন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যকে গ্রেফতার করতে এল গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা। গোয়েন্দাদের দেখে মানুষ পালিয়ে গেল। বানরও পালিয়ে গেল। কিন্তু দু'-একটি বানর ধরা পড়ল। গোয়েন্দা পুলিশ বানরগুলোকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, জেলের ভয়ে সবাই পালিয়ে গেল, তোদের কি হল? পালাতে পারলি না? ছয় মাস তোদের সামরিক জেলে রাখব। তারপর নিশ্চিত হব, তোরা বানর না বনী-আদম।

গোয়েন্দা পুলিশের আক্রমণ ও নির্যাতনে শুধু মুসলমানরাই নিপীড়িত হয়নি। খ্রিস্টানরাও রক্ষা পায়নি। বহু খ্রিস্টানকে জেলে বন্দী করে ছয় মাস পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হয়েছে। ছয় মাস পর গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়েছে যে, তারা খ্রিস্টান।

একটি মজার ঘটনা শুনবে? মিসরীরা খনন কাজ করতে করতে একদা এক বিরাট ফলক পেল। ফলকে কী সব লেখা কেউ বুঝে না। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা কেউ সে লেখার মর্ম উদ্ধার করতে পারল না। প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসের বলল, আমি জানতে চাই এই ফলকে কি লেখা আছে! কোন ফেরআউনের শাসনামলের এই লেখা। এটা আমাদের ইতিহাস, আমাদের ঐতিহ্য। অবশ্যই তা উদ্ধার করতে হবে। তারপর ফলকটি সালেহ নাসেরের নিকট পাঠিয়ে দিল। পরের দিনই আব্দুন নাসেরের সাথে টেলিফোনে সালেহ নাসের যোগাযোগ করল। বলল, এটা দ্বিতীয় রামেসীস-এর শাসনামলের ফলক। আব্দুন নাসের তাকে জিজ্ঞেস করল, এত-এত প্রত্নতত্ত্ববিদরা এটা উদ্ধার করতে পারল না আর আপনি তা উদ্ধার করে ফেললেন! কীভাবে তা সম্ভব হল? উত্তরে তিনি বললেন, শাস্তির ভয়ে কিছু বলতেই হল।

আসল কথা হল, প্রশাসনের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে তুমি প্রশাসনের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তোমাকে মৃত্যুর জন্য অথবা জানে-মালে কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আর তোমার সাথে যারা থাকবে, তাদেরও এই একই পরিণতি ভোগ করতে হবে। আর ভাগ্যক্রমে যদি তোমার হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত হয়, তখন তুমিও সেই তোমার পূর্ববর্তীদের মতই হয়ে যাবে' কাউকে জীবিত ছাড়বে না। কারো প্রতি দয়া দেখাবে না।

শাইখ মুহাম্মদ নাজীব মুতীরীকে আল্লাহ রহম করুন। ফিকাহ শাস্ত্রের ঐ কিতাবটিকে তিনি পূর্ণতা দান করেছিলেন, যা সাত শত বৎসর ধরে অসম্পূর্ণ পড়ে ছিল। তিনি তাকে পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গীন ফিকাহ গ্রন্থ হিসেবে জগতবাসীর সামনে পেশ করেছিলেন। একবার তাকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে দিল। তিনিও আব্দুন নাসেরের একই জেলার লোক ছিলেন। জেদ্দায় থাকতেন। দু'বৎসর আগে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি

আমাকে বলেছেন– গোয়েন্দা পুলিশরা এসে আমাকে গ্রেফতার করে জেলে দিল। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, কী হচ্ছে? আমার এই শাস্তি কেন? পুলিশের লোকেরা বলল, তোমার প্রতিবেশী এক ইখওয়ান সদস্য থেকে তুমি গাড়ি ক্রয় করেছ। আমি বললাম, বাহ, তাতে কী দোষ হল। তারা বলল, তোমার এই প্রতিবেশী তোমাকে সালাম দিয়েছিল আর তুমি তার উত্তর দিয়েছিলে। আমি বললাম, বাহ, এটাও একটা অপরাধ! তারা বলল, এটাই তোমার অপরাধ। তিনি আমাকে বলেছেন– আল্লাহর কসম করে বলছি, এই অপরাধে তারা আমাকে দুই বৎসর জেলে রাখল। রাতে আমার সেলে এক বিরাট সাপ ছুড়ে দেয়া হত। সেটা আমার মাথার ওপর, আমার পেটের ওপর খেলত। এ শাস্তি শুধু মাত্র এই অপরাধের কারণে দেয়া হল যে, সে তাঁর প্রতিবেশী এক ইখওয়ান সদস্যের গাড়ি ক্রয় করেছিল। সেই প্রতিবেশী তাকে সালাম দিয়েছিল। আর তিনি তার সালামের উত্তর দিয়েছিলেন।

দেশের এ ধরনের কঠিন পরিস্থিতিতে কে তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে? কে এমন দুঃসাহস দেখাবে? কেউ তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। এ ধরনের বহু ঘটনা আছে, যা বলে শেষ করা যাবে না।

একবার আমি কুয়েতে গেলাম। জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলল, আমাদের এখানে এক ব্যক্তি বহু বৎসর যাবৎ আত্মগোপন করে চাকরি করছে। মিসরে যখন ইখওয়ান সদস্যদের গ্রেফতার শুরু হল, তখন এক মিসরী লুকিয়ে অন্য দেশের গ্রামে চলে যায় এবং কৃষিকাজ করতে থাকে। তার পরিবারের লোকেরা মনে করল, সে বন্দী হয়ে জেলে নিহত হয়েছে।

লোকটি আঠার বৎসর নিরুদ্দেশ রইল। তার দাড়ি পেকে গেল। চেহারা ভেঙে গেল। আঠার বৎসর সে কৃষিকাজ করল। সতের বৎসর পর আনোয়ার সাদাত ইখওয়ান সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করল। আঠার বৎসর পর লোকটি ফিরে গেল। বাড়িতে পৌঁছে দরজায় আওয়াজ দিল। তার ছেলেরা তখন বড় হয়ে গেছে। যে ছেলেটিকে সে এক বৎসরের দেখে গিয়েছিল, সে এখন বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। আর সাত বৎসরের ছেলের বয়স এখন পঁচিশ। একজন যুবক বেরিয়ে এল। সে তাকে বলল, হে ছেলে! তোমার আম্মা কি ঘরে আছে? যুবক বলল, আরে! এ কেমন কথা বলছ হে! আমার আম্মা তো কারো সাথে দেখা করেন না। সে বলল, আরে, যাও না, তাকে আমার কথা শুনতে বল। ছেলে বলল, না তা হবে না। লোকটি বলল, তার সাথে আমার খুব জরুরি কথা আছে। তাঁর সাথে কথা বলতেই হবে। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর সে ঘরে প্রবেশ করে যুবককে বলল, আমি তোমার পিতা। যুবক বলল, আমার পিতা আঠার বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। যুবক তার মায়ের নিকট গিয়ে বলল, আম্মা! একজন লোক এসেছে। বলছে, তিনি নাকি আমার পিতা। আপনি না বলেছেন– আমাদের পিতা ইন্তেকাল করেছেন। তারপর মহিলাটি তার দিকে তাকিয়েই চিনে ফেলল যে, ইনিই তার স্বামী।

সুতরাং, রাষ্ট্রের পরিস্থিতি যখন এমন ভয়াবহ হয়, তখন কে এসে তোমার পাশে দাঁড়াবে? কে তোমার জন্য, তোমার পরিবারের জন্য এক টুকরো রুটি পাঠাবে?

মুহাম্মদ আওদানের কথা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। তার উপর কেমন নির্যাতন করা হয়েছিল শুনো! তার সেলে চব্বিশটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর রাখা হয়েছিল। আমি একজনকে বলতে শুনেছি, তবে সে কথার সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত। তাঁর অপরাধ হল, ইখওয়ানের এক কর্মী বন্দী হলে তার বিপর্যস্ত পরিবারকে তিনি দশ ছা' (এক ছা-তিন সের ছয় ছটাক) খাবার দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। ব্যস, এই অপরাধে তার কী কঠিন শাস্তি হল।

একবার এক সরকারী প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। তার শিরোনাম ছিল, 'মিসরে কিভাবে ইসলামী আন্দোলন দমন করা যায়।' তাতে যারা স্বাক্ষর করেছিল, তারা হল, হাসান তুহান, আমেরিকার রাষ্ট্রদূত, ইসরাইলী

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি, আমেরিকান পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সচিব। সেই প্রতিবেদনে লিখিত ছিল, প্রত্যেক ইখওয়ান কর্মীকে তার নিকটাত্মীয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। অর্থাৎ পিতা-মাতা, ভাই-বোন কেউ যেন কোন ইখওয়ান কর্মীকে সাহায্য করতে এগিয়ে না আসে সে ব্যবস্থা করতে হবে। এ কারণেই অত্যন্ত আপনজনও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর সাহায্য ও সহায়তায় এগিয়ে আসতে সাহস পায়নি।

আন্তর্জাতিক অবস্থাও আজ এমনই আকার ধারণ করেছে। কোন দেশে ইসলামী বিপ্লব হলে, তার বিরুদ্ধে মোড়ল রাষ্ট্রগুলো এক সারিতে এসে দাঁড়াবে। বয়কট শুরু করবে নানা ছুতোয়। অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করবে। সাহায্য প্রদান বন্ধ করে দিবে। সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করে গোটা দুনিয়া থেকে তাকে একঘরে করে ফেলবে। এ পরিস্থিতিতে ঈমান-আকীদা ও একই বিশ্বাসের এমন কিছু মানুষ যে আল্লাহর সৈনিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না তা নয়। তবে এদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন চরিত্রে আমরা এমনই দেখতে পাই। রাসূল কুরাইশদের সাথে সন্ধিচুক্তি করলেন। ঠিক তার পরপরই প্রায় দুই বৎসরে আট হাজার পাঁচ শত লোক ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে যখন মুসলমানরা কুরাইশদের পদানত করল এবং মক্কা বিজিত হল এবং এ বৎসর শাওয়াল মাসে হাওয়াযিনদের পরাজিত করল, তারপরই গোটা আরব থেকে মদীনায় প্রতিনিধি দল আসতে লাগল। দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ○ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا ○

অর্থ : যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর ধর্মে প্রবেশ করতে দেখবেন।

সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির কর্মীদের অবশ্যই কঠিন অবস্থার মুকাবিলা করতে হবে। নব্য জাহেলিয়্যাতের অত্যাচারে তাদের নিষ্পেষিত হতে হবে। তাই প্রথম ডাকেই সবাই দলে দলে এসে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হবে, জিহাদের রাজপথে এসে দাঁড়াবে এ ধরনের আশা করো না। প্রথমে তো শুধু তারাই এগিয়ে আসবে, যারা ইসলামের জন্য সর্বস্ব এমনকি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকবে।

অষ্টম হিজরীতে কুরাইশ ও হাওয়াযিনদের পরাজয়ের মাত্র দুই বৎসর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ করতে যান। তখন তাঁর সাথে এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবী হজ্জ পালন করেন। অথচ মক্কা বিজয়ের সময় তার সাথে মাত্র দশ হাজার সাহাবী ছিলেন। মাত্র দুই বৎসরে এক লাখ চৌদ্দ হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।

কিন্তু এই বিশাল সংখ্যার প্রেরণাদায়ী শক্তি ঐ এক হাজার ব্যক্তি, যারা উহুদে অংশগ্রহণ করেছিলেন অথবা ঐ চৌদ্দশ' ব্যক্তি, যারা বাই'আতে রিজওয়ানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এরাই ইসলামের শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ। এদেরকে কেন্দ্র করেই বিশ্বব্যাপি ইসলামী আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন–

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ○

অর্থ : "নিশ্চয় ইবরাহীম একটি জাতি ছিলেন।" (সূরা নাহল : ১২০)

অর্থাৎ তিনি একাই এমন মহান ব্যক্তি ছিলেন যে, তাকে কেন্দ্র করে একটি মহাজাতির সৃষ্টি হয়েছিল।

এক কবি চমৎকার বলেছেন–

وكم رجل يعد بألف رجل   وكم ألف تمر بلا عداد

“এমন কত লোক আছে, যাদের একজনকেই হাজার ধরা হয় আর এমন কত হাজার লোক আছে, যারা চলে যায় আর তারা হিসাবের বাইরে থেকে যায়।”

ইসলামী দাওয়াত একটি মিশনারি কাজ। এ কাজ পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হয়। কোন জাতি এক দিনে পরিবর্তিত হয়ে যায় না। জাতির মাঝে পরিবর্তন আনারও বিধান আছে। নীতিমালা আছে। মাত্র দশজন ব্যক্তির পক্ষে একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে। সময়ের অপেক্ষা করতে হবে। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। তুমি হয়তো ইবনে তাইমিয়া বা অন্য কারো ফতওয়া পড়ে জিহাদ করতে আফগানিস্তানে এলে। তুমি যদি তখনই কামনা কর, প্রথম দিনেই দেখতে চাও এবং ভাব, আলহামদুলিল্লাহ, গোটা আফগানিস্তানের মানুষ তো ফেরেশতা! এমন মনোভাব নিয়ে যদি তুমি আফগানিস্তানে আস তারপর হয়তো কাউকে দাড়ি মুণ্ডানো দেখলে বা কারো হাতে মদের বোতল দেখলে বা কাউকে হাশীশ পান করতে দেখলে, তুমি কিয়ামত ঘটিয়ে ছাড়বে। বলবে, আরে এখানের লোকেরা বহু খারাপ। শিরক, বিদা'আতে নিমগ্ন। আরো বহু বিশেষণে ভূষিত করবে। আমি বলব, তুমি এখনো ছোটই রয়ে গেছ, তোমাকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালা কী তা শিখতে হবে। ধীরে ধীরে তোমাকে অগ্রসর হতে হবে।

আমরা তো জোর গলায় বলে থাকি, মুসলিম জাতি কখনো কুফরের সামনে মাথা নত করে না। আমার চ্যালেঞ্জ, দুনিয়ার কোথাও এমন জাতি পাবে না– শুধু আফগানিস্তান-ই এমন একটি দেশ যেখানে মানুষ মুখে কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েই অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে পড়তেই কুফরের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে পড়তেই মৃত্যুবরণ করে। তুমি এমন চরিত্রের মানুষ আফগানিস্তান ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পাবে? মাত্র তিনটি দিনও আমরা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি। আর আফগানিস্তানের লোকেরা দশটি বৎসর কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছে। আজ নয় বৎসর পর তুমি এসেছ তাদের সহায়তা করতে। প্রথম তাদেরকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে, দরদী মন নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। কবি বলেছেন–

لا خيل عنـــدك و لا مـــال   فليسعد النطق إن لم يسعد الحال

“তোমার নিকট সাহায্য করার ঘোড়াও নেই, ধন-সম্পদও নেই। যদি তুমি তাদের বস্তুগত সহায়তা করতে না পারলে, তাহলে অন্তত মৌখিকভাবে তাদের সাহায্য সহায়তা কর।”

তুমি তো নির্বোধ। এখনো বুঝছ না যে, গোটা পৃথিবীর কুফরী শক্তি আজ ভয়ে কাঁপছে। তারা আফগানিস্তানের যুদ্ধের পরিণতির দিকে তাকিয়ে আছে। দূর থেকে তারা পর্যবেক্ষণ করছে আর তওবা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জনৈক আরব মুজাহিদ একদা আফগানিস্তানের মুজাহিদ নেতা আহমদ শাহ মাসউদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আচ্ছা, আমরা শুধু ক্ষমতাসীন যালিম সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাচ্ছি। অথচ আমরা তাওহীদের পতাকা কেন উত্তোলন করছি না? কেন এই মাজারগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিচ্ছি না? অথচ হাজার হাজার মুসলমান এ কবরগুলোকে কেন্দ্র করে বিদ'আত ও শিরক-এ লিপ্ত!

তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তুমি মনে হয় জান না যে, যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় হদ (শরী'আতের নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ করা হয় না। এমন সময় যার উপর হদ প্রয়োগ করা হবে, সে কাফেরদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। সে কাফের হয়ে যাবে। তিনি সেই আরব মুজাহিদকে বলেছিলেন, কিছুটা সময় দাও। আমরা ইনশাআল্লাহ শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি চর্চা ও দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী রূপে গড়ে তুলব। যদি আমরা এখনই এই কবরগুলো ভাঙ্গতে শুরু করি, তাহলে তারা আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং সরকারী দলের সাথে গিয়ে মিলিত হবে।

তোমার মত অনেকেই জিহাদ করছে এবং তারাও তোমার মত ধারণাই লালন করছে। তারা অদূরদর্শী। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপক্কতা আসেনি। এ জিহাদের দূরবর্তী ফলাফল কী হবে, তারা তা জানে না। গোটা বিশ্বে তার কী প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে, তারা তা দেখছে না। তুমি জান না, আফগানিস্তানের এই জিহাদ গোটা বিশ্বের মুসলমানদের অন্তরে জিহাদের আগ্রহ ও বিজয়ের বিশ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছে। জিহাদের বিশ্বাসে তারা প্রতিপালিত হচ্ছে। জিহাদ করতে তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। আমরা এখানে বসে আছি। অথচ এ সময় তুমি মক্কায়, প্যারিসে, বৃটেনে, আমেরিকায় ও গ্রিসে বহু যুবককে পাবে, তারা জিহাদ সম্পর্কে লেখাপড়া করছে। কুরআনের আয়াত পড়ে পড়ে জিহাদের তত্ত্ব, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য শিখছে। অনেককে পাবে, জিহাদের বিভিন্ন কারামাতের কাহিনী পড়ে তাদের ঈমান ফিরে এসেছে। তারা বিশ্বাস করছে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন–

كيف يكون للمشركين عهد عند الله و عند رسوله۔

"কীভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট মুশরিকদের কোন প্রতিশ্রুতি থাকতে পারে?"

এ প্রশ্নটি নেতিবাচক প্রশ্ন। অর্থ ইসলামের বিজয় হওয়ার পর, মুসলমানদের শক্তি অর্জিত হওয়ার পর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট মুশরিকদের কোন প্রতিশ্রুতি বলবৎ থাকতে পারে না। এটা একেবারে অসম্ভব! তাই মুশরিকদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

আর ঐতিহাসিক বাস্তবতা হল, মুশরিকরা কখনো মুসলমানদের সাথে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। আর আকীদায় শিরক থাকা পর্যন্ত কিছুতেই তারা মুসলমানদের মেনে নিতে পারে না। সুতরাং নিঃসন্দেহে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবেই। আর আল্লাহ সূরা বাকারায় যে মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, তা স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সর্বদা অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ○

অর্থ : সম্ভব হলে তারা তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরানো পর্যন্ত তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। (সূরা বাকারা : ২১৭)

চিরকাল তারা আমাদের বিরুদ্ধে হিংসা পোষণ করবে। তার কারণ, আমরা মু'মিন। মু'মিন হওয়ার কারণেই তারা আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করছে। আমাদেরকে হিংসা করছে। এ ক্ষেত্রে মুশরিক, আহলে কিতাব ও অগ্নিপূজারী সবাই এক। তারা আমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করছে, কারণ, আমরা মু'মিন।

সূরা বুরুজের এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ○

অর্থ : পরম প্রশংসিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর উপর ঈমান আনার কারণেই তারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছে। (সূরা বুরুজ : ৮)

এটা তো আসহাবে উখদূদ এর ঘটনা। আর জাদুকররা ফেরআউনকে কী বলেছিল, তা শোন–

وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ○

অর্থ : আমাদের রবের নিদর্শন আমাদের নিকট যখন এসে গেছে, আমরা তাতে ঈমান এনেছি, এ কারণেই তুমি আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছ। হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দান কর এবং মুসলমান রূপে আমাদের মৃত্যুদান কর। (সূরা আরাফ : ১২৬)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ○

অর্থ : আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাবরা! আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, আর আমাদের নিকট ও আমাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছি, এ কারণেই তোমরা আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছ। আর তোমাদের অধিকাংশই পাপাচারে লিপ্ত। (সূরা মায়েদা : ৫৯)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের নির্যাতন ও নিপীড়নের দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন। এক. আমাদের ঈমান আনা। দুই. তাদের ফাসেক বা পাপাচারী হওয়া। তাহলে তারা কখন সন্তুষ্ট হবে? আমরা ঈমানহারা হলে অথবা তারা ফিসক ত্যাগ করলে। এটা কখনো হবে না। কারণ, তারা তাদের ফিসক ত্যাগ করার অর্থ মুসলমান হয়ে যাওয়া। তা কিছুতেই হতে পারবে না। আর আমরা ঈমান ত্যাগ করার অর্থ মুশরিক হয়ে যাওয়া। তাও তো কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং মুশরিকেদের সাথে যুদ্ধ চলতেই থাকবে।

তাই বলছি, যখন তোমরা আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন বা অন্য কোন ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের শত্রুকে দেখবে যে, কোন মুসলমানের ব্যাপারে তারা খুব সন্তুষ্ট, তাহলে তার ইসলাম ও ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ আছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এ বিষয়ের মূলনীতি ঘোষণা করেছেন, যা কখনো পরিবর্তিত হবার নয়। তা হল–

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ○

অর্থ : ইহুদী ও খ্রিস্টানরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মাবলম্বী হন।

তাই যখন তোমরা দেখবে যে, ইহুদীরা আনোয়ার সা'আদাতের উপর সন্তুষ্ট, তখন মনে করবে, আনোয়াত সা'আদাত ইসলাম ত্যাগ করেছে। আর যখন দেখবে যে, ইহুদীরা খালেদ ইস্তাম্বুলীর ফাঁসি চাচ্ছে, কেননা, সে আনোয়ার সা'আদাতকে হত্যা করেছে, তখন বুঝে নিবে, আনোয়ার সা'আদাত ইহুদী ছিল বটে।

অনেকে ধারণা করে যে, কর্নেল গাদ্দাফী কমিউনিস্টপন্থী এক সাহসী পুরুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যখনই তার ক্ষমতা নড়বড়ে হয়ে যায়, তখনই দ্রুত আমেরিকা তাকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে রক্ষার আয়োজন করে। হয়তো দেখা গেল, তার কিছু বিমান ধ্বংস করে দিল। কিছু লিবিয়ার অধিবাসী মৃত্যুবরণ করল। এ সব কিছুই পূর্বপরিকল্পিতভাবে ঘটে। ফলে গাদ্দাফীর ক্ষমতা টিকে যাচ্ছে। গোটা লিবিয়ায় রব উঠেছে, গাদ্দাফী একজন ইসলামী জাতীয়তাবাদী বীর পুরুষ। তার সপক্ষে মিছিলের পর মিছিল হতে থাকে।

হাফেজ আসাদ যখন ইখওয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, সে সময় যখনই তার অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যেত, ঠিক তখনই ইসরাইল বা আমেরিকা তাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসত। অথচ মুখে মুখে কিন্তু হাফেজ আসাদ ইসরাঈলের বিরুদ্ধে হুংকার ছুঁড়ছে। দেখা যাবে, ইসরাইল আরব বিশ্ব থেকে ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে নিতে আন্তর্জাতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করছে আর হাফেজ আসাদ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দিচ্ছে, লোবাননে ক্ষেপণাস্ত্র ছিল এবং থাকবে। ফলে আরব বিশ্বে ব্যাপক হৈ-হুল্লোড় শুরু হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ বুঝে নেয় যে, হাফেজ আসাদ জাতীয়তাবাদী বীর পুরুষ। অথচ ইখওয়ানরা বলছে, সে ইহুদীদের এজেন্ট। ইসরাঈলের স্বার্থ সংরক্ষণ করছে। কারণ, ইহুদী ও ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যারাই দাঁড়াতে চাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধেই সে তার শক্তি ব্যয় করছে। তাদের ধ্বংস করছে। তাই গাদ্দাফী আনোয়ার সাদাতের সমালোচনা করে। তার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে। ফলে আনোয়ার সা'আদাত গিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কার্টারকে বলল, গাদ্দাফী এক সন্ত্রাসী শাসক। আরব দেশগুলোতে নানা অপকর্ম করছে। কিন্তু কার্টার তাকে বলল, নিশ্চয় গাদ্দাফী আরব দেশগুলোতে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। কার্টারের কথা শুনে তো আনোয়ার সা'আদাত বিস্মিত। কিন্তু আমেরিকার বিরুদ্ধে তো তার কিছুই করার নেই। আসলে আমেরিকাই সকল নাটের গুরু।

ঠিক এ দিকটির দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ○

অর্থ : কিভাবে মুশরিকদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার বলবৎ থাকতে পারে; অথচ তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দিবে না। (সূরা তাওবা : ৮)

সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ) তাঁর তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন'-এ লিখেছেন, এ আয়াতের মর্ম স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে আমাদের ইতিহাস পড়তে হবে। মুসলমানদের সাথে কাফেরদের অবস্থান, পলিসি ও চারিত্রিক পরিবর্তনের ইতিহাস পড়তে হবে। তাহলেই কুরআনের এ আয়াতগুলোর প্রকৃত মর্ম আমরা উপলব্ধি করতে পারব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-চরিত অধ্যয়ন করলেই আমরা আরব উপদ্বীপের ঘটনাগুলো জানতে পারব।

'ফী যিলালিল কুরআন'-এ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে কাফেরদের যে চরিত্র ও অবস্থানের বিভিন্ন বিবরণ তিনি তুলে ধরেছেন, তা-ই এ আয়াতের মর্ম বুঝতে যথেষ্ট। আর এ চরিত্র ও অবস্থান শুধু কাফিরদের বেলায় নয়, বরং আহলে কিতাব ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বেলায়ও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য।

ইসলাম ও শিরকের এ লড়াই চিরন্তন। মুশরিকরা প্রত্যেক যুগে রাসূলদের সাথে কী আচরণ করেছে, তা সকলের জানা। হযরত নূহ (আঃ), হযরত হুদ (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে কাফিররা কি আচরণ করেছে, তা কম-বেশি সকলের জানা আছে। এ তো দূর অতীতের কথা। নিকট অতীতেও তা-ই ঘটেছে। বর্তমানেও তা-ই ঘটে চলছে।

মুশরিক তাতারীরা যখন বাগদাদের মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করেছিল, তখন তাদের সাথে কেমন নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ করেছিল। কীভাবে অসহায় মুসলমানদের হত্যা করেছিল। এ প্রসঙ্গে আবুল ফিদা ইবনে কাঁসীর (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে ৬৫৬ হিজরীর সেই ট্রাজেডির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা তুলে ধরছি–

তাঁরা শহরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, পৌঢ় যাকেই পেল নির্মমভাবে হত্যা করল। অনেকে কূপে, ঘাসের ঘরে বা ভাগারে গিয়ে আত্মগোপন করল এবং কয়েকদিন সেখানে লুকিয়ে রইল। বের হল না। দলে দলে মানুষ মজবুত উঁচু অট্টালিকায় গিয়ে আশ্রয় নিল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল। মোঘলরা দরজা ভেঙ্গে বা আগুনের মধ্য দিয়ে দৌড়ে গিয়ে তাতে প্রবেশ করল। মানুষ ভয়ে অট্টালিকার উঁচুতে গিয়ে বাঁচতে চাইল। কিন্তু তাতারীরা তাদের ছেড়ে দিল না। সেখানে গিয়ে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করল। তারপর অট্টালিকার ছাদের পানি নিষ্কাষণ পাইপ দিয়ে রক্তের ধারা রাস্তায় পড়ে রাস্তা ভেসে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সেদিন গোটা বাগদাদ শহর ছিল অরক্ষিত। মুসলমানরা মসজিদ-মাদ্রাসা, সরাইখানা কোথাও গিয়ে মুক্তি পায়নি। তবে ইহুদী-খ্রিস্টান জিম্মিরা এবং যারা তাদের নিকট আশ্রয় নিয়েছে, তারা নিরাপত্তা পেয়েছিল। আর যারা নিমকহারাম ওজীর আলকামী রাফেজীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, তারা রক্ষা পেয়েছিল। কিছু ব্যবসায়ী বহু অর্থের বিনিময়ে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। যে বাগদাদ ছিল জনবহুল শহর, তা জনশূন্য শহরে পরিণত হল। হাতেগোনা কিছু মানুষ ছাড়া বাগদাদে কোন মানুষ রইল না। আর যারা রইল তারা ভীত-সন্ত্রস্ত। বাগদাদের এই ট্রাজেডিতে কি পরিমাণ মুসলমান নিহত হয়েছিল, তা নিয়ে বিভিন্ন মত থাকলেও, লাখ লাখ মানুষ যে নিহত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কেউ বলেছেন– আট লাখ, কেউ বলেছেন দশ লাখ, কেউ বলেছেন বিশ লাখ।

এই মুশরিক মোঘলরা মহররম মাসের শেষদিকে বাগদাদ নগরে প্রবেশ করেছিল। তারপর থেকে ক্রমাগত চল্লিশ দিন পর্যন্ত তারা বাগদাদের মুসলমানদের হত্যা করেছে। খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহকে ১৪ সফর বুধবার হত্যা করা হয়েছিল। তার তিন ছেলে, তিন মেয়েকে হত্যা করা হয়েছিল। হত্যা করা হয়েছিল খলীফা পরিবারের গৃহশিক্ষক শাইখ মুহিউদ্দীন ইউসুফ ইবনে শাইখ আবুল ফজল ইবনে জাওবী (রহঃ)কে ও তার তিন

ছেলে আব্দুল্লাহ, আবদুল কাদের, আবদুল করীমকে। তারা শিয়া ইবনে আলকামীর ইশারায় হত্যা করেছিল খিলাফতের উচ্চপদস্থ লোকদের, মুজাহিদ উদ্দীন আইবেককে, শিহাবুদ্দীন সোলাইমান শাহকে। বাসভবন থেকে তুলে এনে প্রত্যেক উজীরকে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাসভবন থেকে এনে ভেড়া-ছাগলের ন্যায় হত্যা করা হয়েছিল। এভাবে হাজারো আলিম-উলামা, মসজিদ-মাদ্রাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছিল।

চল্লিশ দিন ধ্বংসলীলা চলার পর বাগদাদ হল এক বিরান নগরী। মানুষ নামের কোন প্রাণী খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাস্তাঘাটে টিলার ন্যায় মানুষের লাশ স্তূপ হয়েছিল। তারপর মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছিল। মানুষের লাশ পঁচে দুর্গন্ধে পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারপর মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল। সে এক ভয়াবহ মহামারি। এ দূষিত বায়ুর কারণে শামেও মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে সেখানেও হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল।

এই প্রলয় শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন নিরাপত্তার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, তখন ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে, ভাঙ্গা কবর থেকে ও অন্যান্য গোপন স্থান থেকে যারা বেরিয়ে এসেছিল, তাদের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। যেন কবর থেকে লাশ বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু মহামারির আক্রমণ থেকে তারাও রক্ষা পেল না। তারাও দু'এক দিনের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল।

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ○

অর্থ : কিভাবে মুশরিকদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার থাকতে পারে; অথচ তারা বিজয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা রক্ষা করবে না। (সূরা তাওবা : ৮)

কাফির-মুশরিকরা মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করলে যে কোন নীতি-নৈতিকতা, কোন আত্মীয়তা বা অঙ্গীকারের পরওয়া করে না, তা তো ৬৫৬ হিজরীতে মোঘল নরপশুদের দ্বারা বাগদাদ নগরী ধ্বংসের নির্মম ট্রাজেডির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এতো দূর অতীতের কথা। অতি নিকট অতীতের বিভিন্ন ট্রাজেডির মাধ্যমেও তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। পাকিস্তান ও ভারত বিভক্তির সময় মূর্তিপূজারী হিন্দুরা মুসলমানদেরকে যে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল, তা কিন্তু বাগদাদ ট্রাজেডির চেয়ে কম নয়। নয় মিলিয়ন মুসলমান তখন হিন্দুদের অত্যাচার ও আক্রমণ থেকে বাঁচার কোন উপায় না দেখে পাকিস্তানের পথে হিজরতের করেছিল, ভারতের একটি অতিপরিচিত উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর নির্মম আক্রমণে নিহত হতে হতে মাত্র তিন মিলিয়ন মুসলমান পাকিস্তানে পৌঁছতে পেরেছিল। বাকি পাঁচ মিলিয়ন মুসলমানকে পথে পথে আক্রমণ করে বকরি-ভেড়ার মত হত্যা করেছিল। মৃত লাশকেও তারা ছাড়েনি। তা বিকৃত করে অত্যন্ত বীভৎস অবস্থায় কাক-শকুনের খাবার হিসেবে ফেলে রেখেছিল।

ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির সময়কার একটি নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনলে তো চক্ষু অশ্রুসজল হতে বাধ্য। ভারত ও পাকিস্তান সরকার একমত হল যে, সরকারি চাকুরিজীবীরা স্বাধীন। তারা স্বেচ্ছায় পাকিস্তান যেতে চাইলে তাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আর ভারতে থাকলে তো নিজ চাকুরিতেই বহাল থাকবে। এ সিদ্ধান্তের আলোকে পঞ্চাশ হাজার সরকারি মুসলমান চাকুরিজীবী পাকিস্তান যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। তাদের নিয়ে দিল্লী থেকে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে একটি ট্রেন ছেড়ে যায়। ট্রেন বোঝাই হাজার হাজার যাত্রী। সে কি চাট্টিখানি কথা? ট্রেনটি ছুটতে ছুটতে যখন ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত খাইবার গিরিপথে প্রবেশ করল, তখন সশস্ত্র উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা জোরপূর্বক ট্রেনটি থামিয়ে দিল। তারপর শুরু করল হত্যালীলা। ওরা হিংস্র হায়েনার মত তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে এক বীভৎস নরকীয় কাণ্ড। রক্তে রক্তে ভেসে যায় ট্রেনের প্রতিটি কপার্টমেন্ট। নিরপরাধ মানুষগুলো সেদিন হিন্দু নরপশুদের হাতে নির্মমভাবে নিপীড়িত হয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছিল। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ○

অর্থ : কিভাবে মুশরিকদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার থাকতে পারে; অথচ তারা তোমাদের ওপর বিজয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা রক্ষা করবে না। (সূরা তাওবা : ৮)

এখানেই শেষ নয়, ইসলামের শত্রুদের মুসলমানদের ওপর এই হত্যাযজ্ঞ, এইরূপ নির্মম ট্র্যাজেডি সেই আদিকাল থেকে দেশে দেশে বিভিন্ন প্রকৃতিতে ঘটছে। এই তো কিছুদিন আগে চেঙ্গিসের প্রেতাত্মারা চীনের মুসলমানদের ওপর ঠিক একই কাণ্ড ঘটিয়েছে। রাশিয়ার কমিউনিস্টরা অসহায় মুসলমানদের সাথে যা করল, তা আরো জঘন্য, আরো বীভৎস। চীন ও রাশিয়ার মুসলিম বিদ্বেষী শাসকরা মাত্র পঁচিশ বৎসরে বিশ লক্ষ মুসলমানকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে।

এর চেয়ে আরো বিস্ময়কর ঘটনা শুনবে? রাশিয়ার কমিউনিস্টরা আফগানিস্তানে ছাগল-ভেড়ার মত মুসলমানদের হত্যা করার পরবর্তী বৎসর তারা আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের আয়োজন করে। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের ধর্মমন্ত্রীরা সে সম্মেলনে যোগদান করে। কিন্তু কেউ আফগানিস্তানের নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। আফগানিস্তানে রাশিয়ান লাল ফৌজদের অন্যায় দখলদারীর কোন প্রতিবাদ তারা জানাল না। বরং সবাই রাশিয়ার ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখল। আরব আমিরাতের ধর্মমন্ত্রী বললেন, রাশিয়াতে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মর্যাদা অক্ষুন্ন রয়েছে। কেউ কেউ পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিল, রাশিয়াতে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা বিদ্যমান। তবে একজন মানুষ, যিনি সাহসের সাথে সত্য উচ্চারণ করলেন। তিনি হলেন, রাবেতা আলমে ইসলামীর মহাসচিব শাইখ আব্দুল্লাহ নাসীফ। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার অনুলিপিটি কোথায়, যা দেখে আপনি ভাষণ দিবেন? তিনি বললেন, আমার কোন অনুলিপি নেই। তিনি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন–

"ইসলাম ছাড়া অন্য মতবাদ ও আদর্শে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকতে পারে না। হে রাশিয়ানরা! আমরা কীভাবে বিশ্বাস করব যে, তোমরা বিশ্বশান্তির প্রত্যাশী? তোমরাই তো আফগানিস্তানের নিরীহ মুসলমানদের নির্দয়ভাবে হত্যা করছ।"

তার বক্তৃতা শুনে মুসলিম বিশ্বের ধর্মমন্ত্রীরা চমকে গেল। এ লোকটি রাশিয়ায় অবস্থান করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কী বলছে! দারুণ সাহস তো! তিনি আরো বললেন, "আমরা তোমাদের কথা বিশ্বাস করব যদি তোমরা আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার কর।"

তিনি দীর্ঘ জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখলেন।

এরপর রুশ সরকারের অনুগত মুফতি খালুফ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করল। বলল, আমরা কামনা করি, আপনি আমাদের নেতৃবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি বললেন, আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার না করলে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ফেরার পথে মস্কো বিমানবন্দরে তাকে বিদায় জানানোর জন্য এক প্রতিনিধি দল আসল। তারা বলল, আমরা রাশিয়াতে রাবেতা আলমে ইসলামীর একটি শাখা অফিস খুলতে চাচ্ছি। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ অফিস খোলা হবে, তবে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের পরে।

মানুষ যখন সত্যবাদী হয়, তখন সে সবার চোখে সম্মানিত হয়। বরং কাফেরদের চোখেও সম্মানিত হয়। অন্যান্য মুসলিম দেশের ধর্মমন্ত্রীরা রাশিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রশংসা করে ফিরে এল। তারা সেই লেনিনের কবর যিয়ারত করে তাতে শুভেচ্ছাসূচক ফুলের তোড়া রাখল, যে লেনিন রাশিয়ায় নাস্তিক্যবাদের শাসন কায়েম করেছিল। কোন মুসলমানের পক্ষে ধর্মবিদ্বেষী নাস্তিক লেনিনের সমাধিতে শ্রদ্ধাভরে পুস্পস্তবক অর্পণ করা মোনাফেকী নয় তো কি?

তারেক ইবনে শিহাব বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে–

دخل رجل النار في ذبابة دخل رجل الجنة في ذبابة

"এক ব্যক্তি একটি মাছিকে কেন্দ্র করে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আরেক ব্যক্তি একটি মাছিকে কেন্দ্র করে জান্নাতে প্রবেশ করেছে।"

অর্থাৎ দুই ব্যক্তি এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন মূর্তিপূজা করছিল। সেই লোকেরা তাদের ধরে বলল, মূর্তির নামে কিছু উৎসর্গ না করলে তোমাদের কিছুতেই যেতে দিব না। একজন বলল, কিছুতেই তা পারব না। তারা বলল, একটি মাছি হলেও উৎসর্গ করতে হবে। লোকটি দৃঢ়তার সাথে এ প্রস্তাব অস্বীকার করল। তখন তারা সেই লোকটিকে হত্যা করল আর সে জান্নাতে গেল। আর অপর ব্যক্তি মাছি উৎসর্গ করার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল।

মুফতী সাহেবরা অনেক আগেই ফতওয়া দিয়েছেন যে, যদি কোন মুসলমান তার অগ্নিপূজারী প্রতিবেশীকে তাদের উৎসর্গের দিন একটি ডিমও উপহার দেয়, তবে সে কুফরী করল। যে সব মুসলমান খ্রিস্টানদের বড়দিনে একে অপরকে শুভেচ্ছা কার্ড বিনিময় করে তারা মুসলমান? তুমি কাফেরদের আনন্দ দিবসে আনন্দ প্রকাশ করছ; অথচ তারা সুযোগ পেলে হামলা করবে তোমার ওপর। তাদের চরিত্র অত্যন্ত হিংস্র। তারা মারমুখী। তারা নীতিহীন।

এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً يُرْضُوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبٰى قُلُوْبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

অর্থ : কীভাবে মুশরিকদের সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার থাকতে পারে; অথচ তারা তোমাদের ওপর বিজয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তা ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দিবে না। মুখে মুখে তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে। অথচ তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।

অমুসলিম কর্তৃক মুসলমানদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়নের ধারা চলছে সেই আদিকাল থেকে। মাঝে মাঝে তাদের নরকীয়তা সকল সীমা অতিক্রম করে, যা শুনলে শরীর শিউরে উঠে। হৃদয় ব্যাথায় নীল হয়ে যায়। এ বৎসরের একটি ঘটনা বলছি। চীনের তুর্কি এলাকায় এক মুসলিম নেতাকে ধরে আনার পর রাজপথে একটি গভীর গর্ত খনন করে তাকে তাতে ফেলে দেয়া হয়। তারপর মুসলমানদের মল-মূত্র এনে সেই নেতার ওপর নিক্ষেপ করতে বাধ্য করা হয়। এভাবে তিন দিন পর্যন্ত সেই নেতার ওপর মুসলমানদের পায়খানা ফেলল। অবশেষে সেই নেতা সেখানেই মৃত্যুবরণ করল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুগোশ্লাভিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের নির্মূল অভিযান শুরু হয়ে যায়। মাত্র কয়েক বৎসরে এক লক্ষ মুসলমানকে তারা শেষ করে দেয়। রাশিয়ার ককেশাস অঞ্চলের মুসলমানরা অর্থাৎ ইমাম শামিলের অনুসারীরা- যারা হিজরত করে জর্দানে এসেছিল, তারা বলেছে, লেনিন ও স্টালিনের সময় তাদের সৈন্যরা আমাদের সকল ফসল ছিনিয়ে নেয় এবং আমাদের বন্দী এবং অবরোধ করে রাখে। মানুষ ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে গাছপালা, লতাপাতা খাওয়া শুরু করল। কিন্তু যখন তাও পেল না, তখন মানুষ মানুষকে খাওয়া শুরু করল। মুমূর্ষ মরণোন্মুখ সন্তানকে মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর পিতা-মাতা খাবলে খাবলে খেয়ে নিমিষে শেষ করে ফেলত। স্বামী তার স্ত্রীর লাশ খেয়ে ফেলত। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিজনের গোশত খেয়েও তারা শেষ রক্ষা পায়নি। অবশেষে মৃত্যুর কোলেই ঢলে পড়তে হয়েছে। আর যারা জীবিত ছিল, তাদের ধরে ধরে আজারবাইজানে ফেলে আসত, যেখানে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায় অথবা সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে, যেখানে শীতকালে বরফে বরফে ঢেকে যায়। এভাবে ককেশাসের মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এভাবে আজারবাইজান ও সাইবেরিয়ায় কত লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। এত কিছুর পরও মুসলিম দেশের ধর্মমন্ত্রীরা বলে, রাশিয়ায়

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও শান্তির সুন্দরতম ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই হল মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের বোধ, বিশ্বাস ও সাহস। এই হল তাদের চরিত্র।

১৯৫৮ সালের কথা। তখন ফিলিস্তিনে যুদ্ধ চলছে। যুগোশ্লাভিয়ার মুজাহিদরা এল। তারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। জনৈক মুজাহিদ আমাকে বলেছে, আমাদেরকে হাজার হাজার ইহুদীর মাঝে ছেড়ে দেয়া হত। একবার আমি এক ঝাঁক ইহুদীর মাঝে পড়ে গেলাম। চারদিক থেকে বৃষ্টির মত বুলেট আসছে আর জ্যাকেটের ওপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে চলে যাচ্ছে। আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন কঠিন মুহূর্তে কী করে তুমি রক্ষা পেলে? একটি গুলিও তোমার শরীরে বিদ্ধ হল না যে? তখন তার কথা বিশ্বাস হয়নি। আফগানিস্তানে আসার পর আমার তা বিশ্বাস হয়েছে। সে বলেছে, আমি সূরা ফালাক, সূরা নাস ও সূরা ইখলাস পাঠ করতাম আর আয়াতুল কুরসী পড়ে শরীরে দম দিতাম। আর মাঝে মাঝে পড়তাম–

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض و لا في السماء و هو السميع العليم —

এভাবে দু'আ পড়তে পড়তে হাজার হাজার ইহুদীর মাঝে ঢুকে পড়তাম। তাদের হত্যা করে ফিরে আসতাম। অথচ আমার গায়ে একটি বুলেটের আঘাতও লাগত না। (সুবহানাল্লাহ)

১৯৪৮ সালে মসজিদে আকসা থেকে জর্দান তাদের প্রত্যাহার করে নিল এবং বাইতুল মুকাদ্দাসকে ইহুদীদের হাতে সমর্পণ করতে চাইল, তখন কিছু মুজাহিদ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তারা বলল, আমাদের লাশের ওপর দিয়ে ইহুদীদের বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের প্রাণ থাকতে বাইতুল মুকাদ্দাসে ইহুদীদের প্রবেশ করতে দিব না। তাদের একজন আমাকে বলেছে, আমরা সংখ্যায় একেবারে নগণ্য ছিলাম। বাইতুল মুকাদ্দাসের জানালাসমূহের চেয়ে আমাদের সংখ্যা কম ছিল। আমরা কখনো এই জানালা দিয়ে, কখনো ওই জানালা দিয়ে গুলি ছুঁড়তাম।

জর্দান সেনাবাহিনীর প্রধান আব্দুল্লাহ তালকে শাইখ আব্দুর রহমান বললেন, আরে! কীভাবে তোমরা বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিচ্ছ। আব্দুল্লাহ তাল বলল, এটাই ওপরের নির্দেশ। তখন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে শাইখ আব্দুর রহমান বললেন, বেশ তাহলে আমাকে দুই কার্টুন বোমা দাও আর কিছু বুলেট দাও। আমি তা নিয়ে মসজিদে আকসার আঙিনার ঐ কিনারায় উঠে বোমা ফেলব আর নিশ্চিন্তে গুলি করব। তারপর তোমরা আমার পরিণতি দেখ।

ঐ মুজাহিদ দলটি মসজিদে আকসায় রয়ে গেল। তারা জানালা দিয়ে গুলিবর্ষণ করতে লাগল। কখনো এই জানালা দিয়ে, কখনো ঐ জানালা দিয়ে। কিন্তু ইহুদীদের মসজিদে আকসায় ঢুকতে দিল না। এই ক্ষুদ্র একদল দুঃসাহসী মুজাহিদের কারণে বিশ বৎসর পর্যন্ত ইহুদীরা মসজিদে আকসায় প্রবেশ করতে পারল না। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থ : তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে অল্পমূল্য গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর পথে বাঁধাদান করেছে।

আমরা অনেক সময় আমাদের অজান্তেই আমাদের কথাবার্তা দ্বারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখি। এক আরব যুবকের ঘটনা। মাশাআল্লাহ যুবকটি ছিল দারুণ বুদ্ধিমান। তার আত্মমর্যাদাবোধ ছিল খুবই প্রখর। জিহাদের জযবায় ছিল অধীর। তার আদব-আখলাকও ছিল বেশ ভাল। সে আফগানিস্তানে এসে শাইখ জালালুদ্দীন হাক্কানী-এর ছাউনিতে গেল। বলল ঃ তাওয়াসসুল (আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য কাউকে মধ্যস্থ হিসেবে গ্রহণ করা) শিরক। শাইখ জালালুদ্দীন হাক্কানী বললেন ঃ না, তা হারাম। আরব মুজাহিদটি বলল ঃ না, তা শিরক। শাইখ বললেন : না, হারাম। অনেক মুজাহিদের উপস্থিতিতেই কথাবার্তা হচ্ছিল। আরব মুজাহিদটি

তখন বলল, আপনি যদি এটা মেনে না নেন যে তাওয়াসসুল শিরক, তাহলে আমি কিছুতেই আপনার সাথে এক ছাদের নীচে থাকব না। কিন্তু শাইখ জালালুদ্দীন হাক্কানী তার মতেই অটল রইলেন। ফলে আরব মুজাহিদটি তাকে ছেড়ে চলে গেল।

তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, আমরা যেন কখনো আমাদের কথার দ্বারা, আমল দ্বারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে না দেই। কখনো কারো কর্কশ কথার কারণে কোন মানুষ বিপদগামী জাহান্নামীও হয়ে যেতে পারে। ভেবে চিন্তে কথা বলতে হবে। আপনি একজন ইমাম। মানুষ আপনার নিকট হিদায়াত লাভের প্রত্যাশা করে। জান্নাতের আশায় থাকে। যদি এমন হয় যে, আপনার নিকট আপনার বিশ্রামের সময় এক ব্যক্তি এল। লোকটি বহু দূর থেকে এসেছে। আপনি কোন চিন্তা করলেন না, তাকে আগামীকাল দেখা করতে বললেন। হতে পারে লোকটি সত্যের সন্ধানে এসে আবার অন্ধকারে ফিরে গেছে। তাই তাকে একটু সময় দিন। তার সাথে একটু কথা বলুন।

অনেকে নিজেকে মুজাহিদ বলে জাহির করছে। অথচ সে মানুষকে জিহাদের ময়দান থেকে বিতাড়িত করছে। নিজের অজান্তে সে এই বিরাট পাপ কাজে লিপ্ত হচ্ছে। হয়তো দেখা গেল, কোন এক যুবক সৌদী, কুয়েত, কাতার বা জর্দান থেকে এল। দারুণ সাহসী। তুমি তার আগেই জিহাদে এসেছ। তোমাকে পেশোয়ারের এক পথে দেখে বলল, আরে ভাই! ভাল আছেন তো! আমি জিহাদে যাওয়ার জন্যে এসেছি; কোথায় গেলে ভাল হয়। তুমি বললে, আরে ভাই সে কথা বল না, আফগানের লোকেরা সব মুশরিক। সবাই বিদ'আতে লিপ্ত। ওদের নিকট গেলে ঈমানটাই হারাবে। সে হয়তো বলল, শুনেছি, আহমদ শাহ মাসউদ রুশদের সাথে লড়াই করছে। আল্লাহ তাকে বহু যুদ্ধে সাহায্য করেছেন। আমি তার সাথে জিহাদ করতে চাই। তুমি হয়তো বললে, আরে ভাই! আহমদ শাহ মাসউদের কথা বলছ? আরে সে তো ফ্রান্স আর আমেরিকার দালালি করছে। কুফরী শক্তির সাথে তার আঁতাত। এভাবে হয়তো তোমার সাথে কথা বলার পর সে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। তারপর আক্ষেপ করে বলতে লাগল, আহ, কী কষ্ট করেই না ভিসা করে পাকিস্তানে এসেছিলাম জিহাদ করতে। দূর ছাই, বিমান ভাড়ার টাকাগুলো ফকীর-মিসকিনকে দিয়ে দিলেই ভাল হত। সে এভাবে আফসোস করে অবশেষে ফিরে গেল। এভাবে আমরা মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখছি। আল্লাহ আমাদের রহম করুন। সত্য বোঝার ও ভুল সংশোধনের তাওফীক দিন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন−

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ○

অর্থ : যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথে বাঁধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের সকল কর্মকে ব্যর্থ করে দেন। (সূরা মুহাম্মদ : ১)

এখানে কুফরীর সমপর্যায়ের কাজ হিসেবে আল্লাহর পথে বাঁধা সৃষ্টি করাকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আল্লাহর পথে বাঁধা দান করার অর্থ হল, জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখা। কারণ, কোথাও যখন সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর পথ) শব্দটি শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন তার অর্থ হয় জিহাদ। অথচ কিছু লোক আছে তারা অনুধাবনও করতে পারে না যে, তারা জিহাদের পথে প্রদান করছে। কিছু লোক আছে তারা আফগানিস্তানের দোষ বর্ণনা করে বলে, আরে ভাই! রোযাদারদের ইফতার করাও। জিহাদ যেমন ফরযে আইন, ঠিক রোযাও ফরযে আইন। আমি বলব, হ্যাঁ, উভয়টির বিধান এক হলেও যে রোযা রাখে না তার গুনাহ, যে জিহাদ করে না তার গুনাহের চেয়ে কম। কারণ, জিহাদের উপকারিতা গোটা মুসলিম জাতি ভোগ করে আর রোযার উপকার শুধু নিজের জন্য। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন−

العدو الصائل الذي يفسد الدين و الدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه ـــ

"যে হানাদার-শত্রু দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি করে, ঈমানের পর তাকে প্রতিহত করাই হল প্রধান গুরুত্বপূর্ণ আমল।"

সুতরাং একজন মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল. 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পড়ে মু'মিন হওয়া। আর পরবর্তী দায়িত্ব হল জিহাদ করা। হানাদার শত্রুকে প্রতিহত করা।

রাশিয়ার কমিউনিস্টরা একটি মুসলিম দেশ আক্রমণ করে মা-বোনদের ইজ্জত-আব্রু ছিনিয়ে নিচ্ছে, নির্বিচারে হত্যা করছে। এরপরও কেউ যদি এসে জিজ্ঞাসা করে, ভাই! আফগানিস্তানের জিহাদ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তখন কোন কোন জ্ঞান-পাপী বলে, ঘরে বসে থাক, এখন নিরব থাকা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বেশি উপকারী। এটা তো ঐ ব্যক্তির কথার ন্যায় হল, যে বলল, আরে ভাই! রোযা তোমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে, এতে তোমার শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। অথচ আমরা চাচ্ছি তুমি সুস্থ্য থাক এবং শক্তি অর্জন কর। কারণ, আমরা তো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাচ্ছি। জিহাদ করতে চাচ্ছি। তাই রমযানে রোযা রেখ না। অথবা কেউ তোমার নিকট জিজ্ঞেস করল, ভাই! আমি কি রমযানের রোযা রাখব? তুমি তাকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করলে না বটে, তবে বললে, অমুক ব্যক্তি রোযা রাখল আর মরে গেল; অমুক ব্যক্তি রোযা রাখল আর অসুস্থ হয়ে পড়ল। এভাবে তাকে বুঝাতে চাচ্ছ, তুমিও রোযা রেখ না। অথবা কেউ তোমার নিকট এসে বলল, আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে এসেছি। তখন তুমি বললে, এখানে তো জিহাদ নয়- যুদ্ধ হচ্ছে। এখানে বিদ'আতের ছড়াছড়ি। অমুক ফ্রন্টের যোদ্ধারা শিরকে লিপ্ত আর অমুক ফ্রন্টের যোদ্ধারা কবর পূজায় মত্ত। আরে ভাই! এমন বলছ কেন? সোজা বলে দাও, এখানে জিহাদ করো না। তাহলে সে হয়ত আফগানিস্তান ছাড়া অন্য আর কোথাও জিহাদ করবে। অথবা কেউ এসে জিজ্ঞেস করল, আমি জিহাদে যাচ্ছি। তুমি বললে, পিতা-মাতার সেবা করা আফগানিস্তানে জিহাদ করার চেয়ে উত্তম। অথবা কেউ আফগানিস্তানে মুজাহিদদের বিজয়ের সংবাদ দিলে তুমি বললে, বাহ! তুমি তো এখনো খোকাটিই রয়ে গেলে। এ যুদ্ধের শেষ পরিণতি সম্পর্কে তোমার কিছু জানা আছে! এটা দুই পরাশক্তির যুদ্ধ। আমেরিকা ও রাশিয়ার যুদ্ধ। ও সব রেখে নিজের কাজ কর।

এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

صدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون

অর্থ : তারা আল্লাহর পথ থেকে বাঁধা প্রদান করে। তাদের এই কাজ কতই না নিকৃষ্ট।

অথবা কেউ এসে তোমাকে বলল, আমি জিহাদে যাচ্ছি। তুমি বললে, ভাই! আগে ইসলাম শিখ। তারপর জিহাদে অংশ নিও। বেশ, তুমি ভাল কথাই তাকে বলেছ। সে ইসলামের কী শিখবে? কি বুঝবে? ইসলাম সম্পর্কে তুমিই বা কয়টি কিতাব পড়েছ। সাহাবীরা এসে জিহাদ চলাকালীন অবস্থায় বলতেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু...। তখন তাদের কি বলা হত, তাফসীরে কুরতুবীটা শেষ করে নাও। বেদায়া নেহায়াটা পড়ে নাও। বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফতহুল বারীটা একবার দেখে নাও। এরপর জিহাদে যোগদানের কথা ভেব। প্রথম প্রথম সাহাবীরা শুধু মাত্র 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' কালিমাটাই জানতেন। তাই আবূ বকর বা উমর (রাঃ) বা অন্য কেউ হাদীস মুখস্থ করতে বসে যাননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة فأن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم و أموالهم —

"আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর সাক্ষ্য দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে। যদি তারা তা করে. তাহলে তারা আমার থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদকে হেফাজত করল।"

অনেকে বলে, আরে জিহাদ করবে! তার আগে তো রণকৌশল রপ্ত করে নিতে হবে। অস্ত্রশস্ত্রেরও তো প্রয়োজন হবে। আমি বলি, শত্রুপক্ষের ন্যায় আমাদের অত অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। বিমান বহর আর ট্যাংক বহরের প্রয়োজন নেই। যারা রোম আর পারস্য সাম্রাজ্য পদানত করেছে, তারা তো লবণ-কাফুরও ভালভাবে চিনত না। এ দু'টির মাঝে পার্থক্য করতে পারত না। তারা কিসরার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে কাফুর পেল। হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলল, এত কোমল এই লবণ! দুপুরে খাবার রান্না করার সময় তাতে কাফুর দিয়ে বলল, আহ কি চমৎকার লবণ। কিন্তু খাবার আর লবণাক্ত হল না।

এক যুদ্ধে এক বৃদ্ধা নারী বন্দী হল। বলল, আমি একজন বৃদ্ধা নারী। আমার জীবন-যৌবন বিগত হয়ে গেছে। আমাকে ছেড়ে দিন। যত দেরহাম চান দিব। বেদুইন বলল, এক হাজার দেরহাম দাও। বন্দী নারী তখন তাকে এক হাজার দেরহাম দিয়ে মুক্ত হয়ে গেল। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি আমার নিকট মাত্র এক হাজার দেরহাম চাইলেন! এর চেয়ে বেশি চাইলেন না কেন? বেদুইন বিস্মিত হয়ে বলল, কেন, হাজারের উর্ধ্বে কি কোন সংখ্যা আছে? এবার চিন্তা করে দেখুন, যারা হাজারের উর্ধ্বের সংখ্যা চিনে না, জানে না, তারা কী যুদ্ধ কৌশল জানত? কী সমর বিদ্যা তারা শিখেছিল?

অনেকে আবার বলে, জিহাদের পূর্বে দাওয়াত, দাওয়াতের পূর্বে জিহাদ হতে পারে না। আমি বলি, আমারও ঐ একই মত। তবে জিহাদের পূর্বে দাওয়াত তখনই হবে, যখন আমাদের দেশে আমাদের শাসন থাকবে। যখন মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রম লুটে নেয়া হবে না। মুসলমানদের নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে না। যত্রতত্র খুন করা হবে না। সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হবে না। আর যখন দুস্কৃতিকারী ঘরে প্রবেশ করে তোমার স্ত্রীর বিছানায় পৌঁছে যায়, আর যদি তুমি তখন বল, আমি আল্লাহর নিকট এই দুস্কৃতিকারীদের হেদায়েতের জন্য দু'আ করছি। তবে ডাকাত তোমার স্ত্রীর, তোমার বোনের, তোমার মেয়ের ইজ্জত লুটে নিয়ে নেবে। তুমি এর প্রতিকারের ব্যবস্থা না নিয়ে তাহাজ্জুদে লম্বা লম্বা আয়াত পড়তে পার কিন্তু তোমার পঠিত প্রত্যেকটি আয়াত তোমাকে অভিশাপ দিবে। আকাশের ফেরেশতা তোমাকে অভিশাপ দিবে। কেন তুমি মায়েদের-মেয়েদের ইজ্জত রক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে না। তোমার উপর তখন ফরজ ছিল, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করা বা নিজে নিহত হওয়া। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হল, তখন তুমি নফল আমলে লিপ্ত।

এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত যে, ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষা করা ফরজ। কোন মুসলিম নারীর জন্য শত্রুদের হাতে বন্দী হওয়া অপমানজনক এবং অবৈধ। বিশেষত তারা যদি জানে যে, শত্রুর হাতে বন্দীত্ববরণ করলে তাদের ইজ্জত ও সম্ভ্রম ছিনিয়ে নিবে। তখন তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের হত্যা করবে অথবা নিজে শহীদ হয়ে যাবে। এটাই ফরজ।

কুনাড়ের বীরাঙ্গনা নারীদের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। তারা যখন দেখল, রুশ সৈন্যরা নারীদের ধরে ট্যাংকের ভিতরে ঢুকাচ্ছে, তখন তাদের অধিকাংশই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইজ্জত রক্ষা করেছে। তাদের এই কাজটি শরী'আতের বিধান মোতাবেক হয়েছে। কারণ, জীবন রক্ষার চেয়ে ইজ্জত রক্ষার গুরুত্ব অনেক অনেক বেশি।

জনৈক কবি বলেন–

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى   حتى يراق على جوانبـــه الدم

"চতুষ্পার্শ্বে রক্তের ছড়াছড়ি দেখেও এবং নির্যাতন ও নিপীড়নের কারণেও কিছুতেই সে সুউচ্চ মর্যাদাকে সমর্পণ করবে না।"

তাই আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন–

كيف القرار و كيف يهدأ المسلم و المسلمات مع العدو المعتدي

القـــائلات إذا خشين فضيـــحة جهـــد المقالـــة ليتنا لم نولـــد

"কীভাবে একজন মুসলমান বসে থাকবে, আর কীভাবে নিশ্চিত থাকবে। অথচ মুসলমান নারীরা হানাদার শত্রুর শিবিরে বন্দী রয়েছে! তারা ইজ্জত-সম্ভ্রম হারানোর ভয় করছে। হায় আফসোস! যদি আমাদের জন্মই না হত!"

আর আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ○

অর্থ : তোমাদের কি হল, তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করছ না? অথচ দুর্বল নর-নারীরা আর শিশুরা প্রার্থনা করছে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! এই জনপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করুন। এর অধিবাসীরা যালিম। আর, আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন ওলি ও বন্ধু পাঠিয়ে দিন। আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী পাঠিয়ে দিন। (সূরা নিসা : ৭৫)

জনৈক কবি বলেন–

اتسبى المسلمات بكل ثغر   و عيش المسلمين إذا يطيب

أمـــا لله و الإسلام حق   يدافع عنه شبان و شيب

فقل لذوي البصائر حيث كانوا   أجيبوا و يحكم أجيبوا

"প্রত্যেক সীমান্তে কি মুসলিম নারীরা বন্দী হবে আর মুসলিম পুরুষরা ফূর্তিতে দিন কাটাবে? শুনে নাও! আল্লাহর শপথ করে বলছি। ইসলাম সত্য। যুবক-বৃদ্ধ সবাই তাকে রক্ষা করবে। সুতরাং দুনিয়ার সকল প্রান্তের লোকদের বলে দাও। ছি! ছি! তোমাদের কী হল, তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও। তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও।"

খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর কথা চিন্তা কর। একজন বন্দী মুসলিম নারীর আহাজারি তার নিকট পৌঁছল। সাথে সাথে সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে তাকে উদ্ধার করতে ছুটে গেল। এটা অনাবশ্যক বা বীরত্ব প্রকাশক কোন কাজ ছিল না। বরং এটা ছিল ফরজ। এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, যদি কোন মুসলিম নারীকে কাফেররা বন্দী করে নিয়ে যায়, তাহলে তাকে মুক্ত করে আনা পর্যন্ত সকল মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ থাকে। একটি কথা বলছি, খুব ভাল করে স্মরণ রাখবে। আধা-আলিমরাই ইসলামের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দেয়। তারা পুরোপুরি আলিমও নয় যে, ইলমের আলোকে ফতওয়া দিবে। আর অজ্ঞও নয় যে, এলেম অর্জন করবে।

ইমাম নববী একজন ফকীহ ছিলেন। ইসলামী ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যেসব শীর্ষস্থানীয় ফকীহদের নাম আমাদের হৃদয়পটে ভেসে উঠে, ইমাম নববী তাদের অন্যতম। সহীহ মুসলিমের তিনি সফল ব্যাখ্যাকার। তার রচিত 'আল মাজমূউ ফিল ফিকহ' কিতাবটি এক অনন্য ও অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর হয়ে আছে। তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, তার অনুরুপ অসাধারণ গ্রন্থ আর কেউ রচনা করেনি। তুমি যখন তার কোন কিতাব পাঠ করবে, তখন অবলীলাক্রমে অনুভব করবে, যেন স্বয়ং ইমাম নববী তোমার কাছে বর্ণনা করছেন।

এ সবকিছু সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন যাহেদ ও নির্মোহ ব্যক্তি। ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে বাঁধা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্যমী, দুঃসাহসী। ক্ষমতাসীন আমীর-উমারা ও গভর্নরদের তিনি বিন্দুমাত্র ভয় করতেন না।

এক রাতে তিনি লিখছিলেন। হঠাৎ বাতাসের প্রবল ঝাপটায় বাতি নিভে গেল। অমনি তার হাত উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে উঠল। এভাবে তিনি রাতের অন্ধকারে হাতের বিকিরিত অলৌকিক আলোতেই লিখতেন,

পড়াশোনা করতেন। সিরিয়া ও মিসরের আমীর জাহির বীরস এর সাথে একবার তাঁর দ্বন্দ্ব হয়েছিল। তিনি তার কাছে এ মর্মে ফতওয়া চেয়েছিলেন যেন শাম ও মিসরের লোকেরা জিহাদী ফান্ডে অর্থ প্রদান করে। সে অর্থ দ্বারা অস্ত্র কিনে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে। সেটা ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের কথা। তাতারীরা বাগদাদ ধ্বংস করার পর ফিলিস্তিন তথা শামের দিকে এগিয়ে আসছিল। তাই তিনি বিশিষ্ট আলেমদের কাছে ফতওয়া চেয়েছিলেন। সবাই ফতওয়া দিয়েছিল। কিন্তু ইমাম নববী ফতওয়া দিলেন না। বললেন, আমি এ ফতওয়া দেব না। আমীর জিজ্ঞেস করলেন, কেন দেবেন না? আমরা তো জনগণের দেয়া অর্থ দ্বারা অস্ত্র ক্রয় করে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আপনি কি দেখছেন না, মুসলমান ও ইসলাম উভয়টি এখন ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন!

ইমাম নববী তখন ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তা ঠিক। কিন্তু আপনি এক দাসের বেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ছিলেন কপর্দকশূন্য। ধন-সম্পদ আপনার আদৌ ছিল না। অথচ, এখন আপনার মালিকানায় রয়েছে বহু সম্পদ। বাগ-বাগিচা, গোলাম-বাঁদি, স্বর্ণ-অলংকার, অর্থসহ বহু সম্পদের আপনি এখন মালিক। সে সব জিহাদের ফান্ডে দান করুন। তারপর যদি আরো সম্পদের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি ফতওয়া দেব। আমীর বললেন, তুমি শাম থেকে বেরিয়ে যাও। ইমাম নববী (রহঃ) তখন শাম থেকে চলে এলেন এবং নাওয়া পল্লীতে এসে বসবাস শুরু করলেন। আলিম-ওলামা আমীর জাহির বীরস এর নিকট এসে বলল, মুহিউদ্দীন নববী ছাড়া শামে আলিম-ওলামার চলার কোন উপায় নেই। আমীর বললেন, আচ্ছা, তাহলে তাকে শামে নিয়ে আসুন। শামের প্রখ্যাত আলিম-ওলামারা এসে তাঁকে শামে ফিরে আসার অনুরোধ করলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, সেই আমীর শামে থাকা পর্যন্ত আমি শামে যাব না। সত্যিই আল্লাহ তার কসম পূরণের ব্যবস্থা করলেন। এক মাস পরই আমীরের মৃত্যু হল। অতঃপর ইমাম নববী (রহঃ) শামে ফিরে এলেন।

এই ইমাম নববী (রহঃ) যেমন ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলিম, ঠিক তেমনি ছিলেন ইবাদতগুজার ও নির্মোহ ব্যক্তি। তাঁর মত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইসলামী ইতিহাসে হাতেগোণা কয়েকজন মাত্র। সুবহানাল্লাহ! তাঁর রচিত কিতাবগুলোর বরকতের কথা ভেবে দেখুন। কিতাবুল মজমূ, রিয়াজুস সালেহীন, আরবাঈন, আল আযকার ইত্যাদি কিতাবগুলো পাঠ করলে এক অতীন্দ্রিয় আবেগ অনুভূত হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী তাঁর কিতাবগুলো যেমন জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে, তা খুব কম কিতাবই অর্জন করতে পেরেছে।

একবারের ঘটনা। মদীনার ইসলামী ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের ইমাম নববীর কিতাবসমূহ প্রদান করা হল। বিনামূল্যেই তা বিতরণ করা হল। তখন কিছু ছাত্র ইমাম নববীর কিতাবগুলো নিয়ে এসে বলল, আমাদের নববীর কিতাবের দরকার নেই। জিজ্ঞেস করা হল, কেন? তারা বলল, তার আকীদা-বিশ্বাসে ভ্রান্তি আছে। হায়রে দুনিয়া! শেষ রক্ষা পেলেন না ইমাম নববীও? হয়তো একথাও শুনতে হবে, ইবনে হাজার আসকালানীর মাঝেও ভ্রান্তি আছে। কেউ বলবে, অমুক আশআরী, অমুক অন্য কিছু। এভাবে বলতে থাকলে তো সে কালই বাদ পড়ে যাবে। উম্মতের প্রতিভাধর কোন ফকীহ আলিম এদের কলম আর মুখের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে না। কিছু কিছু তালেবে ইলমকে দেখা যায়, হয়তো এখনও ওজু করাও শিখেনি, ফজরের নামায সকাল আটটায় আদায় করে। তারাও ইমাম নববী (রহঃ) সম্পর্কে, সাইয়্যেদ কুতুব সম্পর্কে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করে না। অথচ, এরা বিদগ্ধ ফকীহ ও আলিম। ইবনে হাজার (রহঃ)কে বলা হয়, "আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস"। সুবহানাল্লাহ! গোটা ইসলামী বিশ্বের মুসলমানরা যাদেরকে গ্রহণ করে নিয়েছে, তাদের সম্পর্কে এমন কথা বলা মারাত্মক বিভ্রান্তি।

আমাকে এক ব্যক্তি বলেছে- লোকটি আমার খুব বিশ্বস্ত। আমি তাকে ভালবাসি। সেও আমাকে ভালবাসে- এক যুবক আফগানিস্তানে জিহাদ করতে এসেছে। সে তাকে স্বাগত জানিয়ে তার বাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এমনকি তাকে আফগানিস্তানে পৌছানোর সমস্ত ঝামেলা নিজে চুকিয়েছে। এই যুবকটি তার ছেলেকে

বলেছে, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে হিংসা করি। কারণ, তোমার পিতা ইখওয়ানের সদস্য। এই বুঝি ইহসানের পরিণাম! এই বুঝি সদাচরণের বিনিময়! এত অনুগ্রহ ও ইহসানের পর তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করা নৈতিকতার দাবি ছিল। কিন্তু সে হিংসা করছে। হে আল্লাহ! হে রব! তুমিই মানুষের হৃদয়কে পরিবর্তন কর। হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়কে আপনি দীনের উপর অবিচল ও দৃঢ় রাখুন।

এটাও মানুষকে আল্লাহর দীন থেকে বিরত রাখার একটি হীন উপায়। তারা সাইয়্যেদ কুতুবকে যা তা বলে। এমনকি কাফির বলতেও দ্বিধা করে না। এর পেছনে কাজ করছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। তারা দেখেছে, সাইয়্যেদ কুতুবের "ফী যিলালিল কুরআন" সমাজ বিপ্লবের সর্বোত্তম ধারাগুলোর আলোচনায় সমৃদ্ধ। তাই উদীয়মান প্রজন্মকে এ কিতাব থেকে দূরে রাখতে হবে। এর সহজ উপায় হল, মানুষের মাঝে তার আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া। তা হলে কেউ তাঁর লিখিত কোন পুস্তকই স্পর্শ করবে না। তাই মানুষের মাঝে এ কথা ছড়িয়ে দাও যে, সাইয়্যেদ কুতুবের চিন্তাধারায় ভ্রান্তি রয়েছে। সে ভ্রষ্ট। তাহলেই যথেষ্ট। কেউ তাঁর রচিত কোন কিতাবই পড়বে না।

মুসলমান কখনো মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। তবে কখনো অজ্ঞতাবশত তা করে থাকলে অন্য কথা। তাই যারা অজ্ঞতাবশত মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাদেরকে সচেতন করা উচিৎ। তাদেরকে চির ধ্বংসের এই পথ থেকে সরিয়ে আনা উচিৎ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالا فهوى بها في النار —

"নিশ্চয়ই কিছু লোক ভ্রুক্ষেপ না করেই এমন কথা বলে, যার কারণে সে জাহান্নামী হয়।"

তুমি কি একবার ভেবে দেখেছ, "নববীর আকীদা-বিশ্বাসে ভ্রান্তি আছে" এমন কথা বলে মুসলমানদের কত বিরাট কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত করছ? কত হাজার হাজার মুসলমান তার কিতাব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? আল্লাহ তাঁকে যে মহা নি'আমত দান করেছিলেন, তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? কাউকে নববী (রহঃ) এর কিতাব নিতে দেখলে অস্থির বেচাইন হয়ে যায়। মনে হয়, যেন সে কোন বিষাক্ত সাপ ধরেছে। ইবনে হাজার আসকালানীর ফাতহুল বারী কিতাবটি ধরলেই চিৎকার করে ওঠে। বলে, আরে, আপনি কার কিতাব নিচ্ছেন! এর আকীদায় তো ভ্রান্তি রয়েছে। এতো আশ'আরী। তুমি যদি তাকে ধরে জিজ্ঞেস কর, আচ্ছা ভাই! আশআরী কি? দেখবে, এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবে না। এর কারণ, তাদের বড়রা তাদের এতটুকুই শিখিয়েছে। কেউ কেউ আবার বলে ইবনে হাজারের ফতহুল বারী পড়তে পার তবে তাঁর 'কিতাবুত তাওহীদ' পড়বে না। কারণ, তাতে অনেক বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তারা বলে, ইবনে হাজার যথাযথ সালাফী হতে পারেননি বলে তার বই-পত্র না পড়াই ভাল।

আরে ভাই! প্রত্যেক মানুষের মাঝে দোষ আছে। দোষমুক্ত কেউ নয়। তাই সবাইকে যদি বাদ দিয়ে দাও, তাহলে কাদের অনুসরণ করবে। আর এভাবে পূর্বসূরীদের দোষচর্চা করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। মু'মিন তো বলবে–

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ক্ষমা করে দিন। ঈমানদারদের বিষয়ে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। (সূরা হাশর : ১০)

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ليس منا من لم يرحم كبيرنا و لم يعطف على صغيرنا —

"সে ব্যক্তি ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না এবং ছোটদের প্রতি দয়া করে না।"

শুনলে অবশ্যই তোমরা বিস্মিত হবে। এক লেখক তার কিতাবে লিখেছে, আল্লাহ তা'আলা আফগানের লোকদের এ কারণে কাফিরদের হাতে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন যে, তারা তাওহীদ বুঝে না, জানে না। আর আমরা যারা তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান রাখি, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কোন পরীক্ষায় ফেলেন, তবে তা আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই করবেন। পেশোয়ার থেকে প্রকাশিত সেই কিতাবটি এখনো আমার সংগ্রহে আছে। আল্লাহর কসম করে বলছি, এরা আফগান জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, কল্যাণকামী নয়।

এক ব্যক্তি জিহাদের নামে এসে পেশোয়ারে রয়ে গেল। আফগানিস্তানে আর গেল না। একবার সে কথা প্রসঙ্গে একজনকে বলেই ফেলল, আরে ভাই! পাকিস্তানীরা তো আফগানীদের চেয়ে অনেক ভাল। অথচ তার অবস্থা হল, মুরগীর রোস্ট আর সুস্বাদু খাবার খেতে খেতে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট শাস্তি যে, নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলিম ভাইদের প্রতি তার হৃদয়ে একটু দয়া বা অনুকম্পা থাকবে না। এ শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। এর পরিণাম আরো কঠিন।

তাই বলছিলাম, আল্লাহর পথে বাঁধা প্রদানের অনেক পথ ও পন্থা রয়েছে। অথচ অনেকে তা বুঝে না, জানে না। সে যে কথায় কথায় আলিমদেরকে পাপাচারী, ফাসিক বলেছে; সে জানে না এসব কথার দ্বারা সে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখছে। কারণ, তার এসব কথার কারণেই মানুষ ইসলামকে ঘৃণা করছে। ইসলাম থেকে ফিরে থাকছে। যে অল্পমূল্যে আল্লাহর আয়াত বিক্রয় করে খাচ্ছে, সে জানে না, সেও মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখছে। অর্থ, টাকা, পদমর্যাদা ইত্যাদি দিয়ে ক্ষমতাসীনরা তাদের পক্ষে ফতওয়া নিয়ে নিচ্ছে। আর পাপ কাজে ডুবে যাচ্ছে। যা ইচ্ছে তা-ই করছে। এর চেয়ে আর কঠিন শাস্তি কী হতে পারে যে, কারো কারো নিকট থেকে উস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুব সম্পর্কে কাফের হয়ে যাওয়ার ফতওয়া নেয়া হয়েছে। জামি'আ আজহার থেকে প্রকাশিত এক পুস্তকে লেখা আছে, তিনি কাফির। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। জামি'আ আজহার থেকে প্রকাশিত এক কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যরা শয়তানের দোসর। আমার সংগ্রহে আরেকটি কিতাব আছে। ১৯৬৫ সালে তা রচিত। তাতে জামি'আ আজহারের শাইখুল ইসলামের ফতওয়া রয়েছে। তিনি বলেছেন– ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যরা কাফির। জামি'আ আজহারের শাইখের ফতওয়ার উপর ভিত্তি করেই মিসরের ক্ষমতাসীনরা সাইয়্যেদ কুতুব ও তাঁর সঙ্গীদের দীনের নামে হত্যা করেছে। এ ফতওয়ার মাধ্যমেই তারা দীনকে বিক্রি করেছে। মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে।

অথচ ১৯৫৪ সালের কথা ভেবে দেখুন। তখন জামি'আ আযহারের শাইখ ছিলেন মুহাম্মদ খিযির হুসাইন (রহঃ)। সরকারী লোকেরা তার নিকট এসে বলল, আমরা আপনার নিকট ইখওয়ান সম্পর্কে ফতওয়া চাই। তাকে বলা হল, লিখে দিন, ইখওয়ানের সদস্যরা কাফির, রাষ্ট্রদ্রোহী। তিনি বললেন, নাউযুবিল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ। আমি তা পারব না। আমি এই ফতওয়ার মাধ্যমে আমার দুনিয়া-আখেরাত বরবাদ করব! কেন তাদের হত্যার পাপের বোঝা আমার মাথায় তুলে নিব! অসম্ভব, কিছুতেই তা হতে পারে না।

সে সময়ের কথা ভিন্ন। তখন জামি'আ আযহারের শাইখকে "শাইখুল ইসলামিল আকবার", "শাইখুল জামি'আ" ইত্যাদি নামে অভিষিক্ত করা হত। গোটা আরব বিশ্বে তার মূল্যায়ন ছিল, তার মর্যাদা ছিল। এক বাক্যে সবাই তার কথা মেনে নিত। তাই এ পদের উপযুক্ত ব্যক্তি কে হবেন, তা আলিম-ওলামা নির্বাচন করতেন। তাক্বওয়া-পরহেজগারীতে শ্রেষ্ঠ, ইলমে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিকেই এ পদের জন্য নির্বাচন করা হত। তাই মুত্তাকী-পরহেজগার, খোদাভীরু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হতেন শাইখুল জামি'আ।

জামি'আ আযহারের এক শাইখের ঘটনা। হয়ত তিনি শাইখ মুহাম্মদ খিযির হুসাইন বা শাইখ আলীশ হবেন। সম্ভবত শাইখ আলীশকে বাদশাহ ফারুক ডেকে পাঠালেন। তখন ছিল রমযান মাস। আগের যুগে রাজা-বাদশাহদের নিয়ম ছিল, তারা বিরাট ইফতারের আয়োজন করতেন এবং তাতে অংশগ্রহণের জন্য আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদের দাওয়াত দিতেন। এসব কাজের দ্বারা তারা জনগণের নিকটবর্তী হতে চাইতেন।

শাইখ আলীশ বাদশাহ ফারুকের ইফতারী অনুষ্ঠানে গেলেন। বাদশাহ ফারুক তাকে পেয়ে মহাখুশি । তার হাতে-কপালে চুমু খেলেন। এখনো আবর দেশগুলোয় এ প্রথা রয়েছে। ইফতারীর সময় হলে বাদশাহ ফারুক বললেন, শাইখ শুরু করুন। কিন্তু শাইখ গম্ভীর। ইফতারী হাতে নিচ্ছেন না। বললেন–

حرمت عليكم الميتة —

অর্থ : "তোমাদের উপর মৃতকে হারাম করা হয়েছে।" বাদশাহ বললেন, শাইখ এ তো খাবার, এ তো ইফতারি।

শাইখ বললেন–

حرمت عليكم الميتة و الدم —

অর্থ : "তোমাদের উপর মৃত ও রক্ত হারাম করা হয়েছে।"

বাদশাহ ফারুক অস্থির-বেচাইন হয়ে বললেন, তা ঠিক। কিন্তু আপনি এখানে মৃত আর রক্ত পেলেন কোথায়? এ কেমন কথা বলছেন? তখন শাইখ এক মুঠি খাবার হাতে তুলে চাপ দিতেই তা থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। একেবারে তাজা রক্ত। শাইখ বললেন, এগুলো মানুষের রক্ত। মানুষের রক্ত থেকে এ খাবার তৈরি হয়েছে। সুতরাং এ ইফতারী আমি খেতে পারি না। সে সময়ের জামি'আ আযহারের শাইখরা এমনই আল্লাহওয়ালা , বুযুর্গ ও মুত্তাকী হতেন। এখন আর সেই ঐতিহ্য নেই।

মূল কথায় ফিরে আসি। শাইখ খিযির মুহাম্মদ হুসাইন (রহঃ) বাদশাহ ফারুকের নির্দেশ মত ফতওয়া প্রদান করলেন না। বাদশাহ বললেন, যান, আপনি বাড়িতে চলে যান। ক্ষমতাসীনরা তখন আরেকজনকে ধরে এনে জামি'আ আযহারের শাইখ নিযুক্ত করল। সেদিন থেকেই এই পদটি তার প্রাণশক্তি হারাল। সরকারি অন্যান্য পদের ন্যায় এটাও একটা চাকুরির পদে পর্যবসিত হল। যারা সরকারের দালালি করতে পারে, নিকৃষ্ট স্বার্থে দীন ও ঈমানকে বিক্রি করতে পারে, সরকারের পদলেহন করতে পারে, তারাই এখন জামি'আ আযহারের শাইখ হচ্ছে। এখন আর জামি'আ আযহারের শাইখকে কেউ চিনে না। তার নামও জানে না। আমিও এখন জামি'আ আযহারের শাইখের নাম জানি না। অথচ সে সময়ে জামি'আ আযহারের শাইখ হতেন বিশ্বের সবচেয়ে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তার নাম সকলে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করত। জামি'আ আযহারের ছাত্রদের আযহারী বলে ডাকা হত। মানুষ তাদেরকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। আমার কথাই বলি। আমার মা আমার নাম আব্দুল্লাহ এ কারণে রেখেছেন যে, আমাদের গ্রামের যে আযহারী আলিম ছিলেন, তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ আল মা'আনী। আমি আমার মাকে কোন আমল করতে দেখে যদি বলতাম, আম্মা এটা এভাবে করতে হয়। তিনি বলতেন, আমি আব্দুল্লাহ আল মা'আনী আযহারীকে এমন করতে দেখেছি। ব্যস, এটাই ছিল তার বড় দলিল। এমন গভীর শ্রদ্ধা তিনি তার প্রতি রাখতেন। আযহারীদের প্রতি মানুষের এমন বিশ্বাস ও আস্থা থাকার কারণে বাদশাহ ফারুকের লোকেরা তাদের পছন্দমত এক ব্যক্তিকে জামি'আ আযহারের শাইখ নিযুক্ত করল এবং তাঁর থেকে ফতওয়া আদায় করে নিল। সে ফতওয়া দিয়েছিল, "ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদের বিধান কুরআন-সুন্নাহ ও শরী'আতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। তারা খারেজী। তাদের তওবা কবুল হবে না।"

তার ফতওয়ার এই অংশটুকু, 'তাদের তওবা কবুল হবে না' এটা ছিল অত্যন্ত বেদানাদায়ক ও মর্মান্তিক। তাই, যখন ইখওয়ানের কোন সদস্যকে হত্যা করা হত, তখন তার বুকের ওপর এই আয়াতটি লটকে দিত–

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ○

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হল তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলীতে চড়ান হবে বা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে বা দেশ থেকে তাদের বহিষ্কার করা হবে। (সূরা মায়েদা : ৩৩)

এ ফতওয়া দেয়ার পরই সেই শাইখ মাত্র এক বছর বা দু'বছর জীবিত ছিল।

১৯৬৬ সালের ঘটনা। তখন জামি'আ আযহারের শাইখ ছিল হাসান। সে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের বিরুদ্ধে একটি পুস্তক রচনা করল। এ পুস্তকটি জামি'আ আযহারের মুখপত্র "মুনীরুল ইসলাম" নামক পত্রিকার সাথে বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। এ পুস্তকটি রচনা করার মাত্র এক বছর পরই তার মৃত্যু হয়।

সে সময়ে মিসরে নিয়ম ছিল, কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিলে তা কার্যকরী করার পূর্বে একজন আযহারী শাইখ তাকে কালিমার তালকীন দিত। সে প্রথা অনুযায়ী শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ)-কে ফাঁসি দেয়ার জন্য যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন এক আযহারী শাইখ এসে তাঁকে বলল, হে সাইয়্যেদ কুতুব! তুমি বল, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। তখন সাইয়্যেদ কুতুব তার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বেদনার্ত কণ্ঠে বললেন–

حتى أنت جئت تتم المسرحية ؟ نحن نعدم لأننا نقول لا إله إلا الله و أنتم تأكلون الخبز بلا إله إلا الله و لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم —

"অবশেষে আপনি এলেন এই নাটকের অবসান ঘটাতে! মনে রাখুন, আমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কালিমাকে বিজয়ী করতে চাচ্ছি বলে আমাদের ফাঁসি দেয়া হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে। আর আপনারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বিক্রি করে খাচ্ছেন। উদরপূর্তি করছেন। শুনে নিন, আমি বলছি– আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু...।"

তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

ষষ্ঠ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

(٨) كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبٰى قُلُوْبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ○ (٩) اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ (١٠) لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ○

অর্থ : (৮) কীভাবে মুশরিকদের সাথে কৃত চুক্তি বলবৎ থাকতে পারে; অথচ তারা তোমাদের উপর জয়ী হয়ে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন ভ্রুক্ষেপ করবে না; কোন মর্যাদা দিবে না। তারা মুখে মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে। অথচ তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। তারা অল্পমূল্যে আল্লাহর আয়াতসমূহ বিক্রয় করে। অতঃপর আল্লাহর পথে বাঁধা প্রদান করে। নিশ্চয় তারা যা করছে, তা অতি নিকৃষ্ট। তারা কোন মু'মিনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের ভ্রুক্ষেপ করে না। আর তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। (সূরা তাওবা : ৮-১০)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের মাঝে إِلٌّ শব্দের অর্থ আত্মীয়তা, প্রতিশ্রুতি, প্রতিবেশীর হক ইত্যাদি। আর ذمة শব্দের অর্থ সম্মান করা, ইজ্জত করা, প্রতিশ্রুতি দেয়া, নিন্দা করা, নির্মম হত্যার মাধ্যমে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। আর ثمن অর্থ অল্প মূল্য। মুজাহিদ (রহঃ) তার ব্যাখ্যায় বলেছেন– যেমন–

قليل أكلة أكلوها عند أبي سفيان فنقضوا عهدهم بسببها —

আবূ সুফিয়ানের নিকট কিছু খেল, ফলে তার বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। তাদের এই কাজটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يرضونكم بأفواههم و تأبى قلوبه —

অর্থ : তারা মুখে মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, অথচ তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে।

এর ব্যাখ্যা হল, হেসে হেসে মিষ্টি মধুর কথা বলে তোমাদের ধোঁকা দেয়। মুনাফিক চরিত্রের লোকেরা এমনই করে থাকে। তারা ঈমান আনে মু'মিনের সুরত ধারণ করে। মু'মিনদের ধোঁকা দেয়। তাই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন–

اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ســاء ما كانوا يعملون —

অর্থ : তারা তাদের ঈমানকে ঢালরূপে গ্রহণ করেছে। অতঃপর আল্লাহর পথ থেকে বাঁধা প্রদান করেছে। নিশ্চয়ই তারা যা করছে তা অতি নিকৃষ্ট।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকের সম্পর্কে বলছেন–

و أكثرهم فاسقون —

অর্থ : আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

অথচ সকল মুশরিকই ফাসিক। তাহলে কথাটি বাস্তবসম্মত হল কি? আসলে ব্যাপারটি হল فاسقون শব্দের অর্থ خارجون (বহির্ভূত)। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি পূরণ করা থেকে বহির্ভূত। অধিকাংশ মুশরিকই এটা করে থাকে। অনেক মুশরিক অবশ্য প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। তবে তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

মু'মিন আর মুশরিক, মু'মিন আর ইহুদী-খ্রিস্টান এরা দুই মেরুর দুই মানুষ। দুই বিশ্বাসের দুই মানুষ। সুতরাং কিছুতেই তারা একাত্ম হয়ে মিলতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ○

অর্থ : ইহুদী আর খ্রিস্টানরা কিছুতেই আপনার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্ম অবলম্বন করেন। (সূরা বাকারা : ১২০)

জনৈক কবি বলেছেন—

يعطيك من طرف السنان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب

"সে তার জিহ্বার পার্শ্ব দিয়ে তোমাকে মধুময়তা দান করে, অথচ সে শৃগালের ন্যায় তোমার থেকে পালিয়ে যায়।"

তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, হত্যার পরিকল্পনা করে। তা সত্ত্বেও তোমাকে দেখলে কোলাকুলি করবে, করমর্দন করবে; কসম খেয়ে বলবে, সে তোমাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসে, মহব্বত করে। এ নিকৃষ্ট চরিত্রকে আল্লাহ তা'আলা 'ফিসক' বলেছেন। এ ধরনের লোক সম্পর্কে বলেছেন—

شر الناس ذو الوجهين

"দ্বিমুখী মানুষ সবচেয়ে নিকৃষ্ট।"

এরা তোমার কাছে এক চেহারা নিয়ে আসবে আর অন্যের কাছে আরেক চেহারা নিয়ে যাবে। মনের কথা বলবে না। এটা নিফাকের আলামত। এটা ফিসকের আলামত। আর মু'মিনের চরিত্র হল, তোমার সামনে তোমার দোষ প্রকাশ করবে আর তোমার অবর্তমানে তোমার গুণের কথা আলোচনা করবে। তাই তুমি যখন কোন মানুষকে দেখবে, সে তোমাকে ভালবাসে- এমন ভান করবে। তোমাকে সন্তুষ্ট রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। অথচ তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার দোষচর্চা করে। তোমার কুৎসা বর্ণনা করে। এ ধরনের মানুষ প্রকৃত মু'মিন নয়। প্রকৃত মু'মিন তো ঐ ব্যক্তি, যে সামনাসামনি তার ভাইকে নছিহত করবে। উপদেশ দিবে আর অনুপস্থিতিতে তার দোষ ঢেকে রাখবে, তার কোন দোষ থাকলে একান্তে তা সংশোধনের চেষ্টা করবে।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

الدين النصيحة

"দীন হল কল্যাণকামিতার নাম।"

সাহাবীরা বললেন—

لمن يا رسول الله؟

" কার জন্য এ কল্যাণকামিতা, হে আল্লাহর রাসূল?"

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

لله و لرسوله و لأئمة المؤمنين و عامتهم

"আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মু'মিনদের ইমাম তথা খলীফা ও শাসকদের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য।"

সুতরাং তোমার কর্তব্য তোমার ভাইকে উপদেশ দেয়া। কোন দোষ দেখলে তা সংশোধনের চেষ্টা করা। **জনৈক কবি বলেছেন–**

لم أر في عيوب الناس شيئا كنقض القادرين على التمام

"সুধী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ লোকদের উপদেশ দান না করার ন্যায় অন্য কোন দোষ আমি মানুষের মাঝে দেখতে পাইনি।"

তুমিও তেমন বলবে যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছেন–

نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل ـــ

"আব্দুল্লাহকে খুব ভাল লোক বলা যেত, যদি সে তাহাজ্জুদের নামায পড়ত!"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনাসামনি তার ভুলটি ধরিয়ে দিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, এরপর থেকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) রাতে আর ঘুমাতেন না। তাই তুমিও যদি তোমার কোন মুসলিম ভাইকে প্রকৃতই ভালবাস, মহব্বত কর, তাহলে তাকে একাকী ডেকে তার দোষের কথা বলে দাও। আর তার অনুপস্থিতিতে তার দোষ ঢেকে রাখ। বরং কেউ কারো কোন দোষ বর্ণনা করলে ভিন্ন সম্ভাব্য কারণ বর্ণনা করার চেষ্টা কর। তাই কারো সংশোধনের ইচ্ছে করলে তার সাথে একাকী মিলিত হয়ে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি তুমি তা মানুষের সামনে প্রকাশ কর, তা হলে তো তুমি তার দোষ বর্ণনা করলে। মনে কর, তুমি যদি কাউকে মানুষের সামনে বল, ভাই! এ-কাজ আর করবেন না বা আপনি তো জামাতের সাথে নামায আদায় করেন না, তাহলে তুমি তাকে লজ্জা দিলে। অপমান করলে। এতে তার মনে ক্রোধ সৃষ্টি হবে। তাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হল, সামনাসামনি কারো অধিক প্রশংসা না করা, যেন সে অহংকারী হয়ে না যায় এবং অনুপস্থিতিতে কারো দোষচর্চা না করা।

তাই যারা সামনাসামনি মানুষের অধিক প্রশংসা করে, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

أحثوا التراب في وجوه المداحين ـــ

"তোমরা অধিক প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি ছিটিয়ে দাও।"

আর যে সামনাসামনি প্রশংসা করে, তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন–

قصمت ظهر أخيك ـــ

"তুমি তো তোমার ভাইয়ের মেরুদণ্ডটা ভেঙে দিলে!"

তাই সামনাসামনি কারো প্রশংসা করা যদিও হারাম নয়, কিন্তু তা মাকরূহ। তবে যদি কেউ কারো দোষ ধরিয়ে দিতে চায়, তাহলে ভূমিকাস্বরূপ প্রথমে তার একটু প্রশংসা করা মাকরূহ নয়; বরং তা ভাল। যেমন তুমি বললে, ভাই! আপনি তো বুদ্ধিমান, অত্যন্ত মেধাবী, আপনাকে সবাই ভালবাসে। অনেকেই আপনার অনুসরণ করে। কিন্তু আপনার মাঝে এ দোষটি আছে। এটা আপনার সংশোধন করে নেয়া উচিত। তবে তুমি যার দোষ ধরিয়ে দিতে চাচ্ছ, সে যদি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হন বা তোমার চেয়ে বয়সে বড় হন বা তোমার পিতা হন আর তুমি তার দোষ ধরিয়ে দিতে ভয় পাও, তাহলে চিঠি লিখে তার দোষটি তাকে ধরিয়ে দিতে পার।

শাইখ হাসানুল বান্না (রহঃ) বলেছেন– 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারে'র ক্ষেত্রে আমরা এই পন্থা অবলম্বন করতাম। আমাদের এক উস্তাদ ছিলেন– আমাদেরকে পড়াতেন, দিক-নির্দেশনা দিতেন। আমি তাঁকে মসজিদের স্তম্ভের সোজাসুজি নামায পড়তে দেখলাম। কিন্তু তাঁকে বলব, এভাবে নামায পড়া মাকরূহ,

তা পারলাম না। অত্যন্ত সংকোচ বোধ হল। তাই তার কাছে চিঠি লিখে বিষয়টি জানিয়ে দিলাম। চিঠি পেয়ে তিনি অনুধাবন করলেন। তারপর আমাদের সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা! আমার এক কল্যাণকামী বন্ধু আমার নিকট একটি চিঠি পাঠিয়েছে। তাতে লিখেছে যে, স্তম্ভের বরাবর নামায পড়া মাকরূহ। আমি এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম না। ইনশাআল্লাহ এখন থেকে আমি তার পরামর্শ অনুযায়ী আমল করব। তোমরাও এ ব্যাপারে সচেতন হবে। শাইখ হাসানুল বান্না বলেন, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। এভাবেই আমরা আমাদের উস্তাদদেরকে ও বড়জনদেরকে কোন প্রকার মনে কষ্ট দেয়া ছাড়াই উপকার করতাম।

সুতরাং তুমি এমনিভাবে মানুষকে নসিহত করতে পার। হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তারা একদা এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে ওযূ করছে; অথচ তার ওযূ হচ্ছে না। তখন তাঁরা তাকে ওযূ শিখানোর জন্য অন্য কোন প্রকার কথা না বলে বললেন, চাচা! আমি এবং আমার ভাই দু'জনে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছি যে, আমাদের মাঝে কে সবচেয়ে সুন্দর ওযূ করতে পারে। আমরা আপনাকে বিচারক মানলাম। আমাদের ওযূ করা দেখে আপনি ফয়সালা করবেন, কার ওযূ সুন্দর হয়েছে। হাসান (রাঃ) বললেন, আমার অযু করা দেখুন। তারপর তিনি বাম হাতে বদনা নিলেন। পানি ঢাললেন। দু'হাত ধৌত করলেন। তারপর এক আজলা পানি নিলেন। মুখ ও নাক ধুইলেন। বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর সমস্ত অবয়ব ধুইলেন। আর দেখুন, হাত ধোয়ার সময় কীভাবে আমি কনুইতে পানি পৌঁছিয়েছি। এভাবে ওযূ শেষ করা হলে হযরত হুসাইন (রাঃ) বললেন, এবার দেখুন, আমি কিভাবে সুন্দর করে ওযূ করি। আমার ওযূ তার চেয়ে সুন্দর। তারপর তিনিও তাকে ওযূ করে দেখালেন। এদিকে লোকটি তাদের থেকে ওযূ করা শিখে ফেলল ও বলল, আমি কীভাবে ফয়সালা করব। আমিই তো আপনাদের থেকে ওযূ করা শিখলাম।

একেই বলে "আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার"। একাজের জন্য এমন মানুষের প্রয়োজন, যে মানুষকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে পারে। যিনি হবেন অত্যন্ত দূরদর্শী। যার কথাবার্তা হবে অত্যন্ত সংযত। কখনো কারো নিকট গিয়ে বলবে না, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে হিংসা করি। কখনো এধরনের কথা বলবে না। ববং বলবে, ভাই! আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে হৃদয় দিয়ে ভালবাসি। সর্বদা তোমার কল্যাণ কামনা করি । তবে আমি তোমার মাঝে একটি ছোট্ট দোষ দেখছি।

জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলেছে, তার নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে হিংসা করি। আমি বললাম, কেন তুমি এমন কর? লোকটি বলল, কারণ, তোমার পিতা ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্য। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা...। এটা আবার কেমন ইসলাম হল? পিতার কারণে পুত্রকে হিংসা করা। একেই বলে ভ্রান্তি! পাপ কাজে লিপ্ত থেকে পূণ্যের প্রত্যাশা করা। এটা কখনো 'আমর বিল মা'রূফ' হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ○

অর্থ : মু'মিন পুরুষরা ও মু'মিন নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা ন্যায়ের আদেশ দিবে এবং অপছন্দনীয় বিষয় থেকে ফিরিয়ে রাখবে। তারা নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। (সূরা তাওবা : ৭১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ـــ

"তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মু'মিন হবে না যাবৎ সে নিজের জন্য যা ভালবাসে অন্যের জন্যও তা ভালবাসবে।"

আরে ভাই! এটা আবার কেমন দীন হল! কোথা থেকে তোমরা এ দীন পেলে যে, বলবে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে হিংসা করি? কোথায় সেই ইসলাম, কোথায় সেই ইসলামের জন্য ভালবাসা! কোথায় সেই মুসলমানদের কোমল আচরণ!

এক ব্যক্তি খলীফা হারুনুর রশীদের নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে উপদেশ দিব। অত্যন্ত কড়া ভাষায় কথা বলব। খলীফা হারুনুর রশীদ বললেন, না তুমি তা করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছিলেন। হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরআউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি হযরত মূসা (আঃ)-কে বলে দিয়েছিলেন–

قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ۔

অর্থ : সুতরাং তার সাথে কোমল ভাষায় কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে।

(সূরা ত্বা-হা : ৪৪)

কোমল ও সুন্দর ভাষায় কথা বললে সদকা করার সওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং কখনও কারো কল্যাণকামিতার ইচ্ছা হলে তখন তো কোমল ভাষায় কথা বলার গুরুত্ব শতগুণে বেড়ে যাবে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা রাসূল সম্পর্কে বলছেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ○

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার দয়ার কারণে আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন। আর যদি আপনি রূঢ় ও কঠিনহৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।

(সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯)

সুতরাং কোমলহৃদয় হওয়া আল্লাহ তা'আলার এক মহান নি'আমত। তাই মু'মিন সর্বদা কোমল ও নরম হৃদয়ের অধিকারী হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছোট ছেলে-মেয়েরা হাত ধরে যে দিকে ইচ্ছা নিয়ে যেত। বলত, আসুন আমার সাথে এটি বহন করুন বা আমাকে অমুক জিনিসটি দেখিয়ে দিন।

لا خيل عندك تهديها و لا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال

"তোমার নিকট ঘোড়া নেই যা তুমি দান করে দিবে বা কোন ধন-সম্পদও নেই। তাহলে তোমার কথাবার্তা বরকতময় হোক যদিও তোমার অবস্থা স্বচ্ছল নয়।"

সপ্তম মজলিস

(১২) وَإِنْ نَّكَثُوٓا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝ (১৩) أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ (১৪) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۝ (১৫) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ (১৬) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

অর্থ : (১২) আর যদি তারা শপথ করার পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীনের ব্যাপারে বিদ্রূপ করে, তাহলে তোমরা কুফর প্রধানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কারণ, তাদের কোন শপথ নেই, যাতে তারা ফিরে আসে। (১৩) তোমরা কি এমন দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বের করে দেয়ার সংকল্প করেছে? অথচ, এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ আল্লাহই অধিকতর ভয়ের যোগ্য, যদি তোমরা মু'মিন হও। (১৪) তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন। তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মু'মিনদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন এবং (১৫) তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৬) তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত। (সূরা তাওবা : আয়াত ১২-১৬)।

উল্লেখিত প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– যারা তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি দেয়, তারপর তা ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীনের ব্যাপারে বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তা বলে, খারাপ মন্তব্য করে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তারাই হল কুফরের সর্দার, কুফরের অগ্রনায়ক।

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোপন বিষয়সমূহ জানতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট গোপন বিষয়সমূহ বর্ণনা করতেন। তিনি বলেছেন– এ আয়াতে কুফরের সর্দার ও অগ্রনায়ক বলে যাদের অভিহিত করা হয়েছে, তাদের চার কি পাঁচজন ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই।

আরবের বেদুইনরা ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। শিষ্টাচার বলতে তাদের তেমন কোন জ্ঞান ছিল না। তাই তাদের শিষ্টাচারবর্জিত কোন আচরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু মনে করতেন না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হলে সাহাবায়ে কেরাম বেদুইনদের খুঁজে আনতেন। বলতেন, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ প্রশ্নটি করলে আমি তোমাকে দুই স্থূপ খেজুর দেব। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা থেকে এড়িয়ে থাকতেন। শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের কারণে সাহাবায়ে কিরাম এমন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের প্রতি তাদের গভীর মর্যাদা ও সম্মানের অনুভূতির কারণেই তারা এমন করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত ভদ্রতা ও শিষ্টাচার বজায় রেখে চলতেন, যা আমরা চিন্তা বা কল্পনাও করতে পারি না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের চেয়ে অধিক শিষ্টাচারসম্পন্ন মানুষ দেখিনি। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মাত্র তেরটি বিষয় জিজ্ঞেস করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে সে প্রশ্নগুলো এভাবে বর্ণনা করেছেন–

يسئلونك عن المحيض ، يسئلونك عن اليتامى ، يسئلونك عن الخمر و الميسر —

"তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ঋতুবর্তী মহিলাদের সম্পর্কে... ইয়াতীমদের সম্পর্কে... মদ ও জুয়া সম্পর্কে।"

তাই বলছিলাম, সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত শিষ্টাচারসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। হে আল্লাহ! আমাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান করুন। আমাদের ভদ্রতার জ্ঞান দান করুন।

সাহাবায়ে কেরাম একে অপরকে সীমাহীন সম্মান করতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে কী পরিমাণ সম্মান করতেন, তা বলে, লিখে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দেখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈহিক গঠন ও অবয়বের বর্ণনা শুধুমাত্র ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ), ইবনে আবী হালা ও উম্মে মা'বাদ আরাবী থেকেই বর্ণিত হয়েছে। অন্য কোন সাহাবী এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-ও এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। হযরত উমর (রাঃ)-ও এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। কারণ, তখন ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ) ছিলেন অল্প বয়স্ক। তাদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার বুঝ তখন আসেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযরত অবস্থায় তারা রাসূলের পিঠে উঠে বসতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মমতাভরা কণ্ঠে তাদের বলতেন, "আমি হলাম তোমাদের উত্তম বাহন।"

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ছিলেন। তিনি সেজদায় গেলে হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসলেন। আর তিনিও দীর্ঘক্ষণ সেজদায় রইলেন। সাহাবায়ে কেরাম এ দৃশ্য দেখলেন। অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। সাহস করে জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যে এত দীর্ঘ সেজদা করলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্মিত হেসে বললেন, "আমার দু'সন্তান আমাকে বাহন বানিয়েছিল। আমি তাদের সরিয়ে দিতে চাইনি।" অর্থাৎ তারা অল্প বয়সী হওয়ার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজ্জত ও মর্যাদার বুঝ তাদের হয়নি। তাই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এমন আচরণ করেছিল। আর শিশুদের এমন করা কোন দোষের বিষয় নয়। তাই দেখা যেত, তাঁরা গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে বসতেন। এদিক-সেদিক তাকাতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাকা দাড়ি মুবারক গুণতেন। ইত্যাদি নানা প্রকারের আচরণ করতেন। অথচ সাহাবায়ে কেরাম শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, সম্মান ও ইহতেরামের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাতে পারতেন না। বেদুইন উম্মে মা'বাদের ঘটনাও ঠিক তেমনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তিনি তাঁকে দেখছিলেন। খুব ভালভাবে দেখেছিলেন। বেদুইন হওয়ার কারণে তার মাঝে শিষ্টাচারবোধ ছিল কম। তাই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈহিক আকৃতির বিবরণ দিয়েছেন।

আর সাহাবায়ে কেরামের কথা! সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। জায়েদ ইবনে দাশনা (রাঃ) কুরাইশদের হাতে বন্দী হলে তাঁকে হত্যার জন্য মক্কার বাইরে তানয়ীম প্রান্তরে নিয়ে যাওয়া হল। শূলে চড়ানোর আগে আবূ সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করল, হে জায়েদ! তুমি কেমন মনে কর, যদি মুহাম্মদ তোমার স্থানে হয়! তখন জায়েদ

(রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না যে, আমি নিরাপদে বাড়িতে ফিরে যাব আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ে একটি কাঁটা বিঁধবে। তখন আবূ সুফিয়ান বিস্ময় ও হতবুদ্ধি হয়ে বলল, মুহাম্মদকে তার সাথিরা যেমন ভালবাসে, এমনভাবে ভালবাসতে আমি কাউকে দেখিনি।

সাহাবায়ে কেরামও পরস্পরে একে অপরকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)-এর হাতে চুমু খেতেন। হযরত আবূ উবায়দা (রাঃ)-এর হাতে চুমু খেতেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ হযরত উমর (রাঃ)-এর বংশের লোকদের যমীন ক্রয় করতেন। সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তা করতেন না, বরং ভালবাসা, ইহতেরাম ও সুসম্পর্ক আরো বিস্তৃত করার জন্য তা করতেন। কারণ, হযরত উমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক নৈকট্যশীল ছিলেন। তবে এঁরা সকলে ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, এ ব্যাপারে উম্মত একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথিরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আবূ বকর (রাঃ)-এর সমপর্যায়ের কাউকে মনে করতেন না। মর্যাদায় এরপর ছিলেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)। এরপর হযরত উসমান (রাঃ)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্মৃতিচারণ করে বলেছেন–

إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما —

এ আয়াতটি কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা হযরত উমর (রাঃ) থেকে জানার জন্য আমি কয়েক বছর কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু কীভাবে জিজ্ঞেস করব তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। হজ্জের সময় একবার আমি হযরত উমর (রাঃ)কে একাকী ও উপযুক্ত সময়ে পেয়েছি বলে মনে হল আর আমি তাকে তা জিজ্ঞেস করে নিলাম। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সবসময় হযরত উমর (রাঃ)-এর সাহচর্যেই থাকতেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বয়স একেবারে অল্প ছিল। তার বয়স তখন পনের বছর মাত্র। এত অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও হযরত উমর (রাঃ) তাকে সাথে নিয়ে সাহাবীদের মজলিসে বসতেন। একদা বর্ষীয়ান সাহাবীগণ এ ব্যাপারে আপত্তি তুলে বললেন, এতো আমাদের সন্তানদের মত। সুতরাং কীভাবে আপনি তাকে বর্ষীয়ান সাহাবীদের মজলিসে নিয়ে আসেন! এটা বড়ই আপত্তিকর বিষয়।

হযরত উমর (রাঃ) তাদের কথায় বিব্রত হলেন। বললেন, বেশ এর ফয়সালা আগামীকাল হবে। পরদিন হযরত উমর (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে নিয়ে সাহাবীদের মজলিসে এলেন। বর্ষীয়ান সাহাবীরাও এলেন। তাদের কারো বয়স ষাট, কারো সত্তর, কারো বয়স পঞ্চাশ। সবাই মজলিসে বসলে উমর (রাঃ) বললেন–

فسبح بحمد ربك و استغفره، إنه كان توابا

এ আয়াতের মর্ম আপনারা কী বুঝেন? উপস্থিত সকল সাহাবী বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে, তখন আমরা তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব, তাওবা করব এবং তার তাসবীহ পাঠ করব। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فسبح بحمد ربك و استغفره، إنه كان توابا

হযরত উমর (রা;) তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, ইবনে আব্বাস! এ আয়াতের মর্ম তুমি কী বুঝ? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি এ আয়াত দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পূর্বাভাস বুঝতে পারি। কেননা, এ সূরার শুরুতে বলা হয়েছে, "আল্লাহর দীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছে।" সুতরাং রিসালাতের দায়িত্ব পালনও শেষ হয়ে গেছে। তাই শীঘ্রই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করবেন। তাঁর এই ব্যাখ্যা শুনে সকলে অবাক হলেন। সকলে বুঝলেন, ওমর (রাঃ) কেন তাকে সবসময় সাথে সাথে রাখেন।

হায়! সাহাবায়ে কেরামের কুরবানী আর মুজাহাদার কথা কি বলব! হযরত উতবা ইবনে গাজওয়ান (রাঃ) বলেন–

كنت سـابع ستعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا وما منا واحد إلا أميرٌ —

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সেই সাতজনের একজন ছিলাম, যাদের নিকট গাছের পাতা ছাড়া খাওয়ার মত অন্য কিছু ছিল না। এমনকি গাছের পাতা খেতে খেতে আমাদের মাড়ি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অথচ আজ আমরা সবাই আমীর ও শাসক।"

আর সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন–

كنت سـابع ستعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس لنا طعام إلا ورق الحبلة و كنا نضع ما له خلط كبعر الشاة ، و الآن بنوأسد يعيرونني على الإسلام و يقولون سعد لا يفهم —

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণকারী সাত ব্যক্তির মাঝে সপ্তম ছিলাম। বাবলা গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কোন খাবার ছিল না। বাবলা গাছের পাতা খেতে খেতে আমাদের অবস্থা এমন হল যে, আমরা বকরীর ন্যায় পায়খানা করতাম। অথচ এখন বনু আসাদের লোকেরা ইসলামের ব্যাপারে আমাকে বিদ্রূপ করে বলে- সা'দ বুঝে না।"

সুবহানাল্লাহ! মানুষের জীবনে কখনো এমন সময় আসে যে, সে মিথ্যা বলতে চায়; কিন্তু মিথ্যা বলতে পারে না। এটা অত্যন্ত অসহনীয় ও জটিল সময়।

যা হোক, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উত্তর শুনে উপস্থিত সকল বর্ষীয়ান সাহাবী বিস্মিত হয়ে গেলেন। তখন উমর (রাঃ) বললেন, তোমরা কি ইবনে আব্বাসকে তোমাদের সাথে মানানসই বলে মেনে নিলে? সবাই বললেন, হ্যাঁ, আমরা তাকে মেনে নিলাম।

সাহাবায়ে কেরামের আপত্তি উত্থাপনেরও যুক্তি আছে। কারণ, প্রত্যেক মজলিসেরই একটা সম্মান ও গুরুত্ব আছে। একথা কি চিন্তা করা যায় যে, তুমি তোমার ছয় কি সাত বছরের সন্তানকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইলমের মজলিসে উপস্থিত হবে! নিশ্চয় তা করবে না। কারণ, মজলিসের গুরুত্ব আছে। আর যদি নিয়েই আস, তাহলে উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিরা বলবে, আরে ভাই! এটা আবার কি শুরু করলে! আমরা এখানে ইলমী আলোচনা করতে এসেছি আর তুমি তোমার শিশু সন্তানকে সামলাতে ব্যস্ত? তুমি তো মজলিসের গুরুত্ব নষ্ট করে দিলে! সুতরাং আল্লাহর কাছে দু'আ কর, আল্লাহ যেন আমাদের আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দান করেন। অনেক সময় দেখা যায়, ছেলে পিতার সামনে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে। আবার কখনো দেখা যাবে, যুবকরা সম্মানিত ব্যক্তিদের মজলিসে হেলান দিয়ে বসে আছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল যে, অনেকে ধারণা করে, এমন করে বসা দীনের বিধান।

একবার জর্দানে আমাদের এক শিক্ষক এক কামরায় এসে প্রবেশ করলেন। সে কামরার এক যুবক পায়ের উপর পা রেখে হেলান দিয়ে বসে আছে। আমাদের সে শিক্ষক ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। জিজ্ঞেস করে বসলেন, কী ব্যাপার, এমন করে বসে আছ যে? যুবক বলল, এভাবে বসা সুন্নত।

আরে এ আবার কেমন কথা?

হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে–

كان إذا دخلت فاطمة قام إليها و اعتنقها و فرش لها رداءه و أجلسها —

"হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট এগিয়ে যেতেন। তাকে ধরতেন। তাঁর জন্য চাদর বিছিয়ে দিতেন এবং তাতে তাঁকে বসাতেন।"

এখানে চিন্তার বিষয়, হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে, বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। রাসূল তাঁর কিশোরী মেয়ের সাথে এমন সৌজন্য ব্যবহার করতেন! আসলে এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে শিষ্টাচার শেখাতেন। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিষ্টাচার শিখতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার লিখিত গ্রন্থ

الترخيص بالقيام على وجه الاحترام لذوي المقام و الإحسان —

এবং ইমাম নববী (রহঃ)-এর লিখিত الترخيص بالقيام কিতাবদ্বয় পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। আমার এক সাথি আমাকে বলেছেন- আমি জীবনে কখনো পিতা-মাতার সামনে হেলান দিয়ে বসিনি। কারণ, আমি তা আদব ও শিষ্টাচারের খেলাফ মনে করি। আমার পিতা আমাকে কখনো ডাকলে বা কোন কাজের নির্দেশ দিলে আমি তার সামনে মাথা নত করে দাঁড়াতাম এবং কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতাম। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা চিন্তা করলে দিশেহারা হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। ছাত্ররা শিক্ষকের সাথে তাস খেলে। শিক্ষক ছাত্রকে সিগারেট দেয় তাতে আগুন ধরিয়ে আনার জন্য। কখনো ছাত্র নিজেকে দুঃসাহসী প্রমাণ করার জন্য ওস্তাদকে কষ্ট দেয়। ওস্তাদের সাথে বেআদবী করে। ওস্তাদদেরকে অবরোধ করে রাখে। উপরন্তু সে তার সঙ্গীদের নিকট গর্বের সাথে তার বেআদবীর বিবরণ তুলে ধরে।

খলীফা হারুনুর রশীদের দু'ছেলে আমীন ও মামুন তাদের উস্তাদ ইমাম কিসাঈ (রহঃ)-এর পায়ের জুতা এগিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত। সে যুগের আলিম-উলামাও ইলমের মর্যাদা রক্ষা করে চলতেন। তাই সবাই তাদের মর্যাদা করত, সম্মান করত। এ প্রসঙ্গে জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন-

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما

و لكن أهانوه فهان و دنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما

"যদি আলিমরা ইলমকে রক্ষা করত, তাহলে ইলমও তাদের রক্ষা করত। আর যদি তারা হৃদয় দিয়ে ইলমের তাজীম ও মর্যাদা দিত, তাহলে ইলম মর্যাদা ও সম্মানের বস্তু হত। কিন্তু তারা ইলমকে অপমান ও অপদস্থ করছে। তাই ইলম ও তাদের অপমান ও অপদস্থ করছে। তারা লোভ-লালসা দ্বারা ইলমের অবয়ব কালিমাযুক্ত করে। তাই ইলম তাদের চেহারাকে মলিন করে দিয়েছে।"

সে যুগের আলিম-ওলামার অবস্থানের কথা আর খলীফারা তাদের যে সম্মান করতেন, তা ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। খলীফা আবু জাফর মনসূর বহু চেষ্টা করল, বহু পীড়াপীড়ি করল যেন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বিচারপতির পদটি গ্রহণ করেন। কিন্তু আবূ হানীফা (রহঃ) তাতে রাজি হলেন না। রাজপ্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করার জন্য তাকে জেলখানায় রুদ্ধ করা হল। অমানবিক শাস্তি দিল। অবশেষে জেলখানায় তিনি ইন্তেকাল করলেন। তবুও তিনি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করেননি। এর কারণ বর্ণনা করে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেছিলেন, মনসূর এই পদটি দিয়ে আমাকে কিনে নিতে চাচ্ছে। তাই তিনি খলীফা মনসূরকে বলেছিলেন, আমি আপনার বিচারপতি হব না। কারণ, যদি আমার নিকট আপনার ব্যাপারে কোন অভিযোগ আসে এবং আমি যদি আপনার বিরুদ্ধে ফয়সালা দান করি, তাহলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। আর আমি তো এখন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে আছি। ব্যবসা-বাণিজ্য করছি।

হ্যাঁ, রাজা-বাদশাহরাও প্রকৃতপক্ষে সে সব আলেমদেরই হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন, যারা জনসম্মুখে সত্য কথা তাদের শুনিয়ে দিতে কোন পরওয়া করেন না।

একদা খলীফা আবুল মনসূরের কোষাগারে পুঞ্জিভূত সম্পদের কি হুকুম হবে, তা নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হল। খলীফা তখন ইবনে আবী জি'ব, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিককে ডেকে পাঠালেন। তারা তার দরবারে উপস্থিত হলে খলীফা বললেন, রাজ কোষাগারে পুঞ্জিভূত এই সম্পদ সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি? ইবনে আবী জি'ব (রহঃ) বললেন, আপনার পূর্ব পুরুষরা এ সম্পদ হারাম পন্থায় অর্জন করেছেন। সুতরাং এ সম্পদ যা আপনারা ইচ্ছেমত ব্যয় করছেন, তা কীভাবে হালাল হতে পারে!

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, আমি তখন আমার কাপড় গুটাতে লাগলাম, যেন ইবনে আবী জি'ব-এর রক্ত ছিটকে এসে আমার গায়ে না লাগে।

অতঃপর ইমাম মালেক (রহঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি নরমভাবে বললেন। তাতে কোন কঠোরতা ছিল না। অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) খুব কঠিন ভাষায় উত্তর দিলেন। তারপর তারা চলে এলেন।

কিছুক্ষণ পরই খলীফা আবুল মনসূর প্রত্যেকের নিকট টাকার থলে পাঠালেন। কেননা, মানুষের দীন ও ঈমানকে ক্রয় করার এটাই হল সহজ উপায়। আর বলে পাঠালেন, যদি ইবনে আবী জি'ব ও আবূ হানীফা এ অর্থ গ্রহণ করে, তাহলে তাদের মাথা কেটে এনে আমার সামনে পেশ করবে। আর যদি মালিক তা গ্রহণ করে, তবে তা তাকে দিয়ে দেবে।

ইবনে আবী জি'ব-এর নিকট অর্থ নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তো এই অর্থ-সম্পদ খলীফার জন্যই হালাল মনে করি না। সুতরাং কীভাবে আমি তা গ্রহণ করতে পারি। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বললেন, মৃত জন্তু, রক্ত আর শূকরের গোশত এ অর্থের চেয়ে অনেক শ্রেয়। আর ইমাম মালিক (রহঃ) খলীফা মনসূরের পাঠান অর্থ গ্রহণ করে নিলেন।

খলীফা মনসূর অত্যন্ত পাষাণ ও কঠিন হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তার সামনে সর্বদা রক্ত শোষণ করে নেয়ার চামড়া বিছানো থাকত। জল্লাদ তার পাশে সর্বদা দণ্ডায়মান থাকত। তিনি প্রায়ই ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ)-কে তার দরবারে ডেকে পাঠাতেন। কিন্তু ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) আসতেন না। একবার খলীফা মনসূর তার নিকট গেলেন। বললেন, হে সুফিয়ান! তোমার কি প্রয়োজন বল। সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বললেন, আপনি কি আমাকে কিছু দিতে চাচ্ছেন? খলীফা বললেন, হ্যাঁ। ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বললেন, আপনার নিকট লোক পাঠালে আসবেন। আর আমার কিছু প্রয়োজন হলে আমি আপনার নিকট চেয়ে লোক পাঠাব।

মনসূর তখন আর দেরি না করে ফিরে এলেন এবং হাঁটতে হাঁটতে বললেন, সব চিড়িয়াকে খাবার দিয়ে ফাঁদে আটকিয়েছি। আটকাতে পারলাম না শুধু সুফিয়ান সাওরীকে।

আমাদের ওস্তাদ আবু মাজেদ একবার আমাদের নিকট বলেছেন– একবার আমি জর্দানের বাদশাহ হুসাইনকে ধরে বললাম, শুনুন! আমাদের কাজ হল মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা। বাকচাতুর্যে আশা করি কেউ আমাদের সাথে পারবে না। তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা আমাদের ধর্মকে বিক্রি করতে চাই না।

বাদশাহ হুসাইন তখন আমাকে বললেন, তবে আমার চারপাশে যারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের ব্যাপারে কিন্তু এমন ধারণা করবেন না। এরা মুনাফিক। সর্বদা আমার প্রশংসা করাই এদের কাজ। তারপর বললেন, হে আবু মাজেদ! আমি এদের তুচ্ছ মনে করি, আমি এদের ঘৃণা করি।

এমনিভাবে বাদশাহ হুসাইন তার এক মন্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন– আমি তার চেয়ে বোকা ও নিচু আর কাউকে দেখিনি

এ ধরনের লোকদের জিন্দেগীর কথা ভাবলে সত্যই শরীর শিউরে উঠে। সারাটি জীবন যার খেদমত করছে, সে তাকে ঘৃণা করে, তাকে অপছন্দ করে।

আগের যুগে মানুষের মাঝে কল্যাণকামিতা ছিল। কোন আলিম বিপদে পড়লে মানুষ তার সহমর্মী হত। আর ও তার পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর নিত। তাদের পাশে এসে দাঁড়াত। কিন্তু বর্তমানে এমন দেখা যায় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وإن نكسوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر —

অর্থ : আর যদি তারা প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীনের ব্যাপারে বিদ্রূপ করে, তাহলে তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেন– এই আয়াত এ কথা প্রমাণ করে যে, যদি কেউ দীন সম্পর্কে, রাসূল সম্পর্কে বিদ্রূপ করে বা রাসূলকে গালি দেয়, তাহলে তাকে তওবা করার সুযোগ না দিয়ে- চাই সে মুসলমান হোক বা খ্রিস্টান হোক- হত্যা করা হবে। একই মত পোষণ করেছেন ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইসহাক রাহওয়াই ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম। তবে এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর অভিমত ভিন্ন। কেউ ধর্ম সম্পর্কে বিদ্রূপ করলে তাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হবে, প্রহার করা হবে, শাস্তি দেয়া হবে। মুসলমান হলেও এই বিধান, অমুসলিম হলেও এই বিধান। যেমন, যদি কোন খ্রিস্টান মুয়াযযিনের আযান শুনে বলল, এই গাধাটি চিৎকার করে কী বলছে; তাহলে ইমাম মালিক ও শাফে'য়ী (রহঃ)-এর মতে তার এই কথাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মধ্যে গণনা করা হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে।

ফিলিস্তিনে একদল খ্রিস্টান ছিল। তাদের দু'জন লোক ধর্ম ও রব সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলত। তারা ইসলামের সাথে এমন শত্রুতা রাখত যে, লোকেরা এদের একজনের নাম আবূ জাহেল রাখল। অপজনের নাম রাখল আবূ লাহাব। এ বিষয়টা সকলের মুখে মুখে ছিল। ঘটনাক্রমে যে ব্যক্তির নাম আবূ লাহাব রাখা হয়েছিল, সে জর্দানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হল। তখন এক কবি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন–

و الله ما قصدي سغب　شغلة غاية في العجب

الملك ابن الرسول　و الوزير أبو لهب

"আল্লাহর শপথ করে বলছি, বিশৃঙ্খলা ও ফেতনা সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হল, বাদশাহ হলেন রাসূল-সন্তান আর মন্ত্রী হলেন আবূ লাহাব।"

সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে কেউ বিদ্রূপ করলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। কেউ যদি ধর্মকে গালি দেয়, তাহলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। যদি সে এরপর স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে তা যিনা হবে। এ অবস্থায় সহবাসের ফলে সন্তান জন্ম নিলে, তা হবে জারজ। এই জারজরা তার মীরাস পাবে না। তাকে হত্যা করা হবে। গোছল দেয়া হবে না। কাফন পরানো হবে না। তার জন্য জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করা হবে না। মুসলমানদের কবরস্তানে তাকে কবর দেয়া হবে না। হ্যাঁ, যদি সে মূর্খ ও অজ্ঞ হয়ে থাকে, তবে তার ব্যাপারে ভিন্ন ফয়সালা। কিন্তু জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্ম নিয়ে তিরস্কার ও বিদ্রূপ করলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা অপর এক আয়াতে বলেন–

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ ○ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ ○

অর্থ : আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো হাসি আনন্দ ও খেল তামাশায় লিপ্ত ছিলাম। আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা আর ওজর-আপত্তি করো না। তোমরা কাফির হয়ে গেছ। (সূরা তাওবা : ৬৫-৬৬)

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কেউ ইসলামের ব্যাপারে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে বিদ্রূপ করলে, ঠাট্টা তামাশা করলে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নামায আদায় করে, রোযা রাখে, সেও ধর্ম সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলে। অনেককে দেখা যায়, রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে। অথচ ধর্মকে বা রাসূলকে সেও মন্দ বলে। তাই শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী এ ব্যাপারে নমনীয়তা দেখিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতামত গ্রহণ করেছেন। বলেছেন– ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে কেউ ধর্মকে গালি দিলে সে কাফির হয়ে যাবে না। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) জাহমিয়া নামক এক ভ্রষ্ট দলের সদস্যদের বলতেন–

لو قلت بقولكم لكفرت و لكني لا أكفركم لأنكم جهال —

"যদি আমি তোমাদের মত বলি, তাহলে আমি কাফির হয়ে যাব। তবে আমি তোমাদেরকে কাফির বলব না। কেননা, তোমরা অজ্ঞ।"

তাই অনেক আলিমের নিকট অজ্ঞতাও একটি ওজর। তবে হ্যাঁ, দ্বীনে এমন কিছু বিষয় আছে, যা সর্বজনবিদিত, যা আলিম-জাহিল কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। সবাই তা স্বীকার করে। যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি। এসব বিষয় যদি কেউ অস্বীকার করে, তাহলে কাফির হয়ে যাবে। আর যদি কেউ ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না। নও মুসলিম। সে যদি বলে, যেমন মদ হারাম নয়, তা পান করা হালাল। তাহলে সে কাফির হবে না। এ ক্ষেত্রে তার অজ্ঞতা গ্রহণীয় হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَـٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ ○

"যদি তারা তাদের কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ধর্মের ব্যাপারে বিদ্রূপ করে।"

অর্থাৎ এ দু'টি কাজের যে কোন একটি করলে কাফির হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করা হবে। যদি কোন জিম্মি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তবে তাকেও হত্যা করা হবে। যদি কোন জিম্মি ধর্মের ব্যাপারে বিদ্রূপ করে, তাকেও হত্যা করা হবে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَـٰنَ لَهُمْ ○

অর্থ : তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদের হত্যা কর। নিশ্চয় তাদের কোন প্রতিশ্রুতি নেই।

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি মুসলমানদের নিকট দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সে-ই কুফরের ইমাম, অগ্রনায়ক। তাকে হত্যা করা হবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ হয়তো তারা বিরত থাকবে। কাফিরদেরকে ভয় না দেখালে তারা ইসলাম সম্পর্কে বিদ্রূপ করা থেকে বিরত থাকে না। আর জিহাদ ও যুদ্ধ ছাড়া কাফিররা ভয় পায় না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ○

অর্থ : সুতরাং আপনি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ কর, আপনি তো নিজ সত্তারই জিম্মাদার আর আপনি মু'মিনদের উৎসাহিত করুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফিরদের শক্তি-সামর্থ প্রতিহত করে দেবেন। (সূরা নিসা : ৮৪)

এখন গোটা বিশ্ব আফগানিস্তানকে সম্মানের চোখে দেখে। কেন? কারণ, তারা বাতিলের বিরুদ্ধে, ইসলামের শত্রুদের (রুশদের) বিরুদ্ধে জিহাদ করছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের সাথে সাক্ষাতের জন্য বেশক'টি দেশের শাসক গিয়েছেন। কিন্তু রিগ্যান তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেননি। মিসরের হোসনী মোবারকও বেশ ক'দিন চেষ্টা-তদবীর করেছেন। নিজের ব্যক্তিগত দূত পাঠিয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু রিগ্যান তাকে সময় দেননি। জনৈক কবি চমৎকার একটি ছন্দ আবৃত্তি করে বলেছেন–

ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الحمام

"যে ব্যক্তি লাঞ্ছিত অপদস্থ ব্যক্তির জীবনযাপন দেখে ঈর্ষা করে, সে সত্যই লাঞ্ছিত অপদস্থ। বহু জীবন এমন আছে, যার থেকে মরণ অধিক শ্রেয়।"

পক্ষান্তরে একবার হেকমতিয়ারের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রেসিডেন্ট রিগ্যান অনেক পীড়াপীড়ি করলেন। হেকমতিয়ার তখন আমেরিকায় ছিলেন। কিন্তু হেকমতিয়ার রাজি হলেন না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত গিয়ে হেকমতিয়ারকে বললেন, রিগ্যান সাহেব আপনার সাথে দেখা করতে চান। হেকমতিয়ার বললেন, আমাকে আমাদের মজলিসে শূরার অনুমতি নিতে হবে। তাদের অনুমতি ছাড়া আমি তা পারি না। রাষ্ট্রদূত বললেন, এটা সহজ ব্যাপার। ইসলামাবাদে টেলিফোন করলেন। তারপর আফগানিস্তানের মজলিসে শূরার সদস্যদের থেকে রাষ্ট্রদূত অনুমতি নিলেন।

রিগ্যানের সাথে সাক্ষাতের দিন সকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রদূত এসে আনন্দের সাথে বললেন, মজলিশে শূরা সদস্যগণ রাজি আছেন। আপনি নিশ্চিন্তে দেখা করতে পারেন। হেকমতিয়ার বললেন, আমি তাদের পরামর্শের সাথে একমত নই। পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত তো বিস্ময়ে হতবাক। এ কেমন ব্যাপার! পকেটে দশ ডলার নেই, আবার রিগ্যানের সাথে দেখাও করতে চায় না! বললেন, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? প্রায় ষাটজন রাষ্ট্রপতি ও নেতা রিগ্যানের সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছেন, আর আপনি একী বলছেন! হেকমতিয়ার বললেন, আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করব না। যদি তোমরা পীড়াপীড়ি কর, তাহলে আমি এক্ষুণিই আমেরিকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তার এ শক্তি ও সাহস জিহাদের মাধ্যমেই তিনি অর্জন করেছিলেন।

জনৈক কবি বলেছেন :

العز في صهوات المجد مركبه المجد ينتجه الإسراء و السهر

لئن عمرت جعلت الحرب والدة و السمهري أخا و المشرفي أبا

لكل أشعث يلقى الموت مبتسما حتى كأن لـــه في قتله إربـــا

"জিহাদের ঘোড়ার পিঠে রয়েছে ইজ্জত ও সম্মান। জিহাদের জন্য নিশি রাতে গমন করা ও বিনিদ্র রাত্রি যাপন করাই ইজ্জত ও সম্মানকে জন্ম দেয়।

যদি আমি দীর্ঘায়ু পাই, তাহলে যুদ্ধকে আমার জননী বানাব আর সামহারী মজবুত বর্শাকে বানাব ভাই আর ইয়ামেনের মাশরাকী তরবারীকে বানাব আমার পিতা।"

উস্কখুস্ক চুল বিশিষ্ট প্রত্যেক মুজাহিদই হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়, যেন সে মৃত্যুর জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিল।

সুবহানাল্লাহ! যুদ্ধ, তরবারী আর জিহাদের মাঝেই রয়েছে এ উম্মতের ইজ্জত, সম্মান ও সফলতা। যারা জিহাদ ছাড়া অন্য কিছুর মাঝে ইজ্জত ও সম্মান খুঁজে বেড়ায়, তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাচ্ছে।

জিহাদ ছেড়ে দিলে এ উম্মতের অবস্থা কি হবে, সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

ليقذفن الله في قلوبكم الوهن و ليترعن من قلوب أعدائكم المهابة منكم ، قالوا : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا و كراهية الموت ـــ

"জিহাদ ত্যাগ করার পরিণামে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হৃদয়ে 'ওহান' নিক্ষেপ করবেন আর তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়ভীতি তুলে নেবেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওহান কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুনিয়ার ভালবাসা আর মৃত্যুকে অপছন্দ করা।"

সুতরাং দুনিয়াতে ইজ্জত, সম্মান ও প্রতিপত্তির সাথে থাকতে হলে এ উম্মতকে জিহাদ করতে হবে। জিহাদ ত্যাগ করলে অবমাননা, লাঞ্ছনা আর পরাধীনতা আমাদের পরিবেষ্টন করে নেবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔

অর্থ : শিরক ও কুফরী নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এবং দীন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তোমরা **কাফির-মুশরিকদের** বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক। (সূরা আনফাল : ৩৯)

সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও যারা তরবারী, ক্লাসিনকভ ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া আল্লাহর দীনের সাহায্য করতে চায়, তারা অলিক চিন্তা-চেতনার পেছনে ছুটছে। তারা দীনের চলার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত নয়।

জিহাদ না থাকার কারণেই তো ইহুদীরা বীরদর্পে তিউনিসিয়ায় প্রবেশ করে তার শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। ইসরাঈল ইরাকী পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে বিমান আক্রমণ করে সব মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। তিনটি আরব দেশ জ্বলছে। রক্তের পর রক্ত ঝরছে। কিন্তু ইহুদীদের বিরুদ্ধে একটি বুলেটও ছোঁড়া হচ্ছে না। আরবদের এত অস্ত্র গেল কোথায়? নিশ্চয়ই তা বিপদের সময়ের জন্য হেফাজত করে রাখা হয়েছে। যুদ্ধবিমান আর ট্যাংকগুলো বিপদের সময়ের জন্যই রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিপদ কবে আসবে? চরম মুহূর্ত কবে দেখা দেবে?

জনৈক ব্যক্তি প্রত্যেক দিন তার পিস্তল পরিষ্কার করে। উল্টেপাল্টে দেখে। প্রচুর সময় সে পিস্তলের পেছনে ব্যয় করে। একদিন তার স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বলল, তোমার বুঝি এই পিস্তল নাড়াচাড়া করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। এসব তুমি কী শুরু করে দিয়েছ? স্বামী বলল, বিপদ মুহূর্তের জন্যই এসব করছি। বেশি চেঁচামেচি করো না।

একদিন রাতে বাড়িতে চোর এল। চোর আসবাবপত্র জমা করতে লাগল। স্ত্রী টের পেয়ে স্বামীকে জাগিয়ে বলল, তোমার পিস্তল কোথায়? ঐ তো চোর এসেছে! স্বামী বলল, আরে, পিস্তল তো বিপদ মুহূর্তের জন্য রাখা হয়েছে। চোরের যা নেয়ার তা নিয়ে সে নির্বিঘ্নে চলে গেল আর পিস্তল বিপদ মুহূর্তের জন্য রয়ে গেল।

একদিন লোকটি তার স্ত্রীকে নিয়ে শহরের বাইরে দূরে কোথাও বেড়াতে গেল। একদল সন্ত্রাসী লোকটির সাথে এমন সুন্দরী নারীকে দেখতে পেয়ে স্ত্রীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগল। স্ত্রী তখন চিৎকার করে স্বামীকে ডাকতে লাগল। তখনো স্বামী তার পিস্তল ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভব করল না। বিপদ মুহূর্তের জন্য তা রেখে দিল। সন্ত্রাসীরা তার স্ত্রীকে নিয়ে গেল, তবুও তার বিপদ মুহূর্ত এল না!

তাই এখন প্রশ্ন, কত দিন পর্যন্ত এরা তাদের শক্তি ও অস্ত্র হেফাজত করে রাখবে? বিপদ মুহূর্ত কি এখনো আসেনি? কবে আসবে সেই দিনটি?

দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান আজ তাদের শক্তি, ধন-সম্পদ আর ক্ষমতাকে বিপদ মুহূর্তের জন্য রেখে দিয়েছে। যদি বলা হয়, এসো, আফগানিস্তানে জিহাদে যাই। তারা বলে, বিপদ মুহূর্তের জন্যই আমরা তৈরি হয়ে আছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○

অর্থ : তোমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, অথচ তারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বের করে দেয়ার সংকল্প করেছে। আর এরাই তো তোমাদের সাথে প্রথম বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর, অথচ আল্লাহ অধিকতর ভয়ের যোগ্য যদি তোমরা মু'মিন হও। (সূরা তাওবা : ১৩)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলছেন, এই কাফিররা, এই মুশরিকরা তোমাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। তোমাদের নবীকেও মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। তোমাদের ধন-সম্পদ, বাড়িঘর সবকিছু লুটে নিয়ে গেছে। তারাই তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যুদ্ধ শুরু করেছে। এরপরও কি তোমরা তাদের ভয় করতে থাকবে? তোমরা যদি প্রকৃত মু'মিন হও, তাহলে এদের ভয় কর না। আল্লাহকে ভয় কর আর জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়। আমিই তোমাদের সাহায্য করব।

আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছিলেন এবং ইসলামী ইতিহাসের পাঠক প্রত্যেক লোক তা বিশ্বাস করতে বাধ্য।

অষ্টম মজলিস

(١٢) وَإِنْ نَّكَثُوٓا أَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوٓا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ○ (١٣) أَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ (١٤) قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ○ (١٥) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ (١٦) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

অর্থ ঃ আর যদি তারা প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বিদ্রূপ করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কারণ, তাদের কোন প্রতিশ্রুতি নেই, যাতে তারা ফিরে আসে। তোমরা কি এমন দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বের করে দেয়ার সংকল্প করেছে, আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ আল্লাহই অধিকতর ভয়ের যোগ্য, যদি তোমরা মু'মিন হও। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের অপদস্থ করবেন। তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মু'মিনদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমরা কি মনে কর, তোমাদের এমনি ছেড়ে দেবেন, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন, তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে? আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত। (সূরা তওবা ঃ ১২-১৬)

আল্লামা ইবনে মুনযির বলেন, এ কথায় সকল উলামায়ে কেরাম একমত যে, কেউ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করে তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ মাসআলায় একমাত্র আবু হানীফা (রহঃ) ছাড়া আর কেউ মতবিরোধ করেননি। আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, যদি কোন যিম্মী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে না। কেননা, সে রাসূলের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত নয়। আর যদি কোন মুসলমান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করে, তবে তা তার ধর্ম ত্যাগের আলামত হবে অর্থাৎ বুঝা যাবে যে, সে পূর্ব থেকেই কাফের ছিল। ইসলামের কোন বিধান ত্যাগ করলে হত্যা করা হবে, তাই সে নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন সম্মানজনক পদের লোভে সে ইসলাম ধর্ম প্রকাশ করেছিল। আসলে মুসলমান হয়নি। তাই তাকে হত্যা করা হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে যদি কেউ ইসলামী বিধি-বিধান না মানে, তাহলে তার কোন মূল্য নেই। যখনই কেউ ইসলামী বিধি বিধান মেনে আল্লাহর নৈকট্যশীল হবে, তখন আলিম-ওলামার নিকট তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। সাধারণ মানুষের অন্তরে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। গোটা উম্মতের নিকট তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে কেউ ইসলামের বিধান না মানলে তার কোন মূল্য নেই। এ কারণে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) মানুষের মাঝে ধন-সম্পদ বণ্টন করার সময় বলতেন–

الإنسان و بلاءه ... الإنسان و سابقته ... الإنسان و حاجته...

"মানুষ তার আমল হিসেবে মর্যাদা পাবে। মানুষ দাওয়াতের ক্ষেত্রে চেষ্টা ও কোশেশ করার কারণে মর্যাদা পাবে। আর মানুষ তার প্রয়োজনের কারণে চেষ্টা-মুজাহাদা করবে।"

তাই মানুষ তার সত্যবাদিতা, লিল্লাহিয়্যাত ও আমলের দ্বারাই ইসলামী রাষ্ট্রে মর্যাদা পাবে। আর আমরা বর্তমানে যে সমাজে বসবাস করছি, তার অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إن بين يدي الدجال خدعة يصدق فيها الكاذب و يكذب فيها الصادق و يخون فيها الأمين و يؤتمن فيها الخائن —

"নিশ্চয়ই দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে ধোঁকাবাজির বেশকিছু বছর অতিক্রম করবে। তখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী আখ্যায়িত করা হবে। সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা হবে। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে খেয়ানতকারী আখ্যায়িত করা হবে। আর খেয়ানতকারীকে বিশ্বস্ত ব্যক্তি আখ্যায়িত করা হবে।"

আমাদের সমাজের অবস্থা বর্তমানে তা-ই হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় সম্পদ যত বেশি চুরি করতে পারে, তার ততই প্রমোশন হয়। যদি কোন দরিদ্র অসহায় ব্যক্তি পেটের দায়ে কিছু টাকা চুরি করে আর ধরা পড়ে, তাহলে তাকে জেলে দেয়া হয়। তাকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি প্রদান করা হয়। আর যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ লুটে নেয়, তাকে কোন শাস্তি দেয়া হয় না। বরং তার উন্নতি হয়। সচিব থাকলে তাকে মন্ত্রী বানানো হয়।

আমাদের ওখানের নামকরা এক কবিলার এক ব্যক্তির কথা বলছি। তার নাম ছিল আবূ লাহাব। লোকটি ছিল অত্যন্ত বাকপটু আর সাহসী। কারণ, তার পশ্চাতে আছে তার কবিলার শক্তি। সে ছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রী। প্রায়ই প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার বিবাদ হত। একবার এক শিশু একটি পয়সা গিলে খেয়ে ফেলল। সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হল। কিন্তু শিশুটিকে বাঁচানো গেল না। মারা গেল।

এ ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ পেল। একবার কথা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলল, দেশের অবস্থা আজ দারুণ শোচনীয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কী করছেন। একটি শিশু একটি পয়সা খেয়ে ফেলল। অথচ তাকে সুস্থ করতে পারলেন না। অকালে একটি ফুল ঝরে পড়ল। এটা দারুণ বিস্ময়কর ঘটনা।

তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলল, এরচেয়ে আরো বিস্ময়কর ঘটনা আমার জানা আছে। এক পয়সা গিলে খাওয়ার কারণে একটি শিশু মৃত্যুবরণ করেছে। অথচ মিলিয়ন বিলিয়ন টাকা এক ব্যক্তি গিলছে। কিন্তু সে মরছে না।

এই তো হল আমাদের সমাজের উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত সমাজের অবস্থা। তাদের আশপাশে কোন সত্যবাদী ও সৎ ব্যক্তিকে পাবে না। মুনাফিক, কপট আর তোষামুদে লোকেরাই তাদের চারপাশে ভীড় করে থাকে। জর্দানের কথাই বলি। সেখানে কোন মন্ত্রণালয়ে কোন আলিম খুঁজে পাবেন না। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হল, আজ থেকে ত্রিশ বছর যাবত জর্দানের আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী খ্রিস্টান। ১৯৫৫ সাল থেকে এখনো পর্যন্ত খ্রিস্টানরাই এ মন্ত্রণালয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী কেউ 'পিতা, পুত্র ও পুণ্যাত্মায়' অর্থাৎ ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস না করলে সে এ মন্ত্রণালয়ে কোন ইনসাফ পাবে না। তাকে একথা বলতেই হবে, তিনজনে মিলে আল্লাহ।

মুসলমান রাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রীর অবস্থা তো এমন হওয়া দরকার যে, যখন সে ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোন কথা-বার্তা বা কাজকর্ম করবে, তখন মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেবে। ব্যক্তিগত কোন পুস্তক পাঠের সময় তার লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন সে সরকারি বিদ্যুৎ ব্যয় না করে। ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র লেখার সময় রাষ্ট্রীয় কোন কলম-কালি-কাগজ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে।

ভাইয়েরা [illegible] বুঝের কথা আর কী বলব। ইসলাম নির্দিষ্ট কোন স্থানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। ইসলাম কোন একটি নির্দেশ বা বিধি-বিধানের মাঝে সীমিত নয়। ইসলাম হল জীবন। এক মহান ব্যক্তির ঘটনা বলি। আমাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনি হলেন ড. ইসহাক ফারহান। তিনি জর্দানের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর মন্ত্রণালয়ের অধীনেই গোটা জর্দানের স্কুলগুলোতে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হত। কেউ যদি তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁকে বলত, ছেলেটা তো তার পাঠ্যপুস্তক হারিয়ে ফেলেছে, একটি পুস্তকের খুব দরকার। তিনি তখন একটি পুস্তকের ব্যবস্থা করে দিতেন এবং মাস শেষে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সে পুস্তকের মূল্য পরিশোধ করে দিতেন।

ড. ইসহাক ফারহানকে আল্লাহ তা'আলা অসীম মেধা দান করেছিলেন। কেমিস্ট্রিতে উচ্চজ্ঞান অর্জনের জন্য এবং ডক্টরেট নেয়ার জন্য তিনি আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিলেন। ইহুদীরা তখন তাঁর পিছু নিল। বিভিন্নভাবে তাঁকে ইহুদীদের এক গ্রুপের এজেন্ট হওয়ার জন্য ফুসলাল। সকল সার্টিফিকেট সহজে দেয়ার লোভ দেখাল। অর্থের লোভ দেখাল। কিন্তু তাকে কোনভাবেই পথচ্যুত করতে পারল না। বিমানের সিঁড়িতে ওঠা পর্যন্ত তাঁর পেছনে লেগেই রইল। বিমানের সিঁড়িতে পৌঁছে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, আমি মুসলমান। কিছুতেই কোন ইহুদী দলের এজেন্ট হতে পারব না।

ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট করতে পারলেন না। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করলেন। এটা ছিল আল্লাহর এক বিরাট নি'আমত। ফিরে আসার পর তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মজীবন শুরু করলেন। পাঠ্যসূচিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনলেন। জর্দানের পাঠ্য-পুস্তকে ইসলামী ভাবধারার অনুপ্রবেশ করালেন। কাতার, ওমান, ইয়ামেন প্রায় প্রত্যেকটি আরব দেশের পাঠ্য-পুস্তককে ইসলামী আদর্শে পরিপুষ্ট করে তুললেন।

তাই বলছিলাম, মানব জীবনে শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ গুরুত্ব আছে। জীবনে সবচেয়ে বড় বিপদ হল শিক্ষার সাথে সাথে কোন বিজ্ঞ আলিমের দীক্ষা লাভ না করা। যদি তুমি দীক্ষা লাভ না করতে পার, তাহলে তুমিই ইসলামের জন্য বিপদ হতে পারে। বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী শক্তির গুপ্তচরদের লোভনীয় ব্যক্তি হতে পার। গুপ্তচররা সর্বপ্রথম তোমার দ্বারাই উপকৃত হবে হয়ত।

আমি বহু দেখেছি, গুপ্তচররা ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তাদেরই কাজে লাগিয়েছে, যারা শুধুমাত্র কিতাবের পাতা উল্টিয়ে শিক্ষা জীবন শেষ করেছে; কিন্তু কোন আদর্শবাদী ওস্তাদের নিকট ইসলামী দীক্ষা গ্রহণ করেনি।

গুপ্তচররা প্রথম এদেরকে টার্গেট করে। তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এদেরকে নিয়ে ছোট একটি গ্রুপ তৈরি করে। বিভিন্নভাবে ব্রেনওয়াশ করতে করতে একদিন বলে, আমরা কখনো বলি না, নামায পড়তে হবে না। রোযা রাখতে হবে না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমরা কখনো কোন খারাপ উক্তি করতে চাই না। তবে আমরা আপনাদের নিকট এতটুকু আশা রাখি, আমাদের সাথে আসুন। আমাদের কথা শুনুন। আপনার নামটা আমাদের দপ্তরে লিখিয়ে নিন।

আসলে এরাই ইসলামের শত্রু। এরাই মুসলমানের শত্রু। ধীরে ধীরে এদের মন-মগজ ও চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনা হবে। ইসলাম ছেড়ে তারা জাহেলী জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত হবে। কমিউনিস্টদের বড় এজেন্ট হবে। কিছুদিন পর এরাই বলবে, মসজিদের এই কট্টরপন্থী লোকগুলো সকল রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের হোতা। এদেরকে মসজিদ থেকে বের করতে হবে। ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত লোকগুলোকে এরা নিঃশেষ করার পাঁয়তারা করতে থাকবে। শুধুমাত্র দীক্ষা পায়নি এ কারণেই তারা ইসলামের বন্ধু না হয়ে ইসলামের শত্রু হল। তাই শিক্ষা জীবনে দীক্ষার অপরিসীম প্রয়োজন রয়েছে।

জর্দানের এক ইসলামী দলের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতার সাথে আমার একবার সাক্ষাৎ হল। তিনি তখন সকল মানুষের সংশ্রব ত্যাগ করে নির্জনবাস শুরু করেছেন। কোথাও যান না। ঘর থেকে বের হন না। নামায

রোযা ও কিয়ামুল লাইলে সময় কাটান। দিন-রাত লেখাপড়া আর ইবাদতে কাটান। কেউ তার সাথে সাক্ষাৎ করুক তাও তিনি চান না। তিনিও কারো সাথে সাক্ষাৎ করেন না। এমনকি কেউ তাকে সালাম দেবে, এ কারণে মসজিদে এসেও নামায পড়েন না।

আমি তার নিকট গিয়ে তাকে সালাম দিয়ে বললাম, কিসের কারণে আপনার এ অবস্থা হল? তিনি আমাকে বললেন, কেউ আমার সাথে সাক্ষাৎ করুক এটা আমি চাই না। তবে তোমাকে পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি। বলল, আমি সকল মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করেছি। এমনকি আমার সন্তানরা ও স্ত্রী- আমরা একই বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও আমাদের মাঝে বিস্তর ব্যবধান।

আমি বললাম, আপনার এ অবস্থা হল কেন? তিনি বললেন, তুমি জান, আমি একটি ইসলামী দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতা ছিলাম। প্রসিদ্ধ লেখকদের একজন ছিলাম। প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি রাজনৈতিক জনসভা, মতবিনিময় সভা ও প্রোগ্রাম করতাম। একবারের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি লাগাতার সতের ঘন্টা প্রোগ্রাম করলাম। আমার তখন ধারণা হচ্ছিল, আমরা এবার সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে বিজয়ী হব। তারপর থেকে সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা শুরু করলাম। ফলে আটচল্লিশ বা উনপঞ্চাশজন সাথিসহ আমাকে জেলে দেয়া হল।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই আমার সকল সঙ্গী দল ত্যাগ করল। তারা পত্রিকায় সরকারের পক্ষে বিবৃতি দিল এবং জেল থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। শুধুমাত্র আমিই জেলখানায় রয়ে গেলাম। আমার নিকটও ঐ একই রকম প্রস্তাব এল। কিন্তু আমি তা গ্রহণ করতে পারলাম না। সরকারি প্রস্তাবকে কঠিন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করলাম।

দীর্ঘদিন জেলে থাকার পর আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের আসল রোগেরই চিকিৎসা হয়নি। আমি তাদেরকে নিয়ে আল্লাহর নিকট পৌঁছতে পারিনি। আমি তাদেরকে রাজনীতি শিক্ষা দিয়েছি। চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রের রাজনৈতিক সমাধান শিক্ষা দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক জুড়ে দেইনি। তাদের রূহের খাবারের ব্যবস্থা করিনি। আল্লাহর পথের দায়ীকে ধৈর্য শিক্ষা দেইনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী শিক্ষা দেইনি। নবীদের জীবনাদর্শও শিক্ষা দেইনি। কুরআনে বর্ণিত তাদের ঘটনাবলি শিক্ষা দেইনি। শুধু রাজনীতি আর রাজনীতির কথা বলেছি। আমাদের সারাদিনের আলোচনার বিষয় থাকত, অমুক আলেম আমেরিকার এজেন্ট, অমুক আলেম রাশিয়ার এজেন্ট ইত্যাদি। এই ছিল আমাদের নিত্যদিনের আলোচনার বিষয়। এটা ছিল বিরাট মুসিবত। আলেমদের সমালোচনার চেয়ে বড় বোকামী আর কি হতে পারে! আল্লামা ইবনে আসাকির বলেছেন–

اعلم أن لحوم العلمآء مسمومة و عادة الله في هتك أستار من أكلها معلومة و من أطلق لسانه على العلمآء بالثلب أصابه الله بموت القلب —

“জেনে নাও, আলিমদের গোশত বিষাক্ত। যারা আলেমদের দোষ বর্ণনা করে বেড়ায়, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান হল, যে ব্যক্তি আলিম-উলামার দোষ বর্ণনা করে, তাদের দোষচর্চায় মগ্ন হয়, আল্লাহ তাদের কলবকে মৃত্যুদান করেন।” (ফলে তারা হিদায়াতের পথ থেকে বঞ্চিত হয়)।

হ্যাঁ, আমি তাদের নিয়ে অনেক ভেবেছি। অনেক চিন্তা করেছি। দেখবে, এদের গায়ে বিরাট কোর্তা। কোর্তার পকেটও বেশ বড়। পকেট ভরে আছে ভিজিটিং কার্ডে। তাতে লিপিবদ্ধ আছে সে আমেরিকার এজেন্ট, বৃটেনের এজেন্ট ইত্যাদি। তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলেই হাসিমুখে স্বাগত জানাবে। কুশলাদি বিনিময় করবে। তারপর একটি কার্ড দিয়ে সাক্ষাতের নিবেদন জানাবে। এদের হাত থেকে বাঁচা বড়ই মুশকিল।

এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমাদেরকে আমীন সাল্লারের অভিজ্ঞতার আলোকেই চলতে হবে। তিনি বলেছেন– আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দলের প্রধান ব্যক্তির নিকট গেলাম। তিনি তখন বৈরুতে থাকতেন। তাকে

বললাম, স্যার, দেখলেন তো বাস্তব কত কঠিন। বিপদের সময় প্রকৃত কর্মীর পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র এক সপ্তাহ যেতে না যেতে সাতচল্লিশ বা আটচল্লিশজন দল ত্যাগ করে চলে গেল। এর কারণ খুঁজে দেখেছেন?

আমার মনে হয় এর কারণ হল, আমরা তাদের কুরআন শিক্ষা দেইনি। সুন্নাহ শিক্ষা দেইনি। আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক জুড়ে দেইনি। তাই আমাদের এই নিষ্ঠুর বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আমাদের দলীয় পাঠ্যসূচিতে কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের জীবন-চরিতও থাকতে হবে। ইবাদাতে নিশি জাগরণ ও তাহাজ্জুদের অভ্যাস আমাদের কর্মীদের মাঝে গড়ে তুলতে হবে।

আমার কথা শুনে তিনি নীরবতায় ডুবে গেলেন। তারপর বললেন, শোন আমীন! আমি আমার দলে দরবেশের সমাবেশ ঘটাতে চাই না। তাহলে যুবকরা এসে আমার চারপাশে জড়ো হবে না।

আমীন সাল্লার বলেন, আমি তখন বুঝে ফেললাম, এ ধরনের দলের সাথে থাকায় কোন লাভ নেই। কোন ফায়দা নেই। আমি দল ছেড়ে চলে এলাম।

তারপর আমি আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন হলাম। আত্মসন্ধানে লেগে গেলাম। আমার তখন দৃঢ়বিশ্বাস জন্ম নিল, আমি অতীত জীবনে আল্লাহর ইবাদত করিনি, দলের ইবাদত করেছি। দিবা-নিশি আমার মাথায় শুধু এক চিন্তাই ঘুরপাক খেত, কীভাবে আমার দল বিজয়ী হবে, কীভাবে আমার দলের সমর্থন বৃদ্ধি পাবে। ন্যায় অথবা অন্যায়, বাতিল অথবা হকের কোন চিন্তা করিনি, কীভাবে আমাদের দল বিজয়ী হবে। কীভাবে আমরা অন্যান্য দলের আগে বেড়ে যাব। এসব চিন্তা সর্বদা মাথায় ঘুরপাক খেত। আর যারা আমাকে দেখত, তারা ভাবত, আমিই বিজয়ী হব আর আমিই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের এ চিন্তা, এ ভাবনার মাঝে অন্যান্য দলের চিন্তা ও ভাবনায় কোন পার্থক্য ছিল না। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত দল, সমাজতন্ত্রের চেতনায় উজ্জীবিত দল বা অন্যান্য দলের থেকে আমাদের দলের চিন্তা-চেতনায় কোন পার্থক্য ছিল না। তবে আমাদের দলের সাইনবোর্ডটি ছিল ইসলামী। অথচ এ দলের প্রধানের নিকট যদি কেউ এসে বলে, অমুক ব্যক্তিটি অত্যন্ত ভাল, রাত জেগে ইবাদত করে, দিনে নফল রোযা রাখে, মানুষের সাথে তার আচার-আচরণ অত্যন্ত চমৎকার, তাকে কি আমাদের দলে নিয়ে নেয়া যায় না? তাহলে সে স্পষ্ট বলে, না। সে ভাল মানুষ, যোগ্য মানুষ। এতে সন্দেহ নেই। তবে সে রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার যোগ্য নয়। দলীয় কাজ এক ভিন্ন বিষয়। সবাই এর যোগ্য নয়।

আলহামদুলিল্লাহ, ত্রিশ বছরের বেশি হবে আমি দাওয়াতের কাজে আছি। দীর্ঘদিনের এই মেহনত, মুজাদাহা, পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতার পর আমি কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি-

এক. যে আন্দোলন, যে জিহাদী কার্যক্রম, যে ইসলামী রাজনীতি আত্মশুদ্ধি ও হৃদয়কে শুচিশুদ্ধ করার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না, তার পতন অবশ্যম্ভবী, তার কাঠামো যতই মজবুত হোক না কেন। কারণ, দাওয়াতের স্বভাব হল, এ কাজে যারা সম্পৃক্ত, তাদের সে অহংকারী করে তোলে। তার দাওয়াতে নতুন নতুন লোক যোগদানের ফলে তার মধ্যে এর সাফল্যের অহংকার ভর করে। এমন অবস্থায় যদি দাঈ সে কাজের উপযুক্ত না হয়, তাহলে সে দাওয়াতের জন্য এবং ইসলামের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। তাই দাওয়াতের কাজে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার। নিজেকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে নিশি জাগরণে অভ্যস্ত করতে হবে। নফল নামায ও রোযায় আন্তরিক হতে হবে। বুযুর্গ ব্যক্তির সাহচর্যে থাকতে হবে।

দুই. যে ব্যক্তি দাওয়াতের কাজে মশগুল রইল, অথচ নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করে নিল না; চিন্তার নির্মল প্রস্রবন ধারায় সে স্বচ্ছ হল না; তার দাওয়াত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে পারে না। আল্লাহর ইবাদতে সে আন্তরিক নয়। এদের হৃদয়ে পংকিলতা জমাট বেঁধে যায়। এরা সকালে ওঠে, রাতে ঘুমায়। ইবাদত-আমলের ভাবনা এদের নেই। কোন ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের এমন স্বভাব কাম্য নয়। অমাবস্যার আঁধারে ঘেরা এমন সংগঠন ও তার কর্মীদের ভবিষ্যৎ।

তিন. নিজের দল থেকে কোন কল্যাণমূলক কাজ হলেই তাকে সমর্থন করবে, পছন্দ করবে। অন্য কোন দল তা করলে পছন্দ হবে না, ভাল লাগবে না। এমন অবস্থায় ইবাদত প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর জন্য হয় না। বরং দলের জন্য হয়। কেননা, যদি ইবাদত আল্লাহর জন্য হত, তাহলে তো যতভাবে যত পথে আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসার হত, হৃদয় ততই বিমোহিত ও আনন্দিত হত। এক্ষেত্রে যদি তাবলীগ জামাত থেকে কোন কল্যাণমূলক কাজ হয়, তাহলে কেন তুমি তা অপছন্দ কর? যদি সালাফীদের থেকে কোন কল্যাণমূলক কাজ হয়, তাহলে কেন তুমি তা অপছন্দ কর? সালাফী হয়ে যদি তুমি আল্লাহর জন্যই কাজ করতে, তাহলে তুমি সালাফী ছাড়া অন্য দলের কোন ব্যক্তি হাদীসের কোন ভাল নির্ভরযোগ্য কিতাব রচনা করলে তুমি তা দেখে খুব আনন্দিত হতে। বলতে, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ এ কিতাব দ্বারা বহু মুসলমানকে উপকৃত করবেন। যুবকদের তুমি তা অধ্যয়নে উৎসাহিত করতে। উদার মনে দল ও মতের উর্ধ্বে উঠে এ ধরনের আচরণ করা তখনই সম্ভব, যখন কেউ আল্লাহর জন্য সবকিছু করে। যখন কেউ দলমত নির্বিশেষে মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করে।

"ছক বাঁধা দলীয় নীতি, দলীয় কৌশল"- এ বিষয়গুলো এমন ক্ষতিকর, যা নিজ দলের বাইরের কোন মানুষের প্রশংসায় উজ্জীবিত করে না। চাই তা যতোই ভাল, সৎ ও নেক হোক।

আমাদের মনের অবস্থা যদি এমনই হয় যে, আমরা নিজ দলীয় কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোন দলের কার্যক্রমকে পছন্দ না করি; তার প্রচার প্রসারে বাঁধাদান করি; তাহলে আমি বলব, আমরা আমাদের কৃতকর্মের মাধ্যমে এ বাস্তব বিষয়টি প্রমাণ করছি যে, আমরা দীনের বিজয় চাই না। দীনের উন্নতি অগ্রগতি চাই না। কারণ, দীন হল এক বিশাল বহমান নদী। এ থেকে বেরিয়ে এসেছে ইখওয়ানুল মুসলিমীন নামক এক শাখা। সালাফী নামের এক শাখা। তাবলীগ জামাত নামের এক শাখা। অমুক দল নামের এক শাখা ইত্যাদি আরো বহু শাখা এর রয়েছে। এই সকল শাখার সম্পর্ক মূলের সাথে রয়েছে।

এমন অবস্থায় তুমি চাচ্ছ, দীনের নদীর সকল শাখা শুকিয়ে শেষ হয়ে যাক আর একমাত্র তোমার শাখাটি প্রবাহমান থাকুক। কেউ যদি তোমাকে এসে বলে, তাবলীগ জামাত সম্পর্কে আপনার কী মতামত? তারা অত্যন্ত ভাল লোক। অত্যন্ত ভাল কাজ করছে। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে দলবদ্ধভাবে বেরিয়ে যায়। ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন মসজিদে। সাধারণ মানুষকে হাত ধরে ধরে মসজিদে নিয়ে আসে। কালিমা শিখায়, নামায শিখায়, ইসলামী আকীদা ও আদব শিক্ষা দেয়। এদের ব্যাপারে আপনার কী ধারণা? আপনি সোজা তাকে বলে দিলেন, না না, ওদের নিকট যেও না। তুমি কি তোমার জিহাদী বাই'আতের কথা ভুলে গেছ?

ভাই, একটু ভেবে দেখ। বিজয় আল্লাহর হাতে। তিনিই তো বিজয় দান করবেন। কেন তুমি তাকে একটি ভাল কাজ থেকে বিরত রাখছ। ইসলামের আদর্শ এটা নয়। সকল ভাল কাজের সমর্থন ও সহযোগিতা ইসলামের কাম্য।

কেউ যদি তাদের সাথে দাওয়াতের কাজে যায়, তাহলে একজন নামাযের পর ঘোষণা করবে, দীন ও ঈমানের আলোচনা হবে, সবাই বসবেন। তারপর সবাই মিলেমিশে বসল। একজন উম্মী হয়ত দাঁড়িয়ে কিছু বলল, এভাবে দু'সপ্তাহ তাদের সাথে মসজিদে মসজিদে কাটিয়ে দিল। হয়ত এ দিনগুলোতে সে শুধুমাত্র দু'টি কালিমাই শিখতে পেরেছে। তুমি তাকে জিজ্ঞেস করলে, কী খবর? এভাবে সময় নষ্ট করছ কেন? কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব ক্রয় করে তা থেকে দীনের তত্ত্ব শিখে নিচ্ছ না কেন? সে তার উত্তরে বলছে, ভাই আমি তো বরকতের আশায় তাদের সাথে আছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله فيمن عنده —

"আল্লাহর কোন ঘরে কিছু লোক সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করলে ও তা অধ্যয়ন করলে তাদের উপর সাকিনা (হৃদয় প্রশান্তি) অবতীর্ণ হতে থাকে, রহমত তাদের আচ্ছাদিত করে ফেলে আর ফেরেশতারা তাদের পরিবেষ্টিত করে রাখে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের নিয়ে তাদের আলোচনা করেন।"

ভাই! আমি তো জীবনে এর চেয়ে বেশি কিছু চাই না। এই কথাগুলো, এই বিশ্বাসগুলো আজ আমাদের মধ্যে থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এটা বড় দুঃখের কথা, ভীষণ কষ্টের কথা। আমরা এমন হতে দিতে পারি না।

ভাইয়েরা আমার! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। আরেকটি কথা অবশ্যই মনে রাখবে, প্রত্যেক দলের কর্মীদের তরবিয়ত দরকার। আত্মশুদ্ধি বা দীক্ষা দরকার। প্রত্যেক দলের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি দরকার। যে কোন একটি ইসলামী দলের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা দরকার। কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করবে। কখনো দলের ইবাদত করবে না।

কিছু লোকের মাযহাবী বাড়াবাড়ির কারণে আমরা আফগান ভাইদের থেকে কী কষ্টই না পাচ্ছি, তা কি ভেবে দেখেছ? কান্দাহার প্রদেশে এখনো আরব মুজাহিদরা প্রবেশ করতে পারছে না। কেন? একটি ফতওয়াই এর কারণ। সেখানের কট্টরপন্থীরা ফতওয়া দিয়েছে, আরবদের থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নেয়া ও তাদের রণক্ষেত্রসমূহে প্রবেশের সুযোগ দেয়া বৈধ নয়। কারণ, তারা হানাফী মাযহাবকে নিঃশেষ করে সেখানে ওহাবী মাযহাব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। মাযহাবী গোঁড়ামি তাদের এ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে।

দলীয় গোঁড়ামি মাযহাবী গোঁড়ামির মতই ক্ষতিকর। এসব গোঁড়ামির ফলে মুসলমানদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। চিন্তার জগতে বিচ্ছিন্নতাসহ বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে। ইবাদতে ইখলাস নসীব হয় না। শুধুমাত্র দলীয় লোকদের ছাড়া আর কাউকে মহব্বত করার তাওফীক হয় না। অন্য কারো জন্য কল্যাণকামিতার মনোভাবও সৃষ্টি হয় না। তাই বলছি, যে কোন দলের সাথে মিশে কাজ কর। তবে সর্বদা সচেতন থাকবে, তোমার হৃদয় যেন দলের পূজা না করে। গোটা বিশ্বের মুসলমানদের খেদমতের জন্য তোমার হৃদয় উন্মুখ থাকতে হবে।

আমার নিকট একজন এসে বলল, দেখলেন তো, এরা তাবলীগের নামে কী শুরু করেছে! এরা মানুষকে জিহাদের দিকে ডাকে না। জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করে না। আরেকজন বলল, এরা রাজনীতি করে না, রাজনীতি করাকে পছন্দও করে না।

আমি বললাম, আরে ভাই! এরা তো এ কাজটা করছে যে, হোটেলে কিংবা চায়ের দোকানে নেশাগ্রস্ত মদ্যপ লোকগুলোকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে আসছে। কালিমা শিখাচ্ছে, নামায শিখাচ্ছে। বেশ তাহলে তুমিও তাদের নিকট যাও। তাদেরকে জিহাদের পথে নিয়ে আস।

একবার আমাদের ক্যাম্পে কিছু আরব তাবলীগের দাওয়াত নিয়ে এল। ভাই মুসান্না ও ইলিয়াসও তাদের সাথে ছিল। আমাদের বুঝাতে এল। আমরাও তাদের বুঝাতে চেষ্টা করলাম। পরিশেষে তারা আমাদের সাথে রয়ে গেল। জিহাদে শরীক হল। বিশ্বাস কর, তারা যা করছে, তা কখনোই বক্র দৃষ্টিতে দেখার নয়। তারা ইসলামের বিরাট খেদমত করছে। ইসলামী জগতে তারা বহু কল্যাণকর কাজ করে যাচ্ছে। তবে প্রত্যেক দলে কিছু না কিছু ত্রুটি আছে। তুমি দোষগুলোই শুধু দেখলে তো হবে না। গুণগুলোও দেখতে হবে। বর্তমান যুগের সালাফীরা বেশ গোঁড়া। কিন্তু তারাও তো ইসলামের খেদমত করছে। তারা মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মেধাকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করছে। আমরা উন্মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তা-চেতনা ও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানীর অবদানকে কখনো ভুলব না। তারই কারণে আমি আকীদা-বিশ্বাসে সালাফী। তবুও কিছু লোক আছে, তারা শাইখ ইবনে বায বা অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় আরবদের নিকট গিয়ে আমার বিরুদ্ধে নানা কথা বলে। আমি নাকি আফগান জিহাদে সালাফীদের বিরুদ্ধে কাজ করছি। আমি অমুক অমুক সালাফী দলগুলোকে

অপছন্দ করছি ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বলি, তোমরা ইবনে বায-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে যা খুশি বল। অন্যদের নিকট আমার বিরুদ্ধে যত খুশি দোষ বল। এসব বিষয় নিয়ে আমি কম ভাবি। আল্লাহর দরবারে আমি মুসলিম ও প্রিয় বান্দা হতে পারলেই চলবে।

একবার হজ্জে গিয়ে শাইখ ইবনে বাযের সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। আমাকে দেখেই বললেন, অনেকে তোমার প্রশংসা করে, অনেকে আবার দোষারোপ করে। এর কারণ কি? আমি বললাম, আপনি কি জানেন, আমি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের একজন সদস্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি তা জানি। আমি বললাম, কিন্তু আল্লাহর কসম করে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি আপনার পার্থিব সম্পদের কিয়দাংশও কখনো গ্রহণ করার ইচ্ছে করেছি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহর কসম করে বলছি, ভবিষ্যতেও আপনার সম্পদের কোন কিছুতেই আমি লোভ করব না। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়ই আপনার সাথে কথা বলছি। তার সাথে দেখা করার পূর্বে আমি চিন্তা করেছি, ইবনে বায রাগ করলে বা অসন্তুষ্ট থাকলে তাতে আমার কী হবে! ইবনে বায থেকে তো আমার প্রত্যাশার কিছু নেই।

মনের এই ভাবনার উত্তরে মন আমাকে বলেছে, তবে তুমি একজন সৎ ও ভাল লোককে দাওয়াত থেকে কেন বঞ্চিত করেছ। তাই আমি শাইখ ইবনে বাযকে বললাম, আমি ইখওয়ানের একজন সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমি কিন্তু ইখওয়ানের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে আপনার সমপর্যায়ের মনে করি না। ইখওয়ানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চেয়ে আমি আপনাকে বেশি মহব্বত করি, ভালবাসি। কারণ, আমি মনে করি, আপনি তাদের চেয়ে অনেক বেশি ইসলামের খেদমত করছেন। আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনি যে সালাফী আকীদার প্রচার করছেন, আমি আপনার সাথে পরিচিত হবার দশ বছর আগে থেকে সেই আকীদায় বিশ্বাসী। এটা আমাদের নিকট নতুন কিছু নয়।

তবে আমি এই সালাফী আকীদাকে জিহাদের বাজারে পণ্য বানাতে চাইনি। কেন আপনারা এই আকীদাকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার জন্য আমার উপর চাপ সৃষ্টি করছেন? সালাফী আকীদা আমার আকীদা। আর আমি বিশ্বাস করি, মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেককে পরকালে মুক্তি পেতে হলে এ আকীদাই পোষণ করতে হবে। কিন্তু এই আকীদাকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে এ কথা বলা যে, সবাইকে কথিত সালাফী আকীদায় বিশ্বাসী হতে হবে। সালাফী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, এটা সংকীর্ণতা।

তারপর আমি তাকে বললাম, আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনি আমার নিকট আমার পিতামাতার চেয়ে বেশি প্রিয়। আর বাস্তবেও তাই। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, আপনি বহু কল্যাণকর কাজ করছেন। আপনার মাঝে ইখলাস আছে। আপনার মাঝে মুসলমানদের উপকারের নির্মল প্রেরণা রয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন মুসলিম এলাকা পাওয়া যাবে না, যেখানে ইবনে বাযের সাহায্যের হাত পৌঁছেনি।

ইবনে বায এক মহান ব্যক্তি। সালাফী আকীদায় বিশ্বাসী হলেও দলীয় সংকীর্ণতা তাঁর মাঝে নেই। সালাফীদের নোংরা রাজনীতি তিনি পছন্দ করেন না। তাঁর মেধা ইসলামী, তাঁর হৃদয় ইসলামী, তাঁর প্রাণ ইসলামী। তাই যেখানেই ইসলাম আছে, তিনিও সেখানে আছেন। তিনি ইসলামকে ভালবাসেন। ইসলাম ইখওয়ানদের মাঝে থাকলে তিনি ইখওয়ানদের ভালবাসবেন। অন্য কারো মাঝে ইসলাম থাকলে তিনি তাদেরও ভালবাসবেন।

সিরিয়ায় জিহাদ শুরু হল। তিনি সেখানে গেলেন। সবকিছু সচক্ষে দেখলেন। তারপর ফিরে এসে ফতওয়া দিলেন, যাকাতের সম্পদ ও অন্যান্য দান জমা করে সিরিয়ার জিহাদের জন্য ব্যয় করা বৈধ।

তিনি শুনলেন, আফগানিস্তানে জিহাদ চলছে। তিনি দেরি করলেন না। ফতওয়া দিলেন, আফগানিস্তানের জিহাদ ফান্ডে যাকাত বা অন্যান্য দান প্রদান করা বৈধ। যদি শুনেন, দুনিয়ার কোন প্রান্তে মুসলমান জনগোষ্ঠী নির্যাতিত-নিপীড়িত হচ্ছে, তাহলে সেই শাসকের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিয়ে দেন। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাসূলের অনুসরণেই বেশি ব্যস্ত ও অস্থির। সালাফী নামের কোন দলের সাথে তার কোন অন্ধ সম্পর্ক নেই।

কিছু লোক আছে, তারা সালাফী মতবাদকে রাজনৈতিক দলের রূপ দিতে চায়। তাদের দলের সদস্য যে হবে, সে আখেরাতে নাজাত পাবে আর যে কথিত সালাফী দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে তার আকীদায় ভ্রান্ত। তার ধ্বংস অনিবার্য। তারা কারণে-অকারণে ইবনে বাযের নিকট ছুটে যায়। ইবনে উসাইমীনের নিকট ছুটে যায়। একবার তাদের একদল লোক আমার নিকট এসে বলল, শুনতে পেলাম, আপনি নাকি বলেন, সৌদি শাইখরা হায়েয ও নেফাসের শাইখ। আমি বললাম, এ কথা বলে আপনারা কাদের বুঝাতে চাচ্ছেন। তারা বলল, যেমন শাইখ ইবনে বায, শাইখ ইবনে উসাইমীন।

আমি বললাম, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! শাইখ ইবনে বায ও শাইখ ইবনে উসাইমীন সম্পর্কে এ ধরনের কথা আমার মুখ দিয়ে কখনো বের হবে না। কোন আলিম সম্পর্কে এ ধরনের কথা কখনো বলেছি বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আর এ শাইখদ্বয় সম্পর্কে বলা তো একেবারেই অসম্ভব। আমি এদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মহব্বত করি, শ্রদ্ধা করি।

আমি জানি, আরবে কিছু লোক আছে, তারা তাদের দীনকে খুব অল্প মূল্যে বিক্রি করে থাকে। আমি মাঝে-মধ্যে তাদের নিকট গিয়ে বলতাম, আপনারা কেবল মৃত ব্যক্তিদের ও কবরের শিরক সম্পর্কে আলোচনা করেন। জীবিতদের শিরক সম্পর্কে কোন আলোচনা করেন না। সাইয়েদ বাদাবী ও তার কবর ছাড়া তো আর কোন কথাই আপনাদের বলতে দেখি না। যদি সাইয়েদ বাদাবীর হাফেজ আসাদের মত পুলিশ বাহিনী ও ক্ষমতা থাকত, তাহলে তার সম্পর্কে আপনারা টু-শব্দটি পর্যন্ত করতে পারতেন না।

হাফেজ আসাদের সেনাশক্তি আছে। ক্ষমতা আছে। তার দেশে সে মুসলমানদের ও ইসলামকে হত্যা করছে। তার সম্পর্কে তো কোন কর্মসূচী আপনারা নিচ্ছেন না?

তাই বলছিলাম, তরবিয়ত ও দীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। দলবদ্ধ হয়ে থাকারও প্রয়োজন রয়েছে। তবে দলবদ্ধ হব আল্লাহর ইবাদত করার ও তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দলের ইবাদত করার জন্য নয়। বর্তমান সময়ে এটাই হল বড় মুসীবত। এ কারণেই আমাদের ভাল আমলগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তুমি যদি কোন দলের কাউকে জিজ্ঞেস কর, ভাই! অমুক ব্যক্তি কেমন? বলবে, আরে রাখুন তার কথা! তার এই অবজ্ঞার কারণ, সে তার দলের লোক নয়। হোক না সে যতই যোগ্য, যতই প্রতিভাবান। ইসলামের নামে যে সব দল কাজ করছে, তাদের এখন এই একই চরিত্র, তারা তাদের দলীয় লোকদের ছাড়া অন্য কারো কল্যাণ কামনা করে না।

বেশ ভাল কথা। আমি তাহলে জিজ্ঞেস করতে চাই, পৃথিবীতে তোমার দলের কতজন লোক আছে? মুসলমানের সংখ্যা এক হাজার মিলিয়ন। এদের সবার জন্যই তো তোমাকে কল্যাণকামী হতে হবে। এদের মাঝেই তো দীনের প্রচার-প্রসারের মেহনত করতে হবে। সে হিসেবে শতকরা কতজন হবে, যারা তোমার দলভুক্ত নয়? তাদের অবস্থা কী হবে?

বন্ধুরা! বিশ্বাস কর, নামে মাত্র কিছু ইসলামী দল আছে, তারা পৃথিবীর কোন ইসলামী দলকেই সমালোচনার বাইরে রাখেনি। হয় তাদের ব্যাপারে নানা সন্দেহের সৃষ্টি করবে। না হয় অনৈসলামিক কোন দলের সাথে তার গোপন সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রচার করবে। জিজ্ঞেস করবে, তুরস্কের হিজবুস সালাম সম্পর্কে তোমার মতামত কী? বলবে, এরা অমুক দলের এজেন্ট। জিজ্ঞেস করবে, মাসুমী দলের কথা। বলবে, তারাও তাগুতের এজেন্ট। ইখওয়ানুল মুসলিমীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেও ঠিক ঐ একই উত্তর দিবে। মুসলিম উম্মাহ'র মাঝে যে দলই কাজ করছে, জনগণকে ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত করছে, তাদের সম্পর্কে একটা সন্দেহমূলক কথা ছড়িয়ে দিবে। বলবে, অমুক দলে প্রবেশ করলে তোমার দীন নষ্ট হয়ে যাবে, তোমার মন-মস্তিস্ক বিগড়ে যাবে। অথচ তারা একটুও ভেবে দেখছে না যে, সে সত্যকে অপছন্দ করছে, কল্যাণকে অপছন্দ করছে। এ যুগে মানুষের অবস্থা মশা-মাছির মত হয়ে গেছে। এরা নর্দমা-আবর্জনার মাঝেই ডিম দিতে

ভালবাসে। যদি একটি মাছিকে ধরে এনে কোন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখ, তাহলে দেখবে ওটা মরে গেছে। ভাল জায়গায় ওরা বেঁচে থাকতে পারে না। তার হৃদযন্ত্র অসুস্থ হয়ে যায়। সে বাঁদুরের মত অন্ধকারে থাকাকে পছন্দ করে। এমন মানুষের সাথে চলাফেরা করে তারা সর্বদা মিথ্যা বলছে, পরচর্চা করছে।

ভাইয়েরা! এটা ইসলাম নয়। ইসলাম এমন নয়। যদি তুমি কোন দলের কর্মী হও, তাহলে তোমার দলের লোক ছাড়া অন্য কারো উপকার করবে না, অন্য কারো কল্যাণ কামনা করবে না, এটা কখনো ইসলাম হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ-

"আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আমার রবের রহমতের (ধন-সম্পদের) ভাণ্ডারের মালিক হতে, তাহলে খরচ হবার ভয়ে তোমরা তা জমা করে রেখে দিতে।" (সূরা ইসরা : ১০০)

যদি আসমান ও যমীনের সকল ধন ভাণ্ডার যার হাতে থাকত, তাহলে সে তার দলের মাঝেই বিতরণ করত। পৃথিবীর কোন সীমিত এলাকায় তা বিতরণ করত। যেমন জর্ডান, মিশর। দেখতে তাদের দলের হয়তো দু'হাজার লোক নামায পড়ে, তাহলে বাকি লোকদের অবস্থা কী হবে? তারা কী তাহলে কাফির? আমরা কী তাদের হত্যা করব? তাদের ধ্বংস করে দেব? ইসলাম কি আমাদের এরূপ শিক্ষা দিয়েছে? কোথায় সেই ভ্রাতৃত্ববোধ! হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, "এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই।" চাই সে ইন্দোনেশিয়ার হোক। চাই সে জাপানী হোক। চাই সে মিসরী হোক। চাই সে আমার দলের হোক। চাই অন্য দলের হোক।

হে মুসলিম ভাইয়েরা! আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, তোমরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চাও, বিশ্বব্যাপী ইসলামী খেলাফতের আহবান জানাচ্ছ। মুসলিম জাতিকে এক জাতি বানাতে চাচ্ছ; অথচ তোমাদের দলের সদস্য মাত্র পাঁচশত জন। এমন অবস্থায় যদি তোমরা পরস্পরকে মেনে নিতে না পার অথবা অপর পাঁচশতজনকে মেনে নিতে না পার, যারা তোমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। পার্থক্য শুধু তারা অন্য দলভুক্ত, তাহলে তোমরা কীভাবে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবে? মেনে নিলাম, তোমাদের ও তোমাদের সমমনাদের সংখ্যা দাঁড়াবে দু'হাজার বা পাঁচ হাজার; কিন্তু তোমাদের মধ্যকার অবস্থা কত কঠিন, কত অসহনীয়। এক দলের লোক অপর দলের লোককে দেখলে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

"তারা প্রখর দৃষ্টিতে আপনাকে ফেলে দিতে চায়।"

তোমাদের মজলিসগুলো কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তবায়নে আহুত হলেও তাতে অপর দলের লোকদের গীবতের আলোচনাই বেশী হয়। ইসলামী আন্দোলনের কোন কর্মঠ কর্মীর দোষচর্চাই বেশী হয়। বলা হয়, সে এমন কথা কেন বলল? এমন কাজ কেন করল? ইত্যাদি ইত্যাদি।

হায় আফসোস! এ ধরনের দলে অংশ গ্রহণ করো না। অন্যথায় তুমি তোমার অনিষ্ঠতা থেকে তোমাকে, ইসলামকে ও মুসলমানদেরকে বাঁচাতে পারবে না। ইসলামের নামে তোমার এই কর্মকাণ্ড মুসীবত হয়ে দাঁড়াবে। বিষের ন্যায় এটা মানুষের ক্ষতি করে। যদি ইসলামের নামে কিছু করতেই হয়, তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন, সেই ইসলামের জন্য কাজ কর। সে ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

"সকল মানুষের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।"

এ ইসলাম কিন্তু তোমার দলীয় ইসলাম নয়। এ ইসলাম গোটা মানবজাতির ইসলাম। এ ইসলাম গোটা জগতের জন্য রহমতস্বরূপ ইসলাম। তাই তোমাকে উদার হতে হবে। যারাই কল্যাণের কাজ করবে, ইসলামের কাজ করবে, তাদের ভালবাসতে হবে।

একজন সালাফী। তার কাজ হল, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস খুঁজে বের করা ও তদানুযায়ী আমল করা। আমরা তাকে স্বাগত জানাব। বলব, সহীহ্ হাদীসগুলো খুঁজে বের করে আপনি মুসলিম জাতির এক বিরাট শূন্যতাকে পূরণ করলেন। কেউ তাবলীগের কাজে আত্মনিমগ্ন- তাকে বলব, মাশা-আল্লাহ, আপনি আল্লাহর এক মহান হুকুম পালনে তৎপর রয়েছেন। আমর-বিল-মা'রূফ-এর কাজে আছেন। আল্লাহ আপনার মাধ্যমে কত পথহারা মানুষকে পথের দিশা দিচ্ছেন। বেনামাযীকে নামাযী বানাচ্ছেন। মানুষকে ইসলামমূখী করছেন। আল্লাহ তা'আলা আপনার কাজে বরকত দিন। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ভাইয়েরা অনৈসলামিক শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়ছে। জানমাল কুরবানী করছে। নির্যাতন-নিপীড়নের মুখোমুখী হচ্ছে। তুমি বল, আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। তারা ইসলাম ও মুসলমানের এক বিরাট শূন্যতাকে পূরণ করছে। তারা শয়তানের দোসরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অবিচল রাখুন।

এভাবে তোমাকে সকল কল্যাণময় কাজকে কবুল করে নিতে হবে। সবাইকে স্বীকার করে নেয়ার মানসিকতা তোমার মাঝে থাকতে হবে। এমন যেন না হয়, তোমার দল থেকে যা হবে, তা-ই গ্রহণ করবে আর অন্যরা যা করবে, তা প্রত্যাখ্যান করবে। আল্লাহর নূর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দাও। তোমার উদ্দেশ্য হবে, মুসলমানের প্রত্যেকটি ঘর যেন আল্লাহর নূরে আলোকিত হয়ে যায়। কার বাতি দ্বারা তা আলোকিত হল, তা তোমার দেখার বিষয় নয়। মানুষের হৃদয় যেন আলোকিত হয়ে যায়। কার সংস্পর্শে আলোকিত হল, তা দেখার বিষয় নয়।

বলছিলাম, ইসলামের জন্য যে কাজ হবে, তা শুধু মাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে। তাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নামে কোন দলে প্রবেশ করে দলের নীতি ও ফর্মুলা অনুযায়ী কাজ করা আর, আল্লাহপ্রদত্ত নীতিমালা ত্যাগ করা কিছুতেই ঠিক নয়।

আমি অনেক যুবককে দেখেছি, পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে আদায় করে। নামাযে কী খুশু-খুজু। মুখ জুড়ে চমৎকার দাড়ি শোভা পাচ্ছে। কোন মজলিসে পরচর্চা-গীবত হলে সাথে সাথে সে মজলিস ত্যাগ করবে। ধূমপান করবে না। সিনেমা দেখে না। যদি শোনে যে, অমুক কাজ হারাম, তবে তা পরিহার করে। শুনেছে জামাতে নামায আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। তাই ফজরের নামাযেও জামাতে এসে শরীক হয়। এ ধরনের যুবকদের দেখেছি, ইসলামী হুকুমাত কায়েমের নামে উজ্জীবিত হয়ে কোন দলে প্রবেশ করেছে। এরপর একমাস যেতে না যেতেই তার মাঝে পরিবর্তন এসে গেছে। দেখেছি, নিয়মিত জামাতে শরীক হয় না। দাড়ি মুণ্ডিয়ে ফেলে। ধূমপান করে ইত্যাদি ইত্যাদি। কাউকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, ঐ যুবকটির মাঝে হঠাৎ এমন পরিবর্তন দেখা দিল কেন? উত্তর পেলাম, সে একটি ইসলামী দলের সদস্য হয়েছে। আর আমার সম্পর্কে বলছে, আমি অমুকের এজেন্ট। জিজ্ঞেস করলাম, দাড়ি মুণ্ডিয়ে ফেলল কেন? উত্তর পেলাম, যেন গুপ্তচররা তাকে চিনতে না পারে যে, সে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেয়। তার যুক্তি, ইসলামে দাড়ি রাখা সুন্নত। তাই ইসলামের স্বার্থে ওয়াজিব আদায় করার জন্য সুন্নতকে পরিহার করতে বাধ্য হয়েছে। আচ্ছা, ধূমপান করছে কেন? উত্তর পেলাম, ধূমপান করা হারাম নয়। এ হল আমাদের ইসলামের নামে রাজনীতির হাল-হকিকত। এক দল লোকের ইসলাম-প্রীতির চালচিত্র। হায়! যদি সে এ ধরনের ইসলামী রাজনীতিতে না যেত, যদি কোন দলের খপ্পরে না পড়ত, তাহলে তার ফিতরত, তার স্বভাব-চরিত্র ও ইখলাস ঠিক থাকত। হে আল্লাহ! আমাদের ইসলামের নামে এ ধরনের অনৈসলামিক কাজ থেকে রক্ষা করুন। দলীয় খেয়ালী নীতি বর্জন করে আল্লাহ প্রদত্ত নীতির উপর চলার তাওফীক দান করুন।

একদা জর্দানের বাদশাহ হুসাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হলেন। আমি গেলাম না। দ্বিতীয়দিন ইসলামী শরী'আ বিভাগের এক ছাত্র জানতে চাইল, বাদশাহ আপনাদের সাথে কী

বললেন। তাকে বললাম, আমি এ ধরনের সাক্ষাতানুষ্ঠানে যাই না। সে ছাত্রটি সরল প্রকৃতির ছিল। কোন দলের সাথে তার কখনো উষ্ণ সম্পর্ক ছিল না। এখনো নেই। সে এক দলীয় ছাত্রের নিকট গিয়ে বলল, তুমি তো প্রায়ই বল, ইখওয়ানুল মুসলিমীন বিদেশী অপশক্তির এজেন্ট। অথচ এই তো আব্দুল্লাহ আযযাম, যিনি ইখওয়ানের সক্রিয় সদস্য। তিনি তো বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে গেলেন না! তোমরা কিভাবে বল, এরা বিদেশী অপশক্তির এজেন্ট?

তার কথায় কিন্তু দলীয় ছাত্রটি দমে যায়নি। সে কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বলল, আরে তুমি এসবের কি বুঝবে। তুমি তো জান না, রাতেই তিনি ও ইখওয়ানের নেতা মুহাম্মদ বাদশাহ হুসাইনের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন। ভেবে দেখ, কী নিচু তাদের মন-মানসিকতা! অথচ কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। এ ধরনের জঘন্য অপবাদ চাপিয়ে দিয়ে হলেও তাদের বিজয়ী হতে হবে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র আমাকে ভালবাসত। গভীর শ্রদ্ধা করত। আমার কথা পছন্দ করত। আমি প্রায়ই তাদের আকর্ষণীয় বিষয়ের ওপর আলোচনা করতে বলতাম। যেমন 'বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সমস্যা ও তার সমাধান'। এ ধরনের বিষয়গুলোতে ছাত্ররা অত্যন্ত আগ্রহ দেখাত। উৎসাহবোধ করত। আমিও ক্লাসে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। 'স্নায়ুযুদ্ধ ও মুসলিম দেশগুলোর সমস্যা' নিয়ে আলোচনা করতাম। উন্মুক্ত আলোচনা হত। মনখোলা আলোচনা হত। সবাই এ ধরনের আলোচনা পছন্দ করত।

একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এক বৃক্ষের ছায়াতলে বসে ছাত্ররা আড্ডা দিচ্ছিল। তখন তাদের একজন আমার প্রশংসা করল। কিন্তু দলীয় এক ছাত্র আমার প্রশংসা সহ্য করতে পারল না। সে তাকে বলল, আরে তিনি তো বাদশাহ হুসাইনের এজেন্ট। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কিভাবে? সে বলল, এই তো কিছুদিন আগে সে বাদশাহ হুসাইনের সাথে সাক্ষাৎ করেছে। বাদশাহ তাকে পাঁচশ' দিনার দিয়েছেন। ঐ ছাত্রের ভাগিনা সেখানে উপস্থিত ছিল। সে প্রতিবাদ করে বলল, 'মামা! এমন বলা কি হারাম নয়? আপনি তো দেখছি, মানুষের গোশত খাচ্ছেন।' দলীয় সেই ছাত্রটি তখন ক্ষিপ্ত হয়ে তার ভাগিনাকে চড় মারল। বলল, চুপ কর। এসব তুই বুঝবি না।

আমারও এক ভাগিনা সেখানে উপস্থিত ছিল। দলীয় ছাত্রটি জানত না, সে সেখানে উপস্থিত আছে। সে ছিল আবূ উরদার আপন ভাই। সে প্রতিবাদ করে বলল, এ ধরনের কথা তো এই মাত্র শুধু তোমার থেকে শুনলাম। এর আগে তো এ ধরনের কথা কেউ বলেনি, শুনিওনি। তার এ কথা শুনে দলীয় ছাত্রটি চরম বিব্রত অবস্থায় পড়ে গেল।

মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ, কুধারণা সৃষ্টি করা ও মিথ্যাচার করাই কি তাহলে এই ধরনের তথাকথিত ইসলামী দলের কাজ!

আরেকটি ঘটনা বলছি। সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ)-কে ফাঁসি দেয়া হল। তখন জামালুদ্দীন নাসেরের সমর্থক এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সাধারণ মানুষ তাঁকে ফাঁসি দেয়ায় দারুণ দুঃখিত ও মর্মাহত হল। এই লোকটি তখন সাইয়্যেদ কুতুবের প্রতি অপবাদ আরোপ করে মানুষকে তার প্রতি ক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বলল, আমি সাইয়্যেদ কুতুবের স্ত্রীকে দেখেছি, সে মাথার কাপড় ফেলে রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে। তার পায়ের গোছা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। তার কথা শুনে এক যুবক বলল, ভাই! তুমি কি স্বচক্ষে তা দেখেছ? লোকটি বলল, আমি কায়রোতে লেখাপড়া করেছি, আমি দেখব না! আমি নিজ চোখে তা দেখেছি।

যুবক তখন বলল, ভাইয়েরা! আপনারা সাক্ষী থাকুন। সাইয়্যেদ কুতুব বিয়েই করেননি। যুবকের একথা শুনে লোকটি দারুণ লজ্জা পেল। মাথানত করে চলে গেল।

তাই বলছি, ভাইয়েরা! সর্বদা সতর্ক থেকো। তোমরা ইসলামের জন্য কাজ করে যাচ্ছ। কল্যাণ ও ভাল কিছু যেখানেই পাবে তা বরণ করে নেবে। তুচ্ছ মনে করে অগ্রাহ্য করবে না। না জেনে কারো সম্পর্কে কিছু

বলো না। যা বলবে সত্য বলবে। জেনেশুনে বলবে। মানুষের সুখ্যাতি ও সুনাম নষ্ট করার চিন্তা করবে না। আর নিজেকে অন্যের পাপের বোঝা বহন করার জন্য প্রস্তুত করো না।

মনে রাখবে, আমাদের অবস্থা যেন শয়তানের মত না হয়। শয়তান মাঝে মাঝে সত্য বলে। আমাদের অবস্থা যেন এমন না হয় যে, আমরাও মাঝে মাঝে সত্য বলি আর প্রায়ই মিথ্যা বলি।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে বাইতুল মালের কিছু সম্পদ প্রহরা দেয়ার জন্য নিযুক্ত করলেন। রাতে আবূ হুরায়রা (রাঃ) দেখলেন, এক ব্যক্তি এসে তা থেকে মুঠি ভরে ভরে খাবার নিয়ে যাচ্ছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) তাকে ধরে ফেললেন। লোকটি তার দারিদ্র্যের ও ছেলে-সন্তানের আধিক্যের কথা বললে আবূ হুরায়রা (রাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন।

সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবূ হুরায়রা! তোমার বন্দীর খবর কি? আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তার দারিদ্র্যের ও সন্তান-সন্ততির আধিক্যের কথা বলায় তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে।"

পরদিন রাতেও তা-ই ঘটল। ঐ ব্যক্তি এসে মুঠি ভরে ভরে খাদ্য নেয়ার সময় আবূ হুরায়রা (রাঃ) তাকে ধরে ফেললেন। লোকটি আজও অনুনয়-বিনয় করে নিজের প্রয়োজনের কথা বললে আবূ হুরায়রা (রাঃ) দয়াপরবশ হয়ে ছেড়ে দিলেন।

সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে ঐ একই কথা বললেন। আর বললেন, সে আজ রাতেও আসবে।

তৃতীয় রাতে লোকটি এলে আবূ হুরায়রা (রাঃ) তাকে ধরে বললেন, আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না, তোমাকে অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করব।

লোকটি অত্যন্ত বিনয়-নম্র হয়ে বলল, আমাকে এবারের মত ছেড়ে দিলে আমি আপনাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিব, যা আপনার বহু উপকারে আসবে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, তা কি?

লোকটি বলল, আপনি বিছানায় গেলে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন প্রহরী আপনাকে প্রহরা দেবে। শয়তান কিছুতেই আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) তখন তাকে ছেড়ে দিলেন। সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবূ হুরায়রা! তোমার বন্দীর খবর কি? আবূ হুরায়রা (রাঃ) ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

يا أبا هريرة! هل تعلم من هو زائرك في الليالي الثلاث ؟ إنه الشيطان، لقد صدقك و هو كذوب.

"শোন শোন হে আবূ হুরায়রা! তুমি কি জান, কার সাথে এ তিন রাত কথা বলেছ! সে হল শয়তান। সে মহামিথ্যাবাদী হওয়া সত্ত্বেও আজ তোমার সাথে সত্য কথা বলেছে।"

বলছিলাম, আমাদের চরিত্র যেন শয়তানের মত হয়ে না যায় যে, মাঝে মাঝে সত্য বলব আর শুধুই মিথ্যা বলব।

ভাইয়েরা আমার! আমাদের ধর্ম পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দিতে ও তা বাস্তবায়ন করতে এসেছে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔

অর্থ : আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়নীতি অবতীর্ণ করেছি। যেন মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হাদীদ : ২৫)

ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলদের প্রেরণ করা হয়েছে। যদি আমরা মুসলমান হয়েও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে না পারি, তা হবে চরম দুঃখের বিষয়।

দা'য়ীরা হলেন ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের উজ্জ্বল প্রতীক। তাদের থেকেই অন্যরা আমল শিখবে, ঈমান শিখবে ও ইনসাফ শিখবে। এ অবস্থায় যদি আমরাই আমাদের মাঝে ইনসাফ কায়েম করতে না পারি, আমার কথায় যদি সত্যতা না থাকে, আমল যদি বিশুদ্ধ করতে না পারি, আচার-আচরণ যদি ভদ্র ও পরিশীলিত না হয়, তাহলে কেন দুনিয়াবাসী আমাদের গ্রহণ করবে? এই অবস্থায় যদি আমরা দুনিয়াকে পদানত করি, তাহলে জাতিকে আমরা কী দিব? জাতি কোনদিকে অগ্রসর হবে?

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ○

অর্থ : হে মু'মিনরা! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর। তাতে তোমাদের নিজের, তোমাদের পিতামাতার বা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও।
(সূরা নিসা : ১৩৫)।

তাই তোমাদের বলছি, তোমরা দলবদ্ধ হয়ে ইসলামের জন্য কাজ কর। দলবদ্ধ হয়ে ইসলামী তরবিয়্যত লাভ কর। মেধার পরিচর্যা কর। গভীর জ্ঞান অর্জন কর। সাবধান! আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন দলের ইবাদত কর না। তোমাদের ইবাদতকে তাগুতের ইবাদতে রূপান্তরিত কর না। এটাই একালের মূর্তিপূজা, প্রতিমা পূজা। তোমরা যেন ইসলামের নামে মানুষের হককে নষ্ট না কর। মানুষের গোশত না খাও। মানুষের ইজ্জত পদদলিত না কর। দাওয়াতের সময় যেন এসব না কর। ইসলামী আমলের নামে যেন এসব না কর। সুতরাং সতর্ক হও হে বন্ধুরা! আল্লাহকে ভয় কর।

একটি কথা বলছি, যদি তোমার দল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত প্রত্যয়ী হয়, নিষ্ঠাবান হয়, তবুও একক চেষ্টায় তোমার দল কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে পারবে না। কোন দল বা কোন জামাত কিন্তু একক চেষ্টায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে পারবে না। অবশ্যই অন্যান্য ভাল নেককার লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হবে। তাদের আন্তরিক সহযোগিতা, সমর্থন, দু'আ ও মুজাহাদা ইত্যাদির বিনিময়েই কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ইসলামী দলের কর্মীদের এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দীনদার বুযুর্গদের উপেক্ষা করা তাদের ভুল হবে। তারা কোন দল করে না বটে, তবে তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। ইবাদত-গুজার। এদের দু'আ নিতে হবে। সম্মান করতে হবে। তবেই সাফল্য আসবে।

প্রিয় ভাইয়েরা! তোমরা এখন যে দলে আছ, সে দল একা কিন্তু আফগানিস্তানের হাজারো সমস্যার একটিরও ষোলআনা সমাধান দিতে পারবে না। তাই মানুষকে কল্যাণ থেকে বিরত রেখো না। নিজেকেও কল্যাণ থেকে বিরত রেখো না। শুধুমাত্র এ কারণে যে, তা তোমার দলের প্রোগ্রাম নয়। তোমার দলের কর্মসূচি নয়।

একটি উপমা দিচ্ছি। ইসহাক ফারহান, যার আলোচনা ইতোপূর্বে করেছি। তিনি বলেন, আমাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হলে আমি ইচ্ছা করলাম, শিক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শবাদী লোকদের নিয়োগ করব। যোগ্য ও দায়িত্বশীল লোকদেরই যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করব। তাই প্রথমে আমি যে দলে যুক্ত ছিলাম, তার প্রতি দৃষ্টি ফেললাম। তা হল ইখওয়ানুল মুসলিমীন। আমি ইখওয়ানের যোগ্য লোকদের নিয়োগ দিলাম। কিন্তু তাতে প্রয়োজনের সামান্যই পূরণ হল। তারপর তাবলীগী, তাহরীরী, সালাফীদের থেকেও লোক নিয়োগ করলাম। তবুও প্রয়োজনের দশ ভাগের এক ভাগও পূরণ হল না। তারপর নির্দেশ দিলাম, যারা নামায আদায় করে, তাদের নিয়ে এস। তাতেও হল না। তারপর নির্দেশ দিলাম, যারা শুক্রবারে জুমার নামায আদায় করে, তাদের হলেও নিয়ে এস।

এবার ভেবে দেখ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় একটি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মেটাতে গিয়েই আমাদের হিমশিম খেতে হয়েছে। আর যদি আমরা দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করে ফেলি, তাহলে কীভাবে তা সামাল দেব। কোন একটি দলের দ্বারা কি তা সম্ভব। মোটেও না। গোটা দেশবাসীকে নিয়ে, প্রত্যেক দলের যোগ্য লোকদের নিয়েই ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে হবে।

এমতাবস্থায় তুমি কীভাবে তোমার একশ' বিশ বা দেড়শ' লোকের দল নিয়ে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে চাও! তোমার জীবনের বিশটি বছর ইসলামী দলের সাথে কাটিয়ে দিলে। অথচ তুমি এখনও আমল বিশুদ্ধ করতে পারলে না। তোমার আমল মানুষের মনে ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করে চলেছে। কল্যাণের উৎসকে শুকিয়ে শেষ করে দিচ্ছে। ইসলামী প্রত্যেকটি কাজের বিরুদ্ধেই তোমার অসতর্ক জিহ্বা পরিচালিত করছ। কোন আলিমকেই অপবাদ না দিয়ে বা তার সম্পর্কে মিথ্যা না বলে ক্ষান্ত হওনি। শুধুমাত্র তোমার দলের কারণে অন্যসব দা'য়ীকে তিরস্কার করেছ, ব্যঙ্গ করেছ। অথচ একবারও কি ভেবে দেখেছ, তোমার দল মুসলমানদের সাগর সমান অভাবের এক ফোঁটাও পূরণ করতে পারবে কি না?

ভাইয়েরা! তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আমল কর। ইখলাসের সাথে কর। ইসলামী দলের সাথে সংযুক্ত থাক। তবে মনে রেখো, কখনো কোন দলের অন্ধভক্তে পরিণত হইয়ো না। তাহলে তোমাদের ইবাদত আল্লাহর জন্য না হয়ে দলের জন্য হবে। তোমাদের চেষ্টা-মুজাহাদা আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য না হয়ে দলের নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হবে, যা কল্যাণের চেয়ে বেশি অকল্যাণ বয়ে আনবে। আল্লাহর জন্যই নিজেদেরকে উদার হতে হবে।

সাবধান! আবার বলছি, সাবধান! আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সব কিছু কর। ইখলাসের সাথে কর। নিয়ত ঠিক রেখে কর। আল্লাহ তোমাদের শক্তিশালী করুন। তিনি তোমাদের হাত ধরে ধরে সত্যের পথে, সিরাতে মুস্তাকীমের পথে পরিচালিত করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

নবম মজলিস

بسم الله الرحمن الرحيم

(٢٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○ (٢٩) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ○

অর্থ : হে মু'মিনগণ! নিঃসন্দেহে মুশরিকরা অপবিত্র। সুতরাং এ বৎসরের পর যেন তারা মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তাহলে আল্লাহ ইচ্ছে করলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমরা আহলে কিতাবের ঐ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম মনে করে না এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না। যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে। (সূরা তাওবা : ২৮-২৯)

সূরা তাওবার উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন :

১. মুসলমান আর মুশরিকদের সাথে সকল সম্পর্ক চিরতরে শেষ হয়ে যাওয়ায় কথা ঘোষণা করেছেন।

২. মুসলমান ও আহলে কিতাবের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, সূরা তাওবা অবতীর্ণ হওয়ার পর আরব উপদ্বীপে কোন মুশরিকের থাকার অবকাশ ছিল না। হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তারা আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করে চলে যাবে। আরব উপদ্বীপে যেন কোন মুশরিক থেকে জিযিয়া গ্রহণ করার অবকাশ না থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের এই ভূমিতে মূর্তিপূজার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে।"

আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন–

لا يحج بعد العام مشرك و يطوف بالبيت عريان

"এ বৎসরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। কোন ব্যক্তি বিবস্ত্র অবস্থায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না।"

হিজরতের এই নবম বর্ষই ছিল মুশরিকদের হজ্জ করার শেষ বৎসর। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ আদায়ের পূর্বে বাইতুল্লাহকে পবিত্র করার ইচ্ছে করেছিলেন। তাছাড়া তিনি পূর্ব থেকেই অনুভব করছিলেন যে, তাঁর বিদায়লগ্ন ঘনিয়ে আসছে। দশম হিজরীর হজ্জই হয়তো তাঁর জীবনের শেষ হজ্জ হবে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায়ী খুতবায় বললেন :

أيها الناس، اسمعوا قولي، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا

"হে লোক সকল! তোমরা আমার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোন। হয়তো এ বছরের পর আমি আর তোমাদের সাথে এখানে সাক্ষাৎ করতে পারব না।"

রাসূলের জীবনে শেষ সময় যে ঘনিয়ে আসছে আর এটাই যে তাঁর জীবনে শেষ হজ্জ এটা তিনি জিব্রাইল (আঃ)-এর একটি কর্মপদ্ধতি দ্বারাও বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ, প্রত্যেক রমযানে জিব্রাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একবার কুরআনের দাওর করতেন। কিন্তু এ বৎসর রমযানে দু'বার দাওর করেছিলেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেছিলেন–

و ما أراه إلا و قد دنا أجلي

"আমার মনে হচ্ছে, আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।"

তাছাড়া আরো অনেক আলামত ও নিদর্শন দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছিল যে, রাসূলের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। তন্মধ্যে একটি হল সূরা নাসর। আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন–

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ○ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ○ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ○

অর্থ : যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে আর আপনি মানুষকে আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী। (সূরা নাসর : ১-৩)

এ সূরা নাযিল হওয়ার পর কতিপয় সাহাবী বুঝে ফেললেন, এটা রাসূলের ইন্তেকালের প্রথম ইঙ্গিত। কেননা, রাসূলের রিসালাতের দায়িত্ব পালন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

আরেকটি ইঙ্গিত হল বিদায় হজ্জের সময় এ আয়াত নাযিল হওয়া-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ○

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নি'আমত তোমাদের উপর পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর দীন হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদা : ৩)

আরেকটি ইঙ্গিত হল, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ অবকাশ দিয়েছিলেন যে, তিনি দীর্ঘদিন জীবিত থাকার পর তাঁর ইন্তেকাল হবে বা শীঘ্রই তার ইন্তেকাল হয়ে যাবে। রাসূল তখন বলেছিলেন, দীর্ঘদিন জীবিত থাকার পর কী হবে? তাঁকে বলা হয়েছিল, মৃত্যুবরণ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শীঘ্রই জান্নাতে আল্লাহর মিলন কামনা করেছিলেন।

এ সকল আলামত ও ইঙ্গিত দশম হিজরীতেই একের পর এক প্রকাশিত হতে লাগল আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিদায় নিতে লাগলেন। ওহুদে গেলেন। শহীদ সাহাবীদের কবর যিয়ারত করলেন। প্রায়ই মধ্যরাতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে জান্নাতুল বাকী'তে চলে যেতেন, কবর যিয়ারত করতেন, দু'আ করতেন।

সুতরাং নবম হিজরীর হজ্জ ছিল দশম হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজ্জের পূর্ব প্রস্তুতি, যে হজ্জে তিনি হজ্জের বিধান হাতে-কলমে শিখিয়ে দেবেন। কারণ, এরপর আর তিনি হজ্জ করবেন না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের কোন আমল করেই বলতেন–

خذوا عني مناسككم

"তোমরা আমার থেকে তোমাদের হজ্জের বিধানসমূহ শিখে নাও।"

আর আল্লাহ তা'আলা চাইলেন যে, যারা রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন, তারা যেন সবাই তাদের রাসূলকে শেষবারের মত দেখে নেন। তাই এ হজ্জে এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হজ্জ করলেন। তারা রাসূলকে কাছ থেকে দেখলেন। তাঁর কথা শুনলেন।

তারপর রাসূল তাঁর উম্মতকে বিদায় জানালেন, যাদের তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। যাদের নিয়ে তিনি হাজারো কষ্ট সহ্য করেছেন। এই সম্পর্কেই কুরআনে বলা হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ٥

অর্থ : তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

হিজরতের নবম বর্ষে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, এ বৎসরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না, কেউ বিবস্ত্র হয়ে বাইতুল্লাহ তওয়াফ করতে পারবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন, এখনো কিছু হৃদয়ের দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রয়ে গেছে। আরো জানিয়ে দিলেন, কতিপয় লোক ভয় পাচ্ছে, তাদের অর্থসংকট দেখা দেবে, খাদ্য সংকট দেখা দেবে। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা আরবে সংখ্যালঘু। তাই মুশরিকদের বাইতুল্লায় আসা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে দু'টি সংকট দেখা দিবে–

১. নিরাপত্তার চরম সংকট দেখা দিবে।

২. অর্থ ও খাদ্য আমদানির পথগুলো রুদ্ধ হয়ে যাবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা এ উভয় সংকটের জিম্মা নিজে নিয়ে ঘোষণা দিলেন–

(৫৭) وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥

অর্থ : তারা বলল, যদি আমরা আপনার সাথে হিদায়াতের পথ অবলম্বন করি, তাহলে আমরা আমাদের দেশ হতে উৎখাত হব। আমি কি তাদের জন্য একটি নিরাপদ 'হারাম' প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে আমার প্রদত্ত রিযিকস্বরূপ সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয়? কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (সূরা কাসাস : ৫৭)

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নিরাপত্তার ঘোষণা দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শপথ করে ঘোষণা করলেন–

و الله، لتأتين الطعينة من الحيرة تطوف بالبيت ، لا تخاف إلا الله —

"আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, হাওদায় করে একজন নারী হীরা থেকে আসবে। তারপর বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে। সে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না।"

আর, অর্থ ও খাদ্য সংকটের সমাধানের ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ٥

অর্থ : আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর, তাহলে সত্বর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের দারিদ্র্য দূর করে স্বচ্ছলতা দান করবেন।

নবম হিজরীতে হাতেম তাঈ-এর পুত্র আদী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আদী ইবনে হাতেম খ্রিস্টান ছিলেন। তার বোন সাফফানা বন্দী হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি আমার গোত্রের সর্দারের মেয়ে। তিনি ক্ষুধার্তকে আহার দিতেন। বিবস্ত্রকে বস্ত্র দিতেন। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন :

ارحموا عزيز قوم ذل و غنيا افتقر و عالما ضاع بين الجهال —

"গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি অপমানজনক পরিস্থিতির শিকার হলে তার প্রতি দয়ার আচরণ কর। ধনী সম্পদশালী ব্যক্তি দরিদ্র ও বিত্তহীন হয়ে পড়লে, তার প্রতি দয়ার আচরণ কর। কোন আলিম জাহিলদের মাঝে হারিয়ে গেলে তার প্রতি দয়ার আচরণ কর।"

অনেক আলিমকে দেখা যায়, এমন লোকদের মাঝে সে বাধ্য হয়ে জীবন-যাপন করছে, যারা মানুষ আর বানরের মাঝে পার্থক্য করতে জানে না। তাদের পেলে তাদের সাথেও দয়ার আচরণ করা উচিত। তাদের ভাল পরিবেশে থাকার সুযোগ করে দেয়া উচিত।

মুক্তি পেয়ে সাফফানা তার ভাইয়ের নিকট ফিরে গেল। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক-চরিত্র, ইসলামের ন্যায়-নীতি ইত্যাদির কথা বর্ণনা করলে তার ভাই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তার গলায় একটি ক্রুশ ঝুলছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তোমার এই মূর্তিটি ফেলে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে তিনি তার ক্রুশটি ফেলে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন–

اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسيح بن مريم —

অর্থ : তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় আলিমদেরকে এবং নিরাসক্ত আবিদদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আর মসীহ ইবনে মরিয়মকেও। তখন আদী বিস্মিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো তাদের ইবাদত করিনি। রাসূল বললেন–

بلى.. أحلوا لهم الحرام و حرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياها —

"হ্যাঁ, তারা তাদের ইবাদত করেছে। হারামকে তাদের জন্য হালাল করেছে। আর হালালকে তাদের জন্য হারাম করেছে। আর তারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে। এটাই তাদের ইবাদত করা, উপাসনা করা।"

ইবাদত অর্থ আনুগত্য করা। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করার ক্ষেত্রে যারা শাসকদের আনুগত্য করে আর আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করার ক্ষেত্রে যারা শাসকদের আনুগত্য করে, তারা মূলত শাসকদের আনুগত্য করে, শাসকদের ইবাদত করে। আল্লাহর ইবাদত করে না। কেউ যদি শরী'আতের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর হুকুম না মেনে শাসকের হুকুম মানে, তাহলে তা কুফরী। এর কারণে মুসলমান আর মুসলমান থাকে না।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন– কেউ যদি বেগানা নারীর দিকে তাকানোকে হালাল বলে, তাহলে সে কুফরী করল। এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। শরী'আতের একটি নীতি হল–

من أحل الحرام فقد كفر و من حرم الحلال فقد كفر —

"যে ব্যক্তি হারামকে হালাল করল, সে কাফের হয়ে গেল আর যে ব্যক্তি হালালকে হারাম করল, সেও কাফের হয়ে গেল।"

তাই যদি কোন শাসক মুসলমানদের জন্য মদ ক্রয়-বিক্রয় ও পানের অনুমতি প্রদান করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যায়। সে ধর্ম থেকে বের হয়ে যাবে। যদি কোন শাসক আইন জারি করে যে, চোরের শাস্তি হল চোরকে দু'মাস জেলে বন্দী করে রাখা, তাহলে সে কাফির হয়ে গেল। এ কারণে সে ধর্ম থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فاقطعوا أيديهما —

অর্থ : তাদের হাত কেটে দাও।

ফিকাহ বিশারদ হাকীম বলেন, আল্লাহ তা'আলা চোরের বিধান বর্ণনা করে বলেছেন–

السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما —

অর্থ : তোমরা পুরুষ ও মহিলা চোরের হাত কেটে দাও।

সুতরাং কেউ যদি এমন আইন করে–

السارق و السارقة فاسجنوهما شهرين —

"পুরুষ ও মহিলা চোরকে দু'মাস জেলে বন্দী করে রাখ, তাহলে এটা নতুন ধর্ম হবে। এর কারণে সে ধর্ম থেকে বের হয়ে যাবে। মুসলমান থাকবে না।"

বিষয়টিকে আমি উদাহরণ দিয়ে আরো স্পষ্ট করছি। যদি কোন শাসক এ হুকুম জারি করে যে, শাওয়াল মাসে রোজা রাখতে হবে– রমজানে রাখা যাবে না, তাহলে কি সে কাফির হয়ে যাবে না? নিশ্চয় সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কোন শাসক এ হুকুম জারি করে, মাগরিবের নামাজ চার রাকাত পড়তে হবে, তাহলে কি সে কাফির হবে? নিশ্চয় কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ বুঝে না যে, চোরের শাস্তিকে পরিবর্তন করা এমন পাপ, যার কারণে মানুষ কাফির হয়ে যায়। মুসলমান মুসলমান থাকে না। কারণ, নামাযের রাকাতে কম বেশি করা বা চোরের শাস্তি পরিবর্তন করা আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করে নতুন আইন জারি করার শামিল-তাই তা কুফরী।

মুসলিম জাতি সর্বপ্রথম এই বিপদের সম্মুখীন হয় ৬৫৬ হিজরীতে। যখন তাতারীরা বাগদাদ পদানত করে নেয় এবং হালাকু খান চেঙ্গীস খানের প্রণীত 'ইয়াসিক' নামক রাজকীয় বিধান মুসলিম জাতির উপর চাপিয়ে দেয়। উলামায়ে কিরাম তার প্রবল বিরোধিতা করলেন। তারা বললেন, যে ব্যক্তি ইয়াসিক এর বিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। যে এই আইনের বিচারালয়ে বিচার চাইতে যাবে, সেও কাফির হয়ে যাবে।

সত্যিই হালাকু খান বুদ্ধিমান ছিল। সে দু'টি বিচারালয় কার্যকর রাখল। একটিতে ইয়াসিক অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালিত হত। অন্যটিতে কুরআন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালিত হত।

তাই যারা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার প্রার্থনা করত, তারা মুসলমানদের বিচারালয়ে যেত আর যারা ইয়াসিক এর বিধান অনুযায়ী বিচার প্রার্থী হত, তারা সেখানে যেত। তবে কাউকে ইয়াসিক এর বিচারালয়ে যেতে দেখলে তাকে কাফির বলে ঘোষণা করা হত।

কিন্তু বর্তমান যুগের ইয়াসিক আরো ভয়াবহ। গোটা ইসলামী বিশ্ব আজ মানব রচিত আইনের থাবায় নিষ্পেষিত-নিপীড়িত। কোথাও গণতন্ত্র, কোথাও সমাজতন্ত্র, কোথাও রাজতন্ত্র। কুরআন ও হাদীসের আলোকে পরিচালিত দেশ একটিও নেই।

বর্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় আইনের সমস্যাগুলো অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ। মুসলমানরা আজ দিশেহারা। তাই বলে মুসলমানদের কিছুতেই তা পছন্দ করা যাবে না। হৃদয় থেকে তা ঘৃণা করতে হবে। আল্লাহর নিকট তা থেকে পানাহ চাইতে হবে। মুক্তি চাইতে হবে। কুরআনী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-মুজাহাদা ও জিহাদ করতে হবে।

আমি এ বিষয়টি নিয়ে বহু চিন্তা করেছি যে, কুরআন ও সুন্নাহর আইন ছাড়া যা হচ্ছে, তার বিধান কি? বহু ভেবেছি। আনোয়ার সা'আদাতের সময় যখন বেশ কিছু ইসলামী আন্দোলনের কর্মী জেল থেকে বেরিয়ে এল, তখন তাদের অনেকে অন্যসব লোককে কাফির মনে করত। আরেকদল সকল মানুষের ব্যাপারেই বলত, যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়বে, সে-ই মুসলমান। অনেকে মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে শর্তারোপ করত। তখন বিষয়টি আমাকে দারুণ চিন্তায় ফেলল। তাদের একদলকে দেখতাম, মসজিদে নামায পড়ে না। বিষয়টি একটি ফেতনার রূপ ধারণ করল।

এ বিষয়টির সূত্রপাত হয় শাকরী মুস্তফাকে কেন্দ্র করে। তাকফীরের মাসআলাকে কেন্দ্র করে আনোয়ার সাদাত তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়। তাকফীরের মাসআলা হল, এ ধরনের বিশ্বাস করা যে, কেউ যদি তার দলে না আসে, সে কাফির। অবশ্য এ মাসআলার ভিত্তির সূত্র হল–

من لم يكفر الكافر فهو كافر و من شك في كفر الكافر فقد كفر —

"যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির বলে না, সেও কাফির। আর যে কাফিরের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে, সেও কাফির।"

কারারুদ্ধ যুবকরা ওস্তাদ হুযাইফী (রহঃ)-এর নিকট এসে বলল, আবদুন নাসের কি কাফির হয়ে গেছে? তিনি বললেন, আমি তাকে কাফির বলি বা না বলি তাতে লাভ কি? ওস্তাদ হুযাইফী স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। চাতুর্যের আশ্রয় নিলেন। এতে যুবকরা ক্ষেপে গেল। তারা ওস্তাদ হুযাইফীকে কাফির বলে প্রচার করল। একদল তাকে ত্যাগ করল। তার পেছনে নামায পড়া ছেড়ে দিল।

জেল থেকে বের হওয়ার পর তারা আমার নিকট আসত। জিজ্ঞেস করত, আবদুন নাসের সম্পর্কে আপনার মত কি? সে কি কাফির নয়? আর আনোয়ার সাদাত? সেও কি কাফির নয়? আর হুযাইফী সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি তো কাফিরকে কাফির বলেন না। তাহলে কি তিনি কাফির হবেন না? তারা এ ধরনের নানা প্রশ্নে আমাকে জর্জরিত করত।

একদিন এক যুবক এল। সে প্রায়ই আমার নিকট আসত। আমাকে মহব্বত করত। ইতোমধ্যে সে শাকরী মুস্তফাকে পেয়ে বসল। তার কথাবার্তা ও মতাদর্শে সে বিমুগ্ধ হল। সে প্রায়ই আমার নিকট এসে ইফতার করত। আমি তখন কায়রোতে ছিলাম। একদিন শাকরী মুস্তফার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে আমার নিকট এল। বিভিন্ন কথাবার্তা হল। নামাযের সময় হল। দেখলাম, সে আমার পেছনে নামায আদায় করতে ইতস্তত করছে। আমি তখন বললাম, এসো আজ তুমি ইমাম হও। আমরা তোমার পেছনে নামায আদায় করি। আরেক দিন ঠিক এমন অবস্থা হল। আমি তখন তাকে বললাম, সত্যি করে বলতো, আমার ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? সে বলল, স্পষ্ট করে বলব? আমি বললাম, হ্যাঁ, স্পষ্ট বল। সে বলল, আমি আপনাকে কাফির মনে করি। আমি বললাম, কেন? কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে তোমার এ ধারণা। সে বলল, আপনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের একজন সদস্য, তাই। সে বলল, ইখওয়ানের সবাই কাফির। আমি বললাম, কেন? সে বলল, কারণ, তারা কাফির হুযাইফীকে কাফির মনে করে না।

আমি তার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হলাম। বললাম, বেশ, তাহলে শোন, ইমাম শাফে'য়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) অলসতা করে নামায পরিত্যাগকারী সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম শাফে'য়ী (রহঃ) বলেছেন– তাকে কাফির বলা যাবে না। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেছেন– তাকে কাফের বলা যাবে। তারা মতবিরোধ করেছেন। তবে একে অপরকে কাফির বলেননি।

সুবহানাল্লাহ! সাথে সাথে সে বলে ওঠল, আমি যদি সেখানে থাকতাম, তাহলে ইমাম শাফে'য়ী (রহঃ)-এর সাথে ঝগড়া করতাম। যদি তিনি তাঁকে কাফির না বলতেন, তাহলে আমি তাকে কাফির বলতাম। আমি বললাম, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। আমি বললাম, বেশ, তাহলে চলে যাও। তোমার সাথে আর কোন কথা নেই। শাকরী মুস্তফার চিন্তায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে সেও জেলে গেল। পনের বছর তার জেল হল।

অল্প জ্ঞান ও দুঃসাহসিকতার কারণে তারা যুবকদের হৃদয়কে আকর্ষণ করতে পেরেছে। স্পষ্টবাদিতাই তাদের প্রধান পুঁজি। তাদের অবস্থা খারেজীদের মত। নিজের মতে তারা অটল আর তা ব্যক্ত করতে স্পষ্টবাদী। গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা এসে জিজ্ঞেস করে, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তোমার মতামত কি? বলে, আপনি কথা আরো সংক্ষিপ্ত করুন। বলুন, আনোয়ার সাদাত সম্পর্কে তোমার মতামত কি? শুনে নেন,

আনোয়ার সাদাত কাফির। যারা তাকে সহায়তা করে, তারাও কাফির। যারা তার নেতৃত্বে চাকরি করছে, তারাও কাফির। গোয়েন্দারা প্রথমবারে বুঝে ফেলে তার মতাদর্শ কি? তাদের এই দুঃসাহসিকতাই উচ্ছ্বল যুবকদের আকর্ষণ করেছে। শুকনো ঘাসে আগুন যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে, সেভাবেই দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়েছে।

বিষয়টি আমাকে দারুণ ভাবে ভাবিয়ে তুলল। আমি এ ব্যাপারে পড়াশোনা শুরু করলাম। ভাবতেই পারছি না, এটা কেমন কথা। একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের পেছনে নামায পড়তে চায় না। আরেকজনের সাথে ইফতার করতে চায় না। এ কেমন কথা! অজ্ঞতা, অন্ধত্ব তাদের ধ্বংস করছে, পতনের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, তবে মিসরে বেশ কিছু যুবক এমনও আছে, যারা যেকোন বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে খুব চিন্তা-ভাবনা করে। কথায় কথায় তারা কাউকে কাফের বলে না।

পড়াশোনা ও গবেষণা করে অবশেষে আমি একটি সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হলাম। যার সংক্ষিপ্তসার হল–

১. যে শাসক কুরআন-সুন্নাহ তথা শরী'আতের বিধি-বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান জারি করে, সে কাফির। সে মুসলমান থাকবে না। কারণ, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে নামাযে পরিবর্তন করে।

২. ইসলামের বিপরীত আইন প্রণেতা কাফির। ইসলাম ধর্ম থেকে সে বের হয়ে গেছে। সে যদি নামায-রোযা পালন করে, তবুও সে কাফির। কারণ, সে হালালকে হারাম করেছে আর হারামকে হালাল করেছে। যেমন- যিনা আমাদের প্রচলিত রাষ্ট্রীয় বিধানে বৈধ রাখা হয়েছে। কোন নারী যদি যিনা করে, তবে তাকে শাস্তি দেয়া হয় না। হ্যাঁ, যদি সে স্বামীর গৃহে যিনা করে, তবে শাস্তি দেয়া হবে। আবার স্বামী যদি যিনা করে, তবে তাকেও শাস্তি দেয়া হয় না। প্রচলিত আইনে প্রাইভেট গাড়িগুলো নাকি চলন্ত বাড়ির মত। তাই কোন নর-নারী যদি গাড়িতে যৌনাচারে লিপ্ত হয়, তাহলে পুলিশ তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি নারী সাহায্যের জন্য ডাকে, তবে পুলিশ যাবে। এ জন্যই শাইখ নজীবুল্লাহ মুতিয়ী বলেছিলেন, 'এটা কি কোন সভ্য লোকদের রচিত আইন, না বেশ্যাদের রচিত আইন, আমি তা বুঝতে পারছি না।'

মোটকথা, যে বিচারক বা আইনবেত্তারা এ ধরনের আইন প্রণয়ন করে এবং সে মতে বিচার কার্য পরিচালনা করে, সে বা তারা কাফির। আর, এরা ইসলামের বহির্ভূত হয়ে যাবে।

৩. যে সব বিচারক অন্যের রচিত ইসলাম বিরোধী আইন অনুযায়ী বিচার করে, তারা কাফির হবে না। কারণ, তারা শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করছে। আইন রচনা করছে না। তবে কুরআন ও সুন্নাহ তথা শরী'আতের আইনের খেলাফ আইন প্রয়োগ করার কারণে গুনাহগার হবে। এমন চাকরি করা হারাম। বেতন হারাম। এই লোকের মাঝে আর মদের দোকানে মদ বিক্রেতার মাঝে পার্থক্য নেই। তবে মদের দোকানে মদ বিক্রি করা ও সুদী ব্যাংকের চাকুরি করা, অনৈসলামিক বিচারালয়ে বিচারপতি হওয়ার চেয়ে একটু নিম্ন পর্যায়ের। তার চাকুরি হারাম, তার বেতনও হারাম। এমন পরিস্থিতিতে তার থেকে এক লোকমা খাবার খাওয়াও তোমার জন্য বৈধ নয়।

হ্যাঁ, যদি সে পৈতৃক সম্পদ পেয়ে থাকে আর তার সম্পদ ও পৈতৃক সম্পদ মিশে গেছে বা তার পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত জমি আছে, যা চাষাবাদ করে বা বাগান আছে, যাতে ফল ফলে, তাহলে তার থেকে খাওয়া যায়। মনে করবে, তুমি তার হালাল সম্পদ থেকে খাচ্ছ।

এ ধরনের বিচারকরা ইসলাম ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাবে না। ফাসিকের পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে। কারণ, সে হারাম কাজ করছে। তবে তার জন্য শর্ত হল, এ কাজকে ঘৃণা করতে হবে। আর যদি সে সেই আইনকে ভালবাসে, তাহলে সে কেন, যে-ই শরী'আতের আইনের খেলাফ আইনকে মনে-প্রাণে ভালবাসবে, উত্তম ভাববে, সে কাফের হয়ে যাবে।

৪. একজন বলল, আমরা সমস্যায় পড়ে উকিলের নিকট যাই। আমি বললাম, ওকালতি হারাম। তখন একজন নেককার ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ভাই! আমি তো উকিল। বিষয়টি শরী'আ বিভাগের শিক্ষকদের থেকে জেনে আমাকে বলবেন। আমি তখন জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। পরে আমি তাদের থেকে বিষয়টি জানতে চাইলে তারা বললেন, কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে ওকালতি করা বৈধ।

প্রথম শর্ত– এমন বিষয়ে উকিল হওয়া যাবে না, যার বিধান প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনে ভিন্ন।

দ্বিতীয় শর্ত– উকিলের এ বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে যে, তার মক্কেলের দাবি শরী'আতসম্মত।

তৃতীয় শর্ত– উকিল নিযুক্ত হওয়ার পর বিচারকার্য চলাকালীন অবস্থায় যদি উকিল জানতে পারে যে, তার মক্কেল অন্যায় ও মিথ্যা দাবি করছে, তাহলে তখনই উকিলকে তার মক্কেল ত্যাগ করতে হবে।

তারা আমাকে এই সমাধান জানাল। কিন্তু আমার মনে এখনো এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে আছে যে, মানব রচিত এ আইনের আওতায় ওকালতি করা হারাম। আমি এ কথা স্বীকার করি যে, তাদের মাঝে আমার চেয়েও বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। তবুও আমার ধারণা, বর্তমানের এ ওকালতি হারাম।

৫. বিভিন্ন দেশে আইন প্রণয়নকারী মজলিস আছে। যাকে পার্লামেন্ট, সংসদ বা লোকসভা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

আবদুন নাসেরের আমলে বলা হত, পার্লামেন্ট ভবনের দু'টি দরজা আছে। এক দরজায় লেখা আছে, সংসদ সদস্যের প্রবেশ পথ। অন্য দরজায় লেখা আছে শ্রোতাদের প্রবেশ পথ। এক সাহসী ব্যক্তি বলেছে, একবার আমি শ্রোতাদের পথ দিয়ে পার্লামেন্টে প্রবেশ করলাম। হাঁটতে হাঁটতে দেখি, আমি আরেক দরজা দিয়ে অন্য এক পথে এসে পৌঁছেছি।

আমাদের দেশে পার্লামেন্ট হল খেলার স্থান। হাশেম রেফায়ী তার ডায়েরিতে এক চমৎকার কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি হল–

ها هم كما هوى تحركهم دمى لا يفتحون بغيرما هوى فما

إنـــا لنعلم أنهم قـــد جمعـــوا ليصفقوا إن شئت أن تتكلما

فالظلم قبلك كما كان مهملا والآن صار على يديك منظما

"এই তো সংসদ সদস্যদের পুতুল, যেমনে চায় নাচায়। দলের ইচ্ছা ছাড়া তারা মুখ পর্যন্ত খুলতে পারে না। নিশ্চয়ই আমরা জানি যে, তাদেরকে একত্রিত করা হয়েছে, আপনি কথা বলার ইচ্ছে করলে যেন তারা হাত তালি দেয়। আপনার পূর্বেও জুলুম অবারিত ছিল, আর এখন তা আপনার হাতে পড়ে সুশৃঙ্খল হয়েছে।"

পার্লামেন্টের কোন অধিকার নেই আইন প্রণয়নে ইসলামের বিরোধিতা করার। যদি কোন পার্লামেন্ট সদস্য ইসলামবিরোধী কোন আইনে একমত পোষণ করে, তাহলে সে ইসলাম ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাবে। তাই অবশ্যই তাকে তার বিরোধিতা করতে হবে। আর যদি বিরোধিতা না করে। বরং চুপ থাকে, তাহলে সে মুনাফিক। এ ধরনের অবস্থায়ও ইসলামে তার কোন স্থান নেই। কেননা, তখন পার্লামেন্ট আইন রচনাকারী সংস্থা হয়ে যাবে, আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা থাকবে না।

৬. আর পার্লামেন্ট সম্পর্কে আমার মতে সাধারণ মানুষের বিধান হল, যদি কেউ এসব আইন-কানুনে সন্তুষ্ট না থাকে, তাহলে আল্লাহর নিকট আশা করা যায় যে, তার কোন গুনাহ হবে না। হ্যাঁ, যদি তার উপর কেউ জুলুম করে আর সে জুলুম থেকে বাঁচার জন্য আদালতে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় না থাকে, তাহলে সে কি আদালতে যাবে, না যাবে না?

এ ব্যাপারে সাইয়্যেদ কুতুব মনে করতেন, নিজের হক ছেড়ে দেয়া এবং আদালতে না যাওয়াই উত্তম। তবে আমার মত হল, নিজের অধিকার আদায়ে যদি অন্য কোন পথ ও পন্থা না থাকে, তাহলে যদি কেউ আদালতের শরণাপন্ন হয়, তাহলে আশা করা যায়, সে গুনাহগার হবে না।

দীর্ঘ পড়াশোনার পর আমি এ কয়টি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি।

আমাকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পার্লামেন্টে যোগদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে বলেছিলাম, যদি রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি সর্বদা নজরে রাখার জন্য, রাষ্ট্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ও পার্লামেন্ট সদস্যদের মাঝে

দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার প্রেরণায় কেউ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পার্লামেন্টে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে আমার মতে তাতে কোন দোষ নেই। তবে মন্ত্রী হওয়াতে আপত্তি আছে। কারণ, মন্ত্রীরা রাষ্ট্রীয় বিধানাবলি বাস্তবায়িত করে, বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এর ভাল-মন্দ তাদের উপরে বর্তায়, এরাই হয় এর জিম্মাদার। আর পার্লামেন্টের সদস্যগণ রাষ্ট্রের সঠিক অবস্থার পর্যবেক্ষক মাত্র। পার্লামেন্ট সদস্যগণ পার্লামেন্টে স্বাধীন বক্তব্য দানের অধিকার রাখেন। এ ব্যাপারে মন্ত্রীগণ দায়বদ্ধ।

ঈমানী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্লামেন্টে যোগদান করার কথা জিজ্ঞেস করা হলে বলেছিলাম, না, এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টে যোগদান উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। তাহলে সবই ভেস্তে যাবে। কারণ, আমরা আজ এমন এক সমাজ ব্যবস্থার মাঝে বসবাস করছি, যার পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হল ইউরোপ। তাদের সকল নিয়ম-কানুন আমরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য। এমন অবস্থায় যদি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তোমার গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য কাউকে নিযুক্ত করা হয়, আর সে পার্লামেন্টে দূরভিসন্ধিমূলক তোমার ব্যাপারে জঘন্য আপত্তি তুলে এবং দাবি করে, তুমি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছ, ঘুষ খেয়েছ, চুরি করেছ ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং তোমার ব্যাপারে তদন্ত ও বিচারের দাবি করে, তাহলে তুমি অসহায়ের মত সব যন্ত্রণা হজম করতে বাধ্য হবে। এতে ইসলামী আন্দোলনের প্রচুর ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

ঠিক তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আমার কথার ফাঁকে বলে উঠল, শাইখ! যদি অবস্থা সত্যই এমন জটিল হয়, তাহলে দাওয়াতের ইচ্ছায় পার্লামেন্টে যোগদান করাতেই বা কতটুকু উপকার হবে? আমার তো মনে হয়, কোনই উপকার হবে না।

উত্তরে বলেছিলাম, আমরা আজ এমন এক সমাজে বাস করছি, যেখানে ইসলাম শেষ হয়ে যাচ্ছে, মুসলমানরা আজ মূক হয়ে আছে। বাকশক্তি থাকা সত্ত্বেও কিছুই তাদের বলার নেই। রেডিও-টিভি ইত্যাদি সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলো থেকে আজ ইসলামের কথা প্রচার হয় না। এমন অবস্থায় আমরা যদি পার্লামেন্টে যোগদান করে সেখানেও সত্যের বাণী উচ্চারণ না করি, জাতীয় নেতৃবৃন্দকে হুঁশিয়ার না করি, তাহলে তো আমরা সবই হারালাম। এটা আমার নিজস্ব অভিমত। তা ভুলও হতে পারে, আবার সঠিকও হতে পারে। শুদ্ধ হলে প্রথমে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারপর আমার পক্ষ থেকে হবে। আর ভুল হলে আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে মনে করবে। তবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তিনি আমাদের চোখের সামনে সত্যকে সত্যরূপে উদ্ভাসিত করবেন এবং তদানুযায়ী চলার তাওফীক দান করবেন আর মিথ্যাকে মিথ্যারূপে বুঝার ও তা থেকে বাঁচার তাওফীক দান করবেন।

জনৈক মুজাহিদ আমাকে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বললাম, আমি তাঁকে কাফির বলতে পারি না। তিনি ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেক চেষ্টা করেছেন, অনেক কাজও করছেন। কিন্তু একা একা কী করবেন আর কতটুকুই বা করবেন। তার পাশে তো পাপাচারী ও দুষ্টু লোকে ভরা- যারা কুফরী কাজে ডুবে আছে। ভাল লোকের ভাল কাজকে তারা সহ্য করতে পারে না। তিনি তো সাধ্যমত চেষ্টা করছেন। এ ধরনের লোকদের আমি কাফির বলব কোন যুক্তিতে।

একজন প্রশ্ন করল, তাহলে কি তাকে উত্তম শাসক বলা যায়? না, তাকে উত্তম শাসকও আমি বলব না। তাকে আমি বলব, মন্দের ভাল। তিনি তো এমন ব্যক্তি, আফগান জিহাদের পক্ষে তার একা থাকাই যথেষ্ট। তিনি মুজাহিদদের যাতায়াতের সকল পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যদি তার স্থানে ভুট্টো সাহেব হত, তাহলে সব কিছুই পণ্ড করে দিত। আফগান মুজাহিদদের সাফল্য বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছতে ব্যর্থ হত। আফগানীরাও আযাদী অর্জনে ব্যর্থ হত।

জনৈক ব্যক্তি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বা আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো কর বিভাগে চাকুরি করি। তবে আমার কারণে মানুষের উপর জুলুম কম হয়। আমি অল্প কর আরোপ করি আর

অন্যরা অকারণে সীমাতিরিক্ত কর আদায় করে। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি তোমার স্থানেই থাক। তাহলে মুসলমানদের ওপর জুলুম কিছুটা কম হবে। তাই বলছিলাম, এ ধরনের মানুষের উপস্থিতি মুসলমানদের জন্য কিছুটা সুবিধা দান করে। তাদের বর্তমানে সাধারণ মানুষেরা কিছুটা সাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

একদা আমার সাথে সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভীর সাক্ষাৎ হল, আলোচনা হল। আমরা মন্ত্রীত্ব নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমি বললাম, ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জন্য আমাদের দেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা এক বিরাট বিপদ। তিনি আমার কথা শুনে খুব ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন, না, না, এটা কেমন কথা। আমরা তো হিন্দুস্তানে হিন্দু পুলিশের গুলি থেকে বাঁচার জন্য একজন মুসলমান পুলিশ অফিসারের তালাশে থাকি। যখন মুসলমানদের হত্যার নির্দেশ আসে, তখন একজন মুসলমান পুলিশ অফিসার পেলে আমরা দারুণ খুশি হই। অতঃপর তিনি বললেন, এসব ব্যাপারে তোমরা এতবেশি বাড়াবাড়ি কর না। এ হল সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)-এর মতামত। তিনি তো এ সময়ের এক মহান ব্যক্তিত্ব।

আমি আবার আদী ইবনে হাতেম তাঈ-এর ঘটনায় ফিরে যাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন–

أحلوا لهم الحرام و حرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فتلك عبادتهم إياها ــ

"তারা তাদের জন্য হারামকে হালাল করেছে, আর হালালকে হারাম করেছে। তারপর তারা তাদের মেনে নিয়েছে। আর এটা তাদের ইবাদত করা।"

আমি এ বিষয়টির প্রতি সবার মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাচ্ছি। কেননা, এটা দীন ও আকীদার সমস্যা, কোন রাজনৈতিক সমস্যা নয়। যে সব লোক কবর স্পর্শ করা, মৃতদের ওসীলা গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান, আমি তাদের বলব, ভাইয়েরা! মৃতদের শিরক নিয়ে এত মাথা না ঘামিয়ে জীবিতদের শিরক নিয়ে মাথা ঘামাও। কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে পাবে না, সে কবরে গিয়ে কোন পাথর স্পর্শ করছে। শিক্ষিত লোক, সে ধার্মিক হোক বা না হোক, সে কবরে যাবে না, কবর ছুঁয়েও দেখবে না। সে জানে, ওতে কোন ফায়দা নেই। সুতরাং জীবিতদের শিরকের ব্যাপারে তোমরা ভাব। এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর। আর তা হল, আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ছাড়া মানবরচিত বিধান মতে রাজ্য পরিচালিত হচ্ছে- এসব নিয়ে ভাব। খোদাদ্রোহীরা যে শিরকের বিধান মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোল।

আমি বলতাম, তোমরা শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী আর সাইয়্যেদ নদভীর আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছ। অথচ হাফেজ আসাদ আর গাদ্দাফীকে নিয়ে তোমাদের কোন চিন্তা-ফিকির নেই। কোন কর্মসূচি নেই। এসব তাগুত আজ আল্লাহর বিধানকে পশ্চাতে ফেলে নিজেদের বিধান মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। মানুষকে তা মানতে বাধ্য করছে। এরা নিজেদেরকে প্রকাশ্যে ইলাহ দাবি করছে না বটে, তবে কাজে-কর্মে তারা ইলাহ সেজে বসেছে। আজ পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক মানুষই তা অনুধাবন করতে পারছে, বুঝতে পারছে। অধিকাংশ মানুষই তা বুঝতে পারছে না। তারা নব্য তাগুতদের সাহায্য-সহযোগিতা করছে। তাদের রচিত বিধান মানুষের মাঝে প্রয়োগের চেষ্টা করছে। বিপদে আপদে দুঃখে-সুখে সর্বাবস্থায় তারা এসব তাগুতের সাথে আছে। অথচ তারা বুঝতে পারছে না যে, তারা কুফরীর সাথে বন্ধুত্ব করে আছে এবং কুফরীর-ই পৃ'পোষক হয়ে জীবন কাটাচ্ছে। অথচ আল্লাহপ্রদত্ত জীবন বিধান বাদ দিয়ে মানবরচিত বিধান মেনে নেয়া কুফরী- যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এসব আকীদা-বিশ্বাসের সমস্যা। এটাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) যখন দেখলেন, হালাকু খান চেঙ্গীস খানের প্রণীত 'ইয়াসিক' নামক রাজকীয় বিধান মুসলিম জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে, তখন তিনি ইয়াসিক নামক রাজকীয় বিধানটি আগাগোড়া অধ্যয়ন করার পর 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখলেন, এ বিধান ইসলাম, ইহুদী ও খ্রিস্টধর্ম থেকে নেয়া হয়েছে। যেমনভাবে আজ আমাদের মাঝে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় বিধানসমূহের কিয়দাংশ নেয়া

হয়েছে ইসলাম থেকে, কিয়দাংশ নেয়া হয়েছে ইহুদী ও খ্রিস্টধর্ম থেকে, কিয়দাংশ নেয়া হয়েছে প্রাচীন রোমানদের বিধান থেকে। তারপর এটা এক নতুন ধর্মের রূপ ধারণ করেছে। তার নাম নেপোলিয়নের ধর্ম। অথচ শরী'আতের স্পষ্ট বিধান হলো–

من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله عليه السلام خاتم الأنبياء و تحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة يعني اليهوديه و النصرانية فقد كفر —

"যে ব্যক্তি আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ জীবন বিধান পরিত্যাগ করে অন্য কোন রহিত জীবন বিধান তথা ইহুদী ও খিস্টধর্মের নিকট বিচার প্রার্থনা করল, সে কাফির হয়ে গেল।"

সুতরাং কেউ যদি ইসলামের বিধান ত্যাগ করে হালাকু খান বা চেঙ্গীস খান প্রণীত বিধানের নিকট বিচার প্রার্থনা করে, তাহলে তার কী হুকুম হবে? নিশ্চয় সে কাফির হয়ে যাবে। এ কারণেই আল্লামা তাইমিয়া (রহঃ) ঐ তাতারীদের কাফির সাব্যস্ত করেছেন, যারা রোজা রাখে, নামায পড়ে, কিন্তু বিচার-প্রার্থনা করে চেঙ্গীসী বিচারালয়ে। ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ঐসব কবিলার লোকদেরও কাফির হওয়ার হুকুম দিয়েছেন, যারা কবীলার আঞ্চলিক প্রচলিত বিধানের আলোকে বিচার-প্রার্থনা করে।

তাতারীরা নামায-রোযা শুরু করে দিলে মুসলমানরা যখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কুণ্ঠাবোধ করতে লাগল, তখন ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন–

لو رأيتموني بينهم و المصحف فوق رأسي فاقتلوني —

"যদি তোমরা আমাকে এমন অবস্থায় তাতারীদের মাঝে দেখতে পাও, যখন আমার মাথার উপর কুরআন রয়েছে, তবুও তোমরা আমাকে নির্দ্বিধায় হত্যা কর।"

অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমরা তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করো না। আর যারা তাতারীদের পক্ষাবলম্বন করবে, তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করতে কুণ্ঠাবোধ করো না। কারণ, তারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ত্যাগ করে মানবরচিত বিধানের অনুসরণ করছে। মানবরচিত বিধান থেকেই জীবন সমস্যার সমাধান গ্রহণের চেষ্টা করছে।"

আমরা আবার আদী ইবনে হাতেম তাঈ-এর আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসে আছেন। ঠিক তখন একজন লোক এল, দারিদ্র্যের অভিযোগ করল। আরেকজন লোক এসে পথে ডাকাতির অভিযোগ করল। এ অবস্থায় আদী ইবনে হাতেম তাঈ-এর মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল। ভাবতে লাগলেন, এটা আবার কেমন ধর্ম গ্রহণ করলাম, এর সবাই দরিদ্র। শহরে কোন নিরাপত্তাই তারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না।

আসলে এরা ছিল আরবের এমন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যারা বাহ্যিক অবস্থা, নিরাপত্তা, সচ্ছলতা ও উঁচু মর্যাদা ইত্যাদিকেই বেশি পছন্দ করত।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদী ইবনে হাতেম তাঈ-এর দিকে ফিরে তাকালেন। যেন তিনি তার হৃদয়ের ভাষা বুঝতে পেরেছেন। তারপর বললেন–

يا عدي! هل تعرف الحيرة ؟ قال: سمعت بها و لم آتها. قال: لئن طال بك الزمن لترين الظعينة تأتي من الحيرة تطوف في البيت ، لا تخاف إلا الله —

"আদী! তুমি কি হীরা (স্থানের নাম) চিন? আদী (রাঃ) বললেন, নাম শুনেছি, তবে সেখানে যাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তুমি দীর্ঘায়ু পাও, তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবে, হীরা থেকে নারীরা আসবে। তারা বাইতুল্লাহ তওয়াফ করবে, আর তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।"

আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে দারুণ বিস্মিত হলাম। ভাবলাম, কেমন করে এমন হতে পারে! এরা তো অসচ্ছলতার কারণে, দুঃখ-দুর্দশার কারণে এক দেরহামের জন্য মানুষদের হত্যা করছে! আমি বিস্মিত হয়ে বললাম–

تمر الظغينة من بينهم تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، قال لئن طال بك زمن لتفتحن كنوز كسرى ؟

قال : كسرى بن هرمز!قال : كسرى بن هرمز و لتنفقن في سبيل الله، قال : و لئن طال بك زمن لترين

الرجل يأخذ ملأ كفه ذهبا و فضة ثم ينادي في الناس من يأخذ هذا المال ، فلا يتقدم إليه أحدٌ —

"দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে মহিলারা গিয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে, অথচ আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তোমার দীর্ঘায়ু হয়, তাহলে অবশ্যই তুমি কিসরার পুঞ্জিভূত সম্পদ করায়ত্ত করবে। আদী বলল, কিসরা ইবনে হুরমুজের সম্পদ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হুরমুজ। তুমি অবশ্যই তার পুঞ্জিভূত সম্পদ অধিকার করবে, তারপর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে। যদি তোমার দীর্ঘায়ু হয়, তাহলে তুমি দেখবে, মানুষ মুষ্ঠিভরা স্বর্ণ বা রুপা নিয়ে অভাবী মানুষকে ডাকবে, কে এই সম্পদ নিবে! কিন্তু কেউ এগিয়ে আসবে না (অর্থাৎ কারো অভাব থাকবে না)।"

قال عدي : ولقد رأيت الظعينة تأتي من الحيرة تطوف بالبيت ، لا تخاف إلا الله ، هذه واحدة و كنت

ممن افتتح كنوز كسرى ، هذه ثانية و لئن طال بكم زمن لترون الثالثة التي بشركم بها أبو القاسم صلى الله

عليه وسلم —

"আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রাঃ) বলেন, আমি দেখেছি মহিলারা হীরা থেকে এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছে। তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করছে না। এটা হল প্রথমটি। আর আমি ছিলাম তাদের একজন, যারা কিসরার পুঞ্জিভূত সম্পদ করায়ত্ত করেছিল। এটা হল দ্বিতীয়টি। আর যদি তোমরা দীর্ঘায়ু পাও, তাহলে তৃতীয়টি দেখতে পারবে, যার সুসংবাদ আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন।"

এরপর উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর খিলাফতকাল এল। তিনি ইয়াহইয়া ইবনে সাইদকে আফ্রিকায় যাকাতের অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। তিনি যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করার পর মানুষের মাঝে এক মাস পর্যন্ত ঘোষণা দিলেন, কারো যাকাতের অর্থের প্রয়োজন হলে যেন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু গোটা আফ্রিকার কেউ যাকাতের মাল নিতে এল না। খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) এ সংবাদ পেয়ে নির্দেশ দিলেন, এ অর্থ দিয়ে গোলামদের ক্রয় করে মুক্ত করে দাও। যে অঞ্চলের যাকাত সে অঞ্চলেই খরচ কর।

আল্লাহ তা'আলা বাইতুল্লাহ হিফাজতের ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন। আর বাইতুল্লাহর অধিবাসীদের রিযিকেরও দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٣) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ○ (٤) الَّذِىْ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ○

অর্থ : সুতরাং তোমরা এই গৃহের রবের ইবাদত কর, যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন আর ভয়ের সময় নিরাপত্তা দান করেছেন।

নিশ্চয় তোমরা শুনেছ যে, সৌদী আরবে বিশাল বিশাল পেট্রোলের খনি পাওয়া গেছে। নিশ্চয় তা আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আর বদৌলতে বাইতুল্লাহর খেদমতের জন্য দান করেছেন।

ইবরাহীম (আঃ) দু'আ করেছিলেন–

(৩৭) رَّبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ○

অর্থ : হে আমাদের রব! আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমার রব! যেন তারা নামায কায়েম করে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদের ফলাদি দ্বারা রিযিক প্রদান করুন। সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

(সূরা ইবরাহীম : ৩৭)

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আর বরকতে এখন মক্কায় শীতের ফল গ্রীষ্মেও শেষ হয় না। আর গ্রীষ্মের ফল শীতের মৌসুমেও মক্কায় পাবে। এই যে উন্নতি-অগ্রগতি, সেবা, মসৃণ রাস্তাঘাট, মুযদালিফা, মিনা, সুউচ্চ মিনার আর ওভারব্রিজের পর ওভারব্রিজ দেখতে পাচ্ছ, এ সব কিছুই হেরেমের বরকতে, বাইতুল্লাহর খেদমতের বরকতে। বাইতুল্লাহর খেদমতের জন্যই আল্লাহ তা'আলা অশেষ পেট্রোল দান করেছেন।

অথচ আজ কি হচ্ছে! যারা হজ্জ করতে বাইতুল্লাহয় আসছে, তারা সৌদী দূতাবাসে একশ' বা দু'শ' রিয়াল প্রদান করছে। তারা এ অর্থ গ্রহণ করে আর বলে, এটা হচ্ছে হজ্জের ট্যাক্স। তারা কি আল্লাহকে ভয় করে না? এই যে মিনারগুলো বানিয়েছে, প্রতিটি মিনারের পেছনে তারা লক্ষ লক্ষ রিয়াল খরচ করেছে। হাজীরা হজ্জ করে চলে গেলে মক্কা-মীনা ইত্যাদি স্থানগুলোকে পরিষ্কার করে। এর দায়িত্ব দেয়া হয় কোন কোম্পানিকে। আমি শুনতে পেয়েছি, যে ঠিকাদার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পালন করে, সে কয়েক মিলিয়ন ডলার নিয়ে নেয়। আর হজ্জের পর মক্কা-মিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য কোম্পানিকে একশ' বিলিয়ন ডলার দেয়া হয়। মনে কর, এক মিলিয়ন লোক হজ্জ করেছে। যদি প্রত্যেক হাজী থেকে একশ' ডলারের চেয়েও কম করে নেয়া হয়, তাহলেও তা মক্কা-মীনার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার খরচের জন্য যথেষ্ট।

এ চিন্তা আমাদের মাথায় কখনো আসে না। এ ধরনের আলোচনাও করতে চাই না। কিন্তু সত্য প্রকাশের জন্য না বলেও পারছি না।

হজ্জের মৌসুমে যারা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে, তাদের ভাতা দ্বিগুণ করে দেয়া হয়। পানি ব্যবস্থাপনার জন্যই কয়েক শত মিলিয়ন ব্যয় করা হয়। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও তেমনি ব্যয় করা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে যেসব ডাক্তার হাজীদের চিকিৎসা কাজে লিপ্ত থাকেন, তাদেরকে এক হাজার রিয়াল দেয়া হয়। তেমনিভাবে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য যেসব পুলিশ, সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবক থাকে, তাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন মূল বেতনের অতিরিক্ত এক হাজার রিয়াল দেয়া হয়।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পেট্রোল দান করেছেন হেরেম শরীফের হেফাজতের ব্যবস্থা করার জন্য, যাতে হজ্জের এই ইবাদতটি মানুষের জন্য সহজ হয়ে যায় আর মক্কাবাসীদের জন্য যেন রিযিক অব্যাহতভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তোমরা এখন কী দেখছ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُّجْبٰى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ○

অর্থ : আমি কি তাদের নিরাপদ হারাম দান করিনি, যেখানে প্রত্যেক বস্তু উপস্থিত করা হয়?

আমি আজ থেকে ১৯ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৬৮ সনে হজ্জ করেছি। তখন মুজদালিফায় যাওয়ার পথ ছিল বালুকাময়। পথের দু'পাশে বিভিন্ন ধরনের পসরা নিয়ে দোকানিরা বসত। কাপড়-চোপড়, ফল-মূল ইত্যাদি। দিনের বেলায় তখন বাইতুল্লাহর তওয়াফ করা যেত না। প্রচণ্ড গরমে গা পুড়ে যেত। দাঁড়ানোই সম্ভব হত না। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে এখন শ্বেত-মর্মর পাথরে সে স্থান সজ্জিত। যতই গরম হোক, এই পাথর গরম

হবে না। এখন আর মুজদালিফা, মিনা বা আরাফায় হেঁটে যেতে হয় না। ব্যস, গাড়িতে বসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই যাওয়া যায়। কিন্তু তখন এমন ছিল না। তখন ছিল সর্বত্র বালি আর বালি।

আমি যখন হজ্জ করেছি, তখন হারাম শরীফ একতলা বিশিষ্ট ছিল। তারপর দু'তলা হল। আর এখন তো মুক্ত হাওয়ায় তারাবীর নামায আদায় করা হয়। এটা আল্লাহ তা'আলার এক মহা নি'আমত।

বাদশাহ সউদের আমলের কথা। তখন বাদশাহর তেমন সম্পদ ছিল না। মুহাম্মদ বিন লাদেন (ওসামা বিন লাদেনের পিতা) বললেন, আমি আমার অর্থে মসজিদুল হারাম প্রশস্ত করে দেই এবং রাষ্ট্রীয় ঋণ হিসেবে তা লিখে রাখি। তিনি তাই করলেন। মসজিদুল হারামকে প্রশস্ত করতে লাগলেন এবং রাষ্ট্রীয় ঋণ হিসেবে তা লিপিবদ্ধ করে রাখতে লাগলেন। বাদশাহ ফয়সাল ছিলেন তখন যুবরাজ। তিনি বলতেন, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। মসজিদুল হারামকে প্রশস্ত করতে থাকুন এবং তার ঋণ আমার নামে লিপিবদ্ধ করে রাখুন। আমি বাদশাহ হলে সে ঋণ পরিশোধ করে দিব।

বাইতুল্লাহর সাথে সাথে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ কাজও তিনি করলেন। এদিকে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা চিন্তা করুন। বাইতুল্লাহর খেদমত করার জন্য মসজিদে নববীর খেদমত করার জন্য আর হাজীদের খেদমত করার জন্য তিনি আমাদের প্রেট্রোল দান করলেন।

আমাদের পূর্ব পুরুষরা যারা হজ্জ করতে যেতেন, যখন তাদের হাজী বলা হত তার অর্থ হত, ব্যস! তিনি এখন পূত-পবিত্র হয়ে গেছেন। বাতিল তার নিকটে ঘেঁষতেও পারবে না। ভাবা হত, হজ্জ থেকে ফিরে আসা মানে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসা। জীবনের আশা ছেড়েই তারা হজ্জে যেতেন। যাওয়ার আগে তারা সবকিছু ছেলে-মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে যেতেন। আখেরী অসিয়ত করে তবে যেতেন।

সে সময় সৌদি আরব ও জর্দানের মাঝামাঝিতে যেসব কবিলা বাস করত, তারা ছিল দুর্বৃত্ত। তারা হাজীদের নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের অর্থ-কড়ি লুটে নিত। দীর্ঘ দিন যাবৎ এ সব চলছিল।

বাদশাহ আব্দুল আযীয ক্ষমতায় এসে মদীনার পার্শ্ববর্তী সকল গোত্রের লোকদের ডাকলেন। বললেন, রাষ্ট্রীয় আইন তোমাদের অবশ্যই মানতে হবে। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই হবে। তারা বলল, আমাদের একটি কথা আছে। আপনি আমাদের ভয় দেখাবেন না। দীনের ভয় দেখিয়ে নিরাপত্তা আনা যাবে না। এভাবে ভয় দেখিয়ে কাউকে অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারবেন না। কিন্তু বাদশাহ আব্দুল আযীয তাদের কথায় নরম হলেন না। তিনি তাদের তরবারীর ভয় দেখালেন। সেদিন যদি তিনি কঠোর হস্তে তাদের দমন না করতেন, তাহলে আজও নিরাপদে হজ্জ করা যেত না।

আগে হজ্জ করতে লাগত ছয় মাস। অথচ এখন ছ'সাত দিনে হজ্জ করা যায়। গত বৎসর আমি আরাফার দিন নয়টায় জিদ্দায় পৌছলাম এবং দু'দিনে হজ্জ আদায় করলাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً
فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

অর্থ : হে মু'মিনগণ! নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক। সুতরাং এ বৎসরের পর তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটবর্তী না হয়। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর, তাহলে আল্লাহ চাইলে সত্বর স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের স্বচ্ছলতা দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক। তারা কেমন নাপাক? আল্লামা ইবনে হাজার বলেন, 'তাদের মুখের লালা নাপাক। তাদের শরীরের ঘাম নাপাক।'

তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, আল্লাহ যাদের নাপাক বলেছেন– মানুষ তাদের কীভাবে পাক বলে? আল্লাহ তা'আলা তাদের নাপাক বলেন আর অনেকে বলে, তাদের ঘাম পাক, মুখের লালা পাক। সুতরাং আল্লামা ইবনে হাজরের মতে কেউ যদি তার খ্রিস্টান স্ত্রীকে চুমু খায় এবং স্ত্রীর লালা তার শরীরে লাগে, তাহলে নাপাক মনে করেই তার অঙ্গ ধৌত করতে হবে।

তেমনিভাবে ঘাম লাগলেও তা ধৌত করতে হবে।

ইমাম হাসান বসরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন– কেউ যদি মুশরিকদের সাথে কমমর্দন করে, তাহলে তার অযু করতে হবে।

তবে চার ইমাম বলেছেন– খ্রিস্টানদের মুখের লালা ও ঘাম নাপাক নয়। তারা বলেন, এই নাপাকী শিরকের নাপাকী। সাধারণত আমরা যে নাপাকী বুঝি, তা নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ○

অর্থ : নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক। সুতরাং এই বৎসরের পর মুশরিকরা যেন মসজিদে হারামের নিকটবর্তী না হয়।

এ বৎসর অর্থ নবম হিজরীর পর মুশরিকরা মসজিদে হারামে হজ্জ করতে পারবে না।

মসজিদে হারাম কি? আতা ইবনে রাবাহ (রহঃ) বলেন, মসজিদ ও তার পার্শ্ববর্তী জায়গা মসজিদ আর বাইতুল্লাহ ও তার পার্শ্ববর্তী জায়গাসমূহ হারাম ও মসজিদ। তাই কেউ যদি হারামের যে কোন স্থানে নামাজ পড়তে চায়, মুযদালিফায় পড়ুক বা মিনায় পড়ুক, এক রাকাতে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াব পাবে। এর কারণ, এসব জায়গা হারামের অন্তর্ভুক্ত। মক্কার বাড়িঘরগুলোও হারামের মধ্যেই গণ্য হবে। আলী ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) এ আয়াত দিয়ে দলীল দেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى ○

অর্থ : মহিমাময় আল্লাহ, যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায়।

সে রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারামে ঘুমিয়ে ছিলেন, মসজিদে নয়। তিনি উম্মেহানী (রাঃ)-র ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। উম্মেহানী (রাঃ)-এর ঘর মসজিদ নয়। তাহলে তো মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী গোটা এলাকা হারাম ও মসজিদ হত। মসজিদে হারামে সম্পাদিত নেক কাজের সওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায়। আবার পাপ কাজও গুরুতর হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ـ

অর্থ : যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। (সূরা হজ্জ : ২৫)

তাই সাহাবীদের কেউ কেউ মক্কায় বসবাস করতে ভয় পেতেন। তারা হারাম ছেড়ে পার্শ্ববর্তী কোথাও গিয়ে থাকতেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)। তিনি তায়েফ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বলেছিলেন–

لا أسكن في بلد تعظم فيه السيئات كما تضاعف فيه الحسنات ـــ

"আমি এমন শহরে বসবাস করব না, যেখানে অন্যায় ও পাপ কাজ গুরুতর হয় যেমনি পূণ্যের সওয়াবও বহুগুণ বেশি হয়।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর দু'টি তাঁবু ছিল। হারামে একটি আর হিলে একটি। তিনি স্ত্রীর ওপর ক্রুদ্ধ হলে হাত ধরে তাকে হিলের তাঁবুতে নিয়ে যেতেন। তারপর তাকে গালমন্দ করতেন। ভর্ৎসনা করতেন। তারপর যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেন, ক্রোধ দূর হয়ে যেত, তখন হারামের তাঁবুতে ফিরে আসতেন। তারা এমন মানুষ ছিলেন যে, প্রতিটি কথা ও কাজ ইসলামের বিধান মত পালন করে জান্নাতের প্রত্যাশায় আকুল হয়ে কাঁদতেন। আর আমরা সারা দিন পাপে ডুবে আছি, আর মনভরা আমাদের আশা, দয়াময় আল্লাহ আমাদের মাফ করে অবশ্যই জান্নাত দান করবেন। এখনো মক্কা আর মদীনাবাসীরা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলাফেরা করে। কোন কিছু ঘটলে যদি তাদের বলা হয়- انت في مكة অর্থাৎ আপনি মক্কায় থেকে এমনটা করলেন! সাথে সাথে তারা বলে উঠবে ربنا يرزقنا الأدب অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিন। তাই মক্কায় থাকতে হলে, মদীনায় থাকতে হল আদবের সাথে থাকতে হবে। ভদ্রতার সাথে থাকতে হবে। তাহলেই মক্কা-মদীনার ফজীলত অর্জিত হবে। আর যারা মক্কা-মদীনায় বসে অবৈধ কাজ করে, মুসলমানদের ধোঁকা দেয়, সুদ খায়, মিথ্যা বলে, তারা যেন আল্লাহকে, আল্লাহর আযাবকে ভয় করে।

বেশ আগের কথা। মসজিদুল হারামের এক ইমাম ছিলেন। তাঁর নাম ইবরাহীম আখযার। তার কুরআন পাঠ এত চমৎকার ও মধুর ছিল, যা বলে বুঝাবার মত নয়। আমি আমার জীবনে কোন ক্বারীর এত মধুর কণ্ঠ ও তিলাওয়াত শুনিনি। আমি সর্বপ্রথম তার পিছনে ফজরের নামাজ আদায় করেছিলাম। তিনি ছিলেন আলজেরিয়ার অধিবাসী। সুবহানাল্লাহ! এত চমৎকার লাগল। মনে হল যেন কুরআন এখন অবতীর্ণ হচ্ছে। মক্কা ও মক্কার পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাঁর কেরাআত শোনার জন্য ফজরের নামাযে এসে জামাতে শরীক হত। এমনকি জেদ্দা থেকেও লোকেরা ছুটে আসত। অর্থাৎ সকল মানুষ এসে হারাম শরীফে উপস্থিত হত। এরপর তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হল, কীভাবে তাকে বের করা যায়। অবশেষে তার আকীদার উপর হামলা হল। প্রত্যেক দিন তার বিরুদ্ধে হ্যান্ডবিল বিতরণ হতে লাগল। বাদশাহ খালেদ তখনো জীবিত। তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছল। আরো কয়েকজন আমীরের নিকটও তা পৌঁছল। তারা এতে দারুণ বিস্মিত হলেন এবং অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, না, কিছুতেই এ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া যায় না। ইমাম ইবরাহীম আখযার মক্কায় থাকবে। তারপর যা হওয়ার হবে। অবশেষে শুনতে পেলাম, তিনি মদীনায় চলে আসবেন। মক্কায় আর থাকবেন না। আমি গিয়ে তাঁকে বললাম, মক্কা আপনার মত ক্বারী থেকে বঞ্চিত হবে তা আমরা ভাবতেও পারি না। তা ছাড়া আপনার মত যোগ্য কাউকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, যার কেরাআত শুনলে হৃদয় গলে যায়, চোখে অশ্রু আসে, মন আখেরাতের দিকে ধাবিত হয়। সুতরাং আমার অনুরোধ, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে শুধুমাত্র আপনার পিছনে দু'রাকাত নামায আদায় করতে ছুটে আসে। আল্লাহ আপনাকে যে কণ্ঠ দিয়েছেন, তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

তিনি বললেন, ব্যস! যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আমি আর মক্কায় থাকতে পারছি না। অতঃপর বললেন, মদীনায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রকৃত কারণ হল, আমার মা ও দাদী। দাদীর সেবা-যত্নের জন্য মদীনায় আমার মা ছাড়া আর কেউ নেই।

আমি তাকে বললাম, বেশ, তাহলে তাদের মক্কায় নিয়ে আসুন। বাইতুল্লাহর ইমামের সম্মানী তো প্রচুর। গাড়ি-বাড়ি কোন কিছুরই তো অভাব নেই। সুতরাং তাদেরকে মক্কায় নিয়ে আসুন। ইমাম বললেন, তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করতে চান। মক্কায় আসতে তার ভয় হয়। যদি মক্কায় তার ইন্তেকাল হয়ে যায়! তিনি মদীনার জান্নাতুল বাকী'তে সমাধিস্থ হতে চান। তিনি দীর্ঘদিন মদীনা ছেড়ে কোথাও যাননি।

ভারতের কিছু মুসলমান মদীনায় থাকে। তারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক। কিন্তু মদীনায় ছোট্ট বাড়িতে কষ্টে জীবন-যাপন করছে। তারা বাড়ি বানাতে চায় না। বলে, দূরে কোথাও বাড়ি বানালে সেখানে নতুন কবরস্তান হবে। তাহলে সেখানেই তাদের কবর দেয়া হবে। মদীনায় কবরস্থ হওয়া থেকে তারা বঞ্চিত

হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ! মদীনার প্রতি তাদের কী ভালবাসা! কী প্রেম! তাই তারা বলে, আমরা এখানেই থাকব। এখানেই মৃত্যুবরণ করব এবং বাকী'তে সমাধিস্থ হব। তাইতো মদীনাবাসীদের এত সম্মান, এত ইজ্জত।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

من أصاب بأهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح بالماء ، إنما المدينة كالكير تنفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد ــ

"যে ব্যক্তি মদীনাবাসীকে কষ্ট দিবে, লবণ যেভাবে পানির স্পর্শে গলে শেষ হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে তেমনিভাবে নিঃশেষ করে দিবেন। নিশ্চয় মদীনা হাপরের ন্যায়। হাপর যেভাবে লোহার ময়লা দূর করে, ঠিক মদীনাও মদীনাবাসীদের সকল ময়লা দূর করে।"

তাই পৃথিবীর সকল মুসলমান মদীনাবাসীদের ভালবাসে, মহব্বত করে। হাজীরাও মদীনাবাসীদের ভালবাসেন।

হযরত উসমান (রাঃ)-এর যুগের ঘটনা। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সাবাঈদের ফিতনার বিভিন্ন সংবাদ পেতে লাগলেন। তিনি হযরত উসমান (রাঃ)কে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনার নিকট শামের একদল বিশ্বস্ত যোদ্ধা প্রহরী নিয়ে আসি। আপনি তাদের প্রহরায় নিরাপদে থাকুন।

হযরত উসমান (রাঃ) উত্তরে বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি রাসূলের প্রতিবেশী মদীনাবাসীদের খাদ্যে সংকট সৃষ্টি করতে চাই না। আপনি শাম থেকে বাহিনী নিয়ে আসবেন আর তারা মদীনাবাসীদের খাদ্য সংকটের কারণ হবে। আমি তা হতে দিতে পারি না।

এমনিভাবে প্রত্যেক খলীফা মদীনাবাসী ও মক্কাবাসীদের প্রতি বেশ খেয়াল রাখতেন। প্রেট্রোলের খনি পাওয়ার পূর্বে আরবরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। তারা খুব কষ্টে জীবন-যাপন করত। আর মিসর ছিল প্রাচুর্যের আধার। ধনসম্পদ, খাদ্য শস্যের কোন অভাব ছিল না মিসরে। কিন্তু যেদিন থেকে মিসরে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হল, প্রকৃত মুসলমানদের উপর নির্যাতনের অমানিশা নেমে এল, সে দিন থেকে মিসর আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হল। খাদ্য সংকট তাকে চারদিক থেকে গ্রাস করে নিল।

মিসরী'আরা আগে বাইতুল্লাহর গিলাফ তৈরি করত। মিসরের এক মহল্লার কিছু লোক সারা বৎসর বাইতুল্লাহর গিলাফ তৈরিতে আত্মনিমগ্ন থাকত। বাদশাহ ফারুক ও ফুয়াদের আমলে তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে হত। গিলাফ তৈরি হলে তারা তা জাহাজে করে মক্কায় নিয়ে আসত ও বাইতুল্লাহকে পরাত। আর বাদশাহ ফারুক মক্কা ও মদীনাবাসীদের জন্য 'থলে প্রথা' প্রবর্তন করেছিলেন। মিসরে বিভিন্ন স্থানে মক্কা ও মদীনাবাসীদের কল্যাণ ফান্ড হিসেবে প্রচুর থলে থাকত। মিসরের লোকেরা তাতে মুক্ত হস্তে দান করত। এসব দান মক্কা-মদীনার লোকদের মাঝে বন্টন করে দিতেন, যেন তারা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকতে পারে। নিশ্চিন্তে মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর খেদমত করতে পারে। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এ প্রথা ছিল।

কিন্তু বাদশাহ ফয়সালের যুগে যখন ইয়ামেন ও মিসরের মাঝে যুদ্ধ হল, তখন মিসর সৌদি আরবের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার শুরু করল। সৌদি আরবে গোয়েন্দা ঢুকিয়ে দিল। তারপর ১৯৬৫ সালে মিসরের একদল লোক বাইতুল্লাহর গিলাফ নিয়ে সৌদি গেল। তারা জেদ্দার উপকূলে নেমেই শ্লোগান দিতে শুরু করল- 'আল্লাহর শত্রুরা নিপাত যাক'।

বাদশাহ ফয়সল তখন হুকুম দিলেন, তোমরা তোমাদের গিলাফ নিয়ে মিসরে চলে যাও। এখন থেকে আমরাই বাইতুল্লাহর গিলাফ তৈরি করব। তারপর তিনি মক্কায় কা'বার গিলাফ তৈরির জন্য একটি কারখানা চালু করলেন। তারপর থেকে বাইতুল্লাহর গিলাফ মক্কায় তৈরি হচ্ছে।

এখন সৌদি আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা পাল্টে গেছে। পেট্রোলের কারণে সৌদি আরব এখন পৃথিবীর প্রধান ধনী রাষ্ট্র। মিসর অনেক পিছিয়ে গেছে। ইদানীং সৌদি আরবেরও মন্দা অবস্থা। তাই যখন চাকুরেদের বেতন কমিয়ে দেয়া হয়, তখন মিসরী'আরা সৌদি সহকর্মী ভাইদের বলে, আরে ভাই! কোন ভয় নেই। দারিদ্রের ভয় কর না। আমরা তোমাদের জন্য 'আবার থলে প্রথার' প্রচলন করব। সকল সংকট দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা আমাদের মূল কথায় ফিরে যাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা নবম হিজরীর পর মুশরিকদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তাই এরপর কি কোন মুশরিকের মসজিদুল হারামে প্রবেশের অনুমিত আছে? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

মদীনার শাফেয়ী মাযহাবের লোকেরা বলে, এখানে আয়াতের অর্থ ব্যাপক। সুতরাং কোন মসজিদেই মুশরিকরা প্রবেশ করতে পারবে না। এ মর্মেই খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) সকল প্রাদেশিক গভর্নরদের নিকট নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন যে, কোন মুশরিকের জন্যই মক্কায় বা মসজিদে হারামে বা যে কোন মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ নয়।

আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটি সকল মুশরিকদের জন্য প্রযোজ্য। তবে তা মসজিদে হারামের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ শুধুমাত্র মসজিদে হারামেই কোন মুশরিক প্রবেশ করতে পারবে না। অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। তাই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে ইহুদী-খ্রিস্টান মসজিদে হারাম ছাড়া যে কোন মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর সঙ্গীরা বলেন, মুশরিক, মুর্তিপূজকদের ছাড়া আর কাউকে মসজিদে হারামে প্রবেশে বাঁধা প্রদান করা হবে না। তাই ইহুদী-খ্রিস্টানরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারবে না।

উলামায়ে কিরাম বলেন, আসবাব বা উপকরণের সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া বৈধ। এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। যদিও প্রত্যেক মানুষের রিযিক আগেই নির্ধারিত রাখা হয়েছে। তাই অবশ্যই তাওয়াক্কুল করতে হবে, চেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে, আবার উপকরণ বা আসবাবপত্রও গ্রহণ করতে হবে। যে ব্যক্তি আসবাব গ্রহণ করাকে মন্দ বলে, সে সুন্নতের খেলাফ করে। আর যে তাওয়াক্কুলকে মন্দ বলে সে তার ঈমানের অপরিপূর্ণতার কথাই প্রকাশ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা সর্বদা তাওয়াক্কুলের উপরই ছিল। আর তিনিই আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তিনি বলেন–

لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا و تروح بطانا —

"যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপর প্রকৃত তাওয়াক্কুল করতে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করতেন যেমনিভাবে পাখিকে রিযিক প্রদান করেন। পাখিরা সকালে খালি পেটে বেরিয়ে যায়, আর সন্ধ্যায় ভরাপেটে ফিরে আসে।"

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ইবনে আরাবী ঐসব সূফীদের প্রতিবাদ করেন, যারা বলে, আমরা আমাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করে আছি। অথচ, তারা কোন আসবাব বা উপকরণ গ্রহণ করে না। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন তাওয়াক্কুলের প্রতিচ্ছবি। তাঁরা তো রিযিকের জন্য ইহুদীদের ক্ষেত-খামারেও কাজ করতেন। ইহুদী থেকে যব ঋণ নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহুদীর নিকট তাঁর বর্ম বন্ধক রাখা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন। তাই এ ধরনের চিন্তা করা যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য আকাশ থেকে রিযিক বর্ষণ করবেন, স্বর্ণ বা রৌপ্য নিক্ষেপ করবেন, এটা নিছক ভুল ধারণা।

এ ধরনের মনমানসিকতার প্রতিবাদ করে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন–

لا يقعدنَ أحدكم عن طلب الرزق ، يقول : يا رب يا رب ، فقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا و لا فضة —

"তোমাদের কেউ যেন কখনো রিযিকের অন্বেষণ ত্যাগ করে বসে না থাকে আর বলতে থাকে, হে আমার রব! হে আমার রব! আমার জন্য রিযিক পাঠাও। অথচ সে জানে, আল্লাহ তার জন্য আকাশ থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য বর্ষণ করবেন না।"

একদা ইয়ামেনের কতিপয় সূফীকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনারা কেন সাথে খাদ্যদ্রব্য বা অর্থকড়ি রাখেন না? উত্তরে তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে বেঁচে আছি। হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট তাদের কথা বলা হলে তিনি বললেন–

هولاء متآكلون ، ليسوا متوكلون ـــ

"এরা ভান করে মানুষের খাদ্য গ্রাস করছে। এরা তাওয়াক্কুল করছে না।"

আরে, রাসূলের জীবনের দিকে ফিরে তাকাও। ক্ষুধায় তিনি কুঁকড়ে যাচ্ছেন। ছটফট করছেন। কিন্তু তবুও আকাশ থেকে তাঁর নিকট কোন খাদ্যদ্রব্য নেমে আসেনি।

একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার উষ্ট্রীকে বেঁধে রাখব, না আল্লাহর উপর তায়াক্কুল করে ছেড়ে দেব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন–

أعقلها و توكلْ ـــ

"তাকে বেঁধে রাখ এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর।"

কোন কোন সূফী প্রমাণ-স্বরুপ বলেন, যেসব সাহাবী সুফফায় থাকতেন, তারা তো কোন কাজ করতেন না। তাদের কোন কাজকর্ম ছাড়াই আল্লাহ তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করতেন। তাদের উত্তরে আমরা বলব, তারা সকল মুসলমানের মেহমান ছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে ঘরে পানি পৌঁছে দিতেন। দিবসে কুরআন পাঠে মগ্ন থাকতেন। ইবাদত-বন্দেগী করতেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবায় নিয়োজিত থাকায় সকল মুসলমানের মেহমান ছিলেন। তারা এ উপকরণই গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং হাদিয়া স্বরূপ কোন খাবার এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা তাদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। মাঝে মাঝে তিনিও তাদের সঙ্গে বসে খেতেন। সদকার কিছু এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা খেতেন না। পরবর্তীতে যখন মুসলমানরা একের পর এক বিজয় লাভ করতে লাগল এবং বিস্তৃত এলাকা তাদের পদানত হয়ে গেল, তখন তারা আর মদীনায় বসে থাকেন। তারা সেসব অঞ্চলে গভর্নর হয়েছিলেন। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ)। উলামায়ে কিরাম বলেছেন– যেসব উপকরণের মাধ্যমে রিযিকের অনুসন্ধান করা হয়, তা ছয় প্রকার।

প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হল ঃ আমাদের নবী (সাঃ) যে উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন। তা হল গনীমতের সম্পদ। তিনি বলেছেন–

جعل رزقي تحت ظل رمحي و جعل الذلة الصغر على من خالف أمري ـــ

"আর আমার রিযিক আমার বর্শার ছায়াতলে রাখা হয়েছে, আর যারা আমার নির্দেশের অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা।"

দ্বিতীয় প্রকার ঃ নিজের হাতের পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত রিযিক থেকে আহার করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده و إن نبي الله داؤد كان يأكل من عمل يده ـــ

"মানুষ যা আহার করে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হল তার হাতের কাজ থেকে অর্জিত রিযিক। আর আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতের কাজ থেকে অর্জিত রিযিক হতে আহার করতেন।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ ۝

"আর আমি তাকে তোমাদের কল্যাণার্থে বর্ম তৈরি করা শিক্ষা দিয়েছি।" (সূরা আম্বিয়া : ৮০)

আর ঈসা (আঃ) তার মাতা মরিয়ম (আঃ)-এর সূতা কাটা থেকে অর্জিত রিযিক থেকে আহার করতেন।

তৃতীয় প্রকার ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য করা। প্রায় অধিকাংশ সাহাবী ব্যবসা করে রিযিক অর্জন করতেন। বিশেষ করে মুহাজির সাহাবীগণ।

চতুর্থ প্রকার ঃ কৃষি কাজ করা। তবে জিহাদের কাজ ত্যাগ করে কৃষি কাজে নিমগ্ন থাকা লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারী সাহাবীর বাড়ির দরজায় লাঙ্গল দেখে বললেন–

ما دخلت هذه بيتا إلا دخله الذل ـــ

"কোন বাড়িতে এ লাঙ্গল প্রবেশ করলেই তাতে লাঞ্ছনা প্রবেশ করে।"

হযরত উমর (রাঃ) শুনতে পেলেন, যেসব সাহাবী ফিলিস্তিন জয় করেছেন, তারা হাওলা নামক উর্বর স্থানে ফিলিস্তিনের গৌর বর্ণের উন্নতমানের গমের চাষ করেছেন। তিনি একথা শুনে এক ব্যক্তিকে তা পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন। তাদের লাগানো ফসল পুড়ে ফেলার পর তাদের নিকট পত্র পাঠালেন। তিনি লিখলেন–

لئن تركتم الجهاد واشتغلتم في الزرع ضربت عليكم الجزية و عاملتكم معاملة أهل الكتاب ، إنما أقواتكم مما تأخذون من أفواه أعدائكم ـــ

"যদি তোমরা জিহাদ ছেড়ে দাও এবং কৃষি কাজে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে আমি তোমাদের উপর জিযিয়া আরোপ করব এবং আহলে কিতাবদের মতই তোমাদের সাথে আচরণ করব। নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখ থেকে যা ছিনিয়ে আন, তা-ই তোমাদের আহার্য্য।"

হযরত উমর (রাঃ) শুনতে পেলেন যে, হিমসের শাসক আমবাসা ইবনে আসওয়াদ আল-আনাসী (রাঃ) হিমসে চাষাবাদে লিপ্ত হয়েছেন। বাগান তৈরি করেছেন। তখন তিনি তাকে এক পত্র লিখে জানালেন ঃ

عمدتَ إلى ذل و صغار في أعناق الكفار فوضعته في عنقك ـــ

"কাফিরের মাথার লাঞ্ছনা আর অপদস্থতা কি তুমি তোমার মাথায় তুলে নিতে চাও?"

পঞ্চম প্রকার ঃ কুরআন, কিতাব তথা দীনী ইলম শিক্ষাদান করা তাবিজ ইত্যাদি দিয়ে রিযিক উপার্জন করা। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী আরবের এক আমীরকে ঝাড়-ফুঁক দিয়ে দশটি বকরী নিয়ে এলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, নিশ্চয়ই এটা পবিত্র।

ষষ্ঠ প্রকার ঃ প্রয়োজন পূরণ করার নিয়তে ঋণ গ্রহণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه و من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ـــ

"যে ব্যক্তি আদায় করার নিয়তে মানুষ থেকে ঋণ নেয়, আল্লাহ তাকে তা আদায় করার ব্যবস্থা করে দেন। আর যে ব্যক্তি পরিশোধ না করার নিয়তে ঋণ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شـــاء ـــ

অর্থ : "যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর, তাহলে আল্লাহ চাইলে স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের স্বচ্ছল করে দেবেন।"

এখানে إن شاء (আল্লাহ চাইলে) দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ কেবল চেষ্টা-তদবীর করলেই রিযিক পায় না। রিযিক আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি তা তার বান্দাদের মাঝে বণ্টন করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ○

অর্থ : আমি পার্থিব জীবনে তাদের মাঝে জীবিকা বণ্টন করেছি। (সূরা যুখরুফ : ৩২)

এ ব্যাপারে আমি তোমাদের নিকট একটি কাহিনী বলছি। ইবরাহীম জালীদান একজন অত্যন্ত ভাল লোক ছিলেন। আফগান জিহাদের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন। তিনি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুবহানাল্লাহ। চমৎকার সেই এতিমখানা। নিজে এসে নিজ হাতে তাতে টাকা খরচ করতেন। এই লোকটি মদীনা বিমানবন্দরে চাকরি করতেন। এক আমীর তাকে বলল, ভাই! আমার জন্য বিমান বন্দরের পার্শ্বে কিছু জায়গা ক্রয় করে দাও। তখন বিমান বন্দরের কার্যক্রম মাত্র শুরু হয়েছে। জায়গার দাম তখন একেবারে কম। তিনি বিভিন্ন জনের নিকট থেকে চল্লিশ হাজার রিয়াল ঋণ নিয়ে তা দ্বারা তার জন্য অনেক জায়গা ক্রয় করলেন। তারপর সেই আমীরের নিকট এসে বললেন, ভাই! আমি তো আপনার জন্য চল্লিশ হাজার রিয়াল ঋণ নিয়ে বিমান বন্দরের পার্শ্বে বিশাল জায়গা ক্রয় করেছি। এখন মূল্য পরিশোধ করে আপনার জায়গা বুঝে নিন। আমীর সাহেব তাকে বলল, ভাই! আমি একথা ঠিকই তখন বলেছিলাম। কিন্তু এখন তা ক্রয় করতে পারছি না। ইবরাহীম জালীদান বললেন, আরে! এতো মহাবিপদ। চল্লিশ হাজার রিয়াল আমি কোথায় পাব। আমীর বললেন, একটু চেষ্টা করলেই পারবেন।

তারপর ইবরাহীম জালীদান নানা কৌশলে ঋণ পরিশোধ করলেন। কারো হাত ধরলেন, কারো নিকট ওজর পেশ করে বিভিন্নভাবে তিনি জমির মালিকদের বুঝিয়ে শুনিয়ে ধীরে ধীরে ঋণ পরিশোধ করলেন। তারপর সময়ের পরিবর্তন হল। এখন তো এ জায়গা মিলিয়ন বিলিয়ন রিয়ালে বিক্রি হয়। ব্যস, এখন আর ইবরাহীম জালীদানকে পায় কে? এখন তিনি মদীনার বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের একজন। এবার ভেবে দেখুন। যাকে তিনি আপদ মনে করেছিলেন, তাই হল তার রিযিকের উপকরণ। মানুষ চায় একটি, আর আল্লাহ চান অন্যটি। আর আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়।

দশম মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٢٩) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ○ (٣٠) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ○

অর্থ : ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তাকে হারাম করে না এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে। ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র আর নাসারারা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্বেকার কাফিরদের মত কথা বলে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। এরা কোন পথে ঘুরপাক খাচ্ছে! (সূরা তওবা : ২৯-৩০)

সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াত থেকে একটি নতুন বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে। তার পূর্বের আয়াত ছিল–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

অর্থ : হে মু'মিনগণ! নিঃসন্দেহে মুশরিকরা অপবিত্র। সুতরাং এ বৎসরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কা কর, তাহলে আল্লাহ ইচ্ছে করলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

এ দু'আয়াতের মাঝে সম্পর্ক–

আল্লাহ তা'আলা যখন মুশরিকদেরকে বাইতুল হারামের হজ্জ করতে নিষেধ করে দিলেন, তখন মু'মিনের অন্তরে হয়তো এ ধারণা উঁকি দিতে পারে যে, তাহলে তো হজ্বে লোক সমাগম কম হবে, ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দিবে, ফলে তাদের মাঝে চরম অর্থ সংকট সৃষ্টি হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের বললেন, তোমাদের অর্থ সংকট দূর করার আরেকটি পথ খুলে দেয়া হল। তা হল জিযিয়া। তোমরা যে পরিমাণ সম্পদ হ্রাসের ভয় পাচ্ছ, তার চেয়ে বেশি আসবে এই জিযিয়ার মাধ্যমে।

জিযিয়া হল মুসলমানদের আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের একটি নতুন পন্থা ও পদ্ধতি। কারণ, বাইতুল মাল অর্থাৎ ইসলামী খিলাফতের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থের উৎস হল জিযিয়া। জিযিয়ার মাঝে ফাইও অন্তর্ভুক্ত। কারণ, গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশও বাইতুল মালে নেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ○

অর্থ : আর তোমরা জেনে নাও গনীমতের সম্পদ হিসেবে তোমরা যা অর্জন কর, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, নিকটাত্মীয়ের জন্য, এতিমদের জন্য, মিসকীনদের জন্য, পথিকদের জন্য।

আর গনীমতের মাল হল, যা যুদ্ধের মাধ্যমে কাফিরদের থেকে অর্জন করা হয়। আর ফাই হল, যা যুদ্ধ ছাড়া সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে কাফিরদের থেকে গ্রহণ করা হয়।

তাই মুসলমানরা যদি কোন দুর্গ জয় করতে চায় আর দুর্গের অধিবাসীরা যদি অর্থের বিনিময়ে সন্ধি করে; যেমন, আমরা তাশাউনী দুর্গ অবরোধ করলাম; তখন দুর্গের প্রধান ব্যক্তি বেরিয়ে এসে বলল, আপনারা চলে যান আমরা আপনাদেরকে একশ' মিলিয়ন আফগানী মুদ্রা প্রদান করব। তাহলে এই একশ' মিলিয়ন আফগানী মুদ্রা ফিকাহ বিশারদদের পরিভাষায় ফাই। চাষাবাদের জমিনের খেরাজও ফাই-এর অন্তর্ভুক্ত এবং জিযিয়াও ফাই-এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, জিযিয়া হল মানুষের কর, খেরাজ হল ফসলি জমিনের কর। যেমন আমরা যদি আফগানিস্তান বিজয় করতে পারি তারপর আমরা যুদ্ধ করে বুখারা দখল করে নেই। ইতোমধ্যে যদি সমরকন্দের অধিবাসীরা পালিয়ে যায় বা তাদের প্রতিনিধিদল এসে বলে, আমরা যুদ্ধ ছাড়া শহর আপনাদের হাতে সমর্পন করছি, তাহলে বুখারার অধিবাসীদের ধনসম্পদ হবে গনীমতের মাল আর সমরকন্দের অধিবাসীদের ধন-সম্পদ হবে ফাই-এর মাল। তাই ফসলি জমিনের উপর যে কর আরোপ করা হয়, তার নাম খেরাজ। আর যুদ্ধ-সক্ষম ব্যক্তিদের উপর যে কর আরোপ করা হয় তার নাম জিযিয়া। ইনশাআল্লাহ আমরা তা পদানত করতে পারব। গনীমত আর ফাই-এর মাল আমরা হস্তগত করতে পারব। আর পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট উপার্জন হল গনীমতের মাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

جعل رزقي تحت ظلال رمحي —

"আমার রিযিক আমার বর্শার নীচে রাখা হয়েছে।"

তাই বলছিলাম, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে, মুসলমানদেরকে আশ্বাস দিচ্ছেন, তোমরা ভয় কর না। কারণ, শীঘ্রই তোমাদের উপর ধনসম্পদ বন্যার পানির ন্যায় উপচে পড়বে। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর খিলাফতকালে শুধুমাত্র ইরাক থেকেই ১২০ মিলিয়ন দিরহাম খেরাজ আসত। সুবহানাল্লাহ, ১২০ মিলিয়ন দিরহাম! সেই যুগে!

কিন্তু হাজ্জাজের শাসনামলে যখন মানুষের উপর যুলুম-অত্যাচার বেড়ে গেল, তখন খেরাজের পরিমাণ অনেক কমে গেল। মনে হয় ৪০ মিলিয়ন দিরহামে গিয়ে দঁাড়িয়েছিল। কারণ, জমিনে তখন তেমন উৎপাদন হত না।

যেমন মিসরের কমিউনিস্ট পার্টি বা আরবের আরো কয়েকটি দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে সে সব দেশে ফসলের উৎপাদন মারাত্মক রকম হ্রাস পেয়েছে। কেননা, তা ছিনিয়ে নেয়া জমিন। আর ছিনিয়ে নেয়া জমিনে ফসল উৎপাদন কমে যায়। আল্লাহ তার বরকত তুলে নেন।

আলজেরিয়াতে যখন বিপ্লব হল ও কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে নিল, তখন আঙ্গুরের উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পেল। ছোট ছোট পোকা আঙ্গুরের কুঁড়ি নষ্ট করে ফেলত। অথচ আলজেরিয়ায় সবচেয়ে বেশি আঙ্গুর উৎপাদিত হত। তারপর যখন তারা আঙ্গুরের রস দিয়ে মদ উৎপাদন শুরু করল, তখন আঙ্গুর উৎপাদন আরো হ্রাস পেল। আল্লাহ জমিনের বরকত তুলে নিলেন।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর খিলাফতকালে আবার খেরাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। ৮০ মিলিয়ন দিরহামে গিয়ে পৌছল। এটা শুধু ইরাকের খেরাজের কথা বলছি। সুবহানাল্লাহ! শাম আর মিসরের খেরাজের পরিমাণ জিজ্ঞেস করারই প্রয়োজন হয় না। বর্ণিত আছে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর কোষাগারে খেজুরের সমান বড় বড় গমের দানা পাওয়া গেছে। যার গায়ে লেখা ছিল, هذا جزاء العدل في الأرض "এটা পৃথিবীতে ন্যায়পরায়ণতার বিনিময়।"

আর ফিলিস্তিনের অবস্থা ছিল অবিশ্বাস্য। আমাদের পূর্বপুরুষগণ বর্ণনা করেছেন, সে সময়ে একেকটি গমের দানা পায়ের মত লম্বা হত। শামের গমের পৃথিবী জুড়ে নাম-ডাক ছিল। সুবহানাল্লাহ! এখন তা ছোট হতে হতে

এত ছোট হয়েছে যে, আধা ইঞ্চিতে এসে দাঁড়িয়েছে। যাকাত হ্রাস পাওয়ার কারণে মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে।

হযরত উমর (রাঃ) মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামেনের গভর্নর করে পাঠালেন। এক বৎসর পর তিনি ইয়ামেনবাসীদের যাকাতের দুই তৃতীয়াংশ মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। উমর (রাঃ) এত সম্পদ দেখে বিস্মিত হয়ে লিখে পাঠালেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে ধনসম্পদ কুড়িয়ে মদীনায় পাঠানোর জন্য প্রেরণ করিনি। আমি তো তোমাকে এ মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তুমি ধনীদের সম্পদ নিয়ে গরিবদের মাঝে বিতরণ করবে। সুতরাং ইয়ামেনের দরিদ্র লোকেরা ধনী হওয়ার পূর্বে কোন সম্পদ মদীনায় পাঠিয়ো না।

দ্বিতীয় বৎসর মু'আয (রাঃ) যাকাতের অর্ধেক মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় বৎসর যাকাতের সমুদয় সম্পদ মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। ইয়ামেনে কোন দরিদ্র লোক বাকি রইল না। আল্লাহ তাদের সকলকে ধনী করে দিলেন।

উমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে যখন চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তখন উমর (রাঃ) মিসরে আমর ইবনে 'আস (রাঃ)-এর নিকট পত্র পাঠালেন, যেন মিশর থেকে খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমর ইবনে 'আস (রাঃ) তখন উত্তর লিখে পাঠালেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! কোন চিন্তা করবেন না। আমি আপনার নিকট খাদ্য সামগ্রীর এমন এক কাফেলা প্রেরণ করছি, যার শুরু গিয়ে পৌঁছবে আপনার নিকট আর শেষ থাকবে আমার নিকট। অর্থাৎ কাফেলার শুরু পৌঁছাবে মদীনায় আর শেষ থাকবে মিসরে।

কিন্তু এখন সেই মিসরের অবস্থা চিন্তা করুন। কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরের কথা চিন্তা করুন। তারা বলল, মিসরে দারিদ্র্যের কারণ হল রাজকীয় পরিবার, যারা জনগণের রক্ত চুষে খাচ্ছে। তারা রাজতন্ত্র উৎখাত করল। ফারুককে তাড়িয়ে দিল। ফারুক বেরিয়ে যাওয়ার পর মিসরের সীমান্ত অরক্ষিত হয়ে পড়ল। সর্বত্র দারিদ্র্য দেখা দিল। ফারুকের সময় আলিম-উলামার মান-মর্যাদা, ইজ্জত-ইহতেরাম ছিল। আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম-সুখ্যাতি ছিল। আযহারের প্রধানকে শাইখুল ইসলাম বলা হত। গোটা পৃথিবীর মানুষ তাঁর কথা মানত। কিন্তু এখন মিসর গোটা পৃথিবীর নিকট লাঞ্ছিত। বৃটেনের কাছে অপমানিত। মিসরের পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। ফারুকের সময়ে মিসর গম রফতানি করত। এখন আর তা সম্ভব হয় না।

কমিউনিস্টপন্থীরা ক্ষমতায় এসে মানুষের ধনসম্পদ লুটে নিয়েছে। জমিজমা লুটে নিয়েছে। মিল-ফ্যাক্টরি লুটে নিয়েছে। তাই আল্লাহ মিসর থেকে বরকত তুলে নিয়েছেন। মিসরের মুদ্রার মানও অনেক কমে গেছে। সৌদীর দুই রিয়াল সমান মিসরের এক টাকা। অথচ, আগে ছিল দশ রিয়াল সমান মিসরের এক টাকা। আমার জানামতে, মিসর সরকার এখন ত্রিশ মিলিয়ন ডলার ঋণী। কেউ কেউ বলছে, ষাট মিলিয়ন ডলার। রাষ্ট্রীয় সুদের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পরিশোধের কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।

মিসর এখন পুরোপুরি বৈদেশিক খাদ্যের উপর নির্ভর করে আছে। পরিস্থিতি এত ভয়াবহ যে, যদি আমেরিকা চায় যে, মিসরে কোন বিপ্লব ঘটাবে, তাহলে খাদ্যের চালান এক মাস বা দু'মাস দেরি করলেই হবে। দেশে বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে।

অথচ মিসরে ছিল অফুরন্ত খাদ্যের ভাণ্ডার। রোম সাম্রাজ্যের খাদ্যের অভাব মিসর পূরণ করত। আর হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আমলে তো গোটা আরবকে মিসর খাদ্য দিয়ে রক্ষা করেছে। এত রহমত! এত বরকত গেল কোথায়? যেদিন মিসরের ভূমি ও ক্ষমতা লুণ্ঠিত হল, সেদিন থেকেই সব বরকত চলে গেছে। কারণ, লুণ্ঠিত জমিনে কখনো বরকত হয় না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মাযহাব মতে লুণ্ঠিত জমিতে নামায পড়লে তা হবে না।

আর মিল-ফ্যাক্টরির অবস্থা আরো করুণ। আগে মিসরে চাদর তৈরি হত, যা ইংল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডের চাদরের চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু এখন সে চাদর আর নেই। মিসরের কাঁচশিল্পও শেষ হয়ে গেছে। আগের

ইয়াসিন কোম্পানির কাঁচ সামগ্রী ছিল খুব প্রসিদ্ধ। আমার পিতা আমাকে বলতেন, ইয়াসিনের কাঁচের সামগ্রী ক্রয় করবে। কারণ, তা সহজে ভাঙে না। এখন তার কোন অস্তিত্ব নেই। সব কিছুর অধঃপতন হয়েছে। আনোয়ার সা'আদাত বলেছেন– সমাজতন্ত্র মিসরের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আনোয়ার সা'আদাতও একথা স্বীকার করেছেন।

মিসরের লোকেরা হাস্য-রসিকতা করে বলে, কমিউনিজমের দীক্ষা হল সমতা। সুতরাং মিসরে এখন পরিপূর্ণ সমতা বিদ্যমান। কোন বিত্তবান ব্যক্তি নেই। সবাই দরিদ্র হয়ে গেছে। মোটকথা, দারিদ্র্য পেয়েছি কমিউনিজমের বদৌলতে। হায়! যদি আমরা ইসলামী জীবন-বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন করতাম, তাহলে যে কী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতাম, তা চিন্তাই করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ○

অর্থ : যদি নগরবাসীরা ঈমান আনত এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের উপর আসমান ও জমিনের সকল বরকত খুলে দিতাম। (সূরা আ'রাফ : ৭৬)

আমার পিতা আমাকে বলেছেন– আমরা আমাদের জমিনে এক ছা' ভুট্টা লাগাতাম আর এক ছা' ভুট্টায় এক হাজার ছা' ভুট্টা হত। আল্লাহ তা'আলা উপমা দিয়ে বলেন যে, একটা দানা থেকে সাত শত দানা হবে। তিনি বলেন–

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ (٢٦١)
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○

অর্থ : যারা তাদের ধন-সম্পদকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তাদের উপমা হল যেমন একটি শষ্যদানা, যা সাতটি শিষ উদগত করল আর প্রত্যেকটি শিষে একশত দানা উৎপন্ন হল। আর আল্লাহ যার জন্য চান বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। (সূরা বাকারা : ২৬১)

একটি শস্য দানা দ্বারা হাজার শষ্য উৎপন্ন হয়। এক ছা' দ্বারা হাজার ছা' উৎপন্ন হয়। এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, যে কয়টি দানা জমিতে রোপণ করে, তাও উৎপন্ন হয় না। বরকত একেবারে শেষ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، فلو لا البهائم لم يمطروا ومل طفف قوم المكيال و الميزان إلا أخذوا بالسنين —

"কোন জাতি যাকাত প্রদান বন্ধ করে দিলে তাদের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণও বন্ধ হয়ে যায়। যদি পশুপ্রাণী না থাকত, তাহলে বৃষ্টি বর্ষিত হত না। আর কোন জাতি মাপে কম দিলে তারা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়।"

আজ তা-ই হচ্ছে। কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলোতে একটা রুটির জন্য এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সাদ্দাম, গাদ্দাফীর দেশেরও একই অবস্থা। এ দেশগুলোতে একটি ডিমের জন্যও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এত সব কষ্ট কমিউনিস্ট শাসনের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন।

একাদশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٢٩) قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ○

অর্থ : আহলে কিতাবের মধ্য হতে ঐ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তা হারাম করে না এবং যারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না। যতক্ষণ না তারা করজোড়ে লাঞ্ছিত অবস্থায় জিযিয়া প্রদান করে।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের সাথে যুদ্ধ করার পক্ষে সাতটি কারণের কথা আলোচনা করেছেন।

১. তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না।

২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তারা তা হারাম মনে করে না।

৩. তারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না।

আয়াতে এ তিনটি পূর্বশর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে আকীল ইবনে আরাবীর এক চমৎকার মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। ইবনে আরাবী বলেন, আমি আবুল অফা আলী ইবনে আকীলকে এক মজলিসে এ আয়াত পাঠ করার পর তার ব্যাখ্যা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– قَاتِلُوا (আর তোমরা যুদ্ধ কর)। এ নির্দেশ শাস্তিমূলক।

তারপর আল্লাহ বলেছেন– الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ (যারা ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি)। এখানে তাদের শাস্তি অবধারিত হওয়ার অপরাধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

তারপর আল্লাহ বলেছেন– وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ (যারা পরকালের প্রতি ঈমান আনে না)। এখানে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের পাপটি যে আরো জঘন্য, একথা বর্ণনা করা হয়েছে।

তারপর আল্লাহ বলেছেন– وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ (আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তারা তা হারাম করে না)। এখানে আমলের ক্ষেত্রেও তাদের পাপ সম্প্রসারিত হয়ে তাকে আরো জঘন্য করে তুলেছে, সে কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

তারপর আল্লাহ বলেছেন– وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ (আর তারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না)। এখানে ইসলাম গ্রহণে বিরোধিতা, বাঁধা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে তারা যে তাদের পাপকে আরো অধিক জঘন্য করে তুলেছে, সে কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (যারা আহলে কিতাব)। এখানে বলা হয়েছে, আহলে কিতাব হওয়ার কারণে তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলে এ ধর্মের আলোচনা পেয়েছে। এ ধর্মের কথা শুনেছে। তারপরও তারা তা গ্রহণ করছে না। সুতরাং তাদের এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তারা নির্মম শাস্তির যোগ্য।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (করজোড়ে লাঞ্ছিত অবস্থায় জিযিয়া আদায় না করা পর্যন্ত)। এখানে যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের হত্যার নির্দেশের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা যদি জিযিয়া আদায় করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না। অন্যথায় যুদ্ধ চলতে থাকবে।

৪. চতুর্থ নম্বর কারণের আলোচনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ○

অর্থ : আর ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র আর নাসারারা বলে, ঈসা আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্বেকার কাফেরদের মত কথা বলে। অর্থাৎ মুশরিকরা বলত, ফেরেস্তারা আল্লাহর কন্যা।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

(١٩) أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى ○ (٢٠) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى ○ (٢١) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنْثَى ○ (٢٢) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ○

অর্থ : তোমরা কি লাত ও ওযযার কথা ভেবে দেখেছো এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? পুত্র-সন্তান কি তোমাদের জন্য আর কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এতো খুবই অসংগত বণ্টন।

৫. পঞ্চম নম্বর কারণের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوٓا إِلاَّ لِيَعْبُدُوٓا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

অর্থ : আর তারা তাদের বিদ্বান ও সংসারবিরাগীদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের রব হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়মের পুত্র মাসীহকেও। অথচ, তারা একমাত্র এক রবের ইবাদতের আদিষ্ট ছিল। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তারা যে শিরক করছে, তিনি তা থেকে পবিত্র। (সূরা তাওবা ঃ ৩১)

৬. ষষ্ঠ নম্বর কারণের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○

অর্থ ঃ তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (সূরা তাওবা ঃ ৩২)

৭. সপ্তম নম্বর কারণের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ ○

অর্থ : হে মু'মিনগণ! নিশ্চয় অনেক বিদ্বান ও সংসার বিরাগী অন্যায়ভাবে মানুষের মালামাল ভোগ করছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত করছে। (সূরা তাওবা ঃ ৩৪)

এখানে একের পর এক সাতটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব কারণে আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। অথচ, এর একটি কারণই আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও সাতটি কারণ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল, ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করার পর মুসলমানদের অন্তরে যেন খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সন্দেহ না থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ○

অর্থ : লাঞ্ছিত অবস্থায় করজোড়ে জিযিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত।

অথচ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اليد العلى خير من اليد السفلى —

"উপরের হাত অর্থাৎ প্রদানকারীর হাত নীচের হাত তথা গ্রহণকারীর হাতের চেয়ে অধিক উত্তম।'

অথচ, এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, প্রদানকারী হবে লাঞ্ছিত, অপদস্থ, অপমানিত। ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন– জিযিয়া গ্রহণকারী বসে বসে গ্রহণ করবে আর প্রদানকারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা পরিশোধ করবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মাযহাবের ফকীহগণ বলেছেন– মুসলিম বালক বাম হাতে ইহুদী বা খ্রিস্টানদের দাড়ি ধরে টানবে আর তারা নতশিরে জিযিয়া আদায় করবে। কুরআনে বর্ণিত–

'عن يد و هم صاغرون' এর এই হল ব্যাখ্যা।

ফিকাহ বিশারদ আলেমগণ বলেছেন– জিযিয়ার টাকা চেক বানিয়ে বাইতুল মালের নামে পাঠিয়ে দিলে চলবে না। বরং জিযিয়া গ্রহণকারীর নিকট গিয়ে স্বহস্তে আদায় করতে হবে। তাহলেই কুরআনে যে লাঞ্ছনার কথা বলা হয়েছে, তা বাস্তবায়িত হবে।

তবে জিযিয়ার পরিমাণ কত হবে, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মাযহাবের একদল আলিম বলেছেন– তার পরিমাণ ধনী-গরিব সবার জন্য এক দিরহাম। আর অপর একদল আলিম বলেছেন– দরিদ্রকে এক দিনার, মধ্যবিত্তকে দুই দিনার এবং উচ্চবিত্ত ধনীকে চার দিনার দিতে হবে। হানাফী ও মালেকী মাযহাবের আলিমগণ এ মতই গ্রহণ করেছেন। তবে তারা তার ব্যাখ্যায় আরো বলেছেন যে, দরিদ্রকে বার দিরহাম দিতে হবে। কারণ, এক দিনারের মূল্যমান বার দিরহাম। এ হিসেবে বার দিরহাম দিতে হবে দরিদ্রকে, চব্বিশ দিরহাম দিতে হবে মধ্যবিত্তকে আর আটচল্লিশ দিরহাম দিতে হবে সম্পদশালী ব্যক্তিকে। কেউ কেউ বলেছেন– জিযিয়ার সবচেয়ে কম পরিমাণ হল এক দিনার। আর বেশির কোন সীমা রেখা নেই।

কাদের থেকে জিযিয়া কর নেয়া হবে? আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ○

অর্থ : যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তারা তা হারাম করে না এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে না।

তবে হানাফী ও মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ বলেছেন– জিযিয়া মুশরিক, কিতাবী, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক ইত্যাদি সকলের থেকেই গ্রহণ করা হবে।

এটাই হল ইসলামের বিশ্বজনীন হওয়ার কারণ। কেননা, আমরা পৃথিবীর সকল মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাতে পারব না। অথচ, আমাদের ধর্ম পৃথিবীর সকল অঞ্চলের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য এবং সকল অঞ্চলে বাস্তবায়নযোগ্য। সুতরাং আমরা যদি ভারত বা রাশিয়া পদানত করতে পারি, তা হলে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মাযহাব অনুযায়ী হিন্দু, বৌদ্ধ ও রাশিয়ার অমুসলিম লোকদের হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে অন্যথায় জিযিয়া দিতে হবে। অন্যথায় তাদের হত্যা করা হবে। মুশরিকদের ন্যায় তাদের থেকে শুধু কর নেয়া হবে না

তবে হানাফী ও মালেকী মাযহাবের আলোকে হিন্দুদের থেকে জিযিয়া আদায় করা হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা ভারত পদানত করতে এবং সেখানে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তাদের থেকে জিযিয়া

আদায় করব। আর এটা কোন আশ্চর্যের কথা নয়। ভারতবর্ষ এক সময় মুসলমানদের অধীনে ছিল। মুসলমানরাই তা শাসন করত। ১৮৫৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন তা ছিনিয়ে নিয়ে রাখতে না পেরে অবশেষে হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে গেছে। যদি হিন্দুস্তানকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ছিনিয়ে না নিত, তবে মুসলিম শাসকরা এখনো তা শাসন করত এবং এখনো হিন্দুস্তানে বিশ কোটির বেশি মুসলমান রয়েছে।

আল্লাহ বৃটেনকে ধ্বংস করুন। ইসলামের বড় শত্রু হল বৃটেন। যেখানেই বৃটেন পৌঁছেছে, সেখানেই সে ইহুদীদের ছড়িয়ে দিয়েছে। মিসরে ইসলামকে ধ্বংস করেছে। আরব উপদ্বীপে তাওহীদের আহবানকারীদের নিঃশেষ করে দিয়েছে। ইংরেজ আর ফ্রান্সের লোকেরা ইবরাহীম পাশাকে লেলিয়ে দিয়েছে। দারাইয়াতে ওহাবী সালতানাতকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তার আমীর উবাইদুল্লাহ ইবনে সাউদকে গ্রেফতার করে কনস্টানটিনোপলে নিয়ে গেছে এবং সেখানে তাঁকে পথে পথে ঘুরিয়েছে। উসমানী খিলাফত ও ওহাবী সালতানাতের মাঝে তখন বিরোধ ছিল বটে।

যেখানেই বৃটেন গেছে, সেখানেই ধ্বংস সাধন করেছে। মেয়েদের করেছে অর্ধনগ্ন। মুনাফিক আর গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের হাতে তুলে দিয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। তারপর তারা চলে গেছে। তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে কোন দেশই ছেড়ে যায়নি যে, তাদের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের পদলেহনকারীদের হাতে থাকবে। তাদের হাতে পালিত পাশ্চাত্য মস্তিস্কের লোকদের হাতে ক্ষমতা থাকবে।

কিন্তু এখন আল্লাহ তা'আলা বৃটেনের লোকদের চরমভাবে লাঞ্ছিত করছেন। বৃটেনের লোকেরা যারা আগে মিসর বা ফিলিস্তিনের শাসক ছিল, তারা এখন সত্তর-আশি বৎসরের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। ফিলিস্তিনীদের বা মিসরী'আদের রক্ত চুষে যে অর্থকড়ি দিয়ে বিশাল হাবেলী তৈরি করেছিল, সে হাবেলীর চাকর-বাকরের পয়সাও এখন তাদের হাতে নেই।

পেনশনের টাকায় তাদের চলে না। তাই একের পর এক হাবেলী আর প্রাসাদ বিক্রি করে দিচ্ছে।

লন্ডন শহরে প্রবেশ করলে বুঝতেই পারবে না এটা বৃটেন না আরব দেশ। কারণ, প্রচুর আরব সেখানে চলাফেরা করছে। বিশাল বিশাল ভিলা আর প্রাসাদ কিনে নিয়েছে কুয়েত বা কাতারের মুসলমানরা।

আর পাকিস্তানে একটি বিস্ময়কর বিষয় লক্ষ করার মত। এখানকার রাস্তার ঝাড়ুদাররা প্রায় সকলেই ইহুদী। ইহুদীরাই রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে। মুসলমানরা তা কখনো করবে না। পাকিস্তানের শ্বেতাঙ্গ ইহুদীরাই তা করে থাকে। সেখানে তাদের কোন মর্যাদা বা সম্মান নেই। হ্যাঁ, ইংরেজ বা আমেরিকানদের কিছুটা সম্মান আছে; কিন্তু ইহুদীদের কোন সম্মান নেই।

আমাদের বাড়িতে একজন পরিচারিকা ছিল। তাকে একবার পায়খানা পরিষ্কার করার কথা বলা হলে সে বলল, না, এটা আমার কাজ নয়। কোন ইহুদীকে ডেকে আনুন, সে পায়খানা পরিষ্কার করে দিবে।

পেশোয়ারে আমাদের দেশে যারকা প্রদেশের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন একবার পাকিস্তান থেকে কিছু শ্রমিক আনল। যারকা প্রদেশে তারা পৌঁছার তৃতীয় দিনে তাদের হাতে ঝাড়ু তুলে দেয়া হল। তারা বলল, আমাদের হাতে ঝাড়ু দেয়া হল কেন? বলা হল, তোমরা শহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে। তারা কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলল, আমরা রাস্তা-ঘাট ঝাড়ু দেই না। আমরা মুসলমান। তোমরা কি আমাদের ইহুদী মনে করেছ? ইহুদীরা এ সব কাজ করে। তারা তা প্রত্যাখ্যান করে পুনরায় পাকিস্তানে ফিরে এল। তবুও ঝাড়ুদারের কাজ করল না।

তবে হারাম শরীফে পাকিস্তানীরা যে ঝাড়ু দেয়ার বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করে তা ভিন্ন বিষয়। এটাকে তারা সম্মানের কাজ মনে করে। ইজ্জতের কাজ মনে করে। কারণ, হারামাইনে ঝাড়ু দেয়া মসজিদের মর্যাদা রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণের সম মর্যাদাসম্পন্ন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

(١٧) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُوْنَ ○ (١٨) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ○

অর্থ : মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে, তখন তারা আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রাখে না। তাদের আমল বরবাদ হয়ে গেছে। আর তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, পরকালের প্রতি ঈমান এনেছে। (সূরা তাওবা ঃ ১৭, ২৮)

আর অগ্নিপূজকদের থেকে সর্বসম্মতিক্রমে জিযিয়া কর নেয়া হবে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন- আমি অগ্নিপূজকদের ব্যাপারে কোন বিধান পাচ্ছি না, তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করব কি করব না। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি-

سنوا بهم سنة أهل الكتاب —

"তাদের সাথে আহলে কিতাবদেরই মত আচরণ কর।"

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে-

غير ناكحي نسائهم و لا آكلي ذبائحهم —

"তবে তাদের নারীদের বিয়ে করা যাবে না। আর তাদের যবাহ করা পশু খাওয়া যাবে না।"

তেমনিভাবে কাদিয়ানীদের, বাহাঈদের, মুরতাদদের ও কমিউনিস্টদের যবাহ করা পশুও খাওয়া যাবে না। একবার করাচিতে এক ঘটনা ঘটল। রাষ্ট্রীয় পশু যবাহ করার কেন্দ্রে একজন কাদিয়ানীকে পাওয়া গেল। সে পশু যবাহ করে। এতে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে যবেহ করে মেরে ফেলল।

পাকিস্তানীদের মধ্যে বেশ কিছু ভাল গুণ আছে। যেমন- ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ, ইসলামী বিধি-বিধান রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা ও কুরবানী করা। যখন হারাম শরীফে দুর্ঘটনা ঘটল, তখন খোমেনী টিভিতে ঘোষণা করল, নিশ্চয় এতে আমেরিকার হাত রয়েছে। এর পরপরই পাকিস্তানের জনগণ আমেরিকান এম্বেসিতে আক্রমণ করে তা জ্বালিয়ে দিল। লাহোরেও তাই ঘটল। ওদের কোন কাগজপত্র আগুনের হাত থেকে রেহাই পেল না। সে সময় বিশ্বের কোথাও কিছুই ঘটল না। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ নীরব থাকতে পারল না। আর এখন তো অবস্থা আরো কঠিন রুপ ধারণ করেছে। এখন আমেরিকা আর বৃটেন মুসলিম নারীদের ইজ্জত নিয়েও দেশে দেশে ছিনিমিনি খেলছে। কিন্তু সারা বিশ্ব নীরব।

ইহুদী ও খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে করা কি বৈধ? হ্যাঁ, ইহুদী ও খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে করা বৈধ। তবে শর্ত হল, সে তার ধর্মীয় কিতাবে বিশ্বাসী হতে হবে, ইঞ্জিলে বিশ্বাসী হতে হবে, তাওরাতে বিশ্বাসী হতে হবে। ধর্মের প্রতি তার আস্থা থাকতে হবে। যদিও তার ধর্ম বলে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। এ ধরনের কিতাবী মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করা যাবে।

কিতাবী ছাড়া অন্য কোন ধর্মাবলম্বী মুশরিককে বিয়ে করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ○

অর্থ : তোমরা মুশরিক নারীদের ঈমান আনা পর্যন্ত বিয়ে করো না। (সূরা বাকারা ঃ ২২১)

এই ব্যাপক নির্দেশমূলক হুকুম থেকে আল্লাহ তা'আলা কিতাবী মুশরিক নারীকে বাদ দিয়ে বলেছেন–

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ○

অর্থ : আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল করা হল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল করা হল। আর তোমাদের জন্য হালাল করা হল সতী মুসলমান নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সতী নারীদের। (সূরা মায়েদা ঃ ০৫)

তাই কিতাবী নারীদের বিয়ে করা বৈধ। তবে শর্ত হল, সতী হতে হবে, যিনাকারী হতে পারবে না। আজ শর্ত রক্ষা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনাকারিনী ছাড়া পাশ্চাত্যে নারী পাওয়াই দুষ্কর। যারা পাশ্চাত্যে থাকে বা থেকে এসেছে, তাদের জিজ্ঞেস কর। নিরাশ করা ছাড়া কোনই উত্তর তারা দিতে পারবে না।

এ কারণেই হযরত হুযাইফা (রাঃ) একজন কিতাবী মেয়েকে বিয়ে করলে হযরত ওমর (রাঃ) তার নিকট লিখে পাঠালেন, আমি শুনতে পেলাম, তুমি একজন কিতাবী মেয়েকে বিয়ে করেছ। আমার এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছা মাত্র তুমি তাকে তালাক দিবে।

হযরত হুযাইফা (রাঃ) চিঠি পেয়ে লিখলেন, এ বিয়ে হালাল না হারাম এ সিদ্ধান্ত দেয়ার পূর্বে আমি কিছুতেই তাকে তালাক দিব না।

তখন হযরত উমর (রাঃ) লিখে পাঠালেন, এ বিয়ে বৈধ! কিন্তু অনারব নারীদের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ার ভয় আছে। আমি আশংকা করছি, তারা বিয়ের পূর্বে যিনায় লিপ্ত হয়। তবুও অনোন্যপায় হয়ে দাসী বিয়ে করার মতই আমি ইহুদী ও খ্রিস্টান নারীদের বিয়ে করাকে বৈধ মনে করি। দাসী বিয়ে করা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ○

অর্থ : আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসিদের বিয়ে করবে। (সূরা নিসা ঃ ২৫)

বর্তমান এ যুগের কিতাবী নারীদের বিয়ে করা এক কঠিন বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাজার বরং লাখো নারীর মাঝেও মু'মিনের বিয়েযোগ্য সতী নারী খুঁজে পাবে না।

একজন নারীর বয়স ত্রিশ বৎসর হয়ে গেছে। সে যার সাথে ইচ্ছে চলাফেরা করে। মেলামেশা করে। পিতামাতার সন্তুষ্টিতেই যার সাথে ইচ্ছে তার সাথে রাত্রি যাপন করে, বয়ফ্রেন্ডের সাথে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। পিতামাতার তাতে বাঁধা দেয়ার অধিকার নেই। বাঁধা দিলেই মামলা, জেল-জরিমানা। কারণ, প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার আছে। পিতা কেন, স্বামীও যদি স্ত্রীকে কারো সাথে যেতে বারণ করে, তবে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে স্বামীকে জেলে দিতে পারবে। এহেন পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্যের কোন নারীকে বিয়ে করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। যারা দীন ও ঈমান নিয়ে বাঁচতে চায়, তাদের পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব। কাউকে দেখা গেছে, বিয়ে করার পর এক দু'টি সন্তানও হয়েছে। তারপর তালাক দিয়ে দিয়েছে। তাই আমার মতামত হল, প্রয়োজনের মাত্রা একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছলে কেউ যেন পাশ্চাত্যের কোন ইহুদী বা খ্রিস্টান নারীকে বিয়ে না করে। অনেককে দেখেছি, আমেরিকান নারীকে বিয়ে করার পর সন্তান হয়েছে। কারণ, আমেরিকার আইন হল, যদি কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় আর তার ছোট সন্তান থাকে, তাহলে সন্তান মায়ের সাথে থাকবে। আর স্ত্রী স্বামীর অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে নিবে।

তাই পাশ্চাত্যের নারীদের বিয়ে করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। যদি তাদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করে, তবুও অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ, তাকে বিয়ে করার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাকে ইসলামী পরিবেশে রাখতে হবে। তাহলে তার মাঝে ইসলামী সভ্যতা, তাহযীব ও তামাদ্দুন ফিরে আসবে। একদিনেই মানুষ পরিবর্তন হয়ে যায় না। দীর্ঘদিনের সাহচর্যে মানুষের স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন আসে।

সাহাবায়ে কিরামের মাঝেও এরূপ ঘটনা আছে। হযরত কুদামা ইবনে মাযউন (রাঃ) ছিলেন বদরী সাহাবী। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মদ পান করেছিলেন। কেন? কারণ, দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি মদ পান করে আসছিলেন। তাই হঠাৎ তা পরিহার করা অসম্ভব ছিল। আবূ মিহযান (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে মদপান করেছিলেন। তখন সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) তাকে বন্দী করে রাখলেন। তাঁর দু'হাতে শিকল পরিয়ে দিলেন। তিনি যখনই জিহাদের অশ্বগুলো দেখতেন, তখনই মনের আবেগে অস্থির হয়ে যেতেন আর করুণ কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন–

كفى حزنًا أن تلتقي الخيلُ بالقنا و أقعدُ مشدودًا على وثاقيا —

"আমার দুঃখের জন্য এটাই যথেষ্ঠ যে, অশ্বারোহী মুজাহিদদের উপর এসে বর্শা পড়বে আর আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে বসে থাকব।"

আবূ মিহযান (রাঃ)-এর এ অস্থিরতা ও আবেগ দেখে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর স্ত্রী তাঁর বন্ধন খুলে দিলেন এবং সা'দ (রাঃ)-এর ঘোড়া 'বালকা' তাকে প্রদান করলেন। বালকা নিয়ে আবূ মিহযান (রাঃ) জিহাদে অংশগ্রহণ করে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। এতে সবাই বিস্ময় বোধ করলেন। তখন সা'দ (রাঃ) দূর থেকে তাকে দেখছিলেন আর বলছিলেন, এটা তো বালকার কাজ।

একটি প্রশ্ন। কোন কমিউনিস্টের সাথে কি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়? আমি বলব, কমিউনিস্টরা কাফির। এরা ইসলাম থেকে বহির্ভূত। তাছাড়া তাদের ইহুদী বলা যায় না। খ্রিস্টানও বলা যায় না। ইহুদী-খ্রিস্টান নারীদের বিয়ে করা যায়। কিন্তু কমিউনিস্ট নারীদের বিয়ে করা যায় না। কোন কমিউনিস্টের নিকট মেয়ে বিয়ে দেয়া যায় না। এদের যবাহ করা পশু খাওয়া বৈধ নয়। তারা নামায পড়লে তাদের নামায কবুল হবে না। মৃত্যুর পর এদের কাফন পরানো যাবে না। মুসলমানদের কবরস্তানে তাদের দাফন করা যাবে না। যারা কমিউনিজমে বিশ্বাসী এবং এর প্রচার প্রতিষ্ঠায় কর্মতৎপর আমরা তাদেরকেই কমিউনিস্ট বলছি। আমরা তার বাহ্যিক অবস্থা ও আচরণের উপর বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত প্রদান করছি। তবে তার অন্তরে কি আছে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। সে বিচার আল্লাহ করবেন।

কেউ যদি বলে, আমি ইসলামের খেদমত করার জন্য কমিউনিজম করছি বা মুসলমানদেরকে কমিউনিস্টদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি করছি, তাহলে তার বিচার কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা করবেন। তবে তার বাহ্যিক দিক বিবেচনা করে আমরা তাকে কাফির বলতে বাধ্য। কেননা, কাফিরের সাথে যেমন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, তেমনি একজন কমিউনিস্টের সাথেও বৈবাহিক সম্পর্ক গড়া যায় না। তেমনিভাবে তার যবাহ করা পশুও মুসলমানদের জন্য হালাল হবে না।

জর্দান ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালে আমি ও আমার সাথিরা অনেক আলোচনা পর্যালোচনা করার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। কারণ, কমিউনিস্টরা ধর্মকে অস্বীকার করে। তারা মুরতাদ। আর মুরতাদদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– من بدّل دينه فاقتلوه "যে তার দীনকে পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা করে ফেল।"

কখনো দেখবে, কোন কমিউনিস্ট তোমার সাথে জুমা'আর নামায আদায় করছে। কিন্তু সে ইসলামকে অপছন্দ করে। একথা বলতেও অপছন্দ করে যে, ইসলাম মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, মানুষের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান তাতে বিদ্যমান রয়েছে, তাহলে মনে করবে, সে কমিউনিস্টদের আদর্শে বিশ্বাসী। আর এমন বিশ্বাস ও ধারণা যে পোষণ করে, সে কাফির।

যদি কোন ইহুদী বা খ্রিস্টান কোন মুসলিম দেশে বসবাস করে, চাই সে পাশ্চাত্যের হোক বা প্রাচ্যের, তাকে হত্যা করা যাবে না, যদি সে সে দেশে ভিসা নিয়ে এসে থাকে। খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে, ভিসা অর্থ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা। ভিসা নিয়ে আসার অর্থ হল, সে তার জান ও মালের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়েই মুসলিম দেশে এসেছে। যদি সে ধারণা করত, সে এ দেশে জান ও মালের নিরাপত্তা পাবে না, তাহলে সে এ দেশে আসত না। তাই তাকে হত্যা করা যাবে না। মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। হ্যাঁ, যদি সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং মুসলমানদের খ্রিস্টান বানাতে শুরু করে, তাহলে তার বিধান হল আমরা তাকে শেষবারের মত সতর্ক করে দিয়ে বলব, যদি তুমি মুসলমানদের মাঝে খ্রিস্টানধর্ম প্রচার কর, তাহলে তোমার মৃত্যুদণ্ড অবধারিত এবং তোমাকে যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, তা আর বলবৎ থাকবে না।

হ্যাঁ, কোন অমুসলিম যদি ভিসা নিয়ে এসে কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হয় বা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার শুরু করে, তখন তাকে সতর্ক করা হবে। তারপরও যদি সতর্ক না হয়, তাহলে ইসলামী সরকার তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবে। এটা ইসলামী বিধান। আমি এ ব্যাপারে বেশ অধ্যয়ন করে এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি।

পক্ষান্তরে কোন দেশের ভিসা নিয়ে সে দেশে গমন করা মানে সে দেশের রাষ্ট্রীয় আইনবিরোধী কোন কাজ না করা। হ্যাঁ, যদি তারা কোন মুসলিমকে নামায আদায় করতে, রোযা রাখতে ইত্যাদি ইসলামী বিধান পালন করতে বারণ করে, তবে তা মানা যাবে না।

তবে কোন মুসলিম অমুসলিম দেশের কাউকে ধোঁকা দিতে পারবে না। কারো সম্পদ ছিনিয়ে আনতে পারবে না। সে দেশের কোন নারীকে অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারবে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষতিকর কোন কাজ করতে পারবে না। টেলিফোন বিল অপরিশোধিত রাখতে পারবে না। কারণ, ইউরোপ বা আমেরিকায় বা পাশ্চাত্যের যে কোন দেশের মানুষ ইসলামের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও মানুষদের বিশ্বাস করে। মানুষকে মানুষ হিসেবে অত্যন্ত সম্মান করে। মনে কর, আমাদের দেশে টেলিফোন বিল পাঠানোর পর দু'দিন যেতে না যেতেই লাইন কেটে দেয়। হয়তো বা এক সপ্তাহ পর বা একমাস পর। কারণ, তুমি টেলিফোন বিল পরিশোধ করনি। এক মুসলিম যুবক আমাকে বলেছে, আমার টেলিফোন ও বিদ্যুৎ বিল এল। সে বিষয়টি তার আমেরিকান বন্ধুদের জানাল। বলল, আমার পি.এইচ.ডি শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন দেশে ফিরে যাচ্ছি। অর্থ সংকটে আছি। কীভাবে এখন এ বিল পরিশোধ করব? তারা তাকে বলল, কোন চিন্তা নেই। তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও। আমরা তা পরিশোধ করে দিচ্ছি। দেশে গিয়ে আমাদের কারো ঠিকানায় অর্থ পাঠিয়ে দিও।

পাশ্চাত্যের লোকেরা মিল-ফ্যাক্টরির বীমা করে। ফ্যাক্টরি পুড়ে গেলে বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি হলে বীমা কোম্পানি তাদের ক্ষতি পূরণ প্রদান করে। কিছু আরব সেখানে গিয়ে করল কী! যখন দেখল, তার ফ্যাক্টরি লাভবান হচ্ছে না; বরং ক্রমান্বয়ে লোকসান দিতে দিতে পথে নামার অবস্থা। তখন গিয়ে বীমা কোম্পানিতে তার ফ্যাক্টরির বীমা করল। তারপর ফ্যাক্টরিতে আগুন দিয়ে তা জ্বালিয়ে বীমা কোম্পানিতে গিয়ে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করল। বিলিয়ন ডলার বীমা কোম্পানি থেকে হাতিয়ে নিল। এটা অন্যায় ও অনৈতিকতা।

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে শাইখ! আপনার এ অভিমত তো সে সময়ের, যখন ইসলাম বিজয়ী ছিল, ইসলাম শৌর্য-বীর্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার শক্তি ও প্রতাপ ছিল। তাই ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বলেছেন– যদি কোন মুসলমান কোন খ্রিস্টানের হাত ভেঙ্গে দেয়, তবে তাকে শুধু জরিমানা পরিশোধ করতে হবে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, এখনো সেই বিধানই বলবৎ রয়েছে।

শোন! ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় রাখা কখনো সম্ভব নয়। ইসলামী বিধান লঙ্ঘন করার কারণে যদি তুমি তাদের উপর আক্রমণ কর; অথচ তারা অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী, তাহলে তার ফলাফল কী হবে তা কি ভেবে দেখেছ? শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ। বরং ইসলামী দাওয়াতের কাজ ও আমল নির্বিবাধে করার স্বার্থে

এ ধরনের কাজ না করাই ভাল। আমরা যদি তাদের একজনকে হত্যা করি, তাহলে তারা আমাদের শত শতজনকে হত্যা করবে। আর গোটা পৃথিবীকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। আমেরিকা ক্ষেপে উঠবে। তোমার দেশকে আমেরিকার যে গোয়েন্দারা নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা ক্ষেপে উঠবে। তোমাকে ও তোমার মত শত শত মানুষকে বন্দি করার জন্য তোমার রাষ্ট্র প্রধানের উপর প্রবল শক্তি প্রয়োগ করবে। শুধুমাত্র একজন খ্রিস্টান বা ইহুদীকে হত্যা করার কারণে এ বিপদ নেমে আসতে পারে। অতএব, ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হবে। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে সামনে অগ্রসর হতে হবে।

কোন খ্রিস্টানের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া কিছুতেই তোমার জন্য বৈধ হবে না। আর মুসলমানদের দেশে যেসব পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানরা আসে, তাদের হত্যা করাও বৈধ হবে না। তবে তাকে সতর্ক করে দেয়ার পর এবং এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, সে এমন অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত রয়েছে যে, তাকে হত্যা করা বৈধ, তখন তাকে হত্যা করা যাবে। জনৈক প্রশ্নকারী বলল, তাদের হত্যা করা কখন বৈধ বা অবৈধ হবে তা কে নির্ধারণ করবে? আমিই কি নির্ধারণ করে নিব, না আলিমরা তা নির্ধারণ করে দিবেন?

আলিমগণ। তাঁরাই তা নির্ধারিত করে দিবে। ফতওয়া কারা দিয়ে থাকেন? আলিমগণ। সুতরাং আলিমগণ ফতওয়া দিবেন যে, এই অপরাধের জন্য অমুক খ্রিস্টানকে হত্যা করা বৈধ। তখন-ই তোমার জন্য সেই খ্রিস্টানকে হত্যা করা বৈধ হবে। তবে একটা কথা খুব ভালভাবে মনে রাখতে হবে। যেনতেন আলেম বা মুফতী দিয়ে কিন্তু এ কাজ হবে না। বর্তমান অবস্থা এমন যে, কেউ হয়তো ফতওয়া বিষয়ক দু'চারটি কিতাব পড়ে নিল তারপর সে মুফতী সেজে বসল আর ফতওয়া দেয়া শুরু করল।

তারা কুরআনের আয়াত পাঠ করবে–

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَأَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ ○

অর্থ : তোমরা তাদের যেখানেই পাবে হত্যা করবে এবং তারা তোমাদেরকে যেখান থেকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিবে।

আরো পাঠ করবে–

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوْهُمْ ○

অর্থ : পবিত্র মাসসমূহ শেষ হয়ে গেলে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে।

তারা এ ধরনের আয়াত পাঠ করে নির্দ্বিধায় ফতওয়া দিয়ে দেয়। অথচ তারা বর্তমান অবস্থা ও মুসলিম বিশ্বের অবস্থানের কথা ভেবে দেখে না। ফতওয়া দেয়া কোন সহজ কাজ নয়।

মিসরের শাকরী মুস্তফার দল جماعة التكفير و الهجرة (জামা'আতুত তাফকীর ওয়াল হিজরাহ) এ কাজই করত। ব্যস, কুরআনের আয়াত পাঠ করে শাব্দিক অর্থ তুলে ফতওয়া দিত। এমনকি তারা মুসলমানদেরকেও হত্যার ফতওয়া দিত। এরা আয়াতের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করত না।

মিসরের গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা শাকরীর দলের মধ্যে ঢুকল। তাদের ধোঁকা দিল। ফলে তারা অল্প দিনে নিঃশেষ হয়ে গেল। বেশি দিন টিকতে পারল না। তাদের ঔদ্ধত্য এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তারা অধিকাংশ আলিমকেই ধর্মচ্যুত মনে করত।

তাদের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য তাদের নেতাকে হত্যা করা হল। ফলে দেশ শান্ত হল। তবে এতে তার অন্ধ অনুসারীরা ক্ষেপে উঠল ভীষণ। বলল, এ পরহেজগার ধার্মিক লোককে এভাবে হত্যা করা হল কেন? তারা প্রতিবাদ সভার আয়োজন করল। তখন তাদের নেতৃস্থানীয় আরো চার-পাঁচজনকে হত্যা করা হল। অন্যান্য নেতা-কর্মীদের বন্দী করা হল।

প্রশ্নকারী দাঁড়িয়ে বলল, খ্রিস্টানরা বর্তমানে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত। এদের বিধান কী?

বললাম, যুদ্ধরত খ্রিস্টান কারা?

প্রশ্নকারী বলল, সকল খ্রিস্টান-ই তো যুদ্ধরত।

বললাম, তারা কীভাবে যুদ্ধ করছে?

প্রশ্নকারী বলল, যারা ক্রুস ব্যবহার করছে, তারাই তো ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

বললাম, কেউ ক্রুস ব্যবহার করলেই সে যুদ্ধরত নয়। এটাতো তার বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। যুদ্ধরত তো ঐ খ্রিস্টান, যে অস্ত্র উঁচিয়ে হত্যা করতে ধেয়ে আসে।

আমাদের মূল আলোচনা হল, যদি খ্রিস্টান-ইহুদী বা জিম্মী জিযিয়া কর আদায় করে, তাহলে তাকে চাষাবাদের বা ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করা হবে। তার ব্যবসা থেকে, চাষাবাদ থেকে রাষ্ট্র কোন কর নিবে না। তবে খেরাজী জমি থেকে খেরাজ নেয়া হবে।

আমাদের মুসলিম দেশের সকল জমিই সাধারণত খেরাজী। তাই খ্রিস্টানদের ফসল থেকে খেরাজ নেয়া হবে। আর নিরাপত্তা কর হিসেবে তাদের থেকে জিযিয়া নেয়া হবে।

তবে যদি তারা মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বিশেষভাবে মক্কা ও মদীনার অধিবাসীদের জন্য খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসে, তাহলে এ ধরনের ব্যবসায়ী থেকে হযরত উমর (রাঃ) অর্ধ উশর গ্রহণ করতেন। তারা তেল, আটা ইত্যাদি নিয়ে আসলে তাদের থেকে অর্ধ উশর আদায় করতেন। আর অন্য ব্যবসা করলে তাদের থেকে পূর্ণ উশর গ্রহণ করতেন।

খেরাজী জমি থেকে খেরাজ নেয়া হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের ইহুদীদের থেকে খেরাজ গ্রহণ করেছিলেন। খায়বার বিজয়ের পর খায়বারের ভূমিকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন। এক ভাগ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আরেক ভাগ সেখানকার ইহুদীদের নিকট রেখে দিয়েছিলেন। তারা খেরাজ প্রদান করত। মুসলমানরা তাদের জমীনের ফসল থেকে উশর প্রদান করে, আর অমুসলিমরা দেয় খেরাজ। জিযিয়া প্রদানকারী কোন অমুসলিম যদি তার বাড়িতে মদ তৈরি করে, তবে তাকে বাঁধা প্রদান করা হবে না। হ্যাঁ, সে যদি হাটে বা প্রকাশ্যে মদ বা শূকর বিক্রির জন্য নিয়ে যায়, তবে তাকে অবশ্যই বাঁধা প্রদান করা হবে। এথেকে তাকে বিরত রাখতে হবে।

যদি কোন অমুসলিম তার বাড়িতে নিজ পরিজনের জন্য মদ তৈরি করতে থাকে আর কোন মুসলমান তার বাড়িতে প্রবেশ করে যদি মদ তৈরির আসবাব ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে সেই মুসলমানকেই এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

কোন ইহুদী বা খ্রিস্টান যদি অস্ত্র উঁচিয়ে আমাদের মারতে আসে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করব এবং আমরা যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা প্রত্যাহার করে নিব।

তেমনিভাবে খ্রিস্টানদের ইসলামী দেশে থাকতে হলে ভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে থাকতে হবে। তাদের বুকের উপর এমন কোন চিহ্ন থাকতে হবে বা কোমরে এমন কোন বেল্ট বাঁধবে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, সে ইহুদী বা খ্রিস্টান। কারণ, ইসলামী দেশে অমুসলমানদের চলা-ফেরার নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে।

মুসলিম ও অমুসলিম এক সাথে চললে মুসলমানরা রাস্তার মাঝ দিয়ে হাঁটবে। হযরত উমর (রাঃ) বাইতুল মুকাদ্দাসের খ্রিস্টানদের জন্য এই নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে, তারা আত্মপরিচয়ের জন্য পোশাকের উপর বুকে এক বিশেষ ধরনের কাপড় ব্যবহার করত অথবা কোমরে তাগা ব্যবহার করত। এ ধরনের নির্দিষ্ট চিহ্নের মাধ্যমে তাদের চিহ্নিত করা হত। তারা অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করতে পারত না। পথের মাঝ দিয়ে তাদের চলার অধিকার ছিল না। ঘোড়ায় চড়লে তাদের গদি ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না।

তাছাড়া তারা গির্জায় ঘণ্টি বাজাতে পারত না। নতুন করে কোন গির্জা নির্মাণ করতে পারত না। ধর্মীয় উৎসবের দিনে তারা প্রকাশ্যে উৎসব পালন করতে পারত না। এসব নিয়ম ছিল হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসনামলে।

আমি নিজে শামের এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, আমরা পথ চলতে যখন কোন খ্রিস্টানকে পথের মাঝে দেখতাম, তখন বলতাম, এই! বামে সরে দাঁড়াও। তখন খ্রিস্টানরা পথ ছেড়ে বাম পার্শ্বে এসে দাঁড়াত। কোন খ্রিস্টান অশ্বারোহী আমাদের সামনে পড়লে ঘোড়া থেকে নেমে যেত। কোন খ্রিস্টানের মুসলমানদের উপরে চড়ার অনুমতি ছিল না। তাই কোন খ্রিস্টানের মুসলমানের বাড়ির চেয়ে উঁচু বাড়ি নির্মাণের অনুমতি ছিল না। কিন্তু এখন অবস্থা একেবারে পাল্টে গেছে।

বাদশাহ ফারুকের বোন ফাতহিয়্যা এক খ্রিস্টান যুবকের প্রেমে পড়ল। তার মায়ের নাম ছিল নায়েলী। তার মা তাকে বলল, এই মেয়েটি খ্রিস্টান ছেলে কামাল গালীকে বিয়ে করতে চায়।

ফারুক মায়ের কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক। বলল, যদি এমনই হয়, তাহলে মিসরের লোকদের এবং জামি'আ আজহারের আলিমদের হাত থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? তারা তো আমাকে এবং আপনাদের কাফির ঘোষণা দিবে। কীভাবে সে এক খ্রিস্টান যুবককে বিয়ে করতে পারে! এটা অসম্ভব! কিছুতেই হতে পারে না।

মা বলল, তুমি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা কর। সমাধান এর একটা বের করতেই হবে।

কোন উপায় না দেখে বাদশাহ ফারুক তার বোনের ব্যাপারে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করল। আল-আযহারের মুফতীরা ফারুকের বোনকে কাফির ঘোষণা করল। সে এসব কিছুর পরওয়া করল না। সে কামাল গালীকে বিয়ে করে নিজের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার নিয়ে আমেরিকায় চলে গেল। একদিন ফাতহিয়্যার টাকা শেষ হয়ে গেল। অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। সে রাজকুমারী থেকে এক সাধারণ আমেরিকান পরিবারের বধূতে পরিণত হয়ে গেল। অন্যের কাজ করে সে নিজের অন্নের সংস্থান করত। একদিন ফাতহিয়্যার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তার খ্রিস্টান স্বামী তাকে গুলি করে হত্যা করল। তার স্বামী লস এঞ্জেলসের আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পন করল। অপরাধ ও লোভ তাকে শেষ করে দিল।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إذا أبغض الله عبدا نادى مناد في السماء إن الله أبغض فلانا فاغضوه، و نادى مناد في الأرض ، إن الله أبغض فلانا فاغضوه و من أرضى الناس بسخط الله عليه سخط الله عليه و أسخط عليه الناس و إذا أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه و أرضى عنه الناس —

"আল্লাহ যখন কোন বান্দার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তখন আকাশে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, আল্লাহ অমুক ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। সুতরাং তোমরাও তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাও। আর যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে তোলেন। আর যদি মানুষকে অসন্তুষ্ট করার মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও সন্তুষ্ট করেন।"

তাই বলেছিলাম, ইসলামের বিধি-বিধান বিকৃত করে দেয়া হচ্ছে। ইসলামের বিধান কোথায় বাস্তবায়িত করবে? পৃথিবীর কোন একটি দেশ বা অঞ্চল নেই, যেখানে ইসলামী বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা আর কী বলব! জর্দানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তখন সামরিক বা পুলিশ বাহিনীতে কোন খ্রিস্টানকে অফিসার পদে পদোন্নতি দেয়া হত না। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবেও তাদের নিয়োগ করা হত না। জর্দানের কোন বিচারক খ্রিস্টান ছিল না। অথচ এখন শতকরা ৪৮ বা ৫০ জন বিচারক খ্রিস্টান। তারাই এখন মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ের ফয়সালা দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, খ্রিস্টানদের নিয়ে একটি বিশেষ ফোর্সও তৈরি করা হয়েছে এবং তাদের ক্ষমতাও প্রচুর।

বাদশাহ আব্দুল্লাহর আমলে ওমানে একটি গির্জা নির্মাণ করা হচ্ছিল। নির্মাণ কাজ বেশ অগ্রসর হওয়ার পর সংবাদ পেয়ে বাদশাহ আব্দুল্লাহ তা দেখতে গেলেন। সাথে সাথে তিনি শহরের প্রশাসককে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি তৈরি হচ্ছে? প্রশাসক বলল, এটা খ্রিস্টানদের গির্জা। এরা আমার উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে এটা তৈরি করছে। রোববারে তারা তাতে ইবাদত করবে। বাদশাহ আব্দুল্লাহ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, তুমি তো দেখছি শহরে খ্রিস্টানদের জন্য দুর্গ তৈরি করছ? যাও এখনি এর নির্মাণ কাজ বন্ধ কর। বাদশাহর নির্দেশে তা ভেঙ্গে ফেলা হল। তখন নতুন গির্জা তৈরি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।

একবার এক খ্রিস্টান "মাদরাসাতুস সালাত" এর অধ্যক্ষ হল। এ কথা শুনে শহরের লোকেরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। অথচ এখন সবকিছু উল্টো ঘটছে।

থাক সে কথা, জিযিয়া কর কিসের বিনিময়ে প্রদান করতে হয়, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর অনুসারীরা বলেন, কাফির হওয়ার কারণে তাদের হত্যা করা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু হত্যা করা হচ্ছে না, তাই তাকে জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন- ইসলামী দেশে নিরাপদে বসবাস ও রক্তের বিনিময়ে জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে।

আর হানাফী মাযহাবের কতিপয় আলিম বলেছেন- জিহাদ ও জিহাদের সাহায্যের বিনিময়ে জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে। এ কারণে যে, তাদের জিহাদে অংশ গ্রহণে বাধ্য করা হয় না।

তাই কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে মালেকী ও হানাফীদের মতে তাকে সে বৎসরের ও পরবর্তী বৎসরের কোন জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে না।

আর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যদি সে বৎসরের জিযিয়া কর আদায় না করে থাকে, তবে তাকে সে বৎসরের জিযিয়া আদায় করতে হবে।

যদি কেউ জিযিয়া আদায় না করে, তবে তাকে শাস্তি প্রদান করা বৈধ। তবে দরিদ্র বা দাস হলে, তাকে জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে না। তেমনি মহিলাদেরও জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে না। যুদ্ধে সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক ধনী অমুসলমানের উপরই জিযিয়া কর প্রদান ওয়াজিব।

যদি কোন ধনী খ্রিস্টান অন্য কোন দরিদ্র খ্রিস্টানের পক্ষ থেকে জিযিয়া আদায় করে, তবে তা গ্রহণ করা হবে না।

জিযিয়া কর হল একটি লাঞ্ছনার বিষয়। হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলে তাগলিব গোত্রের খ্রিস্টানরা জিযিয়া প্রদান করতে অস্বীকার করল। তারা বলল, জিযিয়া হল লাঞ্ছনার বিষয় আর আরবরা লাঞ্ছনা মেনে নিতে পারে না। সুতরাং আপনি যত ইচ্ছা আমাদের উপর কর ধার্য করুন; তবু আমরা জিযিয়া প্রদান করতে রাজি নই।

হযরত উমর (রাঃ) তখন তাদের উপর দ্বিগুণ কর নির্ধারিত করে দিলেন এবং বললেন, তোমরা এবার এর যে নামই রাখ তা তোমাদের ইচ্ছা।

দ্বাদশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٢٩) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ○

অর্থ : তোমরা আহলে কিতাবের ঐ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ ও পরকালের ব্যাপারে ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম করে না। আর সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না। যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে। (সূরা তাওবা ঃ ২৯)

আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা এক নতুন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ মুসলমানরা পূর্ববর্তী কিতাবীদের সাথে কেমন আচরণ করবে, এ বিষয়ের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বিধানাবলি এতে আলোচিত হয়েছে। আর যে বিষয়টি সবার নিকট স্পষ্ট, তা হল, আহলে কিতাবদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বর্ণনাভঙ্গীতে ও আলোচ্য বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআনের এক অভিনব পদ্ধতি লক্ষণীয় বটে। কুরআনের মক্কী ও মাদানী সূরাগুলোর মাঝে পার্থক্য আছে। মদীনায় প্রথম যুগে অবতীর্ণ বিধান আর শেষ সময়কার বিধানসমূহের মাঝেও পার্থক্য বিদ্যমান।

তবে কিতাবীদের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী, তার চিন্তার প্রকৃতি ও বিধানাবলিতে তেমন কোন ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। তবে অবস্থা ও সময়ের ব্যবধানে যা পরিবর্তন হয়েছে, তা হল তাদের সাথে আচরণের ভিন্নতা।

কিতাবীরা যে তাদের সঠিক অবস্থান থেকে দূরে সরে এসেছে, তারা যে আল্লাহপ্রদত্ত কিতাবের ধারক ছিল, তারা যে মানুষের জন্য হিদায়াতকারী ছিল; আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া তাদের থেকে ভিন্ন কিছুর আশা করা যায় না; এ মৌলিক বিষয়গুলোতে কোন বিরোধ বা পার্থক্য দেখা যায় না। এ বিষয়ে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহ বা মদীনায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহের মাঝেও বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই।

বিষয়বস্তুর আলোচনা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে ভিন্নতা ও পার্থক্যের মূল কারণ হল, ইসলাম এক গতিশীল, আন্দোলনমুখী ও কর্মমুখর ধর্ম। বাস্তবতা ও সময়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে যায়।

ইসলামের প্রথম যুগের কথা বলছি। মক্কায় কোন কিতাবী ছিল না। ইহুদী-খ্রিস্টান কেউ ছিল না। তাই কিতাবীদের সাথে মতবিরোধ সৃষ্টির কোন কারণও দেখা দেয়নি। মক্কায় মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র মুশরিকদের সাথে। তাই আমরা দেখতে পাই, মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে বিক্ষিপ্ত আলোচনা ছাড়া কিতাবীদের নিয়ে তেমন কোন গভীর আলোচনাই নেই। যেমন সূরা শূরা মক্কায় অবতীর্ণ। তাতে আল্লাহ তা'আলা কিতাবীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন–

(١٤) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ○

অর্থ : তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতবিরোধ করছে। যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তাহলে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা ঘোর সন্দেহে নিপতিত রয়েছে। (সূরা শূরা ঃ ১৪)

তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আ'রাফে কিতাবীদের দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। আচ্ছা, সূরা আ'রাফ মক্কী সূরা না মাদানী সূরা? মনে রাখতে হবে, যে সব সূরায় পূর্ববর্তী নবীদের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে, তা মক্কী সূরা। এ ক্ষেত্রে কোন সূরা মক্কী আর কোন সূরা মাদানী তা চিহ্নিত করার কিছু নিয়ম আছে। যেমন–

ক. যে সব সূরায় সিজদার আয়াত রয়েছে, সেগুলো মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। তবে সূরা হজ্জ তার ব্যতিক্রম।

খ. যে সব সূরায় ১৫ শব্দটি বিদ্যমান, সেগুলো মক্কায় অবতীর্ণ সূরা।

গ. যে সব সূরায় হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর আলোচনা বিদ্যমান, সেগুলো মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। তবে সূরা বাকারা এর ব্যতিক্রম।

মক্কী সূরার প্রকৃতি হল, তাতে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের আলোচনা বিদ্যমান থাকে। এর উদ্দেশ্য হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াতের কাজে দৃঢ় ও অবিচল রাখা। মক্কী সূরার আরো প্রকৃতি হল, সূরাগুলোতে ইলাহ-এর একত্ববাদ, রব-এর রবুবিয়্যাত সম্পর্কিত আলোচনা থাকা। তেমনিভাবে গুণাবলি ও নামের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কিত আলোচনা থাকা। মানুষের সৃষ্টির সূচনা নিয়ে আলোচনা করা। কোথায় চলাফেরা করবে, কোথায় যাবে, কীভাবে পুনরুজ্জীবিত হবে এসব বিষয় হল মক্কী সূরার প্রকৃতি। তাই যে সব সূরায় হযরত আদম (আঃ)-এর আলোচনা করা হয়েছে, আদম (আঃ) ও ইবলীসের আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো মক্কী সূরা।

সুতরাং যে সূরায় রোযার বিধান রয়েছে, তা মাদানী সূরা। হজ্বের বিধান রয়েছে, তা মাদানী সূরা। বিয়ে তালাকের বিধান রয়েছে, তা মাদানী সূরা।

মক্কী সূরার প্রায় সবগুলো ছোট ছোট আয়াত সম্বলিত। তবে এর বর্ণনাভঙ্গী হৃদয়কে মোহিত করে, স্পর্শ করে, প্রকম্পিত করে। আর মাদানী সূরার আয়াতগুলো দীর্ঘ। মাদানী সূরাগুলো মক্কী সূরার তুলনায় হৃদয়কে কম মোহিত করে, হৃদয়ে কম আলোড়ন সৃষ্টি করে।

তাই তুমি যখন কুরআন তিলাওয়াত শুরু করবে, বুঝতে পারবে সূরাটি মক্কী না মাদানী। তাছাড়া যে সূরাগুলোতে জান্নাত জাহান্নামের আলোচনা করা হয় সেগুলোও মক্কায় অবতীর্ণ সূরা হিসাবে বুঝতে হবে। ৯২টি সূরা মক্কী আর ২২টি সূরা মাদানী। কুরআন মাজীদে ১১৪টি সূরা রয়েছে। এ সূরাগুলো ৩০ পারায় বিভক্ত। আর প্রত্যেকটি পারায় দু'টি হিজব রয়েছে। সুতরাং কুরআন মাজীদে ৬০টি হিজব রয়েছে। আর ছয় হাজারের চেয়ে অধিক আয়াত রয়েছে। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুসারে তাতে ৬২৩৬টি আয়াত রয়েছে। এসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা কুরআনের জ্ঞান বিষয়ক কিতাবসমূহে পাবে।

তবে একটি বিষয় খুবই বিস্ময়কর যে, কুরআনে মক্কী সূরা বা মাদানী সূরা উভয় প্রকার সূরা বনী ইসরাঈলের ইতিহাসকে সবিস্তারে আলোচনা করেছে। ইতিহাসে যে সব ক্ষেত্রে তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র রয়েছে, তার বর্ণনা করেছে, দীন ও নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণ্য কার্যাবলি ও পদক্ষেপের আলোচনাও সবিস্তারে করা হয়েছে। যেমন– মাদানী সূরা আলে ইমরানে ইহুদীদের ঘৃণ্য কার্যাবলির আলোচনায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

(١١٢) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِاٰيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ ○

অর্থ : আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বা মানুষের প্রতিশ্রুতি ছাড়া ওরা যেখানেই অবস্থান করবে, সেখানেই তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হবে। আর ওরা আল্লাহর গজবের যোগ্য হয়ে গেছে। তাদের উপর গলগ্রহতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তা একারণে যে, ওরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে আসছে এবং অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে আসছে। আর তা এ কারণে যে, ওরা নাফরমানী করেছে ও সীমালঙ্ঘন করেছে।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১২)

আর মক্কী সূরা আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘৃণ্য কার্যাবলির আলোচনা শেষে বলেছেন–

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

অর্থ : আর সে সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আপনার পালনকর্তা সংবাদ দিলেন যে, অবশ্যই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান করতে থাকবে। নিঃসন্দেহে আপনার পালনকর্তা শীঘ্র শাস্তি দানকারী আর নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৬৭)

কুরআনকে যারা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছে, তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, কিতাবীদের নিয়ে কুরআন যত আলোচনা করেছে আরব উপদ্বীপে অবস্থানরত রাসূলের জন্য এর তেমন প্রয়োজন ছিল না। মক্কী জীবনে তো তার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ মক্কায় কোন কিতাবী ছিল না। মক্কায় রাসূলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মুশরিকরা। অবশ্য মদীনাতে ইহুদীরা ছিল; কিন্তু খ্রিস্টানরা ছিল না বললেই চলে।

এ হিসাবে বাহ্যদৃষ্টিতে কুরআন কিতাবীদের আলোচনা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি করেছে বলে মনে হতে পারে।

কিন্তু দূরদর্শী পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত, কুরআনে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা প্রয়োজন অনুযায়ীই করা হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা জানেন, মক্কার মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণের পরই কিতাবীরা ইসলাম ও মুসলমানদের মুখোমুখি দাঁড়াবে। কিতাবীরাই মুসলমানদের ঘোর দুশমন হয়ে দাঁড়াবে। তারাই প্রধান বাঁধার সৃষ্টি করবে। আর ইহুদীরা মদীনা থেকে শুরু করে পৃথিবীর সর্বত্র কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের শত্রুতায় সর্ব শীর্ষে থাকবে। তাই আল্লাহ তা'আলা কিতাবীদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যেন কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য তা সঠিক দিক-নির্দেশনা ও আলোর মিনার হয়ে থাকে।

ইতিহাস তাই বলে। আরব উপদ্বীপে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু ছিল মুশরিকরা। তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়ার পর মুসলমানদের দ্বন্দ্ব ও লড়াই কিতাবীদের সাথে শুরু হয়। এ লড়াই চলছে। মুসলমানদের অধিকাংশ যুদ্ধ হয় রোমানদের সাথে। পারসিকদের সাথে যুদ্ধ হলেও কিসরার পতনের পর বিশেষভাবে নুমান ইবনে মুকরিন (রাঃ)-এর নেতৃত্বে নাহাওন্দের যুদ্ধের পর পারস্য সাম্রাজ্য শেষ হয়ে যায়।

পারস্য সাম্রাজ্যের পরিণতির সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়ে গেছেন। তিনি পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন। পারস্য সম্রাট কিসরা তখন অহংকার ভরে রাসূলের চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, ... আল্লাহ তার রাজত্বকেও ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবেন।

তারপর বলেছিলেন– কিসরা যখন ধ্বংস হবে তারপর আর কোন কিসরা দুনিয়াতে থাকবে না। পারস্য সাম্রাজ্য মাত্র কয়েক বৎসর মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল। তারপর তা ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কিন্তু রোমানদের সাথে আমাদের যুদ্ধ সেই ইয়ারমুক থেকে শুরু হয়েছে, যা আজো চলছে। যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে পরাজয় বরণ করতে করতে তারা কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করল। তারা

ইসলাম ধর্মের অগ্রাভিযানের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মযাজক বা পোপের আস্তানা ছিল রোম শহরে। সেখানেই ছিল তার প্রধান গির্জা।

ফ্রান্সে "বালাতুশ-শুহাদা" রণাঙ্গনে মুসলিম সেনাপতি আবদুর রহমান গাফেকীকে হত্যা করে "শার্ল মারতাল" মুসলমানদের অগ্রাভিযানকে থামিয়ে দিল। ইউরোপে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা থেমে গেল।

এরপর ইতিহাসের পটভূমিতে এসে আবির্ভূত হল তুর্কীরা। নতুন করে আবার ইসলামের বিজয় যাত্রা শুরু হল। মুহাম্মদ ফাতেহ ছিল তুর্কীদের অত্যন্ত দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিক সেনাপতি। তার রণকৌশলের সামনে ইউরোপ মাথা নত করল। পতন ঘটল কনস্টান্টিনোপলের। মুসলিম মুজাহিদরা ইউরোপের অভ্যন্তরে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করতে লাগল। এ সকল যুদ্ধে মুসলমানরা কিতাবীদের সাথেই যুদ্ধ করেছে। কিতাবীদের পক্ষ থেকেই বার বার বাঁধা এসেছে। যুদ্ধ হয়েছে।

আমরা এখন যে দেশে আছি অর্থাৎ এই আফগানিস্তান, এটা ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন। বদখশান, জুরজান, হেরাত, খোরাসান, বুখারা, সমরকন্দ এ সকল অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এ সকল অঞ্চল হযরত উসমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে পদানত ও বিজীত হয়েছিল। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন–

ألم ترني بعثُ الضلالةَ بالهدى و أصبحتُ في جيش بن عفان غازيًا —

"তুমি কি দেখনি, আমি ভ্রষ্টতাকে ত্যাগ করে হিদায়াত গ্রহণ করেছি আর উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-এর বাহিনীতে মুজাহিদ হয়ে গেছি?"

এ গোটা অঞ্চল হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাসনামলে বিজিত হয়েছে। বিশিষ্ট মুজাহিদ আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা হযরত উমর বা উসমান (রাঃ)-এর যুগে কাবুল পদানত করেন।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ইসলাম যে সব জাতির নিকট পৌঁছেছে, তারা এত বিদ্রোহ করেনি, যত বিদ্রোহ করেছিল আফগানিস্তানের লোকেরা। এ দেশের লোকেরা বার বার বিদ্রোহ করেছে আর বার বার মুজাহিদ বাহিনী তাদের পদানত করেছে।

আফগানদের সম্পর্কে খ্যাত যে, এ দেশের লোকেরা কোন মতবাদ বা ধর্মকে একবার গ্রহণ করে নিলে মজবুতভাবে তা আঁকড়ে ধরে আর তার প্রচারে জীবন কুরবান করতেও প্রস্তুত থাকে। তাই তারা যখন বৌদ্ধ ধর্মকে গ্রহণ করেছিল, তখন মজুবতভাবেই তা গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাই আজো বামিয়ানে বুদ্ধের বিশাল মূর্তি বিদ্যমান রয়েছে। (সম্প্রতি তালেবানের শাসনামলে এ মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। -অনুবাদক)। এ আফগানিস্তানের লোকেরাই বৌদ্ধ ধর্মকে পাকিস্তান, হিন্দুস্তান ইত্যাদি এলাকায় প্রচার ও প্রসার করেছিল।

ইসলাম আগমনের সময় প্রথমে কিন্তু তারা তা সহজে মেনে নিতে চায়নি। ফলে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ইসলামকে গ্রহণ করে নেয়ার পর তারাই ইসলামের ধারক ও বাহক হয়েছিল। ইতিহাসখ্যাত সুলতান মাহমুদ গজনবীর কথা কে না জানে। তিনি সতেরবার ভারতবর্ষে আক্রমণ করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। তখন থেকে তারা হানাফী মাযহাবকে যে আঁকড়ে ধরেছে, তা কিয়ামত পর্যন্ত ধরে রাখবে। যদি তারা কাউকে দেখে যে, সে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী বিতরের নামায পড়ে; ব্যস, তাহলেই হল, তার পিছনে আর তারা নামায পড়বে না। এ ব্যাপারে তারা কোন কথাই শুনবে না।

পৃথিবীর বহু দেশে হানাফী মাযহাবের লোকেরা অন্য মাযহাবের লোকদের সাথে বসবাস করে। কিন্তু আফগানিস্তান একটি ব্যতিক্রম দেশ। এদেশে হানাফী মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাবের লোক নেই বললেই চলে।

তবে ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, শাফেয়ী মাযহাবের বিশিষ্ট আলিম আবূ ইসহাক ইসফারাইনী-এর কারণে সুলতান মাহমুদ গজনবী ও তার অনুসারীরা শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তখন গজনী ও তার

আশেপাশের লোকেরাও শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তার বিলুপ্তি ঘটেছে এবং পরে আবার সকলে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হয়ে গেছে।

এর পশ্চাতে একটি চমৎকার কাহিনী আছে। একদিন সুলতান মাহমুদ গজনবী কৌতূহলবশত শাফেয়ী মাযহাবের আলিম আবূ ইসহাক ইসফারাইনীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে শাফেয়ী মাযহাবের নামায ও হানাফী মাযহাবের নামায কেমন হয়, পড়ে দেখাতে পারবে?

আবূ ইসহাক বললেন, অবশ্যই পারব। তারপর তিনি নবীযে তামার অর্থাৎ খেজুর ভিজানো মিষ্টি পানি দ্বারা অজু করলেন ও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলেন। তবে নতুন এক পদ্ধতিতে। অর্থাৎ হানাফী মাযহাবে সর্বনিম্ন যে আমলটুকু করলে নামায হয়ে গেছে বলে ফতওয়া দেয়া হয়, সে আমলগুলো করে নামায আদায় করলেন। সূরা ফাতিহা পড়লেন না। নামাযের শুরুতে আল্লাহু আকবার না বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বললেন। মুরগি ঠোকর দিয়ে খাবার তুলে নেয়ার ন্যায় অত্যন্ত সংক্ষেপে রুকু করে নিলেন। এভাবে নামায আদায় করলেন।

এতে সুলতান মাহমুদ গজনবী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। বললেন, আচ্ছা, শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী নামায আদায় করে দেখাও।

এবার তিনি পানি আনালেন এবং পরিপূর্ণভাবে সুন্দরভাবে ওযু করলেন। তারপর নামাযে দাঁড়ালেন, সূরা ফাতিহা পড়লেন। তার সাথে সূরা মিলালেন। রুকুর পর ধীরস্থির হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে সেজদায় গেলেন। এতমিনানের সাথে সেজদা আদায় করলেন। এভাবে সুন্দর করে নামায আদায় করলেন।

সুলতান মাহমুদ যেন ক্ষণকালের জন্য চিন্তার জগতে হারিয়ে গেলেন। হঠাৎ মাথা উঁচু করে বললেন, আজ থেকে আমি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসরণ করব। সুলতানের দেখাদেখি তার সভাসদদের অনেকে শাফেয়ী মাযহাব গ্রহণ করে নিল। এভাবে গজনী ও তার আশেপাশে শাফেয়ী মাযহাব ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু মনে হয় আফগানিস্তানের জন্য আল্লাহ হানাফী মাযহাবকেই কবুল করেছেন। তাই গজনীদের পতনের পর আবার লোকেরা হানাফী মাযহাবে ফিরে গেছে। এখনো পর্যন্ত গোটা আফগানিস্তানের লোকেরা হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করছে।

আমরা এবার মূল আলোচনায় ফিরে আসব। কিতাবীদের সাথে আমাদের এ যুদ্ধ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। তাই কুরআনে কিতাবীদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাদের ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। নবীদের সাথে তাদের অন্যায় আচরণের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। তাদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র, নবীদের প্রতি নানা নির্যাতন ও নির্দয়ভাবে নবীদের হত্যার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ইহুদী আর খ্রিস্টানদেরকে এক শব্দে ব্যক্ত করেছেন। অথচ তাদের পরস্পরের জিঘাংসা, হত্যালীলা ও শত্রুতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তাদের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস পাঠ করলে আজো শরীর শিউরে ওঠে। তাদের পরস্পরে এত বিদ্বেষ সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একই শব্দে ব্যক্ত করেছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা জানেন, তারা মুসলমানদের মোকাবেলায় এক হয়ে যাবে। ঐক্যবদ্ধভাবে তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ইহুদী-খ্রিস্টানদের 'ইয়া আহলাল কিতাব' বলে সম্বোধন করছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ○

অর্থ : হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কেন আল্লাহর কালামকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরাই তাঁর সাক্ষ্যদান কর। (আলে ইমরান ঃ ৭০)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

অর্থ : হে কিতাবীরা! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ করছ এবং সত্যকে গোপন করছ। অথচ তোমরা তা জান। (আলে ইমরান ঃ ৭১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ○

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা কিতাবীদের কোন দলের অনুসরণ কর, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদেরকে কাফিরে পরিণত করে দিবে। (আলে ইমরান ঃ ১০০)

এ ধরনের আরো বহু আয়াতে এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে।

ইসলাম যখন মদীনায় পৌছল এবং সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল, তখন সর্বপ্রথম ইহুদীদের পক্ষ থেকেই বাঁধা সৃষ্টি হতে লাগল। কিবলার পরিবর্তন হলে তারা মুসলমানদের অন্তরে নানা সন্দেহ সৃষ্টি করতে লাগল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

(١٤٢) سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ○

অর্থ : এখন নির্বোধরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলে দিন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।
(সূরা বাকারা ঃ ১৪২)

তারা মুসলমানদের অন্তরে বিভিন্ন সন্দেহ সৃষ্টি করতে লাগল। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পর কিতাবীদের মনোরঞ্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মদীনার ইহুদীরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে ইবাদত করত। নবী (সা.)ও সাহাবীদের নিয়ে তা-ই করতেন। এভাবে ষোল বা সতের মাস অতিবাহিত হল। অথচ বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায আদায়ের ইচ্ছা প্রিয় নবীর হৃদয়ে জাগ্রত ছিল। ঐ ঘরের দিকে ফিরে নামায আদায় করতে তার মন চাচ্ছিল, যা তার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আঃ) তৈরি করেছিলেন। এদিকেই ছিল তার হৃদয়ের টান, মনের ঝোঁক। এরপর আল্লাহ তা'আলা কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন এবং বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে ইবাদত করার হুকুম দিলেন। এবার শুরু হল ইহুদীদের পক্ষ থেকে অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র। তারা মুসলমানদেরকে যুক্তি উত্থাপন করে বলতে লাগল, এখন তোমাদের কিবলা কা'বা। দক্ষিণ দিকে ফিরে তোমরা এখন নামায আদায় কর (কারণ, মক্কা মদীনার দক্ষিণে অবস্থিত)। অথচ তোমরা ইতোপূর্বে উত্তর দিকে ফিরে নামায আদায় করতে (কারণ, বাইতুল মুকাদ্দাস মদীনার উত্তরে অবস্থিত)। তাই তোমাদের কোন নামায শুদ্ধ হয়েছে? আগের নামাযগুলো, না বর্তমানে এখন যা আদায় করছ সেগুলো? যদি তোমাদের নতুন নামাযগুলো সহীহ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের পুরাতন নামাযগুলো বাতিল হয়ে যাবে। এভাবেই তোমাদের নিয়ে খেলা হচ্ছে। আরেক দিন হয়ত তোমাদের আরেক দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে বলা হবে। ইহুদীদের এই অপপ্রচারের প্রেক্ষিতে তখন আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের হৃদয়কে দৃঢ় ও সংশয়মুক্ত করার জন্য নাযিল করলেন–

(١٤٤) قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ○ (١٤٥) وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ○

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব, যা আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরান। আর তোমরা যেখানেই যাও সে দিকে মুখ ফিরাও। যারা কিতাবী, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই পালনকর্তার পক্ষ থেকে ঠিক। আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। আপনি যদি কিতাবীদের নিকট সমুদয় নির্দেশ উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কিবলা মেনে নেবে না। আর আপনিও তাদের কিবলা মানবেন না। তারাও একে অন্যের কিবলা মানে না। যদি আপনি আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর তাদের আকাঙ্খার অনুসরণ করেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (সূরা বাকারা ঃ ১৪৪-১৪৫)

ইহুদীদের পরিকল্পিত আক্রমণ যখন মুসলমানদের হৃদয়ে নানা সন্দেহের সৃষ্টি করছিল, ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ করে মুসলমানদের অন্তরে দৃঢ়তা সৃষ্টি করলেন। সকল সন্দেহ দূর করে দিলেন।

ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে যে সব অঘটন ঘটিয়েছিল, তার মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করে আসার পর পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার প্রত্যাশায় ইহুদীদের সাথে কিছু চুক্তি করেছিলেন। ইহুদীরা একের পর এক সব চুক্তি ভঙ্গ করতে লাগল। প্রথমে ইহুদীদের বনু কাইনুকা চুক্তি ভঙ্গ করল। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেশান্তর করলেন। মদীনা থেকে বের করে দিলেন। এটা দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনা। তৃতীয় হিজরীতে বনু নাযীর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু কুরাইযা চুক্তিভঙ্গ করল। সপ্তম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের বস্তি খায়বার পদানত করলেন। তারপর মৃত্যুশয্যায় শায়িত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন–

أَخرِجُوا اليهودَ و النصارى من جزيرة العربِ —

"তোমরা ইহুদী-খ্রিস্টানদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দাও।"

মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সাথে ইহুদীদের ছিল গভীর সম্পর্ক। বনু নাযীরের ইহুদীরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তারা উমর ইবনে জাহহাস নামের এক ব্যক্তিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারার জন্য নিয়োজিত করল। এই জঘন্য ও হীন ষড়যন্ত্রের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেশান্তরিত করেছিলেন।

রাসূলের ইন্তেকালের পরও ষড়যন্ত্র থেমে রইল না। অগ্নিপূজকরা হযরত উমর (রাঃ) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। এ ক্ষেত্রেও ইহুদীদের কালো হাত সক্রিয় ছিল। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেছেন– নরাধম আবূ লুলু কর্তৃক এই হত্যাকাণ্ডের সাথে কা'ব আহবার ও পারস্য সম্রাট হরমুজানও জড়িত ছিল। হযরত উমর (রাঃ) নামাযরত অবস্থায় আবূ লুলু'র হাতে শাহাদাতবরণ করেছিলেন।

আর ইসরাইলী রেওয়েতের নামে যেসব জাল রেওয়ায়েত ইসলামী বই-পুস্তকে অনুপ্রবেশ করেছে, তাও ইহুদীদের কারসাজি, তাদের ষড়যন্ত্রের ফসল। কা'ব আহবার সম্পর্কে অনেকের মন্তব্য হল, তিনি কুরআনের তাফসীরে ইসরাইলী রেওয়ায়েত অনুপ্রবেশ ঘটানোর কাজ করেছেন।

হযরত উসমান (রাঃ)-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও ইহুদীদের ষড়যন্ত্রেরই ফসল। এর মূল নায়ক আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নামক ইয়ামেনের এক ইহুদী। ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, কিভাবে দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে সে ওসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ইরাকে অবস্থানকালে সে শামের লোকদের চিঠি দিয়ে জানাল, ইরাকের চারদিকে অশান্তি বিরাজ করছে। দ্রব্যমূল্য উর্দ্ধগতিতে বেড়ে চলছে। ফলে শামের লোকেরা ধারণা করছে, ইরাক শেষ হয়ে গেছে। আর শামে গিয়ে ইরাকের লোকদের চিঠি লিখে জানাল, শামের সর্বত্র নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছে। অভাব-অনটন, রোগ, বালা-মুসিবতের যেন শেষ নেই। এভাবে তার অবিরাম

অপপ্রচারের ফলে জনসাধারণের মন খলীফা ও গভর্নরদের উপর বিষিয়ে উঠল। গোটা ইসলামী জাহানে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ল। একদিন ইরাক থেকে একদল বিদ্রোহী মদীনায় গমন করল। মিশর থেকে এল। শাম থেকে এল। এসবের মূলে ছিল ইহুদী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা।

মদীনায় এসে তারা উসমান (রাঃ)-কে অবরোধ করল এবং জিলহজ্ব মাসের সতের তারিখে বিদ্রোহীরা তাঁকে শহীদ করল। তিনি যে কুরআন শরীফটি তেলাওয়াত করছিলেন, তা তার রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল।

এরপর খেলাফতে অধিষ্ঠিত হলেন হযরত আলী (রাঃ)। এই ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের ফলেই বিরোধ সৃষ্টি হল হযরত আলী (রাঃ)-এর মাঝে এবং হযরত তালহা, যোবাইর ও আয়েশা (রাঃ)-এর মাঝে। জামালের যুদ্ধের পর আয়েশা (রাঃ) মদীনায় ফিরে এলেন। এদিকে ওসমান (রাঃ)-এর রক্তরঞ্জিত কাপড় শামে পৌঁছে গেল। শামের মসজিদে তা ঝুলিয়ে দেয়া হল। ষাট হাজার মানুষ এ দৃশ্য দেখে বেদনার্ত হয়ে কাঁদল। তারা হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হল। তাদের দাবি, হযরত উসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না কেন? অবিলম্বে তাদের বিচার করা হোক।

নিহত খলীফার হত্যাকারীদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত নতুন খলীফাকে মেনে নেয়া যায় না। তারপর হল সিফফীনের যুদ্ধ। এভাবে একের পর এক ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র চলে আসছে। চলতে থাকবে। তেমনিভাবে জাল হাদীসের যে ফেতনা ইলমের জগতে সৃষ্টি হয়েছিল, তার পশ্চাতেও ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ছিল সক্রিয়।

এবার শুরু হয়েছে নতুনভাবে আক্রমণ। হয়েছে নতুন ফেতনার আবির্ভাব। তা হল প্রাচ্যবিদদের আক্রমণ। মুসতাশরিকদের ষড়যন্ত্র। এরা ইসলামের বিরুদ্ধে, রাসূলের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আঘাত হানছে। মুসলমান সন্তানদের মাঝে ইসলামবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করছে। ইসলামের প্রতি তাদের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এর জন্য আলাদা বিভাগ খোলা হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, ইহুদী আর খ্রিস্টানরা সেখানে মুসলমান সন্তানদের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছে। আসলে শিক্ষা নয়, তারা মুসলিম ছাত্রদের মগজ ধোলাই করছে। এরপর তারা দেশে ফিরে আসছে। আর ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মহাবিপদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বর্তমান বিশ্বে যত প্রকারের ফেৎনা ও ধ্বংসাত্মক কার্যাবলি চলছে তার পশ্চাতে সক্রিয় রয়েছে ইহুদীদের কালো হাত । তারাই সব অপকর্মের উদ্ভাবক ও রূপায়ক। এরা প্রতিদিন নতুন নতুন পাপের জন্ম দিচ্ছে। এই যে গণতন্ত্রের ফেৎনা, সমাজতন্ত্রের ফেৎনা বা নাস্তিকতার ফেৎনা- এ সব কিছুর মূলে রয়েছে ইহুদীরা, যারা পাশ্চাত্যে বসবাস করছে। এরা অর্থবিজ্ঞানে কার্ল মার্কসের কথা বলে, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দূরকাইম, জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে নাৎসী, এ ধরনের আরো নব নব বিজ্ঞানীর কথা এরা বলে। এদের এই শিক্ষার প্রভাব নিয়েই আমাদের সন্তানরা আজ পাশ্চাত্যের দেশগুলো থেকে ধোলাইকৃত মগজ ও একগাদা উপাধি নিয়ে ফিরে আসছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে লেখাপড়া করতে যাবে, দেখবে সেখানে কার্ল মার্কসের মতবাদ পড়ানো হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞান বিভাগে লেখাপড়া করতে যাবে, দেখবে সেখানে আরেক ইহুদীর মতবাদ পড়ানো হচ্ছে। মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে লেখাপড়া করতে যাবে, সেখানেও সেই ইহুদী। আমাদের দেশ থেকে যারা ইসলামী দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট নিতে আমেরিকা যায়, তারা ঐ ইহুদীদের দর্শন শিখে ফিরে আসে।

আমাদের দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে কি ডক্টরেট ডিগ্রি নেয়া যায় না? ইহুদীদের থেকে সার্টিফিকেট না নিলে কি শিক্ষিত হওয়া যায় না? যায়। কিন্তু এরা উচ্চ শিক্ষার নামে ইহুদীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হৃদয়ে নিয়ে আসে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র, নানা সন্দেহ। এই ইহুদীরা মুসলমান সন্তানদের দীন-ধর্ম ছিনিয়ে নেয়ার পর বা ইসলাম সম্পর্কে তোমার অন্তরে হাজারো সন্দেহ রোপণ করার পর বলবে, তোমাকে ইসলামী শিক্ষার

সর্বোচ্চ সার্টিফিকেট দেয়া হল। তারপর কী হয়? সে দেশে ফিরে এসে কোন কলেজের ইসলামী বিষয়ের প্রফেসর হয়ে তার ছাত্রদের মাঝে ভ্রষ্টতা ছড়াতে থাকে।

বর্তমানের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই বল। তাদের অধিকাংশ শাইখকে সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় নিয়োগ দিয়ে থাকে। তাদের অবস্থা ঠিক ঐরকমই হয়ে থাকে। এভাবে যারা আমেরিকাতে যাচ্ছে, বৃটেনে যাচ্ছে বা পাশ্চাত্যের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে, তারা তাদের মেধা এভাবেই ওয়াশ করিয়ে ফিরে আসছে। আর এভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে।

জার্মানীর ঐ প্রতিষ্ঠানের কথা একটু চিন্তা করে দেখ, যারা المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي রচনা করেছে। এটা এক বিশাল ও দুরূহ কাজ। একদল খ্রিস্টান মুসতাশরিক বা প্রাচ্যবিদ লাগাতার চল্লিশ বছর মেহনত করে এ গ্রন্থটি তৈরি করেছে। তাই এখন যে কোন হাদীসের উৎস খুঁজে বের করা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। ঐ অভিধানটি খুললেই বলা যায়, কোন হাদীসটি কোথায়, কোন কিতাবে, কত নাম্বার পাতায় বিদ্যমান রয়েছে। এটা তো একটা মহান কাজ বটে।

কিন্তু জামি'আ আজহারের ছাত্র আবী রাব্বা একটি কিতাব রচনা করেছে, তা পড়তে তো হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। সে তার গ্রন্থে লিখেছে, বোখারীর সব হাদীস নাকি সহীহ নয়। তার প্রশ্ন, মাছি সংক্রান্ত হাদীসটি কিভাবে সহীহ হতে পারে? মাছির গোটা শরীরই রোগ-জীবাণুতে ভরা। হাদীসটি হল–

إِذَا وَقَعتْ ذبابةٌ فِي إناءِ أحدكم فليغْمسْه كله ثم يُقه —

"যদি কারো পাত্রে মাছি পড়ে, তাহলে সে যেন মাছিটিকে পুরোপুরি ডুবিয়ে দেয়। তারপর তাকে ফেলে দেয়।"

সে বলতে চাচ্ছে, বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, মাছির সারা শরীরেই জীবাণু থাকে। তাই এ হাদীস কীভাবে সহীহ হতে পারে?

এভাবে তারা কৌশলে রাসূলের হাদীসে সন্দেহের বীজ বপণ করছে। তারা ইমাম বোখারীর (রহঃ) কিতাব সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর নামে অপবাদ দিতে সাহস পাচ্ছে। এভাবে ধর্মের বুনিয়াদে একের পর এক কাঁপন সৃষ্টি করছে।

আরবী ভাষা-সাহিত্যও আজ তাদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত নয়। তারা আধুনিক কবিতা চর্চা করে। ছন্দবদ্ধ কবিতা রচনা করতে অপারগ বলে আধুনিকতার নামে তথাকথিত গদ্য কবিতা রচনা শুরু করেছে।

আসল কথা হল, এরা আমেরিকা বা ফ্রান্সে গিয়ে ছয় বছর আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে লেখাপড়া করছে। অথচ, এদের শিক্ষার মাধ্যম হল ইংরেজি। কিভাবে ইংরেজিতে আরবী সাহিত্য শিখবে? তাই দেখা যায়, এসব ব্যক্তি আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। এরাই আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের শিক্ষক পদে নিয়োগ পাচ্ছে। আরবী সাহিত্য সম্পর্কে এদের কিছু জিজ্ঞেস করা হলে, ইনিয়ে-বিনিয়ে পাশ কাটিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। এরা ব্যর্থতা ঢাকার জন্য বলে, এই আধুনিক যুগে মধ্য যুগের সাহিত্য চর্চা করে কী লাভ হবে?

এরা দু'পংক্তি আরবী কবিতাও রচনা করতে পারে না। এরা নিজেদেরকে সাহিত্যিক বলে; কিন্তু কবিতার রুচিও রাখে না। তাই এরা আধুনিক কবিতার নামে ছন্দহীন কবিতা রচনার পথ তৈরি করেছে। তারা বোকার মত না বুঝে মুতানাব্বী, আবূ তাম্মাম, ইসরাইল কাইফের কবিতার সমালোচনাও করে। পাকা পণ্ডিত আর কাকে বলে!

ইসলামী ইতিহাস গ্রন্থগুলোও তাদের আগ্রাসন থেকে মুক্তি পায়নি। প্রাচ্যবিদরা ইসলামের ইতিহাস লিখছে আর তা বাজারে ছেয়ে গেছে। ইহুদীদের লেখা ইতিহাসের গ্রন্থগুলোই বর্তমানে রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোর পাঠ্য ইসলামী ইতিহাস গ্রন্থগুলো ইহুদীদের লিখিত ইতিহাস দেখে প্রণীত হয়েছে। তাই আমাদের সামনে সঠিক ইতিহাস জানার কি কোন পথ আছে?

আমি বলছিলাম, ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসাত্মক সকল কাজের পশ্চাতে ইহুদীদের সক্রিয় হাত রয়েছে। যেদিন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল, সেদিন থেকেই তাদের ষড়যন্ত্র চলে আসছে। এখনো চলছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা চলবে। তাই, যেসব আয়াত ও সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তাতে ইহুদী-খ্রিস্টানদের চরিত্র-স্বভাব, তাদের ষড়যন্ত্র, নবীদের হত্যা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত এই ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাবে। সকল ফেৎনা-ফাসাদের মূলে এরা সক্রিয় থাকবে।

আমার এক মরহুম উস্তাদ এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। তিনি বলতেন, তোমরা রাজনীতি শিখতে চাও? রাজনৈতিক বিশ্লেষণ শুনতে চাও? শত্রু-মিত্র চিনতে চাও? তাহলে কুরআনের নিকট এস। কুরআনই স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে, কারা তোমাদের চিরশত্রু। কারা তোমাদের বিরুদ্ধে চিরদিন ষড়যন্ত্র করে যাবে, যাচ্ছে। তাদের অতীত ইতিহাস কী। অন্যান্য নবীদের সাথে তারা কি আচরণ করেছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুতরাং আমার নিকট কুরআনী শিক্ষা-দর্শনের বাইরে কোন রাজনীতিবিদের মতবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য নয়। আমি রাজনীতি শিখব তো কুরআন থেকে শিখব। আমি জানি, ইসলামী বিশ্বে যত দুর্ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে বা ঘটবে, তার পশ্চাতে ইহুদীদের কালো হাত রয়েছে এবং থাকবে। তাই, কুরআন থেকে আমি ইহুদীদের ইতিহাস পড়ব। তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানব। সেখান থেকেই শিক্ষা নেব। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইহুদী-খ্রিস্টানদের বিস্তারিত পরিচয় স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন।

আজ পাশ্চাত্য জগত ক্রুসেডের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। এর আগেও ওরা ক্রুসেড চাপিয়ে দিয়েছিল মুসলমানদের উপর। সর্বপ্লাবী শক্তি নিয়ে ওরা মুসলমানদের উপর হামলে পড়েছিল। ইসলামকে দুনিয়া থেকে নির্মূল করা ছিল ওদের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন ওদের পূর্ণ না হলেও মানুষ আজও ওদের সেই দিনের নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন ও জিঘাংসার কথা মনে করে শিউরে ওঠে। মসজিদুল আকসার ভেতরে ও চত্বরে মুসলমানদের রক্তে ক্রুসেডারদের ঘোড়া হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল। আজ তারা আবার সেই ক্রুসেড ঘোষণা করে অহংকারে আত্মগর্বে গদ-গদ করছে। এই পরাজিত হিংস্ররা দুনিয়াটা ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হবে। এসব ইতিহাস তাদের অন্তরের গভীরে নিহিত হিংসা-দ্বেষের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তারা একথা বারবার প্রমাণ করেছে যে, কিতাবীদের আর মুসলমানদের মাঝে চিরকাল যুদ্ধ চলতেই থাকবে। এ যুদ্ধ কোন দিন শেষ হবে না। ক্রুসেড যুদ্ধের দিনগুলোতে কি নির্মম নির্যাতন করেছিল খ্রিস্টানরা, তার কিছু চিত্র আমি তুলে ধরছি। আল্লামা ইবনুল আসীর লিখেছেন—

"ক্রুসেডাররা আক্রমণ শুরু করল। পবিত্র মসজিদুল আকসায় এক লক্ষ মানুষকে হত্যা করল। এর সমপরিমাণ মানুষকে তারা বন্দী করল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও হত্যা করল। নারীদের বন্দী করে নিয়ে গেল। ক্রুসেডাররা গোটা শহরে হত্যালীলা চালাতে লাগল।"

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "ক্রুসেডাররা শুধু মসজিদে আকসার অভ্যন্তরেই সত্তর হাজারের চেয়ে বেশি মানুষকে হত্যা করেছে। প্রসিদ্ধ আলিম, খ্যাতনামা আবেদ ও যাহেদ সকলকে তারা তরবারীর আঘাতে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিল।"

এক খ্রিস্টান ঐতিহাসিকের নাম ওলীম সাতুর। তিনি লিখেছেন, "মুসলমানদের রক্ত প্রবাহে তার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল।"

আরেক ক্রুসেডার লিখেছেন, "অশ্বারোহী ক্রুসেডারদের খেলার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল, শিশুদের ধরে ধরে হত্যা করে টুকরো টুকরো করা আর তাদের লাশগুলো আগুনে নিক্ষেপ করা। এসব করে তারা উল্লাসে ফেঁটে পড়ত।"

ভাবা যায়, কত হিংস্র এদের চরিত্র!

বয়াট নামক জনৈক পাদ্রী বলেন, "সে দিন বন্যার পানির ন্যায় রক্ত শহরের পথে পথে প্রবাহিত হচ্ছিল।"

বর্ণ লুমান্দবাজিল নামক আরেক পাদ্রী বলেন, "বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রাণকেন্দ্রে আমার জাতির যোদ্ধারা নির্মমভাবে রক্তপাত করেছে। মসজিদের চত্বরে লাশের পর লাশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিল। কাঁটা হাত, বাহু রক্তপ্রবাহে গড়িয়ে যাচ্ছিল। যে সব ক্রুসেডার এ নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, তারা দুর্গন্ধে আর সেখানে থাকতে পারছিল না।"

এসব হল খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের আত্মস্বীকৃত কিছু বর্ণনা, যা তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের মাটিতে ঘটিয়েছিল।

এবার ইহুদীরা ফিলিস্তিনে মুসলমানদের সাথে কী আচরণ করছে, তার কিছু চিত্র তুলে ধরছি। ফিলিস্তিনের নাছেরা শহরে ইহুদীরা প্রবেশ করে মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করল। এ শহরের খ্রিস্টানদের গায়ে তারা টোকাটিও দিল না। খ্রিস্টানদের সাথে তারা বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি আগেই সম্পাদন করেছিল। ইসলামের মোকাবেলায় সকল কাফির যে একজোট, তার আরেকটি প্রমাণ সেদিন পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ করল।

১৯৬৮ সালের কথা। ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীরে অবস্থিত খ্রিস্টান অধ্যুষিত শহর বীরে যাইত ও বেথেলহেম শহরে খ্রিস্টানরা ব্যানার-ফেস্টুনসহ ইহুদীদের স্বাগত জানিয়ে শহরে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানাল। আর মুসলিম নিধনে তারা ইহুদীদের উৎসাহিত করছিল।

একটি কথা খুব ভালভাবে স্মরণ রাখবে, এই ইহুদীরাই কিন্তু আমাদের পুণ্যভূমি ফিলিস্তিনে নানা মতলবে ভ্রষ্ট মতবাদ ও দল উপদলের সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল মা'সূনীয়া ও রোটারি গ্রুপ দু'টি। এদের টার্গেট খুবই ভয়ঙ্কর। মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এদের প্রথম টার্গেট। আকর্ষণীয় শ্লোগান ও চটকদার বক্তব্যে এরা সরল মুসলমান যুবকদের তাদের দলে টেনে নেয়। তাদের শ্লোগান হল ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও স্বাধীনতা। এ শ্লোগান সামনে রেখে তারা মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে। মাহফিলের আয়োজন করে। আকর্ষণীয় ভাষায় তারা এসব অনুষ্ঠানের বক্তব্য-বক্তৃতা প্রচার করে।

কিন্তু কোন দূরদর্শী সচেতন ব্যক্তি যদি একটু তলিয়ে দেখে, তবে সহজেই বুঝতে পারবে, এসব মা'সুনীয়াদের মাহফিল। জর্দানে মা'সুনীয়ারা মরহুম মহান ব্যক্তির নামেও মাহফিলের আয়োজন করে।

তোমাদের হয়ত বিশ্বাস হবে না। একবার জর্দানে গোয়েন্দা বাহিনীর এক দায়িত্বশীল ব্যক্তি আমাকে ডেকে পাঠাল। জিজ্ঞেস করল, মা'সুনীয়াদের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? আমি স্পষ্ট বললাম, তারা তো ইহুদী। লোকটা বলল, 'সাবধান! অমন কথা আর বলবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে থাকুন আর নীরব থাকুন। ঝামেলা বাড়াবেন না।'

আমি বললাম, 'না, আমি এদের ব্যাপারে চুপ থাকতে পারি না। ইহুদীদের ব্যাপারেও চুপ থাকব না। আর ইহুদীদের দোসরদের ব্যাপারেও চুপ থাকব না।' লোকটি বলল, 'তা হলে তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় করে দেয়া হবে।'

আমি বললাম, 'বেশ, সরিয়ে দাও। কিন্তু আমি আমার মুখ বন্ধ রাখব না। আমার বিবেক বিক্রয় করব না।'

এবার চিন্তা করুন। গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তা। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন বিষয় সবই তার জানা। সে ইহুদীবাদের পক্ষ নিয়ে আমাকে নীরব থাকার নির্দেশ দিচ্ছে। তাদের শক্তি ও দাপট কত! রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো তারা দখল করে আছে।

একবার এক ঘটনা ঘটল। কুয়েত টিভিতে এক ইংরেজ বক্তৃতা দিল। আমার ধারণা, সে রোটারি ক্লাবের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হবে। বক্তৃতা চলাকালে প্রসঙ্গক্রমে বলল, আমীরদের অমুক অমুক আমার ছাত্র। টিভিতে সে এমন সব ঘোষণা দিয়ে গেল। কী দুঃসাহস! দুঃসাহস হবেই বা না কেন! মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই তাদের দোসর। তাদেরই মত এদের মেধা-মনন।

ইহুদীদের বিশ্বাস, তাদের মধ্য থেকে হযরত দাউদ (আঃ)-এর বংশধারায় এক সন্তান জন্ম লাভ করবে। সে সুলাইমান (আঃ)-এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে বসে গোটা বিশ্ব শাসন করবে। এ কারণেই ইহুদীরা

মসজিদে আকসার খনন কাজ এখনো অব্যাহত রেখেছে। তারা তাদের সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন পথকে সুগম করতে বদ্ধপরিকর। আসলে খনন কাজ তাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল, মসজিদে আকসা ভেঙ্গে ফেলে সুলাইমান (আঃ)-এর ভিত্তির উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

আরেকটি ঘটনার কথা বলি। আমেরিকান মা'সুনীয়া গ্রুপের প্রধান তৎকালীন পশ্চিমতীরের ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা শাইখ হিলমী মুহতাসিব এর নিকট প্রতিনিধি পাঠাল। বলল, আমরা আপনাকে সত্তর মিলিয়ন ডলার দিব, আপনি আমাদেরকে মসজিদে আকসা ভেঙে সুলাইমান (আঃ)-এর ভিত্তির উপর তা প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ করে দিবেন। আপনারা এই সত্তর মিলিয়ন ডলার দিয়ে পূর্বতীরে একটি মসজিদে আকসা তৈরি করে নিবেন।

একবার রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন– মা'সুনীয়া গ্রুপের লোকেরা আমার নিকট বেশ কয়েকবার এসে আমাকে ফুসলিয়েছে, যেন আমি তাদের দলে যোগদান করি, তাহলে তারা আমাকে মন্ত্রী বানিয়ে দিবে।

কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখান করেছেন। অত্যন্ত কঠিন ভাষায় বলেছেন– আমাকে কি তাহলে ইহুদী হতে বলছ?

মা'সুনীয়া গ্রুপের এক ব্যক্তি। নাম আব্দুল মজীদ মুর্তজা। জর্দানে সে মা'সুনীয়া গ্রুপের মধ্যমনি ছিল। যোগাযোগ মন্ত্রী ছিল। মা'সুনীয়াদের সহযোগিতায় সে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেছিল।

একটি মজার ঘটনার কথা মনে পড়ল। জর্দানের এই আব্দুল মজীদ মুর্তজা অত্যন্ত উচুঁ পর্যায়ের লোক ছিল। বলা হয়, গোটা পৃথিবীতে মা'সুনীয়া গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় পাঁচজনের মধ্যে সে ছিল একজন। একবার এক ফিলিস্তিনী যুবক বেশ কিছু সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরির আশায় ঘুরছিল। সে বহু জাগায় ধর্ণা দিয়েও কোথাও চাকরি পায়নি। সে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বাজার থেকে পুরাতন কাপড় ক্রয় করে পরিধান করত। একবার বাজার থেকে একটি আমেরিকান জ্যাকেট কিনে আনল। তারপর ঐ জ্যাকেট পরিধান করেই যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে চাকরির জন্য গেল। মন্ত্রী আব্দুল মজীদ মুর্তজার দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। আব্দুল মজীদ মুর্তজা তাকে দেখেই চমকে উঠল। আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল। এগিয়ে এসে বলল, আসুন, আসুন। আমার চেয়ারেই বসুন। ফিলিস্তিনী যুবক তো হতবাক। সে মনে করল, তার সাথে বুঝি তামাশা করা হচ্ছে। কারণ, এতদিন তো কেউ তাকে জিজ্ঞাসাও করেনি। দারোয়ান তাকে বার বার শীর্ষ কর্মকর্তাদের দরজা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পুলিশ তাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ আজ স্বয়ং মন্ত্রী তার জন্য তার আসন ছেড়ে দিচ্ছে! তাকে স্বাগত জানাচ্ছে!

যুবক চেয়ারে বসলে চায়ের অর্ডার দিয়ে মন্ত্রী বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করল, আপনার কিছু প্রয়োজন আছে কি?

যুবক বলল, আমি বেশ কিছু দিন থেকে একটি চাকরি খুঁজছি। কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে গিয়েছি। কিন্তু আশাব্যঞ্জক কোন সাড়া পাইনি।

আব্দুল মজীদ মুর্তজা তখনই তার জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিল। চাকরি পাওয়ার পর তার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয়ে এল, তখন সে সেই পুরাতন কাপড় ছেড়ে দিয়ে নতুন কাপড় পরিধাণ করতে লাগল। অথচ সে তার এই অভাবিতপূর্ব ভাগ্য পরিবর্তনের কোন কারণই বুঝতে পারেনি। পুরাতন সেই জ্যাকেটের কারণেই যে সে চাকরি পেয়েছে তখনো সে তা বুঝতে পারেনি।

কিছু দিন পরে যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল মজীদ মুর্তজার সাথে তার দেখা হল। মন্ত্রী জিজ্ঞেস করল, তোমার সেই জ্যাকেটটি কোথায়?

যুবক বলল, 'আলহামদুলিল্লাহ! অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তাই সেই পুরাতন কাপড় এখন আর পরিধান করি না।'

মন্ত্রী বলল, 'তুমি যে জ্যাকেট পরেছিলে তা কি তোমাকে তোমার পদমর্যাদার জন্য দেয়া হয়নি?'

যুবক বলল, 'না, আমি তা পুরাতন কাপড়ের বাজার থেকে কিনে এনেছিলাম।'

পরে দেখা গেল, সে জ্যাকেটটিতে মা'সুনীয়া গ্রুপের একটি উচুঁ পদের প্রতীক চিহ্ন ছিল। তাই মন্ত্রী তাকে মা'সুনীয়া গ্রুপের উঁচু পর্যায়ের নেতা মনে করে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

কিন্তু এবার বিষয়টি মন্ত্রীর নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই মন্ত্রী তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিল।

বিষয়টি একবার চিন্তা করুন। মা'সুনীয়া গ্রুপের প্রতীক সম্বলিত জ্যাকেট পরিধান করার কারণে কীভাবে সহজে চাকরি হয়ে গেল। কিন্তু রহস্যটি ফাঁস হওয়ার সাথে সাথে তাকে বরখাস্ত করা হল। আজ মুসলিম বিশ্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো মা'সুনীয়া গ্রুপের দখলে। মা'সুনীয়া গ্রুপের ইহুদীরাই এখন গোটা আরব নিয়ন্ত্রণ করছে।

মা'সুনীয়া গ্রুপের একেকটি পদ অতিক্রম করে উচ্চতর পদে উঠতে কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। অত্যন্ত কঠিনভাবে দীক্ষা নিয়ে তারপর মা'সুনীয়া গ্রুপের সদস্য হতে হয়।

ড. আহমদ হামরুদ বর্ণনা করেন, মা'সুনীয়াদের অনুষ্ঠানে যখন দীক্ষার কার্যক্রম শুরু হয়, তখন মাথার উপর চকচকে বর্শা ঝুলানো হয়। তাওরাত নিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করান হয়। তারপর তাকে কুরআনের বিরুদ্ধে অভিশাপ বর্ষণ করতে হয়। কুরআনকে লা'নত করতে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দিতে হয়। তারপর দীক্ষাদানকারীর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়তে হয়। তারপর তার চোখ বেঁধে ফেলা হয় এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কে? তাকে বলা হয়, তুমি বল, আমি একজন অন্ধ মানুষ, আলোর সন্ধানে এসেছি। সে তখন তা-ই বলে। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন আলোর সন্ধান চাও? সে তখন তাদের শিখিয়ে দেয়া কথাগুলোই বলে যে, আমি শুনেছি, আপনারা বাইতুল মুকাদ্দাসকে সুলাইমান (আঃ)-এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাই আপনাদের সহায়তা করতে একান্ত আগ্রহী। এভাবেই তারা একের পর এক মুসলিম সন্তানদের মস্তিস্ক ধোলাই করে ইহুদী বানিয়ে নিচ্ছে। জাহান্নামের পথে নিচ্ছে। অথচ এখনো তা প্রতিহত করার কার্যকরী কোনই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। জনৈক কবি যথার্থ বলেছেন–

مؤامرةٌ يدبِّرهـــا يهودٌ ويرعَـــاها عميلٌ لا أبًا له

"ইহুদীরা বহু ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করছে আর কিছু শ্রমিক তা বাস্তবায়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের কোন পিতা নেই- তারা জারজ।"

ত্রয়োদশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٣٠) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○ (٣١) اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا إِلٰهًا وَّاحِدًا لَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

অর্থ : ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফিরদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। এরা কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছে? তারা তাদের বিদ্বান ও সংসারবিরাগীদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়মের পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে একমাত্র মা'বুদের ইবাদতের। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তারা যে শিরক করছে, তিনি তা থেকে পবিত্র। (সূরা তাওবা : ৩০-৩১)

এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যৌক্তিক কারণ বর্ণনা করেছেন। এটা হল তাবূক যুদ্ধের পটভূমি। কারণ, কিছু মুসলমানের অন্তরে কিতাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধা-সংকোচ ছিল। তারা মনে করত, কিতাবীদেরও তো ধর্মবিশ্বাস আছে। তা ছাড়া তাদের নিকট আল্লাহর কিতাবও আছে। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা কিতাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণগুলো তুলে ধরেছেন। প্রথমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

(٢٩) قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ ○

অর্থ : তোমরা কিতাবীদের ঐ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ ও পরকালের ব্যাপারে ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম মনে করে না। আর সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না। যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে। (সূরা তাওবা ঃ ২৯)

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ হল–

১. তারা আল্লাহ ও পরকালের ব্যাপারে বিশ্বাসী নয়।

২. আল্লাহ ও রাসূল যা হারাম করেছেন, তা তারা হারাম মনে করে না।

৩. তারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না।

এই তিনটি কারণের কথা পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। এখন চতুর্থ কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে। তা হল–

৪. ইহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র আর খ্রিস্টানরা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র। ইহুদীদের ইহুদী নামকরণ করা হয়েছে হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর পুত্র ইয়াহুদা-এর নামানুসারে। ইয়াকুব (আঃ)-এর বারজন পুত্র ছিল। পরবর্তীতে তারাই বার গোত্রের রূপ ধারণ করে।

আর উযাইর ইবনে শারকিয়া বনী ইসরাঈলের একজন আলিম ছিলেন। এক বর্ণনামতে উযাইর (আঃ) ঐ ব্যক্তি ছিলেন, যিনি এক বিধ্বস্ত নগরীর পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, কীভাবে আল্লাহ এদের পুনরুজ্জীবিত করবেন? ঘটনাটি হল, খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ সালে সম্রাট বখতে নসর বাইতুল মুকাদ্দাসকে

ধ্বংস করে দেয়ার পর ওযাইর (আঃ) বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। চারিদিকে মানুষের কঙ্কাল দেখতে পান। ধ্বংসের **আলামত চারিদিকে** স্পষ্ট। তিনি বললেন–

أنى يُحي هذه الله بعدَ موتها ؟

অর্থ : মৃতদের হাড়গোড় বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা কীভাবে এদের পুনরুজ্জীবিত করবেন!

এমনি বিস্ময় প্রকাশ করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছিলেন–

ربِّ أرِني كيفَ تُحي الموتَ ؟

অর্থ : হে আমার রব! আমাকে দেখান কীভাবে আপনি মৃতদের জীবিত করেন!

হযরত উযাইর (আঃ) সে কথা বলার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একশত বৎসর মৃত অবস্থায় রাখলেন। **তারপর তাঁকে** জীবিত করলেন। তাঁর সাথে এক ঝুড়ি তীন ছিল এবং একটি পাত্রে আঙ্গুরের নিংড়ানো রস ছিল। **একশত** বৎসর পরে আল্লাহ তাকে জীবিত করে বললেন, তুমি তোমার খাবার ও পানীয়র দিকে তাকাও, তা নষ্ট **হয়ে** যায়নি। অথচ তীন ফল এক দিনের বেশি ভাল থাকে না। আর আঙ্গুরের রসও দুর্গন্ধময় হয়নি। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

অর্থ : "তুমি তোমার গাধাটির দিকে চেয়ে দেখ আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ, সেগুলোর উপর আমি কিভাবে গোস্তের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার নিকট এ অবস্থা প্রকাশ হল, তখন বলে উঠল, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৯)

বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের উপর যখন বিপর্যয় নেমে এল, তখন তাদের আলিমরা তাওরাতকে মাটির নীচে দাফন করে রাখল। এরপর উযাইর (আঃ) পৃথিবীতে বিচরণ করে ইলম শিখতে বের হলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, হে উযাইর! কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে ইলম অর্জন করব। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বহু কল্যাণময় জ্ঞান দান করেছিলেন এবং মূসা (আঃ)-এর উপর যে তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল, তিনি তা মুখস্থও করেছিলেন। তিনি মানুষকে তাওরাত শিখাতেন। এভাবে কয়েক প্রজন্ম বিগত হয়ে যাওয়ার পর বখতে নসরের বন্দিখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কিছু আলিম বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে এল এবং মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা তাওরাত বের করে আনল। তারা দেখল, উযাইর (আঃ)-এর মুখস্ত তাওরাত ও দাফন করা তাওরাতের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তাই তারা বলতে শুরু করল, যদি উযাইর আল্লাহর পুত্র না হতেন, তাহলে আল্লাহ তাকে তাওরাতের এমন অবিশ্বাস্য জ্ঞান কেন দান করবেন? তাই বলছিলাম, উযাইর ইবনে শারকিয়া বনী ইসরাঈলের একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। ইহুদীরা তাকে আল্লাহর পুত্র অভিহিত করে শিরকে লিপ্ত হয়। আর নাসারারা (খ্রিস্টানরা) বলে মসীহ আল্লাহর পুত্র।

নাসারাদের নাসারা বলা হয় কেন তা কি জান? ঈসা মাসীহ (আঃ)-এর শহর নাসেরা-এর দিকে সম্পৃক্ত করে তার অনুসারীদের নাসারা বলা হয়। আর ঈসা (আঃ)-কে মাসীহ বলার কারণ কয়েকটি।

১. আরবী ভাষায় ঃসَاحَ، يَسِيحُ، سِيَاحَةً অর্থ- ভ্রমণ করা। ঈসা (আঃ) সর্বদা ধর্ম প্রচার ও প্রসারের কাজে ভ্রমণে থাকতেন। কোথাও স্থির হয়ে থাকতেন না। তার কোন স্থায়ী ঘরবাড়ি ছিল না। তাই তাকে মাসীহ বলা হয়।

২. তাকে মাসীহ বলার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়, তার পায়ের তলা সমান ছিল। সাধারণভাবে মানুষের পায়ের তলায় যে ঢেউ থাকে, তা তার পায়ের তলায় ছিল না। এ অবস্থাকে مَمْسُوحٌ বা مسيحٌ বলা হয়।

৩. মাসীহ বলার আরেকটি কারণ– مَسَحَ، يَمسَحُ، مسْحاً অর্থ : স্পর্শ করা, ছোঁয়া। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) কোন জন্মান্ধ বা কুষ্ঠ রোগীকে আল্লাহর নাম নিয়ে স্পর্শ করে দিলে সে সাথে সাথে সুস্থ হয়ে যেত।

৪. কেউ কেউ মাসীহ বলার এ কারণও বর্ণনা করেছেন যে, তার মাঝে কালের বিবর্তনধারার চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

৫. মাসীহ বলার এ কারণও বর্ণনা করা হয় যে, সমস্ত নবীদেরকে যে বরকতের তৈল দেয়া হত, সে তৈল হযরত ঈসা (আঃ)-কেও দেয়া হয়েছিল।

৬. কেউ বলেছেন– মাসীহ শব্দের অর্থ সৌন্দর্য। হযরত ঈসা (আঃ) আরবের সৌন্দর্যের প্রতীক হবেন। তিনি শেষ জামানায় আকাশ থেকে নেমে আসবেন। তাঁর আগে ইমাম মাহদী এর আবির্ভাব হবে। তিনি দামেস্কের জামে মসজিদের পার্শ্বে অবস্থিত সাদা মিনারায় অবতরণ করবেন। দুই ফেরেস্তার ওপর বাহুভর দিয়ে নামবেন। তিনি মাথা অবনমিত করলে তার চেহারা থেকে ঘাম ঝরে পড়বে। মাথা উঁচু করলে ঘাম বেয়ে বেয়ে পড়বে। হলুদ ও জাফরান রংয়ের এক জোড়া কাপড় পরিধান করে থাকবেন। তারপর তিনি দাজ্জালকে ধাওয়া করবেন। মুসলিম শরীফে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। বর্ণিত আছে, দাজ্জাল মক্কা, মদীনা আর (ত্বাহাবী শরীকের এক বর্ণনা মতে) বাইতুল মুকাদ্দাস ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র যাবে। মদীনার প্রতিটি পথে ফেরেস্তারা প্রহরায় নিয়োজিত থাকবে। দাজ্জাল মদীনার নিকটবর্তী হলেই প্রচণ্ডভাবে ভূমিকম্প হবে। মদীনার সকল আবর্জনা ও অপবিত্রতা তাতে দূর হয়ে যাবে। দাজ্জাল মদীনার নিকটে পৌঁছলে এক ব্যক্তি মদীনা থেকে বেরিয়ে আসবে। বলবে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি দাজ্জাল। তোমার সম্পর্কেই রাসূল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।" দাজ্জাল তখন তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। তারপর তাকে পুনরায় জীবিত করবে। জীবিত হয়ে লোকটি বলবে, "আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমার অপকাণ্ড আমার ঈমান ও প্রত্যয়কে শুধু বৃদ্ধি ও মজবুতই করেছে যে, তুমিই সেই আখেরী জামানার দাজ্জাল।" এরপর দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু পারবে না। দাজ্জালকে আর সে ক্ষমতা দেয়া হবে না।

হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করার পর বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে গমন করবেন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস মসজিদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। কোন কাফিরের শরীরে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস স্পর্শ করলে সে মৃত্যুবরণ করবে। বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়ে দেখবেন, ইমাম মাহদী ইসলামী বাহিনী নিয়ে তাঁর অপেক্ষা করছেন। ইমাম মাহদী সরে আসবেন, যেন ঈসা (আঃ) বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

এখানে একটি বিষয় জানা দরকার। এক হাদীসে বর্ণিত আছে–

لا مهديَّ إلا عيسى بن مريم ، إنما المهديُّ هو المسيحُ —

"ঈসা ইবনে মরিয়ম ছাড়া অন্য কোন মাহদী নেই। মাহদী একমাত্র ঈসা (আঃ)-ই।"

এ হাদীসটি যথেষ্ট দুর্বল। তার সূত্র বর্ণনায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে। ফলে হাদীসটি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। সর্বসম্মত মতামত হল, ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করবেন। ইমাম সুয়ূতী ও কাত্তানীসহ অনেকেই এ মত পোষণ করেছেন। এ কারণে হারাম শরীফে সেদিন বিপর্যয় ঘটেছিল। সউদী রাজপরিবারের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করেছিল, তাদের এক ব্যক্তির নাম ছিল মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। শয়তানের ধোঁকায় বিদ্রোহীরা মনে করত, সে ইমাম মাহদী। হারাম শরীফের ঘটনায় সেই যুবক নিহত হলে সবাই নিশ্চিত হল, সে ইমাম মাহদী নয়। বিদ্রোহীরা সত্যপন্থী ছিল না। কারণ, ইমাম মাহদী তো বিশাল বাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্বে থাকবেন। বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বাণী তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করে গেছেন।

আরেকটি চিন্তার বিষয় হল, কিছু ওলামায়ে কিরাম ইমাম মাহদী সংক্রান্ত সকল চিন্তা-ভাবনার অবসান ঘটিয়ে বলেন, এটা সঠিক চিন্তা নয়। সে সময়ে তারা কাতারে এ বিষয় নিয়ে এক সম্মেলন করে ঘোষণা দিয়েছিল যে, মাহদী নামের কেউ আসবে না। আর মাহদী সম্পর্কিত যত হাদীস বিদ্যমান সবই দুর্বল, অগ্রহণযোগ্য। অথচ আসল বিষয়টি হল, ইমাম মাহদী সম্পর্কে যত হাদীস আছে, তা স্বতন্ত্রভাবে এক একজন থেকে বর্ণিত হলেও সকল বর্ণনার সমন্বয়ে নির্যাস বের হয় যে, তা বহু লোক দ্বারা প্রমাণিত। আর হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় একেই বলা হয়ে থাকে تواتر । এই সম্পর্কিত সকল হাদীসের নির্যাস হল, তার নাম হবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। তার সাথে একটি বিশাল বাহিনী থাকবে। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে ঈসা (আঃ)-এর ইমাম হবেন।

ইমাম মাহদী সংক্রান্ত বিষয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা সংক্রান্ত বিষয়। এ বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হলেও বহু লোকের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবেন এবং লুদ শহরের প্রবেশ পথে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি সাত বৎসর জীবিত থাকবেন। ইতোপূর্বে তিনি তেত্রিশ বৎসর পৃথিবীতে ছিলেন আর আখেরী জামানায় সাত বৎসর থাকবেন। মোট চল্লিশ বৎসর তিনি হায়াত পাবেন।

তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ও বিশ্বাস হল, হযরত ঈসা (আঃ)-কে জীবিত অবস্থায় আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। তিনি এখনো আকাশে জীবিত আছেন। শেষ জামানায় তিনি অবতরণ করবেন। শেষ জামানায় সেই সাত বৎসরে জমিন তার সমস্ত বরকত উগলে দিবে। আকাশ তার সকল কল্যাণ অবতীর্ণ করবে। ইসলাম আবার তার সর্বশক্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে। কোন কাফির, কোন শক্তি তার ভয়ের কারণ হবে না। সর্বত্রই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি পৃথিবী থেকে সকল ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। জিযিয়া কর আরোপ করবেন। শূকর হত্যা করবেন। একটি বেদানা বহু মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট হবে। বেদানার দানাগুলো বড় বড় হবে।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, দাজ্জাল পৃথিবীতে এক দ্বীপে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। হাদীসটি হযরত তামীম দারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি খ্রিস্টান ছিলেন। শামে বসবাস করতেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। দাজ্জালের ঘটনাটিও তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেছিলেন। বলেছিলেন, তারা একবার এক জাহাজে আরোহণ করে যাচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে তাদের জাহাজটি ভেঙে গেল। তারা তখন একটি দ্বীপে গিয়ে উঠলেন। তারা সেখানে লোমশ একটি প্রাণীকে পেলেন। প্রাণীটি তাদের সাথে কথা বলল। এতে তারা বিস্মিত হলেন। কিভাবে মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী কথা বলতে পারে! তারপর প্রাণীটি তাদের বলল, ঐ যে একটি গির্জা দেখা যাচ্ছে, তোমরা ঐখানে যাও। সেখানে একজন লোক আছে। তারা সেখানে গেলেন। দেখলেন, একজন লোক হাঁটু থেকে বুক পর্যন্ত শিকলে বাঁধা। লোকটি তাদের জিজ্ঞেস করল, আরব দেশে কি কোন আরব নবীর অভ্যুদয় ঘটেছে? উত্তরে তারা বললেন, না।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, তবারিয়া সাগরের অবস্থা কেমন? তা কি শুকিয়ে গেছে, না শুকায়নি?

তারা বললেন, না, শুকায়নি।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, বিসানের খেজুর বাগানের খবর কি? তা কি এখনো ফল দিচ্ছে? (বিসান ফিলিস্তিনের একটি অঞ্চলের নাম)।

তারা বললেন, হ্যাঁ, তা এখনো ফল দিচ্ছে।

এধরনের আরো অনেক প্রশ্ন করল। কারণ, এগুলো কিয়ামতের আলামত। বর্ণিত আছে, ইয়াজুজ-মা'জুজ বের হবে। তবারিয়া সাগর অতিক্রম করবে এবং তার সব পানি পান করে ফেলবে। তারা বিসান এলাকার খেজুর বাগানের ফল খাবে। তারপর থেকে আর সে বাগানে ফল হবে না।

বলছিলাম, দাজ্জাল সম্পর্কে বিশ্বাস রাখা, তেমনিভাবে ঈসা (আঃ)-এর সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখা যে, তিনি দামেস্কের জামে মসজিদের পূর্ব প্রান্তের সাদা মিনারায় ফেরেস্তার বাহুতে ভর দিয়ে আকাশ থেকে নামবেন- এ দু'টি বিষয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ের হাদীস দলে দলে লোকে শোনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

খ্রিস্টানরা বলে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। কিন্তু কী বিস্ময়ের ব্যাপার! কিভাবে তিনি আল্লাহর পুত্র হবেন! এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম তাঁর রচিত গ্রন্থে এক সুন্দর ও চমৎকার কবিতা লিখেছেন। তা হল–

أَعبَّادَ المسيح لنا سؤالٌ   نُريد جوابَه ممن وعَـــاه

إذا قُتل الإلـــهُ بيد ناسٍ   أَمَاتـــوه فهل هذَا إلـــهٌ

فأنْ رضيَ الذي فعلُوه فيه   فبشِّرهم إذا نالُوا رضَاه

و إن سَخط الذي فعلُوه فيه   فقوهم إذا أوْهتْ قواه

অর্থ : হে ঈসা মসীহ (আঃ)-এর পূজারীরা! আমাদের একটি প্রশ্ন আছে। যে ব্যক্তি প্রশ্নটি বুঝবে, আমরা তার নিকট এর উত্তর চাই।

যদি মানুষের হাতে ইলাহ নিহত হয়, তারা তাকে হত্যা করে ফেলে, তবে কি সে ইলাহ হতে পারে?

তারা যা করল, তাতে যদি তিনি রাজি হন, তাহলে তো তাদের জন্য সুসংবাদ যে, তারা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছে।

আর যদি তিনি তাদের কৃতকর্মে অসন্তুষ্ট হন, তাহলে তো বলতে হবে যে, তাদের শক্তি তাঁর শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে।

এরপর আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন–

و هل خلتِ الطباقُ السبعُ لما   ثوى تحتَ التراب و قد علاه

و هل خلتِ العوالمُ من ألـــهٍ   سميعٍ يستجيبُ لمن دعـــاه

অর্থ : তিনি যখন মাটির নীচে আচ্ছাদিত হয়ে গেলেন, তখন কি সপ্ত আকাশ ইলাহশূন্য হয়ে গেছে! বিশ্বজগত কি ইলাহশূন্য হয়ে গেছে, যিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দান করেন!

খ্রিস্টানদের বিশ্বাস, ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার পর তিনি তিন দিন কবরে ছিলেন। তারপর তর্জন গর্জন করতে করতে আকাশে উঠে গেছেন। নতুনভাবে তিনি জীবিত হয়েছেন। তাই আল্লামা ইবনুল কায়্যিম প্রশ্ন করছেন, ঐ তিনদিন কে এ নিখিল বিশ্বকে পরিচালনা করেছিলেন, কে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন?

এরপর আল্লামা ইবনুল কায়্যিম বলেন–

أقامَ هناك تسعًا من شهور   لدى الظلمات من حيضٍ غذاه

شقَّ البطنَ مولـــودًا صغـــيرًا   ضعـــيفًا فاتحًـــا للثغر فـــاه

و يـــأكلُ ثم يشربُ ثم يـــأتي   يُلازم ذاكَ هل هناك إلـــهُ

অর্থ : তিনি মাতৃগর্ভে অন্ধকারের মাঝে নয় মাস অবস্থান করেছেন আর তার খাদ্য ছিল রজঃস্রাব।

মাতৃ-উদর বিদীর্ণ করে দুর্বল ক্ষীণাবস্থায় নবজাত শিশুরূপে জন্ম লাভ করেছেন। যখন তার মুখ ছিল খোলা।

তিনি খান, পান করেন তারপর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করেন। এমন সত্ত্বা কি মা'বুদ হতে পারে?

এরপর আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) ক্রুশ সম্পর্কে বলেন–

فذاك المركبُ الملعونُ حقًّا فدُسه لا تبسه إذا تراه

يُهان عليـــه الخلقُ طـــرًّا و تعبده فإنك من عَداه

প্রকৃতপক্ষে এটাই অভিশপ্ত ক্রুশ। সুতরাং যখন তাকে দেখবে পদাঘাত করবে– চুমু খাবে না।

সমস্ত সৃষ্টির রবকে এতে অপমান করা হয়। অথচ তুমি তার ইবাদত করছো। সুতরাং নিশ্চয় তুমি শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত।

দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) ফাতেমা বিনতে কাইস থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির বিবরণ হল–

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা কি জান, কেন আমি তোমাদের একত্রিত করলাম?

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তোমাদেরকে কোন আশাব্যঞ্জক বা ভীতিকর কিছু শোনানোর জন্য একত্রিত করিনি। তবে তোমাদের একত্রিত করার কারণ হল, তামীম দারী একজন খ্রিস্টান ছিল। আমার নিকট এসে বাই'আত গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে আর আমাকে এমন এক ঘটনা শুনিয়েছে, আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে যা বর্ণনা করতাম, তা তার বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্ণনা করেছে, সে লাগাম ও জযাম গোত্রের ত্রিশজন লোকের সাথে এক সামুদ্রিক যানে আরোহণ করেছিল। সমুদ্রের তরঙ্গমালা একমাস পর্যন্ত তাদের অজানা পথে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তারপর সূর্যাস্তকালে তারা একটি দ্বীপে নোঙ্গর করল। সামুদ্রিক যানের ছোট নৌকায় করে তারা দ্বীপে অবতরণ করল। তখন অস্বাভাবিক লোম বিশিষ্ট এক প্রাণী তাদের সাথে সাক্ষাৎ করল। লোমের প্রাচুর্যের কারণে তারা তার অগ্র-পশ্চাত চিনতে পারেনি।

তারা বলল, তোর ধ্বংস হোক। তুই কে?

প্রাণীটি বলল, আমি জাসসাসা।

তারা বলল, জাসসাসা কি?

প্রাণীটি বলল, লোক সকল! এই যে গির্জাটি, এর মাঝে অবস্থিত লোকটির নিকট যাও। সে তোমাদের সংবাদ জানতে খুব আগ্রহী।

প্রাণীটি আমাদের একজন লোকের কথা বললে আমরা ভীত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, তাহলে কি সে শয়তান। তারপর আমরা দ্রুত গির্জায় গিয়ে প্রবেশ করলাম। গিয়ে বিস্ময়ভরা চোখে দেখি, আমাদের দেখা সবচেয়ে বিশাল একজন মানুষ। শিকলে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার হাত দু'টি ঘাড়ের সাথে পায়ের গোছা ও গোড়ালীর মাঝ দিয়ে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা।

আমরা বললাম, ছি! তোমার একি অবস্থা?

লোকটি বলল, তোমরা আমার খবর জানতে পারবে, আগে বল, তোমরা কারা?

আমরা বললাম, আমরা আরবের কিছু লোক। একটি সামুদ্রিক যানে করে সমুদ্র পথে যাত্রা করেছিলাম। হঠাৎ আমরা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মাঝে পড়ে গেলাম। উত্তাল তরঙ্গমালা আমাদের একমাস ভাসিয়ে নিয়ে চলল। তারপর আমরা তোমার এই দ্বীপে নোঙ্গর করলাম এবং এক ছোট নৌকায় করে দ্বীপে অবতরণ করলাম। আমরা বহু লোমবিশিষ্ট এক প্রাণীর সাক্ষাত পেলাম। লোমের কারণে তার অগ্র-পশ্চাৎ চেনা যায় না। আমরা বললাম, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কে?

প্রাণীটি বলল, আমি জাসসাসা।

আমরা বললাম, জাসসাসা কি?

প্রাণীটি বলল, তোমরা এই যে গির্জাটি আছে, তার মাঝে অবস্থিত লোকটির নিকট যাও। সে তোমাদের সংবাদ জানতে খুব আগ্রহী। আমরা দ্রুত তোমার নিকট এলাম। আমরা তার ব্যাপারে ভীত ছিলাম। আমরা ভাবলাম, সে শয়তান।

লোকটি বলল, তোমরা আমাকে বিসানের খেজুর বাগানের সংবাদ দাও।

আমরা বললাম, তার কোন অবস্থা তুমি জানতে চাচ্ছ?

লোকটি বলল, আমি জিজ্ঞেস করছি তার বৃক্ষ সম্পর্কে। খেজুর গাছগুলো কি ফল দেয়?

আমরা বললাম, হ্যাঁ।

লোকটি বলল, শুনে নাও। শীঘ্রই সে ফল দিবে না।

লোকটি বলল, তোমরা আমাকে তবারিয়া দরিয়ার সংবাদ দাও।

আমরা বললাম, তার কোন অবস্থা তুমি জানতে চাও?

লোকটি বলল, তাতে কি পানি আছে?

আমরা বললাম, হ্যাঁ, তাতে প্রচুর পানি আছে।

লোকটি বলল, শীঘ্রই তার পানি শেষ হয়ে যাবে।

লোকটি বলল, তোমরা আমাকে যৌর ঝরনার সংবাদ দাও।

আমরা বললাম, তার কোন অবস্থা তুমি জানতে চাও?

লোকটি বলল, ঝরনায় কি পানি আছে?

আমরা বললাম, হ্যাঁ তাতে প্রচুর পানি আছে। লোকেরা তার পানি দিয়ে চাষাবাদ করে।

লোকটি বলল, তোমরা আমাকে উম্মীদের নবীর সংবাদ দাও? তিনি কী করছেন?

আমরা বললাম, তিনি মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন। ইয়াসরিবে অবস্থান করছেন। লোকটি বলল, তার বিরুদ্ধে কি আরবরা যুদ্ধ করছে?

আমরা বললাম, হ্যাঁ।

লোকটি বলল, তিনি তাদের সাথে কেমন আচরণ করছেন?

আমরা তাকে বললাম, তিনি তার পার্শ্ববর্তী আরবদের উপর বিজয় লাভ করেছেন। আর তারা তাঁর অনুগত হয়ে গেছে।

লোকটি বলল, তেমনই হবে।

আমরা বললাম, হ্যাঁ।

লোকটি বলল, শুনে নাও। তাঁর অনুগত হয়ে যাওয়াই তাদের জন্য উত্তম। এখন আমি তোমাদের আমার খবর বলছি। আমি মাসীহ দাজ্জাল। হয়তো শীঘ্রই আমাকে আত্মপ্রকাশের অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি বেরিয়ে যাব। পৃথিবীতে ছুটে বেড়াব। চল্লিশ দিনের মধ্যে সকল শহরে-নগরে পৌঁছব।

তবে মক্কা-মদীনা ছাড়া। এ দুই নগরীতে প্রবেশ করা আমার জন্য হারাম। আমি যখনই এর কোন একটিতে প্রবেশ করতে চাইব, আমার সামনে নাঙ্গা তরবারী হাতে ফেরেস্তা এগিয়ে আসবে। তারা আমাকে প্রতিহত করবে। নিশ্চয় তার প্রতিটি গলি পথে ফেরেস্তারা প্রহরায় নিয়োজিত রয়েছে। আমি কি তোমাদের বলব না, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা, এটাই মদীনা। শুনে নাও, নিশ্চয় তা ঘটবে।

তামীম দারীর ঘটনাটি আমাকে বিস্মিত করেছে। নিশ্চয় ঘটনাটি আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল, মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে যা বলতাম, তার সাথে মিলে যাচ্ছে। শুনে নাও, তা শামের সমুদ্রে বা ইয়ামানের সমুদ্রে রয়েছে এবং তা পূর্ব দিকে রয়েছে।

কিছুলোক আছে, তারা অতি উৎসাহী হয়ে সত্য-মিথ্যা যাচাই না করেই বলে, ত্রিনিদাদের ত্রিকোণ বিশিষ্ট এক বিশেষ জায়গায় দাজ্জাল রয়েছে। ত্রিকোণ বিশিষ্ট এ জায়গাটি বারমুদার নিকটে অবস্থিত। এ জায়গার বৈশিষ্ট্য হল, বিমান বা অন্য যে কোন কিছু তার উপর দিয়ে উড়ে গেলে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। বারমুদা দক্ষিণ আমেরিকায় বলে জানা যায়।

মাহদী সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম। এ ব্যাপারে বেশ ভালভাবে মনে রাখতে হবে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাহদী আর শিয়াদের মাহদী এক নয়। শিয়াদের মাহদী হল, মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল আসকারী। বালক বয়সে তাঁর তিরোধান হয়। শিয়ারা বিশ্বাস করে, তিনি নাকি একটি গুহায় আত্মগোপন করে আছেন। শেষ যুগে আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি শিয়াদের দ্বাদশ ইমাম। তাদের ধারণা মতে, এ মাহদী অবশ্যই আহলে বাইত অর্থাৎ নবী পরিবারের লোক। শিয়াদের ধর্মীয় বিধান হল, তাদের ইমাম মাহদী অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল আসকারী আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে কোন আন্দোলন, বিপ্লব ও যুদ্ধ করা যাবে না। কিন্তু খোমিনী এসে তাদের এ বিশ্বাসে এক নতুন ধারা সংযোজন করে। বলে, কেউ ইমাম মাহদীর প্রতিনিধি হতে পারে এবং প্রতিনিধির নেতৃত্বে বিপ্লব, আন্দোলন, যুদ্ধ সব কিছুই করা যায়। তিনি নির্দেশ দিলেন, এই তাগুত, ইরানের এই শাহ রেজা পাহলবীর বিরুদ্ধে বিপ্লব কর। তার সিংহাসনকে উল্টে দাও। খোমিনীর নির্দেশে ইরানের শিয়ারা বিপ্লব করল। শাহকে পদচ্যুত করল।

এরপর ইরাক ইরানে আক্রমণ করলে খোমিনী বলল, তোমরা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তার দাবি মতে, সে এ নির্দেশ দিতে পারে। কারণ, সে নাকি তাদের মাহদীর প্রতিনিধি। শিয়াদের নিকট তার এ নির্দেশ শিরোধার্য। শিয়াদের নিকট তাদের ইমামগণ নিষ্পাপ। তাই খোমিনীর কোন কথাই মিথ্যা বা ভুল নয়। তারা নির্দ্বিধায় খোমিনীর কথা মেনে নিয়ে জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা তাদের ইমাম মাহদীর প্রতিনিধির নেতৃত্বে যুদ্ধ করে। খোমিনীর এই দর্শন, এই মতবাদ শিয়াদের বিপ্লবী বানিয়েছে। শাহকে তারা বিতাড়িত করেছে। যুদ্ধ করেছে। পৃথিবীর দিকে দিকে শিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠায় তারা শক্তি সঞ্চয় করছে।

শিয়া সম্প্রদায়কে তুচ্ছ ভাবলে ভুল হবে। এ সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে মিশে আছে জীবনকে জয় করার অনন্ত পিপাসা। তারা বিশ্বাস করে, তাদের যে কেউ আশুরার দিনে নিহত হোক বা ইরান সীমান্তে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করুক, তারা সবাই শহীদ। তাই খোমিনী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করল, ইরাকের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমি এক লক্ষ যোদ্ধা চাই, যারা দুই লক্ষ নিয়মিত যোদ্ধার আগে এগিয়ে যাবে। এভাবেই তারা এগিয়ে গেছে এবং হানাদার ইরাকীদের তাড়িয়ে দিয়েছে। ইরাকীদের অধিকাংশ ট্যাঙ্ক জ্বালিয়ে দিয়েছে। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের যারা শরীক হয়েছিল, তাদের খুব কম লোকই জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিল। ইরাক-ইরান যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। এ যুদ্ধে খোমিনীর প্রতিরোধ প্রবল ছিল।

আমি চাইনি, এ যুদ্ধে সাদ্দামের বিরুদ্ধে খোমিনীর বিজয় হোক। অথচ আমি বিশ্বাস করি যে, সাদ্দাম কাফির। ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আর খোমিনীর কুফরীর ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। তবে সে যে ফাসেক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, সে সাহাবীদের ব্যাপারে আপত্তিকর ধারণা পোষণ করে। হ্যাঁ, যদি একথা প্রমাণিত সত্য হয় যে, তারা কুরআনে পরিবর্তন, তাতে সংযোজন ও বিয়োজনে বিশ্বাসী– যেমন ইহসান এলাহী জহীর (রহঃ) বলেছেন– তাহলে তো তারা নিঃসন্দেহে কাফির। তবে সাহাবায়ে কিরামকে অপছন্দ করা, তাদের কাউকে গালমন্দ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো জঘন্য হলেও এজন্য তাদের কাফির-মুরতাদ বলা যায় না।

যে সব বিশ্বাস তাদের ধর্ম থেকে বের করে দেয়, তা হল, এ বিশ্বাস করা যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) নৈতিক চরিত্রে কলুষিত ছিলেন। কেননা, তা কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত। আর এ বিশ্বাস করা যে, কুরআনে সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে। এ বিশ্বাসও যে কাউকে কাফির সাব্যস্ত করে। এ ছাড়া শিয়াদের অন্যান্য

বিশ্বাসগুলো ফাসেকীর পর্যায়ে পড়ে– কুফরী বলা যায় না। তাই আমি খোমিনীর কাফির হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত নই।

তবে খোমিনীর লেখা الحكومةُ الإسلاميةُ গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় নাকি লেখা আছে–

وأن لأئمتنا مكاناً لا يبلغه نبيٌّ مرسلٌ و ملكٌ مقربٌ ، يتصرَّفون في ذرَاتِ الكونِ و لا يموتون إلا حيثُ يريدونَ —

"আর নিশ্চয় আমাদের ইমামদের মর্যাদার এমন এক স্থান রয়েছে, যেখানে নবী-রাসূলগণও পৌঁছতে পারেন না, সেখানে নৈকট্যশীল ফেরেস্তারাও পৌঁছতে পারেন না। পৃথিবীর অণু-পরমাণুতে তাঁরা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। তারা যেখানে চান, সেখানে ছাড়া কোথাও মৃত্যুবরণ করেন না।"

আমি খোমিনীর এ গ্রন্থটি পড়েছি: কিন্তু তাতে এমন কথা খুঁজে পাইনি। তবে যদি এ গ্রন্থের অন্য সংস্করণে এমন বিশ্বাসের উল্লেখ থাকে, তবে সে যে কাফির তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তবে সাদ্দাম যে ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে গেছে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কেননা, সে বাথ পার্টির আদর্শ ও গঠনতন্ত্রে বিশ্বাসী। সে বাথ পার্টির একজন অন্যতম নেতা ও প্রচারক।

খ্রিস্টান মাইকেল আফলাক তার আদর্শ ব্যক্তিত্ব। তাকে সে স্মরণ করে الاب قائد (আদর্শিক নেতা) বা الاستذ المعلم (দীক্ষাগুরু) বলে। মাইকেল আফলাক সম্পর্কে সাদ্দাম হোসেন বলে, "আমি আমার মহান দীক্ষাগুরুর সামনে এক ঘণ্টা বসে থাকলে আগামী ছয় মাস চলার মত আত্মিক শক্তি নিয়ে ফিরে আসি।" এ ধরনের কথা মানুষকে ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেয়। তাছাড়া বাথ পার্টির সক্রিয় কর্মীরা বিশ্বাস করে, এখন ইসলাম ছেড়ে সকলকে বাথ পার্টি গ্রহণ করা উচিৎ। ইসলামের স্থান এখন বাথ পার্টি দখল করে নিয়েছে। আরব জাতীয়তাবাদ এখন আরবদের ঐক্যের প্রধান নিয়ামক। বাথ পার্টির এ দর্শন ইসলামের চেয়ে উত্তম। এ ধরনের কথা বলার কারণে তারা ইসলাম ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। বাথ পার্টির লোকেরা দামেস্ক রেডিও থেকে সম্প্রচারিত একটি পঙ্‌ক্তির কথা মানুষের কাছে প্রচার করে। পঙ্‌ক্তিটি হল–

آمنتُ بالبعثِ ربًّا لا شريكَ له و بالعروبة دينًا ما له ثاني —

"আমি বাথ পার্টিকে রব হিসাবে বিশ্বাস করি, যার কোন অংশীদার নেই। আমি আরব জাতীয়তাবাদকে ধর্ম হিসাবে বিশ্বাস করি, যার কোন বিকল্প নেই।"

বাথ পার্টির অনুসারীরা বলে, আরব জাতীয়তাবাদ আমাদের নিকট একটি ধর্ম। আমরা হলাম আরব জাতীয়তাবাদী।

মাহমুদ তাইমূর নামক এক বাথ পার্টির সদস্য বলেছিল, "প্রত্যেক যুগে কোন একটি বিষয়ে নবুওয়ত হয় আর এ যুগের নবুওয়ত হল 'আরব জাতীয়তাবাদ'। তাই প্রত্যেক আরবের উচিৎ, মুসলমানের কুরআনের উপর ঈমান আনার ন্যায় আরব জাতীয়তাবাদের উপর ঈমান আনা।"

তাই এরা কাফির। সাদ্দাম হল এদের অন্যতম নেতা। সাদ্দাম তার চারপাশে বাথ পার্টির আদর্শে বিশ্বাসী একদল স্বার্থান্বেষী লোককে জড়ো করেছে। সবাই তার সুরে সুর মিলিয়ে বাদ্য বাজাচ্ছে আর কুফরীর গান গাইছে। সাদ্দাম এদের বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করছে। কাউকে ডক্টরেট ডিগ্রী দিচ্ছে। কাউকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু পদে আসীন করছে। তাই বাথ পার্টির আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সাদ্দামকে লক্ষ করে শফীক কামালী নামক এক কবি বলেছিল–

تباركَ وجهُكَ القدسيُّ فينا كوجه اللهِ يَنْضحُ بالجَلاَلِ —

"আমাদের মাঝে আপনার জ্যোতির্ময় পবিত্র চেহারা উজ্জ্বল হয়ে বিভা ছড়াচ্ছে, আল্লাহর চেহারার ন্যায় যাকে সিক্ত করা হয় মহিমার পরশে।"

এরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে। অথচ, শিয়ারাও এদেরকে কাফির বলে। আসলে এরা শিয়াদের চেয়েও জঘন্য বিশ্বাস পোষণ করে। তাই শিয়াদের সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে এদের সম্পর্কেও আলোচনা করতে হবে। এরা সবাই সমান। তবে এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, আরব বিশ্বে শিয়াতত্ত্বের ক্ষতিকর প্রাদুর্ভাব বাথ পার্টির চেয়ে অনেক বেশি। সাদ্দামের চেয়েও মারাত্মক শিয়া নেতাদের মানসিকতা। কারণ, যেকোন সময় সাদ্দামের মৃত্যুর পর ইরাক থেকে বাথ পার্টির অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে। তার কুফরী মতবাদ ইরাক থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু শিয়ারা একটি বিশ্বাস ধারণ করে আছে, তারা জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে এ মতবাদ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে।

এই শিয়াদের সাথে সিরিয়ার বাদশাহ হাফেজ আসাদকে যোগ করা যেতে পারে। সেও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে কাফির। কারণ, সে নুসাইরী। নুসাইরীরা শুধু ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে না, মূর্তিপূজাও করে। এ প্রসঙ্গে ক্ষমতাসীন আমাল-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। সে কট্টর শিয়াপন্থী। তুরস্কের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ, দক্ষিণ তুরস্কে ও উত্তর সিরিয়ায় তিন মিলিয়ন নুসাইরী রয়েছে। এর সাথে পাকিস্তানের প্রায় তের মিলিয়ন শিয়াকে যোগ করে নেয়া উচিৎ, যারা পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ অনেক সরকারী পদ দখল করে আছে। এরা সবাই ইসলামী বিশ্বে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের টুটি চেপে ধরতে চাচ্ছে।

যদি সাদ্দামের পতন হয়, অবশ্য যদি ইরাকের পতন হয়, তাহলে চার দিকে শিয়াদেরই জয়জয়কার শুরু হবে। আরব উপদ্বীপ শিয়াদের দখলে চলে যাবে। জর্দান তো শিয়াদেরই দখলে। সিরিয়াতে শিয়ারা, লেবাননে শিয়ারা। তখন ইসলামী জগতের অবস্থা কি হবে!

খোমিনী যখন ক্ষমতায় এল, তখন আমরা ভীষণ আনন্দিত হয়েছিলাম। উল্লসিত হয়েছিলাম। আমরা জর্দানে বিরাট বিজয়-সভার আয়োজন করেছিলাম। খোমিনীর বিজয় আর শাহের পরাজয়ের স্বপক্ষে আমরা হ্যান্ডবিল-পোস্টার করেছিলাম।

খোমিনী ঘোষণা করল, আমি ইরানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত করব। কুরআন ও সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করব। খোলাফায়ে রাশেদা– আবূ বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ)-এর অনুসৃত নীতিতে আমরা পথ চলব। আমরা তার এ ঘোষণা শুনে আনন্দিত হয়েছিলাম। এ কারণে যে, সে ইরান থেকে খোদাদ্রোহী আমেরিকার পুতুল শাসক ও মা'সূনিয়া মতবাদের শীর্ষ নেতা রেজা শাহ পাহলবীকে বিতাড়িত করেছে। কিন্তু আমাদের সে আনন্দ ও উল্লাস বেশি দিন স্থায়ী হল না।

আমরা দেখলাম, ইসলামী আন্দোলনের চিরশত্রু সিরিয়ার হাফেজ আসাদের সাথে তার গভীর সম্পর্ক। তার সুরে সুর মিলিয়েই সে কথা বলে। অথচ, সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তাঁকে মোবারকবাদ জানিয়েছিল। তার সাফল্যে আনন্দিত হয়েছিল। তাকে সমর্থন করার কারণে দেশে দেশে নির্যাতিত হয়েছিল সহস্র কর্মী। তারা এ কারণে সরকারী উৎপাতে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পথে পথে পালিয়ে বেড়িয়েছে। মিসরের ঠিক একই অবস্থা হয়েছে। ইরানের খোমিনী বিপ্লবের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করার কারণে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর নানা নির্যাতন করা হয়েছে। এতো কিছু করেও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দমন করতে পারেনি। ইসলামী আন্দোলনের নেতারা গোপনে খোমিনীর সাথে সাক্ষাৎ করেছে। তাকে স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু এর পুরস্কার কি দিল? খোমিনীর লোকেরা পত্রিকায় ইখওয়ানের নেতাদের নাম প্রচার করে দিল। ঘোষণা করল, এরা আমেরিকার এজেন্ট। গোটা বিশ্বে তা প্রচার করল।

এরচেয়ে ন্যাক্কারজনক ঘটনা হল, ইখওয়ানের শীর্ষস্থানীয় নেতারা খোমেনীর নিকট আবেদন করল, সে যেন হাফেজ আসাদকে বলে দেয়, যেন হাফেজ আসাদ ইখওয়ানের নেতা ও কর্মীদের উপর নির্যাতন না করে। জুলুম না করে। কিন্তু কার্যত হল তার বিপরীত। ইরানের নেতৃবৃন্দ এসে হাফেজ আসাদের নিকট ইখওয়ানের নেতাদের নাম-ধাম সব বলে দিল। ইখওয়ানের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিল। ফলে যা হওয়ার তাই হল।

যাক, আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসি। শিয়াদের ইমাম মাহদী আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাহদী এক নয়। আমরা যদি শিয়াদের শিকড় তালাশ করি, তাহলে দেখতে পাই, শিয়াদের গোড়ায় রয়েছে ইহুদী অপশক্তি। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা হল এদের তত্ত্ব-গুরু। সে ইহুদী ছিল। সে হযরত আলী (রাঃ)-কে 'ইলাহ' বলে ঘোষণা করেছিল। হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফতের সময় একদল সাবাঈ আলী (রাঃ)-কে সেজদা করল। হযরত আলী (রাঃ) এতে দারুণ বিস্মিত হলেন। বললেন, আরে এসব কী! তারা বলল, আপনি আমাদের ইলাহ। তখন আলী (রাঃ) তাদের পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দিলেন। এভাবে তিনি তাদের হত্যা করলেন।

শিয়া সম্প্রদায় ইরাকে ছড়িয়ে পড়ল। কেননা, ইরাক হল প্রাচুর্যের দেশ। ইরাকের প্রাচুর্য গোটা ইসলামী বিশ্বে সুবিখ্যাত। তাই সকল ভ্রষ্ট দলের বা সম্প্রদায়ের সূচনা বা জন্ম ইরাকেই ঘটেছে। শিয়া, খারেজী, মু'তাজিলা, মারজিয়্যা, ক্বাদরিয়্যা, জাবরিয়্যা, মু'আত্তালা, বাহাই এ ধরনের সকল ফেতনার জন্ম হয়েছে ইরাকের মাটিতে।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন–

اللهمَّ بارِكْ لنا في شَــامنا و يَمَــننا

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শাম ও ইয়ামানে বরকত দান করুন।"

সাহাবায়ে কিরাম তখন বললেন وَفِي نَجْدنا আর আমাদের নজদেও বরকত দান করুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় বললেন,

اللهمَّ بارِكْ لنا في شَــامنا و يَمَــننا

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শামে ও ইয়ামানে বরকত দান করুন।"

সাহাবায়ে কিরাম বললেন, وَفِي نَجْدناআর আমাদের নজদেও বরকত দান করুন। তৃতীয় বারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

هناك تكونُ الزلازلُ و الفسقُ

"সেখানে ভূমিকম্প, অনাচার ও ফেৎনার সৃষ্টি হবে।"

নজদের সীমানা কতটুকু? রাসূলের যুগের আরবরা নজদ বলত আরবের পূর্বাঞ্চলকে। আজকের ইরাক তখন নজদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই আমরা দেখতে পাই, ইরাকেই সব ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে আর একের পর এক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহর নিকট আমরা দু'আ করি, যেন আল্লাহ ইরাককে সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেন। আমীন

এখন ইরাক বিরান হয়ে গেছে। ধ্বংসের একেবারে শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সেখানে এখন আর কোন আলিম খুঁজে পাবে না। কোন ইসলামী চিন্তাবিদ পাবে না। তারা হয় নির্যাতনে নিহত হয়েছে, মৃত্যুবরণ করেছে, অন্যথায় হিজরত করে অন্যত্র চলে গেছে। রাস্তায় হাঁটলে পুরুষের দেখা পাবে কম। শুধু নারী আর নারী। অধিকাংশ সক্ষম পুরুষই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। সাদ্দাম সবশেষে দুইশত একান্নজন লোককে বন্দী করল। তাদের অপরাধ, তারা 'তানজীমে ইসলামী' দলের সাথে সম্পৃক্ত। সাদ্দামের আইনে এধরনের আসামীদেরকে সাধারণত আজীবনের জন্য বন্দী করে রাখা হয় বা হত্যা করা হয়। আল্লাহ জানেন, এদের ভাগ্যে কি ঘটেছে।

একবার চারজন যুবককে গ্রেফতার করা হয়। আমার ধারণা, তারা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক কোন ক্লাসে পড়ত। সরকার তদন্ত করে জানল, তারা আফগান জিহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে। এ অপরাধে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হল।

ইরাকে এক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল। নাম তার নাযেম কুযার। সে যে কত মানুষকে যবাই করে হত্যা করেছে, তার কোন পরিসংখ্যান নেই। তার একটি গন্ধকাম্ল (Sulphuric Acid)-এর হাউজ ছিল। যে কেউ তার বিরোধিতা করত, তাকে তাতে নিক্ষেপ করত। ফলে লোকটি পানিতে লবণ গলে যাওয়ার ন্যায় নিমিষে গলে যেত। গোশত হাড় সব কিছু গলে তরল হয়ে যেত।

হয়তো দেখা গেল দুই ব্যক্তি রাস্তায় ঝগড়া করছে। পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে গেল। উপস্থিত করল নাযেম কুযারের নিকট। তারা একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল। নাযেম কুযার একজনকে বলল, তুমি যে মিথ্যা বলছ না তা আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে পারবে? হ্যাঁ, পারব। কুরআন ছুঁয়ে বলতে পারবে? হ্যাঁ, পারব। নাযেম বলল, তোমার কি ওযূ আছে? লোকটি বলল, না। নাযেম বলল, এসো, ওযূ কর। দু'জনই গেল। হাউজের পাশে দাঁড়াল। নীল রংয়ের পানি। একজন ওযূ করতে প্রস্তুত হল। আর অমনি তাকে ধাক্কা দিয়ে গন্ধকাম্লের কুয়ায় ফেলে দিল। লোকটি কুয়ায় পড়ে গলে শেষ হয়ে গেল। শূন্যে উড়ে গেল তার পোড়ার খানিকটা ধূয়া। তারপর অপরজনকে বলল, যাও তুমি মুক্ত। মনে হচ্ছে তুমি নিরপরাধ। তাই তোমাকে এবারের মত ক্ষমা করে দিলাম।

আল্লাহর লীলা দেখ, যে শফীক কামালী সাদ্দাম হোসেন সম্পর্কে ছন্দ আবৃত্তি করেছিল–

تبارَكَ وجهُكَ القدسيُّ فينا كوجهِ اللهِ يَنْضَحُ بالجَلَالِ —

"আমাদের মাঝে আপনার পূতপবিত্র চেহারা মহিমান্বিত হয়েছে আল্লাহর চেহারার ন্যায়, যাকে নিয়ত সিক্ত করা হয় মহিমার পরশে।"

যে জিহ্বা দ্বারা সাদ্দামের প্রশংসায় শফীক কামালী এমন কুফরী কবিতা আবৃতি করেছিল, তার পরিণতি কী হয়েছিল শোন।

ইরাক-ইরান যুদ্ধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকলে ইরাক থেকে একটি প্রতিনিধিদল ইরানে খোমিনীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গেল। খোমিনী বলল, যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে তার কোন আপত্তি নেই। তবে একটি শর্ত। তা হল সাদ্দামকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। তখন বাথ পার্টির কেউ বলল, আমাদের নেতা দেশের জন্য অনেক কিছু উৎসর্গ করেছেন। এবার তিনি দেশের কল্যাণে এ উৎসর্গটুকুও কবুল করে নিতে পারেন। যারা এ কথা বলেছিল, শফীক কামালী তাদেরই সাথে ছিল।

ইরাকে ফিরে আসার পর সাদ্দাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, শুনলাম তুমি নাকি এমন এমন কথা বলেছ।

শফীক কামালী বলল, আপনি আমাদের নেতা। আপনিই আমাদের আত্মোৎসর্গের শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আমরা তা বলেছি। সাদ্দাম বলল, তোমার জিহ্বা বের কর। তারপর সাদ্দাম নিজ হাতে তার জিহ্বা কেটে ফেলল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ○

অর্থ : যালিমরা যা করছে, তুমি সে ব্যাপারে আল্লাহকে অন্যমনস্ক মনে কর না। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪২)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ○

অর্থ : নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র শুধুমাত্র ষড়যন্ত্রকারীকেই পরিবেষ্টন করে। (সূরা ফাতের ঃ ৪৩)

আল্লাহর ক্ষমতা ও অদৃশ্যের আরেকটি উপমার কথা বলছি। শারাবী জুম'আ মিসরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদের সাথে সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করত। কারাগারে তাদের নিকট কোন ফল-

মূল যেতে দিত না। মুহাম্মদ কুতুব সাত বৎসর পর্যন্ত জেলে ছিলেন। তার বোনও তখন জেলে। তিনি জেলেই তার বোনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করলে সে বলল, আবেদন অনুমোদন করার ক্ষমতা আমার নেই। কারণ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন– মুহাম্মদ ইবনে কুতুবকে বলে দাও, জীবিত বা মৃত কোন অবস্থায়ই তাকে তার বোনকে দেখতে দেয়া হবে না। এ ঘটনার এক বৎসর পরই মুহাম্মদ কুতুব ও তার বোন জেল থেকে মুক্তি পান। আর শারাবী জুম'আ কোন এক অভিযোগে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হল। বাদশাহ ফয়সালের মধ্যস্থতায় মুহাম্মদ কুতুব ও তার বোন মুক্তি পেয়েছিলেন।

শারাবী জুম'আ জেলে যাওয়ার পর একবার তার জন্য তার স্ত্রী ফলমূল নিয়ে এল। জেল গেটে পুলিশ বলল, এতে কি? শারাবী জুম'আর স্ত্রী বলল, এগুলো আমার স্বামী শারাবী বেগের জন্য এনেছি। পুলিশ বলল, আপনার স্বামী শারাবী জুম'আ? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। পুলিশ বলল, আপনার স্বামী আইন করেছিলেন, জেলখানায় কোন ফল ঢুকতে দেয়া যাবে না। তিনি যখন মন্ত্রী ছিলেন, তখন আমরা তার কথা মেনে চলেছি। এখনো এ আইন বাতিল করা হয়নি। তাই আমরা এ আইন মান্য করতে বাধ্য। এ ফল তার নিকট পৌঁছানো কোনভাবেই সম্ভব নয়। নিরাশ হয়ে তার স্ত্রী ফিরে গেল।

শামস বাদরান মিসর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ছিল এবং শেষে মন্ত্রীও হয়েছিল। জীবনের শেষ দিকে তাকেও জেলে যেতে হয়েছিল। প্রায়ই বলত, আল্লাহ সাইয়্যেদ কুতুবকে রহম করুন। হয়তো এটাই জেলখানার সেই প্রকোষ্ঠ, যেখানে আমি তাকে বন্দী করেছিলাম। শামস বাদরানের নির্দেশেই সাইয়্যেদ কুতুবকে সেখানে শাস্তি দেয়া হত। সে জেলে যাওয়ার পর যেসব পুলিশ তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য আসত, তারা বলত, হে বেগ! আমাদের দোষ কি? আপনিই তো আমাদের এসব সেলের বন্দীদের এভাবে শাস্তি দেয়া শিখিয়েছেন। যে রাতে শামস বাদরানকে জেলে নেয়া হল, সে তখন ক্রোধে ফেটে যাচ্ছে আর ইখওয়ানের সদস্যরা বিজয় তাকবীর দিচ্ছে। আসলে আল্লাহর খেলা বুঝা বড় মুশকিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

অর্থ : আল্লাহ তার কাজে ক্ষমতাবান। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা ইউসুফ ঃ ২১)

মূল কথা হল, বাথ পার্টির লোকেরা দুনিয়া অর্জনের জন্য এ পার্টিতে যোগ দিয়েছে। সাদ্দাম তাদের দুনিয়ার লোভ দেখিয়েছে। দুনিয়ার ক্ষমতা লাভের জন্য, স্বাচ্ছন্দে বাঁচার জন্য তারা এই দলে এসেছে। পরকালের জন্য, মরার জন্য তারা বাথ পার্টিতে যোগ দেয়নি। তাই এই বাথ পার্টির লোকেরা ইরানের এই শিয়াদের সাথে কিছুতেই পারবে না, যারা মজবুত বিশ্বাসের উপর দৃঢ় রয়েছে, যারা হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের চিন্তা-চেতনায় লালিত-প্রতিপালিত। তবে মনে রাখতে হবে, আমরা কিন্তু ইরাকের পরাজয় কামনা করি না। সাদ্দামের পতনও চাই না। আমরা আল্লাহর নিকট সর্বদা এ আবেদন ও দু'আ করি, হে আল্লাহ! সাদ্দামের চেয়ে ভাল শাসক ইরাকের ক্ষমতায় সমাসীন কর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ○

অর্থ : তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আমি পূর্বে আলোচনা করেছি, আদী ইবনে হাতেম তাঈ খ্রিস্টান ছিলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন, তখন তার গলায় ক্রুশ ঝুলছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন–

اَلْقِ هذا الوثنَ —

"এই মূর্তিটি ফেলে দাও।"

তিনি তখন তার গলা থেকে ঝুলানো ক্রুশটি ফেলে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা তাওবার কিছু আয়াত তিলাওয়াত শুরু করলেন। অবশেষে যখন এ আয়াতে পৌঁছলেন–

اتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ○

অর্থ : তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে আর মরিয়মের পুত্র ঈসা মাসীহকেও।

এই কথা শুনার পর আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো তাদের ইবাদত করেনা! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

بلى، أحلّوا لهم الحرامَ و حرّموا عليم الحلالَ، فأطاعُوهم، فتلك عبادتُهم إيَّاهَا —

হ্যাঁ, করে। তারা তাদের জন্য হারামকে হালাল করেছে আর হালালকে হারাম করেছে। আর তারা তাদের অনুসরণ করছে। এটাই হল তাদের ইবাদত করা।

এটি একটি ভয়াবহ বিষয়। এ যুগে মুসলিম জাতি এ শিরকে আকবরে ডুবে গেছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্যের বিধান চালু করছে, তাদেরকে অনুসরণে আজ মুসলিম জাতিকে বাধ্য করা হচ্ছে। আর সাধারণ মুসলমানরা তা মেনে নিচ্ছে।

নেপোলিয়ন মিসরে আসার পরই মুসলিম জাতি এ বিপদে পড়েছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সে তা করেছিল। প্রথমে ফ্রান্সের প্রতিনিধি হিসেবে মুহাম্মদ আলী পাশাকে নিয়োগ করল, যেন ধীরে ধীরে এ কুফরী মতবাদ মিসরে অনুপ্রবেশ করে। এরপর মস্তিস্ক ধোলাই করার জন্য মিসর থেকে একের পর এক প্রতিনিধি ফ্রান্সে পাঠাতে লাগল। মুহাম্মদ আলী পাশার নিকট এক ফরাসী পরামর্শদাতা ছিল। তার নাম ড. জালুর। মুহাম্মদ আলী পাশা যাদের পাঠিয়েছিলেন, তাদের একজন ছিলেন আল আযহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের এক শাইখ। নাম রাফা'আ তাহতাবী।

সে ফ্রান্সে গিয়ে নাচ শিখল। মিসরের জাতীয় পোশাক পাগড়ী, জুব্বা সব ছেড়ে দিল। ফ্রান্সের পোশাক কোট-প্যান্ট পড়ে মিসরে এল। একটি গ্রন্থ লিখল, তার নাম–

تلخيص الابريز في تبخيص بارس —

সে সেই গ্রন্থে ফ্রান্সের লোকাচার, সংস্কৃতি, বিনোদন, নাচ, গান, আনন্দ উল্লাসের কথা লিখল। তারপর মুহাম্মদ আলী পাশা ফ্রান্সের সংবিধানের আরবী অনুবাদ করল। তারপর ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে মিসরের মুসলমানদের উপর তা চাপিয়ে দিল এবং তা মিসরের রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত করল।

তারা কিন্তু মসজিদ-মাদরাসায় হাত দেয়নি। সব কিছু স্ব স্ব স্থানে ছিল। কিন্তু জাতীয় জীবনের মূল শিকড়গুলো একের পর এক কেঁটে ফেলল। মিসরের শাসন কাঠামোতে একটি ইসলামী আইনও অক্ষত রইল না।

মসজিদের জায়গায় মসজিদ রইল। মাদরাসার জায়গায় মাদরাসা রইল। নামায রইল, রোযা রইল। কিন্তু মানুষ অনৈসলামিক আইনের প্যাঁচে ঘুরপাক খেতে লাগল। অবশ্য আলিম-উলামারা যে তার বিরোধিতা করেননি, তা নয়। করেছেন, তবে অনেক পরে। যথাসময়ের পর।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আহমদ মুহাম্মদ সাকির বলেছেন– এটা হল এ যুগের 'ইয়াসিক'। ইয়াসিক হল, চেঙ্গিস খানের রাজ্য পরিচালনা করার বিধান সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ। চেঙ্গিস খানই তা রচনা করেছিল।

হিজরী ৬৫৬ সালে হালাকুখান বাগদাদ পদানত করার পর সেখানে চেঙ্গিস খানের বিধান বাস্তবায়নের চেষ্টা করলে উলামায়ে কিরাম বাঁধা প্রদান করলেন। তারা ফতওয়া দিলেন–

من تركَ الشرعَ المحكَمَ المنزَّلَ على محمَّدِ بنِ عبدِ الله خاتمِ الأنبياء و تحَاكَمَ إلى غيرِه من الشرائعِ المنسوخةِ فقد كَفَرَ —

"যে ব্যক্তি আখেরী নবী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ-এর উপর অবতীর্ণ চিরন্তন শরী'আতকে ত্যাগ করবে এবং রহিত কোন জীবন বিধানের নিকট বিচার নিয়ে যাবে সে কাফির হয়ে যাবে।"

এ ফতওয়ার পর মুসলমানরা আর চেঙ্গিস খানের রচিত বিধান অনুযায়ী বিচার প্রার্থনা করতে গেল না। কারো আর দুঃসাহস হল না।

তবে হালাকু খান এ যুগের শাসকদের তুলনায় ভাল ছিল। কিছুটা ন্যায়পরায়ণ ছিল।

হালাকু খান তখন দু'টি বিচারালয় স্থাপন করল। একটি বিচারালায় কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করা হত। আরেকটি বিচারালয়ে চেঙ্গিস খান রচিত বিধান ইয়াসিক অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করা হত।

এরপর মানুষের মাঝে ধর্মীয় চেতনা লোপ পেল এবং মুসলমানরাও ইয়াসিক অনুযায়ী বিচার প্রার্থনা করতে লাগল। কেউ আর তখন তাদের কাফির ফতওয়া দেয়ার মত বাকি রইল না।

এটাই হল হালালকে হারাম করা আর হারামকে হালাল করা। এটাই হল আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করা। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ○

অর্থ : আইন চলবে একমাত্র আল্লাহর। (সূরা ইউসুফ : ৪০)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ ○

অর্থ : আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর কোনটিকে হারাম আর কোনটিকে হালাল করেছ? বল, আল্লাহ কি তোমাদেরকে তার অনুমতি দিয়েছেন? (সূরা ইউনুস : ৫৯)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ○

অর্থ : তাদের কি এমন শরীক দেবতা রয়েছে, যারা তাদের জন্য এমন বিধি-বিধানের প্রচলন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দেননি? (সূরা শূরা : ২১)

হে আল্লাহ! আমরা পানাহ চাচ্ছি, আমরা যেন নিজেরা কোন হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল না করি।

এ বিষয়টি শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চমৎকার করে বর্ণনা করে গেছেন, যার মাঝে কোন অস্পষ্টতা নেই। যার সারমর্ম হল, ইসলাম হল একটি মুদ্রার ন্যায়, যার এক পৃষ্ঠে লেখা আছে–

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ —

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"

আর অন্য পৃষ্ঠে লেখা আছে–

التحاكم إلى شريعة الله —

"রাষ্ট্রের সবকিছু পরিচালিত হবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী।"

এর একটি আরেকটি থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কেউ যদি মুখে لا إله إلا الله বলে অথচ আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোন বিধান মেনে চলে, তাহলে মনে করতে হবে, তার কালিমা পাঠে ত্রুটি রয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের যুগের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল।

কুদামা ইবনে মাযয়ূন (রাঃ) বাহরাইনে ছিলেন। জারুদ ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) এসে হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট সাক্ষ্য দিলেন, তিনি মদ পান করেছেন। কুদামা ছিলেন উমর (রাঃ)-এর দুধভাই।

উমর (রাঃ) কুদামা ও তার স্ত্রীকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। তারা মদীনায় এলেন। কুদামা (রাঃ)-এর স্ত্রীও তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করল। তখন উমর (রাঃ) তাকে আশি দোররা মারার নির্দেশ দিলেন।

তখন কুদামা (রাঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিবাদ করে বললেন, হে উমর! আমার বিরুদ্ধে তুমি কোন অভিযোগ উত্থাপিত করতে পারবে না। আমার বিরুদ্ধে কিছু করার কোন ক্ষমতা তোমার নেই। তুমি আমাকে একটি দোররাও মারতে পারবে না।

উমর (রাঃ) বললেন, কেন পারব না?

কুদামা (রাঃ) বললেন, কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

(৯৩) لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা যা খেয়েছে তাতে তাদের কোন পাপ নেই। যখন তারা আল্লাহকে ভয় করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে। আর আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের পছন্দ করেন। (সূরা মায়েদা : ৯৩)

সুতরাং আমার বিরুদ্ধে আমার কৃতকর্মে কোন প্রকার পাপের অভিযোগ থাকতে পারে না। কেননা, আমি আল্লাহকে ভয় করেছি। ঈমান এনেছি। হিজরত করেছি। জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। সুতরাং আমার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ থাকতে পারে না।

হযরত কুদামা (রাঃ)-এর কথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন। সাহাবায়ে কিরামকে ডাকলেন। তাদের বিষয়টি খুলে বললেন। কুদামা (রাঃ)-এর কথাও বললেন। তারপর তিনি সাহাবায়ে কিরামের মতামত চাইলেন।

আজকে আমাদের অবস্থার কথা একটু ভেবে দেখুন। আমরা হলে সাথে সাথে ফতওয়া দিয়ে দিতাম। আমাদের অনেকের অবস্থা তো এমন যে, ইলম-কালাম কিছুই নেই; অথচ এর চেয়ে বেশি কঠিন মাসআলার ফতওয়া নিশ্চিন্তে দিয়ে দেই। তুমি যদি তাকে বল, আবূ হানীফা (রহঃ) এমন বলেছেন– তাহলে অহঙ্কারের সাথে বলবে, আবূ হানীফা আবার কে?

যদি বলা হয়, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) অমুক কথা বলেছেন। তাহলে সে বলবে, শাফেয়ী আবার কে? এভাবে দুঃসাহসিকতার সাথে আমরা আজ মুজতাহিদে মুতলাকদের উপেক্ষা করে চলছি।

দেখা যাবে, আরবী জানে না, অলংকার শাস্ত্রের বয়ান-বদী' সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটসমূহের জ্ঞান নেই। কুরআনের কোন কোন আয়াত রহিত হয়ে গেছে, কোন আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণে কোন আয়াত রহিত হয়ে গেছে, তারও কোন জ্ঞান নেই।

অথচ অত্যন্ত গর্বের সাথে বলে, আমি মুফতী। তাদের অবস্থা হল, আমরাও মানুষ, তারাও মানুষ। সুতরাং বাঁধার কি আছে? তারা যেমন ফতওয়া দিয়েছিলেন, আমরাও ফতওয়া দিব।

জনৈক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন–

تَفتُونَ بالمسائل ولو عُرِض ما دونها على عمرَ لجمعَ لها أهلَ بدرٍ —

"তোমরা এমন মাসআলার ফতওয়া নির্দ্বিধায় দিয়ে থাক, যদি তার চেয়ে সহজ কোন বিষয় উমর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত করা হত, তাহলে তার সমাধানের জন্য তিনি বদরী সাহাবীদের ডাকতেন।"

আসলেই সাহাবীদের ফতওয়া দেয়ার সময় ভয়ে চেহারা হলুদ হয়ে যেত। মনে হত, তারা যেন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন।

এক ঘটনা। একবার মরক্কোর লোকেরা ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট একজন লোককে পাঠাল চল্লিশটি মাসআলার ফতওয়া নেয়ার জন্য। এত দূর দেশ থেকে এল যে, গমনাগমনেই কয়েক মাস লেগে গেল।

লোকটি এসে ইমাম মালেক (রহঃ)-কে চল্লিশটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল। তখন ইমাম মালেক (রহঃ) মাত্র চারটি মাসআলার উত্তর দিলেন। আর বাকি ছত্রিশটি মাসআলার ক্ষেত্রে বললেন– এগুলোর জবাব আমার জানা নেই।

লোকটি বিনয় নম্র কণ্ঠে বলল, হুজুর! আমাকে যারা পাঠিয়েছে, তাদের গিয়ে কী বলব? ইমাম মালেক (রহঃ) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বললেন, গিয়ে তাদের বলবে, মালেক তা জানে না।

এ কারণেই বলা হয়–

العلم ثلاثةٌ : أيةٌ محكمةٌ و سنةٌ ماضيةٌ و لا أدرى —

"ইলম তিন প্রকার ঃ এক. চির অবধারিত আয়াত। দুই. বিগত দিনের ফয়সালাকৃত বিষয়সমূহ। তিন. "আমি জানি না" একথা বলা।"

অথচ বর্তমানে আমাদের ভাব দেখলে মনে হয় সব সমস্যার সমাধান আমাদের মুখস্থ। যে কোন ফতওয়া প্রদানে আমরা প্রস্তুত, যেন আমরা মুজতাহিদে মুতলাক।

আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আজ যদি আমরা কোন ইসলামী আইনে অনুশাসিত দেশে থাকতাম, তাহলে আমাদের গ্রেফতার করা হত। কারণ, শাসকের ক্ষমতা আছে অযোগ্য মুফতী, মূর্খ চিকিৎসক এ ধরনের লোকদের গ্রেফতার করে বন্দী করা।

মনে কর, তুমি যদি একটি চিকিৎসালয় খুলে বস; অথচ তুমি চিকিৎসা সম্পর্কে কোন লেখা-পড়া করনি। আর সাইনবোর্ডে তোমার নাম এভাবে লিখে রাখ, ডাক্তার বেলাল, বা ডাক্তার নাজীব। তাহলে প্রশাসন কী করবে? যদি তোমার নিকট কোন প্রকার সার্টিফিকেট না থাকে, তাহলে অবশ্যই তোমাকে গ্রেফতার করবে। কারণ, চিকিৎসকের পরামর্শ লোকদের জীবন-মরণের সাথে জড়িত।

তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের সন্ধান দেয় আর বলে, এটা জান্নাতের পথ, এটা জাহান্নামের পথ, এ পথে গেলে তোমাদের চির মুক্তি হবে, তাহলে কি এমন ব্যক্তির মর্যাদা ও দায়িত্ব চিকিৎসকের চেয়ে কম? নিশ্চয় নয়। তাই এই ধরনের লোকদের নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামী সরকারের দায়িত্ব।

আবূ আলী আযযারীর বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ব্যক্তি এক লক্ষ হাদীস মুখস্ত করল, তাহলে কি সে ফতওয়া দিতে পারবে? তিনি বললেন, না।

আমি বললাম, দুই লক্ষ হাদীস মুখস্ত করলে কি ফতওয়া দিতে পারবে?

আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বললেন, না।

আমি বললাম, তিন লক্ষ হাদীস মুখস্ত করলে কি ফতওয়া দিতে পারবে?

আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বললেন, না।

আমি বললাম, পাঁচ লক্ষ হাদীস মুখস্ত করলে কি ফতওয়া দিতে পারবে?

আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ) বললেন, আশা করি পারবে।

তুমি এখনই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ كتاب الأم খুলে দেখ। তার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, আমি কোন মাসআলা অবহিত হয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত না হই এবং আমার হৃদয় সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত না হয়, আমি ততক্ষণে ফতওয়া প্রদান করি না।

অথচ আমাদের অবস্থা এমন যে, আমাদের নিকট কেউ জিজ্ঞেস করলে আমরা চা আর কফি পান করা অবস্থায় নির্দ্বিধায় তার ফতওয়া দিয়ে দেই।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মাযহাবের ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাব খুলে দেখ। প্রায় মাসআলায় দেখতে পাবে, সেখানে লেখা আছে لأحمد ثلاثة أراء في المسئلة অর্থাৎ, এ মাসআলায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর তিনটি মত রয়েছে।

যাক, আমরা এখন আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাই। হযরত উমর (রাঃ) আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের শীর্ষস্থানীয়দের ডাকলেন, পরামর্শ চাইলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, আমরা কুদামাকে জিজ্ঞেস করব যদি সে মদ পান করাকে হারাম মনে করে, তবে তাকে আশিটি দোররা লাগাব। আর যদি হালাল মনে করে, তবে হত্যা করব। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যাকে হারাম করে দিয়েছেন তাকে সে হালাল করেছে। অথচ কুদামা (রাঃ) বদরী সাহাবী। বাহরাইনের গভর্নর।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা বলল, হে কুদামা! মদের ব্যাপারে তোমার মতামত কি? তিনি বললেন, মদ হারাম। আলী (রাঃ) বললেন, তাহলে তাকে আশি দোররা মারা হোক।

সুতরাং যে ব্যক্তি হারামকে হালাল করে, যে ব্যক্তি মদ উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারীদের লাইসেন্স দেয়, সে কাফির না মুসলমান? এ ব্যক্তি তো শুধু হালাল মনে করল না।

বরং তার লাইসেন্স দিল। তার অর্থ আমি তোমাকে মদ উৎপাদন করার, বিক্রয় করার ও পান করার অনুমতি দিচ্ছি। সুতরাং এই নাও তোমার লাইসেন্স। এটা তোমার দোকানে ঝুলিয়ে রাখবে। যদি তোমাকে কেউ কিছু বলে, ইসলামী আন্দোলনের কোন কর্মী তাতে বাঁধা প্রদান করে, তাহলে আমি তাকে কারাগারে বন্দী করব। যদি কেউ কোন মদের বোতল ভেঙ্গে ফেলে, তবে আমি তার শাস্তির ব্যবস্থা করব। কারণ, সে রাষ্ট্রীয় আইনকে অশ্রদ্ধা করেছে। এ ধরনের বিধান বাস্তবায়ন করার অর্থই হল, হারামকে হালাল করা। এমন করলে কোন মুসলমান আর মুসলমান থাকে না। সে কাফির হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন– যে ব্যক্তি পর নারীর দিকে তাকানোকে হালাল মনে করে, সে সর্বসম্মত মতানুযায়ী কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি বলবে, রুটি খাওয়া হারাম, সেও সর্বসম্মত মতানুযায়ী কাফির হয়ে যাবে। কেননা, সে হালাল বস্তুকে হারাম করেছে।

হ্যাঁ, তবে যদি কেউ সারা জীবন মদ পান করে আর সে তা হারাম মনে করে, তবে সে পাপী। পাপের শাস্তি ভোগ করার পর সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি একবারও বলে, মদ পান করা হালাল, তবে সে ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাবে। তার বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। তার ছেলে-সন্তানরা তার উত্তরাধিকারী হবে না। মুসলমান হিসাবে তার কোন প্রকার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। এ থেকে নিস্তার পেতে হলে তাকে প্রথমে গোসল করে কালিমা পাঠ করে নতুন ভাবে ঈমান আনতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

অর্থ : যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয়কে অবিশ্বাস করে, তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা মায়েদা ঃ ৫)

সুতরাং তাকে নতুন করে কালিমা-ই শাহাদাত পাঠ করতে হবে। নুতন করে স্ত্রীর সাথে বিয়ের আকদ করতে হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট বিয়ের এ আকদে নতুন করে মোহর দিতে হবে না।

আল্লাহর বিধানের স্থানে অন্য কোন বিধান চালু করা ও বাস্তবায়িত করার বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক পড়াশুনা করেছি। কারণ, ১৯৭২ সালে মিসরের কারাগার থেকে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কর্মীরা মুক্তি লাভ করার পর মিসরে অনেক দল উপদল সৃষ্টি হয়েছিল। তারা একে অপরকে কাফির বলে বেড়াত। একে অন্যের পিছনে নামায পর্যন্ত আদায় করত না। তাই এ বিষয়টি নিয়ে আমি দীর্ঘ পড়াশুনা করেছি। গবেষণা করেছি। তারপর আমি যে বিধানগুলোতে নিশ্চিত হয়েছি, তাহল–

১. রাষ্ট্রের কর্ণধার যদি রাষ্ট্রের জন্য এমন বিধান তৈরি করে, যা আল্লাহর প্রদত্ত বিধানের বিপরীত, তাহলে সে রাষ্ট্রপতি কাফির হয়ে যাবে। ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

২. যারা বিধান তৈরি করে, তারা যদি রাষ্ট্রীয় বিধানে নতুন কোন এমন ধারা সংযোজন করে, যা আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বিপরীত, তাহলে সেই বিধান প্রণেতারা কাফির হয়ে যাবে।

৩. রাষ্ট্রীয় বিধান সভার অর্থাৎ পার্লামেন্টের কোন সদস্য যদি এমন কোন বিধানের সাথে একমত পোষণ করে, যা আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের বিপরীত। যেমন আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তাকে যদি হালাল করে, জিহাদকে হারাম বা অবৈধ বলে, নামাযের জন্য মসজিদে জমায়েত হওয়াকে অবৈধ বলে, আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারকে অবৈধ বলে, মীরাসের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে উভয়কে সমান ভাগ দেয়, যদি দ্বিতীয় বিবাহকে অবৈধ বলে, তালাককে অবৈধ বলে; এধরনের কোন বিধানকে যদি রাষ্ট্রীয় আইনে অবৈধ করার জন্য কেউ সমর্থন করে অথচ আল্লাহ তা বৈধ করেছেন, তাহলে সে ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাবে; কাফির হয়ে যাবে।

৪. মুসলিম উম্মাহর যে কেউ আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানকে হৃষ্টচিত্তে মেনে নিবে, সেও কাফির হয়ে যাবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ جَاهَدَهم بِيَدِه فهو مؤمنٌ و من جَاهَدهم بلسانِه فهو مؤمنٌ و من جاهَدَهم بقلْبِه فهومؤمنٌ و ليسَ وراءَ ذلك مثقالُ حبَّةِ خردل منَ الإيْمانِ —

“যে ব্যক্তি হাত দ্বারা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপকে প্রতিহত করবে, সে মু'মিন। যে ব্যক্তি জিহ্বা দ্বারা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপকে প্রতিহত করবে, সেও মু'মিন। আর যে ব্যক্তি হৃদয় দিয়ে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিহত করবে অর্থাৎ মনে-প্রাণে তা ঘৃণা করবে সেও মু'মিন। এ তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্য কোন মানুষের হৃদয়ে শস্যের দানা পরিমাণ ও ঈমান নেই।”

যারা কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করে এবং নামায-রোযা আদায় করে, আবার আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানের প্রচলন ঘটায়, তাদের কাফির বললে, কেউ কেউ বিস্ময়ে মাথায় হাত দেয়। তাদের জন্য আমি বিষয়টি আরেকটু সহজ করে বলছি। যদি কেউ বলে, মাগরিবের নামায তিন রাকাত নয়– চার রাকাত, তাহলে কি সে কাফির হয়ে যাবে না? নিশ্চয় কাফির হয়ে যাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। তাহলে বলছি, এ দুই মাসআলার মাঝে কি পার্থক্য, যে বলে, চোরের শাস্তি হল দুই মাস কারাগারে বন্দী করে রাখা আর যে বলে, মাগরিবের নামায চার রাকাত?

আমি মনে করি, এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এটাও আল্লাহর বিধান। ওটাও আল্লাহর বিধান। এ উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আরেকটি উপমা দিচ্ছি। কেউ যদি বলে, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি ইসলামকে ভালবাসি। ইসলামের সকল বিধান আমি অবশ্যই পালন করব। তবে রোববারে আমি খ্রিস্টানদের গির্জায় যাব এবং খ্রিস্টানদের মত ইবাদত করব। তাহলে এ ব্যক্তি কি মুসলমান থাকবে? অথচ, সে তো সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোতে ঠিকই মসজিদে এসে নামায আদায় করছে। শুধুমাত্র রোববারে গির্জায় যাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র রোববারে গির্জায় গিয়ে ইবাদত করছে আর যে ব্যক্তি নেপোলিয়ন বা অন্য কারো রচিত বিধান অনুযায়ী বিচার প্রার্থনা করছে আর আল্লাহর বিধান ত্যাগ করছে, এ দু'জনের মাঝে পার্থক্য কি? ঠিক এ প্রসঙ্গেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

بلى، أحلّوا لهم الحرامَ و حرّموا عليم الحلالَ، فأطاعُوهم، فتلك عبادتُهم إيّاها —

অর্থ : তারা হারামকে হালাল করে নিয়েছে আর হালালকে হারাম করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে তারা তাদের অনুসরণ করেছে আর এটাই হল তাদের ইবাদত করা।

আর ইবাদতের অর্থ হল আনুগত্য করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(١٢١) وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۝

অর্থ : যে সব পশু যবাহ করার সময় তাতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না। এটা গুনাহর কাজ। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট এ প্রত্যাদেশ দেয়, যেন তারা তোমাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। (সূরা আনআম : ১২১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উস্তাদ সাইয়েদ কুতুব (রহঃ) বলেন, নিশ্চয় যারা মূর্তিপূজককে মুশরিক বলে, কিন্তু আল্লাহর বিরুদ্ধ শক্তির নিকট বিচার প্রার্থনা করে, তাদের মুশরিক বলে না, এদের ব্যাপারে সংকোচ বোধ করে আর ওদের ব্যাপারে সংকোচ বোধ করে না, আমি নিশ্চিত যে, এরা কুরআন পাঠ করে না। সুতরাং কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেভাবে পাঠ কর এবং আল্লাহর এ বাণীকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর–

وإن أطعْتُموهم إنّكم مُشركونَ —

অর্থ : যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اتّخذُوا أحبارَهم و رهبانَهم أربابًا من دونِ الله —

অর্থ : তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মের আলিম ও সংসার বিরাগী আবেদদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে আর মসীহ ইবনে মরিয়মকেও।

পূর্বে আমরা শাসক ও বিধান প্রণেতাদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি যে, যে কেউ নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর বিধানের মুকাবিলায় বিধান প্রণয়ন করল, সে যেন নিজেকে ইলাহ বলে দাবি করল। আর যারা সন্তুষ্টচিত্তে তা অনুসরণ করল, তারাও এই দাবিদার ইলাহকেই মেনে নিল। সুতরাং যে আল্লাহর বিধানের মুকাবিলায় অন্য কোন বিধান তৈরি করে ও প্রচলন ঘটায়, সে কাফির হয়ে যায়। সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। আর যারা হৃষ্টচিত্তে তা মেনে নেয়, তারাও ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। কারণ, যারা পাদ্রিদের অন্ধ অনুসরণ করেছে আর যারা আল্লাহর বিধানের মুকাবিলায় নতুন বিধান প্রণয়ন করেছে, আল্লাহ তা'আলা এ দু'দলের মাঝে কোন পার্থক্য করেননি।

সুতরাং এ উভয় কর্ম শিরক। যেমনভাবে আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে অন্য বিধানের প্রচলন ঘটানো শিরক, তেমনিভাবে ঈসা মাসীহকে বা অন্য কোন কিছুর ইবাদত করাও শিরক। এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

অর্থ : আর তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে একমাত্র এক ইলাহর ইবাদত করতে। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তারা তার সাথে যে শরীক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি পবিত্র। (সূরা তাওবা : ২১)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

(৭২) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ○ (৭৩) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

অর্থ : তারা কাফির হয়ে গেছে, যারা বলে, মাসীহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ। অথচ মাসীহ বলেছে, হে বনী ইসরাইল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর যিনি আমার ও তোমাদের রব। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। তারা কাফির হয়ে গেছে, যারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ তিনের একজন। এক ইলাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তারা যা বলে, তা থেকে যদি তারা নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যারা কাফির হয়ে যাবে, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি স্পর্শ করবে। (সূরা মায়েদা : ৭২-৭৩)

উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, হযরত ঈসা (আঃ) বনী ইসরাইলকে শিরক ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করেছিলেন। তিনি শিরক পরিত্যাগের আহবান জানিয়েছিলেন।

এই তো কিছু দিন আগের ঘটনা। বৃটেনে পাঁচজন বিশিষ্ট পাদ্রি একটি পুস্তক রচনা করে। তারা তাতে প্রমাণ করেছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র নন। তাদের এই কিতাব পাশ্চাত্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

আসলে মানব তৈরি এই খ্রিস্টবাদ সর্বদাই মানবতা বিরোধী ছিল। এখনো তা-ই। ফলে পাশ্চাত্যের জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা কখনো এ খ্রিস্টবাদকে মেনে নিতে পারেনি। মধ্যযুগ থেকেই খ্রিস্টধর্মে তীব্র মতভেদ লক্ষ্য করা গেছে। খ্রিস্টানরা ধর্মের নামে সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন করেছে। পল কুসতুনতীনসহ আরো অনেকে। আর তাদের সহায়তা করেছে রাজা-বাদশাহরা।

বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধেও এই খ্রিস্টবাদের ধ্বজাধারীরা অবস্থান নিয়ে তাদের উপর নির্যাতন করেছে। বিজ্ঞানী কোপারনিস (Copernic 1483-1543) জালীলু (Galileo), বেরুনু (Bruno 1548-1600) ভূগোল ও পৃথিবীর অবস্থান নিয়ে গবেষণা শুরু করল। তাঁরা বলল, পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবী সর্বদা ঘুরছে। তখন গির্জার এই পাদ্রিরা তাদের বিরুদ্ধে ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে রাজা-বাদশাহদের সহায়তায় নির্যাতন চালাল। পাদ্রিরা তাদের বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করল। নাম দিল 'খ্রিস্টধর্মের ভূগোল ভাবনা'। তারা সেখানে দাবী করল, পৃথিবী এ নিখিল বিশ্বের কেন্দ্র। তাই পৃথিবী কিছুতেই ঘুরতে পারে না। বরং পৃথিবী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর গোটা বিশ্ব তথা চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সব কিছু পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।

তাদের এ মতবাদের ঝগড়া গড়াতে গড়াতে বিচারালয় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। তারপর পাদ্রি, শাসক আর বিচারকদের গোপন আঁতাতে বিজ্ঞানী বেরুনুকে হত্যার ফয়সালা হল। সে ফয়সালায় শর্ত দেয়া হল, যেন হত্যাকার্য বাস্তবায়িত হওয়ার সময় তার শরীরের রক্ত মাটিতে না পড়ে। এরপর তাঁকে পুড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু তারপরও বিজ্ঞানী বেরুনু নত হননি। নিজের মত পরিহার করেননি। হত্যার ফয়সালা শুনার পর দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন– Also it's round. অর্থ : "তা সত্ত্বেও আমি বলব, পৃথিবী গোলাকার এবং তা ঘুরছে।"

বিজ্ঞানী কোপারনিস ও বিজ্ঞানী জালীলুকে বন্দী করে অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে রাখা হল। অমানুষিক শাস্তি দেয়া হল। নির্যাতনের ধারা যখন সীমা অতিক্রম করতে লাগল, তখন পাশ্চাত্যের জ্ঞানীরা ভাবতে লাগল, কিভাবে এ নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। গির্জার নির্যাতনে বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনার পর তারা সিদ্ধান্ত নিল, এ নির্যাতন থেকে বাঁচার সবচেয়ে সহজ-সরল পথ হল নাস্তিক্যবাদ। গির্জার ইলাহকে অস্বীকার করতে হবে। তাহলেই গির্জার নির্যাতন থেকে বাঁচা যাবে। এভাবে তারা নির্যাতন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিল।

কিন্তু ফলাফল কি দাঁড়াল? গির্জার নির্যাতন থেকে বাঁচতে গিয়ে মানুষ ধর্মকে অস্বীকার করল। আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করল। তারপর থেকেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি হল। বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হল। কারণ, বিজ্ঞানীরা দেখেছে, ধর্মকে সাথে নিয়ে তারা বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম চালাতে পারছে না। তাই তারা ধর্ম ত্যাগ করল। ফলে পাশ্চাত্য উন্নতির দিকে অগ্রসর হল।

একারণে পাশ্চাত্যের পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেয়, আমরা যেভাবে ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছি, তেমনিভাবে তোমরা যদি আমাদের অনুসরণ কর, তাহলে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে। অন্যথায় তোমাদের এ অগ্রযাত্রা থেমে যাবে। তোমরা পশ্চাতে পড়ে যাবে।

তাই দেখবে, মধ্যপ্রাচ্য বা প্রাচ্যের কোন মুসলমান পাশ্চাত্যে লেখাপড়া করতে গেলে সেখান থেকে সে ঠিক এই বিশ্বাসই শিখে আসে। তারা নাস্তিক হয়ে ফিরে আসে। কারণ, শিক্ষকরা তাদের তা-ই শিক্ষা দিয়েছে।

একবার এক ইউরোপিয়ান শাইখ মুহাম্মদ আবদুহুকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আপনারা কেন পশ্চাতে পড়ে রইলেন আর আমরা কেন উন্নতির দিকে অগ্রসর হলাম? উত্তরে তিনি দু'টি বাক্য বললেন, "তোমরা ছেড়ে দিয়েছ আর আমরাও ছেড়ে দিয়েছি। তোমরা তোমাদের ধর্মকে ছেড়ে দিয়েছ, যা বিজ্ঞান বিরোধী। আর আমরা আমাদের ধর্মকে ছেড়ে দিয়েছি, যা আমাদেরকে বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করে। তাই আমরা পশ্চাতে পড়ে আছি আর তোমরা উন্নতির শিখরে পৌঁছেছ।"

ইউরোপে যে দু'টি মহাবিপ্লব ঘটেছে, তাহল ফরাসী বিপ্লব (১৮৭১) ও বলসেভিক বিপ্লব। উভয় বিপ্লবের শ্লোগান ছিল ধর্ম ও খ্রিস্ট মতবাদের বিরুদ্ধে। ফরাসী বিপ্লবের শ্লোগান ছিল, "শেষ পাদ্রির নাড়ি দিয়ে শেষ বাদশাহকে ফাঁসি দাও।" এভাবে তারা রাজা এবং ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

আর বলসেভিকদের শ্লোগান ছিল, 'কোন ইলাহ নেই, মানুষ হল নিছক পদার্থ।' রাশিয়ায় ধর্মকে নির্মূল করার জন্য বলসেভিকরা বিদ্রোহ করল। খ্রিস্টান ধার্মিকদের অসতর্কতা ও অদূরদর্শিতার কারণেই তা হল। তাদের পাপাচারের কারণেই তা হল।

বিদ্রোহের পর রাশিয়ায় খ্রিস্টধর্মকে ব্যঙ্গ করে বেশ কিছু সিনেমা তৈরি হয়েছিল। তার একটির নাম ছিল 'নোংরা কুকুর'। ছবিটির নির্মাতা ছিল রাসপুতীন। তার কাহিনী সংক্ষেপ হল, জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এক শীর্ষ পাদ্রি দেখল, সে বহু নারীর কৌমার্য ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছে, যাদের অধিকাংশই ছিল রাজকন্যা, রাজার বোন বা এ ধরনের সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোক। তারা যখন প্রায়শ্চিত্ত করতে তার সাথে একান্তে নির্জন কক্ষে সাক্ষাতের জন্য এসেছে, তখনই সে তাদের সাথে অপকর্ম করেছে। এ বিষয়ে বহু চিত্র তুলে ধরে ছবিটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

এ ছবিটি রাশিয়ার সর্বত্র দেখানো হয়েছিল এবং মানুষের অন্তর থেকে ধর্মের মর্যাদা ও সম্ভ্রম চিরতরে মুছে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। এ ধরনের আরো কিছু সিনেমা তৈরি করা হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(৩১) اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ (৩২) يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ ○

অর্থ : তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মের আলিমদের ও সংসার বিরাগী আবিদদের রব হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে আর মাসীহ ইবনে মরিয়মকেও। অথচ তাদেরকে একমাত্র এক ইলাহর ইবাদত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তারা তাঁর সাথে যে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি তা থেকে পূত-পবিত্র। তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। (সূরা তাওবা : ৩১-৩২)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেই থাকবে। তারা আল্লাহর নূরকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চাইবে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ইসলাম নামক বৃক্ষের শিকড় তুলে ফেলতে চাইবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা কিছুতেই হতে দিবেন না। ইহুদী ও খ্রিস্টানরা কিছুতেই কামিয়াব হতে পারবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَيَأْبَى اللّٰهُ إِلَّآ أَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ ○

অর্থ : কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

هُوَ الَّذِىْٓ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

অর্থ : তিনিই তো তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন তাকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করার জন্য। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন– নিঃসন্দেহে অবশ্যই তা হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। বহু হাদীসে তা বর্ণিত আছে। শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী এ মর্মের বেশ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি।

এক. মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إنَّ الله زوَى الأرضَ شرقَها و غربَها و إنَّ مُلكَ أمتي سيصلُ إلى ما زُوِيَ لى منها —

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে পূর্ব-পশ্চিমের গোটা যমীনকে তুলে ধরেছেন। আর নিশ্চয় আমার উম্মতের রাজত্ব ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছবে, যে স্থান আমার সামনে আল্লাহ তা'আলা তুলে ধরেছিলেন।"

দুই. আহমদ ও দারেমী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

ليبلُغَنَّ هذَا الأمرُ ما بلغَ الليلُ و النهارُ و لا يُبقى بيتٌ من مدَرٍ و لا وَبَرٍ إلاَّ و يُدخلُه الله هذا الدينَ بعزِّ عزيزٍ و بذُلِّ ذَليلٍ عزًّا يعزُّ به دينَ الإسلامِ و ذلاًّ يذلُّ به الكفرَ —

"রাত আর দিন যেখানে পৌঁছেছে এ ধর্মও সেখানে পৌঁছবে। মাটি দ্বারা তৈরি বা পশম দ্বারা তৈরি প্রত্যেক তাঁবুতে আল্লাহ তা'আলা এ দীন প্রবেশ করাবেন– সম্মানিত বিষয়কে সম্মানিত করার মাধ্যমে আর লাঞ্ছিত বিষয়কে লাঞ্ছিত করার মাধ্যমে। এমন সম্মান দ্বারা, যা দ্বারা ইসলামকে সম্মানিত করবেন এবং এমন লাঞ্ছনার মাধ্যমে, যা দ্বারা কুফরকে লাঞ্ছিত করবেন।"

তিন. আহমদ থেকে বর্ণিত। একদা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, দুই শহরের মাঝে কোন শহরটি প্রথম বিজিত করা হবে? কনস্টান্টিনোপল না রোম? তিনি তখন একটি বাক্স আনার নির্দেশ দিলেন, যা তার নিকট ছিল। বাক্সটি আনা হলে তিনি তা খুললেন এবং তা থেকে একটি কাগজ বের করলেন। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, দুই শহরের মাঝে কোন শহরটি প্রথম বিজিত হবে? কনস্টান্টিনোপল না রোম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

بل مدينةُ هرقلَ أولاً أو القسطنطنيةُ ـــ

"বরং প্রথম হিরাক্লিয়াসের শহর বা কনস্টান্টিনোপল বিজিত হবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সাড়ে আট শত বৎসর পূর্বে এ কথা বলে গেছেন। তিনি আরো বলেছেন– যে বাহিনী তা জয় করবে, তা শ্রেষ্ঠ বাহিনী। আর তার সেনাপতি হবে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি।

সেনাপতি মুহাম্মদ ফাতেহ কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করলে তার বাহিনী তীরবিদ্ধ হয়ে আর অগ্নি তীরে জ্বলে প্রায় নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু তিনি নিরাশ হননি। তিনি বার বার এ হাদীসটির উল্লেখ করছিলেন আর কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট দু'আ করছিলেন, যেন তিনি সেই সেনাপতি হন আর তার বাহিনী যেন সেই বাহিনী হয়। পরিশেষে আল্লাহর বিশেষ কৃপায় কনস্টান্টিনোপল বিজিত হল। ভীষণ যুদ্ধের পর তা পদানত হল। সে যুদ্ধের ইতিহাস কল্প-কাহিনীর মত অবিশ্বাস্য। তারপর কনস্টান্টিনোপলের নাম রাখা হয় "ইসলামবুল" বা ইসলামের শহর। মুহাম্মদ ফাতেহ এ নাম রেখেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত উচ্চারণে তা আজ ইস্তাম্বুল হয়ে গেছে। তারা ইসলামের চির দুশমন। ইসলাম শব্দটাও তারা সহ্য করতে পারে না। মেনে নিতে পারে না। তাই খালেদ ইসলামবুলী শুদ্ধ- খালেদ ইস্তাম্বুলী শুদ্ধ নয়।

কনস্টান্টিনোপল বিজয়কালে হিরাক্লিয়াসকে তার শহরেই হত্যা করা হয়েছিল। সে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে কনস্টান্টিনোপলের পথে আহত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে লুটিয়ে পড়ে নিহত হয়েছিল। সে ছিল আপন আদর্শ ও বিশ্বাসে সুদৃঢ়। হায়! আজকের মুসলমান শাসকরা যদি খৃস্টান এই রাজার মত আপন আদর্শে অনড় হত! আদর্শ ও ইসলামের জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করত! সাড়ে আটশত বৎসর পর রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ রোম শহরও মুসলমানদের পদানত হবে। সেদিন আর খুব বেশী দূরে নয়।

এই তো কিছুদিন আগের ঘটনা। ফ্রান্সের এক খৃস্টান লেখক একটি গ্রন্থ রচনা করেছে। সে লিখেছে, আমার ধারণা, ৩০০০ সালের পূর্বে ফ্রান্স ও ইটালীতে ব্যাপকভাবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়বে। আসল কথা হল, কমিউনিস্ট পার্টির প্রখ্যাত দার্শনিক ছুলানী জারুদীর ইসলাম গ্রহণ, ফ্রান্সের প্রখ্যাত ড. মরিস বুকাইলির ইসলাম গ্রহণ, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কোসতো-এর ইসলাম গ্রহণ ইউরোপে এক মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এরা প্রত্যেকেই ইসলাম গ্রহণের পর সাড়া জাগানো পুস্তক রচনা করে সবাইকে হতচকিত করে দিয়েছেন। জারুদী ইসলাম সম্পর্কে বেশ কিছু পুস্তক রচনা করেছেন। সবগুলো পুস্তক-ই চমৎকার হয়েছে। তার একটি পুস্তকের নাম হল "ইসলাম এগিয়ে এসেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার দিন ফুরিয়ে গেছে"।

ঠিক এমনই আরেকটি পুস্তক রচনা করেছেন ইউরোপের আরেক প্রখ্যাত লেখক। পুস্তকটির নাম "শ্বেতাঙ্গদের কাল শেষ হয়ে গেছে, ইসলাম এগিয়ে আসছে।"এ কারণেই পাশ্চাত্য আফগান জিহাদকে ভীষণ ভয় করছে। তারা ভয় করছে, জিহাদের এ ধারা অব্যাহত থাকলে মুজাহিদরা মধ্য ইউরোপে এসে উপস্থিত হবে। এ বিষয়ে আমেরিকান এক প্রফেসর একটি পুস্তক রচনা করেছে। তার ভাষ্য হল, আফগানের মুজাহিদরা শীঘ্রই বিজয় লাভ করবে, তারপর তারা ইউরোপে প্রবেশ করবে। রাশিয়া পদানত করবে। যখন ইউরোপের অভ্যন্তরে পৌঁছবে, তখন আমেরিকা ইসলামকে প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

তাই আফগান জিহাদে কী ঘটছে, তার বাস্তব অবস্থা জানার জন্য আমেরিকা নিক্সনকে পাঠাল। নিক্সন এসে জিহাদের বিস্ময়কর পরিস্থিতি দেখল, আফগান জাতিকে তাওহীদে বিশ্বাসী দেখল, শুনল তাদের শ্লোগানগুলো, "জিহাদই আমাদের একমাত্র পথ, রাশিয়ার মৃত্যু অবধারিত, ইসলাম জিন্দাবাদ"। তখন সে বলল, আমি আফগান উদ্বাস্তুদের তাঁবু দেখতে চাই। সে নাসেরবাগে গেল। একজন কুঁজো লোকের সাথে সাক্ষাৎ হল। করমর্দন করার জন্য তার দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু লোকটি তার সাথে করমর্দন করতে হাত বাড়াল না।

সাথে যেসব পাকিস্তানী ছিল, তারা বলল, চাচা ইনি হলেন নিক্সন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তবুও লোকটি তার সাথে হাত মিলাল না। পাকিস্তানীরা আবার তার পরিচয় লোকটির নিকট তুলে ধরলে লোকটি বলল, এ হল নাপাক-কাফির। আমি তার সাথে করমর্দন করতে চাই না। কী বিস্ময়কর ঘটনা! যে লোকটি সউদী ত্রাণ সংস্থার সামনে একমাস দাঁড়িয়ে থেকে একটি তাঁবু নিয়ে তাতে দারুণ কষ্টে জীবন কাটাচ্ছে, সেই লোকের এমন আত্মমর্যাদাবোধ দেখে নিক্সন দারুণ বিস্মিত হল।

ইতোমধ্যে একজন বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তি নিক্সনকে বলল, ফিলিস্তিনে আপনারা কেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সাথে যোগ দিচ্ছেন? অথচ আপনারা তো এই ইহুদী জাতিকে ভালভাবেই চিনেন।

নিক্সন বলল, আমি আফগান সীমান্তে যেতে চাই। সেখানে ঘুরেফিরে বুঝল যে, আসলেই এখানে প্রকৃত জিহাদ হচ্ছে। বিভ্রান্তিকর কোন সংবাদ নয়। প্রচার মিডিয়ার কোন বাড়াবাড়ি নয়। সে আমেরিকায় ফিরে গেল। সাংবাদিক সম্মেলন করল। সাংবাদিকরা বলল, What is the problem? সমস্যাটি কী? নিক্সন বলল, Islam is the problem. ইসলামই হল আসল সমস্যা।

তারপর নিক্সন দিক নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলল, "আমেরিকার উচিত, রাশিয়ার সাথে একমত হয়ে যাওয়া, যেন আফগান জিহাদ শেষ হয়ে যায় এবং ইসলামের অগ্রযাত্রা থেমে যায়।"

অথচ আমাদের কী দুর্ভাগ্য! আমরা আফগান জিহাদকে মূল্যায়ন করতে পারলাম না। একবার এক মুসলিম যুবক কিতাবের দু'চার পাতা পড়ে আফগান জিহাদে এল। এক আফগানীর গলায় তাবিজ দেখে দারুণ ক্ষেপে গেল এবং সোজা দেশে চলে গেল। গিয়ে তার গোত্রের লোকদের বলল, এরা মুশরিক। এদেরকে যাকাত দিও না। সে এভাবে অবাস্তব কথা বলে লোকদের বিভ্রান্ত করল। সে জনৈক ব্যক্তির গলায় একটি তাবিজ দেখে সিদ্ধান্ত নিল, আফগানিস্তানের এই জিহাদ জিহাদ নয়। একে বলে অল্প বিদ্যা ভয়ংকর।

একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের সাথে কথা হচ্ছিল। আমি বললাম, আফগান জিহাদে আরবদের আসা অনেক প্রয়োজন। সে বলল, কথা ঠিক, তবে এমন আরবদের কোন প্রয়োজন নেই, যারা আমাদেরকে মুশরিক বলে বেড়ায়। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এক আলজেরিয়ান শিক্ষকের নিকট আরবী ক্লাস করেছি। মাত্র বিশ কি ত্রিশ দিনের জন্য তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রত্যেক দিন এক হাজার রিয়াল প্রদান করত। এই শিক্ষককে এক ছাত্র জিজ্ঞেস করল, আফগান জিহাদ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি তখন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বললেন, আফগানিস্তানে কোন জিহাদ নেই। সেখানে আফগান মুশরিক ও রাশিয়ার নাস্তিকদের মাঝে যুদ্ধ ও লড়াই চলছে। কীভাবে তা জিহাদ হতে পারে!

আলজেরিয়া থেকে আগত এক মুজাহিদ আমাকে বলেছে, আলজেরিয়ায় এক শিক্ষক মনে করেন, তিনি সব বিষয়েই পণ্ডিত। একদিন তাকে বলা হল, আফগান জিহাদের জন্য দান করুন। তিনি বললেন, আমি একশত রিয়াল নিয়ে তা আগুনে পুড়ে ফেলব, তবুও তা সেখানে দান করব না। এটি আফগান মুশরিক ও নাস্তিক রুশদের যুদ্ধ। এটা কোন জিহাদ নয়।

একবার এক যুবক এল। বেশ কিছু অর্থ নিয়ে এল। উদ্দেশ্য মুজাহিদদের দান করা এবং নিজেও জিহাদে অংশ গ্রহণ করা। লোকেরা বলল, আপনি শাইখ জালালুদ্দীনের নিকট যান। সেখানে গেলে জিহাদেও অংশ গ্রহণ করতে পারবেন এবং আপনার এ অর্থগুলোও যথাস্থানে ব্যয় করতে পারবেন। তিনি এখন আফগান সীমান্তে আছেন। গাড়িতে করে অনায়াসেই তার নিকট যেতে পারবেন। যুবকটি তাই করল। শাইখ জালালুদ্দীনের নিকট গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করল। শাইখ তাকে স্বাগত জানালেন। আদর-আপ্যায়ন করলেন।

আল্লাহ্ মালুম যুবক কী দেখল আর কী বুঝল। পরদিন ফিরে গেল পেশোয়ারে। যে অর্থ সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল, সবই সে নিয়ে এল। একটি পয়সাও দান করে এল না।

পরিচিত লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, কী খবর? এভাবে ফিরে এলে যে! কিছু কি ঘটেছে? যুবক বলল, না আর হল না। তার আকীদা-বিশ্বাস ঠিক নয়। ব্যস! এক কথায় সে তার সৎ ইচ্ছাটাকে বরবাদ করে দিল।

এ ধরনের লোকদের এসব মন্তব্য শুনলে দারুণ ব্যথিত হই। আক্ষেপে হৃদয়ে যেন রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এরা পায়ের উপর পা ফেলে উল্লাসে কফি পান করে, দেদারছে অর্থ অপচয় করে। অথচ আফগান জিহাদ সম্পর্কে কিছু না জেনেই বলে, এদের আকীদা বিশ্বাস ঠিক নয়। এদের দান করা যাবে না। এদের বিবেকে দংশনও হয় না যখন বলে, এদের আকীদা বিশ্বাস ঠিক নয়। এদের দান করা যাবে না। এদের বিবেকে দংশনও হয় না, যখন বলে, এরা মুশরিক, বিদ'আতী ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ অবস্থার উপমা হল, এক মহিলার চল্লিশ বৎসর বয়স হয়ে গেছে, কোন সন্তান হয় না। বহু চেষ্টা-তদবির করেছে। কিন্তু কোনই ফলোদয় হয় না। চল্লিশ বৎসর পর আল্লাহ তা'আলা তাকে একটি সন্তান দান করলেন। এই সন্তানকে এ মহিলা জীবনের সব কিছু মনে করে। এই হল তার চাঁদ। এই হল তার সূর্য। তাকে নিয়ে যে কত স্বপ্ন দেখে। মমতায় মমতায় তাকে ভরে তোলে। তখন আরেক মহিলা তার সন্তানকে দেখতে এসে বলল, তোমার এ ছেলের চোখ ডাগর হল না কেন? ছোট চোখ হল কেন?

আমাদের অবস্থা হল আমাদের এ প্রবাদ বাক্যের মত–

مَشينَا حتَّى حَفينا و بَكَينَا حتَّى عَمينا ـــ

"হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পা অবশ হয়ে গেছে আর কাঁদতে কাঁদতে আমরা অন্ধ হয়ে গেছি।"

আমরা যখন কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে লড়াই করছি, আরাম-আয়েশ, খাওয়া-দাওয়া সব ত্যাগ করছি, তখন বিলাসী সন্তানরা বলছে, এদের আকীদা বিশ্বাস ঠিক নয়! আমরা যেখানে খোঁড়া বা ট্যাঁরাচোখা সন্তান পাচ্ছি না, সেখানে অন্ধ সন্তান পাওয়াই আমাদের নিকট বিরাট পাওয়া। এটাই আল্লাহর বিরাট দান। এ ধরনের মন্তব্যের প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

(৩২) يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّآ أَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

অর্থ : তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ, আল্লাহ তো তাঁর নূরকে পূর্ণতায় পৌঁছাবেনই। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। (সূরা তাওবা : ৩২)

আফগান জিহাদকে নিশ্চিহ্ন করতে মুসলিম নামধারী নেতারা বহু ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তাদের সকল পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা আফগান মুজাহিদদের হেফাজত করেছেন। মুজাহিদ গ্রুপগুলো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর এক শ্রেণীর লোক তাদের বিচ্ছিন্ন করতেও কম ষড়যন্ত্র করেনি। এ সম্পর্কে অনেক হৃদয়বিদারক ঘটনা আছে। অন্য একদিন এসব নিয়ে আলোচনা করব।

চার. শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন। তিনি আমার উস্তাদ। আকীদা ও হাদীস শাস্ত্রে আমি তার থেকে প্রভূত ইলম অর্জন করেছি। তার থেকে সহীহ হাদীস ও জাল হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেছি। তাই জাল হাদীস দেখলেই আমার শরীর কেঁপে ওঠে। আমি তাঁর একান্ত ভক্ত ছাত্র এতে সন্দেহ নেই। তবে অনেক ফিকহী মাসআলায় আমি তার সাথে একমত নই। তবে হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি এক দুর্লভ ব্যক্তিত্ব। তার চরিত্রের এ বিষয়টি অনুস্বরণীয়। আমি কখনো তাঁকে বাতিলের সামনে নমনীয় হতে দেখিনি। কোন প্রকার আঁতাত করতে দেখিনি। তিনি ধর্মের বিনিময়ে কখনো একটি পয়সাও গ্রহণ করেননি।

তার একটি কিতাবের নাম হল صحيص جامع الصحيح সব সময় এর একটি কপি আমি কাছে রাখি। আমার ঘরেও এর একটি কপি রেখেছি। সেই শাইখ আলবানী এই বিশুদ্ধ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

تكونُ النبوَّةُ فيكم ما شَاءَ اللهُ أن تكونَ ثم يرفعُها اللهُ إذا شاء أن يرفعَها ثم تكونُ خلافةٌ على منهاج النبوة فتكونُ ما شاءَ اللهُ أن تكونَ ثم يرفعُها اللهُ إذا شاء أن يرفعَها ثم يكون مُلكا عاضًّا فيكونُ ما شاء الله أن يكونَ

ثم يرفعُها الله إذا شاء أن يرفعَها ثم يكون ملكا جَبريًّا فيكونُ ما شاء الله أنْ يكونَ ثم يرفعُها الله إذا شاء أن يرفعَها ثم تكون خلافةٌ على منهاج النبوة ثم سكتَ ، رواه الأمام أحمد بسنده —

"আল্লাহ তা'আলা যতদিন পর্যন্ত ইচ্ছে করেন তোমাদের মাঝে নবুওয়াত থাকবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছে করবেন, তা তুলে নিবেন। তারপর নবুওয়াতের আদর্শে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ তা'আলা যতদিন চান তা থাকবে। তারপর আল্লাহ যখন চান তা তুলে নিবেন। তারপর দুশ্চরিত্র লুণ্ঠনকারী বাদশাহদের উত্থান হবে। আল্লাহ তা'আলা যতদিন পর্যন্ত ইচ্ছে করেন তা তোমাদের মাঝে থাকবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছে করবেন তাদের তুলে নিবেন। তারপর পরাক্রমশালী রাজা-বাদশাহদের উত্থান ঘটবে। আর আল্লাহ যা ইচ্ছে করবেন তা হবে। তারপর আল্লাহ যখন ইচ্ছে করবেন তাদের তুলে নিবেন। তারপর আবার নবুওয়াতের আদর্শে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।"

একথা বলার পর রাসূল নীরব হয়ে গেলেন।

এ হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি, পৃথিবী শাসনধারার একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে–

حيثُ يُلقى الإسلامُ بطرتَه على الأرضِ و لا تدعُ الأرضُ شيئًا من خيراتِها إلا أنبتَتْه لا السماءُ شيئًا من خيراتِها إلا صبّتْــه —

"তখন ইসলাম তার সকল কল্যাণ ভূপৃষ্ঠে ঢেলে দিবে। পৃথিবী তার মুঠোয় কোন প্রাচুর্য রাখবে না। সবকিছুই পূর্ণমাত্রায় উৎপন্ন করবে। আকাশ তার কোন প্রাচুর্য রাখবে না, সব কিছুই ঢেলে দিবে।"

তাই আল্লাহর অশেষ দয়ায় আমরা আশাবাদী, ইসলাম ও মুসলমানরা আবার বিজয় লাভ করবে। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই এ ধর্ম বিজয় লাভ করবে। আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, সাইয়্যেদ কুতুব যখন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ المستقبل لهذا الدين (এ ধর্মের ভবিষ্যত) লিখলেন, তখন মিসরের কোন যুবকের মুখে দাড়ি ছিল না। কোন নারী হিজাব ব্যবহার করত না। কারাগারে থেকে তিনি এ গ্রন্থটি লিখেছিলেন। আমি যখন তাঁর এ গ্রন্থ পড়েছিলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল, সাইয়্যেদ কুতুব স্বপ্ন দেখছেন। কোনভাবেই আমি তাঁর কথা মেনে নিতে পারিনি। সুবহানাল্লাহ! সাইয়্যেদ কুতুবের শাহাদাতের মাত্র চার বৎসর পর প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসের মৃত্যুবরণ করল। এলো আনোয়ার সা'আদাত। তিনি এসে জনগণের উপর থেকে হাতুড়ি ও সাঁড়াশি তুলে নিলেন। তারপরই মিসরের আমজনতা আবার দীনের দিকে ফিরে আসতে লাগল। তিনি যখন এ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তখন কায়রো ইউনিভার্সিটিতে হাজার হাজার ছাত্রীর মাঝে শুধুমাত্র একটি মেয়ে শরী'আতসম্মত পোশাক পরত। আর সে হল সাইয়্যেদ কুতুবের ভাগিনী। নাম মাদীহা। এছাড়া আর কাউকে ইসলামী পোশাক পরিধান করতে দেখা যেত না। আমরা বিশ্বাস করতাম না যে, সাইয়্যেদ কুতুবের এ কথা সত্য হতে পারে। সেই আমিই তার দশ পনের বৎসর পর ১৯৭৯ বা ১৯৮০ সালে একটি গ্রন্থ রচনা করলাম। তার নাম রাখলাম الإسلام و مستقبل البشرية (ইসলাম ও মানবতার ভবিষ্যত)। আমি সে গ্রন্থে দাবী করলাম, ইনশাআল্লাহ ইসলাম তার বিজয় বার্তা নিয়ে এগিয়ে আসছে। মানবতা অতিশীঘ্রই পৃথিবীতে রাজত্ব কায়েম করবে। আমি সে গ্রন্থে চারটি সুসংবাদ দিয়েছি। ১. একমাত্র এ ধর্মের বিধানই মানুষের প্রকৃতিগত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। ২. প্রকৃতি বিরোধী পাশ্চাত্য সভ্যতা শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। ৩. কুরআন ও সুন্নাহ হল সুসংবাদ। ৪. ইসলামী জাগরণ ও জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ ক্রমে ইসলামের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অন্ধকার পশ্চাতে ফেলে আলোকমালার দিকে ছুটে আসছে।

চতুর্দশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٣١) اتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلاَّ لِيَعْبُدُوٓا إِلٰهًا
وَّاحِدًا لَّآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ (٣٢) يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ
يُّتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ○ (٣٣) هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ
كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○ (٣٤) يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ○ (٣٥) يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا
كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○

অর্থ: তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মের আলেম ও সংসার বিরাগী আবেদদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং মাসীহ ইবনে মারইয়ামকেও। অথচ তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র এক ইলাহর ইবাদত করার। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তারা যে শিরক করছে, তা থেকে তিনি পূতপবিত্র। তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তার নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন যদিও কাফেররা তা অস্বীকার করে। তিনিই তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন সকল ধর্মের উপর বিজয় প্রদানের জন্য। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। হে মু'মিনরা! নিশ্চয় ইহুদীদের আলেম ও খৃস্টানদের সংসার বিরাগী আবেদদের অনেকেই অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ খাচ্ছে এবং আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও চাঁদি পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে। (সেদিন বলা হবে) এগুলোইতো তোমরা তোমাদের জন্য পুঞ্জিভূত করেছিলে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জিভূত করেছিলে, তার স্বাদ আস্বাদন কর।

(সূরা তাওবা : ৩১-৩৫)

حِبْرٌ বা حَبْرٌ শব্দের বহুবচন হল– أَحبارٌ এজন্য হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে বলা হয় حَبر هذه الأمة অর্থ : "এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ আলেম, সুবিজ্ঞ পণ্ডিত"। আরবী ভাষার তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন–

سُمِّيَ حَبرًا أو حِبرًا لأنه يحَبِّرُ الكلام أي يُحْسنه و يُتقِنُه و ينظِّمُه —

অর্থ : আলেম ও ধর্মীয় জ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তিকে حِبرٌ বা حَبرٌ একারণে বলা হয় যে, তিনি তার বক্তব্যকে সুশোভিত, মজবুত ও সুবিন্যস্ত রূপে পেশ করেন।

আর আরবী ভাষায় حِبرٌ এর একটি অর্থ হল কালি। এর কারণ আলেমরাই লেখালেখির কাজ অধিক করে থাকেন, তাই রূপকভাবে কালিকেও حِبْرٌ বলা হয়। আর رهبانٌ শব্দটির একবচন হল راهبٌ তার অর্থ হল খৃস্টান ধর্মের সংসার বিরাগী আবেদ। যারা সাধারণত নির্জন গুহায়, বনে-জঙ্গলে গিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়। أحبار। رهبانٌ শব্দ দু'টি ব্যবহার করার কারণ হল, কোরআন সাধারণত প্রেক্ষাপটের বিস্তৃত আলোচনা

করে। ইহুদীদের মাঝে ধর্মীয় জ্ঞানে পণ্ডিত ও আলেমের সংখ্যা অধিক ছিল, তাই তাদের আলোচনায় أحبار শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর খৃস্টানদের মাঝে সংসারবিরাগী আবেদদের সংখ্যা অধিক ছিল। তাই তাদের প্রসঙ্গে رهبان শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এ শব্দ দু'টি দ্বারা ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তিত্ববান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে।

আসল কথা হল, খৃস্টান ধর্ম ইবাদাতের দিকেই আহবান করার জন্য এসেছে। মানুষকে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল করতে আর দুনিয়া থেকে বিমুখ করতে এসেছে। কারণ রোম সাম্রাজ্যে তখন ভোগ, বিলাস, অহংকার আর আত্মমর্যাদার প্রতিযোগিতায় মানুষ বিভোর হয়ে পড়েছিল। আর হযরত ইসা আলাইহিস সালাম রোম সাম্রাজ্যের উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন। রোমানরা তখন বিলাসী জীবন ও রকমারি পানাহারে আত্মনিমগ্ন। পোষাক পরিচ্ছদ ও ফ্যাশন চর্চায় তারা ভীষণ ব্যস্ত। আনন্দ-উল্লাস, ভোগ-বিলাসে তারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। তাদের ভোগ-উন্মাদনা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে হিংস্র পশুর চেয়েও অধম বানিয়ে ছেড়েছে। তারা ক্ষুধার্ত বাঘ বা সিংহের খাঁচায় অসহায় বনী আদমকে ছেড়ে দিয়ে দেখত, কীভাবে সিংহরা মানুষকে ছিড়ে ছিড়ে খায়। এমনকি বিষয়টা রোমানদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট পরিবারের লোকেরা, পদস্থ ও উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা প্রায়ই এই আনন্দ ও উল্লাস মেলার আয়োজন করত। তারা কোন হৃষ্টপুষ্ট বন্দীকে নিয়ে এসে সিংহের খেলার ও আহার্যের বস্তু হিসেবে তার খাঁচায় ঢুকিয়ে দিত।

অতঃপর নিরাপদ দুরত্বে থেকে তারা এ হিংস্র খেলা উপভোগ করত। কীভাবে আত্মরক্ষার জন্য সে চেষ্টা করে, সিংহ কীভাবে তার মাথার খুলি ছিড়ে নিয়ে চিবিয়ে খায়, কীভাবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করে। তারা এসব দৃশ্য দেখত আর করতালি ও আনন্দ-চীৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলত। সেই রোমান সভ্যতাই বর্তমান ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান সভ্যতার মূল উৎস ও সূতিকাগার। এজন্য তুমি দেখতে পাবে, আমেরিকানরা অসহায় মানুষদের নির্যাতনমূলক ছায়াছবি দেখতে বেশী পছন্দ করে। নির্যাতন ও নিপীড়ন করার দৃশ্য দেখে তারা আনন্দিত হয়। এরা সেই রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকারী, যারা অসহায় বন্দীদের বাঘ আর সিংহের খাঁচায় ছেড়ে দিয়ে তাদের সকরুণ মৃত্যুর দৃশ্য উপভোগ করত। আমেরিকান আর ইউরোপিয়ানদের জীবনই হল প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা। খাহেশাতের পূজা করা। রোমানদেরকে এই প্রবৃত্তির পূজা এমন অন্ধ ও বধির বানিয়েছিল যে, তারা রোমের শ্রেষ্ঠ মদ উৎপাদনকারী রাখুসকে মদের ইলাহ নির্ধারণ করে পূজা করত। রোমের শ্রেষ্ঠ বেশ্যা, দেহ পসারিনী ছিল "যীনত"। রোমের লোকেরা তাকেই সৌন্দর্যের দেবী রূপে পূজা করত। তারা আফ্রোদীতকে দেবী বানাল। অথচ তার সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে যে, সে তিনজন দেবের সাথে যিনা করেছে। তারপর তার এক পুত্র হয়েছে। সে হল প্রেম-পুত্র। তার নাম "কিওয়াবীদ"।

পরবর্তীতে তারা কিওয়াবীদকে প্রেম-দেবতা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এমনিভাবে আফ্রোদীত ও দাওয়ালীকও তাদের প্রেম-দেবতার আসন গ্রহণ করে। ওদের বারযনিফের লোক কাহিনীটি ভারি চমৎকার। বারযনিফ নাকি পবিত্র অগ্নি দেবতার প্রহরী ছিল। তবে বারযনিফ ছিল সত্যানুসন্ধানী। বাস্তব ও প্রকৃত বিষয়ের প্রত্যাশী। তাই সে সাধনা করতে করতে ইলাহের নূরের মা'রিফাত হাসিল করে ফেলল। এরপর অন্যান্য দেবতা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে এক নির্জন স্থানে নিক্ষেপ করল। তাকে বন্দী করে তার উপর পক্ষীকুলকে লেলিয়ে দিল। পক্ষীকুল দিবসে এসে তার মস্তক ও চক্ষু ঠুকরে ঠুকরে খেত।

রাতের অন্ধকারে দেবতারা এসে আবার তার শরীরের গোশত ফিরিয়ে দেয়। এটা তার শাস্তি। এভাবে দেবতারা তাদের আক্রোশ মিটায়। প্রতিশোধ নেয়। রোমান সভ্যতা আর ইউরোপিয়ান সভ্যতার এই হল প্রকৃতি। যারা দেবতাকে মানুষের চেয়ে উত্তম মনে করে– যে দেবতারা যিনা করে। সত্যানুসন্ধানী মানুষ থেকে প্রতিশোধ নেয়। সেই নাপাক গন্ধময় সভ্যতার আজ উত্তরাধিকারী হয়েছে বর্তমানের ইউরোপিয়ান সভ্যতা আর আমেরিকান সভ্যতা।

আমেরিকার কথা ভাবলে বিস্মিত হই। প্রথম পর্যায়ে আমেরিকা ছিল এক দল চোর-ডাকাত আর লম্পটের আস্তানা। ইউরোপের জনগণ দুষ্ট লোকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা জীবন বাঁচাতে আমেরিকায় গিয়ে আস্তানা বেঁধে ছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার পর দলে দলে সাম্রাজ্যবাদী লোকেরা সেখানে ছুটে যায় এবং সেখানকার আদি অধিবাসীদের উপর নির্যাতন শুরু করে। লুটতরাজ, হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের প্রায় শেষ করে ফেলে। এখন আদি আমেরিকান মাত্র কয়েক মিলিয়ন খুঁজে পাবে। এরা আজ যাদুঘরের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। গবেষণার বস্তুতে রুপান্তরিত হয়েছে। আমেরিকানদের তাদের দেশে দেখতে পাবে যেন ফেরেস্তা। এই ব্রিটিশদেরও দেখতে পাবে যেন ফেরেস্তা। সাধু পুরুষ। কিন্তু এরা যখন ফিলিস্তিন বা ভারত দখল করতে আসে তখন দেখতে পাবে এদের হিংস্রতা। এদের অবস্থা, চিন্তা-চেতনা আর চরিত্র প্রাচীন রোমানদের মতই, যারা নিজেদের উন্নতি অগ্রগতি ও প্রয়োজনের জন্য সাধারণ জনগণের রক্ত চুষে নিত।

এই ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনীদের উপর কী ভয়াবহ নির্যাতন করেছিল তা কি একবার ভেবে দেখেছো? হয়তো দেখা গেল, কোন ব্রিটিশ সৈন্য তার অস্ত্র পরীক্ষা করবে, সে তখন পাথর কুড়িয়ে দূরে স্থাপন না করে কোন ফিলিস্তিনী যুবককে ধরে আনে এবং তার উপর গুলি নিক্ষেপ করে নিশানা করত। ব্রিটেনে দেখতে পাবে, পত্রিকা বিক্রেতারা তার দোকান খুলে সকালে তাতে 'TIMES' ইত্যাদি পত্রিকা রেখে যায়। তারপর সন্ধ্যায় ফিরে এসে দেখে তার পত্রিকাগুলো বিক্রি হয়ে গেছে এবং তারা বিক্রেতার অনুপস্থিতিতেই মূল্য রেখে গেছে। কেউ কম দিয়ে যায়নি। কিন্তু সেই ব্রিটিশরাই যখন ফিলিস্তিনে আসে, তখন একেবারে হিংস্র পশু হয়ে যায়। দেখতে পাবে, কোন ফিলিস্তিনীর বাড়ীতে প্রবেশ করে পরিবারের কর্তাকে গ্রেপ্তার করে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। তারপর চাবুক মারতে লাগল। তারা অসহায়। আত্মরক্ষার কোন উপায় তাদের নেই। অর্থ-সম্পদও নেই। তাই দেখা যাবে স্ত্রী তার গলার অলঙ্কার দিয়ে গৃহকর্তাকে মুক্ত করতে প্রয়াস চালাচ্ছে। এ ধরনের হাজার হাজার ঘটনা ফিলিস্তিনের অসহায় পরিবারবর্গের উপর ঘটে গেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক বৃটিশ গোয়েন্দাকে বলা হত, "মুকুটহীন আরবপতি"। লোরান্স নামের সেই গোয়েন্দা তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহে উৎসাহিত করে আরব থেকে তুর্কীদের তাড়িয়েছিল। সে একটি গ্রন্থ লিখেছিল। তার নাম أعمدة الحكمة السبعة। সে তার সেই গ্রন্থে লিখেছিল, "আমি অত্যন্ত অহংকারী দৃঢ়চেতা আর গর্বিত ব্যক্তি। আমি ত্রিশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু কোন যুদ্ধে কোন ইংরেজের গায়ের রক্ত ঝরতে দেইনি। কারণ, আমার নিকট একজন ইংরেজ সৈন্যের গায়ের রক্ত গোটা আরব জাতির চেয়ে বেশী দামী।"

একজন ব্রিটিশ অফিসার যখন ভারতে আসত, তখন সে তার ঘোড়ায় উঠার সময় পাদানীতে পা রাখত না। বরং কোন ভারতীয় তার সামনে এসে নত শিরে দাঁড়াত আর সে তার পিঠে পা রেখে ঘোড়ায় চাপত। কথা প্রসঙ্গে ইদি আমীনের কথা এসে গেল। ইদি আমীন একজন মুসলমান। আত্মবিশ্বাসী মুসলমান। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর এক শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক। একজন সেনাপতি। তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলেন। তাঁর আত্মমর্যাদা ছিল খুব প্রখর। লাঞ্ছনাা, অপদস্ততাকে মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। তিনি দেখলেন, কিছু ব্রিটিশ খৃস্টধর্ম প্রচারকদের সাথে মিলে উগান্ডার সাধারণ জনগণের রক্ত চুষে খাচ্ছে। উগান্ডার অধিবাসীরা যেন তাদের পোষা গাধা। যেমন ইহুদীরা মনে করে, অন্যান্য জাতিকে আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ জাতি– ইহুদীদের সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই যখন কোন গাধা সেবা করতে করতে শেষ হয়ে যাবে, তখন আমরা অন্য একটি গাধায় আরোহণ করব। বৃটেনের ইংরেজরাও উগান্ডার সাধারণ জনগণকে তাই মনে করত, তারা তো গাধা, শ্বেতাঙ্গ বৃটিশদের সেবার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

কিন্তু ইদি আমীন তাঁর দেশ থেকে এই ব্রিটিশদের তাড়াতে ইচ্ছে করলেন। পশ্চিমাদের প্রতি তাঁর এই প্রতিবাদী মানস তিনি জন্মগতভাবেই পেয়েছিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, ব্রিটিশরা যেন তার দেশ ছেড়ে অন্যত্র

চলে যায়। তিনি তার অনুগত গোত্রের লোকদের বললেন, তোমরা এদের কাঁধে চেপে বস। সত্যই ঘটলও তাই। টেলিভিশনে এসব দৃশ্য প্রচার হল। ইদি আমীন ধর্ম প্রচারক খৃস্টানদের আর পশ্চিমাদেরকে তার দেশ থেকে বের করে দিলেন। পাশ্চাত্যের টনক নড়ল। তারা তানজানিয়ার শাসক পাদ্রী জোলিউসকে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিল। তানজানিয়া আসলে দু'টি দেশ ছিল। যানজাবার ও তানজানিক। যানজাবারের সকল অধিবাসী মুসলমান। বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় তারা কথা বলত। তার শাসক ওমানের রাজ বংশের লোক। পশ্চিমারা এ দেশ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের চিহ্ন চিরতরে মুছে ফেলতে ষড়যন্ত্র শুরু করল। তারা সেখানে কমিউনিস্ট বিপ্লব সৃষ্টি করল। হাজার হাজার যানজাবারবাসীকে তারা নির্দয়ভাবে হত্যা করল। তারপর চিরতরে ইসলামের আলো মিটিয়ে দেয়ার জন্য তারা যানজাবারে বহু মূর্তিপূজক ও খৃস্টানদের আবাসের ব্যবস্থা করল। উদ্দেশ্য, যেন যানজাবার তানজানিকের মাঝে লীন হয়ে যায়। তারপর বিশ্ব মানচিত্র থেকে যানজাবারের নাম মুছে ফেলল। দু'দেশ মিলে একটি দেশ হল। তার নাম তানজানিয়া। অতঃপর প্রখ্যাত খৃস্টধর্ম প্রচারক জোলিউস নারীবীকে তার শাসক বানিয়ে দেয়। আমার স্মৃতিশক্তি যদি ভুল না করে, তাহলে আমার মনে হচ্ছে এই জোলিউস মুসলমান ছিল। শৈশবেই তাকে গির্জায় নিয়ে যাওয়া হয়, তার নাম পাল্টে ফেলা হয়। তার নাম ছিল মুহাম্মদ। তারা তাকে খৃস্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে তার দেশের শাসক বানিয়ে পাঠাল। এবার জোলিউস উগান্ডায় আক্রমণ করতে প্রস্তুত হতে লাগল। তার প্রতিজ্ঞা, যেভাবেই হোক ইদি আমীনকে ক্ষমতা থেকে তাড়াতে হবে।

ইদি আমীন দূরদর্শী, বিচক্ষণ। তদুপরি সৈনিক। তার বুদ্ধি হল পেশীতে। যখনই বুঝতে পারল যে তানজানিয়া আক্রমণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে তখনই সে তার বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল। তানজানিয়ার বিরাট অঞ্চল পদানত করে একেবারে দারুস সালামের উপকণ্ঠে গিয়ে পৌছাল। তানজানিয়ার রাজধানী দারুস সালামের পতন হয় হয় অবস্থা।

এবার পাশ্চাত্য জগৎ চিৎকার শুরু করল। আমেরিকা আনোয়ার সা'আদাতকে বলল, আমরা তোমাকে মিসরের শাসক বানালাম এখন তুমি চুপ করে বসে আছো কেন? যাও! সৈন্য পাঠাও। নাসীরীকে বলল, যাও, তুমিও যাও। ইদি আমীনকে ফিরিয়ে আন। নাসীরী ছুটে গেল। ইদি আমীনকে বলল, তানজানিয়া থেকে ফিরে আস। ইদি আমীন বলল, এরা উগান্ডা আক্রমণ করতে চায়। নাসীরী বলল, আমি এ দায়িত্ব নিলাম যে, তারা তোমার দেশের সীমান্তও স্পর্শ করতে আসবে না।

ইদি আমীন তানজানিয়া থেকে ফিরে এল। ঠিক তার পর দিন মিসর আর আলজেরিয়ার বিমান আক্রমণে উগান্ডার পতন ঘটল। খৃস্টানরা উগান্ডার শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিল। এরপর সাত বৎসর উগান্ডার মুসলমানদের উপর নির্যাতন আর নিপীড়নের স্টীম রোলার চলল। পথে-প্রান্তরে মুসলমানদের কারণে অকারণে হত্যা করতে লাগল।

কুম্বালার ঘটনাটির কথা আমার বেশ মনে পড়ে। উগান্ডার এই অরাজকতার সময় এক ব্রিটিশ বৃদ্ধা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। সেই বৃদ্ধা নারীর সম্পর্কে পাশ্চাত্য আর বৃটেনের পত্র পত্রিকাগুলোতে জোরে-শোরে লেখালেখি হতে লাগল। অথচ সেই পত্রিকাগুলো হাজার হাজার নিহত মুসলমানের সম্পর্কে কিছুই লিখল না। একেবারে নীরবতা পালন করল। জনৈক কবি চমৎকার দু'টি চরণ আবৃত্তি করেছে।

قتل أمرء في غابة جـــــريمة لا تغتفر

قتل شعب كامـــل قضيـــــة فيها نظـــرٌ

অর্থ : জন বিরল অরণ্যে একজন মানুষের নিহত হওয়া এমন এক অপরাধ যা ক্ষমা করা যায় না। অথচ একটি জাতিকে হত্যা করা এমন এক সমস্যা যাতে চিন্তার বিষয় রয়েছে।

আসলে মিসরের প্রকৃতিই মনে হয় এমন। প্রাচুর্যের দেশ হওয়া সত্তেও মিসর সর্বদা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধ-শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে চলে। যারা নির্বিচারে নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যা করে, মিসর

কেন জানি তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। যুগোস্লাভিয়ায় যখন জেনারেল টিটু মুসলমানদের উপর জুলুম করছিল, মিসর তখন জেনারেল টিটুর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাশিয়ায় যখন মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছিল, তখন মিসর ছিল রাশিয়ার পাশে। সাইপ্রাসেও একই কাণ্ড ঘটল। খৃস্টান পাদ্রী মাকারিউস তুর্কী মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আক্রমণ শুরু করে। পাদ্রীর নেতৃত্বে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হল। মিসর সেই পাদ্রীর পাশেই দাঁড়াল। মিসরের সেনাবাহিনীর এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে, সাইপ্রাসের ট্র্যাজেডিতে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা যে কত মসজিদ মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছি, তা বলতে পারব না। মিসরের এই চরিত্র, এই গতি-প্রকৃতির কথা বিশ্বের সচেতন চিন্তাশীল মানুষ জানে।

আলহাজ্ব আহমদ বাল্লু। উত্তর নাইজেরিয়ার এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তার হাতে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তার প্রচেষ্টায় নাইজেরিয়া ইসলামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তার কার্যক্রম, উদ্যোগ ও ব্যক্তিত্বের কারণে রাবেতা আলমে ইসলামী তাকে বিশেষ সদস্যপদ প্রদান করেছিল। তিনি তার দেশ উত্তর নাইজেরিয়া থেকে ইসরাইলী চরদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইসরাইলী দূতাবাস পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ইসরাইল তখন আফ্রিকার টুটি চেপে ধরেছিল। তার শেষ রক্তবিন্দু শুষে নিচ্ছিল। কিছু সুন্দরী রুপসী নারী দ্বারা তারা আফ্রিকা শাসন করছিল। প্রায় প্রত্যেকটি দেশের শাসকের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিয়োগ পেয়েছিল এক একজন রুপসী সুন্দরী ইহুদী। সোনালী চুল। নীল চক্ষু। ঠোঁটের কোণে লেগে থাকে মিষ্টি মধুর হাসি। এ ধরনের নারী দ্বারা গোটা আফ্রিকা তারা পদানত করে নিয়েছিল। কিন্তু আহমদ বাল্লুকে তারা বাগে আনতে পারল না। তিনি ইহুদীদেরকে দেশ থেকে বের করে দিলেন। নীতিগতভাবে তিনি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন চিন্তার অধিকারী ছিলেন। একবারের ঘটনা। বাইতুল মুকাদ্দাস তখন জর্দানের শাসিত এলাকা। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস যিয়ারত করতে এলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোন ব্যক্তি তাকে স্বাগত জানাতে এলো না। কেউ তার সাথে সাক্ষাৎ করতেও এলো না। তিনি বললেন, ব্যস, চিন্তার কিছু নেই। ইনশাআল্লাহ বাইতুল মুকাদ্দাসে বিজয়ী বেশে আসব। তিনি মসজিদে আকসা যিয়ারত করে ফিরে এলেন। মিসরের প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসেরের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর দেশে ফিরে এলেন।

এদিকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছিল। গভীর ষড়যন্ত্র। আমেরিকা, ফ্রান্স ও বৃটেন তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর এক ব্যক্তিকে উসকে দিল। তার নাম ইরিনী। সে একরাতে তাকে তাঁর গৃহ থেকে তুলে নিয়ে এলো। তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল। তার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে আটকে রেখে তার বাড়ী জ্বালিয়ে দিল। অতঃপর একজন খৃস্টানের হাতে দেশের শাসনভার সমর্পিত হল।

আমার এক পরিচিত বন্ধু কুটনৈতিক কাজে তখন সেখানে ছিলেন। তিনি এক সম্ভ্রান্ত আরব। সরাসরি তিনি আমাকে বলেছেন– আফ্রিকার এক ব্যক্তিত্বশালী প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমরা মিসরের প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসেরের নিকট একটি প্রতিনিধি দল পাঠালাম। তারা আহমদ বাল্লু নিহত হওয়ার পর উত্তর নাইজেরিয়ায় মুসলমানদের করুণ অবস্থার কথা তার নিকট তুলে ধরবে। খৃস্টানরা যেভাবে নির্বিচারে মুসলমানদের হত্যা করছে, নির্যাতন করছে, তার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাবে।

প্রতিনিধিদল আব্দুন নাসেরের দরবারে গেল। তারা তার আগমনের অপেক্ষা করতে লাগল। আব্দুন নাসের এসে প্রথম যে কথা বলল, তাহল, 'আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তোমাদেরকে পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্তিদান করেছেন।'

প্রতিনিধিদল তার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা আব্দুন নাসেরের সাথে আর একটি কথাও বলল না। হতাশ হৃদয়ে, ব্যথিত অন্তরে ফিরে এল। আসল কথা, ইউরোপিয়ান সভ্যতার উৎস হল রোমান সভ্যতা। আর রোমান সভ্যতা অন্যকে নির্যাতন-নিপীড়ন করা ও প্রবৃত্তির পেছনে ছুটে চলার ও প্রবৃত্তিকে তুষ্ট করার দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আর এমন দু'টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা তাদেরকে ইলাহী ধর্মের শত্রু বানিয়ে ছেড়েছে। এক. তারা বিশ্বাস করে, দেবতারা মানুষ থেকে প্রকৃত বিষয়গুলো লুকিয়ে রাখতে চায় আর মানুষ তা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। দুই. মধ্যযুগে খৃস্টানরা সাধারণ মানুষের সাথে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করেছে যে, মানুষ গির্জা ও ইলাহ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

আসলে ইউরোপে যে খৃস্টধর্ম প্রচারিত হয়েছে, তা হযরত ইসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ প্রকৃত খৃস্টধর্ম নয়। বরং হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর এক ইহুদী খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। সে কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) কে দেখেনি। তার সাহচর্যও অবলম্বন করেনি। তার নাম পল। সে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার পর খৃস্টধর্মের সাথে গ্রীক দর্শনের মিশ্রণ ঘটালো, গ্রীক দর্শন বিষয়ে তার পাণ্ডিত্ব ছিল। ঈসা (আঃ)-এর আনীত তাওহীদের ধর্মের সাথে শিরকের মিশ্রণ ঘটালো। তাই ইউরোপে কখনো নিরেট তাওহীদ ও একত্ববাদের ধর্ম পৌছেনি। শুরু থেকেই শিরকসহ খৃস্টধর্ম ইউরোপে প্রবেশ করল। শুরু হল এ ভেজাল খৃস্টধর্মের সাথে রোমান সাম্রাজ্যের বিরোধ। এ বিরোধ ক্রমে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ও যুদ্ধের রূপ লাভ করল। এমনকি সম্রাট হাইদায়ান ও তিরাজনের শাসনামলে খৃস্টানদের নির্বিচারে হত্যা করা হলো। যেখানেই খৃস্টানদের খুঁজে পাওয়া গেল সেখানেই হত্যা করা হল। বিষয়টি কিন্তু শেষ হয়ে গেল না। হত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে রোমান সাম্রাজ্য থেকে খৃস্টধর্মকে উৎখাত করা গেল না। বরং ক্রমেই তা শক্তিশালী হয়ে উঠল। সম্রাট কুসতুনতীনের আমলে তা প্রচণ্ড আকার ধারণ করল।

সম্রাট কুসতুনতীন দেখল, এ বিরোধ চলতে থাকলে শীঘ্রই সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে যাবে। সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়বে। তাই সে সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করল। সে কিন্তু হৃদয় দিয়ে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেনি। তাই দেখা গেছে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে মদ আর নারী নিয়ে মেতেছিল। সে খৃস্টধমের আদর্শ ও শিক্ষার কোন তোয়াক্কা করেনি।

সম্রাট কুসতুনতীন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার পর সাম্রাজ্যের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদের পদের লোভে এবং সম্রাটকে খুশি করার লক্ষ্যে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করল। এরা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলেও জীবনযাত্রায় তাদের কোন পরিবর্তন এল না।

এদিকে খৃস্টধর্মের নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা দেখল, খৃষ্টধর্মের নেতৃত্ব এখন সম্রাট ও সাম্রাজ্যের উঁচু শ্রেণীর লোকদের হাতে চলে গেছে এবং তারা খৃস্টধর্মের বিষয়ে পরিবর্তন করছে। তারা তা নীরবে সহ্য করল। অবশ্য এ ছাড়া তাদের করার কিছু ছিল না। তবে তারা আশা করেছিল যে, ভবিষ্যতে অবশ্যই খৃস্টধর্ম তাদের খপ্পর থেকে মুক্তি পাবে এবং বিশুদ্ধ, নির্মল ও প্রকৃত অবস্থায় ফিরে আসবে। কিন্তু সে সময় আর ফিরে আসেনি। তাই ঐতিহাসিকরা বলেন, পাদ্রী পল সর্বপ্রথম খৃস্টধর্মের বিশ্বাস ও আদর্শে আঘাত হেনেছিল।

তারপর সম্রাট কুসতুনতীন, তার সভাসদ ও সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে দ্বিতীয় আঘাত হেনেছিল। কারণ, এরা সারাজীবন মদ, নারী আর ভোগ-বিলাসে কাটিয়েছিল। সম্রাট কৌশলগতভাবে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলেও তার সভাসদরা শুধু পদের লোভে ও সম্রাটের শুভ দৃষ্টির আশায় খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাই তাদের জীবনযাত্রায় কোন পরিবর্তন আসেনি। ফলে খৃস্টধর্ম সাম্রাজ্যের বেড়াজালে আটকে গেল। তার আদর্শ, শিক্ষা ও আকীদা-বিশ্বাস থেকে খৃস্টানরা দূরে সরে পড়ল। খৃস্টধর্মের এ করুণ অবস্থা দেখে একনিষ্ঠ খৃস্টানরা লোকালয় ছেড়ে নির্জন গির্জায় চলে গেল। সেখানেই তারা ইবাদত বন্দেগীতে জীবন কাটাতে লাগল। ফলে কুসতুনতীন ও তার সহচররা খৃস্টধর্মকে নিয়ে যা খুশি তাই করল।

খৃস্টধর্মে তৃতীয় আঘাত হেনেছে স্বার্থান্বেষী মানুষেরা। যারা ধর্ম ও গির্জার নামে ব্যবসা করেছে। মানুষের অর্থ-সম্পদ লুটে নিয়েছে। মানুষের উপর অন্যায় কর চাপিয়ে দিয়েছে। পাদ্রীরা নিয়ম করেছিল, সপ্তাহে একদিন বিনা পারিশ্রমিকে গির্জার কাজে শ্রম দিতে হবে। গির্জাগুলো তখন জনগণের বিরুদ্ধে রাজা-বাদশাহদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতো। আর রাজা-বাদশাহদের নির্দেশ মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য। কারণ, তাদের বিশ্বাস,

জনগণকে শাসন করার জন্যই আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন। এভাবে চলতে চলতে এক সময়ে গির্জার পাদ্রীরা জান্নাত বিক্রি করতে শুরু করল। নাম্বার বসিয়ে জান্নাত বেচাকেনা শুরু হলো। যেমন ব্যবসায়ীরা প্লট বিক্রয় করে থাকে। কোন নাম্বারের প্লটের পর কোন নাম্বারের প্লট হবে। মালিক কে হবে। নামধাম কি ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখা যায়, সরকারী লোকেরা কোন এলাকা নির্বাচন করে তার ড্রইং করে। সে অঞ্চলের কোথায় কি হবে। রাস্তা কত ফুট প্রশস্ত হবে। বিমানবন্দর, মার্কেট ইত্যাদি কোথায় কি হবে। এসব পরিকল্পনার পর তারা সে অঞ্চলের জমি পানির মূল্যে মালিকদের থেকে কিনে নেয়। তারপর তা স্বর্ণের মূল্যে বিক্রয় করে। পাদ্রীরা এর চেয়েও জঘন্য পদ্ধতিতে ও উচ্চমূল্যে দুনিয়ায় বসে জান্নাতের প্লট বিক্রয় করা শুরু করেছিল।

এরপর পরিস্থিতি আরো জঘন্য রূপ ধারণ করল। দেখা গেল, প্রকাশ্যে কেউ পাদ্রী, খৃস্টান ধর্মগুরু ও বিদ্বান ব্যক্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ইহুদী বা মাসূনী। ইহুদীরা বিস্ময়কর কৌশলে খৃস্টানদের ধর্মীয় পদগুলো লুটে নিয়ে তাদের পরিচালনা করতে শুরু করল। অথচ খৃস্টানরা তার খবরও জানল না।

যদি কখনো দেখা যায়, কোন পাদ্রী ইহুদীও নয়, মাসূনীও নয়, অথচ সে খৃস্ট জগতের শীর্ষধর্মীয় নেতা হয়ে গেছে। ইহুদীরা তাকে বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে বাগে আনার চেষ্টা করবে। কিন্তু একের পর এক সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা হিংস্র হয়ে উঠবে। এক বা দু'মাসের মধ্যেই তাকে হত্যা করে ফেলবে। কিছু পত্রিকায় এ কথাও প্রচার হবে যে, গুপ্তঘাতকের হাতে তিনি নিহত হয়েছেন। তারপর হয়তো তার স্থলে পোল্যান্ডের কোন পাদ্রীকে ঐ আসনে সমাসীন করা হবে। তারপর যখন ঐ পাদ্রী পোল্যান্ডে যাবে সে সর্বপ্রথম ইহুদীদের উপাসনালয়ে যাবে। আর সেই গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত পাদ্রীর সৎকারে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে অনুষ্ঠান করবে। কারণ, গির্জাগুলো প্রচুর সম্পদের মালিক। অবশ্য এর পশ্চাতে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রভাব আছে। পাশ্চাত্যে কিছু এমন কর আছে, যদি তা গির্জায় প্রদান করে, তবে সরকারীভাবে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়। তাই ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ থেকে গির্জা প্রচুর অর্থ পেত। তাছাড়া অনেকে তার ধন-সম্পদ গির্জার নামে উইল করে যায়। গির্জা তার অর্থ-সম্পদ লুটে নেয়। এছাড়া আরো অন্যান্য পদ্ধতিতেও গির্জায় টাকা জমা হতো।

এমন ঘটনা তো অনেকবার ঘটেছে। যেমন আমাদের আরব দেশের কোন শাসক বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলো। তারপর জনগণের অর্থ লুটে নিতে লাগল। অথচ জনগণের সামনে সে কৃচ্ছতার জীবন-যাপনের অভিনয় করে চলাফেরা করে। বলে বেড়ায়, সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য সে ক্ষমতায় এসেছে। তাই পাশ্চাত্যের কোন ব্যাংকে একাউন্ট খুলে ছদ্মনাম ব্যবহার করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার তাতে জমা করে।

তারপর কোন ঘাতকের হাতে সেই বিপ্লবী শাসকের মৃত্যু হলো। পিতার মৃত্যুর পর ছেলে সন্তানরা পিতার সঞ্চয়কৃত টাকা উত্তোলন করতে গেল। কিন্তু ছদ্মনামের কারণে তার এই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার তুলে আনতে পারল না।

এই যে পাহাড় পরিমাণ সম্পদ, যা সাধারণ মুসলমানের রক্ত চুষে চুষে পাশ্চাত্যের ব্যাংকে সঞ্চয় করেছিল তা বিভিন্ন গির্জা, ইহুদীদের গোপন সংস্থাগুলো পেল। আর সেগুলো ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের খৃস্টান করার জন্য ব্যয় হল। এই হল আমাদের অবস্থা। এই হলো আমাদের আত্মঘাতী ক্রিয়াকাণ্ড। কবে আবার আমাদের মাঝে ইসলামী চেতনা, আত্মমর্যাদাবোধ ও জাগরণ ফিরে আসবে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

পঞ্চদশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٣٣) هُوَ الَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○ (٣٤) يَآ
أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ○ (٣٥) يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا
فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○

অর্থ : তিনিই তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন সকল ধর্মের উপর বিজয় প্রদানের জন্য। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। হে মু'মিনরা! নিশ্চয় ইহুদীদের আলেম ও খৃস্টানদের সংসার বিরাগী আবেদদের অনেকেই অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ খাচ্ছে এবং আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও চাঁদি পুঞ্জিভুত করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে। (সেদিন বলা হবে) এগুলোইতো তোমরা তোমাদের জন্য পুঞ্জিভুত করেছিলে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জিভুত করেছিলে, তার স্বাদ আস্বাদন কর।" (সূরা তাওবা : ৩৩-৩৫)

আমরা পূর্বের মজলিসে আলোচনা করেছি, ইনশাআল্লাহ এ ধর্ম অবশ্যই সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ করবে এবং নিখিল বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়বে। এ দাবীর পক্ষে বেশকিছু সহীহ হাদীসও রয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لا يَبْقى بيتٌ مِن وبَرٍ و لا مَدَرٍ إلاَّ و يدخُلُه هذا الدينُ بعزِّ عزيزٍ و بذُلِّ ذليلٍ —

অর্থ : মাটি দ্বারা তৈরী ঘর বা পশম দ্বারা তৈরী প্রত্যেক তাঁবুতেই আল্লাহ তা'আলা এ দীনকে প্রবেশ করাবেন। সম্মানিত বিষয়কে সম্মানিত করার মাধ্যমে আর লাঞ্ছিত বিষয়কে লাঞ্ছিত করার মাধ্যমে।

এ ধর্মের বিরুদ্ধে যত আঘাত, যত বাঁধা এসেছে, যদি তা অন্য কোন ধমের্র উপর আসত, তাহলে তা পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে বিলীন হয়ে যেত। তার কোন চিহ্নই থাকত না।

পৃথিবীতে অনেক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। আবার তা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। ইউনানী সভ্যতা আজ উপমার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছে এথেন্সের সেই চমক। রোমান সভ্যতার কোন চিহ্ন আজ পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই। অথচ একসময় তার শাসিত এলাকায় সূর্য অস্তমিত হত না। ইটালিয়ান সভ্যতারও একই পরিণতি হয়েছে। কালের গর্ভে তাও হারিয়ে গেছে। পৃথিবীতে ইটালী ও তুর্কী মুদ্রার মান একেবারে কম। দুর্ধর্ষ কিছু যোদ্ধার আক্রমণে রোমান সভ্যতা শেষ হয়ে গেছে। কিছুদিন পূর্বের সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বও আজ আর নেই। বৃটিশ সাম্রাজ্যকে গ্রেট বৃটেন নামে অভিহিত করা হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্য বিশ্বের জনবসতির চার বা তিন ভাগের একভাগ শাসন করত। সেই বৃটিশ সাম্রাজ্য এখন শুধুই ইতিহাস। ক্রমে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড দুর্বলতর হচ্ছে। আমি পূর্বেই আলোচনা করেছিলাম, এই বৃটিশরা বিভিন্ন জাতির রক্ত চুষে নিয়ে যেসব বিস্ময়কর সুরম্য প্রাসাদসমূহ তৈরী করেছিল, আজ সে প্রাসাদগুলোকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পরিচারকের বেতনের অর্থেরও দারুণ অভাব। ফলে তারা বাধ্য হয়ে এ প্রাসাদগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে। প্রত্যহ তাদের বিভিন্ন মিল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থা

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। এ কথার প্রতিধ্বনি পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে অনুরণিত হয়েছে-

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ○

অর্থ : ফেনা তো শুকিয়ে বিলীন হয়ে যায়, আর যা মানুষের উপকার করে তা জমিনে অবশিষ্ট থাকে।

(সূরা রা'দ, আয়াত ঃ ১৭)

কোটি কোটি মানুষের রক্ত চুষে ব্রিটিশরা হারাম সম্পদের স্তূপ গড়ে তুলেছিল। ওদের জুলুমে মানুষের আহাজারিতে কেঁপে উঠেছিল আল্লাহর আরশ। তাই আল্লাহ বৃটিশদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন। তবে বৃটিশদের অহংকার আর গর্ব এখনো শেষ হয়নি। তারা এখনও অন্য দেশের, অন্য জাতির লোকদের দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকায়। যেন এখনো তারা বিশ্বের শাসক, বিশ্বের দণ্ডমুণ্ডের মালিক-মুখতার। তারা অন্তরের গোপন স্থানে এখনো ইসলামের বিরুদ্ধে হিংসা ও শত্রুতার ভাব লালন করে। মাঝে-মধ্যে তার প্রকাশও ঘটে।

আসলে বৃটিশরা ইসলাম ও মুসলমানদের চরম ক্ষতি করেছে। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোকে বিশেষত ভারতবর্ষের মুসলমানদের যে ক্ষতি করেছে, পৃথিবীতে আর কোন জাতির এমন ক্ষতি তারা করেনি। ভারতবর্ষের মানুষের চিন্তা-চেতনা, মেধা ও মননশক্তিকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। বইতে লিখে তারা দুই শত বছর ভারত শাসন করেছে, বরং আমি বলব তারা ভারত শাসন করেছে চার শত বছর। ১৫৮৭ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। এর মধ্যে তারা ভারতবর্ষকে চুষে খেয়ে শুধুমাত্র খোসাগুলো ফেলে রেখে গেছে। বৃটিশদের অত্যাচারের আহাজারি আজো শোনা যায় আমেরিকা আর আফ্রিকার জনপদ থেকে।

তারা রেড ইন্ডিয়ানদেরকে আমেরিকায় নিয়ে জায়গা দিয়েছিল। কে তাদের পশুর মতো বিক্রি করেছিল? এই বৃটিশরাই। তাই আল্লাহ তা'আলা বৃটিশদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন। বিশ্বমানবতার জন্য তারা কোন আদর্শ রেখে যেতে পারল না। চারদিক থেকে শুধু তাদের নির্যাতন ও নিপীড়নের আর্তচিৎকার শোনা যায়।

ইসলাম অর্ধ-শতাব্দী যাবত পৃথিবীর বিশাল এক অংশজুড়ে খিলাফত কায়েম করল। তারপর থেকে অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বছর থেকেই সেই আদর্শকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন দেশ ও জাতি চেষ্টা করে আসছে। বিভিন্ন শক্তি-মহাশক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ষড়যন্ত্র করে আসছে। কিন্তু পারেনি। আর পারবেও না। ইসলাম তার মহিমাসহ আজো পৃথিবীর বুকে শির উঁচু করে হিদায়াতের আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, বিজয়ী জাতি পরাজিত জাতির ধর্ম অর্থাৎ ইসলামকে বারবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছে।

তাতারীদের কথা বলা যেতে পারে। তারা বাগদাদে প্রায় আট থেকে দশ লাখ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। দজলা নদীর পানি তারা মানুষের রক্তে, কখনো আবার কাগজের কালির রঙে রঞ্জিত করেছিল। এই তাতারীরাও ইসলামকে ধ্বংস করতে পারেনি। আল্লাহ ইসলামকে রক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

আব্বাসী খেলাফতের এক উজির ভাগ্যক্রমে তাতারীদের আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল। তার নাম তুযান। ভাগ্যের লীলায় সে হালাকু খানের উজির হল। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সে ইসলাম ধর্মকে আঁকড়ে রেখেছিল। হালাকু খানের মৃত্যুর পর সে তৎকালীন তাতারী শাসককে ইসলামের সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে প্রধান শাসক ইসলাম গ্রহণ করে। তার সাথে সাথে হাজার হাজার তাতারীও মুসলমান হয়েছিল। ফলে ইসলাম আবার স্বীয় মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছিল।

তেমনিভাবে তাতারীদের আরেক শাসকের নাম ছিল যুগতাল। সে পাকিস্তান-আফগানিস্তান এলাকা শাসন করতো। একদিন এক আলেম ভুলে তার প্রাসাদের দূরসীমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। প্রহরীরা তাকে ধরে নিয়ে এল। তার নাম শাইখ জালালুদ্দীন। শাসক জালালুদ্দীনকে দেখে রেগে একেবারে আগুন হয়ে গেল। অগ্নিঝরা

কণ্ঠে বলল, তুই শ্রেষ্ঠ, না আমার এই কুকুরটি শ্রেষ্ঠ? শাইখ জালালুদ্দীন বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে বললেন, এখন আমি বলতে পারব না আমি শ্রেষ্ঠ, না আপনার এই কুকুরটি শ্রেষ্ঠ। বিষয়টি শেষ নিঃশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যদি আমি মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি, তাহলে এই কুকুরের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। আর যদি কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে কুকুরটি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শাইখ জালালুদ্দীনের এই কথা শুনে তাতারী শাসক স্তব্ধ হয়ে গেল। বিস্ময়ের আঘাতে যেন চমকে উঠল। সাথে সাথে একটি প্রশ্ন তার চোখের তারায় জ্বল জ্বল করতে লাগল। বলল, ইসলাম কী? শাইখ জালালুদ্দীন অত্যন্ত সারগর্ভ ভাষায় ইসলামের ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। মেছাল, উপমা আর উচ্ছ্বল বর্ণনা-ভঙ্গিতে শাসকের হৃদয় বিগলিত হল। হিদায়াতের নূর তার হৃদয়জুড়ে স্থান নিল। শাসক বলল, আমি এখন খুব ব্যস্ত। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো পদানত করতে হবে। আমি বিজয় লাভ করলে একবার আমার নিকট এসো। আমি তোমার ধর্ম গ্রহণ করব।

শাইখ জালালুদ্দীন তখন বয়োবৃদ্ধ। বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হলেন। অতঃপর একদিন মৃত্যুবরণ করলেন। মৃত্যুর পূর্বে তার ছেলেকে ডেকে বললেন, এ অঞ্চলের শাসক আমাকে বলেছেন– তিনি বিজয় লাভ করলে আমি যেন তার নিকট যাই। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন। সুতরাং আমি তোমাকে একটি পত্র লিখে দিচ্ছি। যদি আমি মরে যাই আর শাসক অত্র অঞ্চলেব সর্বত্র তার রাজ্য বিস্তৃত করে শত্রুদের পদানত করতে সক্ষম হন তাহলে তুমি তার নিকট যাবে। বলবে, আমি শাইখ জালালুদ্দীনের পুত্র। তাকে আমার এই পত্রটি দেবে।

সত্যই শাসক বিজয় লাভ করে শত্রুদের পদানত করার পর শাইখ জালালুদ্দীনের পুত্র তার পিতার চিঠি নিয়ে শাসকের নিকট গেল। প্রহরী বলল, কি চাও? শাইখ জালালুদ্দীনের পুত্র বলল, আমি বাদশাহের সাথে দেখা করতে চাই। তার নিকট একটি অত্যন্ত জরুরী পত্র পৌছাব। প্রহরী তাকে বাদশাহর নিকট নিয়ে গেল। বাদশাহকে সালাম দিয়ে বলল, এটা আমার পিতা শাইখ জালালুদ্দীনের পত্র। মৃত্যুর পূর্বে লিখেছেন এবং আপনার নিকট পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

বাদশাহ পত্রখানা হাতে নিলেন এবং পাঠ করলেন। বললেন, হ্যাঁ, আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তারপর তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেন। বাদশাহর সাথে সাথে তাতারীদের এই বংশের সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। রাজ পরিবারের সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে সাধারণ জনতার মাঝে এর বিস্ময়কর প্রভাব পরিলক্ষিত হল। তারাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিল।

এ হলো ইসলামের আত্মশক্তি। নিজস্ব প্রভাব। তাই বিজিত জাতির ধর্ম বিজয়ী জাতি গ্রহণ করে নিয়েছে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে এ ধরনের উদাহরণ, এ ধরনের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কারণে পাশ্চাত্যের লেখকরা পাঠকদের ইসলাম সম্পর্কে সতর্ক করে আসছে। ইসলাম সম্পর্কে জানতে, শিখতেও তাদের নিষেধ করছে।

পাশ্চাত্যের এক লেখক। নাম লরেন্স ব্রাউন। একবার সে লিখল, আমরা অনেক জাতির রক্তচক্ষু ও হুমকির শিকার হয়েছি। অনেক বিপ্লবীর হুঁশিয়ারি শুনেছি। বলসেভিকদের হুমকির শিকার হয়েছি। ইহুদীদের হুমকির শিকার হয়েছি। কিন্তু শেষে দেখলাম, ইহুদীরা আমাদের বন্ধু। আমাদের মত চিন্তার ধারক। তাই যারা ইহুদীদের শত্রু, তারা আমাদের ও শত্রু। আমরা জাপানীদের হুমকির শিকার হয়েছি। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তা পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমরা বলসেভিকদের হুমকির শিকার হয়েছি। পরে দেখলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তারা আমাদের সঙ্গী। তাই বলছি, ইসলামই আমাদের একমাত্র শত্রু। ইসলামই একমাত্র দুর্লঙ্ঘনীয় বাঁধা, যা আমাদের উপনিবেশবাদের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। পদে পদে মুসলিমরা আমাদের বাঁধা হয়ে আছে। ইসলাম হল একটি শক্তি। তার শক্তি নিজ থেকেই স্ফুরিত হয়। আপন সত্ত্বা থেকেই বিকশিত হয়। বাইরে থেকে তার শক্তি আমদানি করতে হয় না।

ভাইয়েরা! আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি ইসলামের জন্য পৃথিবীর বুকে একটি ছোট্ট দেশ হত, তাহলে দেখতে হাজার হাজার ইউরোপিয়ান আর আমেরিকান স্বতঃস্ফুর্তভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে।

এখন আমেরিকা গোটা পৃথিবী শাসন করছে। আমাদের ছেলে-সন্তানরা আমেরিকার নামে বিমোহিত। তার শক্তি ও ক্ষমতা দেখে বিমুগ্ধ। তার শক্তি, ক্ষমতা, মহত্ব আর উন্নতি-অগ্রগতির কথা বলতে গিয়ে মানুষ আবেগাপ্লুত হয়ে যায়। আমি আমেরিকায় ছিলাম। বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার লোকেরা তখন আমাকে আহবান করত। দাওয়াত দিত। একবার আমি কোথাও যাচ্ছিলাম। আসরের নামাযের সময় হল। মসজিদে গিয়ে দেখি, মসজিদ পরিপূর্ণ। মনে হচ্ছে যেন জুমা'আর নামায। আমি তাদের বললাম, তোমরা ইয়েমেনে আছ, না আমেরিকায়? তাদের অধিকাংশই ছিল ইয়েমেনী। আমার কথা হয়ত বিশ্বাস নাও করতে পার। ইয়েমেনেও কিন্তু নামাযীর সংখ্যা এতো নয়।

তারা বলল, আমরা হিদায়াতের পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাদের অনেকে তাদের অতীতের অন্ধকার জীবনের ক্রিয়া-কর্মের কথা শোনাল। বলল, এক মাস বা দু'মাস আগে আমরা মদ, নারী, জুয়া ইত্যাদিতে ডুবে ছিলাম। তারা বলল, দু'মাস আগে আমাদের নিকট তাবলীগ জামাতের লোকেরা এসেছিল। তাদের কারণে আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দান করেছেন। আমরা আল্লাহর পথে ফিরে এসেছি। এই যে মুসুল্লীদের দেখছেন, এরা সবাই তাবলীগ জামাতের সংস্পর্শে এসে নামায পড়া শুরু করেছে।

কৃষ্ণবর্ণের আমেরিকানরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। তাদের সংখ্যা প্রায় তিন মিলিয়নে পৌঁছেছে। দিনের পর দিন তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তারা একটি গোমরাহ দলের অনুসারী ছিল। তারা বিশ্বাস করত, আলীজা মুহাম্মদ একজন নবী। আলীজা মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তার ছেলে তার উত্তরাধিকারী হয়েই ঘোষণা দিল, তার পিতা একজন সংস্কারক ছিলেন- নবী ছিলেন না। কারণ, শেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি খাতামুল আম্বিয়া।

এরপর যুবকরা ইসলামিক সেন্টারগুলোতে ছুটে এলো। সেন্টার পরিচালকদের সাথে যোগাযোগ করে ইসলামের আদর্শ, ইবাদত, মু'আমালাত সংক্রান্ত বিষয়সমূহ শিখতে মনোনিবেশ করল। তারা শিক্ষা শিবির স্থাপন করল। অযু, নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদির জন্য কোর্স করে তা শিখতে লাগল। ১৯৭৫ সালে তারা 'নামায শিক্ষা শিবির' খুলল এবং সে সাল থেকেই রোযা রাখা শুরু করল। ১৯৭৭ সালে 'হজ্ব প্রশিক্ষণ শিবির' খুলল এবং সে সাল থেকে তারা হজ্ব শুরু করল।

আলহামদুলিল্লাহ। তাদের সংখ্যা এখন তিন মিলিয়নে গিয়ে পৌঁছেছে। ইনশাআল্লাহ আমার আশা ও বিশ্বাস, দশ বছর পর তাদের সংখ্যা দশ মিলিয়নে গিয়ে পৌঁছবে। তারা আমেরিকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। আমেরিকার রাজনীতিতে তাদের গভীর প্রভাব ও প্রশংসনীয় অবদান থাকবে।

এক কর্মনিষ্ঠ মুবাল্লিগ আমাকে বলেছেন– যদি আমার সাথে একদল দুঃসাহসী মুবাল্লিগ থাকত, তাহলে আমি হোয়াইট হাউজের কামানগুলোর মুখ ঘুরিয়ে আমেরিকানদের দিকে ফিরিয়ে দিতাম। আসল কথা হল, ইসলামের একটা আত্মিক শক্তি ও প্রভাব রয়েছে।

১৯৬৫ সালের কথা। মিসরে তখন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদের উপর নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে জামাল আব্দুন নাসেরের বাহিনী। একদল যুবক তার নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে আমেরিকায় চলে যায়। তারপর অবস্থা যখন আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করল, ইখওয়ানের সদস্যদের ফাঁসি দিতে লাগল; তখন একদল যুবক ও শিক্ষক পালিয়ে ইউরোপে চলে যায়, আমেরিকায় চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে তারা একত্রিত হয়। প্রথমে সংখ্যায় তারা ছিল মাত্র তের জন। তারা একটি সংস্থা স্থাপন করে নাম রাখে 'Muslim Student Association.'

বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলমানরা নানা কারণে আমেরিকায় আসে। ফিলিস্তিন থেকে, লেবানন থেকে, মিসর থেকে, বিভিন্ন দেশ থেকে। কিন্তু ভিন দেশে তারা তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। এমনকি তারা তাদের মুসলিম নামও বদলে ফেলে। তারা খবর রাখে না, কখন রমযান আসে, কখন চলে যায়। কখন ঈদ হয়। দেখা গেল মুহাম্মদ নামের এক ডাক্তার আমেরিকায় গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে নাম বদলে ফেলল। নতুন নাম রাখল মাইকেল, যেন আমেরিকানরা তার চেম্বারে গিয়ে চিকিৎসা নেয়। এভাবে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তারা ইসলামকে হারিয়ে ফেলছিল।

মিসরের সেই তেরজন ছাত্র সেখানে গিয়ে মুসলিম যুবকদের সাথে যোগাযোগ করতে লাগল। ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগল। আলহামদুলিল্লাহ! ধীরে ধীরে তারা ইসলামের দিকে ফিরে আসতে লাগল। তাদের মাঝে আত্মচেতনা ফিরে আসতে লাগল। তারপর তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে লাগল।

১৯৭৭ খৃস্টাব্দে মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের অঙ্গ সংগঠন মুসলিম ইয়ুথ এসোসিয়েশন'-এর সদস্যরা একটি সম্মেলনের আয়োজন করলো। তারা ছিলো একদল কুয়েতী যুবক। তারা একতাবদ্ধ হলো, তাদের সাথে আরো অনেকে এসে সংঘবদ্ধ হলো। এভাবে মুসলিম আরব ইয়ুথ এসোসিয়েশন'এর সূচনা হয়েছিলো। তারা আমাকে তাদের প্রথম সম্মেলনে দাওয়াত করেছিলো। তারা ছিলো প্রায় তিনশত যুবক আর দু'শত যুবতী। আমেরিকায় সেই যুবতীরা লম্বা ঢিলেঢালা পোশক পরে হিজাব ব্যবহার করে চলাফেরা করতো। তাদের চেহারা পর্যন্ত পর্দাবৃত থাকতো।

তারা সম্মেলনের জন্য হোটেল ভাড়া করতে গেলো। পাঁচশত আরব যুবক আসবে। এ সংবাদ শুনে তো হোটেল মালিক আনন্দে বিহ্বল। এত বিরাট সম্মেলনে নিশ্চয় বেশ লাভ হবে। ভাবছে এবার সে সম্পদশালী হয়ে যাবে। মালিক তাড়াতাড়ি বার ও মদ পরিবেশন সম্পর্কে পারদর্শী এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীর ব্যবস্থা করলো। পুরাতন মদ রেখে দিয়ে নতুন দামী মদের আয়োজন করলো। সে ধারণা করলো, এ আরব যুবকদের অর্থে সে এবার বিত্তশালী হয়ে যাবে।

সম্মেলনের পরদিন মালিক তাড়াতাড়ি হোটেলে এলো। এসেই সেই নবনিযুক্ত সুন্দরী মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, আজ রাতে কত ডলার জমা করেছো। উত্তরে মেয়েটি বলল, No Dollar. না, কোন ডলার পাইনি। বিস্ময়ে 'থ' মেরে গেলো মালিক। বললো- এই আরব যুবকদের থেকে এক ডলারও পেলে না! মালিকের মাথায় যেন বাজ পড়ল। আরে! এরা আবার কেমন আরব! বললো, আমি এদের দায়িত্বশীলদের সাথে দেখা করবো।

এ সম্মেলনের দায়িত্বে ছিলো এক ফিলিস্তিনী যুবক। আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে লেখা পড়া করছিলো।

হোটেলের মালিক তাকে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি আরব? শান্ত সমাহিত কণ্ঠে সেই যুবক উত্তর দিল- হ্যাঁ, আমরা আরব। হোটেলের মালিক বললো, তোমরা কেমন আরব। পাঁচশত যুবক এলে অথচ এক বোতল মদও খেলে না! নারীর সোহাগও নিলে না! যুবক বললো, আমরা আরব। তবে আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের জন্য পরনারী, মদ, শূকর হারাম করেছে। আসলে তারা পূর্বেই হোটেল কতৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিলো যে, তাদের কোন মদ বা নারীর প্রয়োজন নেই। যেসব নারী হোটেল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত ছিল, তাদের আর কোন কাজ করতে হয়নি। সম্মেলনে যোগদানকারী যুবকরা পাঁচ বেলা কক্ষ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে পরিষ্কার ফরাশ বিছিয়ে তাতে নামায আদায় করেছে। তাদের একজন সবার সামনে দাঁড়ায়। সে যা করে অন্যরাও তাই করে। সে হাত তুললে অন্যরাও হাত তুলে। সে অবনত হলে অন্যরাও অবনত হয়। সে শির মাটিতে রেখে উপুড় হলে অন্যরাও তাই করে। যে সুন্দরী রমণীকে হোটেল কর্তৃপক্ষ যৌন সুড়সুড়ি দেয়ার জন্য এনেছিলো, সে সম্মেলন শেষ হওয়ার পর বললো, আমি তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করবো। এভাবে তারা পাশ্চাত্যে এক আদর্শের পতাকা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি প্রায় প্রত্যেক

বৎসর তাদের এই সম্মেলনে যোগদান করি। মাঝে মাঝে বাদও যায়। যেতে পারি না। সূচনা লগ্নে তারা ছিলো মাত্র ১৩ জন। আর এখন তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তাদের মাত্র একটি শাখা ছিলো। অথচ বর্তমানে ১৮০টি শাখা রয়েছে। ওয়াকফ করা বিভিন্ন স্থানকে তারা রেজিস্ট্রী করে নিচ্ছে। ফলে আমেরিকান সরকার এসব দলীল বাজেয়াপ্ত করতে পারছে না। আমেরিকায় ওয়াকফ অর্থ– সে স্থান গির্জার স্থানের ন্যায় হয়ে যায়। তারা গির্জা ক্রয় করে সেখানে মসজিদ বানাতে শুরু করেছে।

প্রথমে কিন্তু তারা অর্থ সংকটের কারণে তা করতে পারতো না। তাই তারা জুম'আর নামায আদায়ের লক্ষ্যে মাত্র দুই ঘন্টার জন্য গির্জা ভাড়া নিতো। একশত ডলার গির্জা কর্তৃপক্ষকে দিতো। তারপর দ্রুত গির্জার ফরাশ তুলে ফেলতো। কারণ, গির্জায় মদের গন্ধ থাকতো প্রকট। খৃস্টানরা মদ খেয়ে প্রায়ই ফরাশগুলো ভিজিয়ে ফেলত। তারা সাদা চাদর বিছিয়ে তাতে নামায আদায় করতো। তারপর তারা তাদের কাজে ফিরে যেতো। শুক্রবারে তারা সাধারণত বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠানে যোগদান করতো। এভাবে বেশ কিছু দিন চলার পর তারা গির্জা ক্রয় করতে শুরু করলো। কারণ, বহু গির্জা বিরান পড়ে আছে। কেউ তাতে যায় না।

মাঝে মাঝে খৃস্টানরা শহরের প্রাণকেন্দ্রে গির্জা তৈরী করেছে। অত্যন্ত সুন্দর মনোরম করে তৈরী করেছে। আর গির্জার নিচে নাচের ঘর বা আনন্দ-উল্লাস ও বিনোদনের জন্য অন্য কোন স্পট তৈরী করে। তাই অনেক বাড়ী বা গির্জা সম্পর্কে তারা বলে, এটা গির্জা ছিল। এটা বিনোদন স্পট ছিল। আমরা তা ক্রয় করে মসজিদ বানিয়েছি। আসলেও তাই। বাইরে থেকে তুমি কিন্তু তাকে দেখে গির্জাই মনে করবে। কারণ, তা গির্জার আদলে তৈরী করা হয়েছে।

দেখা গেলো, সৌদি আরব থেকে কোন যুবক আসছে। সে জীবনে কখনো নামায পড়েনি। মক্কা থেকে এসেছে, কাতার থেকে এসেছে বা বাহরাইন থেকে এসেছে। আসলে সৌদি আরব থেকেই বেশী যুবক আসে। তখন সেই সংগঠনের যুবকরা অন্যান্য যুবকদের জানিয়ে দেয়, আমাদের দেশ থেকে অমুক ব্যক্তি আসছে। যেমন, মক্কার লোকেরা মক্কা থেকে কেউ এলে তার সংবাদ অন্যান্য সবাইকে জানিয়ে দেয়। সবাই তাকে স্বাগত জানিয়ে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে আসে। তখন তার মাথায় থাকে লম্বা চুল, দেখতে অন্য ধরনের। তারা তাকে বলে, কোথায় থাকতে পছন্দ করো। বাইতুল আরকামে, না মসজিদে? এ যুবকরা মসজিদে বা যেসব গির্জাকে মসজিদ বানানো হয়েছে তার পার্শ্বে পাদ্রীর জন্য তৈরী কামরায় থাকে। এ ধরনের কামরাকেই তারা বাইতুল আরকাম বলে। তারা তাকে মসজিদে বা বাইতুল আরকামে নিয়ে যায়। তাদের সাথে থাকে। শেষ রাতে একজন উঠে আযান দেয়। এটা হলো তাহাজ্জুদের আযান। তখন সবাই উঠে নামায আদায় করে। তারপর আবার ফজরের নামাযের আযান দেয়। জামা'আতের সাথে নামায আদায় করে। আর সে সময় কিন্তু নবাগত মেহমান ঘুমিয়ে থাকে। ফজরের নামাযের পর তারা কুরআন পাঠ করে। সকাল নয়টায় তারা তাকে ডেকে ঘুম থেকে তুলে বলে, বন্ধু ওঠ। নাস্তা তৈয়ার। নাস্তা গ্রহণের পর হয়তো তাদের কেউ তাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসে বা তার কাজে সহায়তা করে। তাকে একটি পণ্য সামগ্রীর লিস্ট দিয়ে বলে এগুলো হালাল খাবার। এগুলো হারাম খাবার। ঐ হোটেলে যেয়ো না। এই সাবান ব্যবহার করো না। সে যোহরের সময় এসে দেখে, তার খাবার প্রস্তুত। তারা বলে, আমরা এ খাবারের আয়োজন করেছি। আমাদের নিয়োজিত লোক আছে। তারা নিজ হাতে পশু যবাহ করে। তারপর আমরা তা বন্টন করে নিয়ে যাই। আমাদের সব কিছুই হালাল।

এভাবে এক, দুই বা তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরই নবাগত মেহমানের মন-মানসিকতায় পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। বলে, এখানে সেলুন কোথায় আছে আমাকে নিয়ে চলো। সেলুনে গিয়ে চুল ছোট করে। পোশাক-পরিচ্ছদ পাল্টে ফেলে। দাড়ি রেখে দেয়। আর তাদের সাথে আমল শুরু করে। সাপ্তাহিক দারস মজলিসে উপস্থিত হয়। জুম'আর নামাযের খুতবা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শুনে। ইসলামী যেসব সেমিনার-সিম্পোজিয়াম বা আলোচনা সভা হয়, তার কোনটাই বাদ দেয় না। বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই সে আল্লাহর পথের দাঈ হয়ে

যায়। দেশে ফিরে যায়। আমলে দারুণ পরিপক্ক। মুখে সুন্দর দাড়ি। চেহারায় নূর। সেকি আমূল পরিবর্তন। পরিবারের লোকেরা বলে, তুমি যখন আমেরিকায় গেলে, আমরা ভাবলাম তুমি হারিয়ে গেছো। তোমাকে আমরা আমাদের মতো করে পাবোনা। আলহামদুলিল্লাহ। এখন দেখছি তুমি একেবারে পাল্টে গেছো। দেশে এসে সে ব্যবসায়ীদের থেকে চাঁদা তুলে। বলে, ভাই আমরাতো ওখানে জুম'আর নামায আদায় করার জন্য জায়গা পাইনা। আমেরিকায় মুসলমানরা কোথায় নামায আদায় করবে। মসজিদ-ই নেই। তাই তোমরা চাঁদা দাও। আমেরিকায় গিয়ে আমরা গির্জা কিনে মসজিদ তৈরী করবো। এভাবে সে মসজিদ তৈরীর কাজে লেগে যায়। বহু যুবকের এ অবস্থাই ছিলো। ইসলামী বিশ্ব থেকে তারা বিভ্রান্ত পথহারা অবস্থায় আমেরিকায় এসেছিলো। আমেরিকান বিমানে যখন যাবে তোমাকে তখন আমেরিকান খাবার পরিবেশন করা হবে। আমেরিকান খাবারে শূকরের গোশত থাকবেই। অন্যান্য হারাম বস্তুও থাকে। তাই মুসলমান এ যুবকরা কোশার মিল অর্থাৎ ইহুদীদের খাবার চেয়ে নিতো। কারণ, ইহুদীরা শূকর খায় না এবং শরী'আতসম্মত পদ্ধতিতে যবাহ করে। তাই বিমানে বুকিং দেয়ার সময় নিজের নামের পাশে K.M. লিখে দিতো। ফলে তাদের কোশার মিল দিতো। এবাবে চলতে চলতে যখন মুসলিম যাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে গেলো তারা তখন বিমান সংস্থাকে চাপ দিলো তারা যেন তাদের খাবারের জন্য M.M. অর্থাৎ মুসলিম মিল তৈরী করে। ফলে তাই হলো। কোন মুসলিম রাষ্ট্র কিন্তু এ ধরনের শর্তারোপ করেনি। অথচ ইহুদীরা এ শর্তারোপ করেছিলো। তাদের শর্ত ছিলো যদি কোন ইহুদী তাদের বিমানে কোথাও যায়, তবে তাকে অবশ্যই কোশার মিল পরিবেশন করতে হবে।

এ যুবকরাই সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় কম্পিউটার প্রোগ্রাম চালু করেছে। আমি একবার এক শহরে গেলাম। তারা বললো, আমাদের সাথে আসুন। আমি গেলাম। দেখলাম, এক মহাজ্ঞানী ব্যক্তি হাদীসের সিডি তৈরী করছে। এখনতো তা বাজারে চলে এসেছে। আবূ সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে কোন হাদীস তুমি চাবে মুহূর্তে বের করতে পারবে। বর্ণনাকারীর নাম ধরে তালাশ করলেই তা পেয়ে যাবে। তোমার পবিত্রতার অধ্যায়ের হাদীসের প্রয়োজন। ব্যস, পবিত্রতার অধ্যায়ের বুতাম চাপ দিবে একের পর এক হাদীস কম্পিউটারের স্ক্রীনে ভেসে উঠবে। প্রযুক্তি উন্নয়নের সাথে সাথে এখন শুধুমাত্র হাদীসের জন্য একবারে ছোট সাইজের কম্পিউটার তৈরী হয়েছে। নির্দিষ্ট বুতামে চাপ দিলে হাদীস বেরিয়ে আসবে। রাবীর নাম আসবে। সাহাবীর নাম আসবে। হাদীস বর্ণনাকারী অন্যান্য মুহাদ্দিসের নামও আসবে। এভাবে তারা বিভিন্ন প্রকারের ঘড়িও তৈরী করেছে। যা তোমাকে নামাযের সময় জানিয়ে দিবে। সেই যুবকদের প্রচেষ্টায় বহু কল্যাণ সাধিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদের বিরাট বিজয় দান করেছেন। তাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেককে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। ধর্মে অবিচল রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ○

অর্থ : হে মু'মিনরা! নিশ্চয়ই ইহুদীদের আলেম ও খৃস্টানদের সংসার বিরাগী আবেদদের অনেকেই অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করছে এবং আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখছে।

এ অবস্থা ছিল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও তার পরবর্তী সময়ে। আসলে, এসব পাদ্রী ও ধর্মের গুরুরা মানবতার জন্য এক মহাবিপদ ছিলো। মধ্যযুগে তাদের এই রূপটি তীব্র আকার ধারণ করেছিলো। তাদের ভ্রষ্টতাই মানুষের গুমরাহী ও বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে এবং মানুষ ধর্মের শত্রু হয়েছে। তারা প্রকৃত জ্ঞান ও ধর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলো। আমাদের সন্তানরা আজ সে সব ইতিহাস পড়ে এবং ধর্মের ব্যাপারে আপত্তিকর

মন্তব্য করে। তারা মনে করে, ধর্ম উন্নতি, অগ্রগতি ও জ্ঞানের বিরুদ্ধ শক্তি। এ কথারই মর্ম ব্যক্ত করেছেন পূর্ববর্তী আলেমগণ। তারা বলেছেন–

صنفان إذا فَسَدَ فَسَدَ الناسُ و صَلُحَا صَلُحَ الناسُ : الأمراءُ و العلماءُ —

অর্থ : দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যদি এরা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সকল মানুষ নষ্ট হয়ে যায়, আর যদি তারা সৎকর্মপরায়ণ হয়, তাহলে সাধারণ মানুষও সৎকর্মপরায়ণ হয়। তারা হল শাসক গোষ্ঠী ও আলেম-উলামা।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) এ ব্যাপারে একটি চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন–

رأيتُ الذنوبَ تُميت القلوبَ و قد يُورث الذُلَّ إدْمانُها

تركُ الذنوبِ حياةُ القلوبِ فخيرٌ لنفسك عصيانُها

و هل أفْسدَ الدينَ إلاَّ الملوكُ و أحْبارُ سوءٍ و رهبانُها

لقد رتعَ القومَ في جيفــةٍ يُبيِّنُ لذي اللُّبِ إنتــانُها

অর্থ : “আমি ভেবে দেখেছি, পাপরাজি হৃদয়কে নিষ্প্রাণ করে ফেলে। সর্বদা পাপ কাজ করলে লাঞ্ছিত হতে হয়। আর পাপ কাজ পরিত্যাগ করাই হল হৃদয়ের জন্য জীবন। তাই তোমার জন্য উচিৎ পাপের বিরোধিতা করা। পাপ কাজ না করা। রাজা-বাদশাহ, অসৎ পাদ্রী ও ধর্মের গুরু ব্যক্তিরাই ধর্মকে নষ্ট করে দিয়েছে। ধর্মের বিনাশ সাধন করেছে। সাধারণ লোকেরা মরা পশুর মাঝেই বিচরণ করছে। জ্ঞানী লোকেরাই তার দুর্গন্ধ পায়, অনুভব করে।”

আলেমরা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। এক দল নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী হয়েছে। আল্লাহ তাদের মাধ্যমে দীনকে হেফাজত করেছেন। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

العلماءُ ورثةُ الأنبيَاء —

অর্থ : আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।

আরেক দল আলেম আছেন, তারা ভ্রষ্ট পাদ্রী ও ধর্মীয় গুরুদের মত কাজ করে। তারা দীনের বিধানে ফাসাদ সৃষ্টি করে। অল্প মূল্যে দীনকে বিক্রয় করে।

এ কারণে পূর্ববর্তী আলেমগণ ঐসব আলেমদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন- যারা রাজা-বাদশাহ আর ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের দরজায় ধর্ণা দেয়। হযরত হুযাইফা (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আরো অনেকে এসব আলেমদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তাদের সকলের কথায় প্রায় একই মর্ম উচ্চারিত হয়েছে।

إذا رأيتمُ العالمَ بباب السلطانِ فاحْذَرُوه على دينِكم —

অর্থ : যদি তোমরা কোন আলেমকে রাজা-বাদশাহদের দরবারে গমন করতে দেখ, তাহলে ধর্মের ব্যাপারে তোমরা তার থেকে বেঁচে থাক।

কেউ বলেছেন–

و الله، إنَّهم لا يأخُذُونَ من دنيَاهم شيئًا إلا دَفَعُوا من دينِهم ضِعْفَين —

অর্থ : আল্লাহর কসম করে বলছি, নিশ্চয় তারা তাদের দুনিয়া থেকে যতটুকু নেয়, তার চেয়ে দ্বিগুণ তারা তাদের ধর্ম থেকে দিয়ে আসে।

আসলেও ব্যাপারটি এমনই। তারা আলেমকে কিছু দিবে কেন? হ্যাঁ, তারা যদি চুপ থাকে, সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজে বাঁধা প্রদান থেকে বিরত থাকে তবেই না তারা আলেমকে কিছু দিবে। তা নাহলে কেন দিবে?

ইসলামী ইতিহাসে রাসূলের উত্তরাধিকারী হয়েছেন এমন বহু আলেম ছিলেন। যারা কখনো রাজা-বাদশাহদের থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি। যেমন- ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), সুফিয়ান সাউরী (রহঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ), ইমাম নববী (রহঃ), আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ), সাইয়েদ কুতুব (রহঃ), হাসানুল বান্না (রহঃ), আব্দুল আযীয বদরী (রহঃ) এ ধরনের আরো অনেক আলেম রয়েছেন। এদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দীনকে হেফাজত করেছেন। আর যারা দুনিয়ালোভী অর্থের পাগল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۝

অর্থ : বহু পণ্ডিত ও সংসারত্যাগী মানুষের সম্পদ ভোগ করে অন্যায়ভাবে এবং আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ اتبعَ الصيدَ غَفَلَ و مَنْ سَكَنَ البَادِيةَ جَفَا و مَنْ أتى السُّلطانَ افْتَتَنَ —

অর্থ : যে ব্যক্তি শিকার করার জন্য কোন পশুর পিছনে ছুটতে থাকে সে গাফেল অসচেতন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি গ্রামে বা পল্লীতে থাকে সে রুক্ষ হয়ে যায়। আর যে রাজা-বাদশাহদের নিকট গমন করে সে ফেৎনায় পড়ে যায়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর সূত্রে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ما زادَ أحدٌ من السلطانِ قُربًا إلاّ ازدادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا —

অর্থ : রাজা-বাদশাহদের নৈকট্য যে যত বেশি অর্জন করবে সে ততই আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যাবে।

কারণ আলেমরা যদি প্রকৃত পক্ষে সৎকর্মপরায়ণ হয়, তাহলে হিংস্র প্রাণীও তাকে ভয় পায়। আর যদি ভ্রান্ত হয় তাহলে আকাশ ও যমীনের সবাই তাদের অভিশাপ দেয়।

ইমাম আওয়ারী (রহঃ) বলেছেন–

شَكَتِ النَّواوِيسُ إلى اللهِ من نتْنِ جُثَثِ الكفَّارِ، فأوْحَى اللهُ إليها إنَّ بُطُونَ العُلماءِ أشدُّ نتنًا مِنَ هذَا —

অর্থ : কাফেরদের লাশের দুর্গন্ধে খৃস্টানদের কবরগুলো আল্লাহর নিকট অভিযোগ করল। তখন আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন, নিশ্চয়ই খারাপ ও ভণ্ড আলেমদের পেটের দুর্গন্ধ এর চেয়ে আরো বেশী কঠিন ও অসহনীয়।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

يُؤتى الرجلُ يومَ القيامةِ فيُلقى في النار فتَنْدَلِقُ بها أقتابُه يدُور بها كما يدُور الحمارُ بالرَّحَى، فيمر عليه أهل الجنة ، يا فلان ! أليسَ بعلمِك قد دخلنا الجَنَّةَ ، قال بلى ، و لكنْ كنتُ آمرُكم بالمعروفِ و كنتُ أنهَاكُم عن المنْكَرِ و آتيْه —

অর্থ : কিয়ামত দিবসে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে। সে তা নিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকবে। যেমন গাধা ঘানীর চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন তার পাশ দিয়ে জান্নাতীরা যাবে। বলবে, হে লোক! তোমার ইলমের কারণেই তো আমরা

জান্নাতে গিয়েছি। সে বলবে, হ্যাঁ, তবে আমি তোমাদের সৎকাজের আদেশ করতাম; কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর অসৎ কাজ থেকে আমি তোমাদের বারণ করতাম; কিন্তু আমি নিজে তা থেকে বিরত হতাম না।

এ কারণেই পূর্বসূরী মহান আলেমগণ বলেছেন−

ويلٌ للذي لا يعلَمُ و لا يعملُ مرةً و ويلٌ للذي يعلَمُ و لا يعملُ سبعَ مرات —

অর্থ : ঐ ব্যক্তির জন্য অভিশাপ, যে জানে না আর আমলও করে না। আর ঐ ব্যক্তির জন্য সাতবার অভিশাপ, যে জানে অথচ আমল করে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন−

(١٧٥) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ○ (١٧٦) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ○

অর্থ : আর আপনি তাদেরকে ঐ ব্যক্তির কথা শুনিয়ে দিন, যাকে আমি আমার নিদর্শনসমূহ দান করেছি। অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেলো। আর শয়তান তার অনুসরণ করলো। ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতাম। সেসব নিদর্শনের কারণে কিন্তু সে অধঃপতিত হলো ও স্বীয় কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং তার অবস্থা হলো কুকুরের মতো। তাকে তাড়া করলে হাঁপাবে, ছেড়ে দিলেও হাঁপাবে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত ঃ ১৭৫-১৭৬)

একেবারে কুকুরের মতো। দুনিয়াদারদের দুনিয়ার জন্য হাঁপানি থামবে না। স্বস্তিতে থাকুক, ক্লান্তিতে থাকুক বা অন্য যে কোন অবস্থায় থাকুক সে হাঁপাতেই থাকবে। তার জিহ্বা ঝুলেই থাকবে। এই যে ধার্মিক ব্যক্তিটি যে দীন ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার পিছনে ছুটছে, তার জিহ্বাও সর্বদা দুনিয়ার জন্য ঝুলে থাকবে। তা থেকে লালা ঝরতেই থাকবে। মুহূর্তকালের জন্যও তা বন্ধ হবে না। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন−

ولو أنَّ أهلَ العلمِ صانُوه لصَاهُم و لو عظَّمُوه في نفوسِهم لعظُما

و لــكنْ أهانُــوه فهانَ و دنَّسوا محيَّــاه بالأطْمَــاعِ حتى تَجهَّمَا

অর্থ : যদি আলেমরা ইলমের হিফাযত করতো, তাহলে ইলমও তাদের হিফাযত করতো। যদি তারা ইলমের সম্মান করতো, তাহলে তারাও সম্মানিত হতো। কিন্তু তারা ইলমকে অপমান করেছে, তাই তারা অপমানিত হয়েছে আর লোভ পোষণ করে তারা চেহারাকে কলঙ্কিত করেছে। তাই তাদের চেহারা মলিন হয়ে গেছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) মানুষের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না, যেন কেউ তার উপর অনুগ্রহ ফলাতে না পারে। তাই তিনি শাসকদের উপঢৌকনও গ্রহণ করতেন না।

মানুষ তাকে উপহার দিতে অত্যন্ত আগ্রহী থাকা সত্তেও তিনি তা গ্রহণ করতেন না।

একদা তিনি তার এক ছেলেকে রুটি ক্রয় করতে বাজারে প্রেরণ করলেন। দোকানে গিয়ে রুটি ক্রয় করার সময় মালিক জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? উত্তরে বললো, আমি আহমদ ইবনে হাম্বলের পুত্র। তখন দোকানের মালিক স্বর্ণ ও চাঁদি দিয়ে তা পেঁচিয়ে প্যাকেট করে দিয়ে দিলো।

বাড়ীতে পৌছে যখন রুটির পুটলি খোলা হলো, দেখা গেলো, তাতে স্বর্ণ ও চাঁদি। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তিনি তা ফেরৎ পাঠালেন। দোকানের মালিক বললেন, খাবারের জন্য এই রুটি। এই স্বর্ণ আর রৌপ্য মুদ্রাগুলোও তোমাদের জন্য। কিন্তু ছেলে বললো, না, তা কিছুতেই সম্ভব নয়− পিতা এসব গ্রহণ করতে বারণ

করেছেন। মানুষ মনে-প্রাণে তাকে উপহার উপঢৌকন দিতে চাইতো কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন–

ازْهَدْ فِي الدنيا يُحِبُّكَ اللهُ و ازْهَدْ بِمَا فِي أَيدِي النَّاسِ يحبُّكَ الناسُ —

অর্থ : দুনিয়ার ব্যাপারে নির্মোহ হয়ে যাও আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন আর মানুষের হাতের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে নির্মোহ হয়ে যাও মানুষ তোমাকে ভালবাসবে।

তার যুগে খালকুল কুরআন নিয়ে এক বিরাট ইখতেলাফ শুরু হয়। একদল ভ্রান্ত আক্বীদার লোক বলতে থাকে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি- অন্যান্য সৃষ্টির মতো এটাও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। বলেন, অসম্ভব! কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি নয়। বরং এটা আল্লাহর কথা। আল্লাহর সিফাত। আল্লাহ যেমন অনন্ত, আল্লাহর সিফাতও তেমনি অনন্ত।

খলীফা মামুন খলকে কুরআনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) কে গ্রেফতার করে নিয়ে এলেন। উদ্দেশ্য তাকে শাস্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে তার মন থেকে এই বিশ্বাস দূর করা। খলীফা মামুনের মৃত্যু হলে খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ ক্ষমতায় এলো। সেও তাকে শাস্তি দেয়া শুরু করলো। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) দীনের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় অবিচল রইলেন। আঠারো বৎসর তিনি কষ্ট সহ্য করলেন। এর মাঝে তিন জন খলীফার পরিবর্তন হলো। কিন্তু তিনি তাঁর আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে সরে এলেন না। তারপর খলীফা ওয়াসেক ক্ষমতায় এলে খলকে কুরআনের বিষয়টি প্রত্যাহার করে নিলেন এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) কে মুক্তি দিলেন।

খলীফা ওয়াসেক তাকে উপহার দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। খলীফা তখন তার ছেলেদের মাধ্যমে তাকে সহায়তা করতে চাইলেন। ছেলেদেরকে উপহার সামগ্রী দিলেন। তারা তা গ্রহণ করে নিলো।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এ কথা জানতে পেরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি তার ছেলেদের থেকে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে দিন গুজরান করতে লাগলেন।

একদা আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসক এসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বললেন, একটি ছাগলের মাথা ভুনা করে খেলে ইনশাআল্লাহ ভাল হয়ে যাবেন। তিনি একটি ছাগলের মাথা ক্রয় করে বললেন, যাও এটা ভুনা করে নিয়ে এসো। তাঁর এক চাচা ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো সালেহ। তার চুলা থেকে তা ভুনা করে আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে তা ভুনা করা হয়েছে। বলা হলো, আপনার চাচা সালেহ-এর চুলা থেকে। তিনি বললেন, আমি তা খাবো না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর প্রভাব এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, জ্বিনরা পর্যন্ত তাকে ভয় করতো। খলীফা ওয়াসেকের নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হলো, তাকে জ্বিনে ধরেছে। খলীফা বললেন, যাও আহমদ ইবনে হাম্বলকে ডেকে নিয়ে আসো। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এলেন। খলীফা বললেন, এই জ্বিনে ধরা লোকটির চিকিৎসা করে দিন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তখন জ্বিনে ধরা লোকটির মাধ্যমে জ্বিনের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, হে জ্বিন! তুমি চলে যাও। কিন্তু জ্বিন গেলো না। তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) জ্বিনকে ধমক দিলেন এবং শাসালেন। জ্বিন তখন লোকটিকে ছেড়ে চলে গেলো। যাওয়ার আগে কয়েকবার বললো, হে আহমদ! তুমি আল্লাহকে ভয় করেছো তাই সবাই তোমাকে ভয় করে। জ্বিন আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলো। তিনি মৃত্যুবরণ করলে আবার জ্বিন এসে ঐ ব্যক্তিকে ধরলো। লোকেরা আবার তাকে খলীফার নিকট আনলো এবং জ্বিন ছাড়ানোর জন্য একজন শাইখকে আনা হলো। শাইখ এসে যখন জ্বিনকে ধমক দিলো জ্বিন তখন হাসতে লাগলো। বললো

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। তুমি ধমকালে কি হবে- তুমি তো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল নও।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)-এর নিকট কোন জ্বিনে ধরা মানুষ নিয়ে আসা হলে তিনি জুতা দিয়ে পিটিয়ে জ্বিন তাড়িয়ে দিতেন।

বেশ কিছু সাহাবী ও তাবেঈর জীবনী পাঠে জানা যায় যে, বনের হিংস্র বাঘও তাদের ভয় করতো। একজন তাবেঈ ছিলেন, তাঁর নাম ছিলো সিলা ইবনে আশইয়াম। এক মুজাহিদ বলেন, আমরা কাবুলের যুদ্ধে ছিলাম। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল তখন ঘন বনে অন্ধকার ছিলো। ছিলো হিংস্র প্রাণীর অভয়ারণ্য। আমি মহান তাবেঈ ছিলা ইবনে আশইয়াম (রহঃ) কে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, আজ রাত তিনি কি করেন তা পর্যবেক্ষণ করবো। রাত গভীর হয়ে পড়লে সবাই যখন নিদ্রার কোলে অচেতন, তখন তিনি আস্তে সৈন্য বাহিনীর তাঁবু থেকে বেরিয়ে বনে প্রবেশ করলেন। তিনি অজু করে নামায পড়তে লাগলেন। আর আমি দূর থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, এক বাঘ এলো। ভয়ে তো আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমি একটি উঁচু গাছে উঠে পড়লাম। ভাবলাম, দেখবো বাঘটি কি করে। বাঘটি এগিয়ে এলো। কিন্তু তিনি তার নামায ছাড়লেন না। বাঘটি তার শরীরের ঘ্রাণ নিতে লাগলো। দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ শুনতে লাগলো। নামায শেষ হলে দেখলাম, সিলা ইবনে আশইয়াম বাঘের কানে বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। আর বাঘ নতশিরে চলে গেলো। মনে হয় তিনি বাঘকে বলেছিলেন ; এখানে তোমার খাবার নেই। আমাকে তুমি খেতে পারবে না। সুতরাং অন্য দিকে চলে যাও। এরপর তিনি সারা রাত জেগে নামায পড়লেন। সকালে তাঁকে দারুণ উদ্যমী দেখাচ্ছিলো। যেন তিনি এইমাত্র বিছানা ছেড়ে এসেছেন। অথচ আমি ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক আযাদকৃত গোলাম ছিলেন । তার নাম সাফীনা। তিনি একদা মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে নৌযানে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। নৌযানটি তুফানের আঘাতে ভেঙ্গে গেলে তিনি তীরে গিয়ে উঠলেন। চারদিক ছিলো অরণ্যে ঘেরা। বিপদের উপর আরেক বিপদ এসে উপস্থিত হলো। একটি বাঘ বন থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না। বাঘটি দেখে তিনি তার দিকে এগিয়ে এলেন। তার কান ধরে বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আযাদকৃত গোলাম সাফীনা। একথা শোনার সাথে সাথে বাঘ মাথানত করলো। সাফীনা (রাঃ) বাঘের পিঠে চড়ে বসলেন। বাঘ তাকে বনের বাইরে নিয়ে এলো। তারপর হালুম হালুম চিৎকার করে তাকে বিদায় জানালো।

হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)-এর নেতৃত্বে যেদিন বাহরাইন পদানত হলো, মরুর বুক চিরে তারা বাহরাইনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় তাদের পানি শেষ হয়ে গেলো। হাহাকার পড়ে গেলো মুজাহিদ বাহিনীতে। সকলের মৃত্যুর উপক্রম হলো। তখন তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের সাহায্য করো। আমাদের সহায়তা করো। সাথে সাথে আকাশে ঘনকালো মেঘমালা উদিত হলো। আর ঝপঝপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। বৃষ্টির পানি পান করে তারা তৃপ্ত হলেন। পানিতে মশক ভরে নিলেন। তারপর তারা সমুদ্রোপকূলে পৌঁছলেন। সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্য তাদের না ছিলো কোন নৌযান, না ছিলো অন্য কিছু। তিনি দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। বললেন–

أللهم يا عظيم .... يا حليم .... يا كريم .... أجزنا

অর্থ : হে মহান সত্ত্বা! হে সহনশীল সত্ত্বা! হে দয়াময় সত্ত্বা! আমাদের পার করে দিন। তারপর তারা পানির উপর দিয়ে হেঁটে ওপারে গেলেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন–

فواللهِ ما ابتلَّ لنا قَدَمٌ و لا خُفٌّ و لا حافرٌ و لا خفُّ جملٍ و لا حافرُ حصانٍ و لا قدمُ إنسانٍ و كنّا قرابةَ أربعةِ آلافٍ —

অর্থ : আল্লাহর শপথ করে বলছি, সেদিন আমাদের কারো পা পানিতে ভিজেনি। কোন উটের খুর, কোন ঘোড়ার পাও পানিতে ভিজেনি। আমরা প্রায় চার হাজার যোদ্ধা ছিলাম।

উকবা ইবনে নাফে (রহঃ) তিউনিশিয়ায় পৌঁছে কাসাব্লাংকা শহর তৈরী করতে ইচ্ছে করলেন। তিনি তার সঙ্গী-সাথীদের সাথে পরামর্শ করলেন। বললেন, আমি এখানে একটি শহর তৈরী করতে চাই। সঙ্গী-সাথীরা বললো, এই গহীন বনের মাঝে আপনি শহর তৈরী করবেন? হিংস্র পশুরা তো আমাদের গিলে খাবে!

তিনি বললেন, "তোমরা একটু দাঁড়াও। তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং চিৎকার করে হুকুম দিলেন, হে হিংস্র পশু-প্রাণীরা! হে বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুরা! আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৈনিক। আমরা এখানে অবস্থান করতে চাই। সুতরাং তোমরা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাও"।

এর কিছুক্ষণ পরই দেখা গেলো, সাপরা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। বাঘ-সিংহ সব বন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বন একেবারে খালি হয়ে গেলো। তারা সেখানে কাসাব্লাংকা শহর গড়ে তুললেন।

জনৈক কবি এক চমৎকার পংক্তি রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

لیسَ منْ یقطعُ طرقًا بطلاً إنما منْ یتّقی اللهَ بطلا —

অর্থ : নিশ্চয় যে ব্যক্তি পথে ডাকাতি করে সে বীর নয়। প্রকৃত বীর ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভয় করে।

তাই তাক্বওয়া হলো অত্যন্ত শক্তিশালী বিষয়। যে আলেম আল্লাহকে ভয় করে, যার মাঝে তাক্বওয়া আছে, সে হলো নবীদের উত্তারাধিকারী। একদা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বাজারে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "হে লোকেরা! তোমরা এখানে কী করছো, অথচ রাসূলের মীরাস মসজিদে বন্টন করা হচ্ছে"। লোকেরা এ কথা শুনে মসজিদে ছুটে গেলো। দেখলো, কিছু মানুষ কুরআন তিলাওয়াত করছে আর কিছু মানুষ নামায পড়ছে। ফিরে এসে তারা আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বললো, হে আবু হুরায়রা! কোথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীরাছ বন্টন করা হচ্ছে। আপনি তো আমাদের কষ্ট দিলেন!

উত্তরে আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ইলম ছাড়া অন্য কিছু রেখে গেছেন? নবীরা দিনার বা দিরহাম রেখে যান না, তারা ইলম রেখে যান"।

যেসব আবেদ অজ্ঞ, তারা খৃস্টানদের আবেদদের স্বভাবপুষ্ট। আর যেসব আলেম আলেম হওয়া সত্ত্বেও পাপ কাজ করে, তারা ইহুদীদের আলেমদের মতো।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

(٣٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ○

অর্থ : হে মু'মিনরা! নিশ্চয় ইহুদীদের আলেমরা আর খৃস্টানদের আবেদরা অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে। আর যারা স্বর্ণ ও চাঁদি পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, আপনি তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দিন।

উল্লেখিত আয়াতে كنز শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তার অর্থ হলো পুঞ্জিভুত সম্পদ। তবে আলেমগণ বলেছেন– যেসব সম্পদের যাকাত আদায় করা হয়, তা পুঞ্জিভূত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যে সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় না, তা হলো পূঞ্জিভুত সম্পদ বা কানয।

তাহলে নারীদের অলঙ্কার, হাতের কঙ্কন, গলার হার এ ধরনের স্বর্ণের অলঙ্কারের কি যাকাত দিতে হবে? যদি কেউ তার যাকাত না দেয়, তাহলে কি তা পুঞ্জিভূত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে, না হবে না?

অধিকাংশ আলেমের অভিমত, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ), মালেক (রহঃ) ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতানুযায়ী নারীর অলঙ্কার তার পরিমাণ যত বেশী হোক না কেন তার যাকাত না দিলেও তা كنز বা পুঞ্জিভুত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন– এর যাকাত না দিলে তা কানয-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। অপর এক অভিমতে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন– আমি এ ব্যাপারে কিছু বলবো না। আল্লাহর নিকট কল্যাণ কামনা করবো। তিনি ব্যাপারটিতে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। তাই কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা দেননি।

আর ঘোড়ার যাকাতের ব্যাপারে আলেমরা বলেছেন– জিহাদের ঘোড়ার যাকাত দিতে হয় না। তবে ব্যবসার ঘোড়া হলে তার যাকাত দিতে হবে।

হ্যাঁ, যদি কারো ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গাড়ি বা বাড়ী থাকে, তাহলে তার যাকাত দিতে হবে না। কারণ, উৎপাদনশীল সম্পদের যাকাত প্রদান করা হয়। যে সম্পদের কোন উৎপাদন নেই, যা দ্বারা কোন লাভ হয় না এমন সম্পদের যাকাত দিতে হবে না। ব্যক্তিগত ব্যবহার্য গাড়ি বা বাড়ীতে তো কোন উৎপাদন নেই, তাই এর যাকাতও নেই।

হ্যাঁ, যদি ব্যবসার জন্য গাড়ি ক্রয় করা হয়, তবে অবশ্যই তার যাকাত দিতে হবে। তবে এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে যে, প্রত্যেক মাসের লভ্যাংশ থেকে যাকাত আদায় করবে, না বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হিসাব করে যদি নেসাব পরিমাণ পাওয়া তাহলে তার যাকাত আদায় করবে। শাইখ ইউসূফ কারযাবী (রহঃ) বলেন, যেসব গাড়ি বা বাড়ী ভাড়া দেয়া হয়, তার যাকাত প্রত্যেক মাসেই মাসের যাকাত পরিশোধ করতে হবে। তা উশরের ন্যায়।

কিন্তু শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ) বলেছেন– বৎসরের শেষে হিসাব করবে। যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, তবেই যাকাত দিতে হবে।

ষোড়শ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٣٦) إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○ (٣٧) إِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ○

অর্থ : নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মাঝে তোমরা যুদ্ধ করো সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। এমাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে। যার ফলে কাফেররা গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা একে এক বৎসর হালাল করে নেয় এবং হারাম করে নেয় অন্য বৎসর। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করে দেয়া হলো। আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (সূরা তওবা , আয়াত :৩৬ - ৩৭)

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই আল্লাহ তা'আলা বারটি মাস নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই এ মাসগুলোতে কোন পরিবর্তন হবে না। মানুষ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা এসব কিছু নির্ধারণ করেছেন। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসের আলোকে এ তথ্য জানা যায়।

তাই এ বিষয়গুলোতে অনধিকার চর্চা করা বা এ বিষয়গুলোকে হাসি তামাশার বিষয় বানানো উচিৎ নয়। এ বার মাসের চার মাস সম্মানিত মাস। তা হলো, এক সাথে পর্যায়ক্রমে তিন মাসঃ জিলক্বদ, জিলহজ্জ ও মুহাররম। চতুর্থ মাসটি হলো, জুমাদাস সানী ও শাবানের মধ্যবর্তী রজব মাস।

এ পবিত্র মাসগুলোতে আরবরা যুদ্ধ না করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জুমাদাস সানী মাসে অভিযানে পাঠালেন। কুরাইশদের কাফেলার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে তাকে পাঠানো হলো। জুমাদাস সানী মাসের শেষ রাত, না রজব মাসের শুরু রাত। ঘটনাক্রমে এ রাতেই তাদের সামনে দিয়ে কাফেরদের কাফেলা গেলো। দেখলেন, যদি এ রাতে আক্রমণ না করেন, তাহলে নিরাপদে কাফেলাটি মক্কা চলে যাবে। আর ধরা যাবে না। তাই নানা সন্দেহ আর ধারণা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে আক্রমণ করে বসলেন। আসলে সে রাতটি ছিলো রজব মাসের প্রথম রাত।

এ ঘটনার পর মক্কার কাফেররা চিৎকার শুরু করলো। তারা চারদিকে ঘোষণা করতে লাগলো, মুহাম্মদ শান্তি-শৃঙ্খলা মানে না। পবিত্র মাসের কোন পরওয়া করে না। পবিত্র মাসে সে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন–

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ○

অর্থ : তারা সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথে বাঁধা দেয়া এবং সেখানের অধিবাসীদের বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও মহাপাপ। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ২১৭)

অর্থাৎ, হ্যাঁ, এতে সন্দেহ নেই যে, পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা অন্যায় কাজ, মারাত্মক অপরাধ। কিন্তু তার চেয়ে অপরাধ হলো আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথে বাঁধা সৃষ্টি করা আর সেখানের অধিবাসীদের উৎখাত করা। আর শিরক করা তো মহাপাপ, নরহত্যার চেয়েও গুরুতর পাপ। তোমরা যে শিরকের দিকে লোকদের আহবান করছো, তা আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের, আমর ইবনে হাজরামীকে ভুলবশত হত্যা করার চেয়ে বেশী ও গুরুতর অপরাধ।

কুরাইশদের কাফেলার উপর এ আক্রমণকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহজে মেনে নিতে চান নি। তার মাঝে তা দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো। কাফেলার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্র করে রেখেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের অনুগত সহযোগীদের মাঝে তা বণ্টন করে দিলেন না। এতে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) ও তার সহযোদ্ধা সাহাবীরা দারুণ দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাঁরা আক্ষেপে জর্জরিত হলেন। সেই পরিস্থিতিতে উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হলো। ফলে রাসূলের চেহারায় প্রফুল্লভাব ফিরে এলো। আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও তার সঙ্গীদের মাথা থেকে দুঃশ্চিন্তার ভার নেমে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গণীমতের মাল আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও তার সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। এ ঘটনার দেড় মাস পর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আল্লাহ তাতে মুসলমানদের বিজয় দান করেন।

বলছিলাম, পবিত্র মাস অর্থাৎ চার মাস আরবদের নিকট পবিত্র মাস ছিলো। জাহেলী যুগে এ মাসগুলোতে কেউ কাউকে হত্যা করতো না। বালাদে হারামে অর্থাৎ মক্কা ও আশপাশের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে কাউকে হত্যা করতো না। এ সময় তারা কোন সাহাবীকে হত্যা করতে চাইলে মক্কার বাইরে 'তানয়ীমে' নিয়ে যেত। সেখানে তারা হত্যার আয়োজন করতো। যায়েদ ইবনে দাসনা ও খুবাইব ইবনে আদী (রাঃ)-এর ব্যাপারে তাই হয়েছিলো। তারা কা'বাকে সম্মান করতো। ইসলামের আগমনের পর ইসলামও এ প্রথাকে বহাল রাখলো। পবিত্র মাসে হত্যা না করাকে বহাল রাখলো। মক্কায় হত্যা করাকে অবৈধ ঘোষণা করলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ○

অর্থ : আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। (সূরা বাকারা, আয়াত ঃ ১৯১)

কিন্তু কয়েক বৎসর পর সম্মানিত মাসে যুদ্ধ না করার বিধান রহিত হয়ে যায় এবং ইসলাম তা বৈধ ঘোষণা করে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অষ্টম হিজরীতে জ্বিলক্বদ মাসে তায়েফ অবরোধ করলেন। অষ্টম হিজরীতে রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে গমন করেন। শাওয়াল মাসে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারপর শাওয়াল মাসেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম তায়েফে যান এবং অবরোধ করেন। অবরোধকাল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। এমনকি তা জ্বিলক্বদ মাসে গিয়ে পৌঁছে।

এভাবে অষ্টম হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম দ্বারা বুঝে আসে যে, পবিত্র মাসে যুদ্ধ হারাম হওয়ার বিধান রহিত রয়ে গেছে। এ মত পোষণ করেছেন হযরত কাতাদা, আতা, জুহরী, সুফিয়ান সওরীসহ আরো অনেকে।

তবে কতিপয় আলেম এখনো এ কথায় অবিচল যে, পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা হারাম। ইবনে জুবাইজ বলেন, আতা ইবনে আবী রাবা আল্লাহর নামে কসম করে বলেছেন– মানুষের জন্য হারামে মক্কায় যুদ্ধ করা বৈধ নয়। পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা বৈধ নয়। তবে কেউ শুরু করলে তার সাথে যুদ্ধ করা বৈধ হবে।

তবে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, প্রথম মতই বিশুদ্ধতর। পবিত্র মাসে যুদ্ধ হারাম হওয়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে।

তাই মনে রাখতে হবে, আলোচিত চার মাস কিন্তু ঐ চার মাস নয় যার আলোচনা সূরার শুরুতে করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فإذا انسلخَ الأشهرُ الحرمُ فاقتُلُوا المشركينَ حيثُ وجدتُموهم —

অর্থ : নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা করো।

সূরার শুরুতে যে চার মাসের আলোচনা করা হয়েছে, তা সফর করা বা স্থানান্তরিত হওয়ার অনুমতির চার মাস। এ চার মাসে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অনুমতি দিয়েছেন তারা যেখানে খুশি সেখানে চলে যাবে। সফর করবে। তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে না। তাদের পিছু ধাওয়া করা হবে না। এ চার মাস শেষ হয়ে গেলে তাদের যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে। এ চার মাস বিশেষ সময়।

এ সময়ে মুশরিকদের নিরাপদে চলাফেরার সুযোগ দেয়া হয়েছে। আবু বকর (রাঃ) নবম হিজরীতে হজ্জ আদায় করে সমবেত কাফের মুশরিকদের মাঝে এ ঘোষণা দিলেন-

آذانٌ منَ اللهِ و رسولِه إلى الناسِ يومَ الحجِ الأكبرِ أنَّ اللهَ بريءٌ من المشركينَ و رسولُــه —

অর্থ : আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদের নিকট ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও।

নবম হিজরীর জ্বিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে আবু বকর (রাঃ) এ ঘোষণা করে দিলেন। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম নবম হিজরীতে হজ্জ করতে ইচ্ছে করলেন না। কারণ, মুশরিকরা বিবস্ত্র হয়ে তাওয়াফ করে। তারা নানা কুসংস্কারের আয়োজন করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইলেন মসজিদে হারাম ও হজ্জকে এসব বিষয় থেকে পবিত্র করতে। যেন বিবস্ত্র হয়ে কেউ কখনো হজ্জ করতে না পারে। আবু বকর (রাঃ) এ ঘোষণা দিয়ে দিলেন। আর আলী (রাঃ) চারটি বা পাঁচটি বিষয়ের কথা মানুষকে সুউচ্চ কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন। বললেন–

أن لا يحجَّ بالبيت عريانٌ و لا تدخل الجنة نفسٌ مشركةٌ و لا يحجُّ بعد العام مشركٌ ، و من كان بينه و بين الرسولِ صلى الله عليه و سلَّمَ عهدٌ فعهدُه إلى مدتِه —

অর্থ : কোন বিবস্ত্র মানুষ বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না। কোন মুশরিক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ বৎসরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। তবে রাসূলের সাথে যার বিশেষ কোন প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা তার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বহাল থাকবে।

এ ধরনের লোক ছাড়া সকল মুশরিককে চার মাসের অবকাশ দেয়া হলো। এ চার মাসের শুরু হবে জ্বিলহজ্জের দশ তারিখ হতে রবিউস সানীর দশ তারিখ পর্যন্ত। এ চার মাসে মুশরিকরা নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে। এরপর আর তাদের কোন অবকাশ দেয়া হবে না। তাদের যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে।

আর শরী'আতের বিধানে পবিত্র চার মাস বা আল্লাহর হুকুম দ্বারা যে চার মাস বুঝানো হয়, তা হলো জ্বিলক্বদ, জ্বিলহজ্জ, মহররম ও রজব মাস। এ চার মাসের বিধান আগের মতোই রয়ে গেছে। তাতে কোন পরিবর্তন আসেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাতে কোন পরিবর্তন করেননি। তাই এ চার মাসের বিশেষ ফযিলত রয়েছে। আবার এ সময় পাপ করলে তারও কঠিন শাস্তি রয়েছে। তবে অষ্টম হিজরীতে

আমলের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিধান রহিত করে দিয়েছেন। তিনি জ্বিলক্বাদ মাসে গিয়ে তায়েফ অবরোধ করলেন। ফলে পবিত্র এ চার মাসে যুদ্ধ রহিত থাকার বিধান রহিত হয়ে গেছে। তবুও এ চার মাসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এ মাসগুলোর বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ ইবাদত নির্ধারিত করেছেন। রমযান মাসে রোযা ফরয করেছেন। এ মাসগুলোতে আবার বিশেষ বিশেষ ইবাদত রয়েছে। যেমন জ্বিলহজ্জের প্রথম দশ দিন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ما مِن أيامِ العمَلِ الصَالِحِ فيهن أحبُّ إلى اللهِ منها في هذهِ الأيامِ ، فأكثِرُوا فيها من التكبيرِ و التهليلِ و التسبيحِ —

অর্থ : যে দিনগুলোয় পূণ্যের কাজ করা আল্লাহ তা'আলার অধিক প্রিয়, তা হলো এই দিনগুলো অর্থাৎ জ্বিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন। সুতরাং এদিনগুলোতে বেশী বেশী আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও সুবহানাল্লাহ পাঠ কর। (বুখারী)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশদিনকে বৎসরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন নির্ধারণ করেছেন। বলেছেন এ দশ দিনের মাঝেই রয়েছে লাইলাতুর কদর। রাসূল বলেছেন–

اِلتَمسُوا في العشْرِ الأواخرِ أو في الوترِ مِنَ العشرِ الأواخرِ —

অর্থ : তোমরা শেষ দশ রাতে লাইলাতুল কদরকে তালাশ কর। অথবা শেষ দশ রাতের বিজোড় রাতগুলোতে তা তালাশ কর।"

তেমনিভাবে প্রত্যেক মাসের আইয়ামে বীয অর্থাৎ ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযারও বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এভাবে অনেক ইবাদতের সম্পর্ক চন্দ্র মাসের সাথে।

তাই মুসলিম উম্মাহর জন্য অবশ্য কর্তব্য হলো চন্দ্র মাসের হিসাব ঠিক রাখা। চন্দ্র সনের গণনা রীতিতে কোন রকম পরিবর্তন করা যাবে না। কিছু কিছু আলেমের আমল দেখলে বড় দুঃখ লাগে। তারা জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ইত্যাদি মাসের তারিখ বলতে পারে। কিন্তু চন্দ্র মাসের তারিখ বলতে পারে না।

খলীফা উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর এক বিশেষ অবদান যে, তিনি হিজরী সনের প্রবর্তন করেছেন। মুসলিম জাতির উত্থানের শুরু হিজরত থেকে ধরে একটি স্বতন্ত্র সনের প্রবর্তন করেছেন। আমরা এখন হিজরী ১৪০৭ সনে রয়েছি। [ডঃ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহঃ) ১৪০৭ সনে এ বক্তৃতা দিয়েছিলেন]

লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফী আমাদের এ ঐতিহাসিক হিজরী সনে পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। লিবিয়াতে গাদ্দাফী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের দিন থেকে চন্দ্র সন গণনা শুরু করেছে। তাই লিবিয়ার ক্যালেন্ডারে এখন ১৩৯৭ সন চলছে।

গাদ্দাফী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করে। তার ইনতিকালের পর নাকি মানব জাতি এক ভীষণ বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে। গাদ্দাফী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। সে রাসূলের নামটি পর্যন্ত অপছন্দ করে। তাই সে লিবিয়ার মসজিদে রাসূলের নামের সাথে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলা নিষেধ করে দিয়েছে।

রাসূলের সুন্নতের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনতে পেয়েছি যে, সে কতিপয় বিখ্যাত আলেমকে মসজিদেই হত্যা করেছে। কারণ, তারা রাসূলের নামের সাথে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলেছিলো। তুরস্কের মুস্তফা কামালও তাই করেছিলো। সে বহু আলেমকে শুধু এ কারণে হত্যা করেছিলো যে, তারা ইউরোপিয়ান ক্যাপ পরতে অস্বীকার করেছিলো। রাজপথের এখানে-সেখানে সে ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপন করে আলেমদের হত্যা করেছিলো।

বর্ণনাকারী বলেন, রাজপথে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলন্ত মৃত আলেমদের স্মৃতি এখনো আমার স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। আমি দেখেছি তাদের সাদা দাড়িগুলো বাতাসে উড়ছিলো। ইউরোপিয়ান ক্যাপ পরিধান না করার কারণে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিলো।

আফগানিস্তানের বাদশাহ জহির শাহও তেমনিই লোমহর্ষক কাজ করেছিলো। আমেরিকা উপদেশ দিলো, যেন সে আফগানিস্তানে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করে। তাই সে মুসলিম নারীদের হিজাব ব্যবহার নিষিদ্ধ করলো। আফগানিস্তানের সর্বত্র এ আইন বাস্তবায়ন করা হলো। কিন্তু কান্দাহারের নারীরা তা মেনে নিলো না।

ফলে জহির শাহ তার ওলীর নেতৃত্বে সেখানে এক বাহিনী পাঠালো। কান্দাহারের জনসাধারণের সাথে তাদের সংঘর্ষ শুরু হলো। প্রায় এক হাজার মানুষ শাহাদাতের সুধা পান করলো। রক্তাক্ত পলাশের ন্যায় তারা লুটিয়ে পড়লো কান্দাহারের পথে-ঘাটে।

আমি বলছিলাম, তারিখ ও দিন-কাল আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত। এ বিষয়ে কোন বিরোধ নেই। সুতরাং মাস নিয়ে যা খুশি তা করা যাবে না। বার মাসকে কমানো যাবে না, বাড়ানো যাবে না। তাই ইংরেজরা গভীর ষড়যন্ত্র করে ইসলামী বিশ্ব থেকে ইরান ও আফগানিস্তানকে পৃথক করে দিতে চাইল। তারা একটি নতুন সনের সৃষ্টি করলো। তার নাম দিল "সৌর হিজরী সন।" এ সনে বার মাস। সৌর সনের মত ৩৬৫ দিনে এক বৎসর। ইরান আর আফগানিস্তানে এখন এই হিজরী সৌর সন চলছে। ফলে তারা ইসলামের ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত দিন-মাস ইত্যাদি নির্ধারণ করতে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এ সনকে তারা সৌর সনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের সূচনা থেকে আরম্ভ করেছে। পৃথিবীতে ইরান আর আফগানিস্তান এ সনের হিসাব অনুযায়ী চলে। এ সনের প্রথম মাস হলো حوت আর শেষ মাস হলো حمل । আর বৎসর শুরু হয় বসন্তকালের প্রথম দিন থেকে, যাকে নওরোজ বলে। সে দিনে ইরানের লোকেরা আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠে। পূর্বযুগে অগ্নি পূজারীরা এ দিনে উৎসব পালন করত। এ দিন থেকে তাদের বৎসর গণনা শুরু হয়। আপনি চিন্তা করলে বিস্মিত হবেন যে, ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার সময় এদেশে মাত্র একদিন সরকারী ছুটি থাকে। কিন্তু এই নওরোজ উপলক্ষে সরকার লাগাতার পনের দিন ছুটি দিয়ে থাকে। সর্বস্তরের সব শ্রেণীর মানুষ এর উৎসবে, মেলায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। নিশ্চয় এ প্রথা অগ্নি পূজারীদের সময় থেকে চলে আসছে।

মিসরের লোকেরাও বসন্তের এই প্রথম দিনে অত্যন্ত আনন্দের সাথে ফসীখ খেয়ে থাকে। ফসীখ হলো, মাছকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে মদের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা। এদিন ঐ মাছ মদের ভিতর থেকে বের করে। মাছগুলো তখন পঁচে দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। তারা তা মজা করে খায়। বসন্তের প্রথম দিনে মিসরের সর্বত্র ফসীখের গন্ধ পাওয়া যায়। ওরনাল গার্ডেনে তা খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। যারা ফসীখ খেতে অভ্যস্ত, তারা ছাড়া আর কেউ এর দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারে না। ইমাম সূয়ূতী (রহঃ) ফসীখ খাওয়াকে হারাম বলে ফতওয়া দিয়েছেন। তিনি এ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন, যার নাম হলো– ألف سيخ في عين من أباح أكل الفسيخ ।

আসল কথা হল, আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত মাসগুলো নিয়ে যা খুশি করা যাবে না। কারণ, এ মাসগুলোর সাথে অনেক ইবাদত সংযুক্ত। আল্লাহর কসম করে বলছি, 'সৌর হিজরী সনের' কোন অর্থ হতে পারে না, আপনি এ সনের ক্যালেন্ডার কিভাবে বুঝবেন, কখন আইয়ামে বীয আসে, কখন তা যায়। কখন হিজরী মাস শেষ হয়, আবার কখন শুরু হয়। কখন রমযান আসে। কখন জ্বিলক্বদ বা জ্বিলহজ্জ আসে। হিজরী সনের মধ্যে এমন বিকৃতি ঘটালে মুসলমানদের অন্তর থেকে ইবাদতের মাস ও দিনগুলোর মর্যাদা, মাহাত্ম্য নিঃশেষ হয়ে যাবে। ইবাদতের দিন-মাসগুলোর গুরুত্ব হারিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ○

অর্থ : নিশ্চয় আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত।

সুতরাং গাদ্দাফীর জন্য, ইরানীদের জন্য বা অন্য কারো জন্য এই মাসগুলো নিয়ে যা খুশি তা করার এখতিয়ার নেই। গাদ্দাফী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কত ঘৃণা করে, তা অনুধাবন করার জন্য একটি ঘটনাই যথেষ্ট। লিবিয়ায় গিয়েছিল এক ডাক্তার। তিনি আমাকে বলেছেন– শিক্ষিকাদের এক প্রশিক্ষণ কোর্স শেষ হলে বিদায়ী অনুষ্ঠানে গাদ্দাফীকে দাওয়াত দেয়া হলো। গাদ্দাফী উপস্থিত হলে এক মহিলা তাকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে বললেন–

الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، و الصلوةُ و السلامُ على أشرفِ المرسلينَ سيِّدنا محمد و على أَلِه و صحْبِه أجمعينَ —

অর্থ : সকল প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং সালাত ও সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল আমাদের সাইয়্যেদ মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিজন ও সকল সাহাবীর উপর বর্ষিত হোক।

তখন গাদ্দাফী দাঁড়িয়ে বলল, "তোমার সাইয়্যেদ হল তোমার স্বামী"।

মহিলা তখন আবার বললেন–

سيِّدنا محمد و على أَلِه و صحْبِه وسلَّم —

অর্থ : আমাদের সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ও তার পরিজন ও সাহাবীদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

তখন গাদ্দাফী আবার বলল, "তোমার সাইয়্যেদ হল তোমার স্বামী"।

আমার মনে হয়, গাদ্দাফীর রক্তধারায় ইহুদীদের রক্ত মিশ্রিত হয়েছে। গাদ্দাফী সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন বিপ্লবী মজলিসের সদস্য উমর সুহাইসী। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এভাবে ঘৃণা করা কোন আরবের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন মুসলমানের পক্ষেও সম্ভব নয়। তিনি হাদীসের ব্যাপারে নানা সন্দেহ পোষণ করেন। কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন। এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাকে বললেন, গাদ্দাফী যখন সুন্নাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন, তখন আলেম-উলামার উপর অত্যাচার শুরু করলেন। মসজিদে হাদীসের আলোচনা করতে নিষেধ করে দিলেন। তখন জাযীরার একদল আলেম তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। এ ব্যাপারে তার সাথে আলোচনা করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

আসরের নামাযের সময় হয়ে এলে গাদ্দাফী এসে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি ইমাম হয়ে নামায পড়ালেন। ফিসফিসিয়ে যা পড়লেন, তা বুঝা গেল। প্রথম রাকাতে পড়লেন–

بسم الله الرحمن الرحيم ، يا أيها الكافرون —

দ্বিতীয় রাকাতে পড়লেন–

بسم الله الرحمن الرحيم ، هو الله أحدٌ —

তিনি উভয় সূরার শুরুতে قُلْ শব্দটি পাঠ করা থেকে বিরত রইলেন। তৃতীয় রাকাতে তিনি বসে পড়লেন এবং বসেই রইলেন। তারপর সালাম বলে ঘাড় ফিরিয়ে নামায শেষ করে দিলেন।

আলেমগণ তাকে বললেন, আরে! আপনি এ কী করলেন? আপনি তো তিন রাকাত নামায পড়িয়েছেন।

গাদ্দাফী বললেন, আমাকে কুরআনের একটি আয়াত দেখান যাতে উল্লেখিত হয়েছে, আসরের নামায চার রাকাত!

আলেমগণ বললেন, কিন্তু আপনি তো কুরআনেরও বিকৃতি ঘটালেন! কুরআনে আছে– قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ আর আপনি বলছেন– يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ আপনি قُلْ শব্দটি বলেননি।

গাদ্দাফী বললেন, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদকে قُلْ বলে সম্বোধন করেছেন। আর আমরা তো মুহাম্মদ নই। সুতরাং আমাদের يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ বলে সূরাটি শুরু করতে হবে। এ কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। একেবারে চলেই গেলেন। আমাদের কোন কথাই তিনি শুনলেন না। এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো, এ মাসগুলোর সাথে অনেক ইবাদত মিশে আছে। রমযান মাস, হজ্জের মাস ইত্যাদি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

صُومُوا لرؤيتــه و افطرُوا لرؤيتــه —

অর্থ : তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা পরিহার কর। বিশেষ বিশেষ ইবাদত চাঁদের সাথেই সম্পৃক্ত। আল্লাহ তা'আলাও বলেছেন–

منها أربعةٌ حرمٌ ، ذلك الدينُ القيِّمُ ، فلا تَظلمُوا فيهنَّ أنفسَكُم —

অর্থ : তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মাঝে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। অর্থাৎ এ মাসগুলোর ব্যাপারে যা তা করো না। পরিবর্তন-পরিবর্ধন ইত্যাদি কিছুই করো না। এসব করে নিজেদের উপর যুলুম করো না।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

অর্থ : আর মুশরিকদের সাথে তোমরা সমবেতভাবে যুদ্ধ করো যেমন তারাও তোমাদের সাথে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

অর্থাৎ সকলে একত্রিত হয়ে চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত করে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যেমন তারা তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত করে যুদ্ধ করছে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ○

অর্থ : যদি তোমরা তা করতে না পার অর্থাৎ যদি ঐক্যবদ্ধ হতে না পার হে মুসলমানরা! তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা হবে, বিপর্যয় হবে, শিরক ছড়িয়ে পড়বে। কুফরী বিস্তার লাভ করবে।

তাই সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, একে অন্যের সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে, একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। তারপর কাফেরদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

উম্মাহর সকলকে কয়েক অবস্থায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সে সময় জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। অন্যথায় স্বাভাবিকভাবে জিহাদ ফরযে কিফায়া। সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈদের যুগে জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকাল ছিল ইসলামের বিজয়কাল। এ সময়ে মুসলমানরা নতুন নতুন অঞ্চল পদানত করেছিল। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) এর পুরো শাসনামলে জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল। এ সময়েও মুসলমানরা নতুন নতুন এলাকা পদানত করেছিল। আর নতুন এলাকা বিজয় করার জন্য জিহাদ করা ফরযে কিফায়া। আলেমগণ বলেছেন– বছরে একবার বা দুইবার খলিফা যদি কাফেরদের রাষ্ট্রে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেন, তাহলে উম্মতের পক্ষ থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর যদি একবারও না পাঠান তবে সবাই গুনাহগার হবে। তারা এ কথা জিযিয়ার উপর কিয়াস করে বলেছেন। অর্থাৎ যেভাবে বৎসরে একবার জিযিয়া দিতে হয়, ঠিক তেমনি বৎসরে একবার হলেও একদলকে জিহাদ করতে হবে। অন্যথায় সবাই পাপী হবে।

আর জিহাদ ফরযে আইন হলে তখন সবার উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়। কয়েক অবস্থায় এ বিধান মুসলিম উম্মাহর উপর আরোপিত হয়।

প্রথম অবস্থাঃ এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর সবাই একমত। আমি কোন আলিমকে এ বিষয়ে মতবিরোধ করতে দেখিনি। তা হল, যদি কাফেররা মুসলিম দেশের কোন জায়গা-চাই তা পাহাড় পর্বত হোক, সমভূমি হোক বা বিজন মরুভূমি হোক– এক বিগত পরিমাণ জায়গাও দখল করে নেয়, তখন সেই দেশের মুসলিম জনগণের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়।

তাই আফগানিস্তানে যখন কমিউনিস্টরা এসে আক্রমণ করল, তখন আফগানের প্রত্যেক নাগরিকের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেল। আমি হাদিস, ফিকাহ, তাফসীর সব বিষয়ের কিতাবে দেখেছি যে, এ অবস্থায় জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন হয়ে যায়। তাই তখন বধূরা স্বামীর অনুমতি ছাড়া, গোলাম তার মালিকের অনুমতি ছাড়া, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণদাতার অনুমতি ছাড়া, সন্তান পিতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

যদি সেই আক্রান্ত দেশের মুসলিম জনগণ তাদের দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে সমর্থ না হয়, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তী দেশের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে। সুতরাং আফগানিস্তানের মুসলমানরা একা যখন কমিউনিস্টদের বিতাড়নে সক্ষম হচ্ছিল না, তখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বা দেশ অর্থাৎ পাকিস্তান ও ইরানের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয হয়েছিল। অর্থাৎ আফগানিস্তান থেকে কমুনিস্টদের বিতাড়নে পাকিস্তান, ইরানের মুসলমানদের উপরও জিহাদ ফরয হয়েছিল। যদি তারাও যথেষ্ট না হয় বা জিহাদে উৎসাহী না হয় বা অন্য কোন কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না যায়, তাহলে ইরানের পরবর্তী আরব দেশের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে। তারাও যদি জিহাদে না যায় বা যথেষ্ট না হত তাহলে তাদের পাশ্ববর্তী মিসর, জর্দান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের মুসলমানদের উপর আফগানিস্তানকে রক্ষার জন্য জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে যেত। কোন রকমেই তা পরিহার করা যেত না। মুজাহিদদের সংখ্যা কম হোক বা বেশি হোক। তারা পদব্রজে জিহাদে যাক বা আরোহণ করে যাক সর্বাবস্থায় তাদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে। যেমন নামাজ রোজা ইত্যাদি পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

আমি কোন আলিম-ফকিহ বা মুফাসসিরকে এ যুগের হোক বা অতীত যুগের হোক কাউকে এ কথা বলতে বা লিখতে দেখিনি যে, এ অবস্থায় জিহাদ ফরযে কিফায়া হয়। সবাই বলেছেন– এ পরিস্থিতিতে সন্তানের জন্য পিতা-মাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই। বিবাহিত নারীদের জন্য স্বামীর অনুমতি নেয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, যেসব বালক এখনও প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি, দাঁড়ি গোঁফ গজায়নি, তারা অভিভাবকের সাথে জিহাদে যাবে। তেমনিভাবে বিবাহিত মহিলারা তাদের মাহরামের সাথে জিহাদে যাবে। স্বামীর তাতে বাঁধা দেয়ার কোন অধিকার নেই। নারীরা তার ভাই, পিতা বা চাচাদের সাথে জিহাদে যাবে। অর্থাৎ জিহাদের ময়দানে নারীর সাথে এমন কেউ থাকতে হবে যে তার ইজ্জত আব্রু রক্ষা করবে। কারণ মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়–

إِنَّما هي لحمٌ على وضم ، فالنفوسُ تطمعُ فيها إنْ لَمْ يكُنْ عندَها مَحْرَمٌ —

নারী হল কসাইয়ের গোশত কাটার কাষ্ঠখণ্ডের উপর রাখা গোশতের ন্যায়। তাই নারীর পাশে যদি তার মাহরাম পুরুষ না থাকে, তাহলে ভিন্ন পুরুষের মন তার দিকে লালায়িত হয়।

সুতরাং জিহাদ আজ থেকে ফরযে আইন হয়নি। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে যখন খৃস্টান বাহিনীর হাতে স্পেনের পতন ঘটল, তখন থেকে মুসলিম উম্মাহর উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে। সুতরাং স্পেন, বুখারা, সমরখন্দ, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া ইত্যাদি মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলো কাফেরদের হাত থেকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত জিহাদ ফরযে আইন থাকবে।

মনে করুন আপনি আফগানিস্তানে জিহাদ করে আফগানিস্তানকে শত্রুমুক্ত করলেন। এতেই কিন্তু আপনার উপর থেকে জিহাদের দায়িত্ব পালন শেষ হবে না। কারণ, জিহাদ হলো জীবনব্যাপী ইবাদত। গোটা জীবন এ ইবাদত করতে হবে। যেমন, নামায রোযা সারা জীবন পালন করতে হয়। তাই আপনি এ কথা বলতে পারবেন না, আমি এ সপ্তাহ নামাজ পড়েছি আগামী সপ্তাহ বিশ্রাম নিব, নামায আদায় করবো না। তেমনিভাবে একথাও বলতে পারবেন না, আমি আফগানিস্তানে জিহাদ করে তা শত্রুমুক্ত করেছি। সুতরাং আমি এখন বিশ্রাম নিব। অথবা এ বৎসর জিহাদ করব এবং আগামী বৎসর বিশ্রাম নিব। এ ধরনের চিন্তা করা যাবেনা। তবে হ্যাঁ, বিশ্রাম অবশ্যই নিতে হবে। হৃদয়কে আনন্দিত রাখতে হবে। যদি আপনি অবিবাহিত হন তাহলে বৎসরে দু'মাসের জন্য অবশ্যই পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাত করতে যেতে হবে। তাই বলা হয়–

رَوِّحُوا قلوبَكم ساعةً بعد ساعةٍ —

তোমরা তোমাদের হৃদয়কে কিছুদিন পর পর আনন্দিত কর, উল্লসিত কর। প্রশান্তি দাও।

আর যদি আপনি বিবাহিত হয়ে থাকেন, তাহলে পাঁচ মাস অন্তর অন্তর স্ত্রীর নিকট যাবেন। একমাস বা দেড় মাস সেখানে কাটাবেন। তারপর আবার রণাঙ্গনে ফিরে আসবেন। আপনাকে অবশ্যই আপনার স্ত্রীর হক ও প্রয়োজনসমূহ আদায় করতে হবে।

অনেকে আছে জিহাদে আসে কসম পূর্ণ করার জন্য। জিহাদের ময়দানের পার্শ্ব দিয়ে একটু ঘুরেই ফিরে যায়। তাদের অবস্থা দেখে কুরআনের এক আয়াতের কথাই মনে পড়ে যায়। আয়াতটি হল–

فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

অর্থ : অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহর দিকে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহর, তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌঁছে যায়। তারা যা ফয়সালা করেছে তা কতোই না নিকৃষ্ট। (সূরা আনআম-১৩৬)

আমাদের অবস্থা হল, তিন মাস কেউ ছুটি পেল। এক মাস এমনিতেই চলে যায়। এক মাস ছেলেমেয়েদের সাথে, স্ত্রী পরিজনদের নিয়ে কেটে যায়। তাদের নিয়ে বিমানে বা গাড়িতে করে অবসর সময় কাটানোর জন্য দূরে কোথাও যাওয়া হয়। আবহাওয়া পরিবর্তন করা হয়।

এসব করে সময় শেষ হয়। সবশেষে আফগানিস্তানের জন্য বাকী থাকে এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ। খুব বেশি হলে এক মাস। এ সময়টুকু অসহায় মযলুম আফগানীদের জন্য ব্যয় করা হয়, যেখানে কমিউনিস্ট কাফেরদের হাতে নির্মমভাবে যবেহ হচ্ছে মুসলমান নারী-পুরুষরা, নিষ্পাপ শিশুরা।

অথবা দেখা গেল, কেউ ইসলামাবাদে বা লাহোরে কোন সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য এল। যেমন বিশ্ব অর্থনীতি শীর্ষক কোন সম্মেলনে বক্তৃতা দেয়ার জন্য এল। সম্মেলনটি হবে ইসলামাবাদ হোটেল বা হলিডে ইন হোটেলে। চার, পাঁচ দিন থাকবে। তারা ইসলামের উপকার করার জন্য এসেছে। সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। তাতে আরব দেশ গুলোকে উপদেশ দেয়া হবে, তারা যেন সুদের লেনদেন না করে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি হয়ত তাদের নিকট গিয়ে বললাম, পেশোয়ারে চলুন, সেখানে আপনাদের প্রয়োজন আছে। তারা বলল, না, এখন আর দেরি করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি শেষ হয়ে গেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমন অবস্থায় আমি তাদের বলি, আল্লাহর কসম করে বলি, তোমরা পাপে লিপ্ত রয়েছ। তারা বিস্মিত হয়ে বলে, আমরা পাপে আছি! আমি দৃঢ়তার সাথে বলি, হ্যাঁ, তোমরা পাপে আছ। কারণ, তোমরা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দেখার ব্যাপারেও আগ্রহ প্রকাশ করছ না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ لم يهتمَّ بأمْرِ المسلمينَ فليسَ منهم —

অর্থ : যে ব্যক্তি মুসলমানের বিষয় নিয়ে চিন্তিত হয় না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তখন তারা বলে, তাহলে ইসলামাবাদ ও পেশোয়াররের মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও। আমি তখন ব্যথিত কণ্ঠে বলি, তোমরা তাহলে বালির বাঁধ দিয়ে পানি আটকানোর দৃশ্য দেখতে চাও। আমাদের সাথে এসো। দেখ, আমরা মানুষ দিয়ে বাঁধ দিয়ে ইসলামী বিশ্বকে কমিউনিস্টদের প্লাবন থেকে রক্ষা করছি। যদি এ বাঁধ ভেঙ্গে যায়, তাহলে গোটা ইসলামী বিশ্ব কমিউনিস্টদের লাল ফৌজদের প্লাবনে ভেসে যাবে।

অনেক সময় দেখা যায়, কেউ হয়ত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এল। এক মাস বা দেড় মাস লাহোরে থেকে সার্টিফিকেট নিল। তারপর শেষদিন চিন্তা করে, এতদূর যখন এলাম তাহলে পেশোয়ারটা একটু দেখে যাই। তখন আমার সাথে যোগাযোগ করে। এই প্রথম আমার সাথে তার সাক্ষাত। বলে, আমরা অমুক দিন পেশোয়ারে আসছি। লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার মাঝে তিন দিন ফাঁকা আছে। সুতরাং সাইয়াফ, হেকমতিয়ার ও রব্বানীর সাথে সাক্ষাতের একটি নির্ধারিত সময় দিন। তাদের কথায় মনে হয় যেন রব্বানী, হেকমতিয়ার আর সাইয়াফ তাদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। মনে হয় তারা এক বৈঠকেই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন সমস্যার সমাধান, আফগান সমস্যার সমাধান করে ফেলবে।

আমি তখন তাদের বলি, যদি আফগানিস্তানের সমস্যাটি তাদের কোন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সমস্যা হত, তাহলে কি তারা তাতে প্রত্যেক বছর এসে দশ দিন সেখানে কাটাতো না! আল্লাহর কসম করে বলছি, প্রয়োজনে তারা সেখানে বছরের অধিকাংশ সময় কাটাতো।

জনৈক উপস্থিত ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে আমি(ড. আব্দুল্লাহ আযযাম) বললাম, যদি কোন ব্যক্তি বিশেষের এমন পরিস্থিতি হয় যে, সে তার দেশে থাকতে বাধ্য; সশরীরে সে জিহাদে শরীক হতে অপারগ, তাহলে সে তার দেশেই থাকবে।

আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে জিহাদ করবে। আর যখনই সুযোগ পাবে জিহাদের ময়দানে চলে আসবে। আরেক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে মিটিয়ে দেয়ার চেয়ে কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। শত শত বরং হাজার হাজার মুসলমানকে নির্দয়ভাবে হত্যা করার চেয়ে কঠিন পরিস্থিতি মুসলিম উম্মাহর জন্য আর কী হতে পারে? অথচ তোমার অবস্থা হল, তুমি তোমার দেশে নিশ্চিন্তে বসে আছ। তোমার উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো দান করে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলছ। আমি জানি, তুমি আফগানিস্তানের জন্য যে অর্থ ব্যয় করছো, তা তোমার ছোট মেয়ের জন্য স্কুলে যা ব্যয় কর, তার সমপরিমাণও নয়।

তোমার ছোট মেয়েটি যদি তার পরিত্যক্ত কাপড়গুলো রেখে দেয়, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যে অর্থ ব্যয় করা হয় যদি তা রেখে দেয় আর তুমি তা আফগানিস্তানের জন্য ব্যয় কর, তাহলে তো তুমি বহু অর্থ দান করলে।

আমি আরব ভাইদের বিভিন্ন জায়গায় বলেছি, মিনায় বলেছি, হজ্জে বলেছি, রাবেতা আলমে ইসলামীর সভা-সম্মেলনে বলেছি, তোমরা আফগান জিহাদের জন্য সপ্তাহে একটি দিনকে নির্ধারণ করে নাও। সেই দিনটির নাম দাও 'পেপসি কোলা বর্জন দিবস'। সেই দিবসে কোন প্রকার পানীয় দ্রব্য ক্রয় না করে তার অর্থ আফগান জিহাদের ফান্ডে দান কর।

আমি বলেছি, সৌদি আরবের জনসংখ্যা সাত মিলিয়ন। তাদের প্রত্যেকে প্রতিদিন কমপক্ষে এক বোতল পানীয় কিনে পান করে। এক বোতল পানীয়র দাম আর কত? এক রিয়াল হবে। তাহলে দেখা যায়, প্রত্যেক সপ্তাহে আফগানিস্তানের জন্য সাত মিলিয়ন রিয়াল পাওয়া যাবে। আর এটা তো সহজেই অনুমেয় যে, অধিকাংশ মানুষই প্রত্যহ পাঁচ-সাত নয়, বরং তার চেয়েও বেশী বোতল পানীয় কিনে পান করে।

এ হিসাব মতে, প্রত্যেক মাসে আফগানিস্তানের জন্য আটাশ মিলিয়ন রিয়াল জমা হবে। তাহলে এ বিপুল অর্থ দ্বারাই আফগানিস্তানের জিহাদের খরচ চলে যাবে। এভাবে 'পেপসি কোলা বর্জন দিবস' পালন করেই আমরা আফগানিস্তানের জিহাদী কার্যক্রমকে চালিয়ে নিতে পারি। এখন চিন্তার বিষয়, মুসলমানরা কি এ

'পেপসি কোলা বর্জন দিবস' পালন করবে এবং নিজেকে সপ্তাহে এক দিনের জন্য তা পান করা থেকে বিরত রাখতে পারবে? যদি আমরা সত্যিই তা বাস্তবায়ন করতে পারতাম, তাহলে আফগানিস্তানে রুশদের দমন করার, তাদের পরাজিত করার জন্য এ অর্থই যথেষ্ট হত।

একদা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে জিজ্ঞেস করা হল, এক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্ষুধার্ত, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত। যদি আমরা তাদের আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা না করি, তাহলে তারা মৃত্যুবরণ করবে। ঠিক তখন জিহাদের ময়দানেও আমাদের অর্থের ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে। যদি জিহাদের জন্য অর্থ না দেই, তাহলে সেই লোকেরা ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করবে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা কী করব? কী আমাদের জন্য বাঞ্চনীয়? উত্তরে তিনি বললেন জিহাদের ফান্ডে অর্থ দান করে দাও। আর ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কারণ, ইসলাম জিহাদের প্রয়োজনে মুসলমানকে হত্যা করাও বৈধ করেছে। অর্থাৎ কাফেররা যদি মুসলমানদের মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, তাহলে জিহাদের প্রয়োজনে সেই মুসলমানদের হত্যা করে হলেও জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। এখানে তো ঢালরূপে ব্যবহৃত মুসলমানরা আমাদের কারণে মৃত্যুবরণ করছে। আমরা গুলি করে তাদের হত্যা করছি। আর দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে তো আমাদের কোন হাত নেই। আল্লাহ তাদের মাঝে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছেন। ফলে তারা মৃত্যুবরণ করছে। তাই শরী'আত যখন জিহাদের স্বার্থে, বৃহৎ মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে ঢালরূপে ব্যবহৃত মুসলমানদের হত্যা করা বৈধ করেছে, তাহলে জিহাদের জন্য আল্লাহর দেয়া দুর্ভিক্ষে কিছু মুসলমানকে মরতে দেয়াও অপরাধ হবে না। তাই বলছিলাম, আফগানিস্তানে, ফিলিস্তিনে বা পৃথিবীর যে যে প্রান্তে জিহাদ চলছে, সেখান থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকা বৈধ নয়। আর জিহাদ মানেই লড়াই। এটা চার ইমামের মত।

তারা বলেছেন– জিহাদ শব্দের অর্থ হল- আল্লাহর রাহে লড়াই করা, যুদ্ধ করা। কলমের জিহাদ বা জিহ্বার জিহাদকে শরী'আতের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়না। ফকীহরা যখনই জিহাদ শব্দ বলেন বা ব্যবহার করেন, তখন তার অর্থ হল যুদ্ধ-লড়াই।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল-

ماذا يعدلُ الجهادَ في سبيلِ الله ؟

আল্লাহর পথে জিহাদের সমান কোন আমল আছে কি?

উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, لا تَستَطِيعُونَه তোমরা তা পারবে না।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবার প্রশ্ন করা হল–

ماذا يعدلُ الجهادَ في سبيلِ الله ؟

আল্লাহর পথে জিহাদের সমান কোন আমল আছে কি? এবার উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

هل يستطيعُ أحدُكم أنْ يقومَ فلا يفترُ و يصُومُ فلا يُفطرُ —

তোমাদের কেউ কি রাত জেগে এমনভাবে নামায পড়তে পারবে যে, সে ক্লান্ত হবে না? আর এমনভাবে লাগাতার রোযা রাখবে যে কিছুই খাবে না, পান করবে না (দিনেও না রাতেও না)? সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একথা শুনে বললেন, مَنْ يستطيع ؟ এ কঠিন কাজ কে পারবে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

فذلك أجرُ المجاهد ، مثلُ المجاهد في سبيلِ الله كمثلِ الصائمِ القائمِ لا يفترُ عن صيامٍ و لا قيامٍ حتى يرجعَ المجاهدُ–

অর্থ : তা হল মুজাহিদের প্রতিদান। আল্লাহর পথের মুজাহিদের উপমা ঐ অবিরাম রাত্রি জাগরণ করে নামাযরত, অবিরাম সিয়াম সাধনারত ব্যক্তির ন্যায়; যে নামায আদায় থেকে, রোযা রাখা থেকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয় না। মুজাহিদ জিহাদ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত এমন প্রতিদান, এমন সওয়াব পেতে থাকে।

কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করে বলে, এখানে জিহাদ মানে জিহাদুন নফস। নফসের বিরুদ্ধাচরণই হল জিহাদুন নফস। আর তা সম্ভব, তবে সবাই তা পারে না। এ প্রসঙ্গে তারা একটি হাদীসের অবতারণা করে। হাদীসটি হল-

رَجَعْنا من الجهادِ الأصغرِ إلى الجهادِ الأكبرِ —

অর্থ : আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে ফিরে এলাম।

এটা জাল হাদীস। মানুষের বানানো হাদীস। এর কোন ভিত্তি নেই। যে জিহাদের অর্থ হল- আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা, তাকে ওরা বলে ছোট জিহাদ। আর জিহাদুন নফস হল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্থানে থাকা, সুস্বাদু খাবার খাওয়া। এসব নাকি বড় জিহাদ! আর আফগানিস্তানের জিহাদ হল মুষলধারায় বর্ষিত গুলীর মাঝে থাকা, কামানের গোলার সামনে বুক টান টান করে দাঁড়িয়ে থাকা। এগুলো বুঝি ছোট জিহাদ? আমাদের মুজাহিদ ভাইয়েরা বলেছেন আমরা কখনো দশ-বার দিন বরফের উপর দিয়ে হেঁটেছি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে পায়ের আঙ্গুলে আমরা যে বেদনা অনুভব করতাম, তাতে অসহ্য হয়ে তামান্না করতাম, যদি আমাদের আঙ্গুলগুলো পড়ে যেত। এ জিহাদকেই বুঝি ছোট জিহাদ বলা হবে? !

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) একটি চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন–

ياعابدَ الحرمينِ لو أبصرْتنا   لعلمتَ أنَّكَ بالعبادة تلعبُ —

হে মক্কা-মদীনার আবেদ! যদি তুমি আমাদেরকে জিহাদের ময়দানে দেখতে, তাহলে বুঝতে যে তুমি এ ইবাদতের মাধ্যমে ক্রীড়া-কৌতুক করছ।

তিনি একেবারে বাস্তব কথা বলেছিলেন। আজ আমরা ইবাদতের নামে ক্রীড়া-কৌতুকই করছি। আমরা ঐ সময় হারামাইনের স্নিগ্ধ পরিবেশে নামাযে দাঁড়িয়ে আছি, যখন মুসলমানদের ইজ্জত-আবরু নিয়ে হোলি খেলা হচ্ছে। নির্মমভাবে শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। বৃদ্ধদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে।

মুসলিম দেশে দেশে ইহুদী-খৃস্টান আর কাফেররা আক্রমণ করে তার পবিত্র স্থানগুলো অপবিত্র করছে। ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছে। হারামাইনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে-নির্ভাবনায় এ নামায কি দীন নিয়ে কৌতুক নয়? দীন নিয়ে খেলায় লিপ্ত হওয়া নয়?

মনে কর তোমার স্ত্রীর কামরায় ডাকাত ঢুকে তার ইজ্জত-আবরু রক্তাক্ত করছে আর তুমি পার্শ্ববর্তী কামরায় নিশ্চিন্তে নামাযে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার এ নামায তোমার জন্য অভিশাপ। এটা কিভাবে চিন্তা করা যায় যে তোমার স্ত্রীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে আর তুমি পার্শ্ববর্তী কামরায় নামাযে দাঁড়িয়ে থাকবে! কুরআন তিলাওয়াত করবে!

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন–

اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا ○

অর্থ : তারা তাদের ধর্মকে খেলাধুলার বস্তু বানিয়েছে।

আমরা আজ আমাদের ধর্মকে খেলার বস্তু বানিয়ে নিয়েছি। যে যেভাবে বুঝছি, সেভাবেই চলছি। দীনের প্রকৃত জ্ঞান আজ আমাদের থেকে তিরোহিত হয়ে গেছে।

কুরআন এই মুসলিম উম্মাহর অন্তরে শাহাদাত ও জিহাদের আকীদা-বিশ্বাসকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে রোপণ করেছে। তাবুকের যুদ্ধের কথা ভেবে দেখ। তিন হাজার সাহাবী এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। মাত্র তিন

জন অংশগ্রহণ করলেন না। তারা হলেন কা'ব ইবনে মালেক, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও মুরারা ইবনে রবী (রাঃ)। তাদের এ অপরাধের কারণে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত মুসলিম সমাজ তাদের সাথে বয়কট করল। একবার ভেবে দেখ, মাত্র তিনজন। অথচ কী কঠিন শাস্তি দেয়া হল। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাদের সর্বোত্তম শাস্তি হলো তাদের আর জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না দেয়া।

فَإِن رَّجَعَكَ اللهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ○

অর্থ : আর যদি আল্লাহ তোমাকে তাদের কোন দলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান, তারপর তারা তোমার কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলে দিও, তোমরা কিছুতেই আমার সাথে বেরোবে না এবং কিছুতেই আমার সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকা পছন্দ করেছো। কাজেই পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে বসে থাক। (সূরা তাওবাঃ ৮৩)

মানুষের নিকট কখনো পাপ কাজকে শোভনীয় করে দেয়া হয়। তখন সে পাপ কাজকে নেক কাজ মনে করে করতে থাকে। এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ○

অর্থ : তারপর আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করে নেয়। তাদের পাপ কাজগুলোকে তাদের জন্য শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (সূরা তাওবা ঃ ৩৭)

তাই দেখা যায়, অনেকে ভুল বুঝে মুসলমানদের কষ্ট দিচ্ছে। ভাই মুহাম্মদ এ ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি এক মসজিদের ইমাম। মাশাআল্লাহ, আফগান জিহাদের জন্য প্রচুর টাকা সংগ্রহ করে এনে জিহাদী ফান্ডে দান করেন। আল্লাহ তাকে আরো বেশি করে নেক কাজ করার তওফিক দান করুন। ঘটনাটি হল এক বৈমানিক একবার আফগান জিহাদে এল। কিন্তু কয়েকদিন আফগানিস্তানে থেকেই ফিরে গেল। ভাই মুহাম্মদ তো তার অবস্থা দেখে বিস্মিত। বললেন, আরে কী হলো আপনি ফিরে এলেন যে! লোকটি বলল, আরে বলো না সেখানে শিরক আর বিদ'আতের ছড়াছড়ি। ভাই মুহাম্মদ বললেন, তুমি যা দেখে এসেছ তা গোপন রাখ। কারো কাছে বলো না।

লোকটি তার কথা শুনে রেগে আগুন। বলল, না, তা হবে না। আমি সত্যকে কিছুতেই গোপন করতে পারবো না। অবশ্যই আমাকে তা বলতে হবে। মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে। ভাই মুহাম্মদ মসজিদের খতিবকে এই বিষয়টি জানালেন। ফলে খতিব সাহেব জুমুআর বক্তৃতায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন এবং এমনভাবে তার সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন যে সে আর আফগান জিহাদ সম্পর্কে কিছুই বলার সুযোগ পেলনা।

এ লোকটির কথা একবার ভেবে দেখ। সত্যকে প্রকাশ করার জন্য অত্যন্ত এখলাসের সাথে সে তার কথাগুলো মানুষের নিকট বলতে চেয়েছিল। কিন্তু সে একবারও ভেবে দেখেনি, এতে কী ক্ষতি হবে? সে ভেবে দেখেনি তার এ কথার কারণে কত এতীমের খাবার বন্ধ হয়ে যাবে। কত বিধবা মহিলা আব্রু ঢাকার কাপড় থেকে বঞ্চিত হবে। তার একবারের জন্য হলেও এই চিন্তা করা দরকার ছিল যে, আমরা তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দিতে পারছিনা। তারা মুসলমান। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য। আর আমরা যদি তাদের কোন বিষয়কে সংশোধন করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে তাদের সাথে থাকতে হবে। তাদের সুখ দুঃখের সঙ্গী হতে হবে। তাদের সহমর্মী হতে হবে।

অথচ তাদের কথা কি একবারও ভেবে দেখেছ? তারা আরবদের দেখলে উল্লাসে ছুটে এসে **বলে, এসো হে** আরব ভাইয়েরা! আপনারা আমাদের শিক্ষক, আপনারা আমাদের নেতা। আমাকে তিউনিসিয়ার **শহীদ বলেছে,** মাজার শরীফে একবার আমাকে এক ব্যক্তি দেখল। লোকেরা তাকে লক্ষ্য করে বলল, **ইনি আরব : এ ঘটনা** আমু দরিয়া বা সির দরিয়ার নিকটে ঘটেছিল। ইনি আমাদের দেশে জিহাদ করার **জন্য এসেছেন। লোকটি** তখন আমার নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূলের নাতী! আপনি আমাদের দেশে আমাদের সাথে মিলে জিহাদ করতে এসেছেন। এ কথা বলেই কাঁদতে লাগল। শুনলাম, সে চারদিন বরফের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এসেছে। সাথে তার ছোট ছেলেকে নিয়ে এসেছে। উদ্দেশ্য, কোন আরব তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে। দু'আ করে দিবে। এরা আমাদের ডেকে ডেকে বলছে, আসুন, আপনারা আমাদের নেতা। আপনারা আমাদের ইমাম।

আবু দোজানা নামক এক আরবের কাহিনী না বলে পারছি না। যে উপত্যকায় সে থাকত, তা প্রায় সত্তর কিলোমিটারব্যাপী পরিব্যপ্ত। এলাকার কেউ ধূমপান করতো না। কেউ তাবিজ ব্যবহার করতো না। কেউ ধূমপান করলেও আবু দোজানার সামনে ধূমপান করার সাহস করতো না। আমাকে এক ব্যক্তি বলেছে, একদা আমি আবু দোজানার পাশে বসেছিলাম। আবু দোজানাও বসেছিলেন। তার নিকট কয়েকজন মুজাহিদ ছিল। নিঃসন্দেহে মুজাহিদরা অত্যন্ত ভাল মানুষ। নেক মানুষ। কিন্তু তারা তো সাধারণ মানুষ। তাদের কেউ তো আর ফেরেশতা নয়। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

(٦) لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

অর্থ : তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না। আর তাদের যে নির্দেশ দেয়া হয় তা তারা পালন করে। (সূরা তাহরীম ঃ ৬)

তাদের অবস্থা তোমার প্রতিবেশীদের অবস্থার মতো হবে। তোমার শহরের লোকদের মতো হবে বা তুমি যে শ্রেণীর তাদের মতো হবে। একবার চিন্তা করে বলো তো, তারা কি সবাই নামায আদায় করে? তারা কি কেউ ধূমপান করে না বা মিথ্যা কথা বলে না? আসলে বিষয়টি এমন নয়। তাদের অনেকেই ভাল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তা করে।

আবু দোজানা মজলিস থেকে উঠে গেলে তাদের একজন সিগারেটের শলাকা বের করে বলল, তাড়াতাড়ি এসো। আবু দোজানা চলে গেছে। এ সুযোগে ধূমপান করে নেই। তারা আবু দোজানার সামনে ধূমপান করতে সাহস পেত না।

আমি কাজী মা'সুমকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আবু দোজানা সম্পর্কে যা জান তা বল। সে বলল, আবু দোজানার মাত্র একুশ বছর বয়স। অথচ তার মতো এতো প্রভাবশালী ও ব্যক্তিত্ববান লোক আমি আর দেখিনি। মুহাম্মদ বান্না, মাসুম, মুসলিম এ ধরনের নেতৃস্থানীয় কেউ তার সামনে কথা বলতে সাহস করে না।

আবু আসেম ইরাকীর কথা শুনবে। সে আফগানের মূর্খ লোকদের শুধু মাত্র কুরআন তিলাওয়াত শিখিয়েছে। সে কোন বিশেষ আলেমও নয়। ফকীহও নয়। কুরআনের হাফেজ। তাজবীদের কিতাব ভালভাবে অধ্যয়ন করেছে। ব্যস, এতটুকুই তার শিক্ষা। অথচ আফগানিস্তানের লোকেরা তাকে এতো মহব্বত করে, এতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, যা বলার মতো নয়। এমনকি আহমদ শাহ মাসউদ পর্যন্ত তার ঘাঁটি ওখান থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ, তা আবু আসেমের মজলিসের নিকটে ছিল।

আমি বলছিলাম, আমরা অনেক সময় মন্দ কাজকে ভাল কাজ মনে করে সওয়াবের আশায় করে থাকি। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا ○

অর্থ : আর যে ব্যক্তি পাপ কাজকে তার নিকট সুশোভিত করে দেয়া হলো আর সে তাকে সুন্দর মনে করে। (সূরা ফাতির ঃ ৮)

তাই আমাদের কে আল্লাহর নিকট দু'আ করতে হবে। আমরা যেন এ ধরনের পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারি। আমরা দু'আ করবো–

اللهم أرِنا الحقَّ حقًّا و ارزُقنا اتِّباعَــه و أرِنا الباطلَ باطلاً و ارْزقْنا اجْتنَابَــه —

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের কে সত্যকে সত্যরূপে দেখান এবং তার অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন আর বাতিলকে বাতিলরূপে দেখান এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।

সাধারণত জ্ঞানের অপরিচ্ছন্নতা থাকলে এমন হয়ে থাকে। আমাদের ঘটনাই বলি। আমরা যখন মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়তাম, তখন আমাদের একজন সমাজে প্রচলিত কিছু আমলকে বিদ'আত ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। আমরাও তার সঙ্গী হলাম। আমি সাধারণত আমাদের গ্রামে বক্তৃতা রাখতাম। কখনো শহরেও বক্তৃতা রাখতাম। একবার আমাদের এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এলেন। আমি তাকে বললাম, জুম'আর আগে যে সুন্নাত নামায পড়া হয় তা বিদ'আত। এটা পড়া ঠিক নয়। মসজিদের ইমাম সাহেব আমার কথা শুনে উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, মনে হচ্ছে, তুমি একটা ফিৎনা উসকে দিচ্ছো। শাফেয়ী, হানাফী, মালেকী, হাম্বলী সব মাযহাবের লোকেরাই জানে জুম'আর পূর্বে সুন্নাত নামায রয়েছে আর তারা তা আমল করে। আর তুমি এক নতুন কথা বলে সমাজে ফেৎনা সৃষ্টি করতে চাচ্ছো।

আযানের পর দরূদ পড়া নিয়েও আমরা মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলাম। তখন জ্ঞানে-গুণে শ্রদ্ধেয় এক বড়ভাই এলে আমরা তাকে বললাম, আযানের পর এই যে দরূদ পাঠ করা হয়, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি তখন আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা এই ফেৎনা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু কি পেলে না? এতে তো তোমরা তোমাদের পাশ থেকে লোকদের তাড়িয়ে দেয়ার আয়োজন করেছো।

আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান-অভিজ্ঞ আর আমরা ছিলাম অল্পবয়সী অনভিজ্ঞ আর দুঃসাহসী। এভাবে কখনো মানুষের নিকট পাপ কাজ পূণ্যের কাজ মনে হয়। তারা দুঃসাহসিকতার সাথে তা করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা হাসানুল বান্নাকে রহম করুন। একবার তিনি মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। তার সাথে ছিল ইখওয়ানের দুই সদস্য। তাদের একজন অপরজনের দিকে মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, يَتقبَّلُ الله তখন অপরজন তার হাত গুটিয়ে নিল। বলল, এটা বিদ'আত। তখন হাসানুল বান্না তার কাছে এসে বললেন, মানুষকে লজ্জা না দেয়া কি সুন্নত নয়? নিশ্চয়ই তা সুন্নত। তাই তোমার উচিত ছিল হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করা। তারপর তাকে তোমার ঐ কথাটি বলে দেয়া যে মুসাফাহার সময় يَتقبَّلُ الله বলা সুন্নত নয়। এটা বিদ'আত। বরং তার জন্য নির্দিষ্ট দু'আ রয়েছে। তা পাঠ করা সুন্নত।

খারাপ ও পাপ কাজ কখনো কখনো মানুষের নিকট সুশোভিত হয়ে দেখা দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে জাগ্রত হলে এ দু'আ পাঠ করতেন–

اللهم ربَّ جبرائيلَ و ميكائيلَ و إسرافيلَ فاطرَ السموات و الأرض عالمَ الغيب و الشهادة ، أنتَ تحكُم بينَ عبادِك فيما كانُوا فيه يختلفونَ ، اهدِنا لما اختلفَ فيه من الحقِّ بإذنك ، إنَّك تهدى من تَشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ —

অর্থ : হে আল্লাহ, জিব্রাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফীলের প্রতিপালক, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতসত্তা! আপনার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করেছে আপনি তার ফায়সালা করবেন। আপনি

আমাদের কে মতবিরোধের মধ্য থেকে আপনার অনুগ্রহে সত্যের পথে পরিচালিত করুন। আপনি যাকে চান সরল-সোজা পথে পরিচালিত করেন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)-এর কথা না বলে পারছি না। তিনি এ ব্যাপারে একটি ছোট্ট পুস্তিকা রচনা করেছেন।

নাম হলো اختلاف الأئمة في العبادة। এতে তিনি লিখেছেন, যদি কেউ হাদীসের আলোকে নামাযের কোন সুন্নাত বা মুস্তাহাব বিষয়কে একভাবে আদায় করে সে যদি অন্য কোন এমন জায়গায় যায় যেখানকার লোকেরা সেই সুন্নাত ও মুস্তাহাব বিষয়টিকে অন্য হাদীসের আলোকে অন্যভাবে আদায় করে, তাহলে তার জন্য উচিত তাদের মতোই আদায় করা। কোন ইখতেলাফ সৃষ্টি না করা।

একদা ইমাম আহমদকে জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি নামাযে জোরে আমীন বলে। সে এমন জায়গায় নামায আদায় করল যারা জোরে আমীন বলে না। তাহলে সে জোরে আমীন বলবে, না আস্তে বলবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বললেন, সে আস্তে আমীন বলবে। কারণ, এগুলো মস্তাহাব। কেউ আদায় করলে সওয়াব পাবে, আদায় না করলে সওয়াব পাবে না। আর উম্মতের মাঝে ঐক্য বজায় রাখা ফরজ। এ ধরনের সুন্নত-মুস্তাহাব আদায়ের চেয়ে উম্মতের মাঝে ঐক্য বজায় রাখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

তাই জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন– তোমরা সুন্নতের প্রচার করতে থাক। তবে সুন্নত নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হইও না। তাই আমি আমার আরব ভাইদের বলি, তোমরা আফগানিস্তানে এসে নামাযে হাত তুলো না, আফগানীদের মতো নামায আদায় করো।

এ ব্যাপারে একটি চমৎকার ঘটনা আমাদের শোনালেন শাইখ তামীম। তিনি নিজে তা দেখেছেন। শাইখ তামীম বলেন, আজ থেকে দু'বছর আগের ঘটনা। আমি তখন শাইখ সাইয়াফের নিকট ছিলাম। সেখানে বিরাট মসজিদ ছিল। আসরের নামাযের সময় আমি মসজিদে গেলাম। আমার ঠিক সামনে দাঁড়িয়েছিলেন রিয়াদের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। এক নামে আমরা তাকে চিনি। জামা'আতে নামায আদায় করছিলেন। তার পাশে এক আফগানী দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি দেখলাম, আফগানীর পা সে তার দিকে টানছে তার পায়ের সাথে মিলানোর জন্য। আর আফগানী তার পা তার থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে। তবে আফগানী জোরাজুরি করছে না। তারপর রুকুতে যখন সে দেখল, আফগানীর পা তার থেকে দূরে তখন সে নিজের পা তার দিকে ছড়িয়ে দিল। আর আফগানীও তার থেকে নিজের পা দূরে রাখতে চেষ্টা করছিল। এভাবে তারা রুকু শেষ করল।

সে কিন্তু হাত দিয়ে আফগানীর পা টানছিল। মনে হচ্ছিল, তারা নামাযে নীরবে কুস্তি করে যাচ্ছে। নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এভাবেই চলল।

নামাযের পর আমি অত্যন্ত কৌশলে তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলাম। বললাম, এগুলো সুন্নত বা মুস্তাহাব। এমন বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করা অনুচিত। এমন কাজগুলোকে আমাদের পরিহার করতে হবে। আমরা যতক্ষণ আফগানিস্তানে থাকব ততক্ষণ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আমল করবো।

রুকু-সিজদার সময় হাত তুলবো না। ব্যস, এর মাধ্যমে নানা ফেৎনা থেকে বেঁচে যাব। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মৌলিক বিরোধ না দেখা যাবে, ততক্ষণ আমরা নীরব থাকব। অন্যকে সম্মান প্রদর্শন করবো। আল্লাহ আমাদের কে দীনের সঠিক বুঝ দান করুন, আমীন।

সপ্তদশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٤٢) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا
لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○ (٤٣) عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ
لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ○ (٤٤) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يُّجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ○ (٤٥) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ○ (٤٦) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ
فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ○ (٤٧) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ
يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمّٰعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظّٰلِمِينَ ○

অর্থ : আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও সফর সহজ হলে তারা নিশ্চয় তোমার অনুসরণ করত। কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। তারা অচিরেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, পারলে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে বের হতাম। তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করবে। আল্লাহ জানেন, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। কারা মিথ্যাবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা সত্যবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলে? যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে তারা সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করা থেকে তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তোমার নিকট কেবল তারাই অব্যাহতি প্রার্থনা করে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না আর যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। তাই তারা আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। তারা বের হতে চাইলে অবশ্যই তার জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করতো। কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহর মনঃপুত ছিলো না। সুতরাং তিনি তাদেরকে বিরত রাখলেন এবং তাদের বলা হলো, যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক। তারা তোমাদের মাঝে ফিৎনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করতো। আর তোমাদের মাঝে তাদের জন্য কথা শোনার লোক রয়েছে। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (সূরা তওবা, আয়াত ঃ ৪২-৪৭)

বিগত আলোচনায় আমি প্রথম আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছিলাম।

আয়াতটি হল– لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ

অর্থ : যদি বিষয়টি এক সপ্তাহ বা দু'সপ্তাহের জন্য হত, সংক্ষিপ্ত সফর হত, বা সে সফরে উমরা আদায়ের সুযোগ হত, তাহলে অবশ্যই তারা উপস্থিত হত وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ কিন্তু পথের দুরত্ব সুদীর্ঘ হয়েছে। কারণ, মদীনা আর তাবুকের মাঝে দুরত্ব হল নয়শত কিলোমিটার। وَسَيَحْلِفُونَ আর তারা শপথ করে অর্থাৎ মিথ্যা বলা ও জিহাদে না যাওয়ার ব্যাপারে তারা আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করে। আর ওভাবেই তারা নিজেদের ধ্বংস করল।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔

আর আল্লাহ জানেন, তারা মিথ্যাবাদী।

عَفَا اللّٰهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ -

আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কেন আপনি তাদের অনুমতি দিলেন? কেউ নামায না পড়ার অনুমতি চাইলে কি আপনি তাকে অনুমতি দিতে পারেন? কেউ রোযা ভঙ্গ করতে চাইলে কি আপনি তাকে অনুমতি দিতে পারেন? তাহলে আপনি কিভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার অনুমতি দিলেন? অথচ তখনকার পরিস্থিতিতে নামায রোযা আর জিহাদের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না। বর্তমানে আমরা আফগানিস্তানে যে অবস্থায় আছি; যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে থাকতেন তাহলে কাউকে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার অনুমতি দিতেন না।

বিশিষ্ট অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) এলেন এবং রাসূলের নিকট অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আমি তোমাকে অনুমতি দিতে পারি না। তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়–

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۝

অর্থ : মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়; অথচ ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধনসম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। (সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৯৫)

সুবহানাল্লাহ! জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেয়ার অধিকার যখন রাসূলেরই রইল না, তাহলে কীভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা আজ মদের দোকান খোলার, মদ তৈরীর অনুমতি দিয়ে থাকে। অনুমতি প্রদানের অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ তা করলে সে শিরক করল। পৃথিবীর সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত। এতে কোন বিরোধ নেই যে, আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন, তার খেলাফ কোন বিধান প্রচলন করা এমন মারাত্মক কুফরী যে সে আর মুসলমান থাকে না। অথচ মুসলিম দেশগুলোতে আজ সব কিছুই হচ্ছে। মানুষই আজ আইনের ধারা তৈরী করছে। আইনমন্ত্রী হচ্ছে। সরকারী ঘোষণা পত্রে বিঘোষিত হচ্ছে, আমি অমুকের পুত্র অমুক নিম্নবর্ণিত আইনটি জারি করলাম, এখন থেকে রাস্তাঘাটে চারজন একত্রিত হওয়া যাবে না। বা ঘোষণা করা হয়, যার নিকট কোন প্রকার অস্ত্র পাওয়া যাবে, তাকে সামরিক আদালতে উপস্থিত করা হবে। নাইট ক্লাব খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়। সেখানে যত অশ্লীল অপকর্ম সারা রাত ধরে চলতে থাকে। জর্দানের কথা বলছি, তুমি সেখানে কোন হোটেল খোলার অনুমতি চাইলে কিছুতেই তোমাকে তা দেয়া হবে না। হ্যাঁ, যদি দেখা যায় যে, তাতে মদ খাওয়ার বার থাকে বা সাঁতরে গোসল করার চৌবাচ্চা আছে, তাহলে সহজেই তুমি অনুমতি পাবে। এসব হোটেলগুলোতে মদ পানের অনুমতিপত্র থাকে। যৌনাচারের অনুমতিপত্র থাকে। শুনলে তুমি হয়তো আশ্চর্য হবে, কিছু কিছু আরব দেশের নারীদের দেহ ব্যবসারও অনুমতিপত্র আছে। কর আদায়ের লক্ষ্যে সরকার এদের অনুমতিপত্র দিয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয়ভাবে জুয়ার অনুমতিও পেয়ে থাকে। এসব ছাড়পত্র প্রদানের অর্থ হল, আমরা তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তোমার জন্য বৈধ ঘোষণা করছি, তুমি জুয়ার আসর বসাতে পারবে। চুটিয়ে দেহ ব্যবসা করতে পারবে। এসব কিছু তোমার জন্য বৈধ।

এসব আইন প্রয়োগকারীদের দৃষ্টিতে গাড়ি হল এক ধরনের চলমান বাড়ি। তাই পুলিশ যদি কোন গাড়ী চালককে দেখে, গাড়ির মধ্যে সে কোন নারীর সাথে যিনা করছে, তাহলে তার তাতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। হ্যাঁ, যদি নারী সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহলে পুলিশ যেতে পারবে। কারণ, পুলিশের অধিকার নেই বাড়ীতে প্রবেশ করে কাউকে বিরক্ত করার। এটা মিসরের আইন। তাই বাড়ীতে যিনা কোন অপকর্ম নয়। যদি না মহিলা সাহায্য প্রার্থনা করে। হ্যাঁ, যদি স্বামীর গৃহে কোন মহিলা পরপুরুষের সাথে যিনা করে, তাহলে এটা অপরাধ। কারণ, সে স্বামীর গৃহের পবিত্রতা নষ্ট করছে। হ্যাঁ, স্বামী যদি তার বাড়ীতে অন্য নারীর সাথে যিনা করে, তাহলে স্ত্রীর কোন অপরাধ হবে না।

সরকার ব্যাংকগুলোকে সুদের অনুমতি প্রদান করে। অর্থাৎ আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ○ (٢٧٩)

অর্থ : হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং অবশিষ্ট সুদ পরিত্যাগ কর যদি তোমরা মু'মিন হও। আর যদি তোমরা তা না কর, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে নাও।

(সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৮-২৭৯)

তুমি যদি মুসলিম দেশগুলোতে সফর কর, তাহলে দেখতে পাবে, অধিকাংশ সাইনবোর্ডগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করছে। ব্যাংক, মদের দোকান, নাইট ক্লাব ইত্যাদি শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

গোয়েন্দারা যখন কোন নারীকে দেখে লম্বা হিজাব পরিধান করে চলাফেরা করছে, তারা তার পিছনে লেগে যায়। তার ও তার পরিবার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে এবং সুযোগের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে। সুযোগ পেলেই তাদের হয়রানী করতে থাকে।

মিসরের কথা বলি। আমি যখন মিসরে গেলাম আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনের জন্য, তখন আমার সাথে বেশ কয়েকজন জর্দানের ছাত্র ছিল। আমরা ছিলাম ইখওয়ানের সদস্য। আমাদের কয়েকজনের স্ত্রীও সাথে ছিল। তারা লম্বা হিজাব ব্যবহার করত। কিন্তু পরিস্থিতি এমন হল যে, তারা নিয়মিত পুলিশি হয়রানীর শিকার হতে থাকল। শেষে তারা লম্বা হিজাব ত্যাগ করতে বাধ্য হল।

আমরা যখন কায়রো ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, তখন তাতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। কিন্তু এতো ছাত্রীর মাঝে শুধুমাত্র একজন ছাত্রী লম্বা হিজাব ব্যবহার করত। সে ছিল সাইয়্যেদ কুতুবের ভাগিনী। এই মেয়ে চেষ্টা করে আরেক মেয়েকে লম্বা হিজাব ব্যবহার করতে রাজী করিয়েছে। ইউনিভার্সিটির হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে এ দু'জনই লম্বা হিজাব ব্যবহার করতো। কিন্তু তার বান্ধবীর বাড়ীতে এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হল। কিন্তু মেয়েটি তার আদর্শে অটল রইল। কিন্তু তোলপাড় আর থামল না। পরীক্ষার দিন সকাল ৬টায় বা ৭টায় তার পরিবারের লোকেরা তার হিজাবটি নিয়ে পানিতে ফেলে দিল। যেন তা আর পরতে না পারে। হিজাব হল মহাপাপ। হ্যাঁ, মহাপাপ। আল্লাহর শত্রুদের নিকট তা মহাপাপ।

আমাকে এক ব্যক্তি বলেছে। সে সত্য বলেছে না রম্যকৌতুক করেছে তা বলতে পারব না। এক মদ্যপ তার পিছু নিল। তাকে ছাড়তেই চায় না। বাসে তার সাথে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সাথে। পথেঘাটে তার সাথে। তাকে মদ দিতে হবে এ তার দাবী। শেষে লোকটি অতিষ্ঠ হয়ে গেল এবং মদের দোকান থেকে এক বোতল মদ কিনে পকেটে নিল। বাসে যখন সেই মদ্যপ যুবক তার সাথে বসল তখন সে মদের বোতল পকেট থেকে বের করে তার লেভেল পড়তে লাগল। গোয়েন্দারা বিষয়টি লক্ষ্য করল। কিন্তু তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এ লোক মদ খেতে পারে। তারা আরো নিশ্চিত হতে কাছে এগিয়ে এল। তখন বিষয়টি গোয়েন্দাদের নিকট তুলে ধরল। এরপর থেকে সেই মদ্যপ যুবক তার পিছু ছেড়ে দিল। তার নাম ছিল তাওফীক শরীফ। তাই গোয়েন্দাদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। তুমি যদি হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছা কর তাহলে তোমার চারিত্রিক সনদ সাথে রাখবে। তাহলে অনেক বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। এই গোয়েন্দারা হল অর্থের পাগল। অর্থ পেলে মানুষের মান-ইজ্জতের দিকে তাকায়না। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لا يدخل الجنة قتات —

চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

একদা হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) বসেছিলেন। তিনি কথা বলছিলেন। তখন দূর হতে একজন লোক এগিয়ে এল। উপস্থিত লোকেরা বলল, এই লোকটি নানা কথা শাসকের কানে তুলে ধরে। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি– قَتَّاتٌ হল ঐ ব্যক্তি যে মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং তা শাসক ও রাজা বাদশাহদের কানে দেয়। যদিও তা সত্য হয়।

শাইখ মুহাম্মদ নাজীর মুতীয়ী একজন প্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞ ফকীহ ছিলেন। তিনি বলেন, আমাকে দু'বৎসর জেলখানার এক প্রকোষ্ঠে রাখা হল। সেখানে আমাকে শাস্তি দেয়ার জন্য বড় বড় সাপ ছেড়ে দিত। সাপ এসে আমার পেটের উপর, আমার মাথার উপর খেলত। এভাবে বিভিন্নভাবে আমাকে নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দিত। আমি একদিন সাহস করে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলল, তোমার এক প্রতিবেশী ছিল ইখওয়ানের সদস্য। সে একটি গাড়ি ক্রয় করেছিল।

আমি বললাম, বেশ তাতে আমার কী? তারা বলল, সে তোমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম দিয়েছিল আর তুমি তার সালামের উত্তর দিয়েছিলে। আমি বললাম, হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। এই ছিল তার অপরাধ। আমি এ ঘটনা বানিয়ে বলছিনা। শাইখ নাজীর মুতীয়ী নিজে তা বর্ণনা করেছেন । আর আমি তা শুনেছি। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে জেদ্দায় তিনি আমার নিকট তা বর্ণনা করেছিলেন। তিনি তার নিজের জীবনের ট্রাজেডি বর্ণনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন জামাল আব্দুন নাসেরের প্রদেশের লোক। তবুও তিনি রক্ষা পাননি।

আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন শাইখ আবদুল্লাহ রিশওয়ান। আল্লাহ তাকে উভয় জাহানে রহম করুন। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের জিহাদী আন্দোলন দমনের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, ১৯৬৫ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের দমনকালে এক সামরিক অফিসারকেও জেলখানায় প্রেরণ করা হয়েছিল। তার কারণ হল, সে যখন ১৯৫৪ সালে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তুমি কি ধার্মিক? তুমি কি ধর্মের ব্যাপারে দৃঢ়? তাদের এসব প্রশ্নের উত্তরের ফাইলগুলো ১৯৬৫ সালে দেখা হয়। সুতরাং যার ফাইলে এ প্রশ্ন দুটির উত্তর হ্যাঁ ছিল, তাদের সবাইকে বন্দী করে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। আবদুল্লাহ রিশওয়ান বলেন, এই সামরিক অফিসারের প্রকোষ্ঠটি শাইখ মুহাম্মদ আওদানের প্রকোষ্ঠটির মুখোমুখি ছিল। সরকারী লোকেরা শাইখ মুহাম্মদ আওদানের ও অন্যান্যদের তদন্ত করতে চাইল। শাইখ মুহাম্মদ আওদানের বয়স ছিল আটাত্তর বৎসর। তিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের একজন প্রফেসর ছিলেন। ইলমে ফিকহেও তার বেশ পারদর্শিতা ছিল। তিনি ডক্টরেট সার্টিফিকেট দিতেন। তাকে ইসলামী বিপ্লবের প্রাণপুরুষ বলা হতো। তিনি আব্দুন নাসের, আনোয়ার সাদাত প্রমুখের উস্তাদ ও মুরুব্বী ছিলেন। তাদের প্রতিপালনেও তার বহু অবদান রয়েছে।

১৯৬৫ সালে যখন ইখওয়ানের সদস্যদের গণহারে গ্রেফতার শুরু হল, তখন শাইখ মুহাম্মদ আওদানকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই সামরিক অফিসার বলেছে, শাইখ মুহাম্মদ আওদানের প্রকোষ্ঠটি খোলা হলে আমি তাতে রক্ষিত কুকুরগুলো গুণে দেখলাম, ছাব্বিশটি কুকুর তাতে ছিল। পুলিশ বাহিনীর এ কুকুরগুলো অত্যন্ত ভয়ংকর। এ কুকুর দেখলে মানুষ দূরে সরে যায়। যারা তদন্ত করতে এসেছিল, তারা শাইখ মুহাম্মদ আওদানের নিকটবর্তী হতে চাইল। কিন্তু দুর্গন্ধে কাছেও ঘেষতে পারল না । কারণ, কুকুরের মল তার সারা শরীরে লেপ্টে ছিল। তখন তদন্তকারী লোকেরা দূর থেকে পাইপ দ্বারা সবেগে পানি ছিটিয়ে তাকে পরিষ্কার করল। তারপর তদন্তকারীরা তার নিকটবর্তী হয়ে তার কাপড় পাল্টিয়ে নতুন কাপড় পরাল। তারপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ○

অর্থ : আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কেন আপনি তাদের অনুমতি দিলেন? অর্থাৎ আপনার কোন অধিকার নেই যে, আপনি তাদের অনুমতি দেবেন। কারণ, আপনি কোন কিছুর হুকুমের মালিক নন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা আগেই ক্ষমার ঘোষণা করেছেন। তারপর তিরস্কার করেছেন। যেন দুঃখে মনোতাপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধীর না হয়ে পড়েন। তারপরই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ ○

অর্থ : কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী, তা আপনার নিকট সুস্পষ্ট হওয়ার পূর্বে কেন আপনি অনুমতি দিলেন? অর্থাৎ তাহলে আপনি মুনাফিকদের চিনতে পারতেন।

মুনাফিকরা বলত, আমরা গিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করব। যদি অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে আমরা পশ্চাতে বসে থাকব আর অনুমতি না দিলেও আমরা পশ্চাতেই থাকব। জিহাদে যাব না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ○

অর্থ : যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তারা জীবন দিয়ে, ধন-সম্পদ ব্যয় করে জিহাদ করতে আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে না।

কুরআনের এই আয়াতের দিকে একটু মনোনিবেশ কর। বুঝতে পারবে, জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করাই হলো মুনাফিকির আলামত।

কেউ কেউ বলেন, উল্লেখিত আয়াতের বিধান রহিত হয়ে গেছে সূরা নূরের আয়াত দ্বারা। আয়াতটি হল–

فَاِذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ○

অর্থ : যদি তারা কোন প্রয়োজনে আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহলে তাদের যাকে আপনি চান অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

এখানে কিছু কথা আছে। সূরা তওবার যে আয়াতটির আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি, তা নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। আর সূরা নূরের এই আয়াতটি পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াত দু'টি অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের মাঝে সময়ের বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। আর পূর্বে অবতীর্ণ কোন আয়াত পরে অবতীর্ণ কোন আয়াতের হুকুম রহিত করতে পারে না।

আরেকটি কথা আমরা পূর্বেই বলেছি যে, জিহাদ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সূরা তওবা থেকেই গ্রহণ করতে হবে। কারণ, সূরা তওবাই এ ব্যাপারে অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা। এ সূরায়ই মুসলমানদের সমাজ, জিহাদ, যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদির চূড়ান্ত বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং জিহাদ সম্পর্কে সর্বশেষ বিধান জানতে হলে অবশ্যই সূরা তওবা পাঠ করতে হবে। তার বিধান অনুধাবন করতে হবে। এ জন্যই–

এ আয়াত দু'টিকে– وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ○

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ○

তরবারীর আয়াত বলা হয়। এই আয়াত দু'টি এমন একশত বিশের চেয়ে বেশী আয়াতের বিধানকে রহিত করেছে; যে আয়াতগুলো মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলকে ক্ষমা, উপেক্ষা, ধৈর্যধারণ, উত্তমভাবে, প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে বিতর্কের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ○

অর্থ : যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে, তারা সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করা থেকে তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করবে না।

কেন প্রার্থনা করবে না? এ প্রসঙ্গে সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ) বলেন–

إنَّ القعودَ عن الجهادِ خللٌ من العقيدةِ و وهْنٌ في الدينِ —

নিশ্চয়ই জিহাদে না গিয়ে বসে থাকা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ত্রুটি ও ধর্মের ক্ষেত্রে দুর্বলতা। কারণ, যে হৃদয়ের সাথে ঈমান মিশে গেছে এবং ধর্মের দ্বারা যে মোহিত হয়ে গেছে, তার জন্য সম্ভব নয়, সে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখবে মানুষের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে, পবিত্র স্থানসমূহ পদদলিত হচ্ছে, রুধির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এ ধরনের পাপ, অপরাধ আর শয়তানের দৌরাত্ম্য সে কিছুতেই সহ্য করে নিতে পারে না। নীরবে, শীতল হৃদয়ে বসে থাকতে পারে না। উস্তাদ আবু মাজেদ (রহঃ) প্রায়ই বলতেন–

لا يمكنُ لكأسٍ أن تمتلئَ إلا أن تَفيضَ ، لا يمكنُ لقلبٍ أن يمتلئَ بهذا الدينِ إلا أن يفيضَ على منْ حولَه

অর্থ : কোন গ্লাসই উপচে পড়া ছাড়া পরিপূর্ণভাবে ভরে না, আর কোন হৃদয়ও তার আশেপাশে উপচে পড়া ছাড়া দীনের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٤٤) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ○

অর্থ : যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে, তারা ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করা থেকে তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

এ আয়াতের শেষাংশ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, জিহাদ তাক্বওয়ার সুস্পষ্ট আলামত। মুত্তাকী ছাড়া জিহাদ সম্ভব নয়। তাই পূর্ব যুগে প্রথা ছিল, যদি ইসলামী জগতের কোন শহরে বা রাজধানীতে এমন কোন জটিল সমস্যা দেখা দিত, যার সমাধান ফকীহরা দিতে পারত না, তখন তারা ফকীহদের সীমান্তে পাঠিয়ে দিত। কারণ, তখন তারা আল্লাহর অতি নিকটে হয়ে যেত। ফলে তারা উত্তর প্রদানের নিকটতম হত এবং তাদের উত্তরদানের তাওফীক দেয়া হত। তাই অনেকে–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ○

অর্থ : কেন তাদের মধ্য থেকে একটি দল বেরিয়ে যায় না ধর্মের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান অর্জন করার জন্য।

এ আয়াত দ্বারা দলীল উপস্থাপিত করে বলেন যে–

إنَّ الفقهَ لا يُؤخذُ من القاعدينَ . إنَّ دينَ اللهِ لا يُؤخذ من فقيهٍ باردٍ قاعدٍ۔

অর্থ : নিশ্চয়ই জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে বসে থাকে যারা, তাদের থেকে ধর্মের গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা হয় না। নিশ্চয়ই জিহাদ থেকে পশ্চাতে উপবেশনকারী শীতল ফকীহ থেকে দীন অর্জন করা হয় না।

একদা কারাগারে একটি সমস্যার আলোচনা করা হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, এ ব্যাপারে অমুক শাইখ এ কথা বলেছেন। তখন উপস্থিত সবাই বলল, জিহাদ থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের থেকে আমরা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করি না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٤٥) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ○

(٤٦) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ○

অর্থ : আপনার নিকট কেবল তারাই অব্যাহতি প্রার্থনা করে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না আর যাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। তাই তারা আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। তারা জিহাদে বের হতে চাইলে অবশ্যই তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করত।

জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছার বেশকিছু আলামত রয়েছে। যেমন জিহাদের প্রশিক্ষণ নেয়া, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

ভাই! তুমি তো মুখে বেশ দৃঢ়তা এনে বল, আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চাই। অথচ প্রত্যেক বছরই তুমি তোমার বেডরুমের এয়ারকন্ডিশনটি পরিবর্তন কর। গাড়ি পরিবর্তন কর। দিনের পর দিন তোমার উপভোগ সামগ্রী বেড়েই চলছে। মানলাম, তুমি সত্যই বলেছ যে, তুমি জিহাদ করতে চাও। কিন্তু তুমি ভেবে দেখ, কত টাকা বেতন পাও, আর তা কোথায় ব্যয় করছ? তুমি যে টাকা বেতন পাও, তা দিয়ে তো বাড়ি ভাড়া করেও থাকা সম্ভব না। তাহলে তুমি এতো টাকা ব্যয় কর কিভাবে? তুমি তোমার পুরাতন গাড়িটি বিক্রি করে নতুন চকচকে ঝলমলে গাড়ি ক্রয় করলে। অথচ তোমাকে যদি বলা হয়, ভাই! এসো না আমাদের সাথে। দেখ, আমরা কী করছি। তখন তুমি বল, ভাই! আমি তো ঋণে জর্জরিত।

আচ্ছা ভাই! আপনি চিন্তা করে দেখুন তো, কে আপনাকে ঋণ করে এত আয়েশী সামগ্রী ক্রয় করতে বলেছে?

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ○ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ○

অর্থ : তারা কি চিন্তা-ফিকির করে দেখে না যে, তারা এক মহা দিবসে পুনরুজ্জীবিত হবে?

তুমি দেখবে, এ ধরনের অধিকাংশ মানুষ ঋণের কারণে দীনের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

আমার একজন সাথী ছিল। আমরা উভয়ে জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম। তিনি كتاب الايمان এর লেখক ডক্টর মুহাম্মদ নাঈম। তিনি জিহাদ সম্পর্কে বেশকিছু পুস্তক রচনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের বেতন বৃদ্ধি করতেই থাকল। অথচ অন্যান্য শিক্ষকদের বেতন অনেক কম। আমাদের ও তাদের বেতনে অনেক ব্যবধান। তাই আমি এ অবস্থা দেখে তাকে বলতাম, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি এ বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি পছন্দ করি না। কারণ, আমাদের বেতন যত বৃদ্ধি পাবে, আমরা ততই তাদের মুখোমুখি হয়ে কিছু বলার সাহস হারিয়ে ফেলব। হ্যাঁ, আমাদের বেতন যদি সরকারী অন্যান্য চাকরিজীবীদের মত হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে চিন্তা করব না। তাই যখনই কোন সমস্যা দেখি, তখন মন অবলীলাক্রমে বেতনের দিকে চলে যায়। পাঁচশ দিনার বা ছয়শ' দিনার বেতন। যদি চাকরি চলে যায়, তাহলে কিভাবে বাঁচব। অবশ্য এ ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিমের জীবন ধারা ব্যতিক্রম।

সাসানী সাম্রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, যখন তৃতীয় সম্রাট ইয়াযর্দজর্দ পরাজয়বরণ করল, তখন সে অত্যন্ত কাঁদল। তার অনেক সহচর তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার কী হল! এতো কাঁদছেন কেন? সম্রাট বললেন, এখন তো আমার নিকট মাত্র এক হাজার পাঁচক আর এক হাজার বাজপাখি পরিচর্যাকারী ছাড়া অন্য কোন কর্মচারী নেই। কিভাবে আমি মাত্র এক হাজার পাঁচক নিয়ে বেঁচে থাকব। এ সম্রাটের জীবনধারার কথা একটু ভেবে দেখুন।

অপরদিকে যে বীরযোদ্ধা তাকে পরাজিত করে তার সিংহাসন দখল করেছিলেন, সেই সালমানের জীবনযাত্রার দিকে লক্ষ্য করুন। তৃতীয় সম্রাট ইয়াযর্দজর্দ-এর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, অথচ তার ব্যক্তিগত খরচ প্রত্যহ এক দেরহাম আর প্রত্যহ এক দেরহাম আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করে তা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতেন।

দিনে এক দেরহাম দ্বারা বাঁশ ক্রয় করতেন। রাতে তা দ্বারা ঝুঁড়ি ও বিভিন্ন ধরনের পাত্র তৈরি করতেন। সকালে তা তিন দেরহামে বিক্রি করে দিতেন। এক দেরহাম নিজের জীবিকার জন্য খরচ করতেন। এক দেরহাম দান করে দিতেন আর এক দেরহাম দিয়ে একটি নতুন বাঁশ ক্রয় করতেন। তাই বলছিলাম, মুসলিম ও অমুসলিমের জীবনধারায় বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।

একবার আমরা ফিলিস্তিনে ছিলাম। সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছিলাম। কোন কিছু ক্রয় করা নিষেধ ছিল। যে কোন ধরনের খাদ্য কেন্দ্রে প্রবেশ করাও ছিল নিষিদ্ধ। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে যা দেয়া হতো, তা খেয়েই থাকতে হতো। আল্লাহ আমাদের সুযোগ ও সুবিধা দিলে আমরাও তা আফগানিস্তানে বাস্তবায়ন করবো। সবাইকে একই ধরনের খাবার খেতে হতো। সেখানে রুটি পাওয়া যেত। আমরা রুটির ঝুড়ি কিনে নিতাম। গোশত, তা তো দেখতেই পেতাম না, খাওয়া তো দূরের কথা। ফলের অবস্থাও তাই- চার মাস আমরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রুটি খেলাম। আমরা যে রুটি খেলাম, সে রুটির কথা জনসাধারণ চিন্তাই করতে পারবে না। পাতলা এক ধরনের রুটি দেয়া হত। এতো পাতলা, মনে হতো বাতাসে উড়ে যাবে। এ ধরনের রুটির অর্ধেক সকালে, অর্ধেক বিকেলে ও অর্ধেক রাতে দেয়া হতো। সাথে দেয়া হতো আট-দশটি যাইতুন। চা ছাড়াই আমরা চললাম।

আমাদের সাথে ছিলেন সুদানের মন্ত্রী মুহাম্মদ সালেহ উমর। তিনিও আমাদের সাথে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। সুদানের আব্বাসীরা এ ব্যাপারে খ্যাত যে, তারা কাঁচা যাইতুন পছন্দ করে না, আর চা ছাড়া জীবন ধারণ করতে পারে না। একবার তিনি নাস্তার সময় খাদ্য বিভাগের দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট এক কাপ চা চাইলেন। নাস্তার সময় তিনি তা পান করবেন। কিন্তু তাকে চা দেয়া হলো না। বলা হলো, চা দেয়া নিষেধ। বলা হলো, তোমাদেরকে আমরা তোমাদের প্রিয় খাবারের লালসা থেকে চিরমুক্ত করে দিতে চাই।

মুহাম্মদ জালাল কাশক একজন কমিউনিস্ট লেখক ছিলেন। পরে অবশ্য তওবা করে সমাজবাদ থেকে ফিরে এসেছিলেন। তিনি আমাদের পরিদর্শন করতে আসতেন। তার দায়িত্ব ছিল প্রহরার। প্রায়ই আসতেন। তিনিও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তৈরি খাবার খেতেন। তবে তিনি ডাল পেতেন। রুটি টুকরো টুকরো করে তা ডালের ঝোল দিয়ে ভিজিয়ে খেতেন। একবার আমাদের এক বন্ধু ওমান থেকে এলো। সাথে এক কার্টুন আপেল আনল। সেখান থেকে সবাইকে দেয়া হলো। তাতে প্রত্যেকের ভাগে আপেলের পাতলা এক টুকরো পড়ল। মুহাম্মদ জালাল আপেলের সেই পাতলা টুকরো হাতে নিয়ে বললেন, আমি কি আপেল না তার ছায়া দেখছি। তারপর বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি! আমরা যেভাবে জীবনধারণ করছি যদি মুসলিম বিশ্ব এমনিভাবে জীবনধারণ করতো, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা পৃথিবীকে পাল্টে দিতে পারতাম। পৃথিবী আমাদের পদানত হয়ে যেত।

ক্ষুধায় কি কখনো কেউ মারা গেছে? না ক্ষুধায় কেউ কখনো মারা যায় না। প্রত্যহ মানুষের খেতে কত লাগে। তিন রুপিয়া। তারা সাথে না হয় আরো তিন রুপিয়া মিলিয়ে নাও। ছয় রুপিয়া। ব্যস, এতেই একজন মানুষ দিন কাটিয়ে দিতে পারে। শাইখ সাইয়্যাফ ও অন্যান্য মুজাহিদরা হিসাব করে দেখেছেন, দৈনিক একজন মানুষের খাবারের জন্য সাত রুপিয়ার প্রয়োজন পড়ে। তাহলে মাসে আমাদের দুইশ' দশ রুপিয়ার দরকার পড়ে। অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য না হয় আরো একশত রুপিয়া যোগ করে নিলাম। মোট তিনশত রুপিয়া হলো। তুমি যদি এভাবে চলার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করো, তাহলে দুনিয়াতে কোন শক্তি আছে, যে তোমাকে তোমার সংকল্প থেকে টলাতে পারবে? তোমার প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করবে?

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলতেন–

أنا إن عشتُ فلستُ أعدمُ قوتًا و لا إن متُّ فلستُ أعدمُ قبرًا

همَّتي همَّةُ الملوكِ و نفسِي نفسُ حرٍ ترى المذلَّةَ كُفرًا

অর্থ : আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে খাবার থেকে বঞ্চিত হবো না, আর যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে কবর থেকে বঞ্চিত হবো না। আমার মনোবল হলো রাজা-বাদশাহদের মনোবল। আর আমার সত্ত্বা হলো স্বাধীন সত্ত্বা। আমি লাঞ্ছনাকে কুফরী মনে করি।

যদি লাঞ্ছনা কুফরী না হয়, তাহলে কী হবে? আমাদের কে কিসে লাঞ্ছিত করছে? প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ ও ভোগ-বিলাসের আয়োজন, এগুলোইতো। এসব আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করতে বাঁধা দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়েই আমরা চিন্তা করতে থাকি, কোথায় কোন চাকরিতে যোগদান করবো, কোথায় বাড়ি বানাব। মাত্র ছয় বা সাতশ' রিয়াল বেতনের চাকরিতেই এতো বিশাল আশা নিয়ে জীবনযাপন করতে থাকি। আর যদি হাজার দু'হাজার রিয়াল বেতন হতো, তাহলে মনে হয় আমরা হাওয়ায় বাস করতাম। আমাদের খুঁজেও পাওয়া যেত না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٤٦) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقَاعِدِيْنَ ○

অর্থ : তারা বের হতে চাইলে তার জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করতো। কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহর মনোপুত নয়। সুতরাং তিনি তাদের বিরত রাখলেন এবং তাদের বলা হলো, যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক।

নাউযুবিল্লাহ! এর চেয়ে আর বড় মুসিবত কী হতে পারে যে, আল্লাহ তোমাকে এমন স্থানে দেখতে অপছন্দ করেন, যে স্থান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দীয়। এর চেয়ে বড় মুসিবত আর কী হতে পারে যে, তোমার জিহাদ করাকে আল্লাহ অপছন্দ করেন। তাই তোমাকে পশ্চাতে বসিয়ে রাখেন। এর চেয়ে বড় আর কোন মুসিবত আছে বলে আমার মনে হয় না।

কাদের সাথে তারা বসে থাকবে? মহিলাদের সাথে কি? আল্লাহ তা'আলা তাদের তিরস্কার করছেন এবং বলছেন, তোমরা ছোট ছেলে-মেয়েদের সাথে আর নারীদের সাথে কি বসে থাকাকে পছন্দ করছো?

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

رَضُوْا بِأَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

অর্থ : তারা পশ্চাতে অবস্থানকারীদের সাথে থাকাকেই পছন্দ করেছে। আর তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। তাই তারা বুঝে না।

অর্থাৎ কুরআনের আয়াতের মর্মানুযায়ী জীবন গড়তে প্রস্তুত নয়। তুমি তাদের কুরআন পাঠ করে শুনাবে। তারাও প্রত্যহ সূরা তওবা পাঠ করবে। তারপরও যদি কেউ বলে, আমি জিহাদে যাব, সে বলবে, ঘরে বসে থাক। এটা আরেক ফিৎনা। মানুষের হৃদয় মরে গেছে; মানুষের সে অনুভূতি নেই। যেন মানুষ আল্লাহকে বলছে, হে আল্লাহ! তোমার কত অবাধ্য হলাম, কিন্তু কই শাস্তি তো দিলে না। আর আল্লাহ যেন বলছেন, তোমাকে কত শাস্তি দিলাম; কিন্তু তুমি তো অনুভব করলে না। আমি কি তোমার হৃদয়কে প্রাণহীন করে দেইনি? কুরআনের আয়াত অনুযায়ী আমল করতে উদ্বুদ্ধ না হওয়াই হৃদয় প্রাণহীন হয়ে যাওয়া। আজ এটাই লজ্জার বিষয় হয়ে গেছে, দোষের বিষয় হয়ে গেছে যে, অন্যায়, অশ্লীল কাজ দেখে প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া, প্রতিবাদ করা। এ ধরনের ঈমানদার লোকদের মানুষ প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদী, সেকেলে, আধুনিক চিন্তায় বিমুখ, মধ্যযুগীয় ইত্যাদি বলে গালমন্দ করে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ও দুঃখের বিষয়, মুসলমানদের মধ্য থেকে অনেকে একে অপরের জন্য এ ধরনের গালি ব্যবহার করে নিজেকে আধুনিক ভাবে, গর্ববোধ করে। প্রত্যেক দেশেই আজ এ অবস্থা চলছে। সচেতন ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হেয়প্রতিপন্ন করতে বিভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে।

একটা বিষয় খুব খেয়াল রাখবে, বুদ্ধি আর চিন্তাশক্তি কিন্তু দীনকে সাহায্য সহায়তা করে না, আবেগ আর সাহসিকতাই দীনকে সাহায্য সহায়তা করতে পারে। বুদ্ধি তোমাকে বলবে, কিভাবে তুমি রাশিয়ার মতো বিশাল শক্তির মোকাবেলায় লড়াই করবে ও যুদ্ধ করবে? তার উত্তরে আমি বলি, যেমন বিদগ্ধ এক দার্শনিক বলেছিলেন, নিশ্চয়ই বিলাল (রাঃ)-এর ঐ আঙ্গুলী যা তিনি আকাশের দিকে তুলে ধরে বলেছিলেন, আহাদ আহাদ। এটা কোন বুদ্ধির ধ্বনি ছিল না, এটা ছিল আবেগের ধ্বনি। কারণ, বুদ্ধি তাকে বলছিল, তুমি উমাইয়া ইবনে খলফকে ধোঁকা দাও। আর রাতে এসে নতুনভাবে কালেমা পড়ে মু'মিন হয়ে যাও। কিন্তু তিনি বুদ্ধির ডাকে সাড়া দেননি। তাই আবেগই সর্বদা দীনকে সাহায্য করে দীনের উপর অবিচল থাকতে অফুরন্ত শক্তি যোগায়।

একদা আমাকে এক ব্যক্তি বলল, ভাই! আমাদের এতো খোলামেলা হওয়া উচিত নয়। দীনের ব্যাপারে আমাদের আরো সংযত হওয়া উচিত। আমি দু'বছর যাবত চাকরি করছি। কিন্তু কেউ আমার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি। আমি তার কথা শুনে বললাম, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তোমাকে সঠিক বুদ্ধি দান করুন। তোমার কথার অর্থ হলো, দু'বছরে তুমি কোন ভাল কাজের আদেশ দাওনি ও অশ্লীল কাজ থেকে কাউকে বারণ করনি। কারণ, তুমি যদি তা করতে, তাহলে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবাই সচেতন হয়ে যেত। আর তুমি তোমার এ বোকামীকেই দক্ষতা বুঝাতে চাচ্ছ।

কবি বলেন–

يَرى الجُبَناءُ أَنَّ الجُبنَ عقلٌ و تلك خديعةُ الطبعِ اللّئيمِ

অর্থ : ভীরুরা মনে করে যে, ভীরুতাই বুদ্ধিমত্তা। তাহলো নীচু স্বভাবের লোকদের ধোঁকা।

এ ধরনের ভীরু লোকেরা তোমার সাথে একমত পোষণ করবে না আর তার সাথে একমত হওয়াও তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি মনে মনে ভাবতাম, এরা কেন জিহাদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। তারপর হঠাৎ এ ব্যাপারে কুরআনের একটি চমৎকার আয়াত পেয়ে গেলাম–

(٢٧) وَاللّٰهُ يُرِيْدُ أَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلاً عَظِيْمًا ○

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান এবং যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তারা চায় যে তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়। (সূরা নিসা ঃ ২৭)

মানুষ কখনো নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতার কথা স্বীকার করতে চায় না। এ কথাও বলতে চায় না যে, অমুক ব্যক্তি আমার চেয়ে ভাল। অন্যের দোষ দেখে নিজের দোষ দেখে না, নিজের দোষগুলোকে দোষও মনে করে না। হযরত উসমান (রাঃ) এ ব্যাপারে এক চমৎকার কথা বলেছেন–

وَدَّتِ الزانيةُ لو زنتْ كلُّ امرأةٍ ـــ

অর্থ : যিনাকারী মহিলা চায় যদি প্রত্যেক মহিলা যিনা করতো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٤٦) وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقَاعِدِيْنَ ○ (٤٧) لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ إِلَّا خَبَالاً ○

অর্থ : কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহর মনোঃপুত ছিল না। সুতরাং তিনি তাদেরকে বিরত রাখলেন এবং তাদের বলা হল, যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক। তারা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করত।

এখানে خبالً শব্দের অর্থ বিভ্রান্তি, ফিৎনা, গালমন্দ করা, চোগলখোরী করা। মু'মিনদের সংঘবদ্ধ দেখলে তাদের নিকট গিয়ে এমন কথা বলা যেন তাদের ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়; তারা তিন-চার দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মু'মিনদের দলকে তারা ঐক্যবদ্ধ দেখতে অপছন্দ করে। হয়তো মু'মিনদের নিকট গেল। দেখল, তারা জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করছে। বিস্মিত কণ্ঠে বলবে, জিহাদ করবে? কোথায়? জাজিতে? জাজিতে আবার জিহাদ করবে কেন? সে স্থানের সবাই তো মুনাফিক, নেশাখোর, সবাই ধূমপান করে।

হয়তো দেখা যাবে, লোকেরা জাজিতে জিহাদে যাওয়ার কথা, মুসলমান ভাইদের সাহায্য করার কথা আলোচনা করছে। তখন সেই দুরাচার এসে বলে, হায়! সব শেষ হয়ে গেছে। আরব মুজাহিদরা পশ্চাতে সরে এসেছে। মুজাহিদরা পরাজিত হয়েছে। এমনই এক ঘটনা ঘটল। শাইখ আব্দুল্লাহ বন্দী হলেন। আমার নিকট বাগমান থেকে আরব ভাইয়েরা পত্র লিখল, তিনি নাকি কোন আরবকে জবাই করেছেন। তাই তাকে বন্দী করা হয়েছে। হায়! তিনি যদি শহীদ হয়ে যেতেন। মূল কথা হল, তাদের কাজ ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা। তারা ভাল ও কল্যাণ দেখতে পারে না।

আল্লাহ এদেরই المرجفين বলেছেন- المعوقين বলেছেন- المثبطين বলেছেন। কুরআন ও হাদীসে তাদের ব্যাপারে এ ধরনের কথাই বলা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে চার ইমাম একমত যে, এদেরকে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে নেয়া যাবে না। আমীরের ওপর হারাম এদেরকে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে নেয়া। المرجف গুজব রটনাকারী। যারা বলে বেড়ায়, মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে। মুজাহিদদের মাঝে বিদ'আত রয়েছে। এ ধরনের কথা বলে বেড়ায়। অথচ আল্লাহর নির্দেশ, এসব বিষয়গুলো গোপন করা। আর তারা তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বলে বেড়ায়, আরে তারা তো ধুমপায়ী, তারা আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতা সৃষ্টি করে। সমাধি ক্ষেত্রে গিয়ে মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাকে বলেছে রিয়াদের এক ঘটনা। ফজরের নামাযের পর এক ব্যক্তি মসজিদে ঘোষণা করল, ভাইয়েরা আমার! সাবধান! আফগান মুজাহিদদের যাকাত দিও না। তারা মুশরিক, সমকামী। আল্লাহর কসম করে বলছি, এটা বানানো কথা নয়। মসজিদে এ ঘোষণা দিয়েছিল। তার কী জযবা! কী আগ্রহ! সে সত্য ও হক কথা বলে দিল। এতে অবশ্যই সওয়াব পাবে(!)

আমি একবার হজ্বে গেলাম। আমি তখন জিদ্দায়। আমাকে এসে লোকেরা জিজ্ঞেস করতে লাগল, ভাই! আমরা শুনলাম, আফগান মুজাহিদদের মাঝে নাকি শিরক বিদ্যমান। বিদ'আত বিদ্যমান। আমি তাদের অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। অথচ আমাকে জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল, ভাই! যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ কি? মুজাহিদ ভাইয়েরা কেমন আছে? বিজয় হচ্ছে তো? এ সুসংবাদের পরিবর্তে দুঃসংবাদ দিচ্ছে। মানুষের মাঝে গুজব ছড়াচ্ছে। একদল মানুষ এভাবে সরল প্রাণ মানুষদের বিভ্রান্ত করছে। কবি বলেন -

لا خيلَ عندكَ تُهديها و لا مالَ فليُسعد النطقُ إن لم تُسعد الحالُ

অর্থ : তোমার নিকট কোন ঘোড়া নেই, ধন-সম্পদ নেই, যা তুমি উপঢৌকন স্বরূপ দেবে। তাহলে তুমি যখন তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারলে না, তাহলে তুমি কথা বলে তাকে সন্তুষ্ট করে দাও।

এ ধরনের গুজবের কারণেই বহু মানুষ আফগান জিহাদের ফান্ডে যাকাতের অর্থ দেয়নি। শাইখ তামীম এক ব্যক্তিকে বললেন, ভাই! তুমি কি তোমার যাকাতের অর্থ দেবে? তুমি কি আফগান জিহাদকে পছন্দ কর? সে বলল, আমি আমার এক বিশ্বস্ত লোকের নিকট শুনেছি, সেখানে শিরকের ছড়াছড়ি। ভাই! আমরা এতোদিন

যাবত ওখানে আছি, কোথায় শিরক? আফগানের লোকেরা কি মৃত মানুষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে যায়? আমি তো কখনো কাউকে কবরে গিয়ে মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করতে দেখিনি। শাইখ জালালুদ্দীন হক্কানী বলেছেন– আল্লাহর কসম করে বলছি, আমার বয়স ৪৭ বছর। এর মাঝে আমি কখনো কোন আফগানীকে কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, তাদের নিকট তাবিজ পাওয়া যায়। এছাড়া তো আর কিছু পাওয়া যায় না। আর কারো কারো কাছে নেশা জাতীয় বস্তু যেমন তামাক, হেরোইন ইত্যাদি পাওয়া যায়। আর এতে তো মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না। কেউ কি আছে এ কথা বলবে যে, হেরোইনখোর মুসলমান নয়! হ্যাঁ, এ ধরনের নেশাজাতীয় বস্তু খাওয়া হারাম। তবে আমার থেকে একটি ফতওয়া নিয়ে নাও। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফতওয়া। যদি কোন মুজাহিদ আফগানিস্তানে জিহাদ করতে থাকে আর সে নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে, তবে সে এ হারাম কাজ করা সত্তেও ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যে বাইতুল্লাহর পাশে অবস্থান করে ইবাদতে রত আছে। কারণ, উভয়ে কিন্তু হারাম কাজে লিপ্ত। একজন নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করার মাধ্যমে হারাম কাজে লিপ্ত, অপরজন জিহাদ ত্যাগ করার কারণে অপরাধে লিপ্ত। তবে মুজাহিদ যে হারাম কাজ করছে, তা তার ব্যক্তির মাঝে সীমিত আর যে ইবাদতে মগ্ন সে যে হারাম কাজ করছে তা গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর। এ ফতওয়াটি খুব ভালভাবে মনে রাখবে। মনে করো না, আমি অতি কট্টরপন্থী বা জযবায় উজ্জীবিত হয়ে এ ফতওয়া দিচ্ছি। আবার বলছি শুনে নাও, আফগানিস্তানে জিহাদে রত নেশাজাতীয় বস্তু সেবনকারী মুজাহিদ যার হাতে আল্লাহ কুফরী শক্তিকে নিঃশেষ করছেন, দমন করছেন, সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যে তার ঘরে বা পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানে ইবাদতে রত রয়েছে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন–

العدوُّ الصائلُ الذي يُفسدُ الدينُ و الدنيا ليسَ أوجبَ بعدَ الإيمانِ من دفعه

অর্থ : আক্রমণরত শত্রু যে দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি করছে, ঈমান আনার পর তাকে প্রতিহত করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব কাজ আর নেই।

তাই বলছি لا إله إلا الله محمد رسول الله বলার পর আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা ওয়াজিব। আরে ভাই! তুমি এসে বারবার বল, এ হাশীশ খায়, সে এটা খায়। রাখ তোমার এ ধরনের অভিযোগ। ইয়ারমুক আর কাদেসিয়ার যুদ্ধের কথা কি তোমার জানা আছে? সাহাবীদের মাঝে তখন এমন ব্যক্তিও ছিলেন, যিনি মদপান ত্যাগ করে উঠতে পারেননি। তাই লুকিয়ে মদপান করতেন। আবার জিহাদও করতেন। আবু মিহজান (রাঃ) কে তো হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) কাদেসিয়ার জিহাদে জিহাদ করা থেকে বিরত রেখে বন্দী করে রাখলেন। তখন তিনি আক্ষেপে, দুঃখে, মর্মজ্বালায় এ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন-

كفىَ حزنًا أنْ تلقَى الخيلُ بالقنا و أقعدُ مشدودًا على وَثَاقــيَا

অর্থ : আমার দুঃখের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, অশ্বারোহী মুজাহিদদের উপর বর্শা এসে পড়বে আর আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে বসে থাকব।

তাই বলছিলাম, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা আর দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে জিহাদ করা, এ দু'টির মাঝে ব্যবধান রয়েছে। দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে জিহাদ হবে পরিচ্ছন্ন, নির্মল। এরা হবে সুনির্বাচিত। এদের মাঝে কোন নেশাখোর থাকবে না, কোন ধুমপায়ী থাকবে না, জুয়াড়ী থাকবে না। জিহাদের ময়দানে গোটা জাতি অংশগ্রহণ করবে। সকলে অংশগ্রহণ করবে। কাদেসিয়ার যুদ্ধের কথা আমরা শুনে থাকি। যে যুদ্ধে পৃথিবীর দুই মহা-সম্রাট একটির শেষ পরিণাম নির্ধারিত হয়ে গেছে। একবারও কি ভেবে দেখেছ, কারা সেই কিসরার পতন ঘটাল? মুরতাদরা। তুলাইহা আসাদী নবুওয়ত দাবী করার পর তওবা করল। তখন তাকে বলা হল, যাও জিহাদে যাও। জিহাদ কর। তুলাইহা ও তার সঙ্গীদের বিরাট অবদান রয়েছে কাদেসিয়ার যুদ্ধে।

তাদেরই অবদান রয়েছে কিসরা ও কায়সারের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা কর, বুদ্ধিকে শাণিত কর। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তার ফতওয়া গ্রন্থেও ২৮ খণ্ডের ৫০৬ পৃষ্ঠায় বলেন–

و لذلك كان من أصولِ أهلِ السنةِ و الجماعةِ الجهادُ مع كلِّ أمير برًّا كان أو فاجرًا ، أو معَ المعسْكرِ الكثيرِ الفجورِ ، فإذا لم يتيسَّر الجهادُ إلا مع معسْكرٍ كثيرِ الفجور فيجبُ الجهادُ —

অর্থ : তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতি হল, আমীর যেমনই হোক পুণ্যবান হোক বা পাপাচারী হোক বা এমন বাহিনী হোক যাতে অধিক পাপ হয় যে অবস্থাই হোক জিহাদ করতে হবে। অধিক পাপাচারী বাহিনী হলেও তার সাথে মিলে জিহাদ করতেই হবে। (কেননা মুসলমানরা দু'টি বিষয়ে মুখোমুখি হয়েছে, কুফরী ও পাপাচার। তাই পাপাচারীদের সাথে নিয়ে কুফরীকে দমন করতে হবে।) তারপর লিখেন–

و الذّينَ يتورَّعُونَ عن الجهادِ مع الفجارِ من المسلمينَ هذا هو مسلكُ الحَروريَّة ذوِي الورعِ الكاذبِ و هذا يدُلُّ على جهلِهم —

অর্থ : পাপাচারী মুসলমানদের সাথে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকা মিথ্যা পরহেযগারীর দাবীদার হারুরী(শিয়া)দের আদর্শ ও নীতি। এটা মূর্খতার পরিচায়ক। সুতরাং হে ভাইয়েরা! এসো আমরা বিষয়টির গভীরে পৌঁছতে চেষ্টা করি। যাক সে কথা, আমরা তাবিজের আলোচনায় ফিরে আসি। তাবিজ যদি কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবিক হয়, তাহলে তোমাদের মাঝে কে আছে বা আলেমদের মাঝে কে আছে যে তাকে মাকরূহ বা হারাম বলবে? আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) একটি হাসান হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন–

كنتُ أعلّمها منْ عَقَلَ من بُنَيَّ و أكتُبها فِي صَكٍّ لمنْ لم يعقِلْ منهم و أعلّقُها عليه —

অর্থ : আমার ছেলেদের মাঝে যে বুঝত, তাকে আমি তাবিজ শিখিয়ে দিতাম। আর তাদের যে বুঝত না, আমি তা একটি কাগজে লিখে তার গলায় ঝুলিয়ে দিতাম।

ইনি হলেন একজন সাহাবী। তার আমল দেখলে তো। সুতরাং তাবিজ যদি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেয়া হয়, তাহলে কে বলবে তা হারাম?

আল্লামা ইবনে হাজর (রহঃ) ফাতহুল বারী গ্রন্থে লিখেছেন, সমস্ত আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, তিনটি শর্তে তাবিজ ব্যবহার করা জায়েয– ১. বুঝে আসে এমন বর্ণে তা লিখতে হবে। ২. হাদীসে বর্ণিত হতে হবে। ৩. এ বিশ্বাস করা যাবে না যে, তাবিজ নিজেই অসুস্থ ব্যক্তির উপকার করবে।

এই যে আফগানী তার গলায় তাবিজ ঝুলাল। তা কোথা থেকে গ্রহণ করেছে? তুমি কি মনে কর সে তা কোন নেশাখোর থেকে গ্রহণ করেছে? নিশ্চয়ই কোন আলেম থেকে তা গ্রহণ করেছে। আর সে জানে যে, নিশ্চয়ই আলেম ইসলাম সম্পর্কে ভাল জানেন।

তাই সব শেষে বলছি, আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার একটি কথা শুনে নাও–

كان من أصُول أهلِ السنةِ و الجماعةِ الغزوُ مع كلِّ برٍ و فاجرٍ و أنَّ اللهَ يؤيِّد هذا الدينَ بالرجلِ الفاجرِ و باقوامٍ لا خلاقَ لهم ...

অর্থ : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিয়ম-নীতি হল, পাপী-পরহেজগার সবাইকে নিয়ে জিহাদ করা। আর আল্লাহ এই দীনের সাহায্য করবেন পাপী ব্যক্তি দ্বারা এবং এমন সম্প্রদায় দ্বারা যাদের কোন অংশ নেই।

অষ্টাদশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٤٦) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ○
(٤٧) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمّٰعُونَ لَهُمْ وَاللهُ
عَلِيمٌ بِالظّٰلِمِينَ ○ (٤٨) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتّٰى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ
كٰرِهُونَ ○ (٤٩) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِّيْ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكٰفِرِينَ ○
(٥٠) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَّقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُونَ ○

অর্থ : তারা যদি জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছে করত, তবে অবশ্যই সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়। তাই তিনি তাদের নিবৃত রাখলেন এবং নির্দেশ হল, তোমরা বসা লোকদের সাথে বসে থাক। (৪৬) যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তাহলে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করত না। আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। আর আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (৪৭) তারা পূর্ব থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ-সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যাবলী উলট-পালট করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং আল্লাহর হুকুম জয়ী হল আর তারা তা অপছন্দ করে। (৪৮) আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রেখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছে। (৪৯) আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা মন্দ বোধ করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং তারা উল্লসিত মনে ফিরে যায়। (৫০)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তারা জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছে করত, তবে তার সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করত। নিশ্চয় যে ব্যক্তি জিহাদের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সে অবশ্যই সরঞ্জামাদি তৈরি করবে, ঘোড়া ক্রয় করবে, যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেবে। কারণ, যে যুদ্ধের ইচ্ছে করেছে, সে অবশ্যই তার প্রশিক্ষণ নিবে। প্রশিক্ষণ ছাড়া কেউ যুদ্ধে যায় না। সে সেনা নিবাসে যাবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাবে যদি সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

হ্যাঁ, যদি উল্লাস করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে তো অন্য কথা। জিহাদের ইচ্ছে থাকলে অবশ্যই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তারপর জিহাদে যেতে হবে। কারণ, প্রশিক্ষণ নেয়া, পূর্বপ্রস্তুতি নেয়া জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা সহীহ হওয়ার শর্ত। যেমন নামায সহীহ হওয়ার জন্য ওজু শর্ত। তুমি যদি প্রশিক্ষণ ছাড়া জিহাদে যাও, তাহলে তুমি পাপী হবে।

তুমি যদি দু'একদিনের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাও, তারপর সেখান থেকে রণক্ষেত্রে চলে আস, আমরা যদি তোমাকে যুদ্ধের জন্য গ্রহণ করি, তাহলে আমরা পাপী হব। আমাদের গুনাহ হবে। আর যদি আমাদের অনুমতি ছাড়া তুমি জিহাদে যাও, তাহলে তুমি পাপী হবে। যদি তুমি দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হতে না পার, দ্রুত পশ্চাতে আসতে না পার, দৌড়ে যেতে না পার, অস্ত্র চালাতে না পার, তাহলে তো তুমি মুজাহিদদের জন্য বোঝা হলে। তুমি তাদের জন্য বিপদ হলে। তুমি তাদের সহায়ক হলে না। আফগান যুদ্ধে এলে আফগান মুজাহিদরা তোমার কাছ থেকে কাজ চাবে। তুমি যদি দাশাক্কাকে যাইকুক বল, তাহলে তুমি মুজাহিদদের নিকট অপাংক্তেয় হয়ে গেলে। তোমাকে অবশ্যই দাশাক্কা ও যাইকুকের পার্থক্য বুঝতে হবে। আর যদি মুজাহিদরা দেখে, তুমি তাদের

চেয়ে বেশী পারদর্শী, তাহলে তাদের নিকট যথেষ্ট মর্যাদা পাবে। তখনই তুমি তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে।

ভাই আব্দুল আউয়াল আমাকে বলেছেন– আমরা নাঙ্গরহর-এ এক যুদ্ধে গেলাম। আমরা শত্রু বাহিনীর অবস্থানের নিকটবর্তী হলে বোমারু বিমান এল। বিমান বিধ্বংসী অস্ত্র যাইকুক চালনাকারী মুজাহিদকে বললাম, গোলা ছুঁড়ে মার। বিমান এসেছে! বিমান এসেছে! সে গোলা মারতে চেষ্টা করল; কিন্তু যাইকুক নীরব-নিশ্চল। বিমান আমাদের ওপর বোমা মেরে আমাদের অনেককে আহত ও নিহত করল। আমরা পশ্চাতে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। আমরা আমাদের কেন্দ্রে পৌঁছে যাইকুক খুললাম। দেখলাম, ভুলে তার পশ্চাৎ দিয়ে একটি পেরেক ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে।

তাই বলছিলাম, অস্ত্রের ব্যাপারে পারদর্শী হওয়া খুব জরুরী। এমনিভাবে আত্মিকভাবেও নিজেকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। সর্বদা তোমার মনে এ সংকল্প থাকতে হবে যে, তুমি আল্লাহর হুকুমে গুলী ছুঁড়ছো। আল্লাহর হুকুমে আঘাত করছো। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ○

অর্থ : তোমরা তাদের হত্যা করনি; বরং আল্লাহ তাদের হত্যা করেছেন। আর তুমি তীর নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহ তীর নিক্ষেপ করেছেন। (আনফাল ঃ ১৭)

মনে রাখবে, যদি আল্লাহর তাওফীক না হয়, তাহলে তুমি যতই প্রস্তুতি নাও, যতই প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর, তার কোন মূল্য নেই। তাই তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন–

إنكم تُقاتِلُونَ بأعْمالِكم

অর্থ : তোমরা তোমাদের আমলের কারণে জিহাদ করছ।

আর তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে, পাপের কারণেই জিহাদে পরাজয় নেমে আসে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ○

অর্থ : তোমাদের যে দু'টি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলে, শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল তাদেরই পাপের কারণে। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। (আলে-ইমরানঃ ১৫৫)

তাই তোমাদের কর্তব্য হল, সর্বপ্রথম আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মযবুত করবে, তার নিকট কাকুতি-মিনতি করে সাহায্য প্রার্থনা করবে। তোমার সমুদয় তারই নিকট অর্পণ করবে। সাথে সাথে জিহাদের পূর্ণ প্রশিক্ষণ নেবে। আর প্রশিক্ষণ ছাড়াই রণক্ষেত্রে চলে যাওয়া আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখা সেতো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অস্ত্র ছাড়াই রণক্ষেত্রে গেল। এ ধরনের কাজ বৈধ নয়। আসবার গ্রহণ না করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের খেলাফ, ইসলামের বিধান ও শিক্ষার খেলাফ।

একদা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কে বলা হল, ইয়েমেনের কিছু লোক পাথেয় ছাড়াই শূন্য হাতে হজ্বের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। আর বলে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখি। তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেবেন। তখন উমর (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেন, এরা তো খাবারের জন্য ভান ধরেছে। কারণ, এরা হজ্বের সময় বাধ্য হয়ে মানুষের নিকট খাবার চেয়ে বেড়াবে। তাই অবশ্যই আসবাব গ্রহণ করতে হবে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে–

قالوا: يارسولَ الله ، أرأيتَ أدويةً نتداوى بها و رقًى نسترقي بها أتغني من قدرِالله عزَّ و جلَّ ؟ قال: هي من قدرِ الله ـــ

অর্থ : কয়েকজন সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা যদি ওষুধ ব্যবহার করি বা ঝাড়-ফুঁক অবলম্বন করি, তাহলে কি তাকদীর থেকে মুখাপেক্ষী হয়ে যাব?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটাই তো তাকদীর। সুতরাং আসবাব গ্রহণ করা তাকদীর। তাই উমর (রাঃ) সাহাবীদের তিরস্কার করেছিলেন যখন শামে মহামারী দেখা দিল– তখন তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। একজন সাহাবী বললেন– "আপনি কি আল্লাহর ফায়সালা তাকদীর থেকে পলায়ন করছেন?" তিনি বললেন, "বরং আমরা আল্লাহর এক তাকদীর থেকে অন্য তাকদীরের দিকে যাচ্ছি।" তারপর তিনি বললেন, তুমি কি ভেবে দেখেছ, যদি তোমার নিকট দু'টি চারণ ভুমি থাকে। একটি সবুজ শ্যামল অপরটি ঘাস-লতাপাতাহীন; এর মধ্যে কোনটিকে পশু চড়ানোর জন্য নির্বাচন করবে? সাহাবী বললেন, বরং আমি সবুজ-শ্যামল চারণভূমিতে পশু চড়াব। উমর (রাঃ) বললেন, তুমি সবুজ-শ্যামল চারণভূমিকে আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী প্রাধান্য দিয়েছ আর ঘাস-লতা পাতাহীন ভূমিকে আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী ত্যাগ করেছ।

আসবাব গ্রহণের বিষয়টি সাহাবায়ে কেরাম এমনই বুঝতেন। হ্যাঁ, যদি তোমাদের কেউ প্রশ্ন করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলেননি। আমি বলব, তখন তার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম সবাই ছিলেন দক্ষ অশ্বারোহী ও যোদ্ধা। অস্ত্র চালনা শিক্ষা ছিল তাদের জীবনের অংশ। ছেলে জন্ম লাভ করলে বা ঘোড়া বাচ্চা প্রসব করলেই তারা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাত। তাই এ ধরনের প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। আরবরা তো গর্বভরে আবৃত্তি করতো–

لو كانَ في الألف فارسٌ فدَعُوا من فارسٍ ظنَهم إياه يَعنُـــونَا

অর্থ : যদি হাজার মানুষের মাঝে আমাদের একজন অশ্বারোহী থাকে, তাহলে তোমরা সেই অশ্বারোহী যোদ্ধাকে ছেড়ে দাও আর মনে করো তারা তাকে গুরুত্ব দিবে।

আর রাসূল যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেননি, তা বলা ঠিক হবে না। তিনি তাজমীর করা অশ্ব আর তাজমীরবিহীন অশ্বের মাঝে দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতেন। তাজমীর করা অশ্বের ময়দান ছিল ছয় মাইল। সানিয়াতুল বিদা ও মসজিদে বনু জরীফের মধ্যবর্তী স্থানটুকু। বুখারী শরীফে তা বর্ণিত আছে। রাসূল তো আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন। আমাদের মতো অলস ছিলেন না। আমরা যেমন কর্মহীন অবস্থায় থেকে শরীরে চর্বির স্তুপ গড়ে তুলি। তারা শ্রমের অনুপাতে খাদ্য গ্রহণ করতেন। তারা দু'বেলা খেতেন। সকালে ও রাতে। তাদের দু'ধরনের খাবার ছিল।

১. صبوحٌ যা সকালে খেত। ২. غبوقٌ যা সন্ধ্যায় খেত।

কিন্তু কালক্রমে যখন কাজের পরিধি বেড়ে চলল, ব্যস্ততাও বেড়ে চলল আমরা খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলাম। আরেকবার খাবার সংযোজন করলাম। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখ, সাহাবায়ে কেরাম মনে করলেন, তিনি হাওদায় আছেন। তাই তারা হাওদা তুলে নিয়ে উটের উপর রাখলেন। তারপর দেখা গেল, হাওদা খালি। তাতে আয়েশা (রাঃ) নেই। এবার চিন্তা কর, আয়েশা (রাঃ) কত ক্ষীণকায়া ছিলেন। আর আমাদের নারীদের শরীর কত স্থুল। খাদেমা ছাড়া তাদের চলেই না। সন্তানকে দুধ খাওয়াবে না। প্রয়োজনীয় কাপড় ধৌত করবে না। ঘর ঝাড়ু দেবে না। এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে দিয়ে বসে থাকবে। আর দৈনিক পত্রিকার অপেক্ষা করবে। টেলিভিশনের প্রোগ্রামগুলো একটার পর আরেকটা দেখবে।

মোটকথা, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগের প্রত্যেকেই অস্ত্র চালনা জানতেন। অস্ত্র প্রশিক্ষণ তাদের জীবনের অংশ ছিল। তাদের সবাই ঘোড়সওয়ারীতে পারদর্শী ছিলেন। তরবারী চালনা, বর্শা নিক্ষেপ সবই তারা পারতেন। এগুলো ছিল তাদের প্রস্তুতির অংশ। বরং মেয়েরাও তা পারত। হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইমের হাতে খঞ্জর দেখতে পেলেন। বললেন, হে উম্মে সুলাইম! এটা কী? উম্মে সুলাইম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা খঞ্জর। যারা আপনার পাশ থেকে পালিয়ে

যেতে চেষ্টা করবে, আমি এর দ্বারা তাদের পেট চিরে ফেলব। অর্থাৎ অস্ত্র চালনা আরবের নারী-পুরুষ সকলের জীবনের অবিচ্ছেদ্য বিষয় ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٤٦) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ○

অর্থ : আর তারা যদি জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছে করত, তবে অবশ্যই সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহ পছন্দ করেন না। তাই তিনি তাদের নিবৃত রাখলেন এবং বলা হলো, তোমরা বসা লোকদের সাথে বসে থাক।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'বলা হল' প্রশ্ন হয় কে বলল? আলেমগণ বলেন, তারা একে অপরকে বলল, তোমরা বসা লোকদের সাথে বসে থাক। তারা বলল, আমরা গিয়ে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব। যদি অনুমতি দেন, তাহলে জিহাদে গমনকারীদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করব। আর যদি আমাদের বসে থাকার অনুমতি দেন, তাহলে আমরা জিহাদে না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকব। কেউ বলেছেন– এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন। তখন মুনাফিকরা বলেছে, ব্যস, আমরা অনুমতি নিয়ে নিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাড়িতে শিশু আর নারীদের সাথে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।

কেউ বলেছেন– তাদের তিরস্কার করে বলা হয়েছে, যাও তোমরা বসা লোকদের সাথে বসে থাক। জিহাদে যেও না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ○

অর্থ : যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো, তাহলে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করত না। অর্থাৎ তারা তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করত না। তোমাদেরকে শত্রুদের থেকে রক্ষা করত না। তাদের মনে কোন কল্যাণ চিন্তা নেই। তারা মু'মিনদের মাঝে চোগলখুরি করে, ভীতি ছড়ায় এবং আরও অন্যান্য পদ্ধতিতে ফিৎনা ছড়ায়।

وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ○

অর্থ : বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য তোমাদের মাঝে ছুটে যেত। তারা না শোনার ভান ধরে কান লাগিয়ে তোমাদের সব কথা শুনে। যখন সময় সুযোগ পায় তখন শোনা কথাকে বাড়িয়ে কমিয়ে প্রচার করে ফিৎনা সৃষ্টি করে।

وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ○

অর্থ : তোমাদের মাঝে তাদের গুপ্তচর রয়েছে। অর্থাৎ তারা তোমাদের সাথে মিশে থেকে তোমাদের কথা শুনে আর মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলে তোমাদের মাঝে ফিৎনা ছড়ায়। তোমাদের পতন কামনা করে। তোমাদের ভুলভ্রান্তিকে আঁকড়ে ধরে। তিলকে তাল বানিয়ে প্রচার করে। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও। কুরআনের দিকে ফিরে তাকাও। কুরআন তাদের ব্যাপারে বলে, তারা তোমাদের মাঝে থাকলে তোমাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করত। আর যদি মুজাহিদদের সারি মজবুত থাকে, নেতৃত্ব মজবুত থাকে, কেউ তাতে ফাঁটল সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে মুনাফিকরা তাতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। মু'মিনদের জীবন নিয়ে খেলায় মেতে উঠতে পারবে না।

এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে ফকীহগণ বলেন, তারা যদি মুজাহিদদের দলের সাথে রণাঙ্গনে যায় আর মুজাহিদ বাহিনী বিজয় লাভ করে, তাহলে তাদেরকে গনীমতের সম্পদের নির্ধারিত অংশ দেয়া হবে না এবং এমনিতেও কিছু দেয়া হবে না।

এমতাবস্থায় আমীরের কর্তব্য হলো, তাদেরকে মুজাহিদ বাহিনী থেকে বের করে দেয়া। হ্যাঁ, যদি তাদের মাঝে প্রতাপশালী কেউ থাকে বা তাদের অনুগত বেশকিছু লোক থাকে, যদি তাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে মুজাহিদ বাহিনীতে ফিৎনা হবে, তাহলে তাদের রণাঙ্গনে যেতে দেবে। তবে তাদের গনীমতের মালে কোন অংশ দেয়া হবে না। নারী ও শিশুদের যেমন গনীমতের মালের কিছু অংশ তুলে দেয়া হয়। এ ভাবেও তাদের মনোতুষ্টির জন্য তাদের কিছুই দেবে না। এ কথায় সকল মাযহাবের সকল ফকীহগণ একমত।

'নিহায়াতুল মুহতাজ' গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর এ মত বর্ণনা করা হয়েছে। ফিৎনা সৃষ্টির উপমা দিচ্ছি। যেমন তুমি সাইয়াফের সাথে জিহাদ করছিলে। কেউ বলল, সে তো যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যে কোন সময় তার পতন ঘটতে পারে। সুতরাং তুমি হেকমতিয়ারের সাথে যুদ্ধ কর। অথবা তুমি হেকমতিয়ারের সাথে জিহাদ করছিলে। তোমাকে বলবে, আরে তুমি হেকমতিয়ারকে চেন না, সে তো খুনী। এক মুহূর্তও তার সাথে থেক না। রব্বানীর তালাশে যাও। তার সাথে যুদ্ধ কর। তুমি হয়তো আহমদ শাহ মাসউদের নিকট যাচ্ছ। তোমাকে বলবে, আরে তুমি আহমদ শাহ মাসউদকে চেন না। সে তো আমেরিকা আর ফ্রান্সের এজেন্ট। আমরা এ ধরনের অনেক গোপন বিষয় জানি। এসব বিষয় গোপন রাখার নির্দেশ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। তাই প্রকাশ্যে এসব কথা বলি না।

এ ধরনের মুনাফিক চরিত্রের লোকেরা পঁচা আপেলের মতো। তার থেকে দুর্গন্ধই বের হবে। ভাল গন্ধের আশা করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ○

অর্থ : যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। (সূরা আরাফ ঃ ৫৮)

তবে এতে ভয়ের কারণ নেই। আল্লাহর উপর ভরসা কর। আমি তো নিশ্চিত যে, এ সবকিছু ফেনাতুল্য। এর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আল্লাহ বলেন–

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ○

অর্থ : আর ফেনা তো শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়। (সূরা রাদ ঃ ১৭)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٢٤) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ○ (٢٥) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○ (٢٦) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ○

অর্থ : তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তা'আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন। পবিত্র বাক্য হল পবিত্র বৃক্ষের ন্যায়। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করে। আর নোংরা বাক্যের উদাহরণ নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই। (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪-২৬)

নোংরা কথা হৃদয়ে থাকে না। হৃদয় থেকে তা মুছে যায়। তাই মু'মিনের নিকট কেউ এসে নোংরা কথা, অবাস্তব কথা বললে সে বলে, হে ভাই! কেন তুমি গিয়ে এ কথাগুলো সামনাসামনি বলো না। অগোচরে বল কেন?

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(৮৩) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ○

অর্থ : আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন শান্তি বা ভয়ের সংবাদ, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রাসূলের নিকট বা তাদের শাসকের নিকট, তাহলে যা অনুসন্ধান করে দেখার মতো তাতে অনুসন্ধান করত। (সূরা নিসা ঃ ৮৩)

হয়তো কেউ এসে তোমাকে বলল, অমুক অমুক যুদ্ধ করছে। তখন তুমি তাদের বলবে, এসব কথা আমাকে বলো না। যাও, যারা এর সমাধান করতে পারবে, তাদের নিকট যাও। তাদের নসীহত কর। তারাই তখন তোমাকে সবকিছু বলে দেবে।

এই যে ভাই আবু সাঈদ। এক সপ্তাহ পূর্বে জিহাদ করতে আমাদের নিকট এসেছে। আচ্ছা আবু সাঈদ তুমিই বল, এ পথে তোমার কোন কোন ধরনের বাঁধা সৃষ্টি হয়েছে!

আবু সাঈদ তখন দাঁড়াল। দরূদ ও হামদ পাঠ করে বলল, আমি জিহাদ করার চিন্তা করছিলাম। আমি আমার সহপাঠী ও যুবক বন্ধুদের বলতাম, ইনশাআল্লাহ আমি জিহাদে যাব। আমার এক যুবক বন্ধু বলল, আমি জিহাদের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানে যাচ্ছি। সে আমার বাড়িতে এলো। বলল, ভাই! আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে কিছু কথা বলব। আমি বললাম, কী বলতে চাও? সে বলল, আমি আমার এক শিক্ষকের নিকট গিয়েছিলাম। তাকে আফগানিস্তানের জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি তখন একটি ছোট্ট পুস্তিকা বের করলেন। পুস্তিকার ভাষ্য, আফগানিস্তানের লোকেরা মুশরিক। সুতরাং তাদের সাথে মিলে জিহাদ করা বৈধ নয়।

আমার কথা হলো, এখন তোমরা ভেবে দেখ, তাদের কত বড় সাহস। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে তারা কত দুঃসাহসী। একটি জাতির বিরুদ্ধে অপবাদ দিচ্ছে, তারা মুশরিক। তারা শিরকে লিপ্ত। সুতরাং তাদের সাথে জিহাদ করা বৈধ হবে না। অর্থাৎ তুমি যদি আফগানীদের সাথে জিহাদে যাও, তাহলে তুমি পাপী হবে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, আল্লাহর ওয়াস্তে সে এ কথাগুলো বলে তাকে উপদেশ দিচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(১০৩) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ○ (১০৪) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ○

অর্থ : বল, আমি কি তোমাদের বলে দেব কারা আমলের ক্ষেত্রে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত? যাদের কৃতকর্ম পৃথিবীতে নিষ্ফল হয়ে গেছে। আর তারা ধারণা করে যে তারা পূণ্যের কাজ করছে। (সূরা কাহফঃ ১০৩-১০৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালের ভয়াবহতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন–

كيفَ بكُم إذا رأيتُم المعروفَ مُنكرًا و المنكرَ معروفًا —

অর্থ : তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন তোমরা পূণ্যের কাজকে পাপ কাজ মনে করবে, আর পাপের কাজকে পুণ্যের কাজ মনে করবে? আজ তো আমাদের অবস্থা এমন হয়ে গেছে আমরা এখন قمة سنام الإسلام ইসলামের উৎকর্ষের চরম শিখর জিহাদকে হারাম বলছি। আমি এদের জিজ্ঞেস করি, কিভাবে তারা মুশরিক? তারা কবরবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে– এ কারণে কি তারা মুশরিক? তারা তাবিজ ব্যবহার করে– এ কারণে কি তারা মুশরিক?

হ্যাঁ, যদি কবরবাসীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার কথা বলা হয় তাহলে বলবো, এ পাপ থেকে কোন দেশের মানুষ মুক্ত নয়। কোন জাতি মুক্ত নয়। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের কিছু না কিছু মানুষ এ পাপ কাজে লিপ্ত। জর্দানের কথা বল, সিরিয়ার কথা বল, মিসরের কথা, ইরাকের কথা বল, পৃথিবীর সব ক্ষেত্রেই এ পাপে লিপ্ত কিছু মানুষ পাবে।

আলহামদুলিল্লাহ! আমি আমার কথা বলছি, শৈশবকাল থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাকে হিদায়াত দান করেছেন। দীনের দাওয়াতের কাজে সম্পৃক্ত আছি। তাই বিদা'আত, কুসংস্কার আর ভণ্ড সূফীদেরকে শৈশব থেকেই ঘৃণা করি। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই আমি দাওয়াতের কাজের সাথে জড়িত। আমি যখন মিসরে ছিলাম, বিশ্বাস করো আমি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর কবরও যিয়ারত করতে যাইনি। আমার মনে হতো হাদীসে বর্ণিত সে شد الرحل অর্থাৎ 'কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূরে কোথাও যাওয়ার' অন্তর্ভুক্ত হয় কিনা? অথচ আমার মনে হতো, এটা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর সাথে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি লোকদের দেখেছি, তারা হুসাইন (রাঃ)-এর কবরের চারপাশে তওয়াফ করে। সাতবার তওয়াফ করে। কাউকে দেখলে ডেকে বলে–

اسعَ ، اسعَ سبعَ أشْواطٍ حولَ قبرِ الحسين —

অর্থ : এসো, হুসাইনের কবরের পাশে সাতবার তওয়াফ করো।

অথচ সেখানে তার শরীর মুবারকের মাথা নেই বা অন্য কোন অঙ্গ নেই, এমনকি শরীরের একটি চুল পর্যন্ত নেই; তারা সেখানে নযর নিয়াজ দিচ্ছে, মান্নত করছে। আমি এ দৃশ্য দেখে আক্ষেপ করতাম। আফসোস করতাম। অথচ তার কবর জামে আজহারের পাশে অবস্থিত। আমি সেখানে অবস্থিত মসজিদে বসে অনেক লেখাপড়া করেছি। তাই কবর পূজা, কবরবাসীর নিকট কিছু চাওয়া ইত্যাদি বিষয়কে আমি আশৈশব ঘৃণা করি।

আমার কিছু বন্ধু, কিছু আত্মীয় সূফী ছিল। তাদের মাঝে আর আমার মাঝে এ বিষয়টি নিয়ে তাদের সাথে মারাত্মক বিরোধ ছিল। অথচ তারা আমাকে মহব্বত করত। তাই আমি সর্বদা তাদের বলতাম, তোমরা কারো উসিলা কামনা করো না। এমনকি রাসূলেরও উসিলা কামনা করো না। আমি কখনো বলতাম না-

اللهم اغْفِرلي بجاهِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم —

হে আল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দাও। অথচ আমি জানি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসিলা কামনা করাকে বৈধ মনে করতেন। আর ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তাকে মাকরুহ মনে করতেন আর যে বিষয়ে ইখতেলাফ আছে, তা পালন না করা উত্তম। তাই আমি কখনো তা করি না। সুতরাং, উসিলা গ্রহণ করা কতিপয় আলেমের নিকট বৈধ আর কতিপয় আলেমের নিকট অবৈধ। কারো নিকটই তা হারাম নয়।

এখন আমরা তাবিজের কথায় আসি। তাবিজে যদি কুরআন ও হাদীসের কিছু লেখা থাকে, তাহলে তা শরী'আতসম্মত তাবিজ। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) এ হাদীসটি লিখেছেন-

أعيذُكَ بكلمات اللهِ التامَّةِ مِن كلِّ شيطانٍ و هامةٍ و من كلِّ عينٍ لامةٍ —

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমি এ তাবিজটি আমার সাবালক সন্তানদের লিখে শিখিয়ে দিতাম। আর যারা ছোট লিখে তাদের গলায় তা ঝুলিয়ে দিতাম।

সুতরাং তাবিজ যদি কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত কালামের দ্বারা হয়, তাহলে তো সে ব্যাপারে কারো বিরোধিতা করার কথা নয়। হ্যাঁ, তুমি যদি তাবিজ খুলে দেখ তাহলে তা দু'ধরনের পাবে। এক ধরনের তাবিজে লেখা থাকবে ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক বা সূরা নাস। আরেক ধরনের তাবিজ আছে তা শিয়ারা তৈরি করে। আমি এ ধরনের কিছু তাবিজ খুলে দেখেছি। তাতে বার ইমামের

নাম লেখা থাকে। তাতে বাহুর ছবি থাকে, চোখের ছবি থাকে। তুমি কি ধারণা করতে পারবে, কত টাকার বিনিময়ে তারা তা বিক্রি করে? কখনও তারা তা আফগানী হাজার রুপিয়ায় বিক্রি করে। কখনও পাঁচ হাজার রুপিয়ায় বিক্রি করে। শিয়ারা এ তাবিজের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। হাজার রুপিয়া কিন্তু অনেক অর্থ। সাধারণ মানুষ এ ধরনের তাবিজ গণ্যমান্য ধার্মিক ব্যক্তিত্ব থেকেই নিয়ে থাকে। তারা মনে করে, এ তাবিজ কুরআন ও হাদীসের আলোকেই লেখা হয়েছে।

এক ডাক্তার বন্ধু আমাকে এ বিষয়ের একটি সুন্দর ঘটনা বলেছেন। একদা এক আরবী এল। ডাক্তার বন্ধুর গলায় তাবিজ ছিল। আরবী তা দেখে বিস্মিত হলো এবং তাবিজ কেঁটে ফেলতে চাইল। ডাক্তার বন্ধু বলল, আরে ভাই, তুমি তাবিজটি কেঁটে ফেলে দিতে চাচ্ছ কেন? এতে কী হয়েছে? আরবী বলল, এটা তো শিরক। ডাক্তার বন্ধু বলল, বারে, তুমিও তো তাহলে মুশরিক। এটা তো কুরআন। কুরআন গলায় ঝুলিয়ে রাখা কি শিরক, না যে কুরআনকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়, সে মুশরিক?

আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষ এটাই বুঝে যে, তাবিজে কুরআন লেখা থাকে। তুমি যদি তা খুলে তাকে দেখাও যে, তাতে কুরআনের কোন আয়াত লেখা নেই, তাহলে সে বিস্মিত হবে। হ্যাঁ, যদিও একথা মেনে নিলাম যে, তাতে শিরকমূলক কিছু লেখা রয়েছে। যেমন ইয়া হাসানু, ইয়া আলিয়ু, ইয়া হুসাইনু ইত্যাদি লেখা থাকে আর সাধারণ মানুষ তা না জেনেই ব্যবহার করল, তাহলে কী তা শিরক হবে?

শোন, খুব মনোযোগ সহকারে শোন। আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামরা মানুষের অজ্ঞতাকেও ওজর হিসেবে গ্রহণ করতেন। এ মত পোষণ করতেন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা ইবনে কায়্যিম ও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব প্রমুখ আলেমগণ। আমরা কী তাদের মতামতকে গ্রহণ করব না?

গত বছর আমি হজ্বে গিয়েছিলাম। শাইখ আব্দুল মজীদ খানদানী আমাকে বললেন, আমি এ বিষয়টি শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বাযকে জিজ্ঞেস করেছি। বলেছি, আচ্ছা, এই সাধারণ লোকেরা যেসব শিরকমূলক কাজ করছে, এর কারণে কি আমরা তাদের মুশরিক হওয়ার ফতওয়া দিব? উত্তরে তিনি বললেন, না, তাদের কাফের হওয়ার ফতওয়া দিব না। এটা হলো শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে বাযের কথা। কারণ, একদা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবকে জিজ্ঞেস করা হল, এই যে লোকেরা কাওয়াযের গম্বুজের ইবাদত করছে। আমি কি তাদের কাফের বলব? তখনকার সময় নজদে একটি গম্বুজ ছিল। লোকেরা তার তওয়াফ করত। তার থেকে সাহায্য কামনা করত। তখন উত্তরে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব বললেন–

لا نُكفّرهم لقلّة منْ يعلّمُهم —

আমরা তাদের কাফের বলব না। কারণ ইসলামী জ্ঞান শিক্ষাদানকারী লোক তাদের মাঝে একেবারেই কম।

এবার একটু চিন্তা করে দেখ। যারা কাওয়াযের গম্বুজের পূজা করত, তাদের সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের মতামত কী ছিল। আজ থেকে তিনশ বছর পূর্বে তিনি একথা বলে গেছেন। একথা আব্দুল্লাহ ইবনে বায বলেছেন। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১১৭০ বা ১১৮০ সালে- ২৫০ সাল পূর্বে। তারা শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। মক্কা ও মদীনা থেকে সকল মিথ্যা ও ভ্রষ্ট সূফীদের মূল উপড়ে ফেলেছিলেন। আজকের আফগান কি তাহলে মক্কা-মদীনার লোকদের চেয়ে বেশী ভাল হয়ে যাবে?

আসুন, আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাই। আলোচনা ছিল, কেন আফগানিস্তানের লোকদের মুশরিক বলব? শরী'আতের আলোকে কি তা সহীহ হবে? তাহলে কি তাদের সাথে মিলে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে না? এ ধরনের পরিস্থিতিতেই কাওয়াযের গম্বুজের যারা পূজা করত, তাদের সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব বলেছেন– لانكفرهم لقلة من يعلمهم আমরা তাদের কাফের বলব না। কারণ, ইসলামী জ্ঞান শিক্ষাদানকারীর অভাব তাদের মাঝে প্রকট।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) জাহমিয়া নামক এক বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে প্রচুর শ্রম দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের সম্পর্কে বলতেন–

لو قلتُ بقولكم لكفرتُ و لكني لا أكفّركم لأنّكم جُهّالٌ —

অর্থ : যদি আমি তোমাদের মতো বলি, তাহলে আমি কাফের হয়ে যাব। কিন্তু আমি তোমাদের কাফের বলব না। কারণ, তোমরা অজ্ঞ। তোমাদের মাঝে ইসলামের নির্মল জ্ঞান নেই।

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলতেন, যেসব লোক মৃত বুযুর্গ ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, আমরা তাদের কাফের বলব না। কারণ, তারা অজ্ঞ-মূর্খ। ইসলাম সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই।

এই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামদের মতামত। আমরা সবাই তাদের মনীষা ও তাদের আকীদা-বিশ্বাসের স্বচ্ছতা সম্পর্কে জ্ঞাত। এমন অবস্থায় তারা যখন মূর্খ ও অজ্ঞ লোকদের শিরকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে মুশরিক বলতে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে কিভাবে আমরা আফগানিস্তানের লোকদেরকে ঢালাওভাবে মুশরিক বলতে পারি? কিভাবে তাদের সাথে জিহাদ করাকে অবৈধ বলতে পারি? এ ধরনের কথা বলা কখনও উচিত নয়।

উসিলা গ্রহণ করা সম্পর্কে আগেই বলেছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উসিলা গ্রহণ করাকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বৈধ বলেছেন। আর আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের উসিলা গ্রহণ করাকে কিছু কিছু আলেম বৈধ বলেছেন। এ বিষয়টি একসময় আমাকে খুব পেরেশানিতে ফেলেছিল। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলছি। একদা কিছু যুবক আফগানিস্তানে জিহাদে এল। একদিন বা দু'দিন তারা আফগানিস্তানে ছিল। তাদের কয়েকজন পেশোয়ারেই থেকে গিয়েছিল। তারা আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসে শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বাযকে বলল, শিরকে আকবার ও শিরকে আসগার মুজাহিদদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। তখন শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে বায আমার নিকট পত্র পাঠালেন। তাতে তিনি লিখেন–

"আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম! আল্লাহ তোমার আমলসমূহে বরকত দান করুন। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করুন। আমীন। আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তার নিকট প্রার্থনা করছি, যেন তিনি আমাকে ও তোমাদেরকে তার নিয়ামত বাড়িয়ে শুকরিয়া আদায় করার তওফিক দান করেন। তাঁর নবী-রাসূল, তাঁর বন্ধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর বংশধর ও তাঁর সাথীদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। আর আমাদেরকে ও তোমাদেরকে তার ঐ অনুসারীদের মাঝে গণ্য করুন, যারা সুন্নতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দীনের দিকে আহবান করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি সক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী।

সম্মানিত ভাই!

আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে এমন কিছু ব্যক্তির মুখে শুনতে পেলাম, ওখানের নেতৃস্থানীয় মুজাহিদদের মাঝে ও কিছু সাধারণ মানুষের মাঝে শিরকে আকবার দেখা যাচ্ছে। যেমন রাসূলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। মৃত বুযুর্গদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা। কিছু শিরকে আসগার ও বিদ'আত দেখা যাচ্ছে। যেমন তাবিজ ব্যবহার করা ইত্যাদি।

তাই তোমাকে বলছি, যে শিরক ও বিদ'আত তাদের মাঝে আছে, উত্তম পন্থায় তা উৎপাটনের চেষ্টা কর। আলোচনা সভা ও বক্তৃতায় এ বিষয় তুলে ধর। তাদের বুঝাও যে, শিরক, বিদ'আত ও পাপে লিপ্ত থাকা শয়তানের কাজ। আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকা শত্রুর উপর বিজয়ের কারণ।..."

এক যুবক আমাকে বলেছে, যারা এ ধরনের কথা বলে থাকে, তাদের কাছে নাকি শাইখ আব্দুল আযীয বলেছেন– আফগানিস্তানে জিহাদ করা বৈধ নয়। কারণ, তা হবে মুশরিকদের সাথে মিলে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ। আমি তখন বিস্মিত হয়ে বললাম, শাইখ আব্দুল আযীয নিজ মুখে একথা বলেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। আমি তাকে বললাম, আল্লাহর দীনকে মানুষের নিকট অপছন্দনীয় করে তুলো না। শাইখ আব্দুল আযীয মুসলমানদের নিকট সত্যের প্রতীক। যদি এ ধরনের কথা আফগান মুজাহিদদের নিকট পৌঁছে, তাহলে তারা তার সম্পর্কে কী ভাববে!

এরপর আমার সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি তাকে বললাম, হে শাইখ! আপনার সম্পর্কে বলা হয়, আপনি বলেন, আফগানিস্তানের জিহাদ নাকি মুশরিকদের সাথে মিলে নাস্তিকদের সাথে যুদ্ধ করার নামান্তর।

আমার কথা শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, তারা তো আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। তারপর তিনি কয়েকটি প্রবন্ধে লিখলেন যে, আফগানিস্তানের জিহাদ একটি ইসলামী জিহাদ। জানে-মালে তাদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা শক্তি সামর্থ্য থাকলে ফরয। সেই পত্রিকা আমার নিকট সংরক্ষিত আছে। তার ফতওয়াও আমার নিকট সংরক্ষিত আছে। 'আল মুজতমা' পত্রিকা তা প্রকাশ করেছিল। 'আল জিহাদ' পত্রিকা তা প্রকাশ করেছিল। হ্যাঁ, জানে-মালে জিহাদ করা ফরযে আইন। এ ব্যাপারে তিনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন।

ভাইয়েরা!

আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, আফগানের লোকেরা মুশরিক। যদিও দেখি, তারা সমাধিস্থ ব্যক্তি থেকে সাহায্য প্রার্থনা করছে। আর যদি কাউকে তা করতে না দেখি, তাহলে কি তাদের মুশরিক বলতে পার? আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি কোন আফগানীকে কবরের নিকট গিয়ে কবরস্থ ব্যক্তির থেকে সাহায্য প্রার্থনা করতে দেখেছ? আমি তো কাউকে দেখিনি। তোমরা কি কাউকে দেখেছ? অথচ কিছু লোক তো মাত্র ছয় ঘন্টা আফগানিস্তানে থেকে মাইক্রোস্কোপ বা টেলিস্কোপ দিয়ে আবিষ্কার করে ফেলে যে, আফগানীরা কবরস্থ মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে।

আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি আফগানিস্তানে বহু হেঁটেছি। প্রায় কাবুল পর্যন্ত হেঁটেছি। রাস্তার পাশে কোন কবর দেখিনি। অথচ পাকিস্তানের পেশোয়ার থেকে তারামনজিল পর্যন্ত পথটুকু কবরে কবরে ভরা। আফগানিস্তানে তা দেখিনি। তারপরও আমি বলছি, আচ্ছা তোমরা যদি তোমাদের ব্যাপারে অটল থাক, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় আমাদের উপদেশ দিয়ে থাক, তাহলে কি এটা উচিত হবে না যে, তোমরা এ অজ্ঞ-অসহায় মানুষগুলোর মাঝে হাজির হয়ে তাদের আল্লাহর দীন ও সহীহ আকিদা শিক্ষাদান করবে। আমরা তো তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না দিয়ে বহু তাবিজ তাদের গলা আর বাজু থেকে ফেলে দিতে পেরেছি।

একদা আমি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। প্রশিক্ষণের শেষদিকে বা গল্পের মজলিসগুলোতে আমি তাদের বলতাম, কবর পাকা করার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতামত কী? তারা যদি একথা জানতো যে, ইমাম আবু হানিফা তা অপছন্দ করতেন। ব্যস, তারাও তা অপছন্দ করত। কখনো বলতাম, তাবিজ ব্যবহারের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতামত কী? এভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করে তাদের সামনে মাসআলাটি সুস্পষ্ট করে দিতাম, আর তারা তা অবলীলাক্রমে মেনে নিত। কারণ, তারা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে অত্যন্ত মহব্বত করে। আর আবু হানিফা (রহঃ) এ সবকিছুর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে গেছেন।

তাই বলছিলাম, হিকমতের সাথে উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তাদের বললে অবশ্যই তারা তা গ্রহণ করে। তারা আরবদেরকে শিক্ষকের মতো সম্মান করে। হ্যাঁ, যদি তুমি প্রথম দিন গিয়েই তাদের হাতে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের পুস্তক তুলে দাও, তাহলে কিন্তু তারা তা মেনে নিবে না। কারণ, ইংরেজরা তিন শতাব্দী ধরে তাদের হৃদয়ে ওয়াহাবীদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে গেছে। তাই সহজে তারা এ কথা মেনে নিতে পারে না। ইংরেজরা ভয় পেত যে, যদি মুসলিম সমাজে ওয়াহাবীদের সংস্কারমূলক দাওয়াত পৌঁছে যায় ও

ইসলামী বিশ্বে সহীহ আকীদা-বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে! তাই তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং ইবরাহীম পাশাকে আরব উপদ্বীপে আগমন করতে উৎসাহিত করেছে। ওবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বন্দী করেছে। পথে পথে লাঞ্ছিত-অপমানিত করে ঘুরিয়েছে। অবুঝ বালকরাও তার সাথে তিরস্কার করেছে। ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে ভ্রষ্ট সূফীরা ছিল। ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে শিয়ারা ছিল। ইংরেজ ও তার দোসররা ছিল ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে। অথচ এরা জানে না, ওয়াহাবী কি। এর আদর্শ কী। পাকিস্তানীদের মতো অন্যান্য দেশের লোকেরাও তাদের সম্পর্কে জানে না।

অন্যের কথা কী বলব। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমিও ওয়াহাবীদের অপছন্দ করতাম। মনে করতাম, এরা ইসমাইলিয়্যা, নাসিরিয়্যাদের মতো একটি ভ্রষ্ট দল। মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া শেষ করেও আমি এ বিশ্বাসই করতাম। এমনকি বার্থ পার্টিও ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে ছিল। ইরানে অনেক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতপন্থী বিজ্ঞ আলেম ওয়াহাবী অভিযোগে কারাবরণ করছে। যেমন আহমদ মুফতী জাদা, ইবরাহীম মুহিউদ্দীন, নযর মুহাম্মদ, আরো অনেকে। সুতরাং তোমরা একদিন বা এক রাতের প্রচেষ্টায় মানুষের মন থেকে ওয়াহাবীদের সম্পর্কে বিদ্যমান খারাপ ধারণা দূর করতে পারবে না। হ্যাঁ, তাদের মাঝে এসে তাদের সাথে মিশে যাও। তাদের নিকট তোমাদের পরিচয় তুলে ধর। তারা তোমাদের প্রতি আস্থাবান হলে অবশ্যই তোমাদের আকীদা-বিশ্বাস তারা মেনে নেবে। তোমাদের থেকে দীন শিখতে আগ্রহী হবে।

উনবিংশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٤٦) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ○
(٤٧) لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ○ (٤٨) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ
كَارِهُونَ ○ (٤٩) وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ○
(٥٠) إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ○
(٥١) قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○ (٥٢) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا
إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم
مُّتَرَبِّصُونَ ○

অর্থ : আর তারা যদি জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছে করত, তবে অবশ্যই সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়। তাই তিনি তাদের নিবৃত্ত রাখলেন এবং নির্দেশ হল, তোমরা বসা লোকদের সাথে বসে থাক। (৪৬) যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তাহলে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করত না। আর তোমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য অশ্ব ছুটাতো। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (৪৭) তারা পূর্ব থেকে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যাবলী উলোট-পালট করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং আল্লাহর হুকুম জয়ী হল আর তারা তা অপছন্দ করে। (৪৮) আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রেখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম কাফেরদের বেষ্টন করে আছে। (৪৯) আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং তারা উল্লসিত মনে ফিরে যায়। (৫০) আপনি বলে দিন, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারিত রেখেছেন, তাই আমাদের নিকট পৌঁছবে। তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহর উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত। (৫২) আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্য দু'টি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা করছ, আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্য যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে বা আমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ○

অর্থ : যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তাহলে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করত না। অনিষ্ট অর্থ ফিৎনা-ফাসাদ, চোগলখোরী, পরচর্চা, বিভেদ সৃষ্টি, মুজাহিদ দলের মাঝে নানা সন্দেহ সৃষ্টি ইত্যাদি।

বিশেষভাবে মুজাহিদদের আমীরের ব্যাপারে, শীর্ষ নেতৃত্বের ব্যাপারে সন্দেহমূলক কথা ছড়িয়ে দেয়া। মুজাহিদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া। কারণ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মুজাহিদ যে দায়িত্ব পালনে ঈমানী চেতনা নিয়ে জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, সে দায়িত্বে যদি সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া যায়, তাহলেই সবকিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। মুজাহিদ যে রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করছে, যাকে সে সত্যিকারের জিহাদ মনে করছে, যে পতাকাতলে সে জমায়েত হয়েছে, তাকে সে সত্যের পতাকা মনে করছে। তাই সে স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ে জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে সে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্বে নেই। সে ভাবছে না, সে কি ভুল পথে আছে, না মিথ্যা পতাকাতলে জমায়েত হয়েছে। এমনও নয় যে, সে জানে না, কিসের জন্য জীবন দিতে যাচ্ছে। বরং মুজাহিদের শতকরা একশত ভাগ নিশ্চিত হতে হয় যে, সে যে পথে এগিয়ে যাচ্ছে তা সত্যের পথ, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ। তাই সে তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করছে। তার হৃদয় থেকে সব ধরনের কল্যাণের ফল্গুধারা উৎসারিত হচ্ছে।

সুতরাং জিহাদের বিজয় ধারাকে ভেঙ্গে দেয়ার সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো মুজাহিদদের মাঝে সন্দেহের বীজ বপন করে দেয়া। একে অপরের মাঝে যে আস্থার সম্পর্ক আছে, তা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। আর এ সন্দেহ সৃষ্টির কাজটি সর্বপ্রথম শীর্ষ নেতৃত্বে যারা থাকেন, তাদের থেকে শুরু হয়। কারণ, নেতৃত্বের ব্যাপারে যদি সন্দেহ সৃষ্টি করা যায়, তাহলে ষাট ভাগ দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নেতাই সর্বদা মুজাহিদ সারির সর্বাগ্রে থাকেন। সবচেয়ে কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হন। কঠিন থেকে কঠিনতর কষ্ট তাকে সইতে হয়। এতোকিছু করা সত্ত্বেও মানুষ কিন্তু মাত্র একটি কথায় তার নেতৃত্বকে বর্জন করে, তার আনুগত্য ত্যাগ করে। তবে যারা এ কাজগুলো করে থাকে, তারা কখনও রক্ষা পায় না।

শোন, তুমি হয়তো শুনতে পাবে, ইনি তো ধন-সম্পদ লুটে নিচ্ছে। বা ইনি তার চারপাশে কিছু বখাটে লোকের সমাবেশ করছে। অথচ তোমার চোখ তা অস্বীকার করবে। এ ধরনের কথা ছড়াতে ছড়াতে এক সময় তা সত্য মনে হয়। ভাই, আল্লাহ তা'আলা কি তোমাকে বুদ্ধি দেননি? বিবেক দেননি? তুমি কয়েক বছর যাবত তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করে যাচ্ছ, তুমি গভীর রাতে জেগে দেখ, তিনি তোমার সামনে, প্রচণ্ড যুদ্ধের ময়দানে তুমি তাকে তোমার সামনে দেখতে পাচ্ছ, দান-সদকার ক্ষেত্রে সে তোমার অগ্রগামী। এতোকিছু দেখা ও শোনার পর কেন সেই কান-কথা বিশ্বাস করলে? কেন তুমি বললে না–

(১২) لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ○

অর্থ : যখন তোমরা শুনলে, তখন মু'মিন পুরুষ ও নারীরা কেন তাদের ব্যাপারে ভাল ধারণা করল না এবং বলল না, এটা সুস্পষ্ট মিথ্যা বচন। (সূরা নূর-১২)

দেখবে, হয়তো কেউ তোমাকে এসে বলবে, আরে ভাই! অমুকের কথা আর বল না। তার তো জিহাদের ফান্ডের টাকায় তৈরি কয়েকটি বিল্ডিং আছে। আমি একদা মক্কায় ছিলাম। আমাকে এক ব্যক্তি বলল, আপনি যদি ঐ ব্যক্তির পাশ দিয়ে যান, তাহলে তিনি আপনাকে একটি কথা বলবেন। আমি বললাম, বেশ; তাহলে যাচ্ছি। আমি তখন তার পাশ দিয়ে গেলাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। আমাকে কাছে ডাকলো। আমি নিকটবর্তী হতেই তিনি বললেন, আমি কয়েকজন লোককে বলতে শুনেছি, আপনার নাকি পেশোয়ারে কয়েকটি বাড়ি আছে। আমি বিস্মিত হলাম। বললাম, ভাই! আমি তো কখনও পেশোয়ারে থাকিনি। আরে পেশোয়ারের সেই বাড়ি দিয়ে আমি কি করব? যদি বাড়ি-বাগানের প্রয়োজন হতো, তাহলে তো জন্মভূমি জর্দানেই বানাতাম। পেশোয়ারে বাড়ি তৈরিতে কি ফায়দা? আসলে মানুষ একটুও চিন্তা করে না। একটুও ভেবে দেখে না। ব্যস, যা শুনে তাই বলতে থাকে। কেউ হয়তো মুজাহিদ শিবিরে এলো, কিছু বলল, ব্যস তিন-চারজন জিহাদ ছেড়ে চলে গেল। কয়েকজনের হৃদয় ভেঙ্গে গেল। জিহাদ ত্যাগ করল। আচ্ছা ভেবে দেখ তো, মক্কা বা মদীনায় বসে

কিভাবে সে আফগানিস্তানের বিষয়ে সঠিক ধারণা নিতে পারবে। আরে, সে তো এত ভীতু যে আফগান মুজাহিদদের দেখতে হবে– এ ভয়ে পাকিস্তানও আসেনি। আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আল্লাহ তাদের হিদায়াত দিন। তাদের হৃদয় পরিচ্ছন্ন করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٨) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ○

অর্থ : পাপাচারীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা সত্যকে সত্যরূপে ও মিথ্যাকে মিথ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। (সূরা আনফাল-৮)

সুতরাং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়ে নিয়েছেন। আর মানুষ মিথ্যা ও অসত্যের যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে তা বেশীক্ষণ থাকে না, শীঘ্রই তা শেষ হয়ে যায়। কারণ, পবিত্র ও সত্য কথার শিকড় গভীরে প্রোথিত থাকে। আর মিথ্যা ও অসত্যের শিকড় উপড়ানো থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٢٦) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ○

অর্থ : বিষাক্ত কথার উপমা হল বিষাক্ত বৃক্ষ। মাটির উপর থেকে তাকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। তার কোন স্থিতি নেই। (সূরা ইবরাহীম-২৬)

সুতরাং নিশ্চিত বলতে পারি, সত্যের মুখোমুখি কেউ হতে পারে না। কারণ, সত্য শক্তিশালী, বলবান; আর মিথ্যা দুর্বল, বলহীন। সত্যের সাথে সর্বদা আল্লাহ রয়েছেন। আর আল্লাহ সর্বদা সত্যের বিজয় কামনা করেন ও মিথ্যাকে ধ্বংস করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(١٨) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ○

অর্থ : বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি। অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১৮)

তাই বলছি, আল্লাহ তা'আলা চান, যেন এই ভূমিতে কল্যাণের শিকড় প্রসারিত হয়। মানুষের হৃদয়ে সত্যের কালিমা প্রোথিত হয়। সত্য সর্বদা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় আর মিথ্যা সর্বদা হৃদয় থেকে পিছলে পড়ে যায়। মিথ্যার আয়ু কম। বেশীদিন তা টিকে না। তাই আমি দেখেছি, প্রায়ই মানুষ আমার নিকট এসে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে আমাকে মাফ করে দিন। আমি তো না বুঝে আপনার বিরুদ্ধে অমুক অমুক কথা বলেছি। আমি তখন বলি, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। আল্লাহও তোমাকে ইনশাআল্লাহ মাফ করে দেবেন।

তুমি যখন জানলে যে, তুমি সত্য চেতনা বহন করছ, সত্য পথে চলছ, তাহলে মিথ্যাশ্রয়ীরা তোমার কী ক্ষতি করতে পারবে? জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন–

إذا كنتَ بالله مُستَعْصِمًا   فَمَاذا يَضُرُّك كيدُ العبيدِ

অর্থ : তুমি যখন আল্লাহকে আঁকড়ে ধরলে, তাহলে মানুষের ষড়যন্ত্র তোমার কী ক্ষতি করতে পারবে?

তাই আমি যখন এ ধরনের কথা শুনি, সে তো প্রভূত সম্পদের মালিক হয়ে গেছে। তার গ্রুপ তো বেশ শক্তিশালী। তখন আমি পাঠ করি–

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ○

অর্থ : আর ফেনা তো শুকিয়ে শেষ হয়ে গেছে। (সূরা রাদ-১৭)

আমি যখনই পৃথিবীতে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও সাইয়েদ কুতুব (রহঃ)-এর কীর্তি অবলোকন করি, তখনই আমি আল্লাহর কালিমা-

(٢٤) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ○ (٢٥) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○

এর মর্মার্থ অনুধাবন করি আর বিস্মিত হই। ৭৬৮ হিজরীর কথা। ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) জেলখানায় ইন্তেকাল করলেন। তার কিতাবাদি জ্বালিয়ে দেয়া হলো। আর আল্লামা ইবনে কায়্যিমকে অপদস্ত করার জন্য দামেস্কের বাজারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হলো। ছোট ছোট বালকরা তার পেছনে হৈচৈ চিৎকার করে ঠাট্টা করছে, তালি দিচ্ছে। জেলে ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মাঝেমধ্যে লিখতেন। ফলে কলম ও খাতা দেয়া বন্ধ করে দেয়া হলো। তখন তিনি পাথর দিয়ে জেলের দেয়ালে লিখতেন। ইবনে তাইমিয়ার-

الرســالةُ التدميرية في الرســالة الحموية ـــ

কিতাব দু'টি জেলখানার দেয়াল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ৭৬৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করলে তার প্রতিযোগী আলেমরা ধারণা করল, তারা এবার নিষ্কৃতি পেয়েছে।

কিন্তু তার ইন্তেকালের প্রায় চার শতাব্দী পর আরব উপদ্বীপে এক ব্যক্তি জন্মলাভ করলো। তিনি ইবনে তাইমিয়ার কিতাবাদী পাঠ করে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। তার ছাত্রত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি হলেন শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব। তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে বিতাড়িত হলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ইবনে সউদের হৃদয়কে কোমল করলেন। তিনি তার সাথে তার মতাদর্শ ও দাওয়াত প্রচারে একমত হলেন।

বিশ্ব তখন ক্ষেপে উঠল। ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আলী পাশাকে তারা ক্ষেপিয়ে তুলল। মিসর আর শামের বাহিনী এগিয়ে এল। এবং নজদের বুক থেকে এ দাওয়াতের চেতনাকে নিঃশেষ করে দিল। নজদের আমীর উবায়দুল্লাহ ইবনে সাউদকে বন্দী করা হলো। মানুষ মনে করল, হয়তো এ দাওয়াতের কার্যক্রম শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে মুহাম্মদ ইবনে সউদের সন্তান আব্দুল আযীয আত্মপ্রকাশ করলেন এবং একের পর এক অঞ্চল দখল করে নিতে লাগলেন।

বর্ণিত আছে, আব্দুল আযীযের শাসনামলে লোকেরা একটি মাত্র খেজুরের আশায় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যেত। নজদের লোকেরা বলে, দুর্ভিক্ষের দিনে আমরা পিপিলীকার ঘর খনন করে জমানো গম বের করে এনে খেতাম। প্রত্যেক দিন খাওয়ার জন্য একটি করে খেজুরও পেতাম না। একদিন খেজুর খেতাম। আরেক দিন তার বিচি চুষে চুষে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতাম। এতো কষ্ট করে নজদের লোকেরা জীবন ধারণ করত। কিন্তু এখন সময় পাল্টে গেছে। আল্লাহ তা'আলা আরবে তেলের প্রবাহ সৃষ্টি করলেন। দেখতে দেখতে সে দেশের চেহারা বদলে গেল। শুরু হল ইবনে তাইমিয়ার কিতাবসমূহ ছাপানো ও বিনামূল্যে বিতরণ। এখন তো অবস্থা এমন যে, পৃথিবীর এমন কোন পাঠাগার নেই, যেখানে ইবনে তাইমিয়ার পুস্তক পৌঁছেনি। আর তুমি যদি চাও, মানুষ কথা বন্ধ করে নীরব হয়ে যাক, তাহলে বলবে, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেছেন। তোমার একথা শোনার সাথে সাথে সবাই তার কথা শোনার জন্য নীরব হয়ে যাবে। এ দৃশ্য দেখলে আমার মনে পড়ে আল্লাহর কথা-

(٢٤) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ○ (٢٥) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ○

আর সাইয়্যেদ কুতুবেরও ঠিক একই অবস্থা। জেলখানার মাঝেই তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হলো। এমনকি এখনও কেউ বলতে পারবে না, তার কবর কোথায় অবস্থিত। তার এক নিকটাত্মীয় একদা আমাকে বলেছেন– হায়! যদি জানতে পারতাম তার কবর কোথায়, তাহলে অবশ্যই তার কবর জিয়ারত করতাম। আমি তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, শোন, তার রব তার সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত। তার কবর কোথায় তা তোমার জানার প্রয়োজন নেই। যেদিন সাইয়্যেদ কুতুবকে হত্যা করা হলো, সেদিন মিসরের পথে পথে তার রচিত তাফসীর ফি জিলালিল কুরআন-এর সাত অথবা আট হাজার সেট অর্থাৎ চৌষট্টি হাজার পুস্তক পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করা হলো, যার কাছে সাইয়্যেদ কুতুবের কোন গ্রন্থ পাওয়া যাবে, দশ বছর তাকে জেলে রাখা হবে। সাইয়্যেদ কুতুবের গ্রন্থগুলো যাদুর মতো। যে পাঠ করে, সেই তার অনুসারী হয়ে যায়।

তার শাহাদাতের ঘটনা পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন দেশের বেতারে সম্প্রসারিত হলে সবার মনে প্রশ্ন উঁকি দিল- এ ব্যক্তি কে? কেন তাকে ফাঁসি দেয়া হলো? সেই তাফসীর গ্রন্থটি কেমন, যার কারণে তাকে ফাঁসি দেয়া হল? সবাই তা পড়তে, তা অধ্যয়ন করতে প্রচণ্ড আগ্রহী হলো। উদ্বুদ্ধ হলো। তখন বৈরুতের প্রকাশকরা প্রকাশনা জগতে কোন খৃস্টান লোকসান খেলে তাকে বলত, আরে তুমি যদি বাঁচতে চাও তাহলে সাইয়্যেদ কুতুবের 'ফি জিলালিল কুরআন' ছাপ। হ্যাঁ, যে বছর সাইয়্যেদ কুতুবকে ফাঁসি দেয়া হলো, সে বছরই তার তাফসীর গ্রন্থটির সাত সংস্করণ ছাপা হলো।

অথচ তার জীবদ্দশায় মাত্র একবার ছাপানো হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের অর্ধেক ছাপানো হয়েছিল। পরিপূর্ণভাবে ছাপাতে পারেননি। যারাই তার তাফসীর গ্রন্থটি পাঠ করেছে, সেই আল্লাহর পথে ফিরে এসেছে। দারুণ প্রভাবিত হয়েছে। আর এখন তো অবস্থা এমন যে, পৃথিবীর এমন কোন প্রান্ত পাওয়া যাবে না যেখানে সাইয়্যেদ কুতুবের এই তাফসীর গ্রন্থ গিঁয়ে পৌঁছেনি। এবং এমন কোন ভাষাও পাওয়া যাবে না যে ভাষায় তা অনূদিত হয়নি।

ইয়ামানের তিনজনের কাহিনী বলছি। আমি তাদের আফগান জিহাদে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হেকমতিয়ার থেকে কোন পত্র নিয়ে তাদের দেইনি। তারা যখন আফগানিস্তানে ঢুকছিল, তখন তাদেরকে মুজাহিদরা বন্দী করল। তারা জানতে চাইলো, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? তারা বলল, আমরা আরব। তখন আরবরা মাত্র জিহাদে যোগদান করতে শুরু করেছিল।

মুজাহিদরা বলল, তোমাদের কে নিয়ে এসেছে? তারা বলল, আমরা জিহাদ করতে এসেছি। মুজাহিদরা বলল, না, তোমরা জিহাদ করতে আসনি। আরবরা জিহাদে আসে না, নিশ্চয়ই তোমরা আমেরিকার এজেন্ট। তারা বলল, আরে ভাই! আমরা জিহাদ করতে এসেছি। আমরা শহীদ হতে চাই। মুজাহিদরা বলল, না না, তোমরা আমেরিকার এজেন্ট।

এভাবে তর্ক-বিতর্ক চলল। অবশেষে তারা বলল, আমরা সাইয়্যেদ কুতুবের ছাত্র। তার অনুসারী। মুজাহিদরা তখন বিস্মিত হয়ে বলল, তোমরা সাইয়্যেদ কুতুবের ছাত্র! সুবহানাল্লাহ! তারপর আনন্দের আতিশয্যে মুজাহিদরা তাকবীর ধ্বনি দেয়া শুরু করল। নামাযের পর বহু মুজাহিদ তাদের বক্তব্য শুনতে সমবেত হলো। সুবহানাল্লাহ! সাইয়্যেদ কুতুবের ব্যক্তিত্ব তখন আমরা অনুধাবন করতে পারলাম। এভাবে তার নামের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা পাল্টে গেল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ○ (٩٦)

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, আল্লাহ তাদের মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। (সূরা মারইয়াম ঃ ৯৬)

কুরআনের বর্ণনাভঙ্গীতে একটি রীতি আছে। তাহলো, যখন سبيل الله শব্দটি নিঃশর্তভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন তা জিহাদের অর্থে ব্যবহার করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(١) الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ○

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথ থেকে অর্থাৎ জিহাদ থেকে লোকদের প্রতিহত করে আল্লাহ তাদের আমলকে নিষ্ফল করে দিবেন। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১)

এখানে আল্লাহ তা'আলা কুফরী করা ও জিহাদ থেকে বাঁধা প্রদান করাকে একই ধরনের পাপ হিসেবে গণ্য করেছেন। এবার ভেবে দেখ, যদি তুমি দেখ কেউ জিহাদে যাচ্ছে আর তুমি তাকে বললে, আরে ভাই! কোথায় যাচ্ছ? এটা তো জিহাদের পথ নয়। সেখানে সে এমন, সে এমন, সে এমন। বিদ'আত আর শিরকের ছড়াছড়ি।

দু'দিন পূর্বে পেশোয়ারে কয়েকজন মেহমান এলো। হয়তো তাদের কেউ এখানে আছে। বলল, আচ্ছা, এ কথা কি ঠিক যে, হেকমতিয়ারের সেনা ছাউনীতে মূর্তি আছে? আমি বললাম, এ আবার কেমন কথা! মূর্তি আসবে কোথা থেকে? লাত, উযযা এ ধরনের মূর্তির কথা কি তোমরা বলছো? তারা বলল, না, মূর্তি নয়, তবে তার নিকট একটি বাক্স আছে তাতে মান্নতের সম্পদ জমা করে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তো বহুবার তার নিকট গিয়েছি। এ ধরনের মূর্তির চিহ্নও তো সেখানে দেখতে পাইনি। এই তো অদূরেই তার সেনা ক্যাম্প, চলো সেখানে যাই। চলো, আমিও তোমাদের সাথে যাব।

আমরা হেকমতিয়ারের নিকট গেলাম। বললাম, আমরা শুনলাম, আপনার সেনা ক্যাম্পে মূর্তি আছে। তিনি বললেন, আসতাগফিরুল্লাহ। তখন তারা তাদের কথা বললে তিনি বললেন, হ্যাঁ, মূর্তি অবশ্য আছে। তোমরা আমার সাথে গাড়িতে আরোহণ করো। দু'টি গাড়ি নিয়ে আমরা সেনা ক্যাম্পে পৌঁছলাম। হ্যাঁ, সেখানে মূর্তি আছে। তাহলো বিশাল মাঠের এক প্রান্তে এক পাকিস্তানীর কবর।

তিনি বললেন, ভাইয়েরা, আমরা যদি কবরে এসে তা স্পর্শ করতাম, তাহলে তা শিরক হতো। পূজার শামিল হতো। প্রথমে তো এটা এক পাকিস্তানীর কবর, কোন আফগানীর কবর নয়। তারপর আমরা ভিনদেশী মানুষ। আমরা যদি কবরকে স্পর্শ করি, তাহলে আফগানরা আমাদের কে এদেশ থেকে বের করে দেবে। আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে। সুতরাং, এখন এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় তের বছর ছিলেন। মূর্তির মাঝেই ইবাদত করেছেন, নামায পড়েছেন। তাই নয় কী? তিনি কি মক্কায় থাকাকালীন সময়ে একবারও তরবারী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং মূর্তি ভেঙ্গেছিলেন? না, তা করেননি। বরং মূর্তির মাঝেই ইবাদত করেছেন। তখন কাবায় তিনশ ষাটটি মূর্তি ছিল। তরবারী দ্বারা লাতকে আঘাত করেননি। উযযার চেহারাও পাল্টে দেননি। তিনি আবুবকর, উমর, আলী, বিলাল, আম্মার (রাঃ) এদের কাউকেই বলেননি যে, এসো আমরা লাত, উযযা আর হুবলকে ভেঙ্গে ফেলি। কারণ, তখন তিনি তা করার ক্ষমতা রাখতেন না।

তাই তা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু যখন মক্কা বিজয় হলো, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার ক্ষমতা হলো, তখন তিনি মূর্তি ভাঙ্গতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করেননি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٨١) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ○

অর্থ : আপনি বলে দিন, সত্য এসে গেছে, মিথ্যা ধ্বংস হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।

(সূরা ইসরা ঃ ৮১)

আহমদ শাহ মাসউদও ঠিক এমন কথাই বলেছেন। ভাইয়েরা! আমাকে একটু অবকাশ দাও। আমরা এ কবরগুলো ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেব। আরে ভাই, তোমরা আমাকে আরব মুজাহিদ দাও। আমি তাদের সেনা ক্যাম্পের প্রধান বানাতে চাই।

কবি বলেন–

لا خيلَ عندكَ تُهديها و لا مالَ فليُسعد النطقُ إن لم تُسعد الحالُ

তোমার নিকট কোন ঘোড়া নেই, ধন-সম্পদ নেই, যা তুমি উপঢৌকনস্বরূপ দেবে। তাহলে তুমি যখন তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না, তাহলে তুমি কথা বলে তাকে সন্তুষ্ট করে দাও।

কিছু মানুষকে দেখতে পাবে, তারা পায়ের উপর পা তুলে চা-কফি পান করে। আর আফগান জিহাদের ব্যাপারে মানুষের মনে নানা সন্দেহের বীজ বপন করে। আমি উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলতে চাই, তোমরা আমাদের সেনা ছাউনীতে এসো। সবকিছু ঘুরেফিরে দেখ। আমাদের ভুল সংশোধন কর। কে তোমাদের সংশোধন করতে বাঁধা দেবে? সবশেষে আহমদ শাহ মাসউদ বললেন, আল্লাহ অবস্থা পরিবর্তন করে দিলে কামান মেরে এ কবর উড়িয়ে দেব। মাটির সাথে তা মিশিয়ে দেব।

আরবরা সাধারণত সাইয়াফ ও হেকমতিয়ারকে চেনেন। তাই জিহাদের সমালোচনাকারীরা তাদের ব্যক্তিত্বে কালিমা লেপন করতে চায়। তার সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো, তাদের ব্যাপারে মানুষের মাঝে নানা সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া, আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তা সহজে প্রয়োগ করা সম্ভব।

তাই বলে বেড়ায়, সে আশ'আরী। আরে ভাই! আশ'আরী, না আশ'আরী নয় তা তো অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারাও ধরা সম্ভব নয়। আর আশ'আরী-এর অর্থ বুঝে কয়জন। তাই সহজে বলে বেড়ায়, সে আ'শআরী। এটা না হলে আরো সহজ পন্থা হলো, কোন দেশের এজেন্ট বলে দেয়া। ব্যস, সে আমেরিকার এজেন্ট বলে দিলেই কেল্লা ফতে। আচ্ছা, তোমরা অনুসন্ধান চালাও। দেখ, সে কিভাবে আমেরিকার এজেন্ট হলো।

আহমদ শাহ মাসউদ যখন রাশিয়াকে কাঁপিয়ে দিলো পাশ্চাত্য তো বিশ্বাসই করলো না যে, এক ব্যক্তি কিভাবে বন্দুক হাতে একশ ট্যাংক ধ্বংস করে দিতে পারে। তাও আবার একই যুদ্ধে। পাশ্চাত্যের সাংবাদিকরা ছুটে এলো। এক অবিশ্বাস্য বিজয় দেখতে পেল।

পাশ্চাত্যে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্স বলল, আমরা তোমার সাথীদের সেবার জন্য কিছু ডাক্তার পাঠাতে চাই। ফ্রান্সের কিছু ডাক্তার এলো। অত্যধিক রক্তক্ষরণে বা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যারা স্বাস্থ্যসেবা না পেয়ে মারা যায়, তাদের রক্ষার জন্য। তিনি এতে রাজি হলেন।

আরে ভাই! বনী ঈসরাইলের সেই কাহিনী কি তোমরা ভুলে গেছ? এক বহুচারিনী মহিলা দেখতে পেল, একটি পিপাসার্ত কুকুর পিপাসায় অতিষ্ঠ হয়ে কূপের চারপাশ দিয়ে ঘুরছে। পিপাসায় তার জিহ্বা বেরিয়ে এসেছে। অসহ্য হয়ে সে কাদা খাচ্ছে।

এ দৃশ্য দেখে সেই বহুচারিনী মহিলা দয়াপরবশ হলো। নিজের মোজা খুলে উড়নায় তা বাঁধল। তারপর তা দিয়ে কূপ থেকে পানি তুলল। কুকুরকে পান করালো। বোবা এক জীবের প্রতি ভ্রষ্টা নারীর এ আচরণে আল্লাহ মুগ্ধ হলেন। তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এ ঘটনা দ্বারা কী বুঝলে? আরে, এরা তো কুকুরের চেয়েও তুচ্ছ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

فِي كُلِّ كَبِدٍ رطبةٍ أجرٌ —

"প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর সেবায় পুণ্য রয়েছে।"

লোকেরা ক্ষুধ-পিপাসায় মরছে, এমন অবস্থায় তোমার কি দায়িত্ব নয় যে, তুমি তাকে সাহায্য করবে? আরে ভাই! সে খৃস্টান হলেও তাকে সাহায্য করতে হবে। তাকে বিবস্ত্র দেখলে তার বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি

তুমি কোন খৃস্টানকে ক্ষুধার্ত পেলে কিন্তু তাকে আহার দিলে না। অথচ তুমি জানো, সে না খেয়ে মারা যাবে। যদি সে সত্যিই না খেয়ে মারা যায়, তাহলে ইমাম মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মাযহাব অনুযায়ী তোমাকে দিয়্যাত দিতে হবে। দিয়্যাতে মুগাল্লাযা দিতে হবে।

কারণ, এটা ইচ্ছাকৃত হত্যার সাদৃশ্য রাখে। তুমি যখন বুঝতে পারলে সে না খেয়ে মারা যাবে, তবুও তুমি তাকে আহার দিলে না। তাহলে তুমিই তার মৃত্যুর কারণ হলে। আর দিয়্যাতে মুগাল্লাযা হলো একশ উট বা এক হাজার দিনার।

ভাইয়েরা! বিষয়টি এতো সহজ নয়। এখানে ভাবার অনেক কিছু আছে। মনে চাইলো আর ফতওয়া দিয়ে দিলাম। এটা ঠিক নয়। কারণ, এতে তুমি সর্বপ্রথম যা করলে তাহলো, তুমি জিহাদকে ধ্বংস করার কাজে অগ্রসর হলে। যে জিহাদ তিনশ বছর যাবত বন্ধ হয়ে আছে। শাইখ তামীমকে আমি বলেছিলাম, আমাদের উপমা হলো ঐ মহিলার মতো, যার পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত কোন সন্তান হয়নি। তারপর তার একটি সন্তান হলো। মহিলারা দেখতে এলো। বলল, খালা! তোমার সন্তানের চোখ তো ছোট। আরেকজন বলল, আরে তার চোখ তো লালচে বর্ণের। আহ, যদি তার চোখ কালো হতো তাহলে তাকে উজ্জ্বল চাঁদের মতো দেখা যেত।

আমাদের দশাও তাই। আমরা দেখছি একটি দেশের লোক একটি জাতিকে জিহাদের মাধ্যমে উদ্ধার করতে চাইছে। আর তুমি এসে তার নানা দোষ ধরায় লিপ্ত হয়েছ। আরে, আমরা তো বানরকে তার মায়ের চোখে হরিণ দেখছি। তাই তোমাদের যারা বানরকে হরিণ দেখতে চাও, আমরা তাদের স্বাগত জানাব। সাদরে গ্রহণ করব।

ভাইয়েরা! আমরা আফগান জিহাদকে ইসলামী জিহাদ মনে করছি। ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে এ জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে আমরা ফরযে আইন মনে করি। এটাই আমাদের আকীদা। তাই যারা এ বিশ্বাস করবে, আমরা তাকে হৃদয় দিয়ে স্বাগত জানাব। আর যারা তা বিশ্বাস করবে না, তাহলে বলবো সে যেন আল্লাহর উপর ভরসা করে। আর আমাদের কে শান্তিতে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে দেয়। যদি তুমি আফগান জিহাদকে ইসলামী জিহাদ মনে করলে না, তাহলে কে তোমাকে এখানে টেনে এনেছে।

যারা অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে তারা এক বছর দু'বছর চলে যায়, তবুও রণাঙ্গনে আসে না। তারা পেশোয়ারেই ঘুরপাক খেতে থাকে। এতিম আর বিধবাদের জন্য যে অর্থ আসে, তা পরম নিশ্চিন্তে ভোগ করে। আর নানা বানোয়াট কথা ছড়িয়ে আনন্দ ভোগ করে। সে তো রণাঙ্গনে গিয়ে একটি গুলীও ছোঁড়েনি। তাহলে সে এখানে কী করছে। তার কাজ হলো-

وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ —

অর্থ : তারা তোমাদের মাঝে অশ্ব ছুটাতো বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর।

এরা মুজাহিদদের মাঝে নানা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ফাঁটল ধরাতে চায়। সুযোগ পেলেই ঢুকে পড়ে। এটা অনুমানের কথা নয়। অনেককেই দেখেছি, অত্যন্ত আগ্রহ, দুঃসাহসিকতা নিয়ে জিহাদ করার জন্য এসেছে। কিন্তু দু'চারজনের কারণে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে গেছে। এরাই ফিৎনা সৃষ্টি করছে। মানুষকে জিহাদের পথ থেকে ফেরাচ্ছে। এরা নিজেদের উপর জুলুম করছে। জাতির উপর জুলুম করছে। বিশ্ব সমাজের উপর জুলুম করছে। মুজাহিদ ভাইদের উপর জুলুম করছে।

তুমি রিয়াদে বসে আছ। জিয়ানে বসে আছ বা ইহসায় বসে আছ। তুমি যদি এখানে বসে বসে বলো, আফগানে শিরক আর শিরক। এখানে জিহাদ বলতে কিছু নেই। তাহলে কেমন হবে? তাহলে তুমি কি চাও, এই যে জিহাদের ধারা শুরু হয়েছে তা বন্ধ হয়ে যাক? নিঃশেষ হয়ে যাক?

শাইখ তামীম! আসো এ ব্যাপারে তাদের কিছু শুনাও। (শাইখ তামীম তার বক্তব্য শুরু করলেন)

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء و المرسلين و على أله و صحبه أجمعين ، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم —

ভাইয়েরা!

আসল কথা হলো, এ বিষয়টি হৃদয়ে খুব দাগ কাঁটে, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমি নিজে দেখেছি এবং অনেকের ব্যাপারে শুনেছি, তারা জিহাদ সম্পর্কে এ ধরনের কথাবার্তা বলে। এরা আল্লাহকে ভয় করে না। আমি তো এমন কিছু লোকের কথা বলতে পারবো, যারা উদার হস্তে জিহাদের ফান্ডে দান করতো। এরা দোহায় গিয়ে পৌঁছল, এমনকি আমার জন্মভূমি কাতারেও গিয়ে পৌঁছল। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম শাইখ তামীমকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, বরং তারা সুদান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। কোথায় আবু মুহাম্মদ। এসো এগিয়ে এসো। জনৈক ব্যক্তিকে সে বলল, আমি আফগান জিহাদে যাচ্ছি। লোকটি বলল, কার সাথে যাচ্ছো? সে বলল, আব্দুল্লাহ আযযামের সাথে। তাকে সেই লোকটি বলল, তুমি আব্দুল্লাহ আযযামের সাথে জিহাদে যাচ্ছ! লোকটি বলল, তার আকীদা-বিশ্বাস তো ভাল নয়।

এই তো আবু মুহাম্মদ উপস্থিত। সুদান থেকে এসেছে। সে নিজেই তার কাহিনী বলবে। (আবু মুহাম্মদ এগিয়ে এসে বলল)

بسم الله الرحمنِ الرحيمِ ، الصلوةُ و السلامُ على رسولِ الله —

আমাকে তাদের একজন বলল, তুমি কার সাথে জিহাদে যাবে? আমি বললাম, আব্দুল্লাহ আযযামের সাথে। সে বলল, তার আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আমি সন্দিহান। আমি তাকে বললাম, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তো তাকে চিনি। তার আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে বেশ ভাল করে জানি। ইনশাআল্লাহ। আমি তার সাথেই জিহাদে যাব। সুদানে কিছু লোক আছে, তারা অবাস্তব কথা বলে বেড়ায়। তারা বিভেদ সৃষ্টিতে দারুণ ওস্তাদ।

এরপর শাইখ তামীম তার কথায় পূর্ণতা দিতে বললেন, আফসোস! তারা কাতারেও এসে পৌঁছেছে। সব জায়গায়ই তাদের সমমনা লোক রয়েছে। কাতারে কিছু দানবীর লোক ছিলেন। এরা আফগান জিহাদে প্রচুর দান করতেন। হঠাৎ এ বৎসর দেখলাম, তারা দান করছেন না। আমি তাদের একজনের সাথে কথা বললাম। তিনি বললেন,আমি একটি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনতে পেলাম, আফগানীরা মূর্তি পূজা করে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম করে বলছি, এটা নিছক মিথ্যা বৈ কিছুই নয়। আমি পাঁচ বৎসর যাবৎ আফগানিস্তানে জিহাদ করছি। আর শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম ছয় বৎসর যাবত জিহাদ করছেন। তিনি কাবুল পর্যন্ত গিয়েছেন আর আমি অন্যান্য বেশ কিছু শহরে গিয়েছি। আমি কোথাও কাউকে কবর পূজা করতে দেখিনি। কাউকে কবরবাসীর নিকট কিছু চাইতেও দেখিনি।

তারা তো হাত তুলেই বলে, হে আল্লাহ! তারা আল্লাহকে ডাকে। কেঁদে কেঁদে বিনম্র কণ্ঠে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন। যদি এমন না হতো তাহলে আট বৎসর যুদ্ধ চলছে, বিশ্বের সুপার পাওয়ারের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এতো দিনে তো তারা ধুলায় মিশে যেত। আমি তো বহুবার জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের দু'আ করতে শুনেছি। তারা বলছে, হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! রুশরা তো প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। আর আমরা দুর্বল। কিন্তু আপনি তো সবার চেয়ে শক্তিশালী। সকল শক্তির আধার আপনি। সুতরাং আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

আমি কখনো কাউকে বলতে শুনিনি, হে অমুক বুযুর্গ! তুমি আমাদের সাহায্য কর। তারা আল্লাহর সাহায্যে নিশ্চিত বিশ্বাস রেখে আল্লাহর নিকট দু'আ করেন। এ একীন ও বিশ্বাসের কারণেই তারা আল্লাহর সাহায্যে ধন্য হয়েছেন। তাদের মাঝে আমি বিস্ময়কর তাওয়াক্কুল দেখতে পেয়েছি। হায়, আমাদের মাঝে যদি তার দশ

ভাগের এক ভাগও থাকত। আমি বারবার মুজাহিদ মুহাম্মদ হাসান ও অন্যান্যদের একীন ও তাওয়াক্কুলের আলোচনা করেছি। মুহাম্মদ হাসান আল্লাহর উপর ভরসা করে, পূর্ণ একীনের সাথে ঘোড়ায় চড়ে রুশ সৈন্যদের সামনে দিয়ে চলে যেত, কিন্তু তাকে রুশরা দেখত না।

একদা আমি তাকে বললাম, রুশ সৈন্যরা তো আপনাকে দেখে ফেলবে! উত্তরে তিনি বললেন, কোন ভয় পেয়ো না। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তো শুধু শাহাদাতের প্রার্থনাই করি, আমি যাওয়ার সময় পড়ি–

(৯) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ○

আর আমি তাদের সামনে ও তাদের পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করে দিয়েছি। তারপর তাদের আচ্ছন্ন করে দিয়েছি। তাই তারা দেখতে পায় না। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৯)

এ আয়াত পড়তে পড়তে তিনি তাদের সামনে দিয়ে চলে যান অথচ তারা তাকে দেখতে পায় না। তার এতো প্রবল বিশ্বাস ছিল। আমরা আল্লাহর নিকট তেমনি বিশ্বাস কামনা করি। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَنَا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ عَبْدِي بِمَا يَشَاء ○

অর্থ : আমার ব্যাপারে আমার বান্দা যে উত্তম ধারণা করবে, আমি তার সেই ধারণার নিকটেই থাকব। সুতরাং আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যা ইচ্ছে ধারণা করুক।

সুতরাং তুমি যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্চিত করবেন না, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে লাঞ্চিত করবেন না। তাই বলছিলাম, আল্লাহর শক্তির প্রতি আমাদের একীন থাকতে হবে, ইস্পাতকঠিন বিশ্বাস থাকতে হবে। তাহলেই আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। আফগান যুদ্ধে আমি অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখেছি। এক যুদ্ধে এক বিশাল কিল্লায় প্রায় ত্রিশজন রুশ সৈন্য ছিল। অস্ত্রেরও তাদের কোন অভাব ছিল না। মাত্র কয়েকজন মুজাহিদের হাতে তাদের পতন ঘটল। আল্লাহ বলেনঃ و ما النصرُ إلا من عندِ الله সাহায্য তো শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি। তারপরও অনেকে জিহাদ সম্পর্কে নানা সন্দেহ করে। এ ধরনের লোক যে শুধুমাত্র পেশোয়ারেই আছে তা নয়। তারা এখানেও এসে পৌছে আমাদের মুজাহিদ শিবিরে অবস্থান করছে। তারা বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলে ফিৎনা ছড়ায়। এদের লক্ষ্য করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ○

অর্থ : বিভেদ সৃষ্টির জন্য তারা তোমাদের মাঝে ছুটে যায়।

এ বিষয়টি এখন আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আর তোমরা জান, আমরা স্পষ্টভাষী। যারা জিহাদ করার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে আমরা তাদের স্বাগত জানাই। মুবারকবাদ জানাই। আর যারা বিভেদ সৃষ্টির জন্য এসেছে, ফিৎনা সৃষ্টির জন্য এসেছে তাদেরকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই, তোমরা ভালোয় ভালোয় বিদায় নিয়ে চলে যাও। এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে চাই না। আমাদের মাঝে তোমাদের কোন স্থান নেই। আমরা আমাদের দেশ, পরিবার-পরিজনদের ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের দাবীতে এখানে এসেছি। শুধুমাত্র জিহাদের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি।

আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি। আমরা সাইয়াফের সাথে থাকার জন্য, আব্দুল্লাহ আযযামের সাহচর্যের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিনি। যেদিন দেখব, তাদের কেউ আমাদের পথ থেকে সরে পড়েছে, সেদিনই আমি সরে পড়ব। আমিই সর্বপ্রথম তাদের অবাধ্য হব। আমাদের এই নিয়্যাত। অন্য কোন নিয়্যাত নেই। তাই আমরা এক সারিবদ্ধ বজ্র কঠিন শক্তি। আল্লাহ বলেন–

(٤) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ۝

অর্থ : আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে এক সারিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর। (সূরা সফ ঃ ৪)

আমরা এখানে সীসাঢালা প্রাচীর। তাই আমরা চাইনা, আমাদের মাঝে কোন ফাঁটল সৃষ্টি হোক। আমাদের সবাইকে হাতে হাত ধরে দাঁড়াতে হবে। আমাদের মত ও বিশ্বাসের বাইরে কাউকে আমাদের মাঝে অবস্থানের সুযোগ দিব না। সে যেন পেশোয়ারে চলে যায়। তার দেশে চলে যায়। আমরা তো জিহাদের ফান্ডের অর্থ দিয়ে খাবার খেয়ে থাকি। সুতরাং সে খাবার তো তাদের জন্য বৈধ হবে না। সে খাবার ফিৎনাবাজদের জন্য হারাম।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম দাঁড়িয়ে যান এবং শাইখ তামীম এর কথার মাঝে বলেন, আমরা আরবদের জন্য যে সম্পদ ব্যয় করি তা শুধুমাত্র আরবদের জন্যই সংগ্রহ করা হয়েছে। জনৈক ব্যবসায়ী তা আরবদের জন্য ব্যয় করতে দিয়েছেন। তবে আমরা তাদের বলে দিয়েছি, যদি তা মুজাহিদদের জন্য ব্যয় না করা হয়, তবে তা অবশ্য এতীম, অসহায়, দুস্থ নারী-পুরুষদের জন্য ব্যয় করা হবে। তাই কোন ভাবেই তা ফিৎনাবাজদের জন্য ভক্ষণ করা বৈধ হবে না। কারণ, তোমার জন্য তা সংগ্রহ করা হয়নি।

যারা শিরক শিরক বলে চিৎকার করে, আমি তাদের বলবো, তোমরা তো শিরক দূর করার কোন চেষ্টা করোনি। ইনশাআল্লাহ আমরা আরবদের আফগানিস্তানে নিয়ে এসেছি- আরবরা যে অঞ্চলেই গেছে সেখানেই তারা সংস্কারমূলক কার্যক্রম চালিয়েছে। তারা জনগণকে এমনভাবে বুঝিয়েছে যে, সেখানে তুমি তাবিজ-কবজ দেখতে পাবে না। কারো গলায় আর তাবিজ নেই। মুজাহিদদের যে শিবিরে আরবদের দেখবে সেখানে কোন তাবিজ খুঁজে পাবে না।

এক আরব ভাই! নাম আব্দুল্লাহ আনাস। সে একবার আহমদ শাহ মাসউদকে বলল, আচ্ছা, আমরা কেন তাওহীদের পতাকা তুলে ধরি না। এতে অসুবিধা কী? আহমদ শাহ মাসউদ বিচক্ষণ মানুষ। বললেন, কিছু দিন আমাদের মাঝে থাক। আমি তো তোমার মতো সচেতন সাত আটজন মানুষ খুঁজছি। আমি তাদের মুজাহিদদের শিবিরে পাঠাব। তারা তাদের তাওহীদ শিক্ষা দিবে।

আমাদের সাথে থাক। তোমরা তরবিয়্যাত চালিয়ে যাও। তাওহীদের শিক্ষা দিতে থাক। যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিজয় দিবেন আমরা এ কবরগুলো শুধু মিটিয়েই দিব না; বরং কামান মেরে উড়িয়ে দিব। শোন, তুমি হয়তো জান না, যুদ্ধের মাঝে শরী'আতের হদ অর্থাৎ ফৌজদারী বিধানসমূহ প্রয়োগ করা হয় না। আমরা যদি এখন এ ধরনের ঘোষণা দেই, তাহলে নিঃসন্দেহে আফগানের সাধারণ অশিক্ষিত মানুষরা আমাদের ত্যাগ করে রুশদের পক্ষে চলে যাবে। বলবে, এরা বেদীন হয়ে গেছে। এরা ওহাবী হয়ে গেছে। তাই আমি শিক্ষা ও দীক্ষার মাধ্যমে সংস্কারমূলক কাজ চালিয়ে যেতে চাই। আমি তোমাদের ইতিপূর্বে ইরাকী আবু আসেমের কথা বলেছি। তিনি আফগান জনগণের মাঝে যে সংস্কারমূলক কাজ করেছেন তার উপমা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কাজী মাসুম আহমদ শাহ মাসউদের পরামর্শ সভার এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

তিনি আমাকে বলেছেন– আমরা সবাই গিয়ে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসি। তার মত প্রভাবশালী মানুষ খুব কম দেখেছি। তার সামনে কেউ পা ছড়িয়ে বসতে পারে না, হাসি-মশকরা করতে পারে না। জোরে কথা বলতে পারে না। তিনি অশিক্ষিত আফগানদের কুরআন শিখিয়েছেন। তাহাজ্জুদ পড়া শিখিয়েছেন। বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে অজ্ঞতার জগত থেকে তাদের আলোর জগতে নিয়ে এসেছেন। তাই আফগানরা তাকে হৃদয় দিয়ে মহব্বত করে, ভালবাসে।

এখন ভেবে দেখ, আমরা যদি আরো শিক্ষিত দক্ষ ও বিজ্ঞ প্রচারকদের আফগানিস্তানে আনতে পারতাম, আর তারা তাদের দাওয়াতী কার্যক্রম চালাত, তাহলে আফগানীদের বিশ্বাসগত ত্রুটিগুলো দূর হয়ে যেত। তাই

আমরা সর্বদা বলে আসছি, আফগান জিহাদে যোগ্য আলিম প্রয়োজন। বহু আলিমের প্রয়োজন। তবে তাদের অবশ্যই দাওয়াতী কাজে পারদর্শী হতে হবে। প্রজ্ঞাবান হতে হবে। অত্যন্ত সহনশীল হতে হবে।

তবে হ্যাঁ, শাইখ তামীম যাদের কথা বলেছেন– আমরা তাদের কাউকে আমাদের মাঝে স্থান দেইনি। আর কেউ যদি থেকে থাকে তার উচিৎ এখান থেকে চলে যাওয়া। আমরা তার যাওয়ার ব্যবস্থা করব। তার যেখানে ইচ্ছে চলে যাক, পেশোয়ারে যাক বা অন্য কোথাও যাক সে অবশ্যই চলে যাক।

তারপর শাইখ তামীম দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হ্যাঁ, শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম যা বললেন, এতে আমরা একমত। আমাদের এই শিবিরে, এ ট্রেনিং সেন্টারে যারা আছেন, আমরা সবাই একটি শক্তি, একটি তাঁবুর নীচে আমাদের অবস্থান। আমরা সবাই আল্লাহর পথে জিহাদ করতে এসেছি। তাই আমি তোমাদের তাক্বওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। নিয়তকে খালেস করার নির্দেশ দিচ্ছি। আমাদের নিয়ত إنما الأعمالُ بالنِّيَّات এর আলোকে পরিশুদ্ধ হয়ে যায়।

তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের কথায় কান দিবে না, যারা আমাদের এই ঐক্যে ফাঁটল সৃষ্টি করতে চায়। আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়।

মনে রাখবে, আমরা তোমাদের আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি। কোন রণাঙ্গনে যাওয়ার প্রাক্কালে যখন বিদায় জানাই,তখন অনুভব করি, যেন আমি আমার সন্তানকে চিরবিদায় জানাচ্ছি। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি আমার পরিজনের কাউকে বিদায় জানাতে কাঁদি না। কিন্তু যখন এ যুবকদের কাউকে রণাঙ্গনে যাওয়ার প্রাক্কালে বিদায় জানাই, তখন মনে হয় আমি যেন তাকে শেষবারের মত বিদায় জানাচ্ছি। সে আর আমাদের মাঝে ফিরে আসবে না। তখন আমার হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়। চোখ চাপিয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসে। কাঁদতে ইচ্ছে করে; কিন্তু কাঁদি না। বরং আমি আমার অশ্রু ধরে রাখতে চেষ্টা করি; কিন্তু পেরে উঠি না। এ যে আত্মিক মহব্বত এটা আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ○

অর্থ : যদি তুমি পৃথিবীর সব কিছু ব্যয় করতে তবুও তুমি তাদের হৃদয়ের মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারতে না। তবে আল্লাহই তাদের হৃদয়ে ভালবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা আনফালঃ৬৩)

সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাদের একে অপরকে মহব্বত করতে হবে। আমরা আল্লাহর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। দুনিয়ার কোন কিছু আমাদের সাহায্য করতে পারবে না। আজকে মরব না কালকে মরব কিছুই বলতে পারি না। তাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা থাকবে, আমার মৃত্যু যেন আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় হয়। আর আমাদের সব কাজ যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। দুনিয়া বা দুনিয়ার কোন মোহ ও চাকচিক্য যেন আমাদের নিয়্যাতকে কলুষিত করতে না পারে। হে আল্লাহ! আমাদের কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম আমাকে কিছু কারামত বর্ণনা করতে বললেন, যা আফগান জিহাদে বিভিন্ন স্থানে ঘটেছে। যা শুনলে মনে আল্লাহর উপর নির্ভরতা বাড়ে।

শাইখ মুহাম্মদ হাসান আমাকে বলেছেন– তিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছে, আল্লাহর কসম খেয়ে বলেছে, তারা এই কারামতটি স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। তিনি বলেছেন– তাদের নিকট এক যুবক মুজাহিদ ছিল। সে হাফেজ ছিল। নাম ছিল গুল মুহাম্মদ। সে মুজাহিদদের ঘাঁটিতে যাচ্ছিল। সে পথঘাট ভালভাবে চিনত না। তাই ভুল পথে চলতে চলতে সে একেবারে রাশিয়ান বাহিনীর এক ক্যাম্পের কাছে চলে গেল। কমিউনিস্ট সৈন্যরা তাকে দেখে চমকে উঠল। সাথে সাথে চিৎকার করে উঠল, থামো, এক কদম আগে আসবে না। মুজাহিদ যুবকটি দাঁড়িয়ে গেল। সে বুঝে ফেলল, শত্রু সৈন্য তাকে ঘিরে ফেলেছে। আত্মসমর্পণ করলো। তাদের প্রধান

অফিসার এলো। সে ছিলো বিশ্বাসগতভাবে কমিউনিস্ট। রাশিয়ান সৈন্য। দোভাষীর সাহায্যে সে আমাকে বললো, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো। মুক্তি দিয়ে দেবো। তবে তোমাকে একটি কথা বলতে হবে। সত্যি করে বলতে হবে। আমি বললাম, হ্যাঁ, সত্যি করে বলবো, মিথ্যা বলবো না। সে বললো, আচ্ছা তোমরা সাধারণ ক্লাসিনকভের গুলীতে কিভাবে ট্যাংকগুলো ধ্বংস করে দাও, জ্বালিয়ে দাও? অথচ ক্লাসিনকভের গুলীতে তো তা ধ্বংস হওয়ার কথা নয়।

সেই মুজাহিদ বললো, আমি জানি এরা শত্রু। এদের সাথে মিথ্যা বলা বৈধ। কারণ, এটা যুদ্ধ। কিন্তু তা সত্তেও আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে বললাম, আমরা মুসলমান। আমরা একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করি। কোন মানুষ, কোন অস্ত্র বা দুনিয়ার অন্য কোন শক্তির উপরও ভরসা করি না। আমাদের বিশ্বাস থাকে যা করার তা আল্লাহই করবেন। আমরা শুধু আল্লাহর নির্দেশে ওসীলা হিসেবে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি। তাই আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমরা এক মুষ্ঠি ধূলি হাতে নিয়ে বলবো–

بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ وَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ —

ব্যস, এতোটুকু বলে যদি সেই ধূলি ট্যাংকে নিক্ষেপ করি, তাহলে তাতে ট্যাংকে বিস্ফোরণ ঘটে, জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। মুজাহিদ তাদের ভয় দেখানোর জন্য একথা বললো। কিন্তু অফিসার তো একজন সৈনিক। সে কি আর তাতে ভয় পাবে। সে বিস্মিত হয়ে বললো, আচ্ছা তাই নাকি? এই তোমার সামনে কয়েকটি ট্যাংক দাড়িয়ে আছে। তুমি প্রথম ট্যাংকটির উপর ধূলি নিক্ষেপ করো তো দেখি। যদি সত্যিই তা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আমি আমার সামনে যে সাধারণ সৈন্যরা আছে তাদের সাক্ষী রেখে বলছি, তোমাকে ছেড়ে দেবো। আর যদি না পারো তোমাকে হত্যা করবো। মিথ্যাবাদীকে হত্যা করাই আমার নীতি।

আসলে আমাদের এমনই আত্মবিশ্বাসী হতে হবে, আমরা দুনিয়ার কাউকে ভয় করবো না, কোন রাজা-বাদশাহ বা অন্য কাউকে ভয় করবো না। শুধু একমাত্র আল্লাহকে ভয় করবো। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমরা তারই গোলাম। তিনি যখন বলেন 'হও' তখনই তা হয়ে যায়। তাই বলছি, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করো না। আল্লাহ তোমার ব্যাপারে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তাই তুমি পাবে। এ বিশ্বাস তোমার অবশ্যই থাকতে হবে। এ বিশ্বাস যদি থাকে তাহলে আল্লাহর সামনে দুনিয়ার সবকিছুকে ইঁদুরের মতো তুচ্ছ মনে হবে।

যা হোক, এ মুজাহিদ আল্লাহর আশ্রয় নিলো। বললো, আমাকে একটু পানি দাও। পানি আনলে সে ওযু করলো। দু'রাকাত নামায আদায় করলো। সিজদায় পড়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করলো। বললো, হে আল্লাহ! আমি তো এ কারামত দেখানোর যোগ্যতা রাখি না। কিন্তু হে আল্লাহ! আপনি তো সক্ষম আমাকে দিয়ে তা দেখাতে। সুতরাং এই বেঈমান কাফির কমিউনিস্টদের সামনে আমাকে লজ্জিত করো না। তোমার রাসূলের ধর্মের অবমাননা করো না। এ ব্যর্থতা, এ অপমান শুধু আমার ব্যর্থতা ও অপমানই নয়, এটা গোটা মুসলিম উম্মাহর ব্যর্থতা ও অপমান।

সালাম ফেরানোর পর মুজাহিদ এক অভাবনীয় প্রশান্তি অনুভব করলো। পথের পাশ থেকে এক মুঠি ধূলি নিলো। তারপর বললো–

بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ وَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ —

তারপর তা ট্যাংকের উপর ছুঁড়ে মারলো। সাথে সাথে সেই বালু দাঁড়িয়ে থাকা সবগুলো ট্যাংকের উপর গিয়ে পড়লো। আর সবগুলো ট্যাংকে আগুন ধরে গেলো। দাউ দাউ করে লেলিহান শিখায় আগুন উঠতে লাগলো। ক্যাম্পের প্রধান অফিসার এ দৃশ্য দেখে থর থর করে কাঁপতে লাগলো এবং অন্যান্য দূরবর্তী ট্যাংকগুলো দূরে সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিলো এবং তাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, আর ধূলি নিক্ষেপ করো না। তুমি তোমার পথে চলে যাও। আমরা তোমাকে আটকাবো না। সত্যিই তাদের ছিলো বিশ্বাস, ছিলো একীন। তাই

আল্লাহ তাদের সাহায্য করেছেন। আমাকে মুহাম্মদ সিদ্দীক চকরী বলেছে। সে তখন দক্ষিণ কাবুলে কমান্ডার ছিল। একবার এক যুদ্ধবিমান এলো, আমাদের উপর বোমা ফেলতে লাগলো। আমরা সবাই লুকিয়ে পড়লাম। কিন্তু একজন বৃদ্ধ মুজাহিদ লুকালেন না। আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! কে শক্তিশালী? তাদের যুদ্ধ বিমানগুলো, না আপনি? কে সবচেয়ে বড় ও মহান? আপনি, না তাদের বিমানগুলো? আপনার বান্দাদের নির্বিচারে ধ্বংস করার জন্য আপনি এ বিমানগুলোকে ছেড়ে দিয়েছেন। এভাবে কেঁদে কেঁদে দু'আ করে হাত নামাতেই বিমানটি পড়ে গেলো। আর কিছুক্ষণ পর কাবুল থেকে ঘোষণা করা হলো, একটি যুদ্ধ বিমান ধ্বংস হয়ে গেছে। তাতে একজন জেনারেল ছিল।

বিংশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٥٠) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُونَ ○ (٥١) قُلْ لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○ (٥٢) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُّصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوآ إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ ○

অর্থ : (৫০) আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা কষ্টবোধ করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং উল্লসিত মনে ফিরে যায়। (৫১) আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন। তিনি আমাদের কার্য নির্বাহক; আল্লাহর উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত। (৫২) আপনি বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্য দু'টি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্য যে, আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের আযাব দান করুন অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর। আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান।

মুনাফিকরা মু'মিনদের মাঝে তখনই বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে, যখন তাদের মাঝে সম্পর্কের শিথিলতা থাকে। পরস্পর বিভেদ থাকে। মতানৈক্য থাকে। আর যদি তারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত থাকে, নিজেদের মাঝে কোন বিভেদ-মনোমালিন্য না থাকে, তখন তারা কিছুতেই তাদের ক্ষতি করতে পারে না। তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে না। এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে রোম সম্রাট কাইসার নিজেই চেষ্টা করেছেন মুসলমানদের মধ্য থেকে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু কাউকে পায়নি। কিন্তু যখন তাবুকের যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে মুসলিম সমাজ কা'ব ইবনে মালেক ও তার অন্য দু'জন সাথীর সঙ্গ বয়কট করলো; সুদীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখলো; তখন রোম সম্রাট নড়ে উঠল। সে তার নিকট একটি পত্র পাঠাল। লিখল, শুনতে পেলাম তোমার সাথীরা তোমার সাথে রুঢ় আচরণ করছে। সুতরাং আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছনার দেশে না রাখুন। আমাদের নিকট চলে আসো।

যেন বর্তমান যুগে মার্সিডিস গাড়ির প্রস্তাব। তারপর রয়েছে প্রাসাদ, প্রহরী, সামনে গাড়ি, পেছনে গাড়ি। এক উষ্ণ সংবর্ধনা। এর চেয়ে বেশী আর কী চাও। যেন রিগ্যানের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রস্তাব। সে যুগের রোম সম্রাট এ যুগের রিগ্যানের মতোই ছিল।

ভেবে দেখ, যদি এক অখ্যাত দরিদ্র বিতাড়িত কারো নিকট রিগ্যানের প্রস্তাব আসে, এসো আমাদের নিকট আমেরিকায় এসো, রাজনৈতিক আশ্রয় নাও। তোমাকে কুটনীতিকদের মতো লাল পাসপোর্ট দেয়া হবে। এসো, তোমাকে আমেরিকান নাগরিকত্ব দেয়া হবে। লাল পাসপোর্ট পেলে তোমাকে আর ভিসা নিতে হবে না। পৃথিবীর যে কোন দেশে ইচ্ছেমতো যেতে পারবে। কেউ তোমাকে রুখতে পারবে না।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ যুগে এটাই হলো বড় ফিৎনা। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)-এর মতো যদি আমাদের নিকট রিগ্যানের বা আমেরিকান কোন কংগ্রেসম্যান বা ক্ষমতাশালী অন্য কারো পত্র এসে

পৌঁছতো, তাহলে আমরা সে পত্রটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে হেফাজত করতাম। ফাইলে সংরক্ষণ করতাম। কিন্তু হযরত কা'ব ইবনে মালেক কী করলেন? তিনি চিঠিটি পাঠ করে শিউরে উঠলেন। চিঠিটি নিয়ে সোজা চুলার নিকট গেলেন এবং তা আগুনে পুড়ে ফেললেন। তার কোন চিহ্ন বাকি রাখলেন না। এটা কেন সম্ভব হয়েছিল? কারণ, তারা ছিলেন পরস্পর সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত। তাদের সামাজিক বন্ধন ছিল অটুট-দৃঢ়। মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। এক নেতৃত্বে তারা চলতেন। একজনের নির্দেশ অম্লান বদনে মানতেন। পালন করতেন।

কিন্তু আজ আমাদের সমাজের কথা চিন্তা করুন। একটু ভেবে দেখুন। এ সমাজ একেবারে নড়বড়ে। একেবারে ঢিলেঢালা। ধর্মের যে কোন শত্রু এ সমাজে অনায়াসে ঢুকতে পারে। যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। পাশ্চাত্যের এক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, আরবের প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোককে আমেরিকান দূতাবাস রীতিমতো ভাতা প্রদান করে। এরা সিআইএ'র নিয়মিত চাকুরে। স্বয়ং হাফেজ আসাদও বিশ মিলিয়ন ডলার নিয়েছে সিআইএ'র কাছ থেকে। এ সংবাদ ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তবে ডলারের পরিমাণে আমার একটু সন্দেহ আছে। হয়তো এর চেয়ে কিছু কম হবে– পত্রিকায় পড়েছিলাম। এখন সঠিক মনে পড়ছে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَّلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۝

অর্থ : তারা বিভেদ সৃষ্টির জন্য তোমাদের মাঝে ছুটে যায়। আর তোমাদের মাঝে তাদের গুপ্তচর রয়েছে।

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে এমন লোক রয়েছে, যারা তোমাদের সব গোপন সংবাদ তাদের নিকট পৌঁছে দেয়। এরা তোমাদের সামনে গরম গরম বক্তৃতা দেয়, আবার উদাসভাবে বসে থাকে, কিন্তু তাদের কান থাকে সদা জাগ্রত। কিছু শুনলেই তার জাতির শত্রুর নিকট পাচার করে দেয়। তোমরা তাদের চেহারায় দৃষ্টি ফেললেই তাদের চিনতে পারবে। তাদের চেহারা সর্বদা মলিন থাকে। কারণ, তাদের কাজ হলো মানুষের নিষ্পাপ রক্ত ঝরানো মানুষের ধ্বংস সাধনে তাদের ছেলে সন্তানরা কেমন হতে পারে? নিঃসন্দেহে তাদের শরীরের রক্ত-মাংস সব হারাম খাবার থেকে উৎপন্ন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

كلُّ لحمٍ نبتَ من حرامٍ فالنارُ أولى به —

অর্থ : হারাম খাদ্যে উৎপন্ন গোশতের জন্য জাহান্নামই অধিক শ্রেয়। সুতরাং ভেবে দেখতে হবে, ক্ষতির দিক বেশী না লাভের দিক বেশী। এরা সবকিছু পারে, অর্থের বিনিময়ে যে কোন দলের গোপন তথ্য পাচার করে দিয়ে ইসলামী শক্তিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। কারো বিরুদ্ধে কাফের ফতওয়ার প্রয়োজন হলে সাথে সাথে তৈরি করে দিতে পারে। পাশ্চাত্যের মুসলিম বিদ্বেষীরা বা ইহুদীরা যদি চায় প্রাচ্যের বা মধ্যপ্রাচ্যের জনসংখ্যা কমাতে হবে, তাহলে তাদের পরিকল্পনার সাথে এরা মুহূর্তে একমত হয়ে যাবে। জনসংখ্যার আধিক্যের ক্ষতি সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ, রচনা ও সভা-সেমিনারের আয়োজন করবে। দেখা যাবে, শশ্রুমণ্ডিত কোন শাইখ টিভির পর্দায় ভেসে উঠেছে। জনসংখ্যা হ্রাসের পক্ষে তুখোড় বক্তৃতা দিচ্ছে। হাত নেড়ে নেড়ে বলছে, সাহাবীরা বলেছেন–

كانَ القرآنُ ينزلُ و نحنُ نعزلُ —

কুরআন যখন অবতীর্ণ হচ্ছিল তখন আমরা আযল করছিলাম।

সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণ যদি হারাম হতো বা নিষিদ্ধ বিষয় হতো তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা নিষেধ করে দিতেন। তাই শরী'আতের আলোকে এবং বিবেকের আলোকে জন্মনিয়ন্ত্রণ বৈধ। এভাবে তারা ঈমান-আমল বিক্রয় করে। দুনিয়ার মোহ, অর্থের মোহ তাদের এভাবে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিয়ে যায়।

ইসরাইলের সাথে সন্ধির আলোচনা উঠল। সাধারণ জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করলো। ইসরাইলের সাথে সন্ধির পথ বন্ধ হয়ে গেল। জামি'আ আযহার থেকে ফতওয়া দেয়া হলো, ইসরাইলের সাথে সন্ধি করা হারাম। বৈধ নয়। যে এ কাজে অগ্রসর হবে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে। কিন্তু কিছুদিন পর যখন আনোয়ার সা'আদাত বায়তুল মুকাদ্দাসে গেল, তখন বলা হলো–

(٦١) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

অর্থ : আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তুমি সেদিকে আগ্রহ প্রকাশ করো এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো। (সূরা আনফালঃ ৬১)

আল্লাহর নিকট দু'আ করি। আল্লাহ যেনো তোমাদেরকে তাদের প্রচার মাধ্যমের মুখোমুখি দাঁড় না করায়। এরা এতো জঘন্য যে, যদি কোন দলের বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করতে চায়, তখন সে দলটি যতোই আদর্শিক হোক না কেন তাদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও জঘন্য বানিয়ে ছাড়ে। যারা ১৯৬৫ ও ১৯৫৪ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের বিরুদ্ধে এদের প্রচার-প্রচারণা ও সংবাদ সংস্থার খবরাখবর শুনেছে তারা তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে। জামি'আ আযহারের শাইখের পক্ষ থেকে কাফের হওয়া সম্পর্কে ফতওয়া দু'বার প্রচারিত হয়েছে। আর সাইয়্যেদ কুতুবের কাফের হওয়া সম্পর্কে তো স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করেছে। সে পুস্তকে তাকে হত্যা করা আবশ্যক বলে প্রচার করা হয়েছে। ফতওয়া প্রদানের সময় তারা নির্লজ্জভাবে কুরআনের আয়াত ব্যবহার করেছে-

(٣٣) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

অর্থ : যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হলো তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শুলীতে চড়ানো হবে বা তাদের হাত-পা'সমূহ বিপরীত দিক থেকে কেঁটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। (সূরা মায়েদা ঃ ৩৩)

এ ছিল তাদের ফতওয়া। আর তারা সাইয়্যেদ কুতুব ও তার সঙ্গীদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে একটি পুস্ত লিখল। তার নাম দিল–

رأيُ الدين في إخوان الشياطين ــ

জামাল আব্দুন নাসের, আব্দুল কাদের আউদা, মুহাম্মদ ফারগালী, ইউসুফ তলআত, হানদারী দুয়াইর, ইবরাহীম তাইয়্যেব, মাহমুদ আব্দুল লতীফ প্রমুখ অবিসংবাদিত জননন্দিত ব্যক্তিদের হত্যা করতে চাইলো। তখন জামি'আ আযহারের শাইখ খিজির হুসাইনকে ডেকে এনে বললো, আমাকে একটি ফতওয়া লিখে দিতে হবে যার আলোকে আমি এদের হত্যা করতে পারবো।

খিজির হুসাইন তো একথা শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ়। বললো, নাউযুবিল্লাহ। এ ফতওয়া আমি দিতে পারবো না। এ দ্বারা আমি তাদের রক্তের সাথে বেঈমানি করবো? তাদের হত্যার পাপের বোঝা নিজ কাঁধে তুলে নিবো? আমার দীনকে বিক্রয় করে অন্যের দুনিয়াকে সমুজ্জ্বল করবো?

তখন তারা তাকে বরখাস্ত করে আরেক জনকে আযহারের শাইখ নিযুক্ত করলো। অথচ আগে সাধারন নিয়ম ছিল, জামি'আ আযহারের শাইখ শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ নির্বাচন করতেন। তিনি হতেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত, বিজ্ঞ। সর্বক্ষেত্রে পারদর্শী, মুত্তাকী ও পরহেজগার। তার সিদ্ধান্ত গোটা দেশ মেনে নেবে। কেউ তার বিরোধিতা করতে সাহস পেতো না। আর এখন জামি'আ আযহারের শাইখ পর্যটন মন্ত্রী, শুল্ক আদায় মন্ত্রী

ইত্যাদির মত একজন চাকুরে মাত্র। তার প্রধান কাজ হলো রাষ্ট্রপ্রধানের মনোরঞ্জন করা, তার মন মতো ইসলামকে পেশ করা। আযহারের এ চাকুরে শাইখরা এখন আর দীনের ফিকির করে না। চাকুরী ঠিক রাখাই এখন তাদের বড় ফিকির। আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট সরকারের এক মহিলা মন্ত্রীকে তাই আযহারের এক শাইখ কুরআন শরীফ উপহার দিয়ে সম্মান দেখিয়েছে। একজন কাফির কমিউনিস্টের হাতে কুরআন তুলে দেয়া কী বৈধ?

মিসরের শাসকরা যখন কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়লো, তখন তারা প্রচার করে বেড়াতো কমিউনিজম হলো আল্লাহর ধর্ম। টেলিভিশন বা রেডিওতে প্রায়ই শাইখে আযহারের প্রোগ্রাম থাকত। তিনি 'কমিউনিজম ও ইসলাম' সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

কিন্তু যখন আনোয়ার সা'আদাত ও রাশিয়ার মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হলো, তখন আবার আযহারের শাইখরা ফতওয়া দিলো, কমিউনিজম একটি কুফরী মতবাদ। যে এ মতবাদ গ্রহণ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। সারকথা হলো, তারা যখন কোন দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তখন তারা সর্বপ্রথম সে দলের বিরুদ্ধে ফতওয়া সংগ্রহ করে। বলতে থাকে অমুক জামা'আতের মাঝে ভ্রষ্টতা আছে। অমুক দলের মাঝে গোমরাহী আছে। তাবলীগ জামা'আত খারাপ। এ ধরনের কথা প্রচার করতে শুরু করে। মুখ থেকে মুখে ছড়িয়ে দেয়। আচ্ছা, একটু চিন্তা করে দেখ, এরা তাবলীগ জামা'আতকে পর্যন্ত খারাপ বলতে দ্বিধাবোধ করে না । অথচ আমি তো এদের মতো ভদ্র, বিনয়ী, আত্মনিবেদিত আর কোন দলকে দেখছি না।

এ জামা'আত গোটা পৃথিবীতে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছে। আমি স্বচোখে আমেরিকায় শত শত লোককে মসজিদে পেয়েছি, যারা ইতিপূর্বে ছিল পথভ্রষ্ট। তারা মদপান করে মাতাল হয়ে থাকতো। যিনা করতো। এদেরকে তাবলীগ জামা'আতের লোকেরা ঈমানের কথা বলে, কালিমার দাওয়াত দিয়ে হিদায়াতের রাজপথে নিয়ে এসেছে। এ দলের লোকেরা কারো কাছে বিনিময় প্রার্থনা করে না। কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশাও করে না। তোমাকে বলবে, ভাই আমরা রাজনীতি বুঝি না, আমরা কালিমার দাওয়াত দিই। ঈমানের আলোচনা করি। তুমি তাদের কাউকে দেখবে, সে সহীহ-শুদ্ধভাবে কালিমা বলতে পারে না; অথচ তার কথায় কি প্রতিক্রিয়া! সে তার হৃদয়ের ভাষায় কথা বলে। তাই শ্রোতার হৃদয়ে তার কথা আবেদন সৃষ্টি করে।

মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক এক আমেরিকানের ঘটনা। তার ঘুম হয় না। কত ওষুধ খেল কিন্তু ঘুম হচ্ছে না। পরিশেষে ঘোষণা দিলো, যে ডাক্তার তাকে ঘুম পাড়াতে পারবে তাকে তার আয়ের অর্ধেক দিয়ে দেবে। ডাক্তাররা আপ্রাণ চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। কেউ তাকে এক ঘন্টার জন্য ঘুম পাড়াতে পারলো না। ট্যাবলেট দিলো, নেশাযুক্ত ওষুধ দিলো। কিন্তু কোন ফলোদয় হলো না।

একদিনের ঘটনা। হয়তো নিউ মেক্সিকো বা সানফ্রান্সিসকোতে ঘটেছিল। লোকটি তার প্রাসাদতুল্য বাড়িতে বসে ছিল। চোখে ঘুম নেই। প্রায় উন্মাদ। দেখলো, তার বাড়ির সামনেই একদল মানুষ। সাদা পোশাক পরিহিত। মাথার নিচে পাগড়ি রেখে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাদের দৃশ্য দেখে লোকটি দারুণ বিস্মিত হলো। ভাবলো, হয়তো তাদের নিকট কোন ঘুমের ওষুধ আছে। প্রাসাদ থেকে নেমে এলো। বললো, তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা তাবলীগ জামা'আতের লোক, আমরা মুসলমান। লোকটি বললো, তোমাদের নিকট কি আমার রোগের ওষুধ আছে? তারা বললো, তোমার রোগ কী? লোকটি বললো, আমার রোগ হলো, আমার ঘুম হয় না। তারা বললো, এতো এক সাধারণ রোগ। তারপর তারা কথা বলা শুরু করলো। এক পর্যায়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো। একাধারে তিন ঘন্টা ঘুমালো। তারা তাকে ঘুম থেকে তুলে বসানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু তার চোখ ঘুমে মিলিত। লোকটি দারুণ বিমুগ্ধ হলো। বললো, কিভাবে তোমাদের ধর্মে প্রবেশ করবো? তারা বললো, যাও গোসল করে এসো। তারপর সে মুসলমান হয়ে গেলো।

ভাইয়েরা আমার! তাবলীগ জামাতের লোকদের পেছনে পড়ো না। তাদের ছেড়ে দাও। তারা হারিয়ে যাওয়া ও ধ্বংসে নিপতিত মানুষদের হিদায়াতের পথে আনার কাজ করতে থাকুক। তোমরা তো ইখওয়ানুল মুসলিমীনের লোকদের হত্যা করেছো এ কারণে যে, তারা রাজনীতি করে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তোমাদের বাঁধা হয়। মুজাহিদদের তোমরা হত্যা করছো।

কারণ, তারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তোমাদের উপর চড়াও হয়। তোমাদের পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। এভাবে নানা অজুহাতে তোমরা ইসলামী দলগুলোকে নিঃশেষ করার পায়তারা করছো। এখন তাবলীগ জামাতের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া নেই।

আশ্চর্যের বিষয়, কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই তাবলীগ জামাত সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে। তাদের বিরুদ্ধাচরণের ফতওয়া দেয়। তোমরা হয়তো তা বিশ্বাস করবে না, আসলেই তারা তা করে। তাই বলছি, তাবলীগ জামা'আতের লোকদের পিছু নিও না। তারা হারিয়ে যাওয়া যুবকদের হিদায়াতের পথে আনছে। সংশোধন করছে।

এমনও মানুষের কথা জানি, যারা তাবলীগ করাকে হারাম বলে ফতওয়া দেয়। তারা বলে, তাবলীগের কিছু লোক নাকি নাস্তিক ও মুশরিকও রয়েছে। এ ধরনের আজগুবী কথা তারা কিভাবে বলে, তা বুঝে আসে না। তারা বলে, তাবলীগের লোকেরা নাকি লোকদের পাপ কাজ থেকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়। তাই শিরক করার চেয়ে পাপ কাজে লিপ্ত থাকাই ভালো।

আরে ভাই! শয়তানের মাথায়ও বুঝি এমন দলিল আসে না। বড় শয়তান ইবলিস সমুদ্রে খিমা স্থাপন করে মানুষকে গোমরাহ করার পরামর্শ করে। সেও তো এমন দলিল-প্রমাণ কখনো দেয়নি।

এদের ব্যাপারে কুরআনের এই আয়াতের মর্ম খুব প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ○

অর্থ : আর বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তোমাদের মাঝে অশ্ব ছুটাতো। আর তোমাদের মাঝে তাদের গুপ্তচর রয়েছে।

তুমি দেখতে পাবে, কিছু মানুষ শশ্রুমণ্ডিত। দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়। কিন্তু সে গুপ্তচর। আল্লাহর কাছে আমরা জাহান্নামের শাস্তি থেকে পানাহ চাই। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্ব প্রকার ফিৎনা থেকে পানাহ চাই। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, যেনো তিনি আমাদেরকে মানুষের রক্ত চুষে খাওয়ার জন্য তৈরী না করেন। এরা মশার ন্যায়, ছারপোকার ন্যায়। মানুষের রক্ত চুষেই তারা বেঁচে থাকে। এরাই মুসলমানদের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন–

وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ○

অর্থ : তোমাদের মাঝে তাদের গুপ্তচর রয়েছে।

তাদের কাজই তোমাদের কথা শোনা। তোমাদের পরিকল্পনা শোনা। এ জন্যই তারা দিন-রাত ব্যস্ত থাকে। এখানে-সেখানে কান পেতে থাকে। এসব যালিমদের কার্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সমধিক অবহিত। তিনিই তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ ○

অর্থ : এরা ইতিপূর্বেও ফিৎনা করার চেষ্টা করেছিলো এবং তোমার কার্যাবলীকে পণ্ড করে দিতে চেয়েছিলো। অবশেষে সত্য এসে গেলো এবং তাদের অনিচ্ছা সত্তেও আল্লাহর নির্দেশ প্রকাশিত হলো।

অর্থাৎ- তারা পূর্ব থেকেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে নিমগ্ন ছিলো। অবশেষে কুরআন আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের লাঞ্ছিত করলো এবং তাদের স্বরুপ প্রকাশ করে দিলো। বর্ণিত আছে, এ আয়াত ১২ জন ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো। তখন জিবরাঈল (আঃ) এসে রাসূলকে তা বলে দিলেন। আসলে মুনাফিকরা মুসলিম সমাজের জন্য একটি আপদ। মারাত্মক বিপদ। এই মুনাফিকরা মসজিদে প্রথম কাতারে মিম্বারের নিকটে এসে বসে। টেপরেকর্ডার সাথে নিয়ে আসে। খতীবের কথা শুনে এরা কাঁদতে থাকে। এরা সবার আগে মসজিদে আসে। সূরা কাহফ পড়তে থাকে। ইমামের একেবারে পেছনে দাঁড়ায়। অথচ এরা মুনাফিক। এরা গুপ্তচর। ইসলামের ক্ষতি ও ধ্বংসই এদের উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۝

অর্থ : তাদের কেউ কেউ বলে, আমাকে অনুমতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।

এই লোকটি হল জাদ ইবনে কাইস। মুনাফিকদের এক সরদার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, হে জাদ! তুমি কি বনু আসফার তথা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করবে? তাহলে তুমি তাদের বাঁদী গ্রহণ করতে পারবে। জাদ বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোত্রের লোকেরা জানে যে, আমি মহিলাদের ব্যাপারে দুর্বল। তাই আমি ভয় পাই, যদি রোমান নারীদের দেখতে পাই, তাহলে ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না। এরা অত্যন্ত সুন্দরী নারী। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।

এক ব্যক্তির নাম ছিলো আসফার(হলুদ বর্ণবিশিষ্ট)। সে রোমের হাবশায় বসবাস করতো। তার মেয়েরা তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলো। রোমে তাদের বিয়ে হলো এবং তাদের সন্তানরা রোমের শুভ্রতা ও হাবশার গৌরবর্ণের মাঝামাঝি অর্থাৎ হলদে বর্ণের সন্তান জন্ম দিলো। তারা হলো সবচেয়ে সুন্দর মানুষ। এরপর থেকে রোমানদের বনু আসফার নামে ডাকা হতে লাগলো।

জাদ ইবনে কাইস যখন বললো, لا تَفْتِنِّي আমাকে ফিৎনায় ফেলবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিলেন-

أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۝

অর্থ : শুনে নাও, তারা তো ফিৎনায় পড়ে গেছে। পাপ ও গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদের ঘিরে আছে।

মুনাফিকরা মুখে মুখে ঠিক এ ধরনেরই অজুহাত তুলে জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে থাকতে চায়। দেখা যাবে, হয়তো গুপ্তচর হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করতে এলো। পেশোয়ারে ঘুরেফিরে তথ্য সংগ্রহ করে। চাপ দিয়ে যখন তাকে রণাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হলো, আর পাকতিয়ার জাজিয়া এলাকায় পৌঁছলো, তারপর সেখানে গোলা এসে পড়তে লাগলো; বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ হতে লাগলো; তখন সে কাঁদতে লাগলো। বলতে লাগলো, আমি তো আমার মায়ের অনুমতি ছাড়া রণাঙ্গনে চলে এসেছি। আমি মারাত্মক পাপ করেছি। আমি ভয় পাচ্ছি, আমি এ পাপ সহকারেই মৃত্যুবরণ করবো।

অন্যান্য মুজাহিদরা শহীদ হওয়ার তামান্না করছে আর সে বসে বসে কাঁদছে। শাইখ তামীম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর, কাঁদছো কেন? বললো, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি আমার মায়ের অনুমতি ছাড়া রণাঙ্গনে চলে এসেছি। এ অবাধ্য অবস্থায় কি মৃত্যুবরণ করবো?

و إن تُصبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهم —

যদি ভালো কিছু হয় অর্থাৎ বিজয় লাভ করে, গনীমতের মাল অর্জিত হয়, তাহলে তা তাদের কষ্ট দেয়। তাদের অপছন্দনীয় হয়।

و إن تُصبْكَ سَـــيِّئَةٌ يفرحُوا بها —

আর যদি তোমার মন্দ কিছু হয়, তাহলে তারা তাতে আনন্দিত হয়।

আমি তাদের বহুবার বলেছি, তোমরা কি চাও আরব যুবকরা এই রুশদের সামনে বন্দী অবস্থায় উপস্থিত হোক? তারপর তাদের হত্যা করা হোক? বলো, এই আরব যুবকরা কী করতে পারবে? এরা তো যুদ্ধের ট্রেনিং পায়নি। কেনো তুমি তাদের একত্রিত করছো। অথচ আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি, তোমরা এই যুবকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। এমনভাবে তারা কথা বলে ও জিহাদের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করে। আবার কেউ কেউ বলে, এই যুবকদের রক্তের হিসাব অমুককে অমুককে দিতে হবে। অথচ এ যুদ্ধের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা দীনের ইজ্জত বুলন্দ করছেন। হারাম থেকে মানুষদের বাঁচাচ্ছেন। তোমরা বসে বসে কী করছো? এই যুবকদের মৃত্যুর ভয়ে জমাট বেঁধে আছো। বারবার দুঃখ প্রকাশ করছো।

বিশ্বাস করো, কিছু কিছু মানুষ এমনও আছে, ইবাদত-বন্দেগী ও আচার-আচরণ এতো ভাল লাগে, যা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু তবুও তারা আশা করে, চায় যেনো আফগানিস্তানে মুজাহিদরা পরাজিত হয়। কারণ, সাত বছর যাবত তিনি বলে আসছেন, এটি জিহাদ কিনা তা এখনো আমার নিকট স্পষ্ট নয়। এমনকি তিনি বলেন, আমি তোমাদের বারবার উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তোমরা উপদেশ গ্রহণ করোনি।

কবি বলেন–

أمرتُهم أمْــرِي بِمُنعــرِجِ اللوى فلم يَستبِينُوا الرشدَ إلا ضُحَى الغَد

অর্থ : আমি পতাকা উঁচিয়ে তাদের হুকুম দিলাম, কিন্তু পরদিন সকালে তাদের নিকট হিদায়াতটি স্পষ্ট হলো।

তারা বলে, আমি কি তোমাদের বলিনি, তোমরা নিজেদের ক্লান্ত করো না। শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করো না, শক্তিকে নিঃশেষ করো না। তোমরা তোমাদের মনোসংযোগকে দেশের জন্য ব্যয় করো। এটাই তোমাদের জন্য অনেক উত্তম।

আমি বলতে চাই, মুসলমানদের সকল দেশই ইসলামের দেশ। আসলে তাদের নিকট মুসলমানদের কোনো ভালো সংবাদ ভালো লাগে না। যদি তাকে বলো, আসুন একটু সময় দিন, আমরা আপনাকে আফগানিস্তানের রণাঙ্গনের সংবাদ শোনাবো। বিজয়ের সংবাদ শোনাবো। মুজাহিদদের বীরত্বের সংবাদ শোনাবো। তারা বিরক্তিভরে তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাবে এবং বলবে, এখন সময় নেই। পরে শুনবো।

আমরা এসব বিষয় অনেক আগেই বুঝেছি এবং ১৯৮০ সাল থেকে এর প্রতিকারের চিন্তা করছি।

তারা বলে, এ জিহাদের পরিণতি হবে আলজেরিয়ার জিহাদের ন্যায়। অন্যান্য মুসলিম দেশের জিহাদের ন্যায়। মুসলমানরা প্রথমে জিহাদ শুরু করে। এর জন্য রক্ত দেয়। কিন্তু ফলটা মুসলমানরা পায় না। আল্লাহর শত্রুরা তা নিয়ে নেয়। এ ধরনের লোকদেরকে শুধু বলতে দাও, আর তোমরা তোমাদের কাজ চালিয়ে যাও। বিজয় একদিন অবশ্যই তোমাদেরই হবে।

অনেকে মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তারা মনে করে, জিহাদে গেলেই বুঝি মারা যাবে। আর জিহাদে না গেলে হয়তো কিছুদিন বেঁচে থাকবে। এ ধরনের বিশ্বাস মুসলমানদের হতে পারে না। মুসলমান তো বিশ্বাস করবে, যেখানে যে সময়ে তার মৃত্যু আল্লাহ তা'আলা অবধারিত করে দিয়েছেন, সেখানেই মৃত্যু হবে। অন্য কোথাও হবে না। হতে পারেও না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۝

অর্থ : বলে দিন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যা ফায়সালা করেছেন, তা ছাড়া অন্য কিছুতেই আমাদের স্পর্শ করবে না।

আফসোস! এ আয়াতটি এমন এক আয়াত যে, শুধুমাত্র এই একটি আয়াতই মুসলমানের জীবনের জন্য দিক-নির্দেশক হতে পারে। কোনো মুসলমান যদি একথা বিশ্বাস করে, তাহলে কিভাবে সে মৃত্যুকে ভয় করতে পারে! কিভাবে সে রিযিকের সংকটে ভীত হতে পারে! সে জানে যে, আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা রিযিকের ফায়সালা করেছেন। তাহলে সে কিভাবে রিযিকের ভয় করতে পারে! কিভাবে সে রিযিকের ব্যাপারে আতংকিত হতে পারে!

তবে আমি পরামর্শ দেই, তুমি তোমার চাকরি ছেড়ে দিয়ে জিহাদে যেয়ো না। এটা ঠিক নয়। আর সরকারী চাকরি এখন দুর্লভ। তাই চাকরি ছেড়ে দিলে তোমার বিপদ হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, তুমি আর দেশে ফিরে যেতে পারবে না। সুতরাং, সতর্ক থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

কুরআনের এই আয়াতটির কথা চিন্তা করো। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۝

অর্থ : বলুন, আল্লাহ যা আমাদের জন্য ফায়সালা করেছেন, তা ছাড়া কিছুই আমাদের স্পর্শ করবে না। তিনি আমাদের মাওলা। আল্লাহ হলেন আমাদের সাহায্যকারী, আমাদের রিযিকদানকারী, আমাদের সহায়তাদানকারী। আর আমরা তার বান্দা, তার দাস, তার সৃষ্টি। সুতরাং তিনি কি আমাদের ধ্বংস করতে পারেন!

ভাইয়েরা! যদি কোনো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর গাড়ির ড্রাইভার হয় বা কোনো মন্ত্রীর গাড়ির ড্রাইভার হয়, তাহলে সে পথে কারো পরওয়া করবে না। নির্ভীক দুর্বার হবে তার চলাফেরা। তাহলে যে ব্যক্তি বিশ্ব জগতের স্রষ্টার হয়ে কাজ করবে, তাকে কি তিনি ধ্বংস করতে পারেন? আমাদের এক বন্ধু বাড়িতে স্ত্রীকে রেখে ফিলিস্তিনের জিহাদে চলে এলো। লোকেরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার স্বামী কি করে? স্ত্রী বললো, তিনি তো আল্লাহর কাজ করছেন। কেউ অমুকের ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। কেউ অমুকের কোম্পানিতে কাজ করে। আর কেউ সরাসরি আল্লাহর নির্দেশে তার কাজ করে। সুতরাং আল্লাহ কি তাকে ধ্বংস করতে পারেন? তার ক্ষতি হয় এমন কিছু করতে পারেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ তা করবেন না।

একবার এক ব্যক্তি খলীফার নিকট থেকে এলো। সে এক আলেমের জন্য এক থলে দিনার নিয়ে এসেছে। আলেম থলে বাহককে বললেন, আমার মুনিব তোমার মুনিবকে দান করেন। আমার রব তোমার মুনিবকে দান করেন। সুতরাং তুমি তোমার মুনিবকে গিয়ে বলো, নিশ্চয়ই আমার মুনিব তোমার মুনিবের চেয়ে অধিক ধনী। এই ছিলো সেই আলেমের বিশ্বাস। এই ছিলো তার একীন।

শাইখ সাঈদ হিলবী (রহঃ) একদা মসজিদে বসে ছিলেন। তখন ইব্রাহীম পাশা মসজিদে প্রবেশ করলো। ইবরাহীম পাশা ছিলো দারুণ অহংকারী। গর্বের তার শেষ ছিলো না। সে তখন শাম ও মিসর শাসন করছিলো। শাইখ সাঈদ হিলবী তখন তার ছাত্রদের মাঝে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। ইবরাহীম পাশা কিছুই বললো না। মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলো। শাইখ তাকে দেখলেন কিন্তু দাঁড়ালেন না। ইবরাহীম পাশা তখন এক প্রহরীকে একটি টাকার থলে দিয়ে বললো, যাও এটা শাইখকে দিয়ে এসো।

প্রহরী এসে থলেটি শাইখ সাঈদ হিলবীর সামনে রাখলো। শাইখ হাতে নিয়ে দেখেন, তা টাকার থলে। প্রহরীকে তা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, যাও তোমার মুনিবকে গিয়ে বলো, আল্লাহ যার পা কে প্রসারিত করেন, তিনি তার হাতকে প্রসারিত করেন না।

একেই বলে আকীদা; একেই বলে বিশ্বাস। একেই বলে আল্লাহর উপর ভরসা। কারণ, ধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত। এক, ইবাদত। দুই, ইসতি'আনত বা সাহায্য প্রার্থনা করা। ধর্মের অর্ধেক হলো ইবাদত আর অর্ধেক হলো ইসতি'আনাত। সূরা ফাতিহায় তাই বলা হয়েছে–

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○

অর্থ : আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই।

একদা জনৈক ব্যক্তি আমাকে একটি বিস্ময়কর ঘটনা শুনিয়েছিলো। মরক্কোর বিশিষ্ট শাইখ বশীর ইবরাহীম একদা ঘটনাক্রমে বাদশাহ ফারুকের নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখলেন, তারা হাসান বান্নাকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র করছে। তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি তখন বাদশাহ ফারুকের নিকট থেকে বেরিয়ে এসে হাসান বান্নার নিকট এলেন এবং বললেন–

إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ○

অর্থ : নিশ্চয়ই সভাসদবৃন্দ তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে, সুতরাং তুমি বেরিয়ে পড়। নিশ্চয়ই আমি তোমার কল্যাণকামী।

হাসান বান্না আমার কথা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। বললেন, এই কী আপনি! এটাই কী আপনার চিন্তা? তারপর তিলাওয়াত করলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ○

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তার কাজ পরিপূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করেছেন। (সূরা তালাক ঃ ৩)

এটাই হলো তাওহীদের বিশ্বাস। এটাই হলো আল্লাহর রব হওয়ার বিশ্বাস। তারপর তিনি দু'টি চরণ আবৃত্তি করলেন।

أيَّ يومي مِنَ الموت أفِرُّ يومَ لا قُــدِّرَ أمْيومَ قُــدِّرَ

يومَ لا قُــدِّرَ لا أرهَبُــه و مِنَ المقْدُورِ لا يَنجو الحَذِرُ

অর্থ : মৃত্যু থেকে আমি কোথায় পালাবো! যেদিন ফায়সালা করা, সেদিন পালাবো, না যেদিন ফায়সালা হয়নি সেদিন পালাবো!

যেদিন মৃত্যুর ফায়সালা করা হয়নি সেদিনে আমি ভয় পাই না। আর সতর্ক ব্যক্তিও তো আল্লাহর ফায়সালা থেকে মুক্তি পায় না। একেই বলে তাওহীদের বিশ্বাস। রব হওয়ার তাওহীদের বিশ্বাসের সাথে অবশ্যই ইলাহ হওয়ার তাওহীদের বিশ্বাস থাকতে হবে। ইলাহ হওয়ার তাওহীদের বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর বিশ্বাস থাকতে হবে। মানব জীবনে প্রত্যেক কাজে তা থাকতে হবে।

তাওহীদের বিশ্বাস তিন প্রকার। রব হওয়ার ক্ষেত্রে তাওহীদের বিশ্বাস। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাওহীদের বিশ্বাস। ইলাহ হওয়ার ক্ষেত্রে তাওহীদের বিশ্বাস। এ তিন প্রকার তাওহীদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন।

আমি একদা সাইয়্যেদ কুতুবের বোন হামীদার সাথে জেলে ছিলাম। হামীদা বলেছেন– ১৯৬৬ সালের ২৮ আগস্টে সাইয়্যেদ কুতুবের ফাঁসির ব্যাপারে বাদশাহ আব্দুন নাসের একমত হলো। তখন হামদী রাসূলী আমাকে তার ফাঁসির নির্দেশনামা দেখিয়ে বললো, এখন আমাদের সামনে আর মাত্র একটি সুযোগ বাকি আছে। আমরা যদি একটু সচেষ্ট হই, তাহলে হয়তো তাকে রক্ষা করতে পারবো। কারণ, তার মৃত্যুর কারণে যে ক্ষতি হবে, তা

শুধু মিসরের ক্ষতি নয়। বরং গোটা ইসলামী বিশ্বের ক্ষতি। তিনি যদি একটু বিনয়ভাব প্রকাশ করেন, তাহলে আমরা তার ফাঁসির হুকুমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিণত করে দেবো। তারপর ছয় মাস গেলে তার মুক্তির ব্যবস্থা করবো। আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন। হাতে সময় একেবারে কম।

হামীদা বলেন, আমি সাইয়্যেদ কুতুবের নিকট গেলাম। বললাম, যদি তুমি একটু বিনয় ভাব প্রকাশ করো তাহলে এরা ফাঁসির হুকুম মওকুফ করে দেবে। আমি যা বলছি, তা হামীদা কুতুবের মুখ থেকে আমি নিজেই শুনেছি। অন্য কারো থেকে শুনিনি। তবে হামীদা কুতুবের বাড়িতে, না যয়নাব গাজালীর বাড়িতে তিনি তা বলেছেন- ঠিক মনে আসছে না।

সাইয়্যেদ কুতুব তখন বললেন, শোনো হামীদা! আমি তাদের নিকট কোন কাজের ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করবো? আল্লাহর দীনের জন্য যে কাজ করেছি, সে কাজের অপারগতার কথা বলবো? আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য কাজ করতাম, তাহলে বিনয় ভাব প্রকাশ করতাম। কিন্তু আল্লাহর জন্য যা করেছি, তার জন্য এমন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর বললেন, হে হামীদা! যদি আমার আয়ু শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে এই ফাঁসির নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে। আর যদি আয়ু শেষ না হয়ে থাকে, তাহলে এ নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে না। কেউ তা বাস্তবায়ন করতে পারবে না। সুতরাং বিনয় প্রকাশের কারণে আমার আয়ু বৃদ্ধিও পাবে না, হ্রাসও পাবে না।

তারপর তাকে যখন ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন এক ব্যক্তি তার নিকট এলো। বললো, আপনি বলুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তিনি তখন তার দিকে ফিরে বললেন, অবশেষে তুমি এলে এ নাটকের অবসান ঘটাতে! ভাই, আমাকে তো ফাঁসি দেয়া হচ্ছে এই কারণে যে, আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করি। আর তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বিক্রি করে রুটির ব্যবস্থা করো। এটাই তাওহীদ। নির্মল তাওহীদ।

এ ধরনের ঘটনাই ঘটেছিলো হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর খিলাফতকালে। কিছু লোক এসে তাকে বললো, সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস নামায পড়তে জানে না। যে মহান সাহাবী ছয়জনের পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তার সম্পর্কে এসে এমন কথা বললো।

তাদের এ কথা শুনে হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) বললেন, আমি ছিলাম ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সপ্তম ব্যক্তি। আমরা রাসূলের সাথে তখনও ছিলাম, যখন গাছের পাতা ছাড়া আমাদের নিকট খাওয়ার অন্যকিছু ছিলো না। আমরা পাতা খেতাম আর বকরীর মতো পায়খানা করতাম। আর আমি ছিলাম প্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করেছিল। আর এখন বনু আসাদের লোকেরা আমাকে ইসলামের ব্যাপারে দোষারোপ করছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ٥ (٥١) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ٥ (٥٢)

অর্থ : আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য ফায়সালা করেছেন। তিনি আমাদের কার্য নির্বাহক। আল্লাহর উপরই মু'মিনের ভরসা করা উচিত। আপনি বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্য দু'টি কল্যাণের (বিজয় বা শাহাদাত) একটির প্রত্যাশা কর আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্য যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করবেন নিজের পক্ষ থেকে বা আমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো। আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান। (সূরা তওবা : ৫১-৫২)

তোমরা শয়তানের প্রতিশ্রুতির অপেক্ষায় আছো আর আমরা দয়াময় আল্লাহর প্রতিশ্রুতির অপেক্ষায় আছি। আমরা বিজয় বা শাহাদাতের প্রত্যাশায় আছি আর তোমরা দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আর পরকালে শাস্তির অপেক্ষায় আছো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ○ (৫৩)

অর্থ : বলুন, তোমরা ইচ্ছায় ব্যয় করো বা অনিচ্ছায় তোমাদের থেকে তা কবুল করা হবে না। কারণ, তোমরা অবাধ্য সম্প্রদায়। (তওবাঃ ৫৩)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াতটি জাদ ইবনে কাইসকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। সে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে জিহাদ থেকে অব্যাহতি দিন। আর এই তো আমার প্রচুর সম্পদ রয়েছে। তা দ্বারা আমি সাহায্য-সহযোগিতা করবো। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, স্বেচ্ছায় অর্থ ব্যয় করো বা অনিচ্ছায় অর্থ ব্যয় করো, আল্লাহ তা কবুল করবেন না। কারণ, তোমরা ফাসিক ও অনাচারী সম্প্রদায়।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ (৫৪)
كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ○

অর্থ : আর তাদের অর্থ কবুল না হওয়ার এ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী আর তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সংকুচিত মনে।
(সূরা তওবা: ৫৪)

মুনাফিকদের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ○ (৯৮)

অর্থ : আর বেদুইনদের কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং তোমাদের উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা তার অপেক্ষায় থাকে। (তওবা ঃ ৯৮)

দুর্দিন অর্থ পরাজয়ের অপেক্ষায় থাকে। হুনাইনের যুদ্ধের দিন তাই ঘটেছিল। তাদের কেউ কেউ বললো, আজ তার জাদু নিস্ফল হয়ে গেছে। অথচ তারা রাসূলের সাথে যুদ্ধে গিয়েছিল। যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানদের পরাজয় দেখা দিলে তারা এ কথা বলেছিলো।

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া তখন কাফের ছিলো। কিন্তু রাসূলের সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলো। সে ছিলো বীরযোদ্ধা। এ কথা শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলো, কুরাইশের কেউ শাসন করা হাওয়াজেনের কেউ শাসন করার চেয়ে আমার কাছে অনেক প্রিয়।

মুনাফিকদের চরিত্র হলো, তারা নামাযে অলস। বিশেষত এশা ও ফজরের নামাযে তাদের অলসতা বেশী প্রকাশিত হয়ে থাকে। ফজরের নামাযের সময় তুমি তাদের মসজিদে খুঁজে পাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, কেউ ফজরের নামাযে অলসতা করলে আমরা তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করতাম। একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لقد هَمَمْتُ أنْ آمرَ برجال فيَجْمَعُونَ الحطبَ أمرَ برجلٍ فيؤذّنُ في الناسِ أوْ فيُقيم الصلاة ثم أعْرجُ على
الذينَ لا يَشْهدُونَ معنَا العشَاءَ فأحرقُ عليهم بُيوتهم —

অর্থ : আমি ইচ্ছে করেছি, লোকদের নির্দেশ দেবো, তারা লাকড়ি একত্রিত করবে এবং একজন লোককে আযান দিতে বলবো বা ইকামত দিতে বলবো, তারপর ঐ লোকদের নিকট ফিরে যাবো যারা আমাদের সাথে ঈশার নামাযে উপস্থিত হয় না। তারপর আমি তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলবো।

আমাদের একটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। তার একটি হলো সহীহ হওয়া, আরেকটি হলো কবুল হওয়া। সহীহ হওয়া অর্থ হলো, দায়িত্বমুক্ত হওয়া আর কবুল হওয়ার অর্থ হলো সওয়াব পাওয়া বা সওয়াবের অধিকারী হওয়া।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

من أتى عرَّافا فسألَه فصدَّقه لا تقبَّل له صلاةُ أربعينَ يومًا —

অর্থ : যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট যাবে, তারপর তাকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে ও তাকে সত্য মনে করবে, তাহলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না। এখানে কবুল না হওয়ার অর্থ, সে তার সওয়াব পাবে না। তবে নামায আদায়ের যে দায়িত্ব ছিলো তা আদায় হয়ে যাবে।

আল্লাহ আমাদেরকে মকবুল নামায আদায় করার তাওফিক দান করুন, মকবুল ইবাদত করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

একবিংশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٥٣) قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ○ (٥٤) وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ
مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ○
(٥٥) فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ
كَافِرُونَ ○ (٥٦) وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ○ (٥٧) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً
أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ○ (٥٨) وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا
وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ○ (٥٩) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا
اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ○

অর্থ : (৫৩) আপনি বলুন, তোমরা স্বেচ্ছায় অর্থ ব্যয় করো বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনো কবুল করা হবে না। নিশ্চয়ই তোমরা ফাসিক সম্প্রদায়। (৫৪) তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী। তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সংকুচিত মনে। (৫৫) সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হলো এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা আর কুফরী অবস্থায় তাদের মৃত্যুবরণ করা। (৫৬) তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। (৫৭) তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা বা ঠাঁই পেলে সেদিকে দ্রুত গতিতে পলায়ন করবে। (৫৮) তাদের মাঝে এমন লোকও রয়েছে যারা সদকা বন্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় আর না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। (৫৯) কতই না ভালো হতো যদি তারা সন্তুষ্ট হতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং বলতো, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের কে নিজ করুণায় দান করবেন। নিশ্চয়ই আমরা শুধুই আল্লাহমুখী।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করে বললেন, তোমরা স্বেচ্ছায় অর্থ ব্যয় করো বা অনিচ্ছায়, কখনো তোমাদের থেকে তা কবুল করা হবে না।

এ ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের প্রতিবাদ করেছেন যারা বলেছিল, আমরা স্বশরীরে জিহাদ করতে যাবো না। তবে আপনাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করবো। অর্থাৎ আল্লাহ তাদের কোন দান কবুল করবেন না। এরপর আল্লাহ তা'আলা কবুল না হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। প্রথম কারণ হলো, তাদের মাঝে ঈমান নেই। আর ঈমান হলো কবুলের শর্ত। তবে তারা যা ব্যয় করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের দুনিয়াতে কিছু বিনিময় দেবেন। তবে পরকালে তারা জাহান্নামে স্থায়ী আযাবে থাকবে। যেমন, কোন কাফির যদি আত্মীয়তা বন্ধন রক্ষা করে। ইজ্জত করে। কোন কাফির বাদশাহ যদি প্রজাদের সাথে সদাচরণ করে, তাহলে দুনিয়াতে তার বিনিময় সে পাবে। অর্থাৎ তার প্রজারা তাকে ভালোবাসবে। তাকে শ্রদ্ধা করবে। এভাবে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা ভালো কাজ করলে তার বিনিময় আল্লাহ তা'আলা তাদের

দুনিয়াতেই প্রদান করবেন। পরকালে তারা তার বিনিময়ে কিছুই পাবে না। কারণ, তাদের মাঝে ঈমান নেই। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إنَّ اللهَ لا يَظلِمُ مؤمنًا حسنةً يُعطي بها في الدنيا و يَجزي بها في الآخرةِ ، أمَّا الكافرُ فيُعطي بِحسناتِ مَا عمِلَ في الدنيا حتَّى إذَا أفْضَى إلى الآخرةِ لم يكنْ له حسنةٌ يَجزي بها ـــ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নেক কাজের ব্যাপারে কোন মু'মিন ব্যক্তির উপর জুলুম করেন না। দুনিয়াতে তার বিনিময় প্রদান করেন এবং পরকালে তার সওয়াব দান করেন। আর কাফিরকে তার কৃত নেক কাজের বিনিময় দুনিয়াতে প্রদান করেন। আর যখন সে পরকালে চলে যায়, তখন সে নেক কাজের কোন বিনিময় পায় না।

ইমাম মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রাঃ) একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন–

يا رسولَ اللهِ! ابنُ جُدْعانَ كانَ في الجاهليَّةِ يَصِلُ الرَحِمَ و يُطعِمُ المسكينَ، فهل ذلك نَافِعُه ؟ قال : لا يَنْفعُه ، إنَّه لم يقُل يومًا : ربِّ اغفِرلي خَطِيئتي يومَ الدِّين ـــ

অর্থ : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে ইবনে জুদআন, জাহেলী যুগে যে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেছে। অসহায়-মিসকীনদের আহার দিয়েছে। এ নেক কাজগুলো কি তাকে কোন উপকার করবে? রাসূল বললেন, না, তাকে কোন উপকার করবে না। সে তো একদিনও বলেনি, হে আমার রব! বিচার দিবসে আপনি আমার ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিন।

অথচ এই আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআন সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মযলুমের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণের আহবান করতেন। তার গৃহেই হিলফুল ফুযুল নামক সেবা সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لقدْ شَهِدتُ في بيتِ عبدِ اللهِ بن جدعانَ حِلفًا، ما أحبُّ أنْ يكونَ لي به حمرُ النَعَم و لو دُعيتُ إليه في الإسْلامِ لأجَبتُ ـــ

অর্থ : আমি প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের গৃহে উপস্থিত ছিলাম। আমি চাই না যে, তার বিনিময়ে আমাকে লাল উট দেয়া হোক। ইসলামের আবির্ভাবের পর যদি আমাকে ডাকা হতো, তাহলে অবশ্যই আমি সে ডাকে সাড়া দিতাম। এ ঘটনা সেসব লোকের কথার প্রতিবাদ হয়, যারা বলে, আফগানিস্তানের লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা উচিত নয়। কারণ, তারা তো ভ্রান্ত, বিদ'আতে নিমগ্ন, শিরকে মত্ত। কিন্তু ইসলামের কথা হলো, মজলুম সে যেই হোক, তাকে সহায়তা করতে হবে। সে কাফির না মু'মিন, না অন্য কিছু এসব দেখা যাবে না।

ইসলামের সূচনা কালের ঘটনা। আরাশ গোত্রের এক লোক এলো। সে ছিলো মজলুম। আবু জাহেল তার এক উটের মূল্য খেয়ে ফেলেছিল। কিন্তু সে অর্থ আর তাকে দিচ্ছে না। সে সেই অভিযোগগুলো নিয়ে এলো। কাবার ছায়ায় দাঁড়িয়ে কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকদের লক্ষ্য করে চিৎকার করে রোরুদ্ধ কণ্ঠে একটি ছন্দ আবৃত্তি করলো–

يا للرجالُ لمظلومٍ بضاعتُـــه   ببطنِ مكةَ خالِي الحيِّ و النفرِ

হে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা! যে মক্কায় তার পণ্য দ্রব্যের ব্যাপারে মজলুম হয়ে পড়েছে তোমরা কি তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে না! তার তো কোন জনবল বা সৈন্যবল নেই।

অচেনা অজানা এক ব্যক্তি। তাই তাকে কেউ সাহায্য করলো না। সে অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বললো, আবুল হিকাম আমর ইবনে হিশাম আমার অর্থ খেয়ে ফেলেছে। আপনারা আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করুন। কিন্তু সবাই নীরব রইলো। কেউ এগিয়ে এলো না। তারা তখন তিরস্কার করে রাসূলকে দেখিয়ে বললো, আরে বোকা শোনো, ঐ যে ঐ লোকটিই তোমার প্রাপ্য অর্থ আবুল হিকামের থেকে আদায় করে দিতে পারবে। রাসূল তখন তাদের থেকে অদূরে অবস্থান করছিলেন।

লোকটি তখন রাসূলের নিকট এলেন। বললেন, আমর ইবনে হিশাম আবুল হিকাম আমার অর্থ খেয়ে ফেলেছে। আপনি কি আমার অর্থ আদায় করে দিতে পারবেন?

রাসূল বললেন, হ্যাঁ পারবো। আমার সাথে এসো। রাসূল তাকে নিয়ে আবু জাহেলের বাড়িতে গেলেন। তাকে ডাকলেন। আবু জাহেল বেরিয়ে এলো। রাসূল বললেন, এই লোকটিকে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আবু জাহেল কাঁপতে কাঁপতে ঘরে প্রবেশ করলো এবং প্রাপ্য অর্থ এনে দিয়ে দিলো। মক্কার সর্দাররা দূর থেকে তা অবলোকন করলো। পরে তারা তাকে বললো, আবুল হিকাম! তোমার কী হয়েছিলো? কী ঘটেছিল? আবু জাহেল বললো, লাতের কসম করে বলছি, আমি তার মাথার উপরে এক ভয়ংকর উষ্ট্রের ব্যাদান মুখ দেখতে পেলাম। উষ্ট্রটি যেনো আমাকে গিলে ফেলতে চাচ্ছে।

তাই বলছিলাম, মজলুমের যুলুম দূর করা মুসলমানদের দায়িত্ব। তুমি কি একবার চিন্তা করে দেখেছো, তোমার প্রতিবেশী যদি খৃস্টান নারী হয় আর কেউ যদি তার উপর দৈহিক অত্যাচার করতে চায়, তাহলে কি তোমার দায়িত্ব নয় যে, তুমি তাকে রক্ষা করবে!

তাকে সেই জুলুম থেকে বাঁচাবে। তুমি চিন্তা করেছো কি যদি তোমার প্রতিবেশী অগ্নিপূজক হয় আর সে ক্ষুধার্ত থাকে বা বিবস্ত্র থাকে বা তার স্ত্রী বিবস্ত্র থাকে বা ছোট ছোট মেয়েরা প্রচণ্ড গরমে খালি পায়ে চলাফেরা করার কারণে পায়ে ফোসকা পড়ে যায় আর তোমার স্বচ্ছলতা আছে। তুমি ইচ্ছে করলে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারো। তাহলে কি তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা তোমার দায়িত্ব নয়?

তাহলে ঐ জাহিল সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যারা তোমার মতোই মুসলমান। তোমার মতোই তারা কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে। তুমি তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিতে পারবে না। তাহলে তুমি কিভাবে এতো দুঃসাহসী হলে? কিভাবে বলো, তুমি আল্লাহকে ভয় করো। সাবধান এদের জন্য ধন-সম্পদ জমা করো না। রাসূলের এ কথাটি কি একবার হৃদয় দিয়ে ভেবে দেখেছো–

لقدْ شَهِدتُ فِي بيتِ عبدِ اللهِ بن جدعانَ حِلفًا، ما أحبُّ أنْ يكونَ لي به حمرُ النَعَم و لو دُعيتُ إليه في الإسْلامِ لأجَبتُ ـــ

অর্থ : আমি প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের গৃহে উপস্থিত ছিলাম। আমি চাই না যে তার বিনিময়ে আমাকে লাল উট দেয়া হোক। ইসলামের আবির্ভাবের পর যদি আমাকে ডাকা হতো, তাহলে অবশ্যই আমি সে ডাকে সাড়া দিতাম। তাই মুসলমানের দায়িত্ব হলো মজলুমের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা।

একবার এক ঘটনা ঘটলো। মদীনায় এক বর্ম চুরি হলো। চুরি করলো তুমা ইবনে উবাইরাক। সে ছিল মুনাফিক। নামায পড়তো। রোযা রাখতো। তুমার আত্মীয়-স্বজনরা এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তুমা এ বর্ম চুরি করেনি। বরং ঐ ইহুদী তা চুরি করেছে। চুরির দায়ে ইহুদী অভিযুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু বিষয় গড়াতে গড়াতে অবস্থা এমন হলো যে, তুমার চুরির বিষয়টি ফাঁস হওয়ার উপক্রম হলো।

তখন তুমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়রা রাতের অন্ধকারে এক কাজ করলো। তারা বর্মটি ও বর্মর সাথে চুরি যাওয়া আটার থলেটি নিয়ে ইহুদীর বাড়িতে রেখে এলো। আর মাঝপথে থলেটি একটু ছিদ্র করে দিলো। ফলে পথে পথে আটা পড়ার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে রইলো। সকালে এ চিহ্ন ধরে বর্মের মালিক ইহুদীর বাড়িতে গিয়ে

উপস্থিত হলো এবং বর্ম ও আটার থলে সেখানে পেলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু শুনে ইহুদীকে মিথ্যাবাদী মনে করার ও তাকেই দোষী সাব্যস্ত করার চিন্তা করলেন। কিন্তু আল্লাহ চাইলেন না যে, এক অসহায় ইহুদী নির্যাতিত ও মজলুম হোক। তখন তিনি ইহুদীর পবিত্রতা ও নির্দোষিতা প্রমাণ করে দশটি আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

ভাইয়েরা আমার! আল্লাহর জমীনে ইনসাফ কায়েম করা এ ধর্মের নির্দেশ। সকল ধর্মের নির্দেশ। সকল ধর্মের বিধান। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ○

অর্থ : আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যেনো মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করে। (সূরা হাদীদ ঃ ২৫)

অন্যত্র বলেন–

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

অর্থ : কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করো না। তোমরা সুবিচার করো। এটাই খোদা-ভীতির অধিক নিকটবর্তী। (সূরা মায়েদাঃ ৮)

যারা এই ধর্মের তবীয়ত ও প্রকৃতি বুঝে না, আর এখান থেকে এক আয়াত আর ঐখান থেকে এক আয়াত মুখস্থ করে নেয়. তারা শরী'আতের ব্যাপক উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারবে না। তোমাকে ডেকে বলবে, আরে তুমি কী বলছো? অমুক হাদীসে তো একথা বলা হয়েছে। এভাবে তারা একগুঁয়েমী ভাব অবলম্বন করবে। আমি তাদের বলি, ভাই! তোমার কথা সত্য। কিন্তু কিছু বিষয় এমন আছে, যা ব্যাপকভাবে কল্যাণকর। ইসলাম ধর্ম তা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসেছে। সেগুলোর শীর্ষে হলো যুলুমকে উৎখাত করা। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।

সে হিসাবে বলছি, আফগান জাতি কি মজলুম নয়? মু'মিন নারীদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা- যদি তারা মু'মিন নারী নাও হয়, তাহলেও কোন ধর্মে, কোন বিধানে, কোন আইনে তা বৈধ? এক রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্রে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয়।

তাই বলছি, যদি আমাদের সামর্থ্য থাকে, আমরা যদি মজলুমদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে পারি; অথচ আমার তা না করি, তাহলে আমরা অপরাধী সাব্যস্ত হবো। এটাই ইসলামের শিক্ষা, এটাই মানবতার শিক্ষা।

রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যখন সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাড়িতে ছুটে এলেন, তখন হযরত খাদীজা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেছিলেন, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'আলা কিছুতেই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। অতিথিকে আপ্যায়ন করেন। দুর্যোগ ও বিপদাপদে মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন।

এটা হলো মানবতার দাবী। এটা হলো প্রকৃতির দাবী। আচ্ছা, যদি আপনি কোন লোককে দেখেন- যদিও সে মুসলমান, নামায পড়ে, রোযা রাখে, আপনি দেখলেন সে এক ইহুদী, খৃস্টান, অগ্নিপূজক বা মুশরিকের শিশুপুত্রকে ছুরি দ্বারা হত্যা করতে চাচ্ছে, তাহলে কী শরী'আতের বিধান মতে সেই শিশুকে রক্ষা করা আপনার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে না? নিশ্চয়ই ওয়াজিব হয়ে যাবে। এগুলো এমন কিছু বিষয়, যা ইসলাম ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে। যা কখনো এ দীন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। যেমন, আমানতের মাল মালিকের নিকট পৌছে দেয়া ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কখনো তা ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

হিজরতের সেই ভয়াবহ রাতের কথা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যখন হত্যা করতে মক্কার সবাই একমত। শাণিত তরবারী নিয়ে যখন তারা রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহ পরিবেষ্টন করে ফেললো, সেই ভয়াবহ লোমহর্ষক মুহূর্তে রাসূল আমানতের মাল মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়ার কথা ভুললেন না। আলী (রাঃ) কে তার বিছানায় শুইয়ে দিলেন। যেনো আমানতের মাল পৌঁছে দিয়ে তারপর হিজরত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ○

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেনো তোমরা আমানতের মাল তার মালিকের নিকট পৌঁছে দাও। (সূরা নিসাঃ ৫৮)

বনু আব্দুদ দারের সরদার ছিলেন উসমান ইবনে শাইবা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করতে ইচ্ছে করলেন। তখন বাইতুল্লাহর চাবি উসমান ইবনে শাইবার নিকট ছিল। তখন উসমান ইবনে শাইবা তাকে বাঁধা দিয়ে বললো, তুমি কা'বায় প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমানকে বললেন, হে উসমান! সেদিন তোমার অবস্থা কেমন হবে যেদিন কা'বার চাবি আমার হাতে থাকবে। আমি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে দিতে পারবো। উসমান বললো, তাহলে সেদিন কুরাইশ লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে। তারপর সময়ের পরিবর্তন ঘটলো। মক্কা বিজয় হলো। হযরত আলী (রাঃ) এলেন এবং উসমান ইবনে শাইবার নিকট চাবি চাইলেন। তখন আলী (রাঃ) তার হাত মোচড় দিয়ে তার থেকে চাবি নিয়ে নিলেন। রাসূলকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কে বাইতুল্লাহ রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি পান করানো- এ দু'টি কাজ দিয়ে দিন। কা'বার চাবি আমাদের দিয়ে দিন। তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) অবতরণ করলেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হলো-

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ○

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা তোমাদের আমানত তার মালিকের নিকট পৌঁছে দাও।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাবিগুলো নিজ হাতে নিলেন এবং উসমানকে বললেন, এ চাবিগুলো নাও। চিরদিন তা তোমাদের মাঝে থাকবে। আজ পর্যন্ত শাইবার সন্তানদের নিকট কা'বার চাবি সংরক্ষিত আছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা তার বংশের নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

তাই বলছিলাম, ধর্ম কী? কেন ধর্ম দুনিয়াতে এসেছে? ধর্ম দুনিয়া থেকে সর্ব প্রকার জুলুম দূর করার জন্য এসেছে। আজ দুনিয়াতে একটি জাতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হচ্ছে। ট্যাংক আর কামানের গোলার আঘাতে তারা হারিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা কোন ধর্মে আছি? আমরা কিসের দিকে তাকিয়ে আছি? যদি তারা মুসলমান নাও হতো আর আমরা দেখতাম তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করছে বা অন্যায়ভাবে বোমার আঘাতে তাদের নিঃশেষ করে দেয়া হচ্ছে, তাহলেও আমাদের ক্ষমতা থাকলে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা ইসলামের বিধান।

হাকীম ইবনে হিজাম। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর চাচা ছিলেন। একশত বিশ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। ষাট বছর তিনি মুসলমান অবস্থায় বেঁচে ছিলেন। আর ষাট বছর জাহেলী যুগে কাটিয়েছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাকীম ইবনে হিজাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন–

أيْ رسولَ اللهِ! أرأيتَ أمورًا كنتُ أتحنَّثُ بها في الجاهليَّةِ من صدقةٍ أو عتاقةٍ أو صلةِ رحمٍ، أفيها أجرٌ؟

فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أسلمتُ على ما أسلفتُ من خيرٍ —

অর্থ : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এমন আমলসমূহের কথা ভেবে দেখেছেন যা আমি জাহেলী যুগে শুনেছি অর্থাৎ দান-সদকা, দাস-মুক্তি, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা, এগুলোতে কি পুণ্য আছে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি বিগত দিনগুলোতে যেসব পূণ্যের কাজ করেছো তা সহকারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছো।"

হাকীম ইবনে হিজাম (রাঃ) জাহেলী যুগে একশত গোলাম আযাদ করেছিলেন। অসহায় পথচারীদেরকে একশত উট দান করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করার পরও তাই করেছেন।

হাদীসের ব্যাপক অর্থে তো এ কথাই বুঝে আসে যে, জাহেলী যুগের আমলের সওয়াব সে পাবে। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) এর আরেকটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন– তার অর্থ হলো তুমি জাহেলী যুগে যে পূণ্যের কাজ করেছো আল্লাহ তা কবুল করুন। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে এটা দূরে নয় যে, ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ তার সওয়াব দিবেন যেমন জাহেলী যুগে যে পাপ করেছিলে তা বিমোচিত হয়ে যায়।

হ্যাঁ, যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তওবা না করে বরং কাফের অবস্থায় ইন্তিকাল করে; তাহলে সে কোনো সওয়াব পাবে না। তবে যদি কাফের অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার পুণ্যময় আমলগুলো তার কোনো উপকার করবে, না করবে না? এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ বলেছেন– তার আযাব লঘু করা হবে। কেউ কেউ বলেছেন– লঘু করা হবে না।

তাই বলা হয়, যে কাফের পাপ কাজ করে, যিনা করে, মিথ্যা বলে, চুরি করে, জুলুম করে, অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করে সে কাফেরের আযাব ঐ কাফেরের আযাবের চেয়ে বেশী হবে, যে এ ধরনের পাপ করে না। তাই বলা যায়, প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের শাস্তি গর্ভাচেবের শাস্তির চেয়ে কম হবে। কারণ, রুশ প্রেসিডেন্ট গর্ভাচেব প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের চেয়ে মুসলমানদের বেশী হত্যা করেছে। কিছুদিন পর আমেরিকার অবস্থা তাই হবে। তখন পৃথিবীতে আমেরিকাই মুসলমানদের বেশী হত্যা করবে।

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আরেকটি উপমা দিচ্ছি। মনে করো, সুইজারল্যান্ডের শাসক কাউকে হত্যা করে না। কারো রক্ত নিয়ে হোলি খেলে না। অন্যায়-অত্যাচার করে না। এর শাস্তি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের চেয়ে কম হবে। আর রিগ্যানের শাস্তি রুশ প্রেসিডেন্ট গর্ভাচেবের চেয়ে কম হবে। আর সবচেয়ে বেশী শাস্তি হবে রুশ প্রেসিডেন্ট গর্ভাচেবের।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ○

অর্থ : যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে প্রতিহত করেছে, শাস্তির উপর তাদের শাস্তি আমি বৃদ্ধি করবো। যেহেতু তারা ফাসাদ সৃষ্টি করতো। (সূরা নাহল ঃ ৮৮)

অন্যত্র বলেন–

(٤٢) مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ○ (٤٣) قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ○ (٤٤) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ○ (٤٥)
وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ○ (٤٦) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ○

অর্থ : বলা হবে, তোমরা কিসের কারণে জাহান্নামে এসেছো? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না। মিসকিনদের আহার দিতাম না। সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনা করতাম। আর প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৪২-৪৬)

হ্যাঁ, এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করলেই জাহান্নামে যাবে। যদি তাই হয় তাহলে নামায না পড়া, আহার না দেয়া আর সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় যোগ দেয়া এ কারণগুলো উল্লেখ করার কারণ এই যে, এগুলোর কারণে তাদের শাস্তি গুরু করা হয়েছে। তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছে।

তাই কাফের হিসেবে উৎবা ইবনে রবী'আর সাথে আমাদের আচরণ আবু জাহেলের সাথে আমাদের আচরণের মতো হবে না। কারণ আবু জাহেল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إنَّ لكلِّ أمة فرعونٌ و هذا فرعونُ هذه الأمة —

অর্থ : নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির জন্য একজন ফেরআউন রয়েছে আর এই লোকটি(আবু জাহেল) এই জাতির ফেরআউন।

আর উৎবা ইবনে রবী'আ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إنْ يكنْ فيهم خيرٌ ففي صاحبِ هذا الجملِ —

অর্থ : যদি তাদের মাঝে কোন কল্যাণ থাকে তাহলে এই লাল উটের মালিকের মাঝে আছে।

হাবশার বাদশাহ নাজ্জাসী একজন কাফের আর আবু জাহেলও একজন কাফের। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজ্জাসী সম্পর্কে বলেছেন–

اذْهبُوا إلى هذا الرجلِ ، فإنَّه لا يُظلمُ أحدٌ عندَه —

অর্থ : তোমরা এই লোকটির(নাজ্জাসী) নিকট গমন করো। কারণ তার নিকট কেউ মজলুম হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তায়েফ থেকে বিতাড়িত নির্যাতিত হয়ে আবার মক্কায় ফিরে এলেন, তখন মুতআম ইবনে আদী তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাই বদরের দিনে যখন মুসলমানরা সত্তর জন কাফেরকে বন্দী করলো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

لوكانَ المطعمُ بنُ عديٍّ حيًّا و سألَني هولاء لتركتُهم له —

অর্থ : যদি মুত'আম ইবনে আদী জীবিত থাকতেন আর আমার নিকট এদের মুক্তি কামনা করতেন, তাহলে আমি তাদের মুক্তি দিয়ে দিতাম।

তাই মুসলমানদের আচরণ কাফেরদের সাথে বা অমুসলিমের সাথে কেমন হবে তা নির্ধারিত হবে মুসলমান ও ইসলাম ধর্মের সাথে তার আচার-আচরণের অবস্থা দেখে।

সুতরাং কেউ যদি মুসলমানদের নির্মমভাবে নির্যাতন করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বাঁধা প্রদান করে, তাকে কিছুতেই ক্ষমা করা যাবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার এগার জন কাফেরের সম্পর্কে মক্কা বিজয়ের সময় ঘোষণা করেছিলেন–

اُقتلُوهم و لَو وَجَدتُموهم معلَّقينَ بأستارِ الكعْبة —

অর্থ : তাদের হত্যা করো। যদিও তাদেরকে ক্বা'বার চাদর ধরে ঝুলে থাকতে দেখো।

বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে খাতালকে মক্কা বিজয়ের দিবসে কাবার চাদর ধরে রাখা অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিলো।

রাসূল এ কঠিন ঘোষণা কেন দিয়েছিলেন? কেননা তারা মুসলমানদের নির্মমভাবে নির্যাতন ও নিপীড়ন করেছিল ও ইসলামের অগ্রযাত্রায় প্রবল বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ জন্য রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালেব সম্পর্কে বর্ণিত আছে, ইমাম মুসলিম আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন– আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু তালেব আপনাকে ঘিরে রাখতো। আপনাকে সাহায্য করতো। এগুলো কি তাকে কোনো উপকার করবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ উপকার করবে।

মুসলিমের আরেক বর্ণনা মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছেন–

لعلَّه تنفعُ شفاعتِي يومَ القيامةِ فيُجعل في ضَحْضَاحٍ مِن النارِ يبلغُ كعبَيه يَغْلي منهما دماغُه —

অর্থ : হয়তো কিয়ামত দিবসে আমার সুপারিশ তাকে উপকার করবে। তাকে জাহান্নামের আগুনের মাঝে রাখা হবে যা তার টাখনু পর্যন্ত পৌঁছবে। যার কারণে তার মাথার মগজ টগবগ করতে থাকবে।

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لوْلا أنا لَكانَ فِي الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النارِ —

অর্থ : যদি আমি না হতাম তাহলে অবশ্যই তিনি জাহান্নামের অতল গহ্বরে থাকতেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পরকালে তারা তাদের পূণ্যের প্রতিদান পাবে না। এবং তা তাদের পক্ষ থেকে কবুলও করা হবে না। আর দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার বিনিময় দিবেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদী ইবনে হাতেমের মেয়ে সাফফানা সম্পর্কে বলেছেন–

لو كانَ أبوكَ مُسلمًا لترحَّمنا عَليه —

অর্থ : যদি তোমার পিতা মুসলমান হতেন তাহলে অবশ্যই আমরা তার প্রতি দয়া-পরবশ হতাম।

তারপর রাসূল বলেছিলেন–

اِرْحَمُوا عزيزَ قومٍ ذُلَّ و غَنيًّا افتَقَرَ و عَالمًا ضَاعَ بينَ الجُهَّالِ —

অর্থ : তোমরা এমন গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিকে দয়া করো যে গোত্র লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়ে গেছে। এমন ধনী ব্যক্তির প্রতি দয়া কর যে দরিদ্র হয়ে গেছে। এবং এমন আলেমের প্রতি দয়া কর যে অজ্ঞ লোকদের মাঝে হারিয়ে গেছে।

কেউ তার গোত্রের মাঝে সম্মানিত ছিল। আফগানিস্তানে বাদশাহ ছিল। তাকে লোকেরা বাদশাহ অমুক, বাদশাহ অমুক বলে ডাকতো বা এলাকার সরদার ছিলো। অথচ এখন তার এমন অবস্থা যে খাবার পর্যন্ত পায় না। এক টুকরো রুটিও পায় না। এ অবস্থায় মানবতা হলো, তার প্রতি দয়ালু হওয়া। বিশ্বাস করো, আমি তাদের বাড়িতে প্রবেশ করেছি। একেকটা বাড়ি প্রাসাদ তুল্য। তার পাদদেশ দিয়ে নহর প্রবাহমান। চারদিকে আঙ্গুর, আপেল ইত্যাদি ফলের বাগান। ফল ঝুলে আছে। কক্ষ থেকে জানালা খুলে হাত বাড়ালেই ফল নিয়ে খেতে পারবে।

সে সময় আমার মনে এ কথাই এসেছিল। হায়! এ বাড়ির অধিবাসিনী কোথায়? তারা এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। পুলিশ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাথার উড়নী রাস্তায় পড়ে যাচ্ছে। এই তো হলো অবস্থা। কোনো মানুষ বিশ্বাস করবে না এখানে কোন মানুষ থাকতো। ময়লা-আবর্জনা আর ধূলো-বালিতে তা ছেয়ে আছে।

আজ আমরা নির্দয় হয়ে গেছি। হৃদয় আমাদের পাষাণ হয়ে গেছে। আমরা কারো দুঃখে দুঃখিত হই না। কারো শোকে শোকাতুর হই না। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে ছিলেন। আর তার সামনে আকরা ইবনে হারেস (রাঃ) ছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এক নাতিকে চুমু খেলেন। তখন আকরা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি আমার দশজন সন্তান রয়েছে। আমি তাদের কাউকে চুমু খাইনি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

ما أصنعُ لكَ إذا كانَ اللهُ قد نَزعَ الرحمةَ مِنْ قلبِك —

অর্থ : আমি কি করতে পারি যদি আল্লাহ তোমার হৃদয় থেকে রহমতকে ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন।

জনৈক কবি একটি চমৎকার ছন্দ পাঠ করেছিলেন–

أمُـــورٌ لو تأمَّلهنَّ طفــلٌ لطفَل في عوارِضِه المشيبُ

أتُسبى المسلماتُ بكلِّ ثَغرٍ و عيشُ المسلمينَ إذًا يَطيبُ

অর্থ : এমন কিছু বিষয় রয়েছে যদি শিশু তা নিয়ে চিন্তা করে, তবে তার গণ্ডদেশে বার্ধক্য বিকশিত হবে। প্রত্যেক সীমান্তেই কি মুসলিম নারীরা বন্দী হবে আর মুসলমানরা সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাবে।

كيفَ القرارُ و كيفَ يَهْدأُ مسلمٌ و المسلماتُ مع العدوِّ المعتدِي

القائــلاتُ إذَا خشينَ فضيــحةً حُهــدُ المقالــةِ ليتَــنا لم نُولَــدُ

অর্থ : কিভাবে নিশ্চিত থাকা যায়, কিভাবে মুসলমান শান্ত হয় অথচ মুসলমান নারীরা আক্রমণকারী শত্রুদের সাথে রয়েছে।

ঘুমন্ত নারীরা যখন নির্যাতন-নিপীড়নের ভয় করে ও বেদনার্ত কণ্ঠে বলে, হায়! যদি আমাদের জন্মই দেয়া না হতো। তারা কি জানে না, সকল ফকীহ এ কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন মুসলমান নারীকে পৃথিবীর দূর পূর্বপ্রান্তে ছিনিয়ে নেয়া হয় তাহলে পৃথিবীর দূর পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত মুসলিম জাতির উপর ওয়াজিব তাকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে যাওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ إِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ○

অর্থ : আর তাদের অর্থ কবুল না হওয়ার এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে বিশ্বাস করে না। অলসতার সাথে নামাযে আসে। সঙ্কুচিত মনে ব্যয় করে।

এগুলোই হল তাদের আমল কবুল না হওয়ার কারণ। এক. তারা কাফের আর সৎ ও পূণ্যের কাজ কাফের থেকে কখনো কবুল হয় না। কেননা নিয়ত হল আমলের জন্য শর্ত। আর ঈমান হল আমল কবুল হওয়ার জন্য শর্ত।

و لا يأتونَ الصلوةَ إلاَّ و هم كُسَالى ،

তারা অলসতার সাথেই নামাযে আসে। তাদের প্রত্যেকটি কাজ লোক দেখানোর জন্য। ঈমানের কারণে উজ্জীবিত হয়ে তারা কোন আমল করে না। কোন অনুভূতি বা চেতনার কারণে তারা নামাযে আসে না।

আর যাকাত প্রদানের সেই একই কারণ। সঙ্কুচিত মনে অপারগ হয়েই তারা দান-সদকা করে। যাকাত প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا ○

আর কিছু মরুর লোক আছে তারা দায়গ্রস্ত হয়ে বোঝা মনে করে দান করে। আর তোমাদের জন্য দুর্যোগ অর্থাৎ যুদ্ধে পরাজয়ের অপেক্ষা করে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

যুগের নিকৃষ্ট বিপর্যয় তাদের উপরই রয়েছে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

তাই বলছি, সমাজ যদি ঈমানের উপর না চলে তাহলে সব কিছুই নিঃসাড় হয়ে যায়। অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়। প্রাণহীন চিত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। নেতৃস্থানীয় লোকেরা বেলুনের মত বায়ুপূর্ণ হয়ে যায়। কোন কাজে আসে না। টেলিভিশন, রেডিও ও পত্রিকার ন্যায় প্রচার মাধ্যমগুলো শুধুই তাদের ফুলাতে থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে তারা অনেক বড় হয়ে যায়। অথচ তুমি তার মুখটি ছেড়ে দিলে, বা তার বাঁধন খুলে দিলে বা সূঁই দিয়ে একটু খোঁচা দিলে তার মধ্যকার সব বাতাস বেরিয়ে যাবে। একটি নিষ্প্রাণ চুপসে যাওয়া বস্তু হিসেবে পড়ে থাকবে। তখন আর তার কোন আকর্ষণ থাকবে না। তাকে নিয়ে কোন হৈ-হুল্লোড় হবে না। প্রচার প্রচারণাও হবে না। এ ধরনের লোকেরা সাধারণ মানুষের চোখে বড় হয়ে থাকে। এরা বিশাল বিশাল সেমিনারে বা রাষ্ট্রীয়

গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে, সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে থাকে। অথচ তার বক্তব্যের মর্ম সে জানে না। অন্যে তার বক্তব্য লিখে দেয় আর সে তা পাঠ করে জনগণকে শুনিয়ে দেয়। মানুষ শ্রবণ করে আর তার বুদ্ধির প্রশংসা করে। জ্ঞানের স্তুতি করে। সাবাস দেয়। জিন্দাবাদ দেয়। ঘোষণা হতে থাকে, অমুক নেতা কিছু দিনের মধ্যেই জাতির জন্য বিধান লিখছেন। জাতিকে শান্তির চাদোয়া তলে পৌঁছাবেন। এভাবে তারা তাকে ফুঁ' দিয়ে ফুলাতে থাকে। এক সময়ে সে পৃথিবীতে ইলাহের স্থান দখল করে নেয়। পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া বিধানের স্থান দখল করে নেয়। অথচ এ লোকটার এমন কী মর্যাদা আছে? সে তো দিক নির্দেশনা দিতেই অক্ষম। সঠিক পরামর্শ দিতেই অক্ষম।

এই যে হাফেজ আসাদ। তার কথাই বলি। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন সে সেনাবাহিনীর একজন অফিসার। প্যান্টের উপর সেনাবাহিনীর জামা পরে চলাফেরা করত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিরাপদে নির্বিঘ্নে যাতায়াতের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাশিতে ফুঁ দিত। ১৯৬২ সালে তার এই অবস্থা ছিল। তারপর হঠাৎ সে সেনাবাহিনীতে এক গুরুত্বপূর্ণ অফিসার হয়ে গেল। ধর্ম ও ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী তার সম্পর্কে একবার বলেছিল, আমি কসম করে বলছি, সে সারা রাত জেগে ইবাদতে মশগুল থাকে। তাই ক্ষমতার বিষয় নিয়ে যখন তার ও তার ভাইদের দ্বন্দ্ব হল তখন তার ভাইদের বন্দি করে তার সম্মুখে উপস্থিত করা হল। তখন সে বলেছিল, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি একজন মুসলমান। আমি জুম'আর নামায পড়ি। ঈদের নামায পড়ি। মীলাদ মাহফিলের নামায পড়ি। সে ধারণা করেছিল, মীলাদ মাহফিলের বুঝি নামায আছে। তাই বলছিল, আমি মীলাদ মাহফিলের নামায পড়ি অথচ তোমরা আমাকে অমুসলিম ধারণা করছো।

এটা হলো আমাদের ফুলানো সমাজ। এ সমাজ অত্যন্ত দুর্বল। এ সমাজ ক্ষণভঙ্গুর।

এদের উপমা ঐ পোকার ন্যায় যা মানুষের খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। অথবা মশা বা ছারপোকার ন্যায় যা মানুষের রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে। এ ধরনের লোকেরা ক্ষমতায় থাকলে তাদের প্রত্যেকটি কথা পবিত্র বিধান বলে বিবেচিত হয়। আর ক্ষমতা ছুটে গেলে তাদের কোন মূল্য থাকে না। যেমন আব্দুন নাসের। ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর যারা তাকে পেয়ে আনন্দিত হত, ঢোলতবলা বাজাতো তারাই তার নিন্দা করতে লাগল। দোষ চর্চা করতে লাগল। এরা কার্টুনের মত নির্জীব। ফুঁ দিলে উড়ে যায়। তাই ইহুদীরা তাকে এ ফুঁ দিল আর অমনিই উড়ে গেল। এদের ব্যাপারেই জনৈক কবি বলেছেন–

أَسَدٌ عليَّ و في الحروبِ نُعامةٌ

এরা আমার ব্যাপারে সিংহ আর রণক্ষেত্রে উটপাখি। অর্থাৎ এরা অসহায় মিসকীন মানুষের সাথে সিংহের মত নির্মম আচরণ করে। অথচ কার্যক্ষেত্রে এরা দারুণ ভীরু।

সাধারণ মানুষ একটি চমৎকার প্রবাদ বাক্য বলে থাকে–

الناسُ يَضْربونَني و أنا أضربُ امْرأتِي

অর্থ : মানুষ আমাকে মারে আর আমি আমার স্ত্রীকে মারি।

এ ধরনের ভীরু মুনাফিকদের, এ ধরনের কাপুরুষ কাফিরদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ○

অর্থ : সুতরাং তাদের ধনসম্পদ, তাদের ছেলে সন্তান যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ চান তাদেরকে তা দ্বারা পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে। এরা এ অগণিত সম্পদ দিয়ে কী করে? জুয়া খেলে। এক রাতেই মিলিয়ন মিলিয়ন হারিয়ে পাগল হয়ে যায়। ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এইডসে আক্রান্ত হয়। নানা রোগ তাদের কুঁড়ে কুঁড়ে খায়।

এদের করুণ পরিণতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজের রজনীতে দেখেছেন। এরা নিজেদের স্ত্রীদের ত্যাগ করে অন্য নারীদের সাথে যৌনাচারে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা এদের মন মানসিকতা বিকৃত করে দিয়েছেন। এদের রুচি বিকৃত করে দিয়েছেন। এদের অবস্থা দেখলে মনে হবে এরা পাগল; এরা বিকৃত মস্তিষ্ক। আল্লাহ তা'আলা এদের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ○

অর্থ : শয়তানের ছোঁয়ায় যাদের মস্তিষ্কে বিকৃতি হয়েছে এরা তাদের মতই চলাফেরা করে।

এদের একজনের এক ঘটনা পড়েছি। লোকটি এক সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে। মেয়েটি এক ধনবান ইংরেজের হোটেলে চাকুরী করে। দায়িত্ব মদ পরিবেশন করা। লোকটি ছয় হাজার মিলিয়ন ডলারের মালিক। লোকটির নাম ছিল মুহাম্মদ।

বিয়ে করার পর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকা গেল। কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই বুঝল এ স্ত্রীকে দিয়ে তার চলবে না। আর চলবে কীভাবে। রাতে গিয়ে হোটেলে থাকে। কতকিছুই করে তার কী কোন ঠিক আছে। লোকটি তাকে তালাক দিল। বিচার উঠল বিচারালয়ে। বিচারক ফায়সালা করল, স্বামীকে তিন হাজার মিলিয়ন ডলার দিতে হবে। সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদের অর্ধেকই সেই বেশ্যা নারীকে দিয়ে দিতে হলো।

এদের অবস্থা এমনই হয়। কখনো এর চেয়েও করুণ হয়। কখনো ধনসম্পদের কারণে জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি জীবন কাটাতে হয়। ধুকে ধুকে সেখানেই তাদের মরতে হয়।

এদের চরিত্র হলো এরা মু'মিনদের সুখের সময়, স্বচ্ছলতার সময় তাদের সাথে থাকতে চায়, আর বিপদে-মুসিবতে থাকতে চায় না। তাদের এ চরিত্রের কথা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ○

অর্থ : এরা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলে, নিশ্চয় তারা তোমাদের সাথে আছে। অর্থাৎ তারা এসে বলে, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে মহব্বত করি। তুমি আমার প্রিয় ব্যক্তি। আমার মান্য ব্যক্তি। তুমি যখন ক্ষমতায় থাক বা সম্পদের অধিকারী থাক তখন এসব কথা সুন্দর করে বলবে।

আর যখন অবস্থা পাল্টে যাবে তখন তাদের অবস্থাও পাল্টে যাবে। তখন তারা سَلَقُوكُم بِألسنةٍ حِدادٍ অর্থাৎ ধারালো ভাষায় তোমাদের আঘাত করবে। তোমাদের সমালোচনা করবে।

বলবে, আমি মুজাহিদদের ভালবাসি। জিহাদ আমার চিন্তা চেতনার অংশ ইত্যাদি। কিন্তু মুজাহিদরা পরাজয় বরণ করতে থাকলে তাদের সাথে সকল সম্পর্কের কথা অস্বীকার করবে।

দ্বাবিংশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٥٥) فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ
وَهُمْ كَافِرُونَ ○ (٥٦) وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ○ (٥٧) لَوْ
يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ○ (٥٨) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ
أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ○ (٥٩) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ○ (٦٠) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

অর্থ : (৫৫) সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হলো, এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা আর কুফরী অবস্থায় তাদের মৃত্যুবরণ করা। (৫৬) তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। (৫৭) তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা বা ঠাঁই পেলে সেদিকে দ্রুতগতিতে পলায়ন করবে। (৫৮) তাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা সদকা বণ্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় আর না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। (৫৯) কতোই না ভালো হতো যদি তারা আল্লাহ ও তার রাসূল যা তাদের দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হতো এবং বলতো আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ ও তার রাসূল নিজ করুণায় প্রদান করেন। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ মুখী। (৬০) যাকাত হলো ফকির-মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক। এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

গত মজলিসে আমরা আলোচনা করেছি, কিভাবে কাফেরদের ধন-সম্পদ, তাদের ছেলেসন্তান তাদের জন্য দুনিয়াতে আযাব হবে আর পরকালে আযাব ও আক্ষেপের কারণ হবে।

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ○

নিশ্চয়ই কুরআনের এ আয়াতটি তুমি পড়েছো–

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ চান এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে আযাবে নিপতিত করবেন আর কাফের অবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করবে। অর্থাৎ আল্লাহ চান, তারা কাফের অবস্থায় মৃতুবরণ করবে।

এখানে একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, আল্লাহর চাওয়া এক বিষয় আর আল্লাহ সন্তুষ্ট হওয়া ও তার পছন্দ করা আরেক বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য কুফরী চান কিন্তু কুফরী পছন্দ করেন না, ভালবাসেন না। আল্লাহ তাতে তুষ্ট হন না। এ কথাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ○

অর্থ : আর যদি তোমরা কুফরী কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে মুখাপেক্ষীহীন আর তিনি বান্দার জন্য কুফরীকে পছন্দ করেন না।

তাই বলছিলাম, সন্তুষ্ট হওয়া এক বিষয়, আর চাওয়া ও ইচ্ছে করা আরেক বিষয়। আল্লাহ তা'আলা মন্দ ও কুফরীকেও সৃষ্টি করেন। কিন্তু ঈমান ও হিদায়াতকে ভালবাসেন। তিনি বান্দার জন্য কুফরীকে ভালবাসেন না। এ বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হওয়া দরকার। অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তা বুঝা দরকার। আল্লাহ তা'আলা তার অসীম জ্ঞানের কারণে জানেন যে, তার বান্দা কী কী করবে। আর বান্দার পূর্ণ এখতিয়ার আছে, সে ভাল-মন্দ উভয়ই গ্রহণ করতে পারবে। আর বান্দা কোন কাজ স্বেচ্ছায় করতে চাইলে আল্লাহ তা করার সুযোগ দেন। স্বাধীন এখতিয়ার ক্ষমতার কারণেই আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের শাস্তি দিবেন।

যেমন তুমি একটি বালককে দেখেছো, সে হেঁটে হেঁটে একটি গর্তের দিকে যাচ্ছে। তুমি তখন বলতে পারবে, ছেলেটি এখন গর্তে পড়বে। তার হাত-পা ভেঙ্গে যাবে। অথচ তুমি কিন্তু তা পছন্দ কর না। তবে বান্দার ইলম ও আল্লাহর ইলমের মাঝে পার্থক্য হলো, বান্দার ইলম কখনো ভুল হয় কিন্তু আল্লাহর ইলম কখনো ভুল হয় না। আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন যে অমুক ব্যক্তি মিথ্যা বলবে, চুরি করবে, যিনা করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার ফায়সালা করে রেখেছেন। তবে তাকে ভাল-মন্দ উভয় গ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

তাই বান্দা যখন মন্দ কাজ করার ইচ্ছে করে, ঠিক তখন আল্লাহ আ'আলাও তার থেকে তা হওয়ার ইচ্ছে করেন। ফলে তা হয়ে থাকে। তবে আল্লাহ তার বান্দার জন্য তা পছন্দ করেন না। তাতে সন্তুষ্ট হন না। তাকদীর সম্পর্কে এরচেয়ে বেশী আলোচনা করা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে আর সামনে অগ্রসর হওয়া ঠিক নয়।

وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ○

তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, নিশ্চয়ই তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত।

এই মোনাফেকরা কেন কসম খায়? দুনিয়ার লোভে আর যুদ্ধের ভয়েই এমন করে। ইসলামী রাষ্ট্র যখন বিজয়ের পথে অগ্রসর হতে লাগল তখনই মদীনায় মুনাফেকীর প্রকাশ ঘটল। মুনাফিকদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলেছে, এই ধর্ম বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং এ ধর্মে প্রবেশ করতে হবে। সে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করল, কিন্তু বাহ্যিকভাবে। হৃদয়ে তার ইসলাম প্রবেশ করল না। তারা মুসলমানদের মাঝে ফিৎনা সৃষ্টি করতে লাগল। আর মুনাফিকদের আলামত হলো তারা কথায় কথায় কসম খায়।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُم جنة فَصَدُّوا عَن سبيلِ الله —

তারা তাদের কসম খাওয়াকে আল্লাহর পথে ঢালরূপে গ্রহণ করেছে। ফলে তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে।

মুনাফিকদের চরিত্র হল অন্য রকম। এদের অন্তরে থাকে এক কথা, আর মুখে থাকে আরেক কথা। সর্বদা ভয়াতুর অবস্থায় থাকে। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ভাবে। চামচিকার মতো অন্ধকারে থাকাকেই তারা বেশী পছন্দ করে। সত্যের আলো এলেই তারা পালিয়ে যায়। আত্মগোপন করে থাকে। আখনাক ইবনে শুরাইক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে কসম খেয়ে বলল, সে মু'মিন। তারপর সে বেরিয়ে চলে গেল। পথে একপাল বকরী পেল। নির্দয়ভাবে বকরীগুলোকে মেরে ফেলল। ফসলের জমিগুলো জ্বালিয়ে ফেলল। তারপর পালিয়ে গেল। মুসলিম সমাজে সর্বদা এই মুনাফিকরা ছিল। উমাইয়াদের শাসনামলে ছিল। আব্বাসীদের শাসনামলে তাদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল। এদেরকে যিন্দিক বলে অভিহিত করা হতো। এদের মাঝে আর মুনাফিকদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। যিন্দিকরা মুখে এমন কথা বলে যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা কুফরীকে ভালবাসে আর ইসলামকে অপছন্দ করে। তাই তৎকালীন যুগের বিচারকরা তাদের হত্যার ফায়সালা

করতেন। আব্বাসী শাসনামলে এদের অনেককেই হত্যা করা হয়েছিল। তার সংখ্যা অনেক. সে যুগে অনেক কবি, সাহিত্যিক, লেখক যিন্দিক ছিল। এদের সম্পর্ক আমীরদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। তারা প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলতো। প্রথম সারিতে নামায আদায় করতো। কিন্তু তারা ছিলো মুনাফিক।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ○

অর্থ : তারা কোন আশ্রয়স্থল, গুহা বা ঠাঁই পেলে সেদিকে দ্রুতগতিতে পলায়ন করে। কারণ এরা পাপাচারী। এরা অত্যন্ত দুর্বল। এদের মনোবল বলতে কিছুই নেই। পাপাচার এদের হৃদয়ের মর্যাদাবোধ শেষ করে দিয়েছে। এদের বীরত্ব, এদের পৌরুষ শেষ করে দিয়েছে। এরা সদা-সর্বদা ভয়ে কাঁপে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ○

অর্থ : আর আপনি তাদের মানুষের মাঝে জীবনের প্রতি অধিক আগ্রহী পাবেন।

আমাদের এক প্রতিবেশী ছিল। সে ছিল ইঞ্জিনিয়ার। সে নামায পড়তো না। একদা তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। বললাম, কেন আপনি নামায আদায় করেন না? এরপর কিছুদিন নামায পড়ার পর আবার নামায পড়া ছেড়ে দিলো। তারপর আবার তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। নামাযের কথা বললে সে বললো, আমি নামায পড়েছি। জুম'আর নামাযে শরীক হয়েছি। আপনি বক্তৃতা দিয়েছেন। আমাকে দুঃসাহসী করে তুলেছেন। তারপর আমি কিছু বললে, সরকারের সমালোচনা করলে আমাকে জেলে নিয়ে যাবে। অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করবে। তখন কে আমাকে রক্ষা করবে? কে আমার মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা করবে? এখন ভেবে দেখো, কেমন ভীতু, খুতবা শুনতেও ভয় পায়।

আমাদের আরেক প্রতিবেশী ছিলো। সে ছিলো মদখোর। প্রায় সময় মাতাল হয়ে থাকতো। ইহুদীদের সাথে সম্পর্কের অবনতি হলে তারা আমাদের শহরে আক্রমণ করলো। একের পর এক রকেট এসে শহরে পড়তে লাগলো। আমাদের ঘরের ভূগর্ভে একটি প্রকোষ্ঠ ছিলো। রকেটের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যই তা তৈরী করা হয়েছিল। আমরা সেই প্রকোষ্ঠে নারী ও শিশুদের নিরাপদে রেখে নিজেরা কামরায় অবস্থান করতে লাগলাম।

এই মদ্যপ ব্যক্তিটি ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে ছুটে এলো এবং নিজেকে নারীদের মাঝে নিক্ষেপ করল। নারীরা ঐ অবস্থায় চিৎকার করতে লাগল। কেউ তাকে থু থু দিলো, কেউ তাকে উপরে উঠে যেতে কর্কশ কণ্ঠে হুকুম দিলো। কিন্তু সে নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে রইলো।

আমার স্ত্রী তখন উপরে উঠে এলো। বললো, আমি আর নিচের প্রকোষ্ঠে থাকবো না। কারণ ঐ মদ্যপ লোকটি সেখানে পড়ে আছে। তুমি কি বিশ্বাস করবে যে, লোকটি সেখানে পড়েই মৃত্যুবরণ করেছে? ভয়ে তার হৃদয়তন্ত্রী ফেটে গেছে। আর সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

বিশ্বাস করো! আমরা তখন তাকে সেখান থেকে তুলে এনেছি। জানাযার নামায পড়ে দাফন করেছি। হায় আল্লাহ! তারা কত ভীরু। পাপাচার এদেরকে মেরে ফেলেছে। এদের হৃদয় মরে গেছে। এরা জীবিত থাকলেও মৃত। তাই বলছিলাম, মুনাফিকদের হৃদয় রোগাক্রান্ত। এরা কঠিন কিছুই সহ্য করতে পারে না। এদের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ থাকে না।

উস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুব বলতেন–

الغَيرةُ تُكبتُ أولاً ثم تَذْوِي ، ثم تَضْمَحِلُّ ، ثم تَموتُ ، فإذا مَاتتِ الغيرةُ و انْهدَمَ هذا السدُّ انهارتْ وَرَاءَه جميعُ السُّدُود ــــ

অর্থ : আত্মমর্যাদাবোধ প্রথমে ভেঙ্গে পড়ে। তারপর নির্জীব হয়। তারপর বিলুপ্ত হয়। তারপর মৃত্যুবরণ করে। আর যখন আত্মমর্যাদাবোধ মরে যায় এবং এই প্রাচীরটি ভেঙ্গে যায়, তখন তার পশ্চাতে বিদ্যমান অন্যান্য প্রাচীরগুলোও ভেঙ্গে পড়ে। এ আত্মমর্যাদা না থাকলে মানুষ শীতল জড় পদার্থ হয়ে পড়ে। কোন উপদেশ তার মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আল্লাহর আয়াত শুনে উপকৃত হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস অন্তরে ঝড় তুলে না। মনে হয় এরা খুব বুঝে। আসলে কিছুই বুঝে না। ভালোকে খারাপ মনে করে। তোমার আত্মমর্যাদাবোধকে সুনজরে দেখে না। এরা খুব প্রতিক্রিয়াশীল। কারো প্রশংসা করে বলবে, ঐ লোক তো অত্যন্ত দক্ষ রাজনীতিবিদ। তার অন্তর খুব ভালো। এই ভালো আর দক্ষের অর্থ কি তা জানো? তাহলো, মিথ্যা বলে মানুষকে ধোকা দিতে, অবাস্তব সান্তনা দিতে খুব পারদর্শী। অথচ যে ব্যক্তি বুঝে, পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি রাখে, ভারসাম্যপূর্ণ, তার ব্যাপারে বলে বেড়াবে, সে অদক্ষ, অযোগ্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(৫৮) وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ○

অর্থ : তাদের মাঝে এমন ব্যক্তিও রয়েছে যারা সদকা বণ্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। যদি তা থেকে তাদের কিছু দেয়া হয়, তাহলে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আর যদি না দেয়া হয় তাহলেই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। (সূলা তওবা ঃ ৫৮)

এখানে দু'টি শব্দ রয়েছে। শব্দ দু'টি হলো الهمز ও اللمز ، الهمز অর্থ– কারো অনুপস্থিতিতে, পশ্চাতে দোষারোপ করা। আর اللمز অর্থ– সরাসরি মুখোমুখি দোষারোপ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ অর্থ : প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে দোষারোপকারীদের জন্য রয়েছে ধ্বংস। (সূরা হুমাযাহ ঃ ১)

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হলো, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকার সম্পদ বণ্টন করছিলেন। তখন হারকুয ইবনে যুহাইর নামক এক ব্যক্তি বলল, اعدل يا محمَّد হে মুহাম্মদ! ইনসাফের সাথে বণ্টন কর। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথায় মর্মাহত হয়ে বললেন–

ويحك ، إنْ لم أعدلْ أنا فمنْ يَعدلُ! ؟

অর্থ : ছি! এ কেমন কথা, আমি যদি ইনসাফের সাথে বণ্টন না করি, তাহলে কে ইনসাফের সাথে বণ্টন করবে?

অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, সে বলেছিলো–

هذه قسمةٌ ما أُريدَ بها وجهُ الله —

অর্থ : এটা এমন এক বণ্টন যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যথিত হয়ে বললেন–

رحِم الله أخي موسى ، فقد أُوديَ أكثرَ منْ هذا —

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আমার ভাই মূসার প্রতি রহম করুন। তিনি এর চেয়ে বেশী কষ্ট বরদাশত করেছিলেন।

হারকুয ইবনে যুহাইর এ কথা বললে উমর (রাঃ) বললেন, হে রাসূল! আমাকে একটু সুযোগ দিলে আমি এই মুনাফিকের গর্দান ধরে এখনই নামিয়ে দিচ্ছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন–

دعْه يا عمرُ، حتى لا يُقالَ محمدُ يقتُلُ أصحابَه ، و إنَّ له أصحابًا يحقِّر أحدُكم صلاتَه مع صلاتِه و صيامَه مع صيامِه يمرقُون من الدِّين كما يمرِق السهمُ من الرمِيَّةِ —

অর্থ : হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও, যেন লোকেরা এ কথা না বলে যে, মুহাম্মদ তার সাথীদের হত্যা করে। আর তার তো এমন সাথী রয়েছে যাদের নামায দেখে তোমরা তোমাদের নামাযকে তুচ্ছ মনে কর। যাদের রোযা দেখে তোমাদের রোযাকে তুচ্ছ মনে কর। তারা দীন থেকে বেরিয়ে যায় যেমনিভাবে তীর তুনীর থেকে বেরিয়ে যায়।

হ্যাঁ, এরাই হলো খারিজী সম্প্রদায়। আর এদের পূর্ব পুরুষ হলো হারকুয ইবনে যুহাইর। তাই আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন, আমি এই হাদীসের উপর নির্ভর করে বলছি। খারেজীরা কাফের। এরা ধর্মচ্যুত। এ হাদীসটি পরিপূর্ণভাবে খারেজীদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হয়।

তাই বর্ণিত আছে, যখন দামেস্ক অবরোধ করা হলো এবং কয়েকজন খারেজী নেতাকে ধরে নিয়ে আসা হলো। তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? বলা হলো, এরা খারেজীদের সরদার। তখন তিনি বলতে লাগলেন–

كلاب أهل النار .... كلاب أهل النار .....

এরা তো জাহান্নামীদের মধ্যে বিদ্যমান কুকুর। এরা তো জাহান্নামীদের মধ্যে বিদ্যমান কুকুর।

মনে রাখবে, আরবরা এবং মুসলমানরা খারেজীদের চেয়ে অধিক সাহসী অধিক ইবাদতকারী কাউকে দেখেনি। তারাই ছিল আরবদের মাঝে শীর্ষ সাহসী ও শীর্ষ আবেদ। আবু হামলা শারী তার এক বক্তৃতায় মক্কার লোকদের লক্ষ্য করে বললো, হে মক্কার লোকেরা! তোমরা আমার সাথীদের নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কর। বলে বেড়াও তারা অল্পবয়সী যুবক। আরে এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথীরা তো যুবকই ছিলেন।

হ্যাঁ, তারা যুবকই ছিলেন। যৌবনের দুঃসাহসিকতা ও কৌশল দিয়েই তারা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আর এই খারেজীদের অবস্থাও ঠিক তেমনি ছিল। ইবাদত করতে করতে তাদের পা ফুলে যেত। শরীর শুকিয়ে যেত। রাতের পর রাত জেগে জেগে তারা ইবাদত করত। রাতের আঁধারে যখন তারা জান্নাতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত পাঠ করত, তখন জান্নাতের আশা করত। আর যখন জাহান্নামের বর্ণনা সম্বলিত কোন আয়াত পাঠ করত তখন ভয়ে-আতংকে কাঁদত। রাত-দিন তাদের নিকট ছিল সমান। জনৈক কবি এসব খারেজীদের সম্পর্কে চমৎকার কবিতা রচনা করেছেন। বলেছেন–

فكـــمْ مـــن عينٍ في منقـــارِ طيرِ طالمـــَا بكَى صاحبُها في جوفِ الليل من خَوفِ الليل

অর্থ : পাখির চঞ্চুতে বিদ্যমান বহু চক্ষু এমন রয়েছে, যারা রাতের অন্ধকারে আল্লাহর ভয়ে কাঁদত।

সত্যিই কবি অত্যন্ত সুন্দরভাবে নিখুঁত করে তাদের অবস্থা অংকন করেছেন। এক খারেজী মহিলার নাম গাজালা। মাত্র তিনশ' খারেজী নিয়ে সে কুফায় আক্রমণ করে তা দখল করে নিল। আর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তার পঞ্চাশ বা সত্তর হাজার সৈন্য নিয়ে পালিয়ে গেল। তখন জনৈক কবি হাজ্জাজকে তিরস্কার করে কবিতা আবৃত্তি করে বললো-

هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان لبك في جناحي طائر

أسدٌ عليَّ وَ في الحروبِ نُعامةٌ ربْداءُ تجفّل من صفيرِ الصَّافرِ

অর্থ : হে হাজ্জাজ! তুমি কেন গাজালার সাথে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে গেলে না। মনে হয় তোমার বুদ্ধি তখন পাখির দুই ডানায় ছিল। আমার ব্যাপারে তো তোমাকে সিংহ মনে হয়, অথচ রণক্ষেত্রে তুমি উটপাখি। রণক্ষেত্র বড়ই ভয়ংকর বাঁশির আওয়াজই প্রতিহত করে ফেললো।

সুবহানাল্লাহ! শুধু ইখলাসই যথেষ্ট নয়। সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, খারেজীরা অত্যন্ত মুখলিস ও নিষ্ঠাবান। আর এ কথায়ও কোন সন্দেহ নেই যে, খারেজীরা বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট। তাই শুধু ইখলাস যথেষ্ট নয়। ইখলাসের সাথে ইলমও থাকতে হয়। এ কারণে অনেকে ইখলাস থাকা সত্তেও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

হযরত আলী (রাঃ) খারেজীদের ফিৎনার আগুনে জ্বলে-পুড়ে আক্ষেপের সাথে একদা বলেছিলেন–

قصَمَ ظَهري رَجُلان ، عابدٌ جاهلٌ و عالمٌ فاجرٌ —

অর্থ : আমার মেরুদণ্ড দু'ধরনের লোক ভেঙ্গে ফেলেছে। এক. অজ্ঞ আবেদ দুই. পাপাচারী আলেম। এরা সব যুগে ইসলামের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এদের উপমা ঐ ভল্লুকের ন্যায় যে তার মালিককে হত্যা করেছিল। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি একটি ভল্লুক পালত। ভল্লুকটিকে খুব যত্ন করতো। একদিন তার মুনিব একটি বৃক্ষের নীচে ঘুমাল। একটি মাছি এসে তার চেহারায় বসল। ভল্লুকটি মাছিটিকে তাড়াল। এভাবে কয়েকবার তাড়ানোর পর ভল্লুকটি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এবার ভল্লুকটি মাছি মারার জন্য মনিবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাছিটিকেও মারল। সাথে সাথে তার মুনিবকেও মারলো। এখানে কিন্তু ভল্লুক মাছিকেই মারার ইচ্ছে করেছে। মুনিবকে মারার ইচ্ছে করেনি। বরং তার খেদমত করার ইচ্ছে করেছে। অজ্ঞতা আর বোকামীর কারণে সে তার মুনিবকেও হত্যা করেছে। বর্তমানে আমাদের মাঝেও একদল লোক আছে তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ইসলামের ক্ষতি করে। দরদের সাথে মুসলমানদের ক্ষতি করে।

এই খারেজীদের কথা চিন্তা করো। এরা ইসলামের খেদমতের নামে অত্যন্ত ইখলাসের সাথে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) কে হত্যা করেছে। শহীদ করেছে। হতভাগ্য আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম। তার সম্পর্কেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন–

أشقَى الناسِ اثنان أحيمرُ ثمودَ و رجلٌ يضربُكَ ها هنا فتُبَتِّلُ هذه —

অর্থ : মানুষের মাঝে দুই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী হতভাগ্য- একজন হলো সামূদ জাতির ওহাইমির আর দ্বিতীয় জন হলো ঐ ব্যক্তি যে তোমাকে হত্যা করবে। এই খানে আঘাত করবে এবং তা খণ্ডিত করবে। এই ইবনে মুলজিম হলো হতভাগ্য। কিন্তু খারেজীরা তাকে ভাগ্যবান মনে করে।

জনৈক খারেজী একটি চরণ পাঠ করে বলেছে–

يا ضربةً مِن كَمِيٍّ ما أرادَ بهـا   إلاَّ ليبلغَ من ذي العرشِ رِضْوانا —

অর্থ : হে ঐ ব্যক্তির আয়াত যে লুকিয়েছিল, সে তো তা দ্বারা আরশের অধিপতি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনেরই ইচ্ছে করেছে। এইতো তাদের বুদ্ধি। এই তো তাদের ইখলাস। এদের বুদ্ধি এদেরকে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাল যে এরা মুসলমানদের হত্যা করাকে হালাল বানাল আর কিতাবীদের হত্যা করাকে হারাম বানালো।

একটি ঘটনা বলছি। ওয়াসেল ইবনে আতা বলেন, আমি একদল অনুসারীর সাথে ছিলাম। তখন একদল খারেজীর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। আমি তাদের দেখে বললাম, তোমাদের কেউ তাদের কথার উত্তর দিবে না। আমি দিবো। আমরা তাদের নিকটবর্তী হলে তারা বললো, তোমরা কারা?

আমি বললাম, আমরা আহলে কিতাবের একটি দল।

তারা বললো, তোমরা তোমাদের গন্তব্যে চলে যাও।

তারা আমাদের ছেড়ে দিলো।

আমি বললাম, না আমরা যেতে পারি না। কারণ, কুরআন বলে–

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۝

অর্থ : যদি মুশরেকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দিবে যেনো সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। (সূরা তওবা ঃ ৬)

আমরা আল্লাহর কালাম শুনতে এসেছি।

তারা বললো, হ্যাঁ, তাই হবে। তারা আমাদের কুরআন শুনালো। তারপর নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিলো।

এরা বহুবার আবু হানীফা (রহঃ) কে হত্যা করতে চেয়েছে। তরবারী হাতে নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেছে। কিন্তু হত্যা করতে পারেনি। প্রত্যেকবার তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে বিতর্কে পরাভূত করেছেন ও তাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

একবারের ঘটনা। এরা তরবারী উঁচিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। এদের উদ্দেশ্য আবু হানীফা (রহঃ) কে হত্যা করা। এসে বললো, মসজিদের দরজায় এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। সে জারজ সন্তান জন্ম দিয়েছে। জন্ম দেয়ার সময় সন্তান মরে গেছে। এ মহিলা এখনো মুসলমান রয়ে গেছে, না কাফের হয়ে গেছে।

আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের তরবারী সংযত করো। তাহলেই আমি স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে উত্তর দিতে পারবো।

তারা বললো, বেশ ভালো কথা। এই তো আমরা আমাদের তরবারী দূরে সরিয়ে নিলাম। এই খারিজীরা বিশ্বাস করে, কেউ কবিরা গুণাহ করলে কাফের হয়ে যায়। তখন আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, সে কি খৃস্টান?

তারা বললো, না, সে খৃস্টান নারী নয়।

আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, তাহলে কি সে অগ্নিপূজারী?

তারা বললো, না সে তাও নয়।

আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, তাহলে কি সে ইহুদী?

তারা বললো, না সে ইহুদীও নয়।

আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, তাহলে সে কী?

তারা বললো, তিনি হলেন মুসলিম নারী।

তখন আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, তোমরা তো তার ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছ। তোমরা তাকে মুসলমান বলে সাব্যস্ত করছো।

এভাবে আবু হানীফা (রহঃ) বিস্ময়করভাবে তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতেন।

হযরত আলী (রাঃ) জুম'আর নামাযে খুতবা পাঠের জন্য মিম্বারে উঠলে খারেজীরা দাড়িয়ে যেত। বলতো–

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা যে বিধান দিয়েছেন, সে বিধান মতে যারা বিচার না করে, তারা কাফের। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৪)

তখন হযরত আলী (রাঃ) বললেন–

نحن لا نُقاتلكم حتى تَبدأُونا ، و لا نَمنعُكم أن تَحضُروا مساجدنا —

তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু না করলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। আর তোমাদেরকে আমাদের মসজিদে উপস্থিত হতেও বাঁধা প্রদান করবো না।

তারপর খারেজীরা যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলো, তখন আলী (রাঃ) নাহওয়ানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। একদা হযরত আলী (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো, খারেজীরা কি কাফের?

তিনি বললেন, তারা কুফরী থেকে পালিয়েছে।

তারপর জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি মুনাফিক?

তিনি বললেন, মুনাফিকরা তো আল্লাহ তা'আলাকে খুব কমই স্মরণ করে। আর এরা তো সারারাত জাগ্রত থেকে নামায আদায় করে আর দিবসে রোযা রাখে।

এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে তারা কারা?

তিনি বললেন, এরা আমার ভাই। আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

আমরাও এসব সাহসী যুবকদের ব্যাপারে বলবো, যারা আফগান জিহাদ সম্পর্কে এখানে সেখানে বিভ্রান্তি মূলক কথা বলে বেড়ায়। এদের সম্পর্কে বলবো, এরা আমাদের ভাই। যদিও এরা আমাদের ব্যাপারে অবাস্তব, অসঙ্গত কথা বলছে। হ্যাঁ, আমরা তাদের খারেজী বা এ ধরনের কিছু বলবো না। এখানে আর সেখানে একই কাণ্ড ঘটছে। ইখলাসের সাথে মুসলমানদের কষ্ট দেয়া হচ্ছে।

কবি বলেন–

ولا تغْلُ في شيءٍ من الأمرِ و اقتصدْ كلاَ طرفَي قصدِ الأمورِ مَذمومٌ

অর্থ : কোন ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করো না। এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। বিষয় সমূহের দুই প্রান্তের যে কোন প্রান্ত অবলম্বন নিন্দনীয়।

আসল ব্যাপার হলো, মানুষের নিকট কখনো কখনো আসল বিষয়টি অস্পষ্ট থাকে। আর তা হয় সাধারণত মানুষ যখন দীনী জ্ঞানহীন হয়। অজ্ঞতার মাঝে ডুবে থাকে। আর সেই অজ্ঞ মানুষটি অত্যন্ত কঠোরতার সাথে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে চায়। আমার মনে আছে, মিসরে এক জর্দানী আমাকে খুব ভালবাসত। কায়রোতে থাকতে সে প্রায়ই আমার নিকট আসত। আমি তার ইখলাস ও আমল দেখে ঈর্ষা করতাম। হঠাৎ তার সম্পর্ক শাকরী মুস্তফার দলের সাথে হয়ে গেল। শাকরী মুস্তফা জামা'আতুল মুসলিমীন দলের নেতা ছিল। একদিন সেই লোকটি আমার বাড়িতে এলো। আমি যখন জামাতে নামায পড়াতে ইমাম হতে চাইতাম সে তখন আপত্তি পেশ করে বলত, না, আমি এখানে নামায পড়ব না। পরদিন আমি অনুভব করলাম যে, সে আমার পিছনে নামায পড়ে না। আমি বললাম, আমি অনুভব করছি যে তুমি আমার পিছনে নামায পড় না। সে বলল, আপনি কি স্পষ্টভাবে তার কারণ জানতে চান? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, আমি আপনাকে কাফের মনে করি। একথা সত্য যে তার ও আমার মাঝে ভালবাসা প্রচণ্ড। তা সত্তেও তার সম্পর্ক শাকরী মুস্তফার সাথে হওয়ার পরই সে আমাকে কাফের মনে করতে লাগল। আমি বললাম, কেন তুমি আমাকে কাফের মনে কর? সে বলল, আপনি হুযাইবীকে কাফের মনে করেন, না করেন না? আমি বললাম, কীভাবে আমি তাকে কাফের মনে করব? সে বলল, হুযাইবী কাফের। কারণ লোকেরা তাকে আব্দুন নাসের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে আর সে আব্দুন নাসেরকে কাফের বলেনি। অথচ আব্দুন নাসের কাফের। আর যে ব্যক্তি কাফেরকে কাফের বলে না সে কাফের। এ কারণে তারা হুযাইবীকে কাফের বলে তার পিছনে নামায পড়া ছেড়ে দিল। তারা বলল, যারা হুযাইবীকে ভালবাসে, হুযাইবীর অনুসরণ করে, বা হুযাইবীর দলে থাকে তারা কাফের। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। আর যারা হুযাইবীকে কাফের মনে করে না তারাও কাফের।

আমি তাকে বললাম, যে নামায পড়ে না সে কি কাফের, না কাফের না? সে বলল, সে কাফের। আমি বললাম, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন– সে কাফের নয়। আর ইমাম আহমদ বলেছেন– সে কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি? তুমি কি ইমাম শাফেয়ীকে কাফের বলবে? সে আমাকে বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি আমি সে মজলিসে উপস্থিত থাকতাম তাহলে আমি তাকে কাফের বলতাম।

আহ! তার অবস্থা তো এমন ছিল, আমরা তার নামায দেখে আমাদের নামাযকে তুচ্ছ মনে করতাম। তার রোযা দেখে আমাদের রোযাকে তুচ্ছ মনে করতাম। সর্বদা সে নামায আর রোযায় বিভোর হয়ে থাকত। খুঁজে খুঁজে সুন্নতের অনুসরণ করত। এসব কিছু সত্তেও তার এ অবস্থা দেখে দারুণ বিস্মিত হলাম। অবশেষে শাকরী মুস্তফার সাথে তার পনের বৎসরের জেল হল। তাই বলছিলাম, শুধু ইখলাস আর নিষ্ঠা থাকলেই হবে না। প্রত্যেক বিষয়ে আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করে সে মতে চলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

অর্থ : তোমরা ওহীর জ্ঞানে বিদ্বান লোকদের জিজ্ঞেস কর যদি না জান। (সূরা নাহল ঃ ৪৩)

ইখলাস আর সাহসিকতাই যথেষ্ট নয়। তার সাথে সাথে সরল ও সঠিক পথে অবিচল থাকতে হবে। তার সাথে সাথে ইলমেরও অধিকারী হতে হবে। বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করছে কান কথা। কেউ এসে বলল, আরে অমুক তো তাগুতী শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে। অমুক আলেম তো তাগুতী শক্তির পদলেহন করে। অমুক এমন হয়ে গেছে। অমুক এমন হয়ে গেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে যদি আমরা সবাইকে যা তা বলতে থাকি তাহলে কার নিকট থেকে আমরা ইলম অর্জন করব। ছোট্ট একটি কিতাব পড়েই আমরা মহাজ্ঞানী হয়ে যেতে চাই। এই শাকরী মুস্তফা ক'টি ছোট ছোট পুস্তিকা লিখল। নাম রাখল তাওয়াসসুমাত। তারা এই কিতাবের কথা বর্ণনা করে। আর এ কিতাব দ্বারাই ফায়সালা দেয়। আর নিজেরা ইজতেহাদ করে। তাদের একজন একদা আমাকে বলল, আরে ভাই! আমার তো একেবারেই বুঝে আসে না কীভাবে আরবের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত। আমি তাকে বললাম, এতে আবার আশ্চর্যের কী আছে। এই যে, বর্তমানের লোকেরা। এরা তো মুজাহিদদের সম্পর্কে নানা মিথ্যা কথা রটায়। এটা কী আশ্চর্যের বিষয় নয়!

একদা হযরত আলী (রাঃ) এ ধরনের এক ব্যক্তিকে বললেন, হে লোক! তুমি সত্যকে অর্জন কর, তাহলে সত্যাশ্রয়ীদের চিনতে পারবে। মানুষকে সত্যের আলোকে চিনা যায়। মানুষ দ্বারা সত্যকে চিনা যায় না। তাই সবচেয়ে ভাল কাজ হলো সর্বদা এ ধরনের মুখলিস সৎকর্ম পরায়ণ যুবকদের জন্য দু'আ করতে থাকা। আর তাদের ব্যাপারে সন্দেহ না করা। দু'আয় বলা–

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ○

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের মাঝে ও আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে সত্যসহ বিজয় দান করুন। আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ বিজয় দানকারী। (আরাফ ঃ ৮৯)

অথবা এ দু'আ করতে থাকা–

اللهُمَّ اهدِنا و إيَّاهم ، أللهُمَّ أرِنا الحقَّ حقًّا وَ ارزُقنا اتِّباعَــه و أرِنا البَاطلَ باطلاً وارزقنا اجْتنابَــه

সর্বদা তাদের জন্য দু'আ করতে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের নিরবতায় কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে এ দু'আ করতেন–

اللهمَّ ربَّ جبرائيلَ و ميكائيلَ و اسرافيلَ، فاطرَ السَّماواتِ و الأرضِ ، عالمَ الغيبِ و الشهادةِ ، أنتَ تحكمُ بينَ عبادِك فيما كانُوا فيه يختلفونَ، اهدِنا لما اختلفَ فيه من الحقِّ بإذنك ، إنَّك تهْدي منْ تشَاءُ إلى صراطٍ مستقيمٍ —

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

تَعِسَ عبدُ الدينارِ و عبدُ الدراهمِ و عبدُ الخَميصةِ ، تَعِسَ و انتكس إنْ أُعطيَ رَضيَ و إنْ لم يُعطَ سَخطَ —

অর্থ : দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম আর পোশাকের গোলাম ধ্বংস হোক। ধ্বংস হোক, অধঃমুখে নিপতিত হোক। যদি প্রদান করা হয় সন্তুষ্ট হয় আর দান না করা হলে ক্ষিপ্ত হয়।

মানুষ আজ ধন-সম্পদ গাড়ি-বাড়ি আর পদমর্যাদার পূজারী হয়ে গেছে। বুকে বা কাঁধে পদমর্যাদার তকমা লাগিয়ে মর্যাদা ও ক্ষমতার দর্প প্রদর্শনকে খুব পছন্দ করে। এরা তাগুতী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে চলে। মুসলমানদের ধ্বংস বা ক্ষতিতে তাদের কিছুই যায়-আসে না।

ঐ পাপি'দের দিকে ফিরে তাকাও যারা মিসরের ইসলামী আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করেছে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বন্দী করে শাস্তি দিয়েছে। সাইয়্যেদ কুতুব, আব্দুল কাদের আওদা, মুহাম্মদ ফারগালী প্রমূখকে শূলিতে চড়িয়েছে। একদিনেই আব্দুন নাসের তাদের বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। তাদের অপরাধ তারা নাকি খেয়ানত করেছে। তারাই নাকি ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ। এসব বানানো অজুহাত তুলে তাদের বন্দী করে তাদের উপর নির্যাতন চালাল। নানাভাবে কষ্ট দিল। যয়নব গাজালীকে ছয় হাজার আটশত বেত্রাঘাত করা হল। ইসলামী আন্দোলনের কর্মী কারাগারে প্রবেশ করেই তাকবীর ধ্বনি দিতে লাগল। শামস বাদরান সাইয়্যেদ কুতুবকে বন্দী করার পর নিজে যখন আবার বন্দী হল তখন সে সাইয়্যেদ কুতুবকে বলল, হে সাইয়্যেদ কুতুব! আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। মনে হচ্ছে এটাই জাহান্নাম যেখানে আমরা তোমাকে বন্দী করেছি। শাসম বাদরানের পনের বৎসর জেল হল। কিন্তু জামাল আব্দুন নাসের বলেছে, আমি তাকে আমার সামনে বসিয়ে বিষ মিশানো কফি পান করতে দিলাম। সে মৃত্যুবরণ করল। অথচ এই শামস বাদরান ছিল তারই জামাতা। আব্দুন নাসেরই তাকে সেনা প্রধান বানিয়েছিল। কিন্ত এক মুহূর্তে সব পাল্টে গেলো। ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটল। কারণ হৃদয়ের মালিক তো আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহই আব্দুন নাসেরের হৃদয়কে তার ব্যাপারে বিষিয়ে তুলেছেন। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা এক জালিম দ্বারা আরেক জালিম থেকে প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন।

ইংরেজদের একটি গল্প পড়েছি। গল্পটির নাম ছিল Felt of Woldi, বৃটেন সম্রাট দ্বিতীয় হেনরীর বড় পাদ্রী ছিল ওয়ালডি। সম্রাট তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আরেকটি বিবাহ করতে চাইল। তাই সে পাদ্রীকে বলল, আমার জন্য দ্বিতীয় বিবাহ বৈধতার কোন সুযোগ বের করো। কিন্তু পাদ্রী বলল, না, এর বৈধতা খৃস্ট ধর্মে নেই। বিবাহিত স্ত্রীকে তালাক দেয়া ও দ্বিতীয় বিবাহ করা উভয়টিই নিষিদ্ধ। কিন্তু সম্রাট বিয়ে করতে চাচ্ছেন আর তা হবে না, এটা তো কিছুতেই হতে পারে না। চাই ধর্ম গোল্লায় যাক। কিন্তু ব্যাপার তো অন্য জায়গায়। পাদ্রীদের প্রভাব তো অপরিসীম। যদি পাদ্রী পোপের নিকট সাহায্য চায় তাহলে তো হেনরীর পতন অনিবার্য। সে যুগে রাজা বাদশাহরা পোপের বিরুদ্ধে কিছু করলে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য পোপের কিল্লার সামনে বরফের উপর তিন দিন পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকতে হত। তারপর পোপ ক্ষমা ঘোষণা করতেন। সম্রাট চিন্তা করলেন যদি পাদ্রীর কিছু করি তো পোপ আমাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করবে। সুতরাং এ সংকট সমাধানের একমাত্র পথ হলো গির্জার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। সম্রাট ঘোষণা দিলেন, আজ থেকে আমরা নতুন ধর্ম পালন করব। পোপের সাথে এ ধর্মের কোন সম্পর্ক থাকবে না। এর ফলে পাদ্রীর সাথে হেনরীর সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে গেল। তারপর পাদ্রী থেকে ধন-সম্পদের হিসাব নেয়া হল। সব দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হল। তখন সেই পাদ্রী ওয়ালডি আফসোস করে যে কথাটি বলেছিল তা আমার হৃদয়ে বেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সে বলেছিল, হায় যদি আমি সম্রাটের যে সেবা করেছি তার অর্ধেক সেবা আমার রবের করতাম তাহলে তিনি আমাকে এ বয়সে এমন লাঞ্ছনার সাথে তাড়িয়ে দিতেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

(٦٤) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ আর মু'মিনদের মধ্য হতে যারা আপনার অনুসরণ করে তারাই যথেষ্ট।

তাই দীনের প্রত্যেক কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করবে, করতে হবে। আল্লাহর উপর আস্থা রাখতে হবে। আর সাথে নিতে হবে মু'মিন মুত্তাকী বান্দাদের। দুনিয়াদার লোকদের উপর নির্ভর করে কখনো দীনের কাজ হয় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا ○

মনে রাখতে হবে, কুরআন ও হাদীসে যখন শর্তহীনভাবে সদকা শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন তার উদ্দেশ্য হয় যাকাত। সুতরাং এখানে সদকা দ্বারা যাকাত উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে যাকাত গ্রহণকারীদের কথা বলেছেন। এবং আট শ্রেণীর লোকদের যাকাত গ্রহণ করা বৈধ ঘোষণা করেছেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমামগণ মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন– আয়াতে উল্লেখিত প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের যাকাত প্রদান করতে হবে। আবার কেউ বলেছেন– না বিষয়টি এমন নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা যাকাত গ্রহণে যোগ্য ব্যক্তিদের নাম ঘোষণা করে দিয়েছেন। এদের কাউকে দিলেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, এখানে নাম তামলীকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহলে আয়াতের মর্ম হবে, إنما يملك الزكوة هولاء সুতরাং সবশ্রেণীর লোকদেরই যাকাত দিতে হবে।

ইমাম মালেক ও আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকাত গ্রহণে যোগ্য ব্যক্তিদের কথা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এদের বাইরের কাউকে যাকাত দেয়া যাবে না। তাই সমুদয় যাকাত এক শ্রেণীর লোকদের দিলেও বৈধ হবে। আবার একাধিক শ্রেণীর লোকদের দিলেও বৈধ হবে। তাই ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, তুমি যদি তোমার যাকাতের সমুদয় অর্থ শুধু ফকীর বা মিসকীন বা দাসকে মুক্ত করার জন্য বা জিহাদের রাস্তায় ব্যয় করো, তবে তা আদায় হয়ে যাবে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) দাবী করে বলেছেন যে, এ ব্যাপারে তিনি সবাইকে ঐক্যমত পেয়েছেন। সাহাবীদের ঐকমত্য পেয়েছেন। কারণ সাহাবীদের কাউকে এর খেলাফ পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে ইমাম মালেক ও আবু হানীফা (রহঃ)-এর কথাই অগ্রগণ্য। কারণ যদি কোন দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাতের অর্থ তুলে বণ্টনের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে কীভাবে সে তা আদায় করবে। এ আট প্রকার লোকদের খুঁজে বের করে তাদের নিকট যাকাত পৌঁছে দেয়া কঠিন ব্যাপার বটে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ○

অর্থ : যদি তোমরা সদকার সম্পদ প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল। আর যদি গোপনে ফকীরদের দিয়ে দাও তবে তা আরো ভাল। (সূরা বাকারাঃ ২৭১)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র এক শ্রেণীর লোকদের কথা বলেছেন। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

أمِرتُ أن آخذَ الصدقةَ من أغنيائكم و أرُدَّها على فقرائكم —

অর্থ : আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি তোমাদের ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করি এবং তোমাদের দরিদ্রদের মাঝে আমি তা ফিরিয়ে দেই।

ইমাম কুরতুবী বলেন, "কুরআন ও হাদীসের এ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝে আসে যে, এই এক শ্রেণীর লোকদের যাকাত প্রদান করলেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে"। এ মত পোষণ করেছেন হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত হুযাইফা (রাঃ) প্রমুখ এবং তাবেঈদের উল্লেখযোগ্য প্রায় সবাই। সুতরাং

এই আট শ্রেণীর লোকদের মধ্য হতে যে কোন এক শ্রেণীর লোককে যাকাতের অর্থ-সম্পদ প্রদান করলেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যদি যাকাতের টাকা দিয়ে কোন গোলাম ক্রয় করে তাকে আযাদ করে দেয় তবুও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের জন্য যদি যাকাতের টাকা প্রদান করা হয় তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যদি যাকাতের সমুদয় সম্পদ জিহাদের ফান্ডে প্রদান করা হয় তাহলেও তা বৈধ হবে। কিন্তু ফকীর আর মিসকীনের মাঝে পার্থক্য কি? এ নিয়েও মনীষীদের মাঝে মতোভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন– মিসকীন হল সবচেয়ে বেশি নিঃস্ব ব্যক্তি। যারা বলেন ফকীর হলো সবচেয়ে বেশি নিঃস্ব ব্যক্তি তারা এর প্রমাণে বলেন فقير শব্দটি এসেছে فقَرات الظهر থেকে। অর্থাৎ যার পিঠের হাড় ভেঙ্গে গেছে, ফলে সে মাটির সাথে মিশে গেছে। এখন আর নড়াচড়া করতে পারে না, তাকেই ফকীর বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দারিদ্র্য থেকে পানাহ চেয়েছেন।

তিনি দু'আ করতেন- اللهم إني أعوذُبكَ منَ الكُفرِ و الفقرِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কুফরী ও দারিদ্র্য থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اللهُمَّ أحْيِني مِسكينًا و أمِتني مسكينًا و احْشرني في زُمرةِ المسَاكينِ —

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন অবস্থায় জীবিত রাখ। মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান কর এবং মিসকীনদের দলে আমার হাশর কর।

সুতরাং রাসূলের ক্ষেত্রে তো একথা বলা যাবে না যে, তিনি এক বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন আর তার চেয়ে নিকৃষ্ট বিষয়ের আবেদন করবেন। সুতরাং এ হাদীসদ্বয়ের আলোকে বুঝা যায় যে, فقر হল একেবারে নিঃস্ব অবস্থা। যার নীচে আর খারাপ অবস্থা হয় না। আর হানাফী মাযহাবে ফকীর ঐ ব্যক্তিকে বলা হবে যার নিকট যাকাতের নেসাব পরিমাণ অর্থ নেই। সুতরাং এমন ব্যক্তি যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে।

কিন্তু কী পরিমাণ হলে তোমার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে? কেউ যদি ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মালিক হয় বা এর মূল্যের পরিমাণ অর্থের মালিক হয় তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। অথবা যদি ৬৪০ গ্রাম রুপা বা তার সমপরিমাণ অর্থের মালিক হয় তাহলে তার উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে। মনে কর তুমি বাজারে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে এক গ্রাম স্বর্ণের মূল্য কত? বলা হল ৫০ রিয়াল। তাহলে ৫০×৮৫=৪২৫০ রিয়ালের মালিক হলেই যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি এক গ্রাম রুপার দাম হয় ৫ রিয়াল তাহলে ৬৪০×৫=৩২০০ রিয়াল হলেই যাকাত ওয়াজিব হবে।

ত্রয়োবিংশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٥٨) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ○
(٥٩) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا اٰتَاهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُوْلُهُ إِنَّآ إِلَى اللهِ
رَاغِبُوْنَ ○ (٦٠) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

অর্থ : (৫৮) তাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা সদকা বণ্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় আর না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। (৫৯) কতোই না ভালো হতো যদি তারা আল্লাহ ও তার রাসূল যা তাদের দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হতো এবং বলতো আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ। আল্লাহ ও তার রাসূল নিজ করুণায় প্রদান করেন। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ মুখী। (৬০) যাকাত হলো ফকির-মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক। এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

ইতোপূর্বে আমি বলেছি, যুলখুয়াইদা তাইমী বা হরকুছ ইবনে যুহাইর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললো-

اعدلْ يا محمدُ في القسمة —

হে মুহাম্মদ! বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করো। তার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

ويحك ، إنْ لم أعدِلْ أنا فمنْ يعدِلُ !؟

ছি! ছি! এ কেমন কথা বললে! যদি আমি ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন না করি, তাহলে কে তা করবে? এরপর আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের কথার উত্তরে বললেন– আরে যাকাত তো রাসূল বণ্টন করেন না। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতই যাকাত বণ্টন করেন। এক্ষেত্রে নির্ধারিত মানুষ আছে তাদেরকেই যাকাত প্রদান করা হবে, অন্যদেরকে নয়। যাদের কথা إنما الصدقات للفقرآء و المساكين এর মাঝে বর্ণনা করা হয়েছে।

কারা ফকির আর কারা মিসকীন, এর মাঝে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশের মত হলো, যারা অধিক গরীব তাদের মিসকীন বলা হয়। কেউ বলেছেন– মিসকীন ঐ ব্যক্তিকে বলা হবে যার নিকট ঐ দিনের খাবার নেই। আর ফকির বলা হবে যার নিকট চল্লিশ দেরহামের কম থাকবে। ইমাম আহমদ, ইমাম সুফিয়ান সাউরী (রহঃ) বলেছেন– যার নিকট পঞ্চাশ দেরহামের চেয়ে কম থাকবে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। কারণ সে যাকাতের হকদার। আবার কেউ বলেছেন যার নিকট চল্লিশ দেরহাম থাকবে সে ধনী, তার যাকাত প্রদান করতে হবে। এর সমর্থনে তারা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হলো–

منْ سألَ الناسَ و هو غنيٌّ جاءَ يومَ القيامة و في وجهِه قُدوحٌ و خُدوشٌ ، قيلَ يا رسولَ الله ، ما غِناؤه؟
قال: أربعينَ درهمًا —

অর্থ : যে ব্যক্তি ধনী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের নিকট ভিক্ষা চাইবে সে কিয়ামত দিবসে কোটরে চলে যাওয়া চক্ষু ও চেহারায় কলঙ্কের দাগসহ আসবে। তখন রাসূলকে জিজ্ঞেস করা হলো, কিভাবে মানুষ ধনী হয়। রাসূল বললেন, চল্লিশ দেরহামের অধিকারী হলেই মানুষ ধনী হয়।

হানাফীরা বলেন, যার নিকট নেসাব পরিমাণ অর্থ থাকবে না, সে ফকির। আর যাকাতের নেসাব হলো, ছয়শত চল্লিশ গ্রাম রুপা। দুইশ' দেরহামের মালিক হওয়া অথবা পঁচাত্তর গ্রাম স্বর্ণ অথবা বিশ দিনারের মালিক হওয়া।

আট শ্রেণীর লোক যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। তারা তাদের ভাতা যাকাতের অর্থ থেকে নিতে পারবে। তবে উত্তম হলো, তাদের ভাতা বাইতুল মাল থেকে প্রদান করা। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের দু'টি অর্থ ফান্ড থাকে- ১. যাকাত ফান্ড, ২. বাইতুল মাল। বাইতুল মালের উৎস হলো- খেরাজ, জিযিয়া, মালে গনীমত, ফাই। জিযিয়া হলো– জিহাদে পরাজিত হওয়ার পর কাফেররা সন্ধির ভিত্তিতে যে অর্থ প্রদান করে। বাইতুল মালের বেশক'টি উৎস জিহাদের উপর নির্ভর করে। জিহাদ চললে সে অর্থ অর্জিত হবে আর জিহাদ না থাকলে তা বন্ধ থাকবে। বর্তমানে জিহাদ নেই। তাই গনীমত, ফাঈ, জিযিয়ার কোন অস্তিত্ব নেই। তবে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য উৎস সৃষ্টি করেছেন, যেমন– পেট্রোল, স্বর্ণ, লোহা, ফসফেট ইত্যাদি। এ ধরনের সম্পদ বাইতুল মালের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

এ ধরনের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহকারীদের ভাতা দেয়া অধিক উত্তম। তবে যদি যাকাতের অর্থ থেকে তাদের ভাতা প্রদান করা হয়, তাহলে তা বৈধ। তবে তাদের কতটুকু পরিমাণ প্রদান করা হবে? ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন– তাকে সংগৃহীত যাকাতের আট ভাগের এক ভাগ দেয়া হবে। তবে এ ব্যাপারে কোন নির্ধারিত নিয়ম নেই। যদি কেউ যাকাতের আট মিলিয়ন রিয়াল জমা করে, তাহলে কি তাকে এক মিলিয়ন রিয়াল দেয়া হবে? তাই আলেমরা বলেছেন– যাকাত সংগ্রহকারীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ প্রদান করা হবে। এখন আবার প্রশ্ন আসে, তার প্রয়োজন কিভাবে নির্ধারণ করা হবে। আইন শাস্ত্রবিদরা বলেছেন– তার প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, একটি বাড়ি সেখানে সে বাস করবে। একটি পশু যার উপর সে আরোহণ করবে। আর তার স্ত্রী। বর্তমান যুগে বাহন জন্তুর পরিবর্তে মার্সিডিস গাড়ি হবে না বরং প্রয়োজন পূরণ হয় এমন গাড়ি হলেই চলবে। খিলাফতকালে যাকাত সংগ্রহকারীদের জন্য গাধা, খচ্চর বা ঘোড়া ক্রয় করা হতো। তারা তাতে আরোহণ করতেন। হযরত উমর (রাঃ) বলতেন–

مَنْ وَلِي لنا عملاً وفَّرْنا له دابّته و مسكنَه و طعامَــه ـــ

অর্থ : যে ব্যক্তি আমাদের হয়ে খেলাফতের কোন কাজে অংশগ্রহণ করবে, আমরা তার জন্য বাহন জন্তু, আবাস ও খাদ্যের ব্যবস্থা করবো। তাই উমর (রাঃ) আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)-এর জন্য প্রত্যেক দিনের খাবারের জন্য অর্ধেক বকরি নির্ধারণ করেছিলেন। এটা তার জন্য, তার প্রহরী ও খাদেমদের জন্য।

আর যদি যাকাত সংগ্রহকারী ব্যক্তি বনু হাসেম গোত্রের হয়, তাহলে তাকে তার ভাতা যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া হবে না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার বংশের লোকদের যাকাতের অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ, যাকাতের অর্থ হলো মানুষের সম্পদের ময়লা। এ ময়লা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বংশ রাসূলের বংশের জন্য বৈধ নয়। তাদেরকে গনীমতের সম্পদ থেকে ভাতা দেয়া হবে। কারণ, গনীমতের মাল সংগ্রহ হয় তরবারীর দ্বারা। ইজ্জত ও সম্মানের মাধ্যমে। সবচেয়ে উত্তম উপার্জন হলো নবীদের উপার্জন। তাহলো গনীমতের সম্পদ ও ফাঈ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَىٰ ○

অর্থ : জেনে নাও, তোমরা গনীমতের সম্পদ হতে যা অর্জন করো, তার এক-পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহর জন্য, তার রাসূলের জন্য ও রাসূলের নিকটাত্মীয়দের জন্য।

সুতরাং রাসূলের নিকটাত্মীয়দের জন্য গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ অর্থ কি তাদের জন্য যথেষ্ট হবে? হ্যাঁ হবে। বরং প্রয়োজন পূরণ করে অবশিষ্ট থেকে যাবে। এছাড়া তাদের জন্য রয়েছে ফাঈ সম্পদের অংশ, জিযিয়ার অংশ।

সুরাকা ইবনে মালেকের কথা তোমরা জানো। রাসূল যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যাচ্ছিলেন, তখন সুরাকা পুরস্কারের লোভে রাসূলকে ধরে মক্কার কাফেরদের নিকট ফিরিয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু ঘোড়া নিয়ে ছুটতে ছুটতে যখন রাসূলের অদূরে পৌঁছলেন, তখন তার ঘোড়ার সামনের দু'পা মাটিতে গেঁথে গেল। তখন তার অন্তরাত্মা ভয়ে চুপসে গেল। দু'হাত তুলে রাসূলের নিকট দু'আ কামনা করলেন। বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে নিরাপত্তা দান করুন। রাসূল বললেন, এসো হে সুরাকা! তোমার খবর কী? সুরাকা বললো, আপনাকে হত্যা করতে পারলে মক্কার কাফেররা আমাকে দু'শ উট প্রদান করবে। সুরাকা আরবের প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী ছিলেন। তখন রাসূল তাকে বললেন, হে সুরাকা! কিসরার হাতের কংকন যদি তোমার হাতে হয় তাহলে তোমার কেমন লাগবে? সুরাকা বিস্ময়ের আতিশয্যে বললেন, কিসরা ইবনে হরমুজের কথা বলছেন? রাসূল বললেন, হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হরমুজ। সুরাকার মাথায় এই চিন্তা বসে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন, মুহাম্মদ এ কী কথা বললেন! কিসরা ইবনে হরমুজের কংকন হবে আমার হাতে! এটা কি সম্ভব! রাসূল এ কথা বললেন হিজরতের প্রথম বছরে। এর প্রায় বাইশ বছর পর নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে কিসরার বাহিনী পরাজিত হলো। বিজিত মুসলিম বাহিনী কিসরার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলো।

বর্ণিত আছে, আমের ইবনে আবদে কাইস কিসরার কংকন দু'টি পেলেন। তিনি একজন একনিষ্ঠ সৎ তাবেঈ ছিলেন। তিনি তা এনে গনীমতের মালের সাথে রেখে দিলেন। গনীমতের মালের হিফাজতে নিয়োজিত ব্যক্তি বললেন, আপনার নাম কী? তিনি বললেন, আমি তোমাদের আমার নাম বলবো না। তাহলে তোমরা তা স্মরণে রাখবে। সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এ কংকন গনীমতের মালে এনে জমা দিয়েছে, নিশ্চয়ই সে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। এ কংকনের মূল্য কয়েক মিলিয়ন হবে। দামী মুক্তা, ইয়াকুত পাথরে সজ্জিত ছিল সে কংকন।

সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) গনীমতের সম্পদ হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। তাতে সে কংকন দু'টিও ছিল। উমর (রাঃ) কংকন দু'টি হাতে তুলে নিয়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন, সুরাকা ইবনে মালেক কোথায়? লোকেরা গিয়ে সুরাকা ইবনে মালেক (রাঃ) কে ডেকে আনলো। সমবেত লোকদের মাঝে তিনি বললেন, এটা হলো তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ। সুরাকা ইবনে মালেকের বয়স তখন অনেক হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রাসূলের সুসংবাদ ও ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত করার জন্য তখনও তাকে জীবিত রেখেছিলেন। উমর (রাঃ) বললেন–

الحمدُ لله الذي نزَعَ هذه من كسرَى بن هُرمُز ملكِ الملوك و ألبسَها أعرابيًّا آ

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি রাজাধিরাজ কিসরা ইবনে হরমুজের হাত থেকে তা ছিনিয়ে এনে এক সাধারণ মরু আরবকে পরিধান করিয়েছেন।

সুতরাং জিহাদ হলো ইজ্জত ও সম্মানের বিষয়। জিহাদ জাতিকে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছায়। জিহাদ অর্থহীন মানুষকে অর্থশালী ও বিত্তবান বানায়। জিহাদ অজ্ঞাত, অখ্যাত মানুষকে ইতিহাসের পাতায় তুলে দেয়। মুসলিম জাতি জিহাদের মাঝেই বেঁচে ছিল। জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে আর তাদের মৃত্যু হয়েছে। যদি আমরা জিহাদ না ছাড়তাম, তাহলে আজ অধিকাংশ ইউরোপ অধিবাসী আমাদের জিযিয়া কর প্রদান করতো। আর অনেক দেশ ইসলামী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হতো। আর এই আমেরিকার কথা বলছো, নিশ্চয়ই এই আমেরিকা আমাদের

জিযিয়া কর প্রদান করবে। আমরা একদিন আমেরিকা পদানত করবো। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لَيَبْلُغَنَّ هذا الأمرُ ما بلغَ الليلُ و النهارُ ، و لا يبقَى بيتٌ من وبَرٍ و لا مدرٍ إلاَّ و يُدخله الله هذا الدينَ بعزِّ عزيزٍ و بذلِّ ذليلٍ عزًّا يعزُّ به دينَ الإسلامِ و ذلاًّ يُذلُّ به الكفرَ —

অর্থ : রাত ও দিন যেখানে পৌঁছে এ ধর্মও সেখানে পৌঁছবে। কোন পশম ও পাথরের ঘর বাকি থাকবে না, তবে তাতে আল্লাহ তা'আলা এ ধর্মকে পৌঁছাবেন সম্মানিত ধর্মের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে আর লাঞ্ছিত, অপদস্ত বিষয়কে অপদস্ত করে। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে সম্মানিত করার মাধ্যমে আর কুফরী শক্তিকে লাঞ্ছিত, অপদস্ত করার মাধ্যমে।

ঐ তো আমাদের মাঝে রোমের শাসক উপস্থিত। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়ার আয়ু বৃদ্ধি করুন। এই ইয়াহইয়াকে আমরা রোমের শাসক বলবো। কারণ, আল্লাহর রাসূল আমাদের রোমের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন দেশ আগে বিজিত হবে। কনস্ট্যান্টিনোপল, না রোম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন, হিরাক্লিয়াসের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল আগে বিজিত হবে। সাতান্ন হিজরীতে কনস্ট্যান্টিনোপল বিজিতি হয়েছিল। ইনশাআল্লাহ রোমও বিজিত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ হাদীসটি সহীহ।

শাইখ ইয়াহইয়া যখন ইতালি থেকে এলো, আমি তখন তাকে বললাম, তুমি রোমের শাসক। যদি আমি মরে যাই তবে তোমরা স্মরণ রাখবে, ইয়াহইয়া হলো রোমের মুহাফিজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে সুরাকা ইবনে মালেক (রাঃ) কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন আমরা আজ শাইখ ইয়াহইয়াকে তেমনিভাবে সুসংবাদ দিচ্ছি। আশা করি, ইনশাআল্লাহ সে রোমের মুহাফিজ হবে। এটা অসম্ভব মনে করো না। এখন সে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। শিগগিরই হয়তো সে ইসলামী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হবে।

আমি একথা শুধু মনের খেয়ালে বলছি না, বরং এর পেছনে দলিলও বিদ্যমান। ফ্রান্সের এক গবেষক ও লেখক বলেছেন– দুই হাজার সালের পর ফ্রান্স ও ইতালি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আমিও মনে করি, তা হবে। এটা আমার ধারণা। বাস্তবায়িত হতেও পারে। আবার নাও হতে পারে।

এখন তো বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত অনেক মানুষই ছুটে আসছে আফগান রণাঙ্গনে। তারা যুদ্ধ করছে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। তাদের লক্ষ্য, তাদের উদ্দেশ্য পৃথিবীর বুক থেকে কমিউনিস্ট নামের শাসন ব্যবস্থাকে নির্মূল করা। পোল্যান্ডের অধিবাসীরা খৃস্টান। এ দেশ শাসন করছে কমিউনিস্টরা। পোল্যান্ডের এক অধিবাসী এসে আমাদের সাথে মিলে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। অথচ সে খৃস্টান। পোল্যান্ডকে রাশিয়া শাসন করছে। তাই রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তারা আফগানিস্তানে ছুটে আসছে।

মজলিসে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল। বলল, এই খৃস্টান ব্যক্তিকে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া কি বৈধ?

শাইখ বললেন, যদি সামান্য কিছু খৃস্টান, অগ্নিপূজক বা হিন্দু জিহাদে অংশগ্রহণ করে তবে তা বৈধ। যদি তারা রণক্ষেত্রে কোন বিশেষ প্রভাব ফেলতে না পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আরীকাত তখনো মুশরিকই ছিল। সেইতো পথ দেখিয়ে রাসূলকে হিজরতের সময় মদীনায় নিয়ে গেছে। সুতরাং জিহাদের ক্ষেত্রে মুশরিকদের সাহায্য সহায়তা নেয়া সকল ইমামের নিকট বৈধ। তবে তাতে কয়েকটি শর্ত রয়েছেঃ

১. কোন শর্ত সাপেক্ষে হতে পারবে না।

২. মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে কোন বিশেষ উঁচু পদে বহাল থাকতে পারবে না।

৩. তার পক্ষ থেকে সার্বিকভাবে নিরাপদ থাকতে হবে। তার পক্ষ থেকে কোন কিছু ঘটানোর সম্ভাবনা থাকবে না। কারণ সে যুদ্ধ করতে এসেছে এ কারণে যে, সে রাশিয়ানদের শত্রু মনে করে।

৪. তারা সংখ্যায় কম হতে হবে, যে বিধর্মী শত্রুপক্ষের সাথে মিশে মুসলমানদের কোন ক্ষতি করতে না পারে। আমাদের আফগানিস্তানে যারা আছে তারা সংখ্যায় একেবারে নগণ্য। তাই তাদের পক্ষ থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই।

এ শর্তগুলো পাওয়া গেলে কোন মুশরিক, ইহুদী, খৃস্টান বা অন্য কোন মত ও বিশ্বাসের কারো সাহায্য সহযোগিতা নেয়ায় কোন বাঁধা নেই।

যদি পাকিস্তান সেনা বাহিনীর কোন অফিসার আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করতে আসে, অথচ সে একজন কাদিয়ানী। সে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে পারদর্শী এবং বলে, আমাকে মাসে দশ হাজার রুপি দিলে আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কোন বাঁধা নেই। হিন্দু, খৃস্টান বা অন্য যে কেউ হোক তাতে কোন সমস্যা নেই।

কিন্তু একবারও কি আমরা ভেবে দেখেছি, ইউরোপের খৃস্টানরা কেন আফগানের লোকদের সাহায্য সহযোগিতা করছে? এটা সত্য যে, তাদের একদল খৃস্ট ধর্ম প্রচারের জন্য তা করছে। কিন্তু তাদের কেউ কেউ এ কারণে সাহায্য করছে যে, তারা কমিউনিস্ট মতবাদকে ঘৃণা করে, অপছন্দ করে। তোমরা শুনলে অবাক হবে, পাশ্চাত্য থেকে যে ত্রাণ সামগ্রী আসছে, তার প্রায় অর্ধেক আসছে আমেরিকা, জার্মান, বৃটেন ও ইউরোপের বিভিন্ন সংস্থা থেকে যেগুলো গির্জার অধীনে। অধিকাংশ খাবার যা পেশোয়ারে, কোয়েটায় মুজাহিদদের অর্পণ করা হয় তা খৃস্টানদেরই প্রেরিত খাবার। যদি তাদের উদ্দেশ্য বিত্তহীন গরীবদের সহায়তা করা ও মানুষদের মৃত্যু থেকে বাঁচানোর জন্য হয়ে থাকে তবে নিশ্চয় তারা পৃথিবীতেই প্রতিদান পাবে। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তাদের প্রচুর ধন-দৌলত দান করবেন। আর এটাও সত্য যে, তাদের একটা বিরাট অংশ মুসলমানদের খৃস্টান বানানোর জন্য কাজ করছে। সাহায্য করছে। আর ক্ষুধায় মৃত্যুর মুখোমুখি ব্যক্তির জন্য ইহুদী, খৃস্টান, মুসলমান বা অগ্নিপূজক যার কাছ থেকে যাই আসে তাই খাওয়া বৈধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

অর্থ : তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস এবং সেসব জীবজন্তু যা আল্লাহ ব্যতিত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। সুতরাং আফগানের উদ্বাস্তুদের জন্য অমুসলিমদের ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ করা বৈধ। তেমনিভাবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা যদি এগিয়ে আসে তাহলেও তাদের সাহায্য নেয়া বৈধ। মুসলমানরা যখন কোন চিকিৎসা সেবা দিতে পারছেনা, মুসলমানদের কোন ডাক্তার যখন আফগানিস্তানের আহতদের সেবায় এগিয়ে আসছে না, তখন যদি আমরা এমন কোন খৃস্টান ডাক্তারকে পাই যে ইঞ্জিল বহন করে, ক্রুশ চিহ্ন গলায় ঝুলিয়ে এসে আমাদের কে বলে, আমি এই আহত ব্যক্তিটির ব্যান্ডেজ করে দিতে চাই। আমি চাই সে অনবরত রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যুবরণ না করুক। তাহলে কি তার সাহায্য গ্রহণ করা আমাদের জন্য বৈধ হবে না? নিশ্চয়ই হবে।

যারা নানা প্রশ্ন তোলে আপত্তি করেন আমি তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এসো তোমরা আমাদের আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। একদা জনৈক আরব আহমদ শাহ মাসউদকে বলল, শুনেছি, আপনার নিকট নাকি অনেক ক্লাসের চিকিৎসক আছে? তখন তিনি স্মিত হেসে বলেছিলেন, তাহলে আমি বলছি, তোমরা আমাকে একজন আরব ডাক্তার দাও। আমি এদের সবাইকে তাড়িয়ে দিব।

আরবীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে-

لسانٌ طويلٌ و باعٌ قصيرٌ —

'জিহ্বা লম্বা অথচ হাত একেবারে খাট।' কথায় একেবারে টন টন অথচ কাজে ঠন ঠন।

আমি এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে বলি, কোথায় সেই পরহেজগার মুত্তাকী, মুসলিম সাংবাদিক? নিয়ে আসুন, আমরা তাকে সাদরে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু কই, পেলাম না তো কাউকে। একজন ফটোগ্রাফার পেলাম না, সাংবাদিক পেলাম না, সম্পাদক পেলাম না। তবে ইরাকের কিছু মুজাহিদ এখানে আছে। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। হিরাতের মুজাহিদরা বলেছেন- ইরাকের লোকেরা ভাল ফারসি জানে। আর আফগানিস্তানের কিছু অঞ্চলের লোকেরাও ফারসী জানে। তাই তারা সহজেই আফগানিস্তানে চলে আসে। তবে এর আসল কারণ হল, ইরাকের লোকেরা জিহাদের জন্য দেশ ছেড়ে চলে আসেনি। তারা তাগুতী শক্তির জুলুম অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য বেরিয়ে এসেছে। তারপর জিহাদের এ সুযোগ নাগালে পেয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে এ কাজের জন্য টেনে এনেছেন। ফলে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করে সৌভাগ্যবান হতে পেরেছেন।

শাইখ জালালুদ্দীন হক্কানী বলেছেন- আমার নিকট একদা ফ্রান্সের এক মহিলা ও এক পুরুষ ডাক্তার এল। তারা বলল, আপনার নিকট যেসব আহত লোকেরা আসে তাদের চিকিৎসার অনুমতি দিবেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপর তিনি মহিলা ডাক্তারের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ইনি কে? ডাক্তার বলল, আমার স্ত্রী। তারপর কিছু দিন যেতে না যেতেই প্রকাশ পেল সে তার স্ত্রী নয়।

তখন তিনি তাদেরকে আলাদা করে দিলেন। দু'জনকে দু'তাবুতে থাকার ব্যবস্থা করলেন। তারপর দেখা গেল, রাতের অন্ধকারে তারা একে অপরের নিকট যাতায়াত করে। তারপর তিনি তাদের দু'জনের তাবুতে প্রহরী নিযুক্ত করে দিলেন। তারপর মেয়েটি মুজাহিদদের ফুসলাতে লাগল। প্রায় বিবস্ত্র হয়ে আহতদের ঔষধ প্রদান করতে লাগল। অতঃপর জালালুদ্দীন হক্কানী তাদের বন্দী করে রাখলেন এবং তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হল, তারা এর পরও বার বার পত্র মারফত জালালুদ্দীন হক্কানীর শর্ত মেনে নিয়ে আফগানিস্তানে আসার অনুমতি চেয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল। হতে পারে তারা খৃস্ট ধর্ম প্রচারের মিশন নিয়ে এসেছিল। হতে পারে, তারা ফিৎনা সৃষ্টির লক্ষ্যে এসেছিল। অথবা তারা গুপ্তচর ছিল।

কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় হল, তাদের কষ্ট সহিষ্ণুতা- আফগানিস্তানে তারা কতো কষ্ট করেছে, তা ভাবতেই আমাদের গা শিউরে উঠে। সবচে' বড় কষ্ট হয় খাওয়া দাওয়ার কষ্ট। তাদের তরকারীর অর্ধেক থাকত তৈল। যা অন্যদের হজম হয়না। একবার খেলেই ডায়রিয়া শুরু হয়ে যায়। গোশত পাওয়া যায় না। ভাত পাওয়া যায় না। শুধু রুটি আর তরকারী। এতো কিছু সত্তেও তারা এখানে থাকতে চায়। নিশ্চয় এর পশ্চাতে তাদের কোন লক্ষ্য ছিল। কোন উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মুসলমানরা কোথায়? এ অবস্থায় আমরা খৃস্টানদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য ছিলাম। এর পর আবার অনেকে এসে নানা আপত্তি তুলে।

একবার একদল ডাক্তার এক ইসলামী ব্যক্তিত্বের নিকট বলল, আমরা কি আফগানিস্তানে যাব? সেখানে আসতে রোগাক্রান্ত লোকদের চিকিৎসা করব। তিনি বললেন, তোমরা সেখানে যেয়ো না। তারা সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য নয়।

আমি এক বড় শাইখের ফতওয়া শুনেছি। তাকে আমি হৃদয় দিয়ে ভালবাসি। একবার এক ডাক্তার এসে তাকে বলল, আমি একজন ডাক্তার। আপনি কি আমাকে আফগানিস্তান যাওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, না। আমার আশ্চর্য লাগে তারা আফগানিস্তানের ব্যাপারে কিরূপ বিভ্রান্তি পোষণ করে। সেই শাইখকে একদা কিছুলোক জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আফগানিস্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরযে আইন না ফরযে কিফায়া? তিনি বললেন, ফরযে কিফায়া। তবে সেখানে তোমরা কীভাবে যাবে? কোথায় প্রশিক্ষণ নিবে? সেখানে

কি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাইরে কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে? তোমরা কি আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে পারবে না পাকিস্তান থেকে মাঝে মধ্যে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে শত্রুদের আক্রমণ করে ফিরে আসবে? এরপর সবচে' বড় কথা হল, তোমরা ছুরি আর চাকু দিয়ে ট্যাঙ্ক আর যুদ্ধ বিমানের মোকাবিলা করতে পারবে? এভাবে নানা প্রশ্ন তুলে মানুষকে অনুৎসাহিত করেন। বিভ্রান্ত করেন।

কবি বলেন,

لا خيل عندك تهديها و لا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال

অর্থ : তোমার নিকট ঘোড়া নেই, কোন সম্পদ নেই যা জিহাদের পথে দান করবে। তাহলে কথার মাধ্যমে সহায়তা কর- যখন তোমার সহায়তা করার সামর্থ্য নেই।

তবে লোকটি মুখলিস, তার মাঝে অনেক গুণের সমাহার। তবে আফগান জিহাদের অবস্থা ও প্রকৃতি তার জানা নেই। তিনি আফগান জিহাদকে ফিলিস্তিনের জিহাদের মত মনে করেছেন। তিনি ধারণা করেছেন মুজাহিদ বাহিনী অবস্থান করছে পাকিস্তানে যেমন ফিলিস্তিনী মুজাহিদদের ঘাটি হল জর্দানের হরবিতে। আর আফগান মুজাহিদদের ভাবে ফিলিস্তিনের ফেদাইনদের মত। তারা নদীর পূর্ব পাশ থেকে আঘাত হেনেই পালিয়ে যায়। অথবা সীমান্ত থেকে বহু দূরে থেকে আঘাত করে পালিয়ে যায়। তারা ভাবতে পারে না যে, মুজাহিদদের কাফেলায় দুই শত অস্ত্র বোঝাই করা উটও থাকতে পারে। লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানার জন্য দিনের পর দিন চলতে থাকে, একাধারে চল্লিশ দিন সফর করে তারা রাশিয়ার সীমান্তে পৌঁছে। পথে জায়গায় জায়গায় কফিঘর আছে। কফি চলে। ঘুম হয়। খাবার দাবার চলে। উটগুলোও বিশ্রাম নেয়। আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি। যখন আমি তরমঞ্জিলে গিয়েছিলাম তুমি দেখবে, প্রত্যেক দিন সেখানে পাঁচ শতের মত উট বা ঘোড়া অস্ত্র বোঝাই করে ঢুকছে। মুজাহিদরা ঘোড়া, গাধা ভাড়ায় নিয়ে নেয়। অস্ত্র বোঝাই করে চলে যায়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এত অস্ত্র আসে কোথা থেকে? মুজাহিদরা এতো অস্ত্র পায় কোথা থেকে? এর উত্তরে আমি বলব, তোমাদের বুঝা উচিত, জানা উচিৎ, আজ পর্যন্ত আমেরিকা আমাদের কে কিছুই দেয়নি। একটি ক্লাসিনকভ ক্রয়ের পয়সা পর্যন্ত দেয়নি। একটি ক্ষেপনাস্ত্র ক্রয়ের মূল্যও দেয়নি বরং আমেরিকা প্রত্যেকটি ক্ষেপনাস্ত্রের জন্য সত্তর হাজার ডলার নেয়। একটি ক্ষেপনাস্ত্রের মূল্য পাঁচ শত ডলার নেয়। আর আফগানের খোলা বাজারে অস্ত্রের মূল্য এক বা দুইশত রুপিয়া। অথচ তার প্রকৃত মূল্য একশত রুপিয়া। এখানে একটি সত্য কথা অবশ্যই বলতে হয়। সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। সৌদী আরবের লোকেরা এরকম অস্ত্র ক্রয়ের জন্যে সিংহভাগ মূল্য প্রদান করে থাকে। একথা শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই বললাম। আলহামদুলিল্লাহ! এ ব্যাপারে আমাদের জিহ্বা পবিত্র। আমরা কখনো তাদের থেকে কোন অংশ গ্রহণ করি না। আর ভবিষ্যতে গ্রহণ করবও না। হয়তো কেউ প্রশ্ন করতে পারে, সৌদী আরব কেন দিচ্ছে? আমি বলব, এটা আল্লাহ ও তাদের বিষয়। তাদের মনের তামান্না বা ইচ্ছা কি আমার জানা নেই। ব্যস, আমরা শর্তহীনভাবে তা গ্রহণ করে থাকি। আল্লাহ তা'আলাই এই মুজাহিদদের খেদমতের জন্য তাদের নিয়োজিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই রাশিয়ার সাথে মুসলমানদের জিহাদী কার্যক্রম সূচনা করে দিয়েছেন। তাই আমেরিকা সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বাঁধা সৃষ্টি করে না। আর তাদের ছাড়া অন্য কোন দেশকে আমাদের সাহায্য করতে দেখছি না। হ্যাঁ, রাশিয়াকে আরেক দেশ সাহায্য করেছে।

কুয়েত কনফারেন্সের কথা বলি। তারা সাইয়াফকে সালাম পর্যন্ত দেয়নি। শুধু এ কারণে তার কথাকে বন্ধ করে দিয়েছে যে, তিনি কুয়েতের প্রচার মাধ্যমগুলোর সমালোচনা করেছেন। একবার কান্দাহারে এক রাশিয়ান জেনারেল নিহত হল। তখন কুয়েতের আল কারসন পত্রিকায় লিখল, আফগান বিদ্রোহীরা রাষ্ট্রীয় শান্তিবাহিনীর এক নেতাকে হত্যা করেছে। তারা মুজাহিদ শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করতে চায় না। কখনো তারা প্রতিরোধ বাহিনী বলে, কখনো বিদ্রোহী, কখনো ডাকাত ইত্যাদি শব্দ মুজাহিদদের সম্পর্কে প্রয়োগ করে। তারা মনে করে,

আফগানের এই বিদ্রোহীরা ঐসব লোকদের হত্যা করছে, যারা রাষ্ট্রীয় শক্তি ও জগতের মাঝে হৃদ্যতা গড়ে তুলতে এসেছে। সুতরাং সৌদী আরব যা দিচ্ছে তার জন্য আল্লাহর হাজার শুকরিয়া। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যদি এমন দিত তাহলে কতই না ভাল হত। আমি তোমাদের আবার সতর্ক করিয়ে দিচ্ছি, আমরা কখনো কোন রাজা বাদশাহ বা শাসকের প্রশংসা করিনি এবং করবও না। আমরা আমাদের আসল আলোচনায় ফিরে যাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ ○

অর্থাৎ যারা অর্থ সংগ্রহে সরকারের পক্ষ থেকে নিয়োজিত হয় তাদের প্রয়োজন যাকাতের অংশ থেকেই পূরণ করতে হবে। আর যারা নও মুসলিম, তাদের হৃদয়কে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যও যাকাতের মাল দেয়া হবে।

যেমন মক্কা বিজয়ের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল রাসূল তাদের তুষ্টির জন্য অর্থকড়ি দিয়েছিলেন। এ কারণেই মক্কা বিজয়ের পর রাসূল যখন তায়েফ আক্রমণ করলেন, হাওয়াজিনদের পরাজিত করলেন, আর হুনাইনের যুদ্ধে প্রচুর গনীমতের সম্পদ হস্তগত হল, তখন রাসূল সেই গনীমতের মাল বণ্টন করতে শুরু করলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) নও মুসলিম ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে দিন। রাসূল বললেন, তাকে একশ উট দিয়ে দাও। এবং চল্লিশ উকীয়া চাঁদি দাও। আবু সুফিয়ান বললেন, আর আমার ছেলে ইয়াজিদ কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকেও একশত উট ও চল্লিশ উকীয়া চাঁদি দাও। আবু সুফিয়ান (রাঃ) এ অবস্থা দেখে তামান্না করলেন, হায়! আমার যদি দশজন সন্তান হত তাহলে প্রত্যেকেই একশত করে উট ও চল্লিশ উকীয়া করে চাঁদি পেত।

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া এল। সে তখনো মুশরিক ছিল। তবে হুনাইনের যুদ্ধে সে অংশ গ্রহণ করেছিল। রাসূল তাকে বললেন, হে সফওয়ান! এই দুই পাহাড়ের মাঝে যত বকরী আছে সব তোমার। রাসূলের এই দানশীলতা দেখে সে বলে উঠল, নবী ছাড়া অন্য কেউ এভাবে দান করতে পারে না। তারপর সে মুসলমান হয়ে গেল।

আরবের শীর্ষ নেতাদের সাথে ছিলেন আকরা ইবনে হারেস ও উয়াইনা ইবনে হাসান। রাসূল তাদের প্রত্যেককে একশত করে উট দিলেন। আব্বাস ইবনে মিরদাস নামক এক ব্যক্তি তখন রাসূলের নিকট এল। তখন রাসূল তাকে কয়েকটি উট দিলেন। সে চলে গিয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করল। কবিতাটি হল–

فأصبحَ نَهبي و نَهبُ العبيدي بين عيـــينـــةَ و الأقـــرعِ

و ما كان حصنٌ و لا حابسٌ يفوقانِ في مرادس في المجتمع

و ما كنتُ دون امرئ منهما   و مـــنْ تضعِ اليومَ لا يرفع

অর্থ : আমার এবং আমার অশ্ব আবিদীর ছিনতাইকৃত সম্পদ উয়াইনা ও আকরার সম্মুখে রাখা হল। আর হিসন ও হারেস তো লোক সমাজে মিরদাসের চেয়ে উপরে নয়। আমি তাদের চেয়ে নীচু ছিলাম না আর আজ যাকে নীচু করা হবে তাকে উপরে তোলা হবে না।

একথাগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল। রাসূল তা শুনলেন। তারপর বললেন, যাও, আমার পক্ষ থেকে তার জিহ্বা কেটে দাও। যদি নতুন নির্বোধ কোন মুজাহিদ হত, তাহলে গিয়ে তাকে বলত, তোমার জিহ্বা প্রসারিত কর। আমি তা এখন কাটব। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের কথার মর্ম বুঝলেন। গিয়ে তাকে কিছু অর্থ দিলেন। ফলে সে সন্তুষ্ট হয়ে গেল। এটাই ছিল তার জিহ্বা কাটার অর্থ।

এভাবে রাসূল অনেক অর্থ প্রদান করলেন। আবু জাহেলের ভাই হারেস ইবনে হিশামকে দিলেন। ইকরামা ইবনে আবু জাহেলকে দিলেন। সাঈদ ইবনে আমেরকে দিলেন। আবু লাহাবের পুত্র হুয়াইতর ইবনে আব্দুল উযযাকে দিলেন। এরা সবাই পরবর্তীতে সাচ্চা মু'মিন হয়ে গিয়েছিলেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে ইকরামার অবদানের কথা একবার স্মরণ করে দেখ। আবু সুফিয়ানও খাঁটি নিয়তেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হুনাইনের যুদ্ধের পর যখন তায়িফ আক্রমণ করলেন। তায়েফ অবরোধ করলে তায়েফের অধিবাসীরা তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। এক দিনেই কয়েক সাহাবীর চক্ষু আক্রান্ত হল। তখন আবু সুফিয়ান (রাঃ) এর চোখও আক্রান্ত হল। আবু সুফিয়ান তার চোখ নিয়ে রাসূলের নিকট গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাতাদা ইবনে নুমানের চোখের মত আমার চোখটিও ভাল করে দিন।

যুদ্ধে কাতাদা ইবনে নুমানের চোখ আক্রান্ত হয়েছিল। রাসূল তখন তার চোখ নিয়ে তার কোটরে স্থাপন করে দিয়েছিলেন ও মুছে দিয়েছিলেন। ফলে সে চোখে পূর্বের চেয়ে ভাল দেখা যেত।

আবু সুফিয়ান (রাঃ) এর কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনি চাইলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমি তা সুস্থ্য করে দিতে পারবো। আর যদি চান তাহলে জান্নাতে এর বিনিময়ে আপনাকে একটি চোখ দেয়া হবে। তখন আবু সুফিয়ান (রাঃ) তা মাটিতে নিক্ষেপ করে পদদলিত করলেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় তিনি একেবারে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন রণাঙ্গনের শেষ প্রান্তে অবস্থান করছিলেন। মুসলমানদের কেউ যদি রণাঙ্গন ছেড়ে যেতে চাইতো তখন তিনি জিহাদের ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করতেন।

চতুর্বিংশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٦٠)

অর্থ: যাকাত হলো ফকির-মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হলো আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তওবা ঃ ৬০)

আমরা وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا এর আলোচনায় এসে উপনীত হয়েছি। যারা যাকাতের অর্থ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত তারা। এদের পারিশ্রমিক এদের প্রয়োজন অনুযায়ী যাকাতের সম্পদ থেকেই দেয়া হবে। যেমন অন্যান্য চাকরিজীবীদের বেতন দেয়া হয়ে থাকে। তবে শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে সরকারী বেতন স্কেলের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের সম্মানি দেয়া হলে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। যেমন, যদি কোন যাকাত সংগ্রহকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী হয়। তারা সাধারণত একটু উঁচু শ্রেণীর চাকরিজীবী হয়ে থাকে। তাদের সম্মানি সাধারণত চার হাজার দেরহামের মত হয়ে থাকে। সুতরাং এ ধরনের কাউকে যাকাত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত করলে তাকেও চার হাজার দেরহাম দেয়া হবে। তবে এ বিষয়ে ফিকাহ বিশারদদের মাঝে মতবিরোধ রয়ে গেছে যে, যদি কোন হাশেমীকে যাকাত সংগ্রহের কাজে নিয়োগ দেয়া হয়, তাহলে কি তাকে যাকাতের মাল থেকে সম্মানি দেয়া হবে? ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, না, তাদেরকে যাকাতের মাল থেকে সম্মানি দেয়া হবে না। কারণ যাকাতের মাল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশের জন্য বৈধ নয়। তবে ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন– তাদের যাকাতের মাল থেকে সম্মানি দেয়া যেতে পারে। কেননা তা তার কর্মের বিনিময়। সরাসরি যাকাতের অর্থ দেয়া নয়। নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) কে ইয়ামেনে যাকাত সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এবং বনু হাশেমের অনেককেই খেলাফতের কাজে নিয়োগ দিয়েছিলেন। পরবর্তী খলীফারাও তাই করেছিলেন। আর বনু হাশেম কখনো সরাসরি যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। কারণ তাদের জন্য তো গনীমতের সম্পদের ও ফাইয়ের সম্পদের অংশ রয়েছে। তাদের জন্য গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ রয়েছে। তেমনিভাবে ফাইয়ের মালেরও এক-পঞ্চমাংশ রয়েছে।

কিন্তু এখন একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। তাহলো, এখন তো গনীমত ও ফাইয়ের মালের ব্যবস্থা নেই। এখন বনু হাশেমদের জন্য কী ব্যবস্থা করা হবে? যদি অবস্থা এমন হয় যে, যদি আমরা যাকাতের মাল না দেই তাহলে তারা অনাহারে কষ্ট পাবে। অথচ তারা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। এদের সম্মান, মর্যাদা ও ইজ্জত হলো হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর মতো। সুতরাং এদের ব্যাপারে কী করা হবে? ইয়েমেনে এরা প্রচুর। আফগানিস্তানেও এদের সংখ্যা অনেক। শাইখ সাইয়াফ তাদের একজন। তাই আমরা তাকে যাকাতের অর্থ থেকে কিছুই দেই না। কিছু কিছু ফকীহ বলেছেন– বনু হাশেমদের জন্য নফল দানের অর্থও গ্রহণ করা বৈধ নয়। তাই যদি তাদের যাকাতের ও নফল দানের অর্থ না দেই, তাহলে তাদের ব্যাপারে কী ফয়সালা করা হবে? তাহলে কী তারা অনাহারে মারা যাবে? তাদের দরিদ্ররা তো আর সরকারী কোন পদের চাকরিজীবী হয় না। তাই অধিকাংশ আলেম এ মত পোষণ করেন যে, বনু হাশেমের জন্য নফল সদকার মাল গ্রহণ করা বৈধ।

তবে সত্যাশ্রয়ী মতামত যাতে কোন সন্দেহ নেই তাহলো, বনু হাশেমের মধ্য হতে যারা একেবারেই দরিদ্র তাদের জন্য যাকাতের মাল গ্রহণ করা বৈধ হবে। এখন অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত পোষণ করে থাকেন। সুতরাং এ যুগে বনু হাশেমের কেউ গরীব হয়ে একেবারে অনন্যোপায় হয়ে গেলে তার জন্য যাকাতের মাল গ্রহণ করা বৈধ ও জায়েজ।

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ আর যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের যাকাতের মাল দেয়া হবে। অর্থাৎ যেসব মু'মিনের হৃদয় ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল তাদের ঈমান ও আমলকে শক্তিশালী করার জন্য রাসূল তাদের অর্থের মাধ্যমে সহায়তা করতে ইচ্ছে করলেন। তাহলে তারা রাসূলকে ভালবাসবেন। ইসলামকে ভালবাসবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশী গনীমতের মাল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন হুনাইনের যুদ্ধে। এর চেয়ে বেশী অস্থাবর সম্পদ অন্য কোন যুদ্ধে অর্জন করতে সক্ষম হননি। আর সবচেয়ে বেশী স্থাবর সম্পদ অর্জন করেছিলেন খায়বরের যুদ্ধে। তাই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা খায়বরের যুদ্ধের পরই তৃপ্তিসহ খেজুর খেতে সক্ষম হয়েছি।

রাসূল খায়বরে অর্জিত সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। এক অংশকে খেরাজী সম্পদ হিসেবে রেখে তা ইহুদীদের দায়িত্বে দিয়ে দিলেন। তারা তা পরিচর্যা করবে। সেঁচ দিবে। তারপর খেজুর হলে তার অর্ধেক নিবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আর অর্ধেক পাবে পরিচর্যাকারী ইহুদীরা। আর অর্ধেক এক হাজার আটশত ভাগে ভাগ করলেন। কারণ খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত। আর তাদের মাঝে দু'শত অশ্বারোহী ছিলেন। বারশত ছিলেন পদাতিক। পদাতিক প্রত্যেকে এক এক অংশ করে পেয়েছেন। তাই তারা বারশত অংশ পেয়েছেন। আর অশ্বারোহী প্রত্যেকে পেয়েছেন তিন অংশ করে। অশ্বের দু'অংশ আর আরোহী যোদ্ধার এক অংশ। এ হিসাবে তারা পেয়েছেন মোট ছয়শত অংশ। তাই বারশ' ও ছয়শ' অংশ মিলে মোট ১৮শত অংশ হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হিসাবে ১৪ শত সাহাবীর মধ্যে ১৮শ' অংশ ভাগ করে দিলেন। হুনাইনের যুদ্ধে রাসূল প্রচুর সম্পদ পেলেন। ছয় হাজার বন্দী নারী ও শিশু পেলেন। চব্বিশ হাজার উট পেলেন, চল্লিশ হাজার বকরি ও চল্লিশ হাজার উকীয়া চাঁদি পেলেন। আল্লাহ তা'আলা এভাবেই রাসূলকে প্রচুর সম্পদের মালিক বানালেন।

দুরাইদ ইবনে সামমা খায়বরের এক বর্ষীয়ান মানুষ। তার বয়স তখন প্রায় একশ' বিশ বছর। চোখে কিছুই দেখতে পায় না। হাওয়াযেনদের সরদার মালেক ইবনে আউফকে সে জিজ্ঞেস করলো, হে মালেক ইবনে আউফ! এই যে বকরী আর উটের চিৎকার শুনছি, শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনছি, এদেরকেও তুমি রণাঙ্গনে নিয়ে এলে? মালেক ইবনে আউফ বললো, তাদেরকে নিয়ে এসেছি তাদের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য। দুরাইদ ইবনে সামমা বললো, পরাজয় হলে কি তুমি তাদের ফেলে পালিয়ে যাবে?

মালেক ইবনে আউফ অত্যন্ত দুর্বার যুবক। সে বললো, আপনি কি মনে করছেন আমি তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো? আর যদি তোমরা তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাও তাহলে আমি তাদের হত্যা করবো।

এ সমুদয় সম্পদই হুনাইনের যুদ্ধে মালে গনীমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে। সেই হুনাইনের যুদ্ধের কাহিনী বলছি। মুসলমানরা যখন হুনাইন উপত্যকায় প্রবেশ করলো, তখন কাফেররা পাহাড়ের চূড়ায় তাদের অপেক্ষায় ছিল। সূর্যের আলো তখন ছড়িয়ে পড়ছে। হাওয়াযেনের যোদ্ধারা দেরি না করে বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। মুসলমানরা টিকে থাকতে না পেরে ছুটে পালাতে লাগলো। সাহাবায়ে কেরাম পালিয়ে গেলেন। যারা সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা পালিয়ে গেলেন। দু'হাজার যোদ্ধা যারা রাসূলের সাথে এসেছিলেন পালিয়ে গেলেন। মাত্র দশজন রাসূলের সাথে রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাদের মাঝে ছিলেন আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস। তিনি রাসূলের চাচাতো ভাই। তিনি আরবের প্রসিদ্ধ কবি। রাসূল ও রাসূলের স্ত্রীদের ব্যাপারে নিন্দামূলক কবিতা আবৃত্তি করতেন। মক্কা বিজয়ের সময় যখন আবু সুফিয়ান রাসূলের তাঁবুর

দরজায় এসে দাঁড়ালেন আর রাসূল তখন মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছে করছিলেন। উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূলকে বললেন, আপনার চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার এ চাচাতো ভাইতো আমার ইজ্জতে আঘাত করেছে। আমি তাকে দেখতে চাই না।

তখন আবু সুফিয়ান বললেন, আপনি বলে দিন যদি তিনি আমাকে গ্রহণ না করেন তাহলে আমি দিশেহারা ব্যক্তির ন্যায় পৃথিবীতে ঘুরে ফিরব। এবং অচিন দেশে মৃত্যুবরণ করবো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গ্রহণ করে নিলেন। তার ইসলাম গ্রহণ সুন্দর হলো। হুনাইনের যুদ্ধে তিনি রাসূলের পাশে অবিচল দাঁড়িয়ে রইলেন। রাসূলের গাধার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারা ছিলেন মাত্র দশজন। রাসূল তখন তার রিসালাতের মহিমা প্রকাশ করলেন। বললেন– أنا النبيُّ لا كذب ، أنا ابنُ عبد المطّلب আমিই নবী এতে কোন মিথ্যার লেশ নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান। তারপর রাসূল এক মুষ্টি ধূলিকণা তুলে নিয়ে কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। চার হাজার কাফেরের প্রত্যেকের চোখে তার কণা গিয়ে বিঁধল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। এখন যুদ্ধ উত্তপ্ত হবে। অথচ তখন রাসূলের সাথে মাত্র দশজন সাহাবী বিদ্যমান আর তার বিরুদ্ধে রয়েছে চার হাজার সশস্ত্র দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।

আব্বাস (রাঃ)-এর কণ্ঠ ছিল অস্বাভাবিক উঁচু। তিনি টিলার উঁচুতে ওঠে ডাক দিলে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত মদীনার লোকেরা তার আহবান শুনতো। তাই রাসূল তাকে বললেন, হে আব্বাস! গোত্রের লোকদের ডাক দাও। আব্বাস (রাঃ) একটি টিলার উঁচুতে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বললেন, হে বাবলা বৃক্ষের নিচে শপথ গ্রহণকারী সাহাবীরা! হে রাসূলের হাতে বাই'আত গ্রহণকারী সাহাবীরা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যে এগিয়ে এসো। কারণ আনসাররাই রাসূলের প্রকৃত প্রেমিক। তারা রাসূলকে রক্ষার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করবে না।

হ্যাঁ, তাই ঘটলো। কয়েকজন আনসার সাহাবী নেমে এলেন। ঘোড়া ছেড়ে তারা দৌড়ে এলেন। একশত আনসার সাহাবী রাসূলের চারপাশে এসে জড়ো হলেন। এরপর রণাঙ্গনের রুপ পাল্টাতে লাগলো। অন্যান্য মুহাজির ও আনসার সাহাবী এগিয়ে এলেন। ফলে রাসূল বিজয় লাভ করলেন। মক্কা ও তায়েফের মাঝে অবস্থিত জিইররানা নামক স্থানে গনীমত পাঠিয়ে দিয়ে একজন সাহাবীকে প্রহরী নিযুক্ত করলেন। বললেন, আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত তোমাকে এর দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলো।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফে গেলেন। তায়েফ অবরুদ্ধ করলেন। তারপর ফিরে এসে তা বণ্টন করতে ইচ্ছে করলেন। দেখলেন, যেসব নও-মুসলমান রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তারাও এসে হাজির হয়েছে। যারা পালাতে পালাতে বলেছিল, তোমাদের এ পরাজয় সমুদ্রে গিয়ে থামবে। তারাও এসে উপস্থিত হলো। তারা উট চায়। গনীমতের মাল চায়। যেনো তারা অপরাজেয় যোদ্ধা। আবু সুফিয়ান এগিয়ে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একশ' উট দিলেন, চল্লিশ উকিয়া চাঁদি দিলেন। তারপর আবু সুফিয়ান বললেন, আমার ছেলে ইয়াযীদ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকেও তেমনই দেয়া হবে। তারপর বললেন, আমার ছেলে মুআবিয়া? রাসূল বললেন, তাকেও তেমনি দেয়া হবে। হাকীম ইবনে হিযামকে একশত উট প্রদান করলেন। হারেস ইবনে হিশামকে একশত উট প্রদান করলেন। সুহাইল ইবনে আমরকে একশত উট প্রদান করলেন। হুয়াইতিব ইবনে আবদুল উযযাকে একশত উট প্রদান করলেন। মালেক ইবনে আউফকে একশত উট প্রদান করলেন। আলা ইবনে জারিয়াকে একশত উট প্রদান করলেন। এভাবে প্রত্যেককে একশত করে উট প্রদান করলেন। এদের সবাইকে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সম্পদ মক্কাবাসীদের মাঝে ও বেদুইনদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। মদীনার আনসারী সাহাবীদের কিছুই দিলেন না। যারা যুদ্ধের পট-পরিবর্তন করে দিলেন, তারা কিছুই পেলেন না। তখন তাদের মাঝে কেউ কেউ বলতে লাগলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গোত্রের লোকদের পেয়ে গেছেন, তাই আমাদের এ অবস্থা!

সা'আদ ইবনে উবাদা (রাঃ) রাসূলের নিকট এলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমার গোত্রের লোকেরা তো বিরুপ মন্তব্য করছে। রাসূল তাকে বললেন, তুমিও কি তাদের মতো? তিনি বললেন, আমি তো তাদেরই একজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন, তাদের সবাইকে জড়ো করো। রাসূল এলেন। তাদের লক্ষ্য করে বললেন–

হে আনসারী! তোমাদের একি কথা আমার নিকট পৌঁছেছে? মনে মনে তোমরা আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করছো, আমি কি তোমাদের নিকট তখন আসিনি যখন তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে? তারপর আমার রব আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। আমি কি তোমাদের নিকট অস্বচ্ছল অবস্থায় আসিনি? অতঃপর তিনি তোমাদেরকে স্বচ্ছলতা দান করেছেন। তোমরা কি পরস্পর শত্রু ছিলে না? তারপর আল্লাহ তোমাদের মাঝে বন্ধুত্ব ভাব সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

তারা স্বতঃস্ফুর্ত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ।

তারপর রাসূল বললেন, হে আনসারী সাহাবীরা! তোমরা কি আমার ডাকে সাড়া দেবে?

তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার যে কোন ডাকে সাড়া দিব।

রাসূল বললেন, হে আনসারী সাহাবীরা! যদি তোমরা চাইতে তাহলে বলতে পারতে, আর তোমরা তোমাদের কথায় অবশ্যই সত্যবাদী হতে। তোমরা বলতে পারতে, আপনি আমাদের নিকট মিথ্যাবাদী হয়ে এসেছিলেন আর আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আপনি আমাদের নিকট বিতাড়িত হয়ে এসেছিলেন। আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। নিঃস্ব-বিত্তহীন অবস্থায় এসেছিলেন, আমরা আপনাকে অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছি।

হে আনসার সাহাবীরা! তোমরা তোমাদের অন্তরে দুনিয়ার তুচ্ছ বস্তুর আকর্ষণ বোধ করছো, যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এক জাতি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আগ্রহী হয়েছে।

সুতরাং হে আনসারী সাহাবীরা! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মানুষ তাদের বাহনের সাথে উট আর বকরী নিয়ে যাবে, আর তোমরা তোমাদের সাথে আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে যাবে! আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি হিজরত না হতো তাহলে আমি আনসারদের একজন হতাম। যদি লোকেরা এক পথে চলে আর আনসাররা চলে আরেক পথে, তাহলে আমি আনসারদের পথে চলবো। হে আল্লাহ! আনসারদের প্রতি রহম কর। আনসারদের সন্তানদের প্রতি রহম কর। আনসারদের সন্তানদের প্রতি রহম কর। তখন আনসারী সাহাবীরা কাঁদতে কাঁদতে তাদের দাঁড়ি ভিজিয়ে ফেললো। তারা বললো, আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে পেয়ে সন্তুষ্ট। আমরা তাতেই আনন্দিত ও মুগ্ধ।

কিন্তু আব্বাস ইবনে মিরদাস এ বন্টনে সন্তুষ্ট হলো না। রাগে-ক্ষোভে ফিরে গেল। রাসূলের নিন্দা করে কবিতা রচনা করল। এরা সর্বদা দুনিয়ার পিছনে পড়ে থাকে। যখন জিহাদের আহবান আসে পালিয়ে যায় আর যখন গনীমতের মালের সন্ধান পায় তখন ফিরে আসে। কিন্তু যারা বীর, যারা উঁচু মানসিকতার লোক, তারা কখনো এরূপ করে না। জাহেলী যুগের কবি আনজার- এর কবিতা দেখ-

أغشَى الوغَى و أعفُ عن المغنمِ —

অর্থ : আমি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি আর গনীমতের মালের ব্যাপারে আমি উদাস হয়ে থাকি।

তাই বলছি, প্রকৃত বেদুইন তো ঐ ব্যক্তি, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারপর জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে। তাকে তার গনীমতের অংশ বন্টন করে দিলে সে বললো, এটা আবার কী? রাসূল বললেন, এ তোমার অংশ। বেদুইন বিস্মিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর জন্য তো আমি আপনাকে অনুসরণ করছি না, আর এ জন্য তো আমি আসিনি! তারপর কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, আমি তো এ জন্য জিহাদে এসেছি যে, আমার এখানে আঘাত করা হবে। তারপর আমি জান্নাতে প্রবেশ করব। এরপরই সেই বেদুইন আরেকটি জিহাদে

অংশগ্রহণ করল এবং তার ইঙ্গিতকৃত স্থানে আক্রান্ত হয়ে শাহাদতবরণ করল। রাসূল শুনে জানতে চাইলেন, এ কি সেই ব্যক্তি? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূল বললেন, সে সত্য বলেছে তাই আল্লাহ তার সত্যকে বাস্তবায়িত করেছেন।

ভাই! তুমি তো জিহাদ করার কথা বলছো, কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছো, তুমি আসলে কেন এসেছো? কী তোমার উদ্দেশ্য?

যেসব আনসারী সাহাবী প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দীনের সাহায্যের জন্যই তৈরি করেছিলেন। দীনের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। সুতরাং যারা দাঈ হবে তাদের মনোবল অনেক মজবুত হতে হবে। অনেক শক্তিশালী হতে হবে। তারা কখনো দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থের দিকে তাকাতে পারবে না। মানুষ যে অবস্থায় জীবন-যাপন করে, তাদেরকে আরো উর্ধ্বে উঠে জীবন-যাপন করতে হবে। যখন তুমি দেখবে, লোকেরা দিরহাম আর দীনারের জন্য যুদ্ধ করছে, তখন তারা কান্দাহার, নাঙ্গরহার পদানত করার চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। যদি কেউ বলে আমাদের বেতন এতো এতো টাকা। তখন তারা বলে, আমাদের মধ্য হতে অমুক অমুক শহীদ হয়ে গেছে। কেউ যদি বলে তোমাদের নিকট এলে আমাদের দুনিয়ার অংশ কমে যাবে, তখন তাদের দেখবে তারা ক্ষুধা আর পিপাসায় দিন-রাত কাটাচ্ছে। জনৈক কবি বলেছেন–

إذا كان بعضُ المال ربًا لأهْلِـه   فإني بحمد الله مـــالي معبد

অর্থ : যদি কিছু অর্থ কারো জন্য রব হয়ে যায়, তাহলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা আল্লাহরই সকল প্রশংসা যে আল্লাহ ছাড়া আমার কোন মা'বুদ নেই। পৃথিবীতে কিছু লোক আছে এরা অর্থের গোলাম। এরা দিরহাম আর দীনারের গোলাম। এ ধরনের লোকদের জন্য রাসূল বদ দু'আ করেছেন। বলেছেন–

تَعِسَ عبدُ الدينارِ و عبدُ الدرهمِ و عبدُ الخميصةِ ، إن أعْطِي رَضِيَ و إنْ لم يُعطَ سَخِطَ ، تَعِسَ و انتَكِسَ و إذا شِيكَ فلا انتُقِشَ ـــ

অর্থ : ধ্বংস হোক দীনার আর দিরহামের গোলামরা, মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদের গোলামরা। যদি তাদের অর্থ দেয়া হয়, তাহলে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আর যদি দেয়া না হয়, তাহলে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তারা ধ্বংস হোক। অধঃমুখে নিপতিত হোক। তারা কাঁটা বিদ্ধ হলে আল্লাহ যেন তাদের কাঁটা বের না করেন।

আর যারা আত্মত্যাগী, তাদের প্রশংসা করে বলেন–

طُوبى لعبدٍ أخَذَ بعِنانِ فرَسِه يَطيرُ علَى متْنِه كلَّما سمِع فزعـــةً أو هيعةً طار إليها يَبتَغِي الموتَ ـــ

অর্থ : আল্লাহর ঐ বান্দার জন্য সুসংবাদ, যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে তার পিঠে চড়ে উড়ে যায়। যখনই কোন ভয়ের বা আতংকের কিছু শোনে, মৃত্যুর তামান্নায় তার দিকে ছুটে যায়।

এ ধরনের লোকেরা কখনো দুনিয়ার দিকে তাকায় না। দুনিয়া তাদের নিকট এলে তা তাদের হাতের মাঝেই থাকে। হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে না। দুনিয়া তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম; লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়। তারা জীবন ধারণের জন্য খায়, খাওয়ার জন্য জীবন ধারণ করে না। আল্লাহর নিকট আমি আবু আব্দুল্লাহ উসামা বিন লাদেনের জন্য দু'আ করি, আমার দু'চোখ তার মতো মানুষ দেখেনি। হজ্ব বা উমরায় যখনই জিদ্দায় আমি তার বাড়িতে গিয়েছি কখনো কোন চেয়ার-টেবিল দেখিনি। অথচ তার জর্দান বা মিশরের যে কোন কর্মচারীর বাড়ি তার বাড়ি থেকে সুন্দর। তাদের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে আসবাবপত্র দেখতে পাবে। এ সত্ত্বেও তুমি যখনই আফগান মুজাহিদদের জন্য এক মিলিয়ন রিয়াল চাবে, সাথে সাথে সে চেক লিখে দিবে।

একদা সে তার এক বোনের কাছে গেল। জিহাদ বিল মালের প্রসঙ্গে ফতওয়া ইবনে তাইমিয়া খুলে তার সামনে রাখল। তখন তার বোন চেক বের করে আট মিলিয়ন রিয়াল লিখে দিল। তার এই দানের কথা শুনে

পরিবারের লোকেরা ছুটে এল। বলল, তুমি কি পাগল! একবারেই এতগুলো অর্থ দিয়ে দিলে। আরে তুমি এটা করলে কী? মুসলমান নারীরা না দেয়ার জন্য নানাভাবে বুঝাতে লাগল। আর পুরুষরা লাগল তার স্বামীর পেছনে। অবশেষে তার বোন দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেল। কেউ কেউ বলল, তুমি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাক। কমছে কম এক মিলিয়ন রিয়াল দিয়ে একটি বাড়ি বানিয়ে নাও। এভাবে বুঝাতে লাগল। অবশেষে সত্যই তার বোন এলো। এক মিলিয়ন নিয়ে তা দিয়ে একটি বাড়ি বানাবে। উসামাকে বলল, ভাই! আমাকে তা থেকে এক মিলিয়ন দাও। আমি তা দিয়ে একটি বাড়ি তৈরি করব।

উসামা বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি একটি রিয়ালও নিও না। তুমি তো ফ্ল্যাট বাড়িতে আরামে আছো। আর আফগানে গিয়ে দেখ। মানুষ না খেয়ে মরছে। থাকার জন্য তাঁবু পর্যন্ত পাচ্ছে না।

অথচ সেই উসামা তোমার সাথে বসলে তুমি মনে করবে সে একজন খাদেম। মাশাআল্লাহ! যেমন ভদ্র তেমনি সাহসী। অসীম সাহসী। আমি শাইখ সাইয়াফকে বললাম, আপনি তাকে নির্দেশ দিন, সে যেন এখানে থাকে। রণাঙ্গনে না যায়। সবসময় সে রণাঙ্গনে যাওয়ার জন্য পাগল। প্রায়ই রক্তচাপ কমে যায়। তাই তার পকেট লবণে ভরা থাকে আর সাথে থাকে পানির ক্যান। যখনই রক্তচাপ কমে যেত, দুর্বলতার কারণে হাঁটতে পারত না। পানির সাথে লবণ গিলে খেত। তাহলে রক্তচাপ বেড়ে যেত। তোমরা বিশ্বাস করবে না, সে আমার বাড়িতে এলে যদি টেলিফোন বেজে ওঠে, সাথে সাথে ছুটে যায়। ফোনটি নিয়ে এসে আমাকে দেয়। দাঁড়ানোর একটু সুযোগও দেয় না। আল্লাহ তাকে ভদ্রতা, শালীনতা ও বীরত্ব দান করেছেন। আশা করি, আল্লাহ তাকে হেফাজত করবেন। তার দ্বারা ইসলামের মহান খেদমত নেবেন।

বন্ধুরা! শোনো, যে কোন মহান কাজের শুরু কিন্তু সাধারণ মানুষ দ্বারা হয় না। প্রয়োজন হয় মহান ব্যক্তিত্বের। তুমি কি চাও এক পয়সা দিয়ে বা এক রিয়াল দিয়ে জান্নাতে যাবে? এক রিয়াল দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবে না। তার জন্য চাই কুরবানী। চাই আত্মত্যাগ।

আফগানিস্তানের এই যুদ্ধে বহু মানুষ অপরিসীম কুরবানী করেছে। ভাই নুরুদ্দীন তাদের একজন। সে এখন সেনানিবাসের প্রধান। আর আবু বুরহানও তাদের একজন। সে এখন রণাঙ্গনে লড়ছে। নূরুদ্দীনের পিতা জর্দানের একজন মন্ত্রী। আর সে ওমানের এক বিরাট কোম্পানীর প্রধান ছিল। ইস্কান্দারিয়া থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিল। এতো কিছু সত্ত্বেও সে আফগানিস্তানে এলো। কিছু ছবি তুলে ফিরে গেল। ওমানে গিয়ে তার এলাকার মসজিদে জুম'আর দিন এক অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিল। তার পরদিন সে আমার নিকট এসে বলল, আমি আবার আফগানিস্তান যেতে চাই। বাড়িতে বালিশের নিচে একটি পত্রে লিখে এল, আমি আফগানিস্তানে যাচ্ছি। আমার সম্পর্কে আর খোঁজ নিয়ে লাভ নেই। সেই যে এলো। এখনো আর ফিরে যায়নি।

ভাই আবু দাউদ। সে এখন খিদমত বিভাগের প্রধান। তার পিতা ওমানের এক বিরাট ব্যবসায়ী ছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় লেখাপড়া করে সেখান থেকেই উত্তীর্ণ হয়েছিল। সে তার পিতাকে বলল, আমি লেখাপড়া শেষ করার জন্য যাচ্ছি। পিতা বললেন, কোথায় যাচ্ছো? সে বলল, ড. আব্দুল্লাহ আযযামের নিকট যাচ্ছি। আচ্ছা, তুমি ড. আব্দুল্লাহ আযযামের নিকট যাচ্ছো? তাকে মাসে কত টাকা বেতন দিতে হবে? হ্যাঁ, আমি তাকে অধিক বেতন দেবো, তবে তাকে আমার বাড়িতে এসে পড়াতে হবে। সে বলল, না, তা কি হয়। ইলমের অনুসন্ধান করা আমাদের জন্য ফরজ। সুতরাং আমিই তার নিকট যাবো। আসল কথা হলো, সে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছে। তারপর সে আফগান রণাঙ্গনে চলে এলো।

আবু হুযায়ফা বেশক'টি বিদ্যালয়ের মহাপরিচালক ছিল। তার পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে আঠার হাজার ছাত্র লেখাপড়া করত। সে সবকিছু ফেলে আফগান রণাঙ্গনে চলে এলো। আবুল হাসান মাদানীও তারই মতো এক আত্মত্যাগী মানুষ। সে আব্দুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ডক্টর ছিল। আমেরিকায় বসবাস করত। সেখানে ছিল তার কর্মস্থল। সবকিছু ফেলে সে পেশোয়ারে চলে এলো। জিহাদে আত্মনিয়োগ করল।

তাই বলছিলাম, কিছু করতে হলে আত্মত্যাগী একদল মানুষ চাই। তা না হলে কিছু করা সম্ভব নয়। এই জিহাদী প্রোগ্রাম আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আত্মত্যাগ ও কুরবানী ছাড়া তা কিছুতেই চলতে পারে না। বাঁধা-বিপত্তিও আসবে। সবকিছুকে ডিঙ্গিয়ে সামনে চলতে হবে। অর্থনৈতিক বাঁধা আসবে। স্ত্রী-পরিজনের পক্ষ থেকে বাঁধা আসবে। আর মনে রাখবে, দু'টি বিষয়ই তোমার মাঝে প্রেরণা-উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে– ১. মুসলিম জাতির চিন্তা, ২. খাহেশাতে নফসের চিন্তা। হয়তো তুমি মুসলিম উম্মাহর কষ্ট বেদনাকে নিজের বেদনা মনে করবে। এবং তার জন্য কুরবানী ও মুজাহাদা করবে। আত্মবিলীন করে দিবে। আর তা না হলে খাহেশাতের ডাকে সাড়া দিয়ে স্ত্রী-পরিজন নিয়ে খাঁচায় থাকবে। এর মাঝেই ঘুরপাক খেতে থাকবে।

আমি একদা শাইখ তামীম আদনানীকে বললাম, হয়তো আপনাকে আবার তারা সৌদি আরবে আপনার চাকরিতে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, আমার বেতন সর্বমোট মাসে চব্বিশ হাজার পাঁচশ রিয়াল ছিল। আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি তারা এখন আমাকে মাসে এক লাখ রিয়ালও দেয়, তবুও আমি জিহাদ ছেড়ে যাব না। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর, প্রতি লোকমা খাবার তিনি দীনের জন্য খান। তিনি তার পরিজনকে কাতারে রেখে চলে এসেছেন। তার যে কতো ঋণ আছে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। কিছুদিন পূর্বে আমি ও তিনি এক কামরায় ছিলাম। তখন এক ভাই তার দুরবস্থার কথা বলতে এলো। তার কিছু অর্থের প্রয়োজন। শাইখ তামীম তার কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। তিনি যখনই কোন মুজাহিদের খারাপ অবস্থা দেখেন বা শুনেন, তখনই তার চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সেই ভাই বেরিয়ে গেলে শাইখ আমাকে বললেন, তার ঋণ আমার জিম্মায়। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আপনি এ কী করছেন। আপনার জিম্মায় তো এখন এক লাখ দেরহাম ঋণের বিরাট বোঝা রয়েছে। তিনি বললেন, আল্লাহই তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেবেন।

এরা হলো নমুনা। এরা হলো দৃষ্টান্ত। এদের ছাড়া কখনো ইসলাম বিজয়ী হতে পারে না। এদের ছাড়া কোন জিহাদী কাফেলা চলে না। কোন কাজেই সফলতা অর্জন করা যায় না। আর কিছু লোক সব সময়ই অর্থের পেছনে ছুটতে থাকে। এরা অর্থ চায়। গনীমতের মাল চায়। ন্যায়-অন্যায়ের কোন বালাই তাদের নেই। যেখান থেকে যা পায় তাই লুফে নেয়। এরা হলো বোঝা। এরা কখনো তোমাকে সাহায্য করবে না। তারা সর্বদা তোমার সাহায্য চাইবে। এর অনেক উপমা রয়েছে। অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অনেক ঘটনা ও কাহিনী রয়েছে। এগুলো বর্ণনা করা এখন সম্ভব নয়। কিন্তু এগুলোর দিকে ফিরে তাকিয়ে হিম্মতহারা হওয়া যাবে না। এগুলোকে অতিক্রম করতে হবে। ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে। তাহলেই জিহাদের কাফেলা বীর বিক্রমে সামনে এগিয়ে যাবে। বিজয় মাল্য ছিনিয়ে আনবে। তা না হলে থেমে যাবে তার গতি, থেমে যাবে বিজয় অভিযান।

এ ক্ষেত্রে আফগানীদের উপমা খুবই চমৎকার। এদের একেকজন সেনাপতি সম্পর্কে, একেকজন মুজাহিদ সম্পর্কে যদি তুমি লিখতে চাও, তাহলে বৃহদাকারের পুস্তক লিখতে পারবে।

এই যে সফীউল্লাহ, মাত্র তিন দিন আগে শহীদ হয়েছেন। পনের বৎসর বয়স থেকে সেই যে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন, সেই যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন তা আর ক্ষণিকের জন্য থামেনি। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ত্রিশ বৎসর। হেরাতে তার ভাই-ই সর্বপ্রথম ইসলামী কার্যক্রম শুরু করেছেন। শিয়া বিপ্লবের পূর্বে ১৯৭৫ সালে পাঞ্জশীরের যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়েছেন। তার নাম শুনলে রুশরা থর থর করে কাঁপত। তিনি ইরানে গেলে ইরান সরকার তাকে খুব সম্মান করত। এতো সাহসী ছিলেন যে, একাই শত্রুদের শিবিরে প্রবেশ করতেন। এই যে ইসলামী কেল্লা যা তিনি নিজে একা পদানত করেছিলেন, তিনি তাতে একা প্রবেশ করেছিলেন। তিনি তখন বাংকারে কমিউনিস্টদের এক নেতাকে খুঁজছিলেন। তিনি হাত প্রসারিত করে বললেন, বেরিয়ে এস। কমিউনিস্ট নেতা বলল, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি সফীউল্লাহ। তখন কমিউনিস্ট নেতা বলল, অন্য কেউ আমাকে গ্রেফতার করার চেয়ে আপনি গ্রেফতার করা অনেক উত্তম।

তিনি এমন মহান চরিত্রের ছিলেন যে শত্রু-মিত্র সবাই তাকে সম্মান করত। সব দলের লোকের নিকট তিনি ছিলেন প্রিয়পাত্র। এই তো কিছুদিন আগের ঘটনা। তাহের এসে বলল, সফীউল্লাহর বাড়ির জন্য ভাড়া দিন। কারণ তিনি এখন যে বাড়িতে থাকেন তা স্যাঁতসেতে। আরো অনেক সমস্যা সেখানে। তাঁর নিজের পরিজন প্রায় দশজন। তাছাড়া তার বাড়িতে বেশকিছু মুজাহিদও থাকে।

আব্দুল ওয়াদুদ খানের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। তিনি বদখশানের অবিসংবাদিত সেনাপতি ছিলেন। দু'মাস পূর্বে তিনি শহীদ হয়েছেন। তার পরিবার থেকে ষাট জন শহীদ হয়েছেন। তার পিতা, তার চার ভাই, এভাবে এক এক করে ষাট জন। রাশিয়ানদের সামনে তিনি এক অনতিক্রম্য সুউচ্চ পর্বততুল্য। রাশিয়ায় প্রবেশ করে রাশিয়ানদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করতেন। তাদের এই অচিন্তনীয় কুরবানী ছাড়া, তাদের এই অনুপম দৃষ্টান্ত ছাড়া এই জিহাদী কার্যক্রম, এই দাওয়াতী প্রোগ্রাম সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। কবি বলেন–

لنْ يسْلَمَ الشَرفُ الرفيعُ مِن الأذَى حتَّى يُـــراقَ على جَوانبِـــه الـــدَّمُ

অর্থ : উঁচু মর্যাদা অর্জন করা কখনো কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিরাপদ থাকে না। তার চারপাশে রক্ত ঢেলে দিলেই তা অর্জিত হয়।

শুনে রাখ, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ ব্যয় করতে কৃপণতা করে, সে তার জীবন দিতেও কৃপণতা করবে। কিছুতেই সে তার জীবন বিলিয়ে দিতে পারবে না। কারণ ধন-সম্পদ জীবনের চেয়ে অনেক সস্তা। তুমি তোমার জীবন রক্ষার জন্য তোমার জীবনে সঞ্চিত সমুদয় সম্পদ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করো না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(١٩) إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ○ (٢٠) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ○ (٢١) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ○ (٢٢) إِلَّا الْمُصَلِّينَ ○

অর্থ : মানুষকে ভীরুরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে আর যখন কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা স্বতন্ত্র যারা নামায আদায় করে।

(সূরা মাআরিজ ঃ ১৯-২২)

বস্তুত, আল্লাহ তা'আলা একদল নির্ভীক আরব মুজাহিদের মাধ্যমে আফগানিস্তানের জিহাদকে সমুন্নত করেছেন। আর আমি একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, বিবাহিতরাই প্রকৃত পক্ষে জিহাদের চালিকাশক্তি। এরা যদিও ভারি কিন্তু চালিকাশক্তি। তারা বহু গুরুত্বপূর্ণ বোঝা বহন করে। আর যুবকরা নিঃসন্দেহে ক্ষিপ্র। বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে। তবে অনেক অনেক এমন কাজ রয়েছে যা বিবাহিতদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। তাদের স্ত্রী পড়ে আছে, তাতে তাদের দুঃখ নেই। এটা এমন এক হিজরত যা থেকে ফিরে যাওয়ার আশা তাদের নেই। পক্ষান্তরে অবিবাহিতরা প্রত্যেক দিন নতুন নতুন শহরে, নতুন নতুন এলাকায় যেতে চায়। তাদের মাথায় থাকে বিয়ের চিন্তা। বর্ণিত আছে–

غزا نبيٌّ منَ الأنبياء ، فقال: لا يَصحبُني رجلٌ خطَبَ امرأةً و لم يَبْنِ بها، أو رَفَعَ بناءً و لم يُتمَّ سقفَه، أو كانتْ له خلفاتٌ حاملةٌ و لم تَلدْ ـــ

অর্থ : জনৈক নবী জিহাদে যাওয়ার প্রাক্কালে বললেন, আমার সাথে এমন লোক জিহাদে যাবে না, যে কোন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে অথচ বিয়ে করে এখনও মধুযামিনী পালন করেনি; আর যে ব্যক্তি বাড়ি তৈরি করেছে অথচ এখনও তার ছাদ দেয়নি; আর যে ব্যক্তির স্ত্রী গর্ভবতী অথচ তার স্ত্রী এখনও প্রসব করেনি।

এর কারণ হলো, এ ধরনের লোকদের হৃদয়ে রণাঙ্গন থাকবে না। এরা সর্বদা অন্য চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকবে। তবে যারা তাদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে তাদের ব্যাপার ভিন্ন।

যাদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হবে, তাদের মধ্য থেকে এক শ্রেণী হলো– وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ অর্থাৎ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য একশ্রেণীর মানুষকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা হবে। বর্তমান যুগে কি এ ধরনের লোকদের যাকাতের অর্থ দেয়া হবে? হযরত উমর (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), আমের শা'বী (রহঃ) সহ অনেকে বলেছেন– ইসলামের বিজয় হয়ে যাওয়ার পর তখন আর সেই অংশ বাকি নেই। সুতরাং কারো মনোরঞ্জনের জন্য যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না। আবু হানীফা (রহঃ)-এর অনুসারীরা বলেছেন– আর ইমাম মালেক (রহঃ)-এরও এই মত যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কাফিরদের শক্তিকে নির্মূল করে দিয়েছেন আর ইসলামকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন, তখন সাহাবীরা আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর যুগে এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, তাদের অংশ রহিত হয়ে গেছে।

এ কারণেই দেখা যায়, আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে যখন আকরা ইবনে হারেস ও উয়াইনা ইবনে হুসাইন এসে বলল, আমাদের যাকাতের অংশ আমাদের প্রদান করুন। তখন আবুবকর (রাঃ) উমর (রাঃ)-এর নিকট একটি পত্র লিখলেন। তিনি তখন বাইতুল মালের জিম্মাদার ছিলেন। লিখলেন, অমুককে অমুককে এতো এতো পরিমাণ দিয়ে দাও। তারা গিয়ে পত্রটি উমর (রাঃ)কে প্রদান করলে তিনি তা পাঠ করে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর বাতাসে উড়িয়ে দিলেন।

তারা এ অবস্থায় হতবাক হলো। ক্রুদ্ধ হলো। ফিরে এলো আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট। বলল, আচ্ছা বলুন তো, আপনি খলীফা না উমর? আমরা তা বুঝতে চাই। আবুবকর (রাঃ) বললেন, তিনি, যদি আল্লাহ তা চান। দেখো, একটু চিন্তা করো, তাদের মাঝে কেমন ভদ্রতা, কেমন সহমর্মিতা ছিল। কীভাবে একে অপরকে শ্রদ্ধা করতেন। ভালবাসতেন। তাদের পরস্পরের মাঝে কেমন ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল। এমন অবস্থা না হলে মুসলমানরা বিজয় লাভ করতে পারে না। আর এমন অবস্থা হলেই একে অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আত্ম-বিসর্জন দিতে লাফিয়ে উঠে।

আমি এখন তোমাদেরকে রকস মাকরুনের একটি ঘটনা শুনাবো। এই রকস মাকরুন ছিলেন খৃস্টান চোরাকারবারী। আব্দুন নাসেরের সময় রাষ্ট্রের হাতে সে ধরা পড়ে যায়। খৃস্টান চোরাকারবারী। তাকে জেলখানায় রাখবে! তাকে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদের সাথে রাখলো। কারণ সরকারী লোকেরা সাধারণ কোন বন্দীকে তাদের নিকটবর্তী হতে দেয় না। আর ইহুদী-খৃস্টানদের সম্পর্কে বলে, ইখওয়ানের সদস্যরা তাদের উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না। তাই তারা সেই খৃস্টান চোরাকরাবারীকে তাদের মাঝেই বন্দী করে রাখল। তখন সেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটল। সেও তাদের মাঝে ছিল। সেখানে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সাদস্যদের উপর ব্রাশফায়ার করা হলো। নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। রকস মাকরুন বলে, আমি তাদের সাথে ছিলাম। আমি একটি বাক্সের পশ্চাতে লুকিয়ে রইলাম। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। আমি বাক্সের পশ্চাৎ থেকে দেখলাম, অবিবাহিত যুবক বন্দীরা বুক পেতে গুলী ধারণ করতে প্রস্তুত হয়ে আছে, আর বিবাহিত ভাইদের সরিয়ে দিচ্ছে। তারা বলছে, আমরা আপনাদের আগে মরতে চাই। আপনারা আপনাদের সন্তানদের জন্য বেঁচে থাকুন। রকস মাকরুন বলে, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি তখন আমাকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করেছিলাম। তারপর সে জেল থেকে বেরিয়ে একটি পুস্তিকা লিখেছিল। নাম রাখলো– أقسمت أن أروي। খৃষ্টান হয়েও সে এ পুস্তিকাটি লিখেছিল। সে লিখেছে, তখন সাঁইত্রিশ জন ইখওয়ানের সদস্যকে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের অনেকে ছিল এডভোকেট, অনেকে ইঞ্জিনিয়ার, আলেম। তাদের গোশত দেহ থেকে ছিঁড়ে দেয়ালে গিয়ে লেগেছিল। হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে দূরে পড়েছিল। এমনিভাবে তাদের উপর ব্রাশফায়ার করা হয়েছিল।

তাই বলছি, ইসলামী দলগুলো যদি এ ধরনের হয়, তারা পরস্পরে পরস্পরকে এমন গভীরভাবে ভালবাসতে পারে, মহব্বত করতে পারে, অন্য ভাইকে রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারে; তবেই বিজয় বয়ে আনতে পারবে। অন্যথায় পারবে না।

তবে الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ সম্পর্কে প্রবলতর কথা হলো, যখন ইসলাম দুর্বল হয়ে যাবে তখন ইসলামের স্বার্থে যাকাতের অর্থ প্রদান করে কারো কারো মনোরঞ্জন করা যেতে পারে। যেমন বর্তমানে আফগানিস্তানের বিভিন্ন দলের কমান্ডাররা করছেন। তারা প্রয়োজনে কবিলার নেতাকে অর্থ দিয়ে মনোরঞ্জন করে। ফলে তারা তাদের গমনাগমনের পথ ছেড়ে দেয়। আর তা না করলে পথ বন্ধ করে দেয়। তাই বাধ্য হয়ে তাদের যাকাতের অর্থ থেকে দিয়ে তাদের মনোরঞ্জন করতে হয়। জিহাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্যই তারা তা করে থাকে। কবিলার নেতারা পথ বন্ধ করে দিলে তাদের কিছু অর্থকড়ি দিলে পথ খুলে দেয়, জিহাদের পথে কোন বাঁধা সৃষ্টি করে না।

এখন আমরা যে স্থানে আছি সে স্থানটিকে শাইখ সাইয়াফ কিভাবে পদানত করেছেন, তা জানো? তিনি যখন এ স্থানে এলেন তখন এর স্থানীয় লোকেরা এসে বলল, আপনি কীভাবে আমাদের এখানে থাকবেন? আমরা তো আমাদের জমিন ও বৃক্ষসমূহের মুহতাজ। এগুলো তো আমরা এমনিতেই ছেড়ে দিতে পারি না। তিনি তখন বললেন, আমি আপনাদের কথা শুনে দারুন বিস্মিত হচ্ছি। আমি ধারণা করেছিলাম, আপনারা এসে বলবেন, আমাদের এই ছেলেরা আপনার সৈন্য। অথচ আপনারা এসে বলছেন, আমাদের জমিন, গাছপালা ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। এটা কেমন কথা? তখন তারা নিজেরাই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে ফিরে যায়। তাই বলছি, এ আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যায়নি। বরং প্রয়োজনে এখনো এ আয়াতের মর্মানুযায়ী আমল করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন وَفِي الرِّقَابِ অর্থাৎ যাকাতের অর্থ গোলাম-বাঁদীর মুক্তির জন্যও ব্যয় করা হবে। তাদের যাকাতের অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতে হবে। তবে এখানে একটি আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, যাকাতের অর্থ দিয়ে ঐ মুসলামনদের মুক্ত করা বৈধ হবে কি যারা কাফিরদের হাতে বন্দী অবস্থায় আছে? আল্লামা ইবনে হাবীব বলেন, যাকাতের অর্থ দিয়ে যদি মুসলমানদের দেশে বিদ্যমান মুসলমান গোলামকে ক্রয় কবে মুক্ত করা যায় তাহলে তো কাফেরের হাতে বন্দী মুসলমান গোলামকে মুক্ত করার জন্য তা ব্যয় করা অধিক উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, الْغَارِمِينَ অর্থাৎ যাকাতের অর্থ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ আদায়ে সহায়তার জন্য প্রদান করা যাবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ঝগড়া মিটিয়ে দেয়ার জন্য নিজের পক্ষ থেকে দিয়্যত আদায় করে দেয় অথবা দুই কবিলার মাঝে অর্থ ব্যয় করে এরা যদি এ কারণে ঋণ প্রার্থনা করে, তবে তাদের যাকাতের অর্থ থেকে অর্থ দেয়া হবে। তারা অর্থশালী হলেও তাদের তা দেয়া হবে। এটা ইমাম শাফেয় ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মাযহাব। এর সমর্থনে তারা কুবাইসা ইবনে মুখারেকের হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি হলো–

تَحَمَّلْتُ حَمَالَـةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم أَسْأَلُـه فيها ، فقال : أَقِمْ حتى تَأْتِيَنَا الصدقةُ فنأمُرُلك بها ـــ

অর্থ : আমি এক ব্যক্তির ঋণের বোঝা আমার উপর চাপিয়ে নিলাম। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করার জন্য এলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি অপেক্ষা করো, যাকাতের অর্থ এলে তোমাকে তা থেকে দেয়ার নির্দেশ দেবো।

হাদীসে বর্ণিত আছে–

لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا لخمسةٍ : لغازٍ في سبيلِ الله ، أو العاملِ عليها ، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بماله، أو لرجلٍ له جارٌ مسكينٌ فتصدَّق على المسكينِ فاهدى المسكينُ إلى الغنيِّ —

অর্থ : পাঁচজন ছাড়া কোন বিত্তবান ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা বৈধ নয়।

১. আল্লাহর পথে জিহাদে রত বিত্তবান ব্যক্তিকে।

২. যাকাতের অর্থ সংগ্রহে নিয়োজিত বিত্তবান ব্যক্তিকে।

৩. ঋণগ্রস্ত ধনী ব্যক্তিকে।

৪. এমন বিত্তবান ব্যক্তিকে যে নিজের অর্থ দ্বারা অন্যের ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে।

৫. এমন বিত্তবান ব্যক্তিকে যার বিত্তহীন প্রতিবেশী রয়েছে। সে বিত্তহীন প্রতিবেশীকে যাকাতের অর্থ প্রদান করল, তারপর সেই বিত্তহীন ব্যক্তি তা বিত্তবান ব্যক্তিকে উপঢৌকন রুপে প্রদান করল।

এ জন্যই রাসূলের বাঁদী বারীরাকে যাকাতের খেজুর প্রদান করা হলে সে তা রাসূলকে উপঢৌকন স্বরুপ প্রদান করত। সাহাবায়ে কেরাম তখন জিজ্ঞেস করতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো যাকাতের মাল। রাসূল বলতেন,

هو لها صدقةٌ و لنا هديةٌ —

সেই খেজুর তো তার জন্য যাকাত আর আমাদের জন্য তা উপঢৌকন। এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কোন মৃত ব্যক্তির যদি ঋণ থাকে তাহলে কি যাকাতের অর্থ দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা যাবে?

এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন– না, মৃত ব্যক্তির ঋণ যাকাতের অর্থ থেকে আদায় করা যাবে না। আর ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মাযহাবের আলেমরা বলেন, হ্যাঁ.... আদায় করা যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وفي سبيل الله অর্থাৎ যাকাতের অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে। এই 'ফী সাবীলিল্লাহ'র ব্যাখ্যায় হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম বলেন, এর মর্ম জিহাদ। আর হাম্বলী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম বলেন, 'ফী সাবীলিল্লাহ'-এর অর্থ জিহাদ এবং হজ্ব ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। তাই হজ্বে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিকে যাকাতের উট প্রদান করা বৈধ।

উল্লেখিত আলোচনায় বুঝা গেল, চার ইমাম একমত যে, ফী সাবীলিল্লাহ দ্বারা জিহাদ ও জিহাদ সংক্রান্ত ক্ষেত্র উদ্দেশ্য। যেমন অস্ত্র ক্রয় করা, সীমান্তে সদা প্রহরায় নিয়োজিত মুজাহিদদের প্রয়োজনে ব্যয় করা, তাদের খাবার-দাবারের আয়োজন করা, তাদের যাতায়াত ও স্থানান্তরিত হওয়া, এ সবকিছু যাকাতের অর্থ থেকে করা যেতে পারে। এটা কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি এ বিশ্বাসটিকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। এর মাঝে বিস্তৃতি দানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ফলে মুজাহিদদের জন্য কিছুই বাকি থাকেনি। কেউ কেউ বলেন, 'ফী সাবীলিল্লাহ'র অর্থ মতে পুল, ব্রিজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ করাও অন্তর্ভুক্ত। এভাবে বললে তো আর কিছুই বাকি থাকবে না। সবকিছুই ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা শাইখ আব্দুল আজিজ ইবনে বাযকে রহম করুন, তিনি এ ব্যাপারে খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন। আমরা একবার এক ব্যক্তিকে পাঠালাম একটি হাসপাতাল নির্মাণের ক্ষেত্রে ফতওয়া সংগ্রহের জন্য। এটি একটি ইসলামী হাসপাতাল হবে। খৃস্টানদের মোকাবেলায় তা স্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে কি যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে?

তখন শাইখ বললেন, আমি তা কিছুতেই বৈধ মনে করি না। তিনি বললেন, যদি আমি এ ফতওয়া প্রদান করি তাহলে আর ফকির, মিসকীন ও জিহাদের জন্য কিছুই বাকি থাকবে না। আর রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা এতে আরো ব্যাপকতা সৃষ্টি করবে। এ ফতওয়ার উপর নির্ভর করেই তারা তা করবে। তারা যাকাতের অর্থ দিয়ে ব্রিজ

নির্মাণ করবে, মাদরাসা, হাসপাতাল নির্মাণ করবে, আর গরীব-মিসকীনদের জন্য তখন আর কিছুই থাকবে না। কারণ, যাকাতের অর্থ চলে যাবে হাসপাতাল নির্মাণে, ব্রিজ আর মাদরাসা নির্মাণে। এভাবে চলতে থাকলে গরীবদের সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

যদি গরীব-মিসকীনকে দেয়া ফী সাবীলিল্লাহ হয়, ঋণগ্রস্তকে প্রদান করা ফী সাবীলিল্লাহ হয়, কারো মনোরঞ্জনের জন্য প্রদান করলে ফী সাবীলিল্লাহ হয়; তাহলে তো আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পৃথকভাবে ফী সাবীলিল্লাহ বলতেন না। তাই বুঝতে হবে, 'ফী সাবীলিল্লাহ'র এক বিশেষ শরয়ী পরিভাষা আছে। আর তাহলো জিহাদ।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

لَغَدوةٌ أو روحةٌ في سبيلِ الله خيرٌ من الدنيا و ما فيها —

অর্থ : আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল কাটানো দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে বিদ্যমান সবকিছুর চেয়ে উত্তম। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ ফী সাবীলিল্লাহ'র অর্থ তাবলীগ করা বা বয়ান করাকেও শামিল করে নেয়। আরবী ভাষার অর্থ হিসেবে এ ধরনের আরো অর্থ তা দ্বারা নেয়া যায়। কিন্তু শরয়ী পরিভাষায় তার মর্ম হবে শুধু জিহাদ। এ হাদীস দ্বারা জিহাদ ছাড়া অন্য কোন অর্থ বুঝানো মোটেই ঠিক হবে না।

ফী সাবীলিল্লাহ শব্দের মাঝে ব্যাপকতা বিদ্যমান। যে ব্যক্তি চেয়ারে বসে ইসলাম সম্পর্কে কিছু লিখছে; তার ডান পাশে ধুমায়িত কফি আর বাম পাশের প্লেট ভর্তি খেজুর, এ ব্যক্তিও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। আর যে ব্যক্তি হিন্দুকুশে উঁচু শৃঙ্গে জমাট বাঁধা বরফের মাঝে ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে, শীতে থরথর করে কাঁপছে আর অস্ত্র হাতে নিস্পলক শত্রুর দিকে তাকিয়ে আছে সেও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। তবে তারা উভয়ে কি সমান? তুমি তোমার বিচার শক্তি প্রয়োগ করে কি তাদের সম পর্যায়ের মনে করবে? নিশ্চয়ই তা পারবে না। তাহলে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তা করবেন? সুতরাং সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল, ফী সাবীলিল্লাহ'র একটি শরয়ী অর্থ আছে। আর তাহলো জিহাদ। সুতরাং ফী সাবীলিল্লাহ দ্বারা জিহাদই বুঝতে হবে। অন্য কিছু বুঝলে ভুল হবে। আর জিহাদ অর্থ যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের জন্য সাহায্য করা।

পঞ্চবিংশ মজলিস

(٦١) وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

অর্থ : আর তাদের কেউ কেউ নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, এ লোকটি তো কান সর্বস্ব। আপনি বলে দিন, কান সর্বস্ব হলেও তোমাদের মঙ্গলের জন্য। তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখেন এবং মু'মিনদের কথায় বিশ্বাস রাখেন। তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য রহমতস্বরূপ। আর যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (সূরা তওবা ঃ ৬১)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের চরিত্রের বর্ণনা করে বলেন, মুনাফিকদের মাঝে এমন ব্যক্তিরা রয়েছে যারা রাসূলকে কষ্ট দেয়। রাসূলের ব্যাপারে অশোভনীয় কথা বলে। রাসূলের দোষ চর্চা করে। আর পরস্পরে বলে, যদি আমরা জিজ্ঞাসিত হই তাহলে কসম খেয়ে বলব, আমরা এমন কথা বলিনি, তখন আমাদের কথা মেনে নেবে। তিনি তো কান সর্বস্ব। কে কী বলে কান পেতে তা শুনে। তাই আমরা যা বলব তা অবশ্যই শুনবেন। কবুল করবেন। বর্ণিত আছে, এ আয়াতটি উত্তাব ইবনে কুশাইয়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন– তা নাবতাল ইবনে হারেসকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। এই নাবতাল ছিল এক বেমানান মোটা লোক। চুল-দাড়ি সব উস্কো-খুস্কো হয়ে থাকত। গায়ের রং ছিল গৌর বর্ণের। চোখ ছিল লাল। দেখতে ছিল একেবারেই বেমানান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে বলেছেন–

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنظُرَ إِلَى الشيطانِ فلينظُرْ إلى نبتلِ بنِ حارثٍ ــــ

অর্থ : তোমাদের কেউ যদি শয়তান দেখতে চায় তাহলে সে যেন নাবতাল ইবনে হারেসকে দেখে। কারণ দেখতে সে ছিল শয়তানের মতো আর তার কাজও ছিল শয়তানের মতো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা বলে সে তো কান সর্বস্ব। আপনি বলে দিন তিনি কান সর্বস্ব হলেও তোমাদের মঙ্গলের জন্য। ভাল কথা, কল্যাণময় কথা শুনেন আর মন্দ ও অকল্যাণময় কথা থেকে বিমুখ হয়ে থাকেন। তাদের নিচুতা ও তুচ্ছতার কারণে তিনি তাদের পিছু নেন না। তাই তারা আল্লাহর নিকটও লাঞ্ছিত অপদস্ত আর রাসূলের নিকটও লাঞ্ছিত অপদস্ত। তিনি মু'মিনদের সব কথা বিশ্বাস করেন। আর মুনাফিকরা কসম খেয়ে কথা বললে তাদের কথা কবুল করে নেন।

এ আয়াতটি পাঠ করে যখন আমি তার মর্ম উপলব্ধি করতে চাই; তত্ত্বতালাশ করতে চাই তখন আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। দারুণ আশ্চর্য বোধ করি। আল্লাহর রাসূল যেখানে উপস্থিত সেখানে রাসূলকে নিয়ে মুনাফিকদের এই কাণ্ড। রাসূলকে তারা গাল-মন্দ করে। কষ্ট দেয়। এই বুঝি হয় অধঃপতিত মানুষের চরিত্র ও বিবেক। এসব কথা ভাবতে ভাবতে মাঝে-মধ্যেই আমি খেই হারিয়ে ফেলি।

বিগত মজলিসে আলোচনা করেছি যে, সাবিলিল্লাহ অর্থ চার মাযহাবের ইমামের নিকট জিহাদ। সাবিলিল্লাহ শব্দের অর্থে পুল নির্মাণ করা, হাসপাতাল নির্মাণ করা, মাদরাসা স্থাপিত করা ইত্যাকার জনকল্যাণমূলক বিষয়গুলো আসবে না। কারণ, সাবিলিল্লাহ শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো জিহাদ। এ অর্থে ব্যাপকতা সৃষ্টি করে অন্যান্য বিষয়গুলো তাতে অনুপ্রবেশ ঘটানো ভুল। আল্লামা ইবনে হাজার (রহঃ) বলেছেন–

المتبادرُ من قوله صلى الله عليه و سلم أو قولِ الله عزَّ و جلَّ في سبيل الله هو الجهادُ ــــ

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা আল্লাহ তা'আলার কথায় সাবিলিল্লাহ শব্দের সাধারণ অর্থ হলো জিহাদ। আর ইমামদের সম্মিলিত মতানুসারে জিহাদ অর্থ কিতাল, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। সুতরাং এ অর্থের মাঝে ব্যাপকতা সৃষ্টি করা যাবে না। কারণ তা শরয়ী পরিভাষা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- و أَقِيمُوا الصلوةَ তোমরা নামায কায়েম করো। এখানে নামাযের একটি শরয়ী পারিভাষিক অর্থ আছে। তাই এটাকে অন্য অর্থে ব্যবহার করা যাবে না। নামাযের পারিভাষিক অর্থ হলো-

أَفْعالٌ و أقوالٌ تُبتدئ بالتكبيرِ و تُنتهى بالتسليمِ —

এমন কিছু কাজ ও কথা যা তাকবীর দ্বারা শুরু হয় আর সালাম দ্বারা শেষ হয়।

তাই বলা যাবে না যে, নামায মানে দু'আ। তাই কেউ দু'আ করে নিলে নামায আদায় হয়ে যাবে। সওম বা রোযারও একটি শরয়ী পারিভাষিক অর্থ আছে। তাহলো-

الامتناعُ عن الطعامِ و الشرابِ و الجماعِ منْ طلوعِ الفجرِ الصادقِ إلى غروبِ الشمسِ —

পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকা সুবহে সাদেক থেকে আরম্ভ করে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। তাই বলা যাবে না الصومُ عن الكلام صومٌ কথা থেকে বিরত থাকা সওম বা রোযা। এভাবে যদি অর্থ করা হয় তাহলে শরয়ী পরিভাষাকে পরিবর্তন করা হবে। আর এটা কোনভাবেই বৈধ নয়। তাই বলছি, فِي سبيلِ الله একটি শরয়ী পরিভাষা, এর অর্থ হলো জিহাদ। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ঘরে বসে আমার মতো তাফসীর করাকে জিহাদ বলা যাবে না।

অনেক ভাইয়েরা আছেন, জিহাদ সম্পর্কে খুব লেখালেখি করেন। কিন্তু কখনো জিহাদে গিয়ে একটি গুলীও ছুঁড়ে দেখেননি। তিনি জিহাদের মর্মার্থ কী বুঝবেন? যথাযথভাবে জিহাদের মর্মার্থ বুঝা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বহু মানুষের সাথে মিশেছি। বহু আলেমের সাথে কথাবার্তা বলে দেখেছি তারা জিহাদের পরিভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখেন না। আমি যখন তাদের বলেছি, বর্তমানের এই পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরযে আইন, তখন বিস্ময়ে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। তারা যেন জীবনে কখনো এমন কথা শোনেননি। কিন্তু আমি যখন তাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেছি, কথা বলেছি; তখন তারা বুঝেছেন যে জিহাদ ফরযে আইন। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, শুধুমাত্র ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে জিহাদের মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। জিহাদ বুঝতে হলে জিহাদের ময়দানে আসতে হবে।

তাই উস্তাদ সাইয়েদ কুতুব বলেছেন-

إنَّ أسرارَ القرآن لا يفْهمها فقيهٌ قاعدٌ باردٌ —

নিশ্চয়ই কুরআনের রহস্য কোন শীতল ঘরকুনো ফকীহ বুঝতে পারবেন না। কারণ, কুরআনের অনেক আয়াত এমন আছে যা মানুষ সহজে বুঝতে পারে না। বিশেষভাবে যদি সে প্রবৃত্তির অনুসারী হয় তাহলে তো সে কিছুতেই তা অনুধাবন করতে পারবে না। তাই কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবন করার জন্য তাক্বওয়া অবলম্বন করতে হবে। তাক্বওয়া ছাড়া কুরআন বুঝা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا ○

হে মু'মিনরা! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাক্বওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে হক ও বাতিল অনুধাবন করার শক্তি দান করবেন। তাই প্রকৃত সমস্যা ইলমের স্বল্পতার সমস্যা নয়। আসল কথা হলো, কুরআনের আয়াত বুঝতে হলে তাক্বওয়া অবলম্বন করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার সঠিক মর্ম অন্তরে ঢেলে দিবেন। এ জন্য খিলাফত আমলে বাগদাদে মুসলিম সমাজে কোন সমস্যা দেখা দিলে যদি তার

সমাধান করা সম্ভব না হতো তখন বলা হতো, তোমরা এই সমস্যাটি সীমান্তে অবস্থিত মুজাহিদদের নিকট পাঠিয়ে দাও। কারণ তারা আল্লাহর অধিক নৈকট্যশীল বান্দা। সুতরাং আশা করা যায় তাদেরই এ বিষয়ের উত্তর প্রদানের তাওফীক দেয়া হবে। আফগানের এই জার্জিতে, পাকতিয়ায় যারা গুলী আর মিসাইলের নিচে বসে আছে, দিনে একশ' বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়; এদের অনেকে এমন আছে যে কখনো পেশোয়ারেও যায়নি। রণাঙ্গনেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। কেউ যদি তাকে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, সে তখন তার দৃষ্টিভঙ্গীতে এমন সুন্দর উত্তর দিবে যে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে।

এ কারণেই শাইখ ইবনে তাইমিয়া ফতওয়া দিয়ে বলেছেন–

لا يُسأل العلمآءُ الذينَ ليسُوا في أرضِ المعركةِ عنِ الجهادِ —

যেসব আলেমরা কখনো রণাঙ্গনে যায়নি তাদের জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না।

তাই আমি বলি, এদেরকে জিহাদ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করবে না। বিশেষভাবে যাদের কোন ওজর নেই, কোন বাঁধা-বিপত্তি নেই। হ্যাঁ, যদি কারো ওজর থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। ভেবে দেখতো সেই আলেমের কথা যে নিজে জিহাদের মতো একটি ফরয আমল করছে না। অথচ সে পারে নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলমানদের রক্ষা করতে, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে। তুমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করো, জনাব আপনি কেন এ ফরয আমলটি করছেন না? তাহলে মনে কর সে উত্তরে বলবে, আমার অসুবিধা আছে, ওজর আছে। আরে ভাই, জিহাদ তো ফরযে আইন। তুমি জিহাদে যাও বা না যাও দেখবে তার কোন উত্তরই স্পষ্ট হচ্ছে না, পরিষ্কার হচ্ছে না। কারণ সে তো কখনো জিহাদের ময়দানে যায়নি।

তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো, আফগানিস্তানে যে জিহাদ চলছে সেখানে নেতৃত্বে কারা আছে? নিশ্চয়ই সে কিছুই বলতে পারবে না। সে জানেই না কিভাবে জিহাদ শুরু হলো। এখন জিহাদের পরিস্থিতি কী? আরে সে তো কষ্ট করে একদিনও আফগানিস্তানের মানচিত্রটিও খুলে দেখেনি। সে তো জিহাদ সম্পর্কে কোন প্রচারপত্রও পাঠ করে দেখেনি। কোন মুজাহিদের ভাষণও কোনদিন শোনার চেষ্টা করেনি। আর ঘটনাক্রমে যদি তুমি তার নিকট যাও ও আফগান জিহাদের অবস্থা বর্ণনা করতে চাও তাহলে দেখবে তার শোনার সময়ও নেই। সুতরাং তুমি কিভাবে তাকে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। জিহাদ তো তার স্বভাব পরিপন্থী।

এ ব্যাপারে যদি কেউ বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হয় তাহলে তাকে ফতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া'র চতুর্থ খণ্ড অধ্যয়ন করতে হবে। সেখানে দেখবে, যেসব আলেমরা জিহাদে যায় না তাদের থেকে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। তবে সন্দেহ নেই যে, তিনি একজন মুসলিম, সত্যবাদী লোক। তবে সন্দেহ নেই যে, একজন আলেমের দ্বারা অবশ্যই তার স্বদেশের বহু মানুষ উপকৃত হয়। কিন্তু তুমি তো তাকে এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করছো যা সে জানে না। মনে রাখবে, মুফতি যখন কোন বিষয়ে ফতওয়া দিতে চায় তখন তাকে সে বিষয়ের সবকিছু জানতে হয়, বুঝতে হয়। যদি তাকে বিয়ে বা তালাক সম্পর্কে ফতওয়া দিতে হয় তাহলে অবশ্যই তালাক দানকারী স্বামী তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে হবে কী কথা সে তখন বলেছিল। শব্দটি কী ছিল। তা দ্বারা তার উদ্দেশ্য কী ছিল। তালাক ছিল, নাকি অন্যকিছু ছিল। সবকিছু বিস্তারিত জানার পর ফতওয়া দেবে। তাহলেই তা ঠিক হবে, গ্রহণযোগ্য হবে। তাই বলছি, শরয়ী পরিভাষা নিয়ে যা ইচ্ছে তাই বলা বৈধ নয়, ঠিক নয়।

আর যারা জিহাদের শরয়ী পরিভাষাকে ধ্বংস করে দিতে চায় তারা বলে, যারা সভা-সমাবেশে বক্তৃতা দেয় তারা মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ, যারা মসজিদে গিয়ে সমবেত মুসুল্লীদের সামনে দীন সম্পর্কে কথা বলে তারা মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। যারা পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য মেহনত মোজাহাদা করছে, পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করছে; তারা মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাস শেষে দশ হাজার রিয়াল বেতন পাচ্ছে, তার কাজ-কর্ম মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল কাগজে স্বাক্ষর করা, সেও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ।

তাহলে আফগানিস্তানে যারা করওয়াজে, বদখশানে, মাজার-ই শরীফে, বলখে বা রাশিয়ার সীমান্তে মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে, যাদের পরিবারের বহু লোক এ পথেই শহীদ হয়ে গেছে, শরীরের প্রতিটি জায়গায় রয়েছে রক্তের চিহ্ন; তাদের সম্পর্কে তুমি কী বলবে? এরা উভয়ে কী সমপর্যায়ের?

রিয়াদের ঘটনা। আফগানিস্তানের এক মুজাহিদকে মেটাল ডিটেক্টর দ্বারা পরীক্ষা করা হল। সাথে সাথে আওয়াজ হলো, প্রহরীরা তালাশ করলো, পকেট তালাশ করলো, কিন্তু কিছুই পেল না। আবার পরীক্ষা করল। আবারও আওয়াজ হলো, কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু পেল না। বিস্মিত কণ্ঠে প্রহরী বললো, বলুন তো ব্যাপারটি কী। এমন হচ্ছে কেন? তখন মুজাহিদ হেসে ফেলল। বললো, আমার মাথায় কয়েকটি স্প্রিন্টার রয়েছে। এই তো ইনি হলেন মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। আর যে ব্যক্তি সুখ-স্বাচ্ছন্দে এপার্টমেন্টে জীবন কাটাচ্ছে, পেপসির পর পেপসি পান করছে; সেও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ? একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উভয়ে এক পর্যায়ের নয়। এক দিনের ঘটনা। সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন,

ما يَعدلُ الجهادَ في سبيلِ الله —

ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদের সমান কোন আমল আছে কি? রাসূল বললেন, لا تَستَطيعونَه তোমরা সে আমল করতে পারবে না। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, কোন আমল জিহাদের সমপর্যায়ের হবে? রাসূল বললেন, لا تَستَطيعونَه

তোমরা সে আমল করতে পারবে না। তারপর রাসূল বললেন–

مثلُ المجاهدِ في سبيلِ الله كمثلِ القائمِ القانتِ الصائمِ لا يفترُّ عنْ صيامٍ أو قيامٍ حتى يرجعَ المجاهدُ —

অর্থ : মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহর উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সারারাত জেগে ইবাদত করে আর দিনে রোযা রাখে। রোযা আর ইবাদতে মুহূর্তের জন্যও অলসতা করে না। মুজাহিদ ফিরে আসা পর্যন্ত এ অবস্থা চলে। তারপর রাসূল বললেন–

هل تستطيعُ أن تدخلَ مسجدَكَ و فتقومُ فلا تفترُّ و تصومُ فلا تُفطِرُ —

অর্থ : তুমি কি পারবে, তোমার মসজিদে প্রবেশ করে তারপর নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে। এক মুহূর্তের জন্যও অলসতা করবে না। আর ক্রমাগত রোযা রাখবে। আর রোযা ভাঙবে না। এরপর রাসূল বললেন, مَنْ يستطيعُ هذا কে এটা করতে পারবে? এরপর রাসূল বললেন– ذلك أجرُ المجاهد এটা হলো মুজাহিদের পুরস্কার।

বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করছেন যে দরস দেয়ার জন্য মসজিদে যায়। চাই সে সর্বক্ষণ নামাযে রত থাক বা না থাক। চাই সে ক্রমাগত রোযা রাখুক বা না রাখুক। তাকে মুজাহিদদের সেই পুরস্কার প্রদান করা হবে। আরেকটি পুরস্কার আছে যা আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদের জন্যই তৈরি করেছেন। আর জান্নাতে তা একশত তবকায় বিন্যস্ত হবে। প্রত্যেক তবকার মাঝে আকাশ ও জমীনের ব্যবধান হবে।

একবার ভেবে দেখেছো, মুজাহিদদের এই পুরস্কার কি আল্লাহ তা'আলা তাদেরও দিবেন যারা মসজিদে বসে থাকে? যারা প্রত্যেক সপ্তাহে একবার মসজিদ বা মাদরাসায় যায়। একটি দরস, মজলিস করে। তার পারিশ্রমিক তার বক্তব্যের শব্দের চেয়ে বেশি। আমি আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি, কিছুতেই তা হবে না। মুজাহিদদের সেই পুরস্কার কিছুতেই এ ধরনের ব্যক্তিদের দেয়া হবে না।

তাই বলছিলাম, 'ফী সাবীলিল্লাহ' একটি শরয়ী পরিভাষা। সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে তা প্রয়োগ করা যাবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা যাকাত গ্রহণে যোগ্য ব্যক্তিদের আলোচনায় 'ফী সাবীলিল্লাহ' কে পৃথকভাবে উল্লেখ

করেছেন। যদি আমি তা না মেনে তার অর্থে বাহুল্য সৃষ্টি করে বলি, দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্য-সহযোগিতা করা 'ফী সাবীলিল্লাহ'; মিসকিনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা 'ফী সাবীলিল্লাহ'; ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা ও মনোরঞ্জনের জন্য কাফের মুশরেককে যাকাতের অর্থের কিয়দাংশ প্রদান করা 'ফী সাবীলিল্লাহ'; ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে প্রদান করা 'ফী সাবীলিল্লাহ'; তাহলে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলে আল্লাহ যে মর্ম অর্থাৎ মুজাহিদদের কথা বুঝাতে চেয়েছেন তার কোনই মর্ম বাকি থাকবে না। বরং তা উল্লেখ করাই অনর্থক হয়ে যাবে। অথচ এরকম কিছুতেই হতে পারে না। যেমন সাওম শব্দের অর্থ বিরত থাকা। কিন্তু কেউ কথা থেকে বিরত থাকলে আমরা তাকে সাওম বলি না। তেমনিবাবে সালাত শব্দের অর্থ দু'আ করা। কিন্তু কেউ দু'আ করলে আমরা তাকে সালাত আদায়কারী বলি না। তাই, ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য মানুষকে দীনের পথে দাওয়াত দেয়ার জন্য কোথাও গেলে তারপর কিছু সময় সেখানে কাটিয়ে আবার বাড়িতে ফিরে এলে তাকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলা যাবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তাহলো, মুজাহিদ বিত্তবান হোক বা না হোক উভয় অবস্থায় কি সে যাকাতের সম্পদ গ্রহণ করতে পারে? হ্যাঁ, পারে। সে বিত্তবান হোক বা না হোক সে যদি রণাঙ্গনে, জিহাদের ময়দানে থাকে, যুদ্ধে রত থাকে বা অতন্ত্র প্রহরায় নিয়োজিত থাকে; তাহলে আমাদের জন্যও বৈধ যে আমরা তার জন্য যাকাতের সম্পদ থেকে অস্ত্র ক্রয় করব, জুতা, কাপড় বা ঘোড়া ক্রয় করব।

তবে কতিপয় ফকীহ তা বৈধ মনে করেন না। তারা বলেন, যদি তার নিকট সম্পদ থাকে তাহলে সে যাকাতের অর্থ ভোগ করতে পারবে না। আর যদি তার নিকট সম্পদ না থাকে তাহলে সে যাকাতের সম্পদ গ্রহণ করতে পারবে।

আর যদি এমন হয় যে, মুজাহিদের স্বদেশে সম্পদ আছে। সেখানে সে ধনী। তাহলে কি সে যাকাতের সম্পদ গ্রহণ করতে পারবে? হ্যাঁ, পারবে। তবে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেন–

لا تحلُّ الصدقـــةُ لغنيٍّ إلا لخمسة —

পাঁচ প্রকারের লোক ছাড়া কোন ধনী ব্যক্তির যাকাতের অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে মুজাহিদকেও শামিল করেছেন। তাই মুজাহিদ ধনী হলেও সে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। আমরা অস্ত্রসামগ্রী বহন করিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য বাহন তথা গাড়ি বা গাধা ইত্যাদি ক্রয় করতে পারি। অস্ত্র ক্রয় করতে পারি। পরিখা ইত্যাদি খনন করতে পারি। আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি করতে পারি। আহত মুজাহিদদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল তৈরি করতে পারি। এভাবে মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমরা যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে পারি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যাকাতের সমুদয় সম্পদ কি জিহাদের পথে ব্যয় করা যাবে? শাফেয়ী মাযহাব ছাড়া অন্যান্য মাযহাবে তা যাবে। আর বর্তমানের এই পরিস্থিতিতে, এই ভয়াবহ মুহূর্তে সমুদয় সম্পদ জিহাদের পথে *ব্যয় করা ওয়াজিব।* একদা আল্লামা ইবনে তাইমিয়াকে জিজ্ঞেস করা হলো। এক সম্প্রদায়ের লোকেরা অনাহারে-অর্ধাহারে মরণাপন্ন আর অপরদিকে মুজাহিদরা জিহাদ করে থাকে। আর আমাদের কাছে এতটুকু পরিমাণ অর্থ আছে যা দ্বারা মুজাহিদদের প্রয়োজন পূরণ হবে বা ক্ষুধার্ত লোকদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করা যাবে। যদি ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের যাকাতের অর্থ দেয়া না হয় তাহলে তারা মৃত্যুবরণ করবে; এমন অবস্থায় কী করতে হবে?

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, জিহাদের ক্ষেত্রে তা ব্যয় করে দাও। ক্ষুধার্তদের মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দাও। এর কারণ হলো, ফকীহরা বলেছেন– যদি শত্রুরা মুসলমানদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে মুজাহিদদের জন্য তাদের হত্যা করা বৈধ। যদি এমন আশংকা করা হয় যে, তাদের হত্যা না করলে মুজাহিদরা পরাজিত হবে। তাই জিহাদের ময়দানে প্রয়োজনে যদি মুসলমানদের হত্যা করা বৈধ হয়, তাহলে ক্ষুধার্ত

অবস্থায় তো হবেই। তাই বলছি, বর্তমান সময়ের দাবি, মুসলিম উম্মাহ তাদের যাকাতের সমুদয় অর্থ আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দিবে। আর আফ্রিকার ক্ষুধার্ত মানুষের কথা ভাবছো। আফ্রিকার মুসলমানদের খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করার কথা ভাবছো। এ সমস্যার সমাধান তো অনেক সহজ। মুসলিম উম্মাহ যদি তাদের সমুদয় সম্পদ দ্বারা সাহায্য করে পৃথিবীর বুকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে, যা কুরআন ও হাদীসের আলোকে শাসিত হবে, তাহলে সেই রাষ্ট্রই মুসলমানদের অনেক সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে আসবে।

আর আমরা যদি শীতের রাতে কুঁকড়ানো বকরীর পালের মতো হই, যে পালের চারদিক থেকে নেকড়ে আক্রমণ করছে, তাহলে তো পৃথিবীর বুকে আমাদের চিহ্ন থাকবে না। আমরা মুজাহিদদের যে অর্থ দিয়ে সাহায্য করি তার পরিমাণ হলো আমাদের সন্তানদের খাবারের উচ্ছিষ্ট খাদ্য; আমাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য নয়। এভাবে তো দীনের সাহায্য করা হয় না। আর আল্লাহ তা'আলাও আমাদের এ তুচ্ছ দানকে কবুল করেন না।

সুতরাং আল্লাহর পথে জিহাদের প্রয়োজন আমাদেরই মিটাতে হবে। মুসলিম উম্মাহ যদি এ প্রয়োজন না মেটায়, তাহলে সবাইকে তার পাপের বোঝা বহন করতে হবে। আফগান থেকে রুশদের বের করতে যাতে যোদ্ধার প্রয়োজন হয়, তার যোগান মুসলিম উম্মাহকেই পূরণ করতে হবে। কিছু কিছু মানুষ মিথ্যা প্রচার করছে যে, আফগান রণাঙ্গনে অর্থের প্রয়োজন অতি প্রকট। যোদ্ধার তেমন প্রয়োজন নেই। যারা আছে তারাই যথেষ্ট। এ ধরনের কথা একমাত্র মূর্খ জাহেল ব্যক্তিরাই বলছে।

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! আমরা এ ধর্মের পরিচালক। আমরা এ ধর্মের অজেয় দুর্গ।

সুতরাং যেদিন জিহাদের ধারা স্তব্ধ হয়ে যাবে, সেদিন ইসলাম হারিয়ে যাবে। জিহাদ ছাড়া ইসলাম টিকে থাকতে পারে না। জিহাদ ছাড়া আল্লাহর একত্ববাদও প্রতিষ্ঠিত হয় না। জিহাদ ছাড়া কোন ইসলামী রাষ্ট্রও টিকে থাকতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন–

بعثتُ بينَ يدي السَّاعةِ بالسيْفِ حتىٰ يعبدَ اللهُ وحدَه لا شريكَ لـه

আমাকে কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার পূর্বে তরবারীসহ পাঠানো হয়েছে যেন মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত করে। তার সাথে কাউকে শরীক না করে।

আজ ইমাম বোখারীর জন্মস্থান বোখারায় মানুষদের নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। লেনিনের দর্শন শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আর বোখারার মুফতি সাহেব কমিউনিস্টদের কথা অনুযায়ী ফতওয়া দিয়ে বলছে, ইসলাম তা সমর্থন করে।

তাই 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলা মাত্রই এ কথা বুঝতে হবে যে, তার উদ্দেশ্য কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা চলতে থাকবে যতোক্ষণ না তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বা অপদস্ত হয়ে স্বেচ্ছায় জিযিয়া কর প্রদান করে। যাকাত গ্রহণকারীদের একজন হলো 'ইবনুস সাবীল'। এর অর্থ, পরিজন থেকে দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তি। যদিও দেশে তার সম্পদ আছে, তবুও সে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। কারণ সাথে তো তার কোন অর্থ-সম্পদ নেই।

তবে বর্তমান সময়ে এ ধরনের লোকদের যাকাত প্রদান করা হবে না যারা পরিজন থেকে দূরে আছে। আর বাড়িতে তার অর্থ-সম্পদ আছে। কারণ, এখন পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে গেছে। সাথে অর্থ না থাকলে ব্যাংকের চেকে লিখে দিলেই যাকাতের টাকা দেয়া হয়ে গেছে বলে বিবেচিত হবে। তুমি যে কোন ব্যাংকে যাবে টেলিফোন আছে। মানুষের হাতে হাতে মোবাইল আছে। আমেরিকাসহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে যুবকদের সাথে কার্ড থাকে। কার্ডে গোপন নাম্বার থাকে। প্রায়ই বিমানবন্দরে দেখা যায় কিছু মেশিন বসানো থাকে। মনে করো তুমি এক বিমানবন্দরে আছো অথচ তোমার ব্যাংক একাউন্ট মেক্সিকো অথবা সানফ্রান্সিসকোতে। ব্যস, কোন চিন্তা নেই। তুমি তোমার সেই কার্ডটি মেশিনের ছিদ্রপথে দিবে অমনি তা থেকে তোমার জন্য ডলার বেরিয়ে আসবে। তোমার জমা দেয়া টাকা শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমার টাকা পেতে কোন অসুবিধা হবে না। আর

টাকা শেষ হয়ে গেলে একটি ছোট পত্র বেরিয়ে আসবে, তাতে লেখা থাকবে- 'সরি, আপনার একাউন্টে টাকা নেই'। সুতরাং এ যুগে ইবনুস সাবীলের ব্যাখ্যা আর আগের মতো হবে না। এখন সাবিল হলো, যে পরিজন থেকে দূরে আছে আর বাড়িতেও তার অর্থ-কড়ি নেই এমন ব্যক্তি।

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তাহলো, এক শহর বা এক দেশের যাকাতের অর্থ অন্য শহর বা দেশে নিয়ে বিতরণ করা যাবে কিনা। এ ব্যাপারে ফকীহদের একাধিক কথা আছে। তবে প্রবলতর মত হলো, যদি নিজের শহর বা দেশের লোকেরা দূরবর্তী শহর বা দেশের লোকদের মতো অত্যধিক দরিদ্র বা অর্থ সংকটে না থাকে বা দূরবর্তী অঞ্চলে জিহাদ চলতে থাকে তাহলে দূরবর্তী শহর বা দেশে নিয়ে বণ্টন করা ভাল। এর পক্ষে দলীল হলো, মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর কথা। তিনি বলেছিলেন–

إِئْتُـــونِي بخميصٍ أو لبيسٍ آخذُه منكم مكانَ الذرَّةِ و الشعيرِ ، فإنَّه أيسرُ عليكم و أنفعُ للمهاجرينَ في المدينة —

অর্থ : যাকাতের যব বা ভুট্টার পরিবর্তে তোমরা আমার নিকট কাপড়-চোপড় বা চাদর নিয়ে এসো, আমি তা তোমাদের থেকে গ্রহণ করে নেবো। কারণ, তা তোমাদের জন্য খুব সহজ আর মদীনায় অবস্থানকারী মুহাজিরদের জন্য খুব উপকারী।

এ ক্ষেত্রে বুঝা যাচ্ছে যে, মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) যাকাতের বস্তু গ্রহণ না করে তার সমমূল্য গ্রহণ করতে চাচ্ছেন। এবং তা মদীনায় পাঠানোর চেষ্টা করছেন। আর তিনি তা করেছেনও। সুতরাং বর্তমান সময়ে পেট্রোল সম্পদে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের বিপুল পরিমাণ যাকাতের অর্থ আফগানিস্তানের মুজাহিদদের জন্য পাঠানো উচিত। এটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। হ্যাঁ, যদি কেউ বলে মধ্যপ্রাচ্যেও তো দরিদ্র ব্যক্তি আছে যারা অনাহারে মরছে। তাহলে আমি তাদের শুধু আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি এমন পরিস্থিতির জন্য বলেছেন–

لِيَمُتِ الجياعُ و نُعطِي الجهادَ —

অর্থ : ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের মরতে দাও আর যাকাতের অর্থ মুজাহিদদের সহায়তায় পাঠিয়ে দাও। এখন পাল্টা প্রশ্ন হতে পারে, আচ্ছা, মধ্যপ্রাচ্যে কি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুবরণ করে? আমরা বলবো, সেখানে ক্ষুধার কারণে কেউ মৃত্যুবরণ করে না। বরং অধিক আহারের কারণে সেখানে মানুষ মৃত্যুবরণ করে থাকে। আসল কথা হলো, পরিস্থিতি বিবেচনা করে যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে হবে। তবে মুজাহিদদের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

যাকাতের বস্তুর মূল্যের পরিমাণ অর্থ প্রদান করলে কি যাকাত আদায় হবে? অর্থাৎ সদকায়ে ফিতরে গম, চাল বা আঞ্চলিক অধিক প্রচলিত খাবার প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যদি কেউ তার মূল্য প্রদান করে তাহলে কি তা বৈধ? হানাফী মাযহাবে তা বৈধ। আর ইমাম মালেক (রহঃ)-এর এক মতানুসারে তা বৈধ। ইমাম মালেক (রহঃ) এর স্বপক্ষে পূর্বোল্লিখিত হাদীসটিকে পেশ করেছেন। তারা আরও বলেছেন যে, গরীব লোকদের এতোটুকু পরিমাণ দিবে যে, তাদের যেন সেদিন অন্য কারো কাছে কিছু চাইতে না হয়। তাই মানুষের প্রয়োজন কখনো খাবার হতে পারে, কখনো কাপড় হতে পারে, আবার অন্যকিছুও হতে পারে। তাই অর্থ প্রদান করলে সে স্বাধীনভাবে তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে। শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবে অর্থ প্রদান করলে হবে না, বরং তাকে বস্তু প্রদান করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! এ বছর শাইখ ইবনে জাবরীন ফতওয়া দিয়েছেন যে, সৌদি আরবে বস্তু প্রদান না করে অর্থ প্রদান করে তা আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দিলে আর সেই অর্থ দিয়ে গম বা চাল কিনে বিতরণ করলে তা বৈধ হবে।

তার এ ফতওয়া শুনে কিছু আলেম তো ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা বললো, মোটেই না। বস্তুই প্রদান করতে হবে। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, ... সে অর্থ দিয়ে বস্তুই ক্রয় করা হবে। তবে এখানে নয়, আফগানিস্তানে। তারপর তা অসহায় গরীব মানুষদের মাঝে বণ্টন করা হবে। আমি এ ফতওয়া শাইখ ইবনে বাযকে দেখালাম, তিনি তাতে একমত পোষণ করলেন। আল্লাহ তা'আলা শাইখ ইবনে বাযকে অন্তরদৃষ্টি দান করেছেন। তার দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের অনেক উপকার হয়েছে। আমার জানা নেই, যারা রাষ্ট্রের কর্ণধার নয়, যারা মিলিয়ন বিলিয়ন ডলারেরও মালিক নয়; তাদের মধ্যে শাইখ বিন বাযের মতো আছে কী, যার দ্বারা আল্লাহ আফগান জিহাদে এতো খেদমত নিয়েছেন। তিনি ফতওয়া দিয়েছেন যে, "আফগানিস্তানে জিহাদ করা ফরজে আইন। তাই জান ও মাল দিয়ে এ জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। আফগানিস্তানে যাকাত দেয়া ওয়াজিব আমলসমূহের অন্যতম এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উত্তম মাধ্যম।"

তিনি বিশ রমযানে ফতওয়া দিলেন আর ইবনে বায তার সাথে একমত পোষণ করলেন। এরপর ত্রিশ রমযানে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলেন। বললেন, আমাদের নিকট দেড় মিলিয়ন রিয়াল আছে। তিনি তা দিয়ে বললেন, এগুলো খরচ করতে থাকো। আমরা আরও পাঠাব। এভাবে তিনি আমাদের সহায়তা করলেন।

এমনিভাবে ফতওয়া দিলেন, বললেন, হজ্বের পশু হারামে কুরবানী করা হবে। তারপর তা আফগান মুহাজিরদের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হবে। আর হলোও তাই। হাজীরা কুরবানী আদায়কারী সংস্থাগুলোতে কুরবানীর টাকা জমা দিলো। তারপর কুরবানী হয়ে গেল। চামড়া খুলে রেখে গোশত বিমানে করে পেশোয়ারে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

একটু চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ তা'আলা একজন আলেমের দিব্য চক্ষু খুলে দিলেন। আর তার দ্বারা আল্লাহ তার অনেক বান্দাকে উপকৃত করলেন। অথচ আগে এসব পশুর কারণে দুর্গন্ধ হতো। মানুষ তার দুর্গন্ধে মিনায় বসতে পারত না। কারণ তখন বলা হতো, তার গোশত সেখান থেকে বের করা যাবে না আর হারাম ছাড়া অন্য কোথাও যবাহ করা যাবে না। কিন্তু তারপর পাল্টে গেল এ মত। বলা হলো, হারামে যবাহ করা হবে এবং তার গোশত অসহায় দুঃস্থ মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া হবে।

তাই আমরা বলতে চাই, বর্তমান যুগে শরী'আহ বিভাগসমূহে ভাল মেধাবী ছাত্র ভর্তি হওয়া প্রয়োজন। অথচ অন্য কোন বিভাগে সুযোগ না পেলে তারা শরী'আহ বিভাগে এসে ভর্তি হয়। যতো অথর্ব, অকেজো, নির্বোধ, বেওকুফগুলো এসে শরী'আহ বিভাগে ভর্তি হয়।

হায় আল্লাহ! আফসোস! আল্লাহর দীন কী এতোই সস্তা হয়ে গেল। এতোই তুচ্ছ হয়ে গেল। এর কারণেই শরী'আহ বিভাগের অথর্ব-নির্বোধ ছাত্ররা কুরআনের আয়াতের মর্ম বুঝে না। তার তত্ত্ব উদ্ধার করতে পারে না। তুমি যদি বলো, ভাই! তুমি শরী'আহ বিভাগে ভর্তি হও। সে বলবে, আমি রিট পেয়েছি। আমি ডাক্তার হবো। ইসলাম তো মুসলমান ডাক্তারও চায়। মুসলমান উকীল চায়। তাই তা হতে চাই। আসল কথা হলো, সে অর্থের ধান্ধায় আছে। দুনিয়ার পেছনে ছুটছে কিন্তু মুখে বলছে না।

তুমি কি একবার এ কথাটি ভেবে দেখেছো, তুমি ডাক্তার হওয়ার পথে বা উকিল হওয়ার পথে বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পথে, আল্লাহ প্রদত্ত তোমার মেধা ব্যয় করলে, অথচ আল্লাহর বাণী বুঝার ক্ষেত্রে তা ব্যয় করলে না।

রাসূলের হাদীস নিয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে তা ব্যয় করলে না। তুমি চাচ্ছো ডাক্তার হয়ে, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে মুসলমানদের উপকার করবে অথচ ইসলামের শত্রুরা এ ফাঁদই তৈরি করেছে, যেনো প্রতিভাবান কোন আলেম সৃষ্টি হতে না পারে। বাথপার্টির লোকদের দিকে ফিরে তাকাও। এই যে মাইকেল গাফলাক। আরব বিশ্বের দু'টি মূল্যবান ভূখণ্ড সে শাসন করছে। এক সময় সে উমর ইবনে আব্দুল আজীজের (রহঃ) মেহরাবের কুরসীতে বসত। আর এখন সে খলীফা হারুন অর রশীদের কুরসীতে বসে। সে সিরিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হয়েছিল

মাত্র কয়েক মাসের জন্য। সে বাথপার্টির লোকদের সিরিয়ায় নিয়ে এলো। কেন? দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য বাথপার্টির লোকদের নিয়ে এলো। কোন চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ারকে আনলো না। কারণ, এরাই তো সমাজে মৌলিক পরিবর্তন আনে। এরাই তো মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন সৃষ্টি করে। আর ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির প্রফেসাররা তো কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। তারা শুধুমাত্র তাদের কথাগুলো বিজ্ঞানময় করে তুলে ধরে। আর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা কালে তুমি ছাত্রদের সামনে একটি দর্শন পেশ করতে পারবে। ঐতিহাসিক বাঁধা বিবরণকে তুমি কাজে লাগাতে পারবে। ইতিহাসের ঘটনাকে তুমি তোমার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাদৃশ্য রেখে বর্ণনা করতে পারবে। তাই তারা এসে দামেস্ক ইউনিভার্সিটিতে জেঁকে বসলো। তারপর নতুন প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে দিতে লাগল। ধীরে ধীরে মানুষের চিন্তা-চেতনায়, আকীদা-বিশ্বাসেও পরিবর্তন এলো। এরা অত্যন্ত চালাক। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে তারা কোন হস্তক্ষেপ করল না। কারণ, বিজ্ঞানের সূত্রসমূহে তো কোন পরিবর্তন করা যায় না।

আর তুমি যদি ইহুদীদের ব্যাপারটি লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে, সে ইহুদী-আমেরিকান হোক বা অন্য দেশের হোক সে প্রাচ্য সম্পর্কে গভীর পড়াশোনা করবে। আরবী ভাষা শিখবে, ইতিহাস পড়বে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করবে। যেমন হেনরী কিসিঞ্জার ও সাফরুনী। এরা দু'জন ইহুদী। হামবুর্গে এদের নিবাস। তারা ছিল ইহুদী জগতের সরদার। কেউ যদি বিশ্বে নাম করে থাকে সে বলে, আমি কিসিঞ্জারের নিকট অধ্যয়ন করেছি বা সাফরুনীর নিকট অধ্যয়ন করেছি।

আরব বিশ্বের অনেক মন্ত্রী ও সচিবদের দেখবে তারা কিসিঞ্জারের ছাত্র। তার নিকট লেখাপড়া করেছে। শুনলে আশ্চর্য হবে, এক দেশের একুশজন সচিব একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। ইহুদীরা পরিকল্পিতভাবে তাদের তৈরি করে পাঠিয়েছে। এরা আরবের সন্তান হলেও এরা ইহুদীদের চিন্তা-চেতনা ধারণ করে। অথচ আমাদের অবস্থার কথা একটু ভেবে দেখেছো! আমরা চাই মুসলমান ডাক্তার হতে, মুসলমান ইঞ্জিনিয়ার হতে, মুসলমান উকীল হতে। আমরা সারাদিন কিসের পশ্চাতে কাটাবো- ইট, বালি, সিমেন্ট আর শ্রমিকদের পেছনে! একজন শ্রমিক সারাদিন তার কাজে ব্যস্ত থাকে। তারপর যে সময়টুকু পায় এ সময়ে কি সে তোমার কোন কথা শুনবে? নিশ্চয়ই শুনবে না।

ভাইয়েরা আমার! একজন আলেম পৃথিবীর বুক থেকে চলে গেলে তার স্থান কিন্তু কেউ পূরণ করে না। তার সে স্থান শূণ্যই থেকে যায়। বর্তমানে যারা শরী'আহ বিভাগে পড়ে তাদের অবস্থা জানলে তুমি রীতিমতো শিউরে ওঠবে। একবার এক শরী'আহ বিভাগের ছাত্রকে জিজ্ঞেস করা হলো, ভাই! দরূদে ইব্রাহিমী কী? ছাত্রটি বিস্মিত হয়ে বললো, এ আবার কেমন দরূদ! এ দরূদের কথা তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করানো হয়নি। হাজীদের সহায়তার জন্য একবার কিছু শরী'আহ বিভাগের ছাত্রদের নেয়া হলো। এক ছাত্র তখন মহিলা হাজীদের নির্দেশ দেয়া শুরু করলো, তারা যেনো তাদের পোশাক খুলে পুরুষদের পোশাক পরে নেয়। আরেক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করা হলো, মুসাফির অবস্থায় কসর কিভাবে করবে? সে বললো, দেড় রাকাত নামায পড়বে। এই যদি আমাদের অবস্থা হয় তাহলে আমরা সমাজে কী পরিবর্তন আনবো? কিভাবে আমাদের সমাজ আলোকময় হবে? হিদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন বিভাগে ভর্তি হতে না পারলে শরী'আহ বিভাগে এসে ভর্তি হয়। এদের অনেকেই নামায পড়ে না। কোন আমলের ধার ধারে না। এদের দ্বারা ইসলামের কী উপকার হবে? মুসলমানদের কী উপকার হবে?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

অর্থ : হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহর উপর, তার রাসূলের উপর এবং ঐ কিতাবের উপর ঈমান আন যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন আর ঐ কিতাবের উপর যা তিনি ইতিপূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব সমূহ, তাঁর রাসূলদেরকে এবং পরকালকে বিশ্বাস করে না, সে তো দূরবর্তী পথভ্রষ্টতায় নিপতিত। (সূরা নিসা ঃ ১৩৬)

আমাদের শরী'আহ বিভাগের ছাত্র আর উস্তাদদের অবস্থা দেখলে দারুণ হতাশা বোধ করি। ভারি আশ্চর্যান্বিত হই। একবার এক শিক্ষক এ আয়াত পাঠ কালে ভারি চিন্তায় পড়ে গেল। অবশেষে দীর্ঘ চিন্তার পর ছাত্রদের বলল, দেখ এ আয়াতে ভুলে দু'বার "আমিনু" লেখা আছে সুতরাং এটি মুছে ফেল। এ হলো শরী'আহ বিভাগের উস্তাদদের অবস্থা। আর ছাত্রদের অবস্থা যে কী গুরুতর তা ভাবতেই শরীর শিউরে উঠে।

ভাইয়েরা আমার, এবার একটু ভেবে দেখ। মুসলমানদের মাঝে ইসলামের মর্যাদা কতটুকু বাকি আছে। ইসলাম আজ তাদের নিকট কতো হেয়, কতো তুচ্ছ হয়ে গেছে। আজ মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের কথাই চিন্তা করো। বাৎসরিক ছুটি পেলে তারা দলে দলে পৃথিবীর দিগ দিগন্তে ছুটে যায়। কতো কিছু জানার তাদের কী নেশা, কী প্রচণ্ড আগ্রহ! কিন্তু আফগানিস্তানে বা পেশোয়ারে এসে অসহায় নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের একবার দেখার জন্য আসারও প্রয়োজন অনুভব করে না।

একটি জাতির মাথা হল শিক্ষকরা। মধ্যপ্রাচ্যের কতোজন শিক্ষক আছেন যারা আফগানের এই নিপীড়িত মুসলিম জাতির কথা চিন্তা করে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে একটু দেখতে আসে। আর যারা আসে তারা কি হাজারে একজন হবে? নিশ্চয় এর চেয়ে কম হবে। গোটা ইসলামী বিশ্ব থেকে কতোজন মানুষ আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে? হাজার মিলিয়ন মুসলমানের মধ্য হতে মাত্র তিন শত হবে। প্রত্যেক তিন মিলিয়ন থেকে একজন করে এসেছে। এর কারণ হল দীনের সেই গুরুত্ব, সেই দরদ, সেই জযবা আর আমাদের অন্তরে নেই। দীন আজ আমাদের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে গেছে।

দীন আর দুনিয়ার মাঝে মানুষ আজ দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছে। তুমি যদি কারো নিকট গিয়ে বলো, ভাই! আমি আমেরিকা যাচ্ছি। সেখানেই আমার পড়াশোনা শেষ করব। সাথে সাথে দেখবে তার চেহারায় আনন্দের ছাপ ভেসে উঠছে।

স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বলছে, মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তোমাকে তাওফীক দান করুন। তোমাকে বিপদাপদ থেকে মুক্ত রাখুন।

তুমি যদি কাউকে বল আমাকে আমেরিকা পাঠানো হচ্ছে। আমি সেখানে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করে উঁচু ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসব। দেখবে আনন্দে অধীর হয়ে বলবে, শাবাস! শাবাস! বিন্দুমাত্র চিন্তা করো না। সেখানে যাও। ইসলামী কেন্দ্রগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখবে। ইনশাআল্লাহ ইসলাম ও মুসলমানদের অনেক খেদমত করতে পারবে। দেশে ফিরে এসেও তুমি প্রচুর দেশের সেবা করতে পারবে। আর যদি তুমি গিয়ে বল, ভাই আমিতো আমার চাকুরিটা ছেড়ে দিতে চাচ্ছি। আমি আফগানিস্তানে গিয়ে মুজাহিদদের খেদমত করব। আমি শুনেছি সেখানে নানা কাজে ইঞ্জিনিয়ারদের ভারি সংকট।

তোমার কথা শুনে তার চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে যাবে। বলবে এ্যাঁ.....এ আবার কী ভাবলে! বলবে, এতো খেদমতের দরকার নেই। দেশেই থাক। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ফিকিরে থাক। এটাই তোমার বড় জিহাদ। তুমি যে আফগানিস্তানে যেতে চাচ্ছো, এ শূণ্য পদটি পূরণ করার জন্য কাকে রেখে যাচ্ছো? এ পদে তো শিয়ারা আসবে। কমিউনিস্টরা আসবে, পথভ্রষ্ট কোন ফেরকার লোকেরা এসে জেঁকে বসবে। এভাবে নানা বুঝ দিয়ে তোমাকে বিভ্রান্ত করতে চাইবে। আসল কথা হল, মুসলমানদের অন্তরে এখন আর ইসলামের মর্যাদা নেই। ইসলাম আজ তাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে গেছে।

বিশিষ্ট তাবেঈ মাইমুন ইবনে মিহরান বলেন–

فاتتْــني صلاةُ العصرِ جماعة فوقفتُ بابَ المسجدِ حتى يُعزِّيني الناسُ فلم يُعزِّني الناسُ سوَى اثنينِ أو ثلاثُ، ولو ماتَ ابني لعزَّاني الألوفُ، لإنَّ مصيبةَ الدين عندَ الناس أهونُ من مصيبةِ الدنيا —

অর্থ : একদা আমার আছরের নামাযের জামাত ছুটে গেল। আমি তখন মসজিদের দরজায় বিষণ্ন মনে দাঁড়িয়ে রইলাম। হয়তো মানুষ আমাকে সান্ত্বনা দিবে। কিন্তু দু'তিন জন ছাড়া কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিল না। হ্যাঁ...যদি আমার সন্তান মৃত্যুবরণ করত তাহলে হাজার হাজার মানুষ এসে আমাকে সান্ত্বনা দিত। এর কারণ হল, মানুষের নিকট দীনের মুসিবতটা দুনিয়ার মুসিবতের তুলনায় তুচ্ছ হয়ে গেছে।

ষড়বিংশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٦١) وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ (٦٢) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ○ (٦٣) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ○ (٦٤) يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ○ (٦٥) وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ○ (٦٦) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ○

অর্থ : আর তাদের কেউ কেউ নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, এ লোকটি কান সর্বস্ব। আপনি বলে দিন, কান সর্বস্ব হলেও তোমাদের মঙ্গলের জন্য। তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখেন এবং মু'মিনদের কথায় বিশ্বাস রাখেন। আর তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান এনেছে তিনি তাদের জন্য রহমত। যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায়। অথচ যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলকে সন্তুষ্ট করাই অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল। তারা কি জানে না, যে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে মোকাবিলা করে তার জন্য জাহান্নাম। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তাই হল মহা অপমান। মুনাফিকরা ভয় পায় যে, মুসলমানদের নিকট এমন সূরা অবতীর্ণ হবে যা তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করে দিবে। আপনি বলে দিন, তোমরা বিদ্রুপ করতে থাক। নিশ্চয় তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবেন। যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো গল্প আর কৌতুক করছিলাম। আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তার বিধি বিধান ও তার রাসূলের সাথে কৌতুক করছিলে? তোমরা কোন ওজর আপত্তি করো না। ঈমান আনার পর তোমরা কাফের হয়ে গেছ। তোমাদের কাউকে যদি আমি ক্ষমা করে দেই তবে অবশ্যই কাউকে শাস্তিও প্রদান করব। কারণ তারা পাপাচারী। (সূরা তওবা ঃ ৬১-৬৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ তাদের মাঝে এমন লোক রয়েছে যারা নবীকে কষ্ট দেয় অর্থাৎ নবীর সাথে কৌতুক করে। নবী সম্পর্কে গীবত করে। তার কাজকে তুচ্ছ মনে করে। তারা পরস্পরে বলাবলি করে, যদি আমাদের জিজ্ঞেস করে তাহলে আমরা ওজর আপত্তি করব। আর তিনি আমাদের বিশ্বাস করে নিবেন। কারণ তিনি যাই শুনেন তাই বিশ্বাস করেন। তিনি কান সর্বস্ব। আমাদেরকে ফিরিয়ে দিবেন না। আমাদের মিথ্যাবাদী বলবেন না।

তারা বলে, هُوَ أُذُنٌ তিনি কান সর্বস্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ আপনি বলে দিন, কান সর্বস্ব হলেও তোমাদের মঙ্গলের জন্য। তোমাদের ভাল ও কল্যাণকর বিষয়গুলো শুনেন। আর অকল্যাণ ও

ক্ষতিকর বিষয় উপেক্ষা করে থাকেন। কারণ তোমরা তো আল্লাহর দরবারে নির্ণীত হয়ে গেছো। ফলে তার নিকটও নির্ণীত হয়ে গেছো। তাই তিনি তোমাদের কোন গুরুত্বই প্রদান করেন না।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ○

তিনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন। মু'মিনদের বিশ্বাস করেন। তাদের কথায় কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করেন না। আর তিনি তো মু'মিনদের জন্য দয়া স্বরূপ। উল্লেখিত আয়াতগুলো বেশ কিছু মুনাফিকদের কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন নাবতাল ইবনে হারেস। এর কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ লোক সম্পর্কে বলেছেন–

من أرادَ أن ينظرَ إلى الشيطانِ فلينْظُر إلى نبتلِ بنِ الحارثِ —

অর্থ : যে ব্যক্তি শয়তানকে দেখতে চায় সে যেন নাবতাল ইবনে হারেসকে দেখে। তাদের আরেক জন হল মুয়াত্তাব ইবনে কুসাইব।

এদের চরিত্র হল, এরা কোন কুকর্ম করার পর যদি তা প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে রাসূলের নিকট এসে কসম খায়। অস্বীকার করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ ○

তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায়। তোমাদের সন্তুষ্ট করতে চায়। অথচ যদি তারা মু'মিন হত তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলকে সন্তুষ্ট করাই অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল।

আর এই মুনাফিকদের চরিত্র হল, এরা মানুষকে স্রষ্টার উপর প্রাধান্য দেয়। আল্লাহর নিকট লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে মানুষের নিকট লাঞ্ছিত হওয়াকে অধিক ভয় পায়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ ○

তোমরা মানুষকে ভয় কর, অথচ আল্লাহই অধিক যোগ্য যে তোমরা তাকে ভয় করবে। কারণ আল্লাহ হলেন ঐ মহান সত্ত্বা যার হাতে রয়েছে সব কিছুর চাবিকাঠি। তার হাতে রয়েছে তাদের রিযিক, তাদের সৌভাগ্য, তাদের সুস্থতা, তাদের সাহায্য। মোট কথা তাদের জীবনের সবকিছুই আল্লাহর ক্ষমতাধীন। তাই আল্লাহ বলেন–

وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

আর আল্লাহর নিকটই সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং তুমি তার হস্তমুষ্টিতে আবদ্ধ। সুতরাং কোথায় যাবে? কোথায় পালাবে? আল্লাহ তা'আলা বলেন– اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ এখানে يُحَادِدِ اللّٰهَ শব্দের অর্থ হল– يدخل في الحدود الأقليمية আল্লাহর নিজস্ব সীমায় প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর নিজস্ব সীমায় প্রবেশ করার অর্থ হল আল্লাহর পৃথিবীতে থেকে সে আল্লাহর শত্রুতা ও বিরোধিতার ঘোষণা করতে থাকে। যেমন তুমি প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে লিখিত কিছু লিফলেট বা হ্যান্ডবিল নিয়ে প্রেসিডেন্ট হাউজে প্রবেশ করে সেখানেই তা বিতরণ শুরু করলে। ঠিক তেমনই গুরুতর অপরাধ হল তুমি আল্লাহর সীমানায় প্রবেশ করে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবে। আল্লাহ বিরোধী কাজ করবে। তাই এই অপরাধের শাস্তি হল–

فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ـــ

তাহলে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তাই হল মহা অপমান। দুনিয়াতেও অপমানিত হবে, লাঞ্ছিত হবে। আখেরাতেও অপমানিত হবে, লাঞ্ছিত হবে। মুনাফিকদের লাঞ্ছনার আর শেষ নেই। লাঞ্ছনা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে ধাওয়া করে ফিরবে। আল্লাহ তা'আলাই মানুষদের অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃণা ঢেলে দেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে ডেকে বলেন–

يا جبريل، إِنِي أحببتُ فلانًا فأحِبَّه ثم يُنادي جبريلُ في أهلِ السماء أنَّ الله أحبَّ فلانًا فأحبُّوه ثم يُوضع لـــه القبولُ في الأرضِ ـــ

হে জিবরাঈল! আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসি। মহব্বত করি। সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাস ও মহব্বত কর। তারপর জিবরাঈল (আ.) আকাশবাসীদের আহবান করে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন.... সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস। তারপর পৃথিবীতে তার সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ۝

অর্থ : নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, সত্ত্বর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য মানুষের অন্তরে ভালবাসা আর মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন। (সূরা মরিয়ম ঃ ৯৬)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي অর্থ : আর আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালবাসা এবং মহব্বত ঢেলে দিলাম। যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর মহব্বত আর ভালবাসার মধু ঢেলে দিলেন। ফলে সকল মানুষ তার ভালবাসার মধু থেকে একটু একটু আস্বাদন করে নিল।

তারপর রাসূল বলেছেন–

و إذا أبغضَ الله عبدًا نادَى جبريلُ إِني أبغضتُ فلانًا فأبغضْه ثم يُنادى جبريلُ إنَّ الله أبغضَ فلانًا فأبغضُوه ـــ

অর্থ : আর যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন, ঘৃণা করেন তখন জিবরাঈল (আ.) কে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করি সুতরাং তুমিও তাকে ঘৃণা কর। তারপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ঘোষণা করেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন সুতরাং তোমরাও তাকে ঘৃণা কর। তারপর মানুষের হৃদয়ে তার ঘৃণা ঢেলে দেয়া হয়।

এ কারণেই হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর কাছ দিয়ে যখনই কোন আমীরের শোভা যাত্রা হত আর শোভা যাত্রায় সাধারণত আরব ও অনারব উন্নত সব ঘোড়া আমীরের গাড়ি টেনে নিয়ে যেত। সাথে চাকচিক্য আর জৌলুসের অভাব থাকত না। তখন তিনি বলতেন, তাদের গাড়িগুলো যতই খটখট শব্দ তুলে আর ঘোড়া গুলো হ্রেসা তুলে ছুটে যাক না, পাপাচারের লাঞ্ছনা কখনো তাদের থেকে দূরীভূত হচ্ছে না। এ অবাধ্যদের সাথে সর্বদা লাঞ্ছনা ঘুরে ফিরছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ অর্থ : আর আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে কেউ সম্মান করার নেই।

সুবহানাল্লাহ! একটু ভেবে দেখ। অনেক সময় এমনও হয় একজন মানুষ তোমার সাথে অত্যন্ত কঠোর ও রূঢ় আচরণ করে অথচ তা সত্ত্বেও তুমি তাকে মহব্বত কর। এর কারণ মহব্বত তোমার হাতে নয়। বরং তোমার রবের হাতে। আবার দেখা যায় কিছু লোক তোমার নিকট এসে নত হয়ে থাকে। কোমল ভাষায়

তোমার সাথে কথা বলে। আরো কতো কি করে। কিন্তু তুমি তাকে পছন্দ করো না, তার সাথে বসতে চাওনা, এর কারণ কি? সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তরে তার ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাই তুমি তাকে মহব্বত করতে পারছো না।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। আমি তাকে খুব বিশ্বাস করতাম। বিশ্বাস কর, সে পাপ কাজের দুর্গন্ধ অনুভব করত। এটা ছিল তার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যও। একবার আমি ও সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ বিভাগে বসে ছিলাম। তখন আমাদের বেশ দূর দিয়ে শরী'আহ বিভাগের একজন উঁচু পদের কর্মকর্তা হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাকে দেখেই সে বলল, ঐ লোকটা কে? আল্লাহ! তার থেকে তো পাপের দুর্গন্ধ বের হয়ে আসছে! অথচ সে তাকে চিনে না। জীবনে কখনো তাকে দেখেওনি। আসলেও লোকটা ভাল ছিল না। শরী'আহ বিভাগের উঁচু পদে থাকা সত্ত্বেও সে জুম'আর নামায পর্যন্ত পড়ত না। একবার ভেবে দেখ। কোথায় যাচ্ছো? কী করছো? আল্লাহর সাথে মশকরা করছো আর ভাবছো, তুমি একজন শিশুর সাথে কৌতুক করছো। এ ধরনের দুষ্টু লোকদের সম্পর্কে আইয়ুব সাখতিয়ানী বলেছেন– এরা সুদ খায় আবার বড়াই করে। বলে, সুদ খাওয়া তো হারাম। হয়তো কেউ এসে বলল, আমাকে এক হাজার দেরহাম ঋণ দিন। আমি আপনাকে দু'শ দেরহাম সুদ দিব। একথা শুনে সে একেবারে চমকে যাবে। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে বলবে, আরে কী বলছো, সুদ খাওয়া তো হারাম! আমি হারাম খাব নাকি? তবে সুদ থেকে বাঁচার জন্য তোমাকে একটি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমি তোমার নিকট এই ঘড়িটি এক হাজার দু'শত দেরহামে বিক্রয় করছি। তুমি আমাকে তার মূল্য এক বৎসর পর পরিশোধ করবে। তখন সে ঘড়িটি নিয়ে চলে যাবে। বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে। তারপর লোকটি ফিরে এলে বলবে তুমি এ ঘড়িটি নগদ এক হাজার দেরহামে ক্রয় করবে? বলবে, হ্যাঁ.... ক্রয় করব। তারপর নগদ এক হাজার দেরহাম দিয়ে তা ক্রয় করে নিবে। তারপর এক বৎসর পর তার থেকে পাওনা দু'শত দেরহাম নিবে। এভাবে সুদের বিকল্প ব্যবস্থা বের করে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। আর নিজেকে খুব পরহেজগার ভাবতে থাকে। এদের কার্যকলাপ দেখে আইয়ুব সাখতিয়ানী বলেছেন– يخادعون الله لما يخادعون صبيًّا এরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয় যেমন শিশুকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। এ ধরনের মুনাফিকদের সম্পর্কেই তো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

(٢٦) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○

অর্থ : তাই আল্লাহ তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন। আর পরকালের লাঞ্ছনা তো আরো কঠিন। যদি তারা জানতো। এ ধরনের মুনাফিকদের সম্পর্কে আমি প্রায়ই বিস্মিত হয়ে বলি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তাদের থেকে পানাহ দাও। রাসূল তাদের মাঝে বিদ্যমান। অথচ তাদের হৃদয় অন্ধ। তারা রাসূলকে চিনছে না। কুরআনের নূর তাদের মাঝে বিদ্যমান, অথচ তাদের চোখে আবরণ পড়ে আছে। তারা কিছুই দেখছে না। নবীর নিকট ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। অথচ তারা সেই ওহী নিয়ে তিরস্কার করছে। মশকরা করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(١٠٤) قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ○

অর্থ : তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব যে দেখবে সে নিজের কল্যাণেই দেখবে। আর যে অন্ধ হবে তার পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। আর আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই। (সূরা আনআম ঃ ১০৪)

হৃদয় কীভাবে অন্ধ হয়? হ্যাঁ অধিক পাপাচারের কারণেই হৃদয় অন্ধ হয়ে যায়। অধিক গুনাহের কারণেই হৃদয় তার শক্তি হারিয়ে ফেলে। তা শুরু হয় ছোট ছোট গুনাহ দ্বারা। তারপর আস্তে আস্তে গুনাহ বড় হতে

থাকে। এভাবে ধীরে ধীরে হৃদয়ে অন্ধত্ব নেমে আসে। আর আল্লাহ তাকে অবকাশের পর অবকাশ দিতে থাকেন। রাসূল বলেন–

إن الله ليُملي للظالم حتى إذا أخذَه لم يفلتْه ـــ

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যালিম পাপাচারীকে অবকাশ দিতে থাকেন। সুযোগ দিতে থাকেন। অবশেষে যখন তিনি তাদের পাকড়াও করেন তখন আর ছুটে যাওয়ার কোন সুযোগ থাকে না।

আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল সম্পর্কে বলেছেন–

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

অর্থ : সে শাস্তি তাদের দেয়া হয়েছে এ কারণে যে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধানকে মানত না। এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান, সীমালংঘনকারী। (সূরা বাকারা ঃ ৬১)

এদের পাপাচার শুরু হয়েছে অবাধ্যতা ও সীমালংঘন দ্বারা। তারপর পাপ করতে করতে তারা দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। এমনকি অন্যায়ভাবে তারা নবীদের হত্যা করেছে। আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে। প্রত্যাখ্যান করেছে।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لعن الله السارقَ يَسرقُ البيضةَ فتُقطعُ يدُه ـــ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ঐ চোরকে রহমত থেকে বঞ্চিত করেন, যে ডিম চুরি করে ফলে তার হাত কাটা যায়। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে তা হলো, একটি ডিম চুরি করার কারণে কি কারো হাত কাটা যায়? আলেমরা এ কথায় একমত যে, তিন দেরহামের চেয়ে কম মূল্যের কিছু চুরি করলে কারো হাত কাটা যাবে না। তাহলে কিভাবে একটি ডিম চুরি করলে কারো হাত কাটা হবে? এর ব্যাখ্যা হলো, একটি ডিম চুরি করার পর মুরগী চুরি করবে। তারপর গরু চুরি করবে। ফলে বিচারে তার হাত কাটা যাবে।

হৃদয়ের অবস্থা হলো কাঁচের ন্যায়। তোমরা কি গাড়ির কাঁচের কথা ভেবে দেখেছো। কাঁচের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। আবার তা মুছে ফেলার জন্যও এক প্রকার ব্যবস্থা আছে। ধূলি বালিতে কাচ অপরিচ্ছন্ন হয়ে গেলে একটি বাটনে চাপ দেয়। ফলে পানি বেরিয়ে আসে। আরেকটি বাটনে চাপ দিলে মুছে ফেলার যন্ত্রটি কাঁচ মুছে ফেলে। এভাবে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। রাসূল বলেন, أتبعِ السيئةَ الحسنةَ تَمْحُها অর্থ : তোমার দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে তারপর একটি নেকীর কাজও কর যা তোমার পাপকে মুছে ফেলবে। তবে হ্যাঁ, যদি পাপ করতে করতে এমন অবস্থা হয়ে যায় যে, দাগ পড়তে পড়তে হৃদয় একেবারে কালো হয়ে যায়; তা থেকে আর নূর বের হওয়ার আশা করা যায় না। তখন সে অবস্থাকে বলা হয় মরিচা। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○ (١٤)

অর্থ : কখনো না, বরং তারা যা করতো তা তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।

এদের হৃদয় এমন হয়ে গেছে যে, তা দ্বারা আর কিছুই দেখা যায় না। যেমন ক্যামেরার কাঁচ যখন ঘন ময়লায় আচ্ছাদিত হয়ে যায় তখন তা দ্বারা কিছুই দেখা যায় না। কখনো দেখা গেলে উল্টা পাল্টা দেখা যায়। তাই হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। পাপ থেকে বিমুক্ত রাখতে হয়। আর কখনো পাপ হয়ে গেলে সাথে সাথে তওবা করে পরিচ্ছন্ন পবিত্র করে নিতে হবে।

মালেক ইবনে দীনারের কথা কে না জানে। তিনি ডাকাত ছিলেন। এক রাতে এক বাড়িতে ডাকাতি করতে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করে দেখে মালিক নামাযে দাঁড়িয়ে আছে। সূরা হাদীদ তিলাওয়াত করছে–

(١٦) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ○

অর্থ : মু'মিনদের জন্য কি সে সময় আসেনি যে, আল্লাহর কথা স্মরণের কারণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে তাদের হৃদয় ভয়ে বিগলিত হবে। আর তারা তাদের মত হবে না যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে, তারপর সুদীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হয়েছে ফলে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারে অভ্যস্ত। (সূরা আল হাদীদ ঃ ১৬)

সাথে সাথে মালেক ইবনে দীনারের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি হল। তিনি বলে উঠলেন نعم... لقد آن হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই সময় এসে গেছে। তারপর সাথে সাথে তওবা করে খাঁটি মু'মিন হয়ে গেলেন। আবেদ ও যাহেদ হয়ে গেলেন। আজো তিনি একজন মুহাদ্দিস, আলেম ও বুযুর্গ হিসেবে গোটা বিশ্বে প্রখ্যাত। ফুজাইল ইবনে আয়াজ (রহঃ)-এর ঘটনা ঠিক এমনই। হতে পারে উল্লেখিত ঘটনাটিই ফুজাইল ইবনে আয়াজ (রহঃ) এর। আর মালেক ইবনে দীনারের ঘটনা হল তিনি স্বপ্নে দেখেন, তার পিছনে পিছনে একটি বিরাট আজদাহা ছুটে আসছে। আর তিনি তার থেকে আত্মরক্ষার জন্য উদ্ভ্রান্তের ন্যায় দৌড়ে পালাচ্ছেন। কিছু দূর গিয়ে একজন বৃদ্ধ লোককে পেলেন। বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

বৃদ্ধ বললেন, আমি তোমাকে হেফাজত করতে পারব না। তিনি তখন আবার দৌড়ে পালাতে লাগলেন। আর সাপটিও ছুটে আসতে লাগল। একটি পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের পাহাড়? বলা হল, এ পাহাড়ে মু'মিনের ছেলে মেয়েরা আছে যারা প্রাপ্ত বয়সের পূর্বে ইন্তেকাল করেছে। তারপর দেখলেন, সেই পাহাড় থেকে একটি ছোট মেয়ে বেরিয়ে এল। মেয়েটি ইশারা করতেই সাপটি পিছনের দিকে চলে গেল। মালেক ইবনে দীনার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? কী তোমার পরিচয়? এ মহা বিপদ থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার করলে। মেয়েটি উত্তরে বলল, আমি আপনার মেয়ে। একেবারে ছোট অবস্থায় আমি ইন্তেকাল করেছিলাম। আচ্ছা তাহলে ঐ সাপটি কী? কেন সে আমার পিছনে পিছনে ছুটে আসছিল? মেয়ে বলল, সে হল আপনার বদ আমল। তিনি বললেন, ঐ দুর্বল বৃদ্ধ লোকটি কে? সে কেন আমাকে রক্ষা করতে পারেনি? মেয়ে বলল, সে আপনার নেক আমল। সে এতোই দুর্বল যে, আপনার বদ আমলের উপর বিজয়ী হওয়ার শক্তি তার নেই। তাই সে সাহায্য করতে পারেনি।

এ স্বপ্ন দেখার পর মালেক ইবনে দীনার তওবা করলেন। চিরতরে পাপের পথ ছেড়ে দিয়ে নেক আমলে লিপ্ত হয়ে গেলেন। পরবর্তীতে তিনি একজন প্রখ্যাত তাবেঈ হয়ে ছিলেন।

হ্যাঁ, তওবা করতে হবে। একেবারে খাঁটি তওবা করতে হবে। তওবায়ে নাসূহা করতে হবে। এমন করলে হবে না যে, সন্ধ্যায় তওবা করবে আবার সকালে যেমন ছিল তেমন হয়ে যাবে। খাঁটি তওবার জন্য তিনটি শর্তঃ ১. পাপ কাজ পরিহার করা ও পুনরায় তা না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। ২. বিগত পাপের ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া। ৩. মানুষের সর্বপ্রকার হক আদায় করে দেয়া আর আদায় করা সম্ভব না হলে মাফ চেয়ে নেয়া। আল্লাহ তা'আলা বান্দার হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন এবং সে হিসাবেই ফায়সালা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إنَّ اللهَ ينظُرُ إلى في أهلِ الأرضِ ، قال كما قال عليه السلامُ — إنَّ اللهَ اصْطَفى كنانةَ مِنَ العرَبِ ، و اصْطَفى قُرَيشًا مِن كنانةَ وَ اصْطَفى بَنِي هاشمٍ منْ قُرَيشٍ و اصْطَفَنِي مِن بَنِي هاشمٍ ، فأنا خِيارٌ من خيارٍ من خيارٍ ، ينظُرُ سُبحانَه إلى المعادنِ —

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীর অন্তরে দৃষ্টি ফেললেন। অতঃপর গোটা আরব থেকে কেনানা বংশকে বেছে নিলেন। তারপর কেনানা বংশ হতে কুরাইশকে বেছে নিলেন। তারপর কুরাইশ থেকে বনু হাসেমকে বেছে নিলেন। আর বনু হাসেম থেকে আমাকে বেছে নিলেন। সুতরাং আমি উত্তমের চেয়ে উত্তমের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা সর্বদা মানুষের সুকুমারবৃত্তির দিকে লক্ষ করেন। বলছিলাম, এতে কোন আশ্চর্যের বিষয় বা অসম্ভব বিষয় কিছুই নেই। কারণ তওবার দরজা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সদা উন্মুক্ত থাকবে। সুতরাং পাপ থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর মুরাকাবা করতে হবে। মনে করতে হবে আল্লাহ আমার অতি নিকটে আছেন। আমার সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করছেন। অবলোকন করছেন। তাই সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে থাকতে হবে। আল্লাহর মাঝে আর আল্লাহর শাস্তি ও গযবের মাঝে একটি অন্তরায় সৃষ্টি করে রাখতে হবে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী সকল উম্মতকে এবং এ উম্মতকে তাক্বওয়া বা খোদা ভীতির নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন–

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ ○

অর্থ : আর আমি নির্দেশ দিয়েছি, তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। (সূরা নিসাঃ ১৩১)

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়ায (রাঃ) কে বললেন, اتَّقِ الله حيثُ ما كنتَ হে মুয়ায! তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর। তারপর বললেন–

اِسْتَحِ مِنَ اللهِ استحيَائَكَ من رجلٍ أو رَجلينِ منْ صالحِ عشيرتكَ لا يُفارقَانكَ —

তুমি আল্লাহ থেকে লজ্জিত হও তোমার পরিবারের পুণ্যবান একজন বা দুজন থেকে লজ্জিত হওয়ার ন্যায় যারা তোমার থেকে দূরে সরে যায় না। অর্থাৎ তুমি হয়তো চুরি করতে চাইবে তখন তুমি মনে মনে চিন্তা করবে তোমার নিকটে দাড়িয়ে আছে এমন এক ব্যক্তি যাকে তুমি ভয় পাও। তাহলে কি তুমি তার সামনে চুরি করবে? তুমি কি তোমার পিতা বা মাতার সামনে যিনা করতে পারবে? নিশ্চয় পারবে না। সুতরাং তুমি আল্লাহর ব্যাপারে তেমনিভাবে লজ্জা পাও যেমন তোমার পরিবারের কারো সামনে পাপ কাজ করতে লজ্জা পেয়ে থাক। মনে মনে চিন্তা করো, হায়! একজন মানুষের সামনে লজ্জা পাই। তাহলে তো আল্লাহর ব্যাপারে আরো বেশী লজ্জা পাওয়া দরকার।

আমি বহুবার যুবক ভাইদের বলেছি, তোমরা কাকে বেশী ভয় কর, আল্লাহকে, না গোয়েন্দাকে? তারা আমার প্রশ্নের উত্তরে খুব জোর দিয়ে বলেছে, আল্লাহকে। তখন আমি তাদের বলেছি, যদি তোমার ফজরের নামায ছুটে যায়, তাহলে নামায ছুটে যাওয়ার কারণে আল্লাহকে কি তেমন ভয় করবে যেমন ভয় কর কেউ এসে তোমাকে বলল যে, একজন গোয়েন্দা তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করছে। সত্যি করে বল দেখি। কোন ক্ষেত্রে বেশী ভয়াতুর হবে। এর উত্তরে তুমি যাই বল না কেন। কিন্তু তুমি যদি এমন দেশে থাক যার শাসক একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তি। তাহলে তুমি যদি জানতে পার, তোমার সাথে যে ব্যক্তিটি কথা বলছে সে একজন গোয়েন্দা। তোমার ব্যাপারে সে রিপোর্ট দিবে। অথবা পাশে একজন ব্যক্তি আছে যে তোমার সারাদিনের কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করে রাখে, তাহলে নিশ্চয় তুমি একটি কথা বলতে হাজার বার চিন্তা করবে।

অথচ তোমার সাথে দু'জন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন, তারা সর্বদা তোমার কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করছেন। আর তা প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর নিকট পেশ করা হচ্ছে। অথচ তুমি তার কোনই পরওয়া করছো না। তাহলে দেখা গেল, তুমি আল্লাহর চেয়ে গোয়েন্দাকে বেশি ভয় কর। সত্যি করে বলছি, যদি আমরা আল্লাহকে তেমন ভয় করতাম যেমন ভয় করি এলাকার পুলিশ অফিসারকে বা গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনকে তা হলে তো আমাদের আমল অন্যরকম হত। আসলে আমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করি না।

তাই বলছিলাম মুরাকাবা করতে হবে। মহান রাব্বুল আলামীনের উপস্থিতির মুরাকাবা করতে হবে। আর বলতে হবে, এই যে দুনিয়ার শাসক, মন্ত্রী বা অন্য যে কেউ হোক তার ক্ষমতা তো চোখের পলকে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ক্ষমতা, তাঁর রাজত্ব চিরন্তন। এর কোন ক্ষয় নেই। কোন লয় নেই। এ জন্যই দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোন মুজাহিদ বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করতেন তখন তাকে আল্লাহর ভয় ও তাক্বওয়ার উপদেশ দিতেন। এরপর হযরত আবু বকর (রাঃ) ও সর্বদা তার বক্তব্যে বলতেন–

إيها الناس، أُوصِيْكم بتَقْوَى الله —

হে লোকেরা, আমি তোমাদের আল্লাহর ভয়ের উপদেশ দিচ্ছি। উমর (রাঃ) ও সর্বদা আল্লাহর ভয়ের উপদেশ দিতেন। এর কারণ যে বিষয়টি মানুষকে আল্লাহর দীন রক্ষার জন্য, মানুষের ধন-সম্পদ রক্ষার জন্য ইত্যাদি যাবতীয় নেক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে তা হল আল্লাহর ভয়, তাক্বওয়া। একদা হযরত আলী (রাঃ) হাসান বসরী (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো, কোন বিষয় দীনকে সঠিক পথে অবিচল রাখে আর কোন বিষয় দীনকে নষ্ট করে দেয়? উত্তরে হাসান বসরী (রহঃ) বললেন–

الَّذي يُصلِحُ الدينَ الورعُ و الَّذي يُفسِدُ الدينَ الطمَعُ —

অর্থ : যা দীনকে রক্ষা করে তা হল তাক্বওয়া। আল্লাহর ভয়। আর, যা দীনকে নষ্ট করে দেয় তা হল লোভ। আল্লাহর ভয়ের সাথে সাথে জাহান্নামের ভয়ও থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ○

অর্থ : তোমরা ঐ অগ্নিকে ভয় কর যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। পরকালকে ভয় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ

অর্থ : তোমরা ঐ দিবসকে ভয় কর যে দিবসে তোমরা আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে। এ কারণেই আমাদের মহান পূর্বসূরীরা বলতেন– تَرَكْنا تِسْعَةَ أعْشارِ الحلال خوفًا مِنَ الله অর্থ : আমরা হালাল বিষয় সমূহের দশ ভাগের নয় ভাগই হারামের ভয়ে ত্যাগ করেছি। এক মহিলা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে ইমাম! জালিমদের বাতির আলোতে বসে সুতা কাটা কি জায়েয? সে যুগে খলীফা আর আমীররা তাদের বাড়িতে বাতি জ্বালিয়ে দিনের ন্যায় উজ্জ্বল করে রাখত। আর সেই মহিলার বাড়ি আমীরের বাড়ির মুখোমুখি থাকার কারণে বাতির আলোর প্রতিবিম্ব তার বাড়িতে গিয়ে পড়ত। ফলে সেই মহিলার বাড়িও আলোকিত হয়ে উঠত।

মহিলার এ প্রশ্ন শুনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) দারুণ বিস্মিত হলেন। বললেন, হে আল্লাহর বাঁদী! তুমি কে? কী তোমার পরিচয়? মহিলা বলল, আমি বিশর ইবনে হাফীর বোন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বললেন, যদি ঘটনা এমনই হয়ে থাকে তাহলে তো মনে হয় আপনাদের পরিবার থেকে তাক্বওয়া-পরহেজগারী বিদূরিত হয়ে যাচ্ছে।

তাই বলছিলাম, বেশি বেশি আল্লাহর মুরাকাবা করতে হবে। আল্লাহর বড়ত্ব আর মহত্ত্বের মুরাকাবা করতে হবে। যারা মুরাকাবা করতে করতে আল্লাহর নৈকট্যশীল হয়ে গেছে তাদের দ্বারাই সমাজ সঠিক থাকে। আল্লাহর সাহায্য ও রহমত আসে। তাদের দু'আয়ই আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি অবতীর্ণ হয়।

সমরকন্দ বিজয়ের সময় সেনাপতি কুতাইবা ইবনে মুসলিম আল বাহেলী (রহঃ) বললেন, একটি অঙ্গুলী আকাশের দিকে এভাবে ইঙ্গিত করে দু'আ করে. এটা আমার নিকট এক লাখ উন্মুক্ত তরবারীর চেয়ে, এক লক্ষ

শক্তিশালী যুবকের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ। তা হল মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসের আঙ্গুল। কারণ তিনি যে দু'আই করতেন আল্লাহ তা কবুল করতেন। তাই বিজয়ের জন্য মুজাহিদ বাহিনীতে এমন একজন লোক থাকাই যথেষ্ট।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। তারা বারা ইবনে মালেক (রাঃ) এর নিকট ছুটে যেতেন। বলতেন–

يا بَراءُ ، أنتَ الذي قَالَ فيكَ رسولُ الله صلّى الله عليه و سلّم : رُبَّ أشْعَثَ أغبَرَّ لوْ أقْسَمَ علَى الله لأبَره —

হে বারা! আপনার ব্যাপারেই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– এমন কতক লোক রয়েছে যারা উস্কো খুস্কো ধূলি মলিন। যদি তারা আল্লাহর নাম নিয়ে কসম খেয়ে কিছু বলে, তাহলে আল্লাহ তা পূরণ করেন। সুতরাং আপনি দু'আ করুন। তারপর তিনি দু'আ করে বলতেন, أقسمتُ عليكَ لتنْصرَنا আমি কসম খেয়ে বলছি, আমাদের সাহায্য করুন। এভাবে দু'আ করে হাত তোলার পর হাত নামানোর আগেই শত্রুরা পলায়ন শুরু করত। এভাবেই চলতে ছিল। কিন্তু কাদেসিয়ার যুদ্ধে তিনি দু'আ করে বললেন, اللهُمَّ امْنحْنا أكتَافَهُمْ و ارْزُق البراءَ الشهادةَ হে আল্লাহ! তাদের কাঁধগুলো আমাদের দান করুন আর বারাকে শাহাদাত দান করুন। এরপর তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

এমনই ঘটনা ঘটেছিল নু'মান ইবনে মুকরিন (রহঃ) এর জীবনে। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তিনি দু'আ করলেন। বললেন–

اللهم نزِّل نصرَكَ و اجْعلْ النعمانَ أوَّلَ شهيدٍ في المعرَكَة، فكان أولَ شهيدٍ في المعركة —

হে আল্লাহ! আপনার সাহায্য অবতীর্ণ করুন এবং রণক্ষেত্রে নু'মানকে প্রথম শহীদ হিসাবে কবুল করুন। তাই হয়েছিল। তিনি ছিলেন সেই যুদ্ধের প্রথম শহীদ ব্যক্তিত্ব।

তবে মনে রাখবে অখাঁটি ভেজাল কিন্তু কোথাও গৃহীত হয় না। কেউ কবুল করে না। তুমি যদি নকল টাকা তৈরি কর তাহলে কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না। বরং তোমার জেল জরিমানা হবে। সুতরাং তুমি যদি ভেজাল আমল কর, লোক দেখানো আমল কর তাহলে কিন্তু তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। রিয়াপূর্ণ আমলের কোন মূল্য আল্লাহর নিকট নেই। মনে কর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বসে বললে, আলহামদুলিল্লাহ! আমি আজ রোজা রেখেছি। তাহলে তুমি তোমার বুকে থাপ্পড় দিয়ে বল, সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। হে নফস! তুমি কি এদের থেকে বিনিময় নেয়ার আশায় রোজা রেখেছো, না আসমান ও জমীনের রব থেকে বিনিময় নেয়ার আশায় রোজা রেখেছো।

এজন্যই দেখা গেছে, কিছু বুযুর্গ এমন ছিলেন যে, তাদের তাক্বওয়া, পরহেজগারী প্রকাশিত হয়ে গেলে বা তাদের কোন কারামত প্রকাশ পেয়ে গেলে তারা তাদের সেই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতেন। আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বাজারে গেলে কুলিদের মাঝ দিয়ে হাটতেন। যেন কেউ তাকে সহজে চিনতে না পারে। এসব বুযুর্গ ব্যক্তিদের কারণেই সমাজ ঠিক থাকত। মানুষের মান মর্যাদা ইজ্জত আবরু ঠিক থাকত। এদের দু'আর কারণেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হত। মানুষের হাজারো বালা মুসিবত দূর হয়ে যেত।

এক রেওয়ায়েতে রাসূল বলেন, যদিও রেওয়ায়েত সম্পর্কে কিছুটা কথা আছে। তিনি বলেন–

إن الله ليَدفعُ بالمؤمنِ الصالحِ عنْ أربعينَ منْ أهلِ جيرانــه —

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের কারণে তার চল্লিশজন প্রতিবেশী থেকে বিপদাপদ দূর করে থাকেন। এই যে মুনাফিকরা, এরা নবুওয়তের পবিত্রতা নিয়ে, ওহী নিয়ে, রাসূলকে নিয়ে হাসি-মজাক করে। তিরস্কার করে। অথচ রাসূল তাদের মাঝে বিদ্যমান। রাসূলের জন্য জীবন উৎসর্গ করারও অনেক লোক বিদ্যমান। অথচ এই মুনাফিকরা তাদের কদর্যপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে। এর কারণ, পাপিষ্ঠ পাপাচার ব্যক্তিরা

কঠিন সময়েও কারো মর্যাদা ও ইজ্জতের দিকে ফিরে তাকায় না। তারা তাদের স্বভাবগত খারাপ কাজ করেই যায়।

হে মুনাফিক! তুমি কি ভেবে দেখেছো, কার সাথে দুষ্টুমি করছো? বদমাইশী করছো? এসব করছো আল্লাহর সাথে। যার নিকট কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। যিনি ইচ্ছে করলেই তোমাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(١٦) ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ○ (١٧) أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ○

অর্থ : তোমরা কি এ ব্যাপারে আশংকামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে জমিনে ধ্বসিয়ে দিবেন আর তারপর জমি কাঁপতে থাকবে? না তোমরা এ ব্যাপারে শংকামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন? আর তখন তোমরা বুঝতে পারবে আমার সতর্কবাণী কেমন ছিল। (সূরা মুলক ঃ ১৬ -১৭)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে তাদের লাঞ্ছিত করবেন। পরকালেও তাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করবেন। প্রত্যেকেই কিয়ামত দিবসে নিজ নিজ আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি অন্যের জমিন ছিনিয়ে নিয়ে থাকে তাহলে তার পিঠে সাত তবক জমিন তুলে দেয়া হবে। সে তা নিয়ে চলাফেরা করবে। যদি যিনা করে থাকে তাহলে কিয়ামত দিবসে সকল মানুষের সামনে তাকে অপমান করা হবে। অপদস্থ করা হবে। যদি শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করে তাহলে কিয়ামত দিবসে তার রক্ত দেখতে রক্তের মত মনে হলেও তা থেকে মেশকের সুগন্ধি ছড়াবে। আর যদি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলতে বলতে কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হবে। লোকেরা তার অবস্থা দেখে বিস্মিত হবে। আর সে তালবিয়া করতেই থাকবে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– কেউ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তোমরা তার মাথা ঢেকে দিওনা। আর শরীরে সুগন্ধি লাগিও না। কারণ সে কিয়ামত দিবসে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উঠবে।

তাহলে এখন ভেবে দেখ, যদি কেউ যিনারত অবস্থায় বা চুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তাদের অবস্থা কেমন হবে?

শাইখ তামীম বলেন, একদা আমি এক জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। দেখলাম এক যুবক কাঁদছে আর কাঁদছে। তার অবস্থা দেখে আমিও আবেগাপ্লুত হলাম। বক্তৃতা শেষ হলে আমি তাকে ডাকলাম। বললাম, তোমার হয়েছে কী? এতো কাঁদছো কেন? যুবক বলল, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ, দুঃখের কথা। তবে অবশ্যই তিনি তার রবের নিকট চলে গেছেন। তার রবই তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। যুবক বলল, আহ! যদি আপনি জানতেন তিনি কী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। ষাট বৎসর পর্যন্ত তিনি একজন ভাল ও সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তারপর এমন এক যুবকের পাল্লায় পড়লেন যে যুবক প্রায়ই ব্যাংকক যায় ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক জায়গায় যায়। তিনিও তার সাথে যেতে লাগলেন। তার বয়স যখন তেষট্টি বৎসর তখন একদিন তিনি নষ্টা মহিলাদের সাথে থাকা অবস্থায় মৃতুবরণ করলেন।

মানুষ যখন পাপ কাজ করে তখন কেউ দেখে ফেলে কিনা তার ভয় করে। কিন্তু একবারও ভেবে দেখেনা যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। প্রতিটি মুহূর্তে সে আল্লাহর সামনে রয়েছে। মুহূর্তের জন্যও সে আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে থাকতে পারছে না।

একবারের ঘটনা। এক ব্যক্তি নির্জনে এক আরব মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করল। অসৎ কর্মের জন্য তাকে ফুসলালো। বলল, আমাদের তো আকাশের তারকা ছাড়া আর কেউ দেখছে না। মহিলা বলল, তাহলে তারকার সৃষ্টিকর্তা কী করছে?

একদা এক দরিদ্র নারী এক ধনী ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা চাইতে গেল। লোকটি বলল, তোমাকে আমি ভিক্ষা দিব। তবে কথা হল তোমার সাথে আমার নির্জনে মিলন হতে হবে। তাহলে তোমার সব প্রয়োজন আমি পূর্ণ করে দিব। কিন্তু মহিলা রাজি হল না। মহিলা ক্ষুধার যাতনা সহ্য করতে না পেরে কয়েকবার এল। আর সেই ধনী ব্যক্তি একই প্রস্তাব বারবার দিল। কিন্তু মহিলা তা প্রত্যাখান করল। অবশেষে মহিলা তার ছোট কচি সন্তানদের কান্না সহ্য করতে না পেরে রাজি হল। লোকটি বাড়ির সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর তাকে শোয়ার জন্য আহবান করল। বলল, সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছি। কেউ আর দেখতে পারবে না। তখন মহিলা বলল, হ্যাঁ, একটি জানালা এখনো খোলা আছে। সে জানালা তুমি বন্ধ করতে পারবে না। তা হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জানালা।

মহিলার এ কথা শুনে লোকটি কাঁপতে লাগল। তার দিব্য চক্ষু খুলে গেল। তওবা করল ও মহিলাকে তার প্রয়োজন পূরণ করে দিল।

তাই বলছিলাম, মানুষের জীবনে মুরাকাবা চাই। মুরাকাবা ছাড়া কিছুতেই সমাজ ভাল হতে পারে না। মুরাকাবার মাধ্যমেই কল্যাণ নেমে আসে।

যারা সর্বদা নিজেদের আমলের মুরাকাবা করে তুমি তাদের দেখতে পাবে, কর্মকর্তা উপস্থিত না থাকলে তারা তাদের কাজের গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। বেশী করে কাজ করে। ভাবে, কর্মকর্তা আমাকে দেখছে না। কিন্তু আল্লাহ তো আমাকে দেখছেন। তার চোখকে তো আর ফাঁকি দেয়া যাবে না। আমার অর্জিত প্রত্যেক টাকা হালাল হতে হবে। আমি যে খাবার ক্রয় করে আমার স্ত্রী পরিজনদের খাওয়াচ্ছি তা হালাল হতে হবে। সুতরাং সে নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করবে।

মালিকে সালিহে আইয়ুব একদা এক বিশাল শোভা যাত্রা নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সে যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ইজ্জ ইবনে সালাম তাকে দেখলেন। সেদিন ছিল ঈদের দিন। তিনি বাদশার নিকট এগিয়ে গেলেন। বললেন, হে আইয়ুব! আল্লাহকে ভয় কর। আশপাশের লোকেরা তার এ আচরণে বিস্মিত হল। বলল, এভাবে তুমি বাদশাকে বলছো কেন? উত্তরে ইজ্জ ইবনে সালাম বললেন, আমি আল্লাহর ক্ষমতা আর শক্তির দিকে তাকালাম। তারপর বাদশাহর ক্ষমতা ও শক্তির দিকে তাকালাম। আমার মনে হল, আমি একটি বিড়ালের সাথে কথা বলছি।

এখন আর মুসলমানদের মাঝে মুরাকাবা নেই। মুসলমানরা এখন আর আল্লাহ তা'আলাকে সর্বদা হাজির নাজির ভাবে না। হিসাব-নিকাশ আর পরকালের ভাবনা তাদের চিন্তা চেতনা থেকে বিদূরিত হয়ে গেছে। একজনের সন্তুষ্টির জন্য বহু মুসলমানকে নির্দ্বিধায় হত্যা করে। একটুও চিন্তা করে না।

একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, বাদশাহ কারা? তিনি উত্তরে বললেন, যাহেদ লোকেরা। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হল, সমাজের একেবারে নিচু লোক কারা? তিনি বললেন, যারা দীন-ধর্ম বিক্রয় করে খায় তারা হল সমাজের নিচু শ্রেণীর লোক। টাকার বিনিময়ে ফতওয়া পাল্টে দেয়। যেন ফতওয়ার স্তুপ তার পাশেই রাখা আছে। যখন ইচ্ছে যেমন ইচ্ছে তা থেকে বের করে দিতে পারে। কেউ যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে ফতওয়া চায় তাহলেও তা উপস্থিত। কেউ যদি সমাজতন্ত্রের পক্ষে ফতওয়া চায় তাহলেও তা উপস্থিত। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফতওয়া চায়, তাহলেও তা উপস্থিত। এক ব্যক্তি এভাবে ফতওয়া দিয়েই যাচ্ছে। ধর্মের লেবাসে ধর্ম বিক্রয় করে যাচ্ছে। এসব লোকেরা সমাজের সবচেয়ে নীচু ব্যক্তি।

আহমদ যায়েফ একটি গ্রন্থ লিখেছেন। বিষয় হল মিশরে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নির্যাতন ও নিপীড়নের বিবরণ। গ্রন্থটির নাম البوَّابـةُ السَّوداءُ তিনি তাতে লিখেন, আমি জেলখানার এক প্রকোষ্টে আবদ্ধ ছিলাম। একজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী শাস্তি সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করল। সকালে পুলিশ এসে দরজা খুলল। বলল, ঐ তো এক কুকুর মরে পড়ে আছে। শোন, শোন, আল্লাহ তাদের প্রেসিডেন্টকে পার্থিব

জীবনের উপর শক্তি দিয়েছেন। তারপর আর তাদের কোন শক্তি নেই। এইতো সালাহ নাসের, ইখওয়ানের কর্মীদের শায়েস্তা করার জন্য সে কতো কিছুই না করেছিল। কিন্তু শেষে কি হয়েছিল তা কি ভেবে দেখেছো। অথচ তার নামে গোটা মিশর কাঁপত।

মুহাম্মদ কুতুব ও তার বোন হামীদাকে জেলে পাঠাল। প্রায় পাঁচ বৎসর তারা বন্দী রইল। কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পেল না। মুহাম্মদ কুতুব তার বোনকে দেখার আবেদন করল। জেল কর্মকর্তারা এ আবেদন মঞ্জুর করতে অপারগতা প্রকাশ করল। শেষে এ আবেদন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট পৌঁছল। মন্ত্রী দম্ভভরে বলল, তোমরা মুহাম্মদ কুতুবকে জানিয়ে দাও, সে তার বোন হামীদাকে জীবিত বা মৃত কোন অবস্থায়ই দেখতে পারবে না।

এরপর এক বৎসর কাটতে না কাটতেই পট একেবারে পাল্টে গেল। আল্লাহর লীলা বুঝা বড়ই মুশকিল। মুহাম্মদ কুতুব ও তার বোন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়িতে চলে এলেন আর সেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সারাবী জুম'আ বন্দী হয়ে জেলে প্রবেশ করল। তার স্ত্রী কিছু ফল নিয়ে জেলখানায় উপস্থিত হল। জেলের দরজায় দাঁড়াল। পুলিশ সারাবীকে জিজ্ঞেস করল, ইনি কি আপনার স্ত্রী? সারাবী বলল, হ্যাঁ। ফল দেখে পুলিশের মুখে মুচকি হাসি। তার স্ত্রীকে বলল, শুনুন, আপনার স্বামী এ আইন করেছিল যে, জেলখানায় ফল দেয়া যাবে না। তিনি যখন জেলখানার বাইরে ছিলেন তখন আমি এ আইন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি। আর এখন যখন তিনি জেলখানায়ই বিদ্যমান তখনও তার আনুগত্য বজায় রাখব। সুতরাং আল্লাহর কসম করে বলছি, তাকে এ ফলের একটি টুকরাও খেতে দেয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ○

অর্থ : কূট-ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রকারীকেই পরিবেষ্টিত করে। (সূরা ফাতির ঃ ৪৩)

সুতরাং হে দুনিয়াবাসী! ভেবে দেখ, একবার ভেবে দেখ, কার বিরুদ্ধে তোমার এই শৌর্য প্রদর্শন? কার বিরুদ্ধে তোমার এ শক্তি প্রদর্শন। আল্লাহর বিরুদ্ধে! যিনি প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির অধিকারী। তার নবী ও তার ওলীর বিরুদ্ধে! তাহলে শুনে নাও! আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করছেন। আল্লাহ যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন–

مَنْ عادَى لي وليًّا فقدْ آذنتُه بالحرب —

অর্থ : যে আমার কোন ওলীর বিরুদ্ধে শত্রুতা করল আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলাম।

তাহলে একটু ভেবে দেখ।

এই যে শামস বাদরান। জান তার কথা? সে ছিল মিশরে ইন্টেলিজেন্স বিভাগের প্রধান। ইখওয়ানের কর্মীদের নির্মমভাবে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব ছিল তার। সে তাদের এমন কষ্টের ও কঠিন শাস্তি দিয়েছিল যা এ যুগের পৃথিবী কোথাও দেখেনি।

একদা কথা প্রসঙ্গে সাইয়্যেদ কুতুব আমাকে বলেছেন–

راجعتُ تاريخَ التعذيبِ في البشريةِ، فلمْ أرَ مجموعةً في الأرض عُذِّبتْ كمَا عذِّب الإخوانُ المسلمونَ في مصرَ —

আমি বহু নির্যাতন ও নিপীড়নের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছি। মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কর্মীদের যেমন নির্যাতন ও নিপীড়ন করা হয়েছে তার কোন নজীর আমি খুঁজে পাইনি।

অবশেষে সেই শামস বাদরান জেলে গেল। স্বয়ং আব্দুন নাসের তাকে জেলে দিল। আর তার সেই পুলিশ বাহিনীই তাকে শাস্তি দিল।

সুতরাং আমাদের উচিৎ, যখনই কোন কাজ করতে উদ্যোগী হই, আমরা যেন আগে আল্লাহকে হাজির নাজির মনে করি। তারপর তা করতে অগ্রসর হই।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন– আমি এতো বৎসর যাবৎ এমন কোন কাজ করিনি, কোন কথা বলিনি, কোথাও যাওয়ার জন্য পা ফেলিনি, তবে আগেই আল্লাহর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি। যদি তাতে কল্যাণ দেখেছি তাহলে অগ্রসর হয়েছি। আর যদি তাতে অকল্যাণ দেখেছি তাহলে তা থেকে বিরতে রয়েছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুই পর্যবেক্ষণ করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা রাতের নিকষ কালো অন্ধকারে কালো পিপীলিকার মৃদু নড়াচড়াও দেখেন। সুতরাং তুমি তোমার সমুদয় বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পন কর। নিশ্চয় আল্লাহই তোমার হয়ে তোমার সকল বিপদাপদ প্রতিহত করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ○

নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে রক্ষা করেন। (সূরা হজ্জ ঃ ৩৮)

সুতরাং তুমি তোমার কার্যাবলীকে আল্লাহর জন্য ছেড়ে দাও। মহান শক্তিশালী পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট সমর্পন কর। তাই তোমার জন্য পুঞ্জীভুত সম্পদ হয়ে থাকবে। বিপদের সময় তা-ই তোমার সহায়ক হবে। এ ব্যাপারে তুমি কোন মানুষের প্রশংসা ও নিন্দার কোন পরওয়া করো না। তোমার অবস্থা যখন এমন পর্যায়ে পৌছবে তখনই তুমি তাওয়াক্কুলের এক বিশেষ মানে পৌছতে পেরেছো বলে বিশ্বাস করবে। তাই কেউ যদি এসে তোমাকে বলে, ভাই তুমি কি এমন কাজ করেছো? তাহলে তুমি উত্তরে বলে দাও, হ্যাঁ, হতে পারে। তুমি তার সাথে ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত হয়ে নিজেকে কষ্ট দিয়ো না।

একবার সাইয়েদ কুতুবের দিকে ফিরে দেখ। জেলে আবদ্ধ রেখে তাকে নির্মম নির্যাতন করল। অবশেষে তাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হল। এমনকি আজও মানুষ জানে না তার কবরটি কোথায়। কায়রোর রাজপথে এক দিনে তার ঐতিহাসিক তাফসীর ফি যিলাযিল কুরআন এর আট হাজার কপি পুড়িয়ে দেয়া হল। যেন তার কোন নাম নিশানা তার কোন চিহ্ন পৃথিবীর বুকে না থাকে। কিন্তু হল তার উল্টো। পৃথিবীর মানুষ এখন সাইয়েদ কুতুবের চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ লেখক আর কাউকে জানে না। সাইয়্যেদ কুতুব এমন ব্যক্তি যার গ্রন্থ সবচেয়ে বেশী বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুতরাং ভেবে দেখ। একবার চিন্তা কর! কার বিরুদ্ধে এতো বড়াই করছো! এতো অহংকার করছো! তাই প্রত্যেক কাজ করার আগে নিয়ত করে নাও। মনে কর তুমি তোমার এক বন্ধুকে দেখতে যাবে। সুতরাং তুমি তোমার এ কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াবের নিয়ত করে নাও। তুমি কিছু খাবে। তুমি নিয়ত করে নাও এ খাবার খেলে তোমার শরীরে শক্তি হবে। সেই শক্তি দিয়ে তুমি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে। তাহলে তোমার সাক্ষাৎ, তোমার খাবার দাবার সব কিছুই ইবাদতে পরিণত হবে। মোবাহ্ কাজ নিয়তের কারণে পূণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। আলেমগণ বলেছেন– যে কোন কাজ যখন তুমি নিয়ত করে করবে তা পূণ্যের কাজ হবে যদিও তা ব্যায়াম হয়। এভাবে প্রত্যেক কাজের শুরুতে তুমি নিয়ত করে নিবে, তাহলে সওয়াবের অধিকারী হবে।

আরেকটি কথা খুব স্মরণ রাখবে। মানুষের গোপন দোষ কখনো খুঁজে বের করতে যাবে না। এটা খুব খারাপ অভ্যাস। রাসূল বলেন–

مَنْ تَتَبَّعَ عورةَ أخيه المسلمِ تتبّع الله عورتَه و مَنْ تتبّع الله عورتَه فضحَه و لوْ في جوفِ بيتِه —

অর্থ : যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ তালাশ করবে আল্লাহ্ তার গোপন দোষ তালাশ করবেন। আর আল্লাহ্ যার গোপন দোষ তালাশ করেন তাকে তিনি লাঞ্ছিত, অপদস্ত করেন যদিও সে তা রাতের অন্ধকারে করে।

এর কারণ আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষে হয়ে যান। সুতরাং তুমি সর্বদা তোমার দোষের ব্যাপারে সতর্ক থাক। নিজের নফসের সংশোধনের ব্যাপারে সচেতন থাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

طوبى لمن شغله عيبُه عن عيوبِ الناسِ —

অর্থ : ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যার দোষ তাকে মানুষের দোষ ধরা থেকে ব্যস্ত রেখেছে।

এ বিষয়ে খুব খেয়াল রাখবে। বেশি কথা বলবে না। প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা উত্তম চরিত্রের লক্ষণ। যত কথা শুনবে তার চেয়ে অনেক কম কথা বলবে। কারণ তোমার প্রত্যেকটি কথা সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। ফেরেশতারা তা লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। একটি কথাও তোমার আমলনামা থেকে বাদ যাচ্ছে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ و اليومِ الآخرِ فليقُلْ خيرًا أو ليَصمُتْ —

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অথবা নিরব থাকে।

সপ্তবিংশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٦٢) يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَحَقُّ أَنْ يُّرْضُوْهُ إِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○ (٦٣) أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَأَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ذٰلِكَ الْخِزْىُ الْعَظِيْمُ ○ (٦٤) يَحْذَرُ الْمُنَافِقُوْنَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوْا إِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ○ (٦٥) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ ○ (٦٦) لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ إِنْ نَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○

অর্থ : তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে তোমাদের সামনে আল্লাহ্র কসম খায়। অথচ যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলকে সন্তুষ্ট করাই অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল। তারা কি জানে না, যে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে মোকাবিলা করে তার জন্য জাহান্নাম। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তাই হল মহা অপমান। মুনাফিকরা ভয় পায় যে, মুসলমানদের নিকট এমন সূরা অবতীর্ণ হবে যা তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করে দিবে। আপনি বলে দিন, তোমরা বিদ্রুপ করতে থাক। নিশ্চয় তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবেন। যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো গল্প আর কৌতুক করছিলাম। আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তার বিধি বিধান ও তার রাসূলের সাথে কৌতুক করছিলে? তোমরা কোন ওজর আপত্তি করো না। ঈমান আনার পর তোমরা কাফের হয়ে গেলে। তোমাদের কাউকে যদি আমি ক্ষমা করে দেই তবে অবশ্যই কাউকে শাস্তিও প্রদান করব। কারণ তারা পাপাচারী।

(সূরা তওবা ঃ ৬২-৬৬)

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ তারা তোমাদের সন্তুষ্ট করতে তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায়। তাফসীর বিশারদগণ লিখেছেন, এ আয়াতটি কয়েকজন মুনাফিককে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন জুলাস ইবনে সুহাইব, ওয়াদা ইবনে সাবেত ইত্যাদি। তাদের মাঝে এক আনসারী বালক ছিল। নাম আমের ইবনে কাইস। মুনাফিকরা তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করল। তার সাথে তামাশা করতে লাগল। তারা বলল, মুহাম্মদ যা বলেছে তা যদি সত্য হয় তাহলে আমরা গাধার চেয়ে অধম। তাদের কথা শুনে আনসারী বালক ক্ষেপে উঠল। বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনি যা বলেছেন তা সত্য। আর তোমরা গাধার চেয়ে অধম। তারপর আনসারী বালক রাসূলের কাছে গিয়ে বলল। তখন মুনাফিকরা একজোট বেঁধে কসম খেয়ে বলল, নিশ্চয় আমের মিথ্যাবাদী। আমেরের বয়স তখন পনের বৎসর। আর তারা তো বয়সী। একজনের বয়স ষাট বছর। তবুও মুনাফেকী ছাড়ছে না। এই মুনাফিক সরদারদের ঘিরে আছে কিছু লোক যারা মু'মিনদের কাছেও যায়। এরা মুনাফেক সরদার থেকে মাঝে মধ্যেই খেজুর পায়। কখনো জুনাস দেয়। কখনো মুতআব দেয়। আবার কখনো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই দেয়। মাঝে মাঝে কিছু দেরহাম দিনারও দেয়। এই মুনাফিক সরদাররা এভাবে তাদের নেতৃত্ব বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। যে কোন মূল্যে তারা তাদের নেতৃত্ব ধরে রাখতে চায়। তাই এরা মুসলমানদের কণ্ঠনালীতে কাঁটা স্বরূপ। নানা ভাবে নানা ফন্দি আঁটতে থাকে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এদের নিয়ে চিন্তিত।

তারা যখন আমের ইবনে কাইসকে সরাসরি মিথ্যাবাদী বলল, তখন আমের তা সহ্য করতে পারলো না। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় এরা মিথ্যাবাদী। তারপর বললেন–

اللهُمَّ لا تفرِّقْ بيننا حتىَّ يتبَّين الصَّارقُ من الكاذبِ ـــ

হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে মিথ্যাবাদী আর সত্যবাদী স্পষ্ট হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে এ স্থান থেকে সরাবেন না।

তখন আল্লাহ তা'আলা সে মজলিসেই এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন–

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ○

অর্থ : তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায়। অথচ যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ ও রাসূলকে সন্তুষ্ট করাই অধিক শ্রেয়।

আল্লাহ তা'আলা আনসারী এই যুবক সাহাবীর দু'আ কবুল করলেন। ঠিক এমনই ঘটনা ঘটেছিল যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) এর সাথে। মুরাইসীর যুদ্ধে যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর নিকট বসে ছিলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলল, আল্লাহর কসম! হে আনসাররা আমি তো তোমাদেরকে এমনই মনে করি যেমন আমাদের পূর্ববর্তীরা বলেছেন– سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ অর্থ : তুমি তোমার কুকুরকে মোটা কর তাহলে সে তোমাকে খাবে। আমরাই তো মুসলমানদের মোটা করেছি। আর এখন তারা আমাদের খেতে শুরু করেছে। তারপর বলল–

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ○

অর্থ : যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে অবশ্যই আমাদের সম্মানিতরা মদীনা থেকে লাঞ্ছিতদেরকে বের করে দিবে। (সূরা মুনাফিকুন ঃ ৮)

তখন যায়েদ ইবনে আরকাম রাসূলের নিকট এলেন। তার বয়সও তখন আমের ইবনে কাইসের মতই প্রায় পনের ষোল বৎসর ছিল। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তো এমন কথা বলেছে। যারা এতো দিন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নুন খেয়েছে তারা এবার তার পক্ষ নিল। এরাই কিন্তু অন্ধভক্তি দেখিয়ে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নেতাদের জাহান্নামে পৌঁছায়। এরাই শাসকদের স্বৈরাচারী অহংকারী বানায়। ফলে তারা নিষ্পাপ মানুষের রক্ত দিয়ে হোলি খেলায় লিপ্ত হয়। নির্মমভাবে তাদের হত্যা করে। একদা খলীফা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেক হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় গেলেন। মক্কায় তখন বিশিষ্ট তাবেঈ আবু হাযেম (রহঃ) ছিলেন। হজ্জের পর সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেক বললেন, যারা রাসূলের সাহাবীদের দেখেছেন তাদের কাউকে নিয়ে এস। আমি তার সাক্ষাৎ করতে চাই। ফলে তাবেঈ আবু হাযেম (রহঃ) তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। খলীফা সুলাইমান তাকে দেখে বললেন, হে আবু হাযেম কী হল? কেন আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসনি। আবু হাযেম বললেন, আমি আপনার মিথ্যা বলার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমীরুল মু'মিনীন, কবে আপনাকে চিনেছি যে আপনার সাক্ষাতের জন্য আসব? তারপর খলীফা সুলাইমান বললেন, হে আবু হাযেম! আমরা যে খেলাফতের দায়িত্ব নিয়ে আছি এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

আবু হাযেম তখন নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, আপনার পূর্বপুরুষরা খেলাফতের দায়িত্বে থেকে মানুষকে হত্যা করে, মানুষের ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে জোর জুলুম করে তা অর্জন করেছে সুতরাং এ ব্যাপারে আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। চাটুকারের দলরা তখন বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার সামনে এতো কড়া কথা! এতো গাধা। তারা আবু হাযেম (রহঃ) কে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করল।

তখন আবু হাযেম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, চুপ কর। ফেরআউনকে হামানই ধ্বংস করেছে।

সুলাইমান তখন আবু হাযেম (রহঃ) কে বললেন, হে আবু হাযেম! আমরা কেন মৃত্যুকে অপছন্দ করি? আবু হাযেম বললেন, কারণ তোমরা তোমাদের দুনিয়াকে আবাদ করেছো। আর আখেরাতকে ধ্বংস করে দিয়েছো। তাই তোমরা দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতে পৌঁছতে চাও না।

এই যে চাটুকারদের কথা বলছিলাম, এরা বহু দেশ ও নগরকে ধ্বংস করেছে। এরা সব ধরনের কথাই বলতে পারে। দিনকে রাত বলতে আর রাতকে দিন বলতে এরা কোন দ্বিধা করে না। যদি ইসরাঈলের সাথে সন্ধি করতে এদের মতামত চাওয়া হয় তাহলে এরা স্বমতে কুরআন হাদীসের অকাট্য দলীল পেশ করতেও দ্বিধা করবে না। আবার যদি ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে এদের থেকে পরামর্শ নেয়া হয় তাহলে এরা যুদ্ধের স্বপক্ষে দলিল দিতেও পিছপা হবে না। এদের স্বভাব, ক্ষমতাবান ব্যক্তি যা বলবে তাকেই এরা সর্বদা সত্য ও সময়োপযোগী প্রমাণ করবে। এরাই সর্বযুগে সকল অনিষ্ঠ ও কুকর্মের হোতা।

জনৈক বন্ধু আমাকে বলেছেন– একদা মক্কায় এক কনফারেন্স হয়। তা রাবেতা আল আলম ইসলামীর উদ্যোগে হয়েছিল। বিশ্বের নেতৃস্থানীয় আলেমরা কনফারেন্স শেষ হওয়ার পর বলল, চলুন আমরা সবাই বাদশাহ ফয়সালের সাথে একটু সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হই। সবাই গেল। সাক্ষাৎকারীদের একজন বাদশাহকে সম্বোধন করে বলল, ইয়া জালালাতাল মালিক! এরপর আর কথা বলতে পারল না। বাদশাহ ফয়সাল সাথে সাথে বললেন–

أعوذ الله ... أعوذ بالله ... أعوذبالله ...

এ কেমন কথা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন জলীল। তাকে বলা হবে জালালাতুল মালিক। আমাকে কেন? আপনারা বিশ্বের নেতৃস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। আপনারা এ কথা বলছেন? আল্লাহ তাকে রহম করুন। শেষ জীবনে সত্যিই তিনি ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন।

তার এক পরামর্শদাতা আমাকে বলেছেন। তিনি অবশ্য সৌদি আরবে ছিলেন না। জীবন সায়াহ্নে বাদশাহ ফয়সালের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তিনি নিজ সত্তাকে ও ক্ষমতাকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখন তাকে বলেছিলাম, আপনি এমন শাহাদাত চান যা নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবেন! উত্তরে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি তেমনই শাহাদাত কামনা করি। এরপর থেকে আমি তার প্রত্যেকটি কাজে ভিন্নতা লক্ষ করেছি। সে সময় মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'আদাত ইসরাঈলে গেল। অথচ কেউ তখন ইসরাঈলের সাথে বসতে সাহস করত না। কিন্তু ফয়সাল ছিলেন অটল অবিচল। বরং তিনি আমেরিকার উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। বললেন, ইসরাঈলের সাথে আমাদের কোন আপোস নেই। যতক্ষণ না তারা বাইতুল মুকাদ্দাসকে ফিরিয়ে দেয় আর আমি সেখানে দু'রাকাত নামায পড়তে পারি। এ ব্যাপারে তিনি আরো বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। হে আল্লাহ! আপনি তাকে পরলোকে তার কর্মের বিনিময় দান করুন। আমেরিকানরা তার এই পদক্ষেপের ব্যাপারে টের পেয়ে গেল। বলল, আরে! এ তো দেখি কোন ধরনের সন্ধি চায় না। ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়। সুতরাং একে আর দুনিয়ায় রাখা যায় না।

বলছিলাম, যায়েদ ইবনে আরকাম রাসূলের নিকট গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইতো এ সব কথা বলেছে। তখন চাটুকারদের একদল এগিয়ে এল। বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মনে হয় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এমন কথা বলেন নি। কিন্তু রাসূল তাদের কথায় কর্ণপাত করছিলেন না। কেননা এরা হলো অপদস্ত নাপাক। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ○

অর্থ : তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর নামে শপথ করবে যখন তোমরা তাদের নিকট যাবে তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে বিমুখ করার জন্য। নিশ্চয় তারা নাপাকী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা যখন অসাড় কথা শুনে তখন বিমুখ হয়ে যায়। (সূরা কাসাস ঃ ৫৫)

তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন–

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ○

তারা বলে যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে অবশ্যই আমাদের সম্মানিতরা মদীনা থেকে লাঞ্ছিতদেরকে বের করে দিবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-এর কান ধরে বললেন, এই তো সেই কান যার সত্যায়ন করেছেন আল্লাহ তা'আলা।

والله و رسولـــه أحقُّ أن يُرضوه إنْ كَانوا مُؤمنينَ ـــ

অর্থ : যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূল অধিক হকদার যে তারা তাকে সন্তুষ্ট করবে। কিন্তু অবস্থা তো এখানেই শেষ নয়। সময়ের পরিক্রমায় সমস্যা দেখা দিবে। মুনাফিকরা আপত্তিমূলক কথা বলবে। রাসূলের নিকট সংবাদ আসবে। আর তারা বাঁচার চেষ্টা করবে। এরা শেয়ালের মত। মানুষ যখন এদের তাড়া করতে যায় তখন একবার এদিকে দৌড় দেয় আরেকবার ঐদিকে দৌড় দেয়। মুনাফিকদের চরিত্র এরকমই।

এখানে কারো কারো মনে একটি প্রশ্ন উঁকি দিতে পারে। তা হল মদীনায় মুনাফিক দেখা গেল অথচ মক্কায় তো কোন মুনাফিক ছিল না! হ্যাঁ, এর উত্তর অত্যন্ত সহজ। মনে রাখবে, মুনাফিকরা হল স্বার্থান্বেষীর দল। সুবিধাবাদীর দল। ভোগবাদির দল। এরা কোন সময় কোন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় যায় না। কোন বিপদের সম্মুখীন হতে চায় না। এরা যেখানেই লাভ আছে সেখানেই আছে। তাই যখন মুসলমানদের মাঝে স্বচ্ছলতা আসতে শুরু করল তখন মুনাফিকদের সৃষ্টি হতে লাগল। এ কারণেই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করার পর বলেছিল, এ যুদ্ধ এক রেখা একে দিল যে, ক্ষমতা এখন মুহাম্মদের নিকটই ফিরে যাবে তাই চল আমরা তার দলে মিশে যাই।

এজন্য দেখবে কোন পরিবারে, কোন দেশে বা কোন ব্যক্তির নিকট অর্থ সম্পদ জমা হলেই তাদের চার পাশে চাটুকাররা, মুনাফিকরা এসে জমা হয়। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় মুনাফিক হল ঐ ব্যক্তি যে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনি। তাই তারা আল্লাহকে ভয় করে না। আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না। তাদের আলামত তিনটি ঃ

آيةُ المنافق ثلاثٌ : إذَا حدَّثَ كذَبَ، و إذَا وَعَدَ أخلفَ، وإذَا ائتُمِنَ خَانَ و إنْ صَامَ وَ صَلَّى و زَعَمَ أنه مُسْلِمٌ ـــ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– মুনাফিকের আলামত তিনটি: কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, কোন কিছু আমানত রাখা হলে তা খেয়ানত করে। যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে আর বলে সে মুসলমান।

মুনাফেকদের এই তিন আলামতের একটি যার মাঝে পাওয়া গেল সে কিয়দাংশ মুনাফিক হল। আর যার মাঝে তিনটিই পাওয়া গেল সে পরিপূর্ণ মুনাফিক হিসেবে বিবেচিত হল। এদের জীবন হল আশার পেছনে ছুটে বেড়ানো। এ পথে তারা একেবারে অন্ধ হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। তাই এদের দেখতে পাবে, ক্ষমতাসীনদের আশেপাশে এরা ঘুরে বেড়ায়। তাদের মনোরঞ্জনে মেতে থাকে। কিন্তু এদের পরিণতি অত্যন্ত খারাপ। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিটি যখন পদচ্যুৎ হয় তখন তারা আর বাঁচতে পারে না। পরবর্তী শাসক এদের কারারুদ্ধ করে। মামলা মোকদ্দমার আক্রমণে জীবনের দীর্ঘ দিনের জমানো সম্পদ যা মানুষের রক্ত চুষে চুষে জমা করেছিল পরবর্তী শাসক তা ছিনিয়ে নেয়। তুমি যদি এর উদাহরণ চাও তাহলে বেশি দূর যেতে হবে না।

মিশরের রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাঝেই তুমি তা খুঁজে পাবে। আব্দুন নাসেরকে ঘিরে যারা স্বপ্নের ফানুস তৈরী করেছিল আনোয়ার সাদাত এসে তাদের সব স্বপ্ন নিঃশেষ করে দিয়েছে। তাদের অনেককেই সে হত্যা করেছে। তারপর ক্ষমতায় এসেছে হোসনি মুবারক। সেও তাদের রক্ষা করেনি যারা আনোয়ার সাদাতের পাশে ছিল। মুনাফেকি করেছে। পৃথিবীর সর্বত্র তুমি একই চিত্র দেখতে পাবে। এতে কোথাও ব্যতিক্রম কোন কিছু ঘটেনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

অর্থ : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করাই অধিক যুক্তিযুক্ত, যদি তারা মু'মিন হয়।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, আল্লাহ তা'আলা তার সন্তুষ্টিকে রাসূলের সন্তুষ্টির সাথে বিজড়িত করে দিয়েছেন। শুধু এখানেই নয়। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ○

অর্থ : যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে হেদায়াত লাভ হবে। (সূরা নূর ঃ ৫৪)

সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে রাসূলের সন্তুষ্টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এককে বাদ দিয়ে আরেক জনের সন্তুষ্টির কথা চিন্তাই করা যায় না।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ ○

অর্থ : তোমাদের সামনে তারা আল্লাহর নামে শপথ করে তোমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক যোগ্য যে তারা তাদের সন্তুষ্ট করবে।

এ আয়াত দ্বারা ইঙ্গিতে এ কথা বুঝা যায় যে, কেউ যদি আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করে কিছু বলে তাহলে তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে হবে। তবে যদি বার বার মিথ্যা বলাটা প্রমাণিত হয়ে যায় তবে আর তার শপথের বিষয়টিকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবা যাবে না। আর আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে শপথ করা যাবে না।

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ حلَفَ بغيرِ الله فقدْ كَفرَ أو أشْرَكَ —

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নাম নিয়ে শপথ করে সে কুফুরি করল বা শিরক করল।

এর অর্থ এ নয় যে, সে ইসলাম ধর্ম থেকে বেরিয়ে গেল। সুতরাং কেউ যদি বলে, নবীর নামে শপথ, বা তোমার পিতার জীবনের শপথ, বা এ ধরনের কোন কিছুর নাম নিয়ে শপথ করল তাহলে সে ইসলাম ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাবে না। তবে সে একটি হারাম কাজ করল। এর জন্য তার গুনাহ হবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لا تحلفوا باللهِ و لا بالطَواغيت —

অর্থ : তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করো না এবং অন্য কোন মূর্তির নামে শপথ করো না। এর অর্থ বেশি শপথ করা ভাল নয়। তাই তা পরিত্যাগ করার জন্য রাসূল উৎসাহিত করছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ○

অর্থ : তারা কি জানে না যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সীমানায় প্রবেশ করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তা মহা লাঞ্ছনা।

এখানে يُحَادد শব্দের অর্থ সীমায় প্রবেশ করা। বিগত মজলিসে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি। অর্থাৎ আল্লাহর সীমারেখায় প্রবেশ করা ও আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়গুলোতে বাড়াবাড়ি করা। এদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের অগ্নি তৈরী করেছেন।

যদি সে খালেস মুনাফিক হয় তাহলে সে জাহান্নামের অতি নিম্নস্তরে চিরকাল থাকবে। আর যদি মুসলমান হয়, আমলের মাঝে কোন ত্রুটি থাকে তাহলে আল্লাহর ইচ্ছে অনুযায়ী সে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তারপর সে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে।

আল্লামা ছুদ্দী (রহঃ) বলেন, কিছু কিছু মুনাফিক বলেছে, হায় যদি আমাকে এক শত বেত্রাঘাত করা হত ও আমাদের লাঞ্ছনা হয় এমন কোন আয়াত অবতীর্ণ না হত।

এ সুরায় মুনাফিকদের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তাই এর নাম রাখা হয়েছে الفاضحة ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সূরা তওবা অবতীর্ণ হতে লাগল আর منهم و ও ومنهم বলে বলে মুনাফিকদের শত ধরনের কর্মের সমালোচনা করতে লাগল। তখন আমরা বলতাম, এ সূরা তো মুনাফিকদের কাউকে ছাড়বে না। তাই প্রত্যেকে ভয় পেত যে, সে আবার মুনাফিকদের কোন স্তরে পড়ে যায় কিনা। এই মুনাফিকদের সবচেয়ে প্রিয় ও লোভনীয় বিষয় হল তাদের কার্যকলাপ গোপন থাকা।

তবে আল্লাহ তা'আলা চান তাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে। কারণ তারা গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করে আল্লাহর দীনের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। দীনের ভাবমর্যাদা নষ্ট করে দিতে চায়। তবে তারা তা গোপন রাখতে পারে না। সময়ের ব্যবধানে তারা তা রাসূলের নিকট বা আবু বকর বা উমর (রাঃ) এর নিকট বা অন্যকোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট স্বীকার করে। কারণ হৃদয়ের মালিক হলেন আল্লাহ। আল্লাহই তাদের হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তন করে দেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ○

অর্থ : মুনাফিকরা ভয় পায় যে, তাদের ব্যাপারে কোন সূরা অবতীর্ণ হবে যা তাদের হৃদয়ের দুরভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করবে। আপনি বলে দিন, তোমরা ঠাট্টা মশকরা কর। নিশ্চয় তোমরা যার ভয় করছ তা অবশ্যই আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন।

মিশরের কথা বলছি, যখন সরকারী লোকেরা শহীদ হাসানুল বান্নাকে অপহরণ করে নিয়ে যেতে চাইল। তারা স্বার্থান্বেষী এক ব্যক্তিকে খুঁজে আনল। একটি পিস্তল দিয়ে বলল, যাও বান্নাকে হত্যা করে এস। লোকটি পিস্তল নিয়ে হাসানুল বান্নার নিকট যেয়ে বলল, এই যে পিস্তলটি দেখছেন, এটা আমাকে মিশর সরকার আপনাকে হত্যা করার জন্য দিয়েছে। কিন্তু আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, ওরা আপনাকে কোন আততায়ীর মাধ্যমে আর হত্যা করতে পারবে না। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও ঘটে। মানব মন আল্লাহর পথে আহবানকারীকে সম্মান করে। ইজ্জত করে। কিন্তু এর দুর্বলতা তাকে ক্ষমতাসীনদের নির্দেশ পালনে বাধ্য করে। এইতো আবুল ফাততাহ ইসমাঈল (রহঃ) যাকে সাইয়্যেদ কুতুবের সাথে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। তাকে তারা কঠিন শাস্তি দিত। তবে কারা অফিসার তাকে অত্যন্ত সম্মান করত। তাকে শাস্তি দিত আবার সম্মানও করত। কখনো কখনো আবেগাপ্লুত হয়ে বলত, শাইখ যা বলেন তাই করব। কিন্তু আমরা তো অসহায়। আমাদের তো উপরের নির্দেশ পালন করতেই হবে।

একদিনের ঘটনা। তার স্ত্রী এসে বলল, আপনার ব্যবসায়িক পার্টনার তো আপনার সব সম্পদ আত্মসাৎ করে নিয়ে গেছে। এখন আমরা কী করব? তখন আবুল ফাততাহ ইসমাঈল সেই অফিসারকে ডেকে বললেন, দেখুন, আমার ব্যবসায়িক পার্টনার আমার সবগুলো টাকা মেরে দিয়েছে এখন আমি কী করি? এরপর আর বেশি সময় কাটেনি। তাকে ধরে এনে কারাগারে বন্দী করলো। বেশ শাস্তিও দিলো। বললো, এই বুযুর্গ ব্যক্তির সম্পদ মেরে দিতে চাস! এতোবড় সাহস তোকে কে দিয়েছে? এ কথা শুনে তো সেই ব্যক্তি একেবারে হতবাক। উপায় খুঁজে না পেয়ে অবশেষে তার মূলধন ফিরিয়ে দিয়েছে।

এমনি ভাবে সাইয়্যেদ কুতুবকেও জেলে লোকেরা অত্যন্ত সম্মান করত। জেলের শীর্ষ অফিসার সালাহ দুসকী প্রায়ই বলত, আসলে প্রকৃতপক্ষে জেল কর্মকর্তা আমি নই। আসল কর্মকর্তা হলেন সাইয়্যেদ কুতুব। কারণ জেলের মাঝে কোন কিছু ঘটলে তার সমাধান করতেন সাইয়্যেদ কুতুব। অন্যরা সবাই তা মেনে নিত। জেলে ভয়ঙ্কর আসামীরাও তাকে সম্মান করত। চোরাচালান, হেরোইন ব্যবসায়ীর মত লোকেরা তার কথা মেনে নিত। হেরোইন ব্যবসায়ীরা কীভাবে হেরোইন পাচার করত তা কি কখনো ভেবে দেখেছো? শিশুদের ধরে এনে মেরে ফেলত। তার পেট চিরে নাড়িভূড়ি বের করে তাতে সুন্দর করে সাজিয়ে হেরোইন রেখে সেলাই করত। তারপর কাফন পরিয়ে মৃত সন্তানকে নিয়ে যাওয়ার অভিনয় করে হেরোইন পাচার করত। এ ধরনের পাপিষ্ঠ নির্মম ব্যক্তিরাও সাইয়্যেদ কুতুবকে খুব সম্মান করত। কোন বিষয়ের সমাধান জেলার করতে না পারলে তা সাইয়্যেদ কুতুবের নিকট পাঠিয়ে দিত। তিনি তা ফায়সালা করতেন। জয়নাব গাজালী বাকরুদ্ধ ছিলেন। তার কষ্ট ও নির্যাতন বাড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তার প্রকোষ্ঠে এক হেরোইন চোরাচালানী মহিলাকে দেয়া হল। এ মহিলা ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, নির্দয়। সে শিশুদের হত্যা করে তাদের পেটে হেরোইন প্যাক করত। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। যয়নাব গাজালীর সংস্পর্শে এসে সেই মহিলা একেবারে মানুষ হয়ে গেছে। জীবনের সব ভুল থেকে, পাপ থেকে নিষ্ঠার সাথে তওবা করে। তারপর নামায আদায় আর রোযা রাখতে শুরু করে। এরপর সেই মহিলা এমন ভক্ত হয়ে গেল যে সর্বদা যয়নাব গাজালীর সেবা করতে প্রস্তুত হয়ে থাকত। সে যয়নাব গাজালীর পরিজনদের সাথে যোগাযোগ রাখতে লাগল। যয়নাব গাজালীর সাথে কারো দেখা সাক্ষাতের অনুমতি ছিল না। কিন্তু সেই মহিলা চেষ্টা করত যেন তার জন্য ভাল ভাল খাবারের ব্যবস্থা করা যায়। সরকারী লোকেরা বলত, আমরা হেরোইন পাচারকারীদের নষ্ট করে দিয়েছি। তাই তাদের কারারুদ্ধ করেছি। যয়নাব গাজালীর প্রকোষ্ঠে রেখেছি। যেন তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু তা আর হয়নি। সেই মহিলা তওবা করে ফিরে এসেছে। সে পাপ কাজ চিরতরে ছেড়ে দিয়েছে। তাই জেল কতৃপক্ষ তাকে মুক্তি দিয়ে দিল। কিন্তু সেই মহিলা মুক্তির সংবাদ শুনে কাঁদতে লাগল। কেঁদে কেঁদে বলল, হায়! আমি কিভাবে আপনাকে ছেড়ে থাকব। এটা তো সম্ভব নয়।

একদিনের ঘটনা। আমি যয়নাব গাযালীর বাসায় ছিলাম। দেখলাম, এক বৃদ্ধা মহিলা চা নিয়ে এল। যয়নাব গাযালী আমাকে বললেন, এই মহিলাটিকে কি চিনছেন? আমি বললাম, না তো, চিনলাম না। এ তো সেই মহিলা যার গোটা জীবন কেটেছে এমন এমন কাজে। তিনি কিছু কিছু আমাকে শোনালেন।

যয়নাব গাযালী জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সেই মহিলা তার নিকট থাকতে এসেছে। তার বাড়িতে কাজ করতে এসেছে। অথচ সে কিন্তু বিত্তশালী। প্রচুর সম্পদের অধিকারী। একদিন যয়নাব গাযালী নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, হে আল্লাহ! এটা কি সম্ভব যে আব্দুন নাসের আমার এ অসহনীয় শাস্তি সম্পর্কে অবহিত হবে? যদি সে জানে তাহলে আল্লাহ আমাকে তা দেখিয়ে দাও। যয়নাব গাযালী অত্যন্ত পুণ্যবান ছিলেন। তাঁর দু'আও মকবুল ছিল। তিনি বলেন, দু'দিন পর শামস বাদরান আমাকে নিয়ে এল। আমাকে শাস্তি প্রদানের দায়িত্বে সে ছিল। বলল, হে ছফওয়াত! ছফওয়াত জেলখানায় জল্লাদদের শীর্ষে ছিল। তাকে আজ থেকে পাঁচশত দোররা মারবে।

যয়নাব গাযালী বলেন, তারা আমার হাত পা বেঁধে তারপর মারত। আমি তখন ধনুকের মত বাঁকা হয়ে যেতাম। তাদের নির্মম আঘাতের পর আঘাতে আমার কাপড় ছিড়ে যেত। রক্তের ধারা প্রবাহিত হত। আমার মাথা ফুলে গিয়েছিল। চোখ ফুলে গিয়েছিল। চেহারা ফুলে গিয়েছিল। শামস বাদরান বলল, একে চেয়ারে বসাও। ছফওয়াত আমাকে চেয়ারে বসাল। আব্দুন নাসেরের সামনে বসাল। আব্দুন নাসের বলল, তাকে এক গ্লাস লেবুর জুস দাও। যয়নাব গাযালী বলেন, আমি এ ঘটনাটি أيامي من حياتي নামক আমার গ্রন্থে লিখেছি। তিনি বলেন, আমার চেহারা ফুলে ছিল। চোখের পাতাও ফুলে ছিল। ফলে দেখতে খুব কষ্ট হত। আব্দুন নাসের

আমাকে বলল, হে যয়নাব! আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর তাকিয়ে দেখি আমার সামনে বসে আছে আব্দুন নাসের আর আব্দুল হাকীম। তাদের পশ্চাতে শামস বাদরান। তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করতে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝

অর্থ : আর তার মু'মিনদের সাথে যা করা হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করছে। (সূরা বুরুজ ঃ ৭)

তারপর আব্দুন নাসের আমাকে বললো, তুমি যদি আমার স্থানে হতে তাহলে আমার সাথে কী আচরণ করতে? যয়নাব গাযালী বললেন, আমি কখনো তোমার স্থানে হব না। আব্দুন নাসের বলল, যদি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের লোকেরা আমার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় এবং তোমাকে প্রদান করে তা হলে কী করবে?

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٦٤) يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ۝ (٦٥) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝

(٦٦) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

অর্থ : মুনাফিকরা ভয় পায় যে, মুসলমানদের নিকট এমন সূরা অবতীর্ণ হবে যা তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করে দিবে। আপনি বলে দিন, তোমরা বিদ্রুপ করতে থাক। নিশ্চয় তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবেন। যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো গল্প আর কৌতুক করছিলাম। আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তার বিধি বিধান ও তার রাসূলের সাথে কৌতুক করছিলে। তোমরা কোন ওজর আপত্তি করো না। ঈমান আনার পর তোমরা কাফের হয়ে গেলে। তোমাদের কাউকে যদি আমি ক্ষমা করে দেই তবে অবশ্যই কাউকে শাস্তিও প্রদান করব। কারণ তারা পাপাচারী।

(সূরা তওবাঃ ৬৪-৬৬)

তাবুকের যুদ্ধের সময় কিছু মুনাফিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুকে যাচ্ছিল। তারা পরস্পর তাচ্ছিল্যের সাথে সমালোচনা করে বলছিল, আরে, দেখ না কী মজার কথা, এই লোকটি নাকি শামের প্রাসাদগুলো দখল করে নিবে! রোমান যোদ্ধাদের প্রতিহত করবে!

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এ বিষয়টি অবহিত করেছিলেন। তাদের একজন ছিল ওয়াদীয়া ইবনে ছাবেত। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহনের পাদানী চেপে ধরল। কসম খেয়ে খেয়ে বলতে লাগল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো কৌতুকচ্ছলে বলছিলাম। এর প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলছেন–

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۝

অর্থ : আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর বিধি বিধান ও তাঁর রাসূলের সাথে কৌতুক করছিলে? তোমরা কোন ওজর আপত্তি করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছো। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

অর্থাৎ তোমাদের কাউকে যদি আমি ক্ষমা করে দেই তাহলে অবশ্যই আমি কাউকে শাস্তি প্রদানও করব। কারণ তারা পাপাচারী।

এরা তিনজন ছিল, মুখসী ইবনে হিময়ার ও তার দুই সঙ্গী। সঙ্গী দু'জনের একজন তিরস্কারমূলক কথা বললে অপরজন তাতে সাড়া দিয়ে হাসল কিন্তু মুখসী নীরব রইল। তাই আল্লাহ বলেছেন– যদি তোমাদের কাউকে আমি ক্ষমা করে দেই অর্থাৎ মুখসীকে তাহলে অবশ্যই কাউকে অর্থাৎ সেই দুই সঙ্গীকে শাস্তি প্রদানও করব। কারণ তারা পাপাচারী।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, যদি কেউ আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ বা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে তিরস্কার বা রসিকতা করে বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালমন্দ করে সে আর মুসলমান থাকে না। তার তওবা কবুল হয় না।

হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুই বাঁদীকে হত্যা করা বৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিরস্কার করে ব্যঙ্গ করে কবিতা আবৃত্তি করত। তারা মক্কার শীর্ষস্থানীয় এক সরদার হিলাল ইবনে কাতালের বাঁদী ছিল। মক্কা বিজয়ের দিবসে রাসূল যখন মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন ঘোষণা করলেন–

اُقتلُوهم و لو وَجدتمُوهم معلَّقين بأَسْتَــارِ الكعْبَة ـــ

অর্থ : এদের হত্যা কর যদিও এদের কাবার গিলাফ ধরে থাকা অবস্থায় পাও। এরা হল হেলাল ইবনে খাতান, তার সেই দুই বাঁদী, আব্দুল মুত্তালিবের এক বাঁদী, ইকরামা ইবনে আবু জাহেল, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সাবাহ, মুকায়িস ইবনে সাবাবা প্রমুখ। এদের মাঝে আব্দুল্লাহ ইবনে খাতালকে কাবার গিলাফ ধরা অবস্থায়ই হত্যা করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর একটি চমৎকার কিতাবের নাম হল, الصارمُ المسلولُ على شاتمِ الرسولِ তিনি তার সেই গ্রন্থে লিখেছেন–

هو يدلُّ على أنَّ المرْأةَ إذا سبَّتِ الرسُولَ صلى الله عليه و سلم و تابتْ فإنَّ دمَها لا يُحقن بالتوبة ـــ

অর্থ : এ আয়াতের সুস্পষ্ট ভাষ্যে বুঝা যায় যে, যদি কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করে এবং তারপর তওবা করে তাহলে তওবার কারণে সে তা থেকে পরিত্রাণ পাবে না। মহিলাদের ব্যাপারেই যদি এ বিধান হয় অথচ মহিলাদের রণক্ষেত্রে হত্যা করা হয় না। তাহলে পুরুষের ব্যাপারে তো ক্ষমার প্রশ্নই আসে না। এক হাদীসে বর্ণিত আছে–

نَهىَ رسولُ الله صلى الله عليه و سلم عنْ قتلِ النِّســاءِ و الأطْفــالِ ـــ

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তাই কোন মহিলা যদি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে আসে তাহলে তাকে হত্যা করবে না। অথচ এই বাঁদী দু'জন কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্ত্র নিয়ে রণাঙ্গনে নেমে আসে নি। যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেনি। অথচ রাসূল মক্কার সাধারণ মানুষকে ক্ষমা করে দিলেও এই বাঁদী দু'জনকে ক্ষমা করেন নি। তাদের হত্যা করা বৈধ, এ ঘোষণা দিয়েছেন।

মদীনার এক অন্ধ সাহাবী ছিলেন। তার এক বাঁদী ছিল। সে বাঁদী রাসূলকে গালমন্দ করত। একদিন এ বাঁদী রাসূলকে গালি দিলে। অন্ধ সাহাবী তা সহ্য করতে পারলেন না। ছুটে গিয়ে একটি বালিশ এনে তার মুখে চেপে ধরলেন। তারপর তার উপর বসে পড়লেন। ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সেই বাঁদী মৃত্যুবরণ করল। একটি কথা মনে রাখবে। কেউ তোমার সাথে শত্রুতা করছে, তোমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করছে তার হৃদয় কিন্তু তোমার হাতে নয়। তার হাতেও নয়। বরং তার হৃদয় আল্লাহর হাতে। বিশ্বজগতের স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণে।

এ মাসআলাটি খুব ভালভাবে স্মরণ রাখবে, রাসূলকে গালি দিলে কাফির হয়ে যায়। তার কোন তওবা কবুল করা হবে না, শত বারও যদি সে কালিমা পড়ে নেয়। তবু সবাই একমত যে, তাকে ক্ষমা করা হবে না।

একই হুকুম, আল্লাহকে গালি দিলে, কুরআন নিয়ে তিরস্কার করলে, কোন হাদীস নিয়ে তিরস্কার করলে, কোন সুন্নাত নিয়ে তিরস্কার করলে। তবে কোন কথাটি তিরস্কারমূলক আর কোন কথাটি তিরস্কারমূলক নয় তা ভালভাবে বুঝতে হবে। অনেক সময় রাসূলের সুন্নাত দাড়ি নিয়ে তিরস্কার করা হয়। হাস্য-রসিকতা করা হয়। এতে কিন্তু তিরস্কারকারী কাফের হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় কোন দাড়িওয়ালা ব্যক্তি কোন মন্দ বা অসামাজিক কাজ করলে বলা হয়, আরে! তুমি এতো বড় দাড়ি রেখে এ কাজটি করলে? ভারি আশ্চর্যের কথা তো। এ ধরনের কথায় কিন্তু দাড়ি নিয়ে তিরস্কার হয় না। বরং বলা হয় দাড়ি রেখে এ ধরনের কাজ কিছুতেই সমিচীন হয়নি।

বর্ণিত আছে, ইরাকের জনৈক ব্যক্তি এসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বলুন তো, কীটপতঙ্গের রক্তের বিধান কি? তা কি পাক, না নাপাক? প্রশ্ন শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বিস্মিত হলেন। আশ্চর্যান্বিত হলেন। বললেন, আচ্ছা আগে বলতো তুমি কোথাকার লোক? লোকটি বলল, আমি ইরাকের অধিবাসী। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, আরে! তোমরাই না ঐ লোক যারা হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) কে হত্যা করা বৈধ মনে কর আবার এখন এসে কীটপতঙ্গের রক্তের বিধান জানতে চাচ্ছো?

তাই ধর্ম নিয়ে কেউ গালমন্দ করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মুসলমানদের কবরস্তানে তাকে কবর দেয়া হবে না। তাকে গোসল দেয়া হবে না। তার জানাযার নামায পড়া হবে না। তার ছেলেমেয়েরা তার জন্য শোক প্রকাশ করবে না। আর যদি তাকে হত্যা করা না হয় তাহলে ইসলামী বিধান সব রহিত হয়ে যাবে। তার সাথে তার স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। শোন, কমিউনিস্টদের সৈন্য শিবিরে আমরা যে সব মুসলমানদের ধরি তাদের কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না। যদিও তারা শতবার কালিমা পাঠ করে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিলাল ইবনে খাতায়াকে মক্কায় হত্যা করেছিলেন। আর হযরত উসমান (রাঃ) এর দুধভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ যখন উসমান (রাঃ) এর সাথে এসে রাসূলের নিকট তওবা করল তখন রাসূল কিছুক্ষণ বিলম্ব করে তার তওবা কবুল করলেন। এই আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ চলে যাওয়ার পর রাসূল বললেন–

أَمَا كَانَ لأحدِكم أَنْ يقطعَ عنقَ هذا —

অর্থ : এর গর্দান উড়িয়ে দেয়ার মত কি তোমাদের মাঝে কেউ ছিল না? উপস্থিত সাহাবীরা রাসূলের কথা শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি চোখের ইঙ্গিতেও আমাদের এ কথা বলতেন। তখন রাসূল বললেন–

ما كانَ لرسولٍ أن يكونَ له خائنةُ الأعين —

অর্থ : আল্লাহর রাসূলের জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি চোখের খেয়ানত করবেন।

সুতরাং জিনদিক, মুরতাদের তওবা কিছুতেই কবুল করা হবে না। এরা তাদের জীবনকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছে। তাই তাদের তওবা কবুল করা হবে না।

আফগানিস্তানের জাজি নামক অঞ্চলে একদা মুজাহিদরা শুনতে পেল, কমিউনিস্টদের সাথে কিছু সৈন্য আছে, যারা আযান দিয়ে নামায আদায় করে। তাই মুজাহিদরা তাদের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেল। আমি তখন দৃঢ়ভাবে বললাম, এদের হত্যা কর। জবাই কর। এর কারণ চারটি–

১. এরা লুটেরা, ডাকাত। মুসলমানদের ধন-সম্পদ, ইজ্জত-আবরু লুটে নিচ্ছে।
২. কমিউনিস্টরা এদের উপর নির্ভর করছে।
৩. এরা নির্বিচারে মুসলমানদের হত্যা করছে।
৪. এদেরকে কেসাসের বিধান অনুযায়ী হত্যা করা হবে। এরা শত্রু শিবিরে অবস্থান করছে।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার কথা শুনলে তো তোমরা হতবাক হবে। তিনি বলেছেন– যদি তোমরা আমাকে তাতারীদের সাথে দেখ তাহলে আমাকে হত্যা করবে। যদিও তোমরা আমার মাথার উপর কুরআন দেখতে পাও।

সুতরাং আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলছি, এদের ব্যাপারে কোন ছাড় নেই। কোন দ্বিধা নেই। এদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

কেউ যদি বলে, মনে করুন আমরা একটি ক্যাম্প দখল করার পর তা পরিষ্কার করতে ইচ্ছে করলাম। তখন সেখানে কয়েকজন মুসলমানকে পেলাম। তখন তাদের কী করব? তারা তো বাধ্য হয়ে এসেছে।

আমি বলব, তাদের রণক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। সুতরাং তাদের হত্যা করা হবে। যদিও তারা বাধ্য হয়ে এসেছে। এ ধরনের মুসলমানদের তখনই ক্ষমা করা যাবে যখন তাদের গ্রেফতার করার পর এ কথা প্রমাণিত হবে যে, তারা বাধ্য হয়ে এসেছে। আর তারা কাউকে হত্যায় শরীক হয়নি। কোন যুদ্ধে অংশ নেয়নি। তারা অপেক্ষায় ছিল কখন পালাবে, কখন পালানোর সুযোগ পাবে। কিন্তু পালানোর সুযোগ পাচ্ছিল না। তাহলে তাদের হত্যা করা হবে না।

হ্যাঁ, যদি যুদ্ধে শরীক হয়ে কাউকে হত্যা করে থাকে তবে অবশ্যই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

হযরত উমর (রাঃ) এর শাসনামলে একবার একজন মুসলমানের হত্যার কারণে তিনি সান'আর সাতজনকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তাই বলছি, যারা কমিউনিস্টদের সাথে ছিল তারা যে কতো মানুষকে হত্যা করেছে তার কি কোন সীমা সংখ্যা আছে? বহু মানুষকে হত্যার কর্মকাণ্ডে এরা অংশ নিয়েছে। সে-ই তো কমিউনিজমকে প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র তুলে নিয়েছে। আল্লাহ, রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আচ্ছা সবকিছুই বাদ দিলাম। এরা যে ডাকাত লুটেরা, এতে তো কোন সন্দেহ নেই। আর ডাকাতদের জন্য শাস্তির বিধান হল–

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে। অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সূরা মায়েদা ঃ ৩৩)

অষ্টাবিংশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٦٥) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ ○

(٦٦) لَاتَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ إِنْ نَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○

অর্থ : যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আমরা তো গল্প আর কৌতুক করছিলাম। আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তার বিধি বিধান ও তার রাসূলের সাথে কৌতুক করছিলে? তোমরা কোন ওজর আপত্তি করো না। ঈমান আনার পর তোমরা কাফের হয়ে গেলে। তোমাদের কাউকে যদি আমি ক্ষমা করে দেই তবে অবশ্যই কাউকে শাস্তিও প্রদান করব। কারণ তারা পাপাচারী। (সূরা তওবা ঃ ৬২-৬৬)

গত মজলিসে আলোচনা করেছি, কুরআন, সুন্নাহ বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কেউ ঠাট্টা বিদ্রুপ করলে বা ধর্মের বিধি-বিধানের ছিদ্রান্বেষণ করলে, রাসূলকে গালমন্দ করলে, বা ধর্মের কোন বিষয়ে সন্দেহ করলে তার বিধান কী হবে। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ কিতাব– الصارم المسلوم على شاتم الرسول এ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন– যদি কেউ রাসূলকে গালমন্দ করে, বিদ্রুপ করে তাহলে চার ইমাম একমত যে, ইসলামী আদালত তাকে হত্যার নির্দেশ দিবে। তবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, হত্যার আগে তাকে তওবা করার সুযোগ দেয়া হবে কি না। অধিকাংশের মত হল, তাকে তওবা করার সুযোগ দেয়া হবে না। আর যদি ইসলামী খেলাফতে বসবাসকারী জিম্মী, ইহুদী বা খৃস্টান তা করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা ছাড়া অন্য তিন ইমামের মত হল, তাকে তওবার সুযোগ দেয়া হবে না। তাকে হত্যা করা হবে। আর আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, তার মাঝে কুফুরী বিদ্যমান থাকা রাসূলকে গালমন্দ করার চেয়েও কঠিন; কিন্তু এ কারণে তো কাউকে হত্যা করা হয় না। তাই তাকে তওবা করার সুযোগ দেয়া হবে। হ্যাঁ, তবে যদি মুসলমানদের পাপাচারের কারণে বা অন্য কোন খারাপ অভ্যাসের কারণে কেউ তাদের গালমন্দ করে তাহলে তাকে কাফের বলা হবে না। তাকে কোন প্রকার শাস্তি দেয়া হবে না। গত মজলিসে তার একটি উপমা দিয়েছি।

বলেছি, এক ব্যক্তির লম্বা দাড়ি, লম্বা জামা অথচ সুদ খায়। মদ বিক্রি করে। এখন যদি কেউ বলে, আহ লোকটি যদি তার দাড়ি কেটে ফেলত আর লম্বা জামা ত্যাগ করত তাহলে ভাল হত। এ ধরনের কথা কিন্তু সুন্নতের সাথে বিদ্রূপ নয়। বরং এটা ঐ ব্যক্তিকে তিরস্কার ও বিদ্রূপ করা হচ্ছে, সে রাসূলের সুন্নাতকে তার পাপের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। আসল কথা হল, সুন্নাতকে সুন্নাত হিসাবে তিরস্কার করা। মনে রাখবে, কেউ যদি বলে এখন দাজ্জাল আর মুজাহিদদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। মুসলমানদের মাঝে এখন মুনাফিকের অভাব নেই- তাহলে কিন্তু কথক কাফের হবে না। তবে যদি এভাবে বলে, প্রত্যেক দাড়িওয়ালা ব্যক্তিই পাপিষ্ঠ, খবিছ বা মুনাফিক। তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

একবার এক ব্যক্তি এসে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) কে বলল, يقولُ صاحبُكم هذا আপনাদের এই লোকটি বলে, সে কথার ভঙ্গীতে রাসূলের সাথে ব্যঙ্গ করেছিল। সাথে সাথে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।

বর্তমানে আরেকটি বিষয় খুব লক্ষণীয়। আল্লাহ প্রদত্ত কোন বিধান বা নির্দেশ নিয়ে তিরস্কার করলেও কিন্তু কাফের হয়ে যায়। যদি কেউ বলে, যারা ইসলামের অনুসরণ করে তারা সেকেলে, পশ্চাৎগামী। তাহলে

কিন্তু সে আর মুসলমান থাকবে না। এমনিভাবে কেউ যদি পর্দাশীল কোন মহিলাকে লক্ষ্য করে বলে, আরে তুমি কী পরলে? এই লম্বা বোরকা! এই স্কার্ট! এটা তো মধ্যযুগের পোষাক। অন্ধকার যুগের সংস্কৃতি। এ ধরনের মন্তব্য করলেও কাফের হয়ে যায়।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, বর্তমানে মুসলমানরা ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে গেছে। ইসলামকে আজ তাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। কি কি কারণে মুসলমান কাফের হয়ে যায় তাও তারা জানে না। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি তার স্ত্রী মুসলমান থাকে। এরপরও তারা এক সাথে রাত্রি যাপন করলে তারা ব্যভিচারকারী হবে। তাদের সন্তানরা জারজ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মেয়ে যয়নব (রাঃ) কে বলেছেন– যখন তার স্বামী আবুল আস ইবনে রবী-এর মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করেছিলেন অথচ তখনো আবুল আস কাফের ছিল। আর যয়নব (রাঃ)ও তার নিকট ছিলেন। বলেছিলেন– يَا بُنَيَّـةُ! لا يَقْرُبَنَّكَ و لا تُمكِّنِيه مِنْ نفسك হে মেয়ে! সে যেন কিছুতেই তোমার নিকটবর্তী না হয়। আর তুমি কিছুতেই তাকে সহবাসের সুযোগ দিবে না। তাই কোন কাফের নারীকে বিয়ে করা জায়েয নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ○

অর্থ : তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১০)

তেমনিভাবে মুসলমান মেয়েদেরকেও কোন কাফেরের সাথে বিয়ে দেয়া জায়েয নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ○

অর্থ : ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা মুশরিক পুরুষদের স্বামীরূপে বরণ করে নিও না। (সূরা বাকারা ঃ ২২১)

কেউ যদি বার বার সুদ খায় তবুও সে কাফের হয় না। কিন্তু কেউ যদি একবার কোন মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার কারণে তিরস্কার করে, ইসলামকে সেকেলে বলে মন্তব্য করে তাহলে সে কাফের হয়ে যায়। ইসলাম ধর্ম থেকে সে বেরিয়ে যায়।

আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামী (রহঃ) এ সম্পর্কে একটি মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। তার কিতাবটির নাম الزواجرُ عن ارتكاب الكبائر উক্ত কিতাবে তিনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত মূল্যবান ও সূক্ষ্ম আলোচনার অবতারণা করেছেন। এবং কিছু মূলনীতিও লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন, কেউ যদি এমন কাজ করে যে ব্যাপারে মুসলমান একমত যে, তা কাফের ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। যদিও সে নিজেকে মুসলমান বলে থাকে। যেমন কেউ যদি খৃস্টানদের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে খৃস্টানদের সাথে গির্জায় প্রার্থনা করতে যায়, কুরআনের আয়াত বা আল্লাহর নাম লিপিবদ্ধ কোন কাগজ অপবিত্র জায়গায় ফেলে দেয়, সর্বসম্মত ঐক্যমতে যিনি নবী তার নবুওয়তের ব্যাপারে সন্দেহ করে, তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর এবং ইবরাহীম (আ.) এর সহীফাসমূহ বা কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করে, উম্মতকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করার জন্য যারা বিভিন্ন ধরনের কথার ও কৌশলের আশ্রয় নেয় তারা কাফের হয়ে যাবে। যেমন, বাথপার্টির লোকেরা মুসলমানদের গোমরাহ করেছে। সুতরাং তারা অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের নেতা মিখাইল আফলাককে মুসলমানদের উপর প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ, রাসূল ও মু'মিনদের বাদ দিয়ে তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। আফগানের মুসলমানদের উপর আরবের খৃস্টানদের প্রাধান্য দেয়। রাসূলের বাণীর উপর মিখাইল আফলাকের কথাকে প্রাধান্য দেয়। তারা বিশ্বাস করে না যে, কুরআনের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হতে পারে বা ইসলাম এ যুগে গ্রহণীয় হতে পারে। যারা এ সব কিছু করবে তারা কাফের। বাথপার্টির লোকেরা এ সব করে। তারা কুরআনকে অপছন্দ করে। যারা কুরআনকে

ভালবাসে তাদের অপছন্দ করে। তারা বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার করে রাসূলের শানে নানা ধরনের কটুক্তি করে। ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বক্তব্য দেয়। আর লক্ষ্য রাখে এ সব বক্তব্য শুনে কার চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে উঠে, তার চেহারা ক্রোধে লাল হল কেন? তাহলে এবার বুঝে দেখ তারা কেমন মুসলমান!

তেমনিভাবে শিয়ারা কাফের। আর যারা শিয়াদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে তারাও কাফের। কারণ, তারা উম্মাতদের গোমরাহ করছে, সকল সাহাবীকে কাফের বলে। তারা বলে সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের ইন্তেকালের পর কাফের হয়ে গেছে। তেমনিভাবে তারা কা'বার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে যে, তা কি মক্কায় না সিরিয়ায়? তেমনিবাবে নামায আর রোযা নিয়েও তাদের নানা কথা। তারা অনেক হারামকে হালাল মনে করে। আর যারা হারামকে হালাল মনে করে তারা কাফের। আর যারা হালালকে হারাম মনে করে তারাও কাফের। এটি একটি সর্বসম্মত মূলনীতি। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন– مَنْ استحلَّ النظرةَ فقد كفر بالإجماع যে ব্যক্তি পরনারীর দিকে তাকানোকে হালাম মনে করে সে কাফের হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন مَنْ استحلَّ الخبزَ فقد كفر بالإجماع যে ব্যক্তি রুটিকে হারাম মনে করবে সে কাফের হয়ে যাবে। অনেককেই দেখবে নিজেকে মুসলমান দাবী করে। তুমি তাকে যদি জিজ্ঞেস কর, ভাই, তুমি কেন এই মেয়ের দিকে তাকালে? সে বলবে, আরে এটা আবার কেমন কথা! তাকালে কী হয়? মেয়েদের দিকে তাকানো কি হারাম? এই ছোট্ট একটি কথা বলে লোকটি কাফের হয়ে গেল। ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল।

তেমনিভাবে, কেউ যদি অজু ছাড়া নামায পড়াকে বৈধ মনে করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, তা দীনের প্রতি শৈথিল্য ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন বৈ কিছুই নয়। কেউ যদি কোন শরয়ী কারণ ছাড়া কোন মুসলমানকে বা কোন কাফের জিম্মীকে কষ্ট দেয়া, উত্ত্যক্ত করা বৈধ মনে করে এবং বলে, এই লোকটাকে কষ্ট দেয়া হালাল। কারণ সে মুসলমান। তাহলে সে হারামকে হালাল মনে করল। এটাও কুফুরী। কেউ যদি বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো ছিলেন। তাহলেও তা কুফুরী। এ ধরনের কথা বললে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। কারণ, তাওয়াতুরের সূত্রে অর্থাৎ বহু সাহাবী দ্বারা স্বীকৃত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো ছিলেন না। কেউ যদি বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়ি উঠার আগেই ইনতিকাল করেছেন বা দাড়ি মুণ্ডানো অবস্থায় ইনতিকাল করেছেন, তাহলেও সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, সে রাসূলকে এমন বিশেষণে চিহ্নিত করেছে যা তিনি ছিলেন না। এটা রাসূল সম্পর্কে মিথ্যা বলা। অর্থাৎ রাসূল যে সব গুণে গুণান্বিত ছিলেন তা সর্বজন স্বীকৃত ছিল। তার কোন একটিকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি একথা বিশ্বাস করে যে, রাসূলের পর অন্য নতুন রাসূল আসতে পারে, এতে কোন অসুবিধা নেই, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। যেমন কাদিয়ানীরা কাফের। এরা রাসূলের পর মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে রাসূল বলে বিশ্বাস করে। পাকিস্তানে এদের সংখ্যা প্রায় এক মিলিয়ন। লাহোরের রাবওয়া নামক স্থানে তার ঘাঁটি ছিলো। মৃত্যুর পর তাকে সেখানেই দাফন করা হয়েছে। এই কাদিয়ানীরা অত্যন্ত সুসংগঠিত। পররাষ্ট্র অফিসগুলোতে কাদিয়ানীদের বড় বড় অফিসার রয়েছে। তেমনিভাবে সেনা বাহিনীতে, পুলিশ বাহিনীতেও এদের উঁচু উঁচু পদের লোক রয়েছে। কিন্তু যে দিন পাকিস্তান ঘোষণা করল যে, কাদিয়ানীরা মুসলমান নয়, এরা একটি নতুন ধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায়, ইসলামের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। সেই থেকেই তারা গা ঢাকা দিল। নিজেদের আর কাদিয়ানী বলে প্রকাশ করার সাহস পেল না। তবে বিয়ের সময়ই প্রকাশ পায় যে, লোকটি কাদিয়ানী কিনা। কারণ, কাদিয়ানীরা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে কাদিয়ানী পরিবারেই বিয়ে দিয়ে থাকে। অন্য কোথাও দেয় না। সুতরাং কেউ যদি তার ছেলে বা মেয়েকে কোন কাদিয়ানী পরিবারে বিয়ে দেয় তাহলে মনে করবে সে কাদিয়ানী। অমুসলিম। কেউ যদি বলে, আমি বলতে পারব না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় নবুওয়ত পেয়েছেন না অন্য কোথাও; তিনি মদীনায়

গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন না অন্য কোথাও; তাহলে এই সর্বসম্মত বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কারণে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।

তেমনিভাবে আমেরিকার কতক কৃষ্ণাঙ্গ নিজেদের মুসলমান দাবী করলেও তারা প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ছিল না। তারা কাফের ছিল। তারা আলীজা মুহাম্মদকে নবী বলে বিশ্বাস করত। এদের সংখ্যা শিকাগোতে সবচেয়ে বেশী। এখন তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ মিলিয়ন।

কিন্তু আনন্দের বিষয় হল, আলীজা মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তার ছেলে সেই ধর্মের উত্তরাধিকারী হিসেবে আসন দখল করলেও আমেরিকা ও আরব ছাত্রদের একটি ঐক্য সংস্থার যুবকরা তাকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হয় যে, তার পিতা নবী ছিলেন না। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আর কোন নবী আসবেন না। তখন সে ঘোষণা করেছিল, আমার পিতা আলীজা মুহাম্মদ নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সংস্কারক। আলহামদুলিল্লাহ, এখন তারা মুসলমানদের মত নামায আদায় করে, রোযা রাখে, হজ্জ করে।

কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, নবুওয়াতের পদটি মেহনত মুজাহাদার মাধ্যমে অর্জিত হয়। মানুষ তার আত্মিক পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে ও আত্মার উন্নতি লাভের মাধ্যমে নবী হতে পারে। তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। অথবা কেউ যদি বলে, ওলী নবী থেকে শ্রেষ্ঠ। ওলীর নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়। তাহলে সে নিজেকে নবী দাবী না করলেও কাফের হয়ে যাবে। কেউ রাসূলের শানে কোন ব্যঙ্গ বা তিরস্কারমূলক কোন উক্তি করলে সে কাফের হয়ে যাবে। যেমন মিশরের আল আহরাম পত্রিকায় একদা রাসূলকে ব্যঙ্গ করে একটি চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল, চিত্রটিতে দেখানো হয়েছিল যে, একটি মোরগকে নয়টি মুরগী ঘিরে রেখেছে। তেমনিভাবে কেউ যদি ব্যঙ্গ করে তাকে মুহাম্মদ নামে না ডেকে হুসাইন নাম ধরে ডাকে বা বলে, রাসূল যদি আমাকে এ কাজের আদেশ দিতেন তাহলে আমি তা করতাম না, অথবা একথা বলে, যদি আল্লাহ এসেও বলে তবুও আমি এ কাজ করব না, তাহলে কাফের হয়ে যাবে।

মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদের গ্রেফতারের পর জেলখানায় তাদের অমানুষিক শাস্তি প্রদান করা হত। জেল প্রধান হামযা আলবাসূনী বলত, যদি আল্লাহ তোমাদের মুক্ত করে নিতে আসে তাহলে তাকেও জেল খানায় বন্দী করব। এ ধরনের কথা বলার কারণে সে কাফের হয়ে গেছে। জয়নাব গাযালীকে জেলখানায় নির্মমভাবে কষ্ট দেয়ার পর বলত, বল দেখি, কোন শাস্তি অতি কঠিন, জাহান্নামের শাস্তি, না আব্দুন নাসেরের শাস্তি? শোনে রাখ, হে বন্দিনী! এ ধরনের শাস্তি তুমি আমরণ ভোগ করবে যতক্ষণ না তুমি আব্দুন নাসেরের পক্ষ অবলম্বন করবে। এ ধরনের কথা বলা কুফুরী। এ দ্বারা মুসলমান কাফের হয়ে যায়। কেউ যদি তিরস্কার করে বলে, যদি কা'বাকে এখানেও নিয়ে আসা হয় তাহলেও আমি নামায পড়ব না।

তবে একটি বিষয় খুব বেশী লক্ষণীয়, তা হল কি কি কারণে মানুষ কাফের হয়ে যায়, তা জানার আগে আমাদের এ বিষয়টিও জানতে হবে যে, বর্তমানে বহু মানুষ কোন চিন্তা ফিকির ছাড়াই এ শব্দগুলো ব্যবহার করে। তুমি যদি জরিপ চালাও তাহলে দেখবে, উম্মাহর চার ভাগের তিন ভাগের চেয়েও বেশী মানুষ এ শব্দগুলো ব্যবহার করছে। অথচ আমরা তাদের কাফের বলতে পারছি না। যদি আমরা তাদের কাফের বলতে ইচ্ছে করি তাহলে দেখবে শতকরা আশিজন লোক আর মুসলমান থাকবে না।

তাই আমাদের কর্মপন্থা হবে, আমরা ঘোষণা করব, এটা কুফুরী, এটা কুফরী। এটা করলে মানুষ কাফের হয়ে যায়। এভাবে মুসলমানদের মাঝে এ বিষয়গুলো প্রচার করব। তাদের এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলব। তাদের ঈমান-আকীদা বিষয়ে শিক্ষা দিব। দলীল প্রমাণ তাদের নিকট পেশ করব। তারপর যদি তারা এ সব বিষয়ের কোন পরওয়া না করে তাহলে তাদের কাফের বলব। তাদের সাথে আমাদের আচরণ হবে কাফেরদের সাথে কৃত আচরণের মত।

যারা কবরস্থ ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে তারাও কাফেরদের মধ্যে গণ্য হবে। তবে আমরা তাদের কাফের বলতে পারব না। কারণ, তারা এ বিষয়ে মূর্খ। অজ্ঞ। এ কথা বলেছেন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য আলেমগণ।

সুতরাং আগে মানুষদের বুঝাতে হবে। বুঝাতে হবে যে, কবরস্থ কোন আল্লাহ ওয়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক। অত্যন্ত জঘন্যতম শিরক। এর কারণে মুসলমান মুসলমান থাকে না। তবুও তাদের কাফের বলা যাবে না। তাদের বুঝাতে হবে। শরয়ী বিধান তাদের শিক্ষা দিতে হবে। তবে তাবিজ ব্যবহার করা শিরক নয়। এর কারণে কেউ অমুসলিম হয়ে যায় না। এ বিষয়টি নিয়ে কিছু মানুষ খুব বাড়াবাড়ি করে। তারা একে শিরকে ছগীর বলে।

তাওয়াসসুল বিল নবী অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার উসীলা ধরে আল্লাহর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা। এভাবে বলা– اللهُم اغفرلي بجاه النبيِّ صلَّى اللهُ عليه و سلَّم অর্থ : হে আল্লাহ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার উসীলায় আমাকে ক্ষমা করে দিন। এ বিষয়টি নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, এটা বৈধ, জায়েয। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত। কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত। আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) একে মাকরূহ বলেছেন। তবে যারা রাসূলের ইনতিকালের আগে আর পরের কথা বলে বিধানে পার্থক্য করতে চায় এদের নিকট তাদের কথার সমর্থনে শক্তিশালী কোন দলীল নেই।

এ ব্যাপারে আমরা ইমাম আবু হানীফার কথা অনুসরণ করব। আমরা একে শিরক বলব না। কারণ, তাওয়াসসুল আর ইসতেগাসা কিন্তু এক বিষয় নয়। তাওয়াসসুল বৈধ আর ইসতেগাসা হারাম, শিরক। এ দু'য়ের মাঝের পার্থক্য ভালভাবে বুঝতে হবে।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের লোকেরা يا محمَّد এর মর্ম বুঝে না। বরকতের জন্য এরা এ শব্দটি লিখে রাখে। কখনো দেখবে, ট্যাক্সির এক পাশে يا محمَّد লিখেছে, আরেক পাশে يا الله লিখেছে। এটা তারা বরকতের জন্য লিখে রাখে। তুমি যদি জিজ্ঞেস কর ভাই يا محمَّد এর মর্ম কি? কেন তুমি তা লিখেছ? সে কিন্তু তার সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে পারবে না। এদের অজ্ঞতার পরিধি এতো দীর্ঘ যে, দেখা যায়, সন্তান জন্ম গ্রহণের পর কেউ ওজু করে কুরআন খুলে চোখ বন্ধ করে কুরআনের পৃষ্ঠার উপর আঙ্গুল রাখে। যে শব্দের উপর আঙ্গুল পড়ে সে শব্দটি নবজাতকের নাম হিসেবে মনোনীত করে। এভাবে এক ব্যক্তি তার মেয়ের নাম রেখেছিল بصلها। কারণ তার আঙ্গুল এ শব্দটির উপর পড়েছিল।

এ হল সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার হালত। বড়ই বিস্ময়কর তাদের অবস্থা। বড়ই আশ্চর্যজনক। দীন সম্পর্কে এদের অজ্ঞতার কোন পরিসীমা নেই। আরবী সম্পর্কে এদের কোন জ্ঞান নেই। সুতরাং এদেরকে কাফের বলতে একটু চিন্তা ফিকির করতে হবে। কাউকে কাফের বলে দেয়া কিন্তু সহজ বিষয় নয়। কারণ, ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার কারণে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়। তার বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। সে কোন মুসলমানের মীরাস পায় না, সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা হবে না ইত্যাদি অনেক বিধান এসে যায়। সুতরাং কাফের ফতওয়া দেয়ার বিষয়টিতে ফিকির করতে হবে। বিলম্ব করতে হবে।

এ সূক্ষ্ম বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায় কুরআনে বর্ণিত হযরত মূসা (আ.) ও তার সম্প্রদায়ের একটি ঘটনায়। মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে রাতের আঁধারে মিশর ত্যাগ করে পালিয়ে সিরিয়ায় চলে আসছিলেন তখন লোহিত সাগর পার হওয়ার পর এক মুশরিক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বনী ইসরাঈল তাদের মূর্তি পূজা করতে দেখে মূসা (আ.) কে বলল–

قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ○

হে মুসা! তাদের যেমন অনেক ইলাহ আছে আমাদেরও একজন ইলাহ বানিয়ে দাও। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৩৮)

তখন কিন্তু মূসা (আ.) তাদের বলেননি, তোমরা ইসলাম ধর্ম থেকে বেরিয়ে গেছো। তাওহীদ ও একত্ববাদের বিশ্বাস বর্জন করেছো। বরং তিনি বলেছেন– قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ নিশ্চয় তোমরা মূর্খ সম্প্রদায়।

বর্তমানে অনেক যুবককে দেখতে পাবে, তারা ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখে না। বেফাঁস অনেক আপত্তিকর কথা বলে ফেলে। সুতরাং ক্ষিপ্ত হয়ে ত্বরিত গতিতে তাদের ব্যাপারে কেনা ফতওয়া না দেয়াই উচিত হবে। আগে তাদের বুঝাতে হবে। দলীল প্রমাণ তাদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে।

তাওয়াসসুল বিন নবী অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওসীলা করে দু'আ করা সম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বলে। অনেকে তা হারাম বলে। অনেকে আবার তা শিরক বলে। আসলে তারা তাওয়াসসুল সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখে না।

হ্যাঁ, কেউ যদি দু'আয় বলে– يا محمد أغثني হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে সাহায্য কর। অথবা বলল, اشف لي ولدي আমার জন্য আমার ছেলেকে আরোগ্য দান কর। সুস্থ কর। অথবা বলল, يَا رَسُولَ اللهِ ! المددَ، المددَ হে আল্লাহর রাসূল, তোমার সাহায্য চাই। তোমার সাহায্য চাই। তাহলে তা শিরক হবে। হারাম হবে।

একবারের ঘটনা। আমি আরবের একজন শ্রেষ্ঠ বর্ষিয়ান নেতৃত্বস্থানীয় আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলাম। একটি বিষয় নিয়ে তার সাথে মশওয়ারা করব। পর্যালোচনা করব। আমার সাথেও কিন্তু লোক ছিল। পথে এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করল। কণ্ঠ তার বিস্ময়ে ভরা। হযরত আপনি কি বলেন যে, তাওয়াসসুল বিন নবী শিরক নয়? আমি উত্তরে বললাম, পৃথিবীতে কোন মুসলমান আছে কি যে তাওয়াসসুল বিন নবীকে শিরক বলে। সে বলল, হ্যাঁ আছে। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আমরা যে শাইখের নিকট যাচ্ছি তিনিও কি তাওয়াসসুলকে শিরক বলেন। আমি তখন রুক্ষ ভাষায় বললাম, অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব। এটা হতেই পারে না। আসলে তোমরা মস্তিষ্ককে শিরকের ভাণ্ডারে পরিণত করেছ। আর সেখান থেকে শিরক বিতরণ কর।

আমরা শাইখের নিকট পৌঁছলে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তখন বললেন, না- এটা শিরক নয়। আমি তখন বললাম, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তাওয়াসসুলকে বৈধ বলেছেন। উসূলে ফেকাহর কিতাব পাঠ করলে দেখতে পাবে, যারা মরুভূমিতে বাস করে তাদের বিধান শহুরে মানুষের বিধানের মত নয়। যে শহরে আলেম ওলামা বসবাস করে সে শহরের অধিবাসীদের বিধান ঐ শহরের মত নয় যে শহরে আলেম উলামা নেই। সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির বিধান ঐ ব্যক্তির মত নয় যে পূর্ব থেকেই মুসলমান। সুতরাং আমাদের চিন্তা করতে হবে। ভাবতে হবে। যখন তখন যাকে তাকে কাফের ফতওয়া দেয়া যাবে না।

একবার একদল আরব যুবককে কুনাড় পাঠালাম। তাদের একজন অত্যন্ত দুঃসাহসী। জযবায় ভরা তার হৃদয়। একদিনেই সে পৃথিবীতে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে চায়। কুনাড়ের মুজাহিদ ক্যাম্পে সে দুই ব্যক্তির গলায় তাবিজ দেখল। আর দেরি করল না, ক্ষেপে আগুন হয়ে গেল। জোরালো গলায় চিৎকার জুড়ে বলল, এক্ষুনি তোমাদের গলার তাবিজ দু'টি খুলে ফেল। আফগানী সেই দুই যুবকের কণ্ঠও বেশ জোরালো। বলল, না খুলব না। কয়েকবার কথা কাটাকাটির পর আরব যুবক তাদের জাপটে ধরল। পরবর্তীতে সেই যুবকের সাথে আমার দেখা হলে কারণ জিজ্ঞেস করলাম। অকপটে সে তাদের কাফের বলে অভিহিত করল। আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম। তাহলে কি তারা কমিউনিস্টদের মত কাফের? এদের হত্যা করা কি বৈধ? এরা কি গর্বাচেবের মত কাফের? এভাবে ভেবে দেখ, অজ্ঞতা ভ্রষ্টতার কোন স্তরে নিয়ে পৌঁছায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٦٧) اَلْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ۝

অর্থ : মুনাফেক নর ও নারীরা সবাই একই ধরনের। তারা মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং ভাল কাজ করতে বারণ করে এবং নিজেদের হাতকে (দান করা থেকে) সংকুচিত করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে তাই আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মুনাফিকরা পাপাচারী। (সূরা তওবা ঃ ৬৭-৬৮)

এমন ব্যক্তিকে মুনাফেক বলা হয়, যে তার কুফরীকে গোপন রাখে এবং ইসলামকে প্রকাশ করে। যিন্দিকও তেমনই। মুনাফিক ও যিন্দিকের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে যিন্দিক মাঝে মাঝে কুফরিমূলক কথা বলে ফেলে, যা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু। তাই তাকে ইসলামী রাষ্ট্রে আদালতের ফয়সালা মতে তওবার সুযোগ দেয়া ছাড়াই হত্যা করা বৈধ হবে।

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের আলামতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন–

اَلْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ ○

অর্থ : মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা একই ধরনের। এখানে আল্লাহ তা'আলা– بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ অর্থ : তারা পরস্পরে একে অপরের বন্ধু- এমন কথা বলেননি। কারণ, তাদের মাঝে বন্ধুত্বের কোন সম্পর্ক নেই। এরা সংকট মুহূর্তে একে অপরকে রেখে পালিয়ে যায়। পক্ষান্তরে মু'মিনদের সম্পর্কে বলেছেন–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ○

অর্থ : মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু। অর্থাৎ কল্যাণের কাজে তারা একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। এ পথে তারা অটল অবিচল থাকে।

মুনাফিকদের অপর তিনটি আলামত হলঃ ১. তারা অন্যায় অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, ২. সৎকাজ থেকে বারণ করে, ৩. নিজেদের হাতকে সংকুচিত করে রাখে। আমি এখন তোমাদের একটি প্রশ্ন করছি। আফগানিস্তানের এই জিহাদ কি পূণ্যের কাজ নয়, সৎ কাজ নয়? নিশ্চয় তা পূণ্যের কাজ, সৎ কাজ। তাহলে যে সব মুসলমান ভাইয়েরা আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করতে লোকদের বারণ করে তারা কি অসৎ কাজের আদেশ ও সৎ এবং পূণ্যের কাজে বারণ করছে না? অবশ্যই করছে। তাহলে আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে, তাদের মাঝে মুনাফিকদের আলামত পাওয়া গেছে। মনে রাখবে, যথার্থ জিহাদের পথে অংশ গ্রহণে নিষেধ করা আর রমযান মাসে কাউকে রোযা না রাখতে বলা একই পর্যায়ের পাপ। এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন–أَفَرَأَيْتَ الَّذِي عَبْدًا إِذَا صَلَّى অর্থ : আপনি কি ঐ ব্যক্তির কথা ভেবে দেখেছেন যে বান্দাকে নামায আদায় করতে বাঁধা প্রদান করে?

সুতরাং ইসলাম ধর্মে এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই যে, তুমি কারো কাছে গিয়ে বলবে, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি রোযা রেখো না। কারণ, ভবিষ্যতে তা তোমার স্বাস্থ্যের ক্ষতির কারণ হবে অথবা কাউকে উপদেশ ছলে বলবে, তুমি জিহাদে যেয়ো না। কারণ, গোয়েন্দা বাহিনী কিন্তু ভবিষ্যতে তোমার পিছনে লাগবে। এ দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। উভয়কে ফরজ কাজে বাঁধা প্রদান করা হচ্ছে। এদের কাছে এদের অন্যায় ও পাপ কাজ সুশোভিত মনে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ○

অর্থ : এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জাতির নিকট তাদের আমলকে সুশোভিত করে দিয়েছি।

(সূরা আন'আম ঃ ১০৮)

এ ক্ষেত্রেও যারা জিহাদের পথে বাঁধা প্রদান করে তাদের নিকট তাদের কাজটি ভাল মনে হয়। আল্লাহর নামের দোহাই দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তারা তা করে। অথচ সে কতো হতভাগা। পাপের বোঝা

স্বেচ্ছায় বহন করে চলছে। আর মনে করছে, আমি পূণ্যের কাজ করছি। এ ধরনের অবস্থার চিত্রপট সম্পর্কে বিলাল ইবনে হারেস মুযানী (রাঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إنَّ الرجلَ ليَتَكلَّمُ بالكلمةِ من رضَا الله عزَّ و جلَّ لا يَلقَى لها بالاً فيكتبُ الله له رضوانَه بها إلى يومِ يلقَاه و

إنَّ الرجلَ ليَتَكلَّمُ بالكلمةِ من سَخَطِ الله عزَّ و جلَّ لا يَلقَى لها بالاً فيكتبُ الله له سَخَطَه بها إلى يَومِ يلقَاه —

অর্থ : মানুষ কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে যার প্রতি তার কোন গুরুত্বও থাকে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার আমলনামায় তার সন্তুষ্টির সওয়াব লিখে দেন। আবার কখনো মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে যার প্রতি তার কোন গুরুত্বও থাকে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার আমলনামায় অসন্তুষ্টির পাপ লিখে দেন।

সুতরাং আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে। খুব চৌকান্না থাকতে হবে। আমরা যেন কখনো কোন মন্দ কথা আমাদের মুখ থেকে বের না করি।

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মুনাফিকের আলামত তিনটি। ১. অন্যায় অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়া। ২. পুণ্য কাজের নিষেধ করা। ৩. ভাল কাজে বাঁধা প্রদান করা। হয়তো দেখা যাবে কেউ এসে তোমাকে বলছে, আরে ভাই! কেন তুমি তোমার দাড়ি লম্বা করছো! কেন তোমার দাড়ি প্রতিপালিত করছো? এ ধরনের তিরস্কারমূলক কথা বলবে। তোমাকে সওয়াবের কাজে বাঁধা দিতে আসবে।

সাবধান, এই আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার। এ দু'টি বিষয় হল এ উম্মতের দুর্ভেদ্য দুর্গ। এ দু'টি বিষয় ছাড়া এ উম্মত চলতে পারে না। কল্যাণ ও নেকীর কাজও চলতে পারে না। সবকালে সবযুগেই শাসকরা আলেমদের নসীহত ও উপদেশের মুহতাজ। যে দিন সুস্বাদু মজাদার খাবার দ্বারা আলেমদের মুখ ভরে দেয়া হবে, আর তারা উপদেশ প্রদান ছেড়ে দিবে তখন এ উম্মত অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। ক্রমেই হেদায়াতের আলোকোজ্জ্বল রাজতোরণ থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে।

এজন্য সুফিয়ান সওরী (রহঃ) প্রায়ই বলতেন–

إذا رأيتُم العالِمَ على بابِ السلطانِ فاحْذَرُوه ، فاعْلَموا أنه لصٌّ —

অর্থ : 'যদি তোমরা কোন আলেমকে শাসকের দরজায় দেখ তাহলে তার ব্যাপারে সতর্ক থাক। আর মনে রাখবে, সে একজন ডাকাত।' আর হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) বলতেন–

إنَّهم و اللهِ ، لا يأخذُون منْ دنَياهم شيئًا إلا أخذُوا من دينِكم ضِعْفَين —

অর্থ : আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় তারা দুনিয়ার কিছুই তোমাদের থেকে গ্রহণ করে না। তবে তারা তোমাদের ধর্মের দ্বিগুণ নিয়ে যায়। কারণ, তাদের থেকে দুনিয়াকে গ্রহণ করার পর তারা জুলুম করলে তাদের উপদেশ দেয়া সম্ভব হয় না। যে রাজা বাদশাহদের উপদেশ দিবে তাদের হাত সর্বদা উঁচু থাকতে হবে। নিচু হাতের অধিকারী ব্যক্তি কখনো উঁচু গলায় কথা বলতে পারে না।

একদা খলিফা মনসুর সুফিয়ান সওরী (রহঃ) এর নিকট এসে বলল, হে সুফিয়ান! তুমি আমাদের নিকট তোমার প্রয়োজনীয় সামগ্রী চেয়ে নাও। সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বললেন, তাহলে কি আমাকে তা দিবেন? খলীফা মনসুর বললেন, অবশ্যই দিব। তখন সুফিয়ান সাওরী অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বললেন–

لا تأتِني حتى أُرسلَ إليكَ و لا تُعطِني حتى أسْـألَكَ —

অর্থ : 'আপনার নিকট লোক পাঠিয়ে সংবাদ দেয়ার পূর্বে আপনি আমার নিকট আসবেন না। আর আপনার নিকট প্রার্থনা করার পূর্বে আমাকে কিছু দিবেন না।' তখন মনসুর তার কাপড় গুটিয়ে একথা বলতে বলতে প্রস্থান করলেন–

كلُّ الطُّيُـــورِ علفْـــنَاها فالْتقَطَتْ إلاَّ سُفيـــانُ ـــ

অর্থ : সব পাখিকে খাদ্য দিলাম আর সে তা গ্রহণ করল কিন্তু সুফিয়ানকে আটকাতে পারলাম না।

একদা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ), ইবনে আবী যিব ও ইমাম মালেক (রহঃ) খলীফা মনসুরের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন খলীফা মনসুর তাদেরকে তার খিলাফতের কার্যক্রম সম্পর্কে মন্তব্য করতে বললেন। উত্তরে আবু হানীফা (রহঃ) কঠোরতা অবলম্বন করলেন। ইমাম ইবনে আবী যিবও কঠোরতা অবলম্বন করলেন। আর ইমাম মালেক (রহঃ) কোমলতা অবলম্বন করলেন।

এর পরের ঘটনাই লোমহর্ষক। খলীফা মনসুর তার পুলিশ প্রধানকে তিনটি থলি দিয়ে পাঠালেন। বলে দিলেন, যদি আবু হানিফা আর ইবনে আবী যিব তা গ্রহণ করে তাহলে তাদের কর্তিত শির আমার নিকট নিয়ে আসবে। আর যদি মালেক তা গ্রহণ করে তাহলে তা তাকে দিয়ে দিবে।

সত্যই ইমাম মালেক (রহঃ) তা গ্রহণ করেছিলেন। আর তাকে তা দেয়া হয়েছিল। আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট থলেটি নিয়ে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে। পুলিশ প্রধান বলল, আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ হতে। তখন আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তো তা তার জন্যও পছন্দ করি না, সুতরাং কিভাবে আমি তা আমার জন্য পছন্দ করতে পারি?

তার পরবর্তী ইতিহাস আরো করুণ। খলীফা মনসুর আবু হানীফা (রহঃ) কে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে বললে তিনি তা গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছেন– আপনি আমাকে বিচারকের পদ দিতে চাচ্ছেন এ কারণে যে, আমি আপনার হয়ে ফায়সালা করি। আপনার পক্ষে রায় দেই। আল্লাহর কসম করে বলছি, তা কিছুতেই হবে না। কিছুতেই হবে না। এরপর খলীফা মনসুর তাকে জেলে বন্দী করেন। এবং জেলেই ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) নিপীড়িত নির্যাতিত অবস্থায় ইনতেকাল করেন।

উনত্রিংশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٦٧) اَلْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ
أَيْدِيَهُمْ نَسُوْا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ○ (٦٨) وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ
جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○ (٦٩) كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْا أَشَدَّ مِنْكُمْ
قُوَّةً وَّأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَّأَوْلاَدًا فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلاَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ
وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا أُوْلٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ○ (٧٠) أَلَمْ يَأْتِهِمْ
نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيْمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○ (٧١) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ أُوْلٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ (٧٢) وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

অর্থ : মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা একে অপরের সহায়ক। তারা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় এবং ন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। তারা তাদের হাতকে সংকুচিত করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে তাই আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা নাফরমান। আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারীদের এবং কাফেরদের জন্য জাহান্নামের ওয়াদা করেছেন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের জন্য অভিসম্পাত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা, তারা শক্তিতে ছিল তোমাদের চেয়ে প্রচণ্ড, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে ছিল তোমাদের চেয়ে অধিক। তারা তাদের ভাগ্য দ্বারা উপকৃত হয়েছে আর তোমরা তোমাদের ভাগ্য দ্বারা উপকৃত হয়েছো, যেমন তোমাদের পূববর্তীরা তাদের ভাগ্য দ্বারা উপকৃত হয়েছে। আর তোমরা তাদের মতই চলছো। ইহলোকে ও পরলোকে তাদের আমলসমূহ নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর তারাই ক্ষতিগ্রস্থ। তাদের নিকট কি পূর্ববর্তীদের সংবাদ পৌঁছেনি, নূহ, 'আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের, ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এবং মাদায়েনবাসীদের আর সে সব সম্প্রদায়ের সংবাদ যাদের উল্টে দেয়া হয়েছিল? তাদের রাসূলরা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। আর আল্লাহর জন্য তো শোভনীয় নয় যে, তিনি জুলুম করবেন। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করত। মু'মিন পুরুষ ও নারীরা একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয়। মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। নামায কায়েম করে। যাকাত প্রদান করে। আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ এদের উপর দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য এমন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরমালা প্রবাহিত হয়। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন পবিত্র পরিচ্ছন্ন নিবাসের যা চিরন্তন উদ্যানে থাকবে। আর আল্লাহর সামান্য সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় বিষয়। আর তা-ই মহান সফলতা। (সূরা তওবা ঃ ৬৭-৭২)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা দুই প্রকার মানুষের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এক প্রকার মানুষের হৃদয় অসুস্থ। এরা চাটুকার। এরা নিজেরা নির্জনে মিলিত হলে অন্যায় ও ফেতনায় লিপ্ত হয়। প্রকাশ্যে এরা সাধুতার ভান ধরে। এরা হল মুনাফেক। এদের বৈশিষ্ট্য এরা মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। ভাল কাজে বাঁধা প্রদান করে। হাতকে সংকুচিত করে রাখে। কল্যাণের কাজে অগ্রসর হয় না।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, কল্যাণময় কাজে অগ্রসর না হওয়ার অর্থ হল, জিহাদের কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ না করা। কারণ, জিহাদ সম্পর্কেই আলোচনা চলছিল।

এরা হল মুনাফেক। সমাজে জিহাদই হল এমন বিষয় যা মুনাফেকদের চরিত্র স্পষ্ট করে দেয়। চিহ্নিত করে দেয়। তাই জিহাদ হল কল্যাণময় কাজ। এ জিহাদই প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান মু'মিন ও ধোকাবাজ মুনাফেকের মাঝে পার্থক্যের রেখা সৃষ্টি করে। জিহাদই হল সঠিক নিরূপক যন্ত্র। জিহাদ দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে যায় কে প্রকৃত মু'মিন, কে তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বদা জিহাদের সাথে তাক্বওয়ার আলোচনা করেছেন। জিহাদের সাথে নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতার আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(১٥) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○

অর্থ : মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে। তারপর এতে কোন সন্দেহ রাখে না, আর নিজের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই সত্যবাদী। (সূরা হুজুরাত ঃ ১৫)

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

(١١٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ○

অর্থ : হে মু'মিন ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (সূরা তওবা ঃ ১১৯)

আমি সূরা তওবা অধ্যয়ন করে দেখেছি, তাতে অনেক ক্ষেত্রে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে আর অনেক বেশী তাক্বওয়ার আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, জিহাদ তাক্বওয়ার ভিত্তি ছাড়া চলতে পারে না। আর মুনাফেকরা তোমার সাথে এক পা, দুপা বা তিন পা চলবে। কিন্তু যখন গুলি আসতে থাকবে, বোমা বিস্ফোরিত হবে, কামানের গোলায় চারদিক কেঁপে উঠবে তখন হাজার হাজার আপত্তি পেশ করবে। তারপর রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী মুত্তাকী ব্যক্তির অবস্থা কী হবে? তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٢) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○

(٣) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ○

অর্থ : যাদের নিকট আল্লাহর কথা বলা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়ে পড়ে। আর তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হলে তাদের ঈমান বেড়ে যায়। আর তারা শুধুমাত্র তাদের রবের উপরই ভরসা করে। যারা নামায কায়েম করে আর আমি তাদের যে সম্পদ দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। (সূরা আনফাল ঃ ২-৩)

এরাই অভিযান শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমার সাথে থাকবে। রাস্তার প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমার সাথে চলবে। তাই যারা লোকদের জিহাদের পথে আহবান করে, যারা জিহাদ করতে উৎসাহী তারা যেন তাক্বওয়ার প্রতিপাদ্য

বিষয়গুলো দেখে নেয়। যাদের মাঝে তা পাবে; দেখবে, তারাই বিপদের সময়, কঠিন দিনগুলোতে তোমার পাশে থাকবে।

আর মুনাফেকরা হলো, ধান্দাবাজ, লোভী। দুনিয়ার স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে তোমার নিকট আসে। সুতরাং যদি তোমার দুনিয়া তাদের জীবন অবসানের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তারা তোমাকে ফেলে পালাবে। এ বিষয়টি বুঝতে হলে ইরান ইরাক যুদ্ধের দিকে ফিরে তাকাও। তবে আমরা কিন্তু চাই না যে, ইরান ইরাকের উপর বিজয়ী হোক। তবে বুঝার বিষয় হল ইরানীরা একটি আক্বীদা ও বিশ্বাস পোষণ করে যদিও তা অসত্য হয়। তারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পরই তারা জান্নাতে পৌঁছে যাবে। তাই খোমেনী এক লাখ স্বেচ্ছাসেবী চাইলে দু'লাখ এসে উপস্থিত হয়। মুহূর্মুহূ ক্ষেপণাস্ত্র বিস্ফোরিত হচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসছে। অথচ ইরানীরা এগিয়ে যাচ্ছে। 'ইয়া হাসান, ইয়া হুসাইন' বলে ধ্বনি দিচ্ছে আর এগিয়ে যাচ্ছে। এরা মৃত্যুর পিয়াসী। মৃত্যুকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে এরা প্রস্তুত। কেন? এটা হল তাদের বিশ্বাসের শক্তি। যদিও তা অবাস্তব ও অসত্য।

অন্যদিকে যারা বার্থপার্টির পতাকাতলে এসেছে তাদের লক্ষ্য হল দুনিয়া। এরা এসেছে দুনিয়া অর্জনের জন্য। পদের লোভে। মন্ত্রিত্বের লোভে। সেনাবাহিনীতে উচ্চপদ পাওয়ার লোভে। তাই যখনই এরা মৃত্যুর মুখোমুখি হয় পালিয়ে যায়। দৌড়ে পালায়।

আমি এ বিষয়টি ভেবে অত্যন্ত বিস্মিত হই। কিভাবে এই দীর্ঘ সময় ধরে ইরাক এখনো ইরানের সাথে যুদ্ধে ঠিকে আছে। শিয়ারা একটি বিশেষ আকীদা পোষণ করে। তাদের বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য হল শাহাদাত, হুসাইন (রাঃ) এর মত শাহাদাত অর্জন করা। এ কারণে এদের উপর বিজয়ী হতে হলে এদের চেয়ে মজবুত আকীদা বিশ্বাসের অধিকারী হতে হবে। শিয়াদের জীবনের লক্ষ্য হল, শাহাদত। সুতরাং দুনিয়া কি কখনো আখেরাতের উপর বিজয় লাভ করতে পারে? লোভ-লালসা কি বিশ্বাসের উপর বিজয় লাভ করতে পারে? আকীদা বিশ্বাসের সামনে কি ঠুনকো দুনিয়ার লোভ দাড়িয়ে থাকতে পারে? তাই সাদ্দাম যতই শক্তি নিয়ে আসুক ইরানীদের আকীদা বিশ্বাসের সামনে ঠিকতে পারবে না। আমি চাই না, শিয়ারা বিজয়ী হোক তবে একথা সত্য যে, শাহাদাতের আকীদা বিশ্বাসে গড়ে উঠা ইরানীদের সাথে তারা কিছুতেই টিকে থাকতে পারবে না। থাকতে পারে না। যদিও শিয়ারা ভ্রষ্ট, বাতিলপন্থী।

আর বার্থপার্টি তো আরো বেশী গোমরাহ, বেশী ভ্রষ্ট। যুবতীদের কৌমার্যের লোভ দেখিয়ে যুবকদের কাজে লাগানো। ইসলামের বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করে যাচ্ছে। পাপ কাজের বিস্তার ঘটাচ্ছে। মুসলমানদের ধরে ধরে জবাই করছে। ইরাকে এখন আর প্রকৃত ইসলাম বাকি নেই। নেফাকে ভরা কিছু মানুষই এখন ইরাকের ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে আছে। যেমন সাদ্দাম হোসেনের প্রশংসা করে তার অনুসারী বার্থপার্টির সমর্থক কবি শফিক কামালী বলেছে–

بارَكَ وجهُكَ القدسيُّ فينا كوجهِ الله ينضَحُ بالجلالِ —

অর্থ : তোমার পবিত্র চেহারা আমাদের মাঝে মহিমাময় হোক। আল্লাহর চেহারার ন্যায় যা থেকে সর্বদা তাজাল্লী বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

এই লোভী কবি হল শফিক কামালী। আল্লাহ তা'আলা তার বিরুদ্ধে সাদ্দামকে নিয়োজিত করলেন। একদিন সে একটি ভুল করল, বলল, যদি এ যুদ্ধ থেমে যেত!......সাদ্দাম এ কথা শুনে আর দেরি করল না। তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করল। একথা কি সত্য যে, তুমি বলেছো, যদি এ যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট তার পদকে বিসর্জন দিত। তারপর সাদ্দাম হোসেন অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বলল, তুমি এদেশের জন্য তোমার জীবনের দীর্ঘ সময় বিসর্জন দিয়েছো। তাই আজ একটি ছোট বিষয় বিসর্জন দিতে আশা করি তোমার কোন আপত্তি থাকবে না। তারপর সে তার জিহ্বা প্রসারিত করার হুকুম দিল। এবং নিজ হাতে তার জিহ্বা

কেটে ফেলল। সেই জিহ্বাটি কেটে ফেলল যে জিহ্বা দ্বারা সে আল্লাহর সাথে তুলনা করে সাদ্দামের প্রশংসা করেছিল। বলেছিল–

كوجهِ الله ينضَحُ بالجلالِ —

অর্থ : আল্লাহর চেহারার ন্যায় যা থেকে সর্বদা তাজাল্লী ঝরছে। তথাকথিত বিপ্লবী কবি শফিক কামালীর শেষ পরিণাম এই হয়েছিল।

আমি বলেছিলাম, আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আকীদা-বিশ্বাসই টিকে থাকতে পারে। এ কারণেই মিশর যখন কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়ে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে আঘাত শুরু করল; ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল; এরপর আনোয়ার সাদাত ক্ষমতায় এসে দেখল যে, মিশর কমিউনিস্টদের কব্জায় চলে গেছে। সে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের অনুসারীদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করতে ইচ্ছে করল। সে মন্ত্রিসভাকে জিজ্ঞেস করল, কীভাবে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায়? তারা বলল, এ পরিস্থিতিতে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদের কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। এক আকীদা বিশ্বাসের সামনে আরেক আকীদা বিশ্বাসই টিকে থাকতে পারে। তাই শিয়ারা তাদের টার্গেট ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যদেরই বানিয়েছিল। সমাজ থেকে তাদের সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।

আনোয়ার সাদাতের মন্ত্রীসভার সদস্যরা কিন্তু আল্লাহ, রাসূলকে তেমন চিনে না। তবে তারা বাস্তব বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তারা বুঝেছিল যে, স্বার্থ কখনো বিশ্বাসের সামনে টিকতে পারে না। দুনিয়ার লোভ কখনো এমন মানুষদের সামনে টিকে থাকতে পারে না, যারা দুনিয়া ছেড়ে দিয়ে আখেরাতকে গ্রহণ করে নিয়েছে। কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না। এটা একেবারে অসম্ভব। আকীদা-বিশ্বাসের সামনে আকীদা-বিশ্বাসই ঠিকে থাকতে পারে। তাই বিশেষ আকীদা-বিশ্বাসের অধিকারী লোকেরাই বিজয় লাভ করে যদিও ক্ষেত্র বিশেষে তাদের বিজয় বিলম্বিত হয়। যদিও আকীদা বিশ্বাস ভ্রান্ত হয়। আর যদি সঠিক আকীদার অধিকারী হয় তাহলে তারা সবার উপয় বিজয় লাভ করে। সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে। আর সত্যবাদী বিশ্বাসী মুসলমানরা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ সঠিক আকীদা বিশ্বাস পোষণ করে না।

আমাদের কথা চলছিল, মুখোমুখি দু'ধরনের মানুষদের নিয়ে। মু'মিন ও মুনাফেকদের নিয়ে। মুনাফেকরা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয়। কল্যাণময় কাজে বাঁধা প্রদান করে। জিহাদ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। তাই আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। তাদেরকে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে ছেড়ে দিয়েছেন। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'আ করতেন–

يا حيُّ يا قيومُ ، برحمتِك استغيثُ أصلحْ لي شأني كلَّه و لا تكلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ —

অর্থ : হে চিরঞ্জীব, সবকিছুর নিয়ন্ত্রক মহান আল্লাহ! আমি আপনার রহমত চাচ্ছি। আমার সব অবস্থাকে আপনি সংশোধন করে দিন। আর চোখের পলকের জন্যও আমাকে আমার প্রবৃত্তির নিকট সমর্পণ করবেন না।

তাহলে একবার ভেবে দেখ, তার অবস্থা কেমন হবে যাকে আল্লাহ তা'আলা তার শয়তানের নিকট, তার প্রবৃত্তির নিকট ছেড়ে দিয়েছেন। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট এ অবস্থা থেকে পানাহ চাই। মুক্তি চাই। আল্লাহর রহমত, হেফাজত ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। কোন গত্যন্তর নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٣٦) وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ○ (٣٧) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

অর্থ : যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিকির থেকে গাফিল হয়ে যায় আমি তার জন্য শয়তান নিয়োজিত করে দিই। সে তার সহচর হয়ে যায়। আর নিশ্চয় তারা তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে দেয় আর তারা ধারণা করে যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৩৬-৩৭)

এজন্য এ ধরনের লোকদের দেখতে পাবে, এদের অনেকেই নিজের ধন-সম্পদ নিজেকে ধ্বংস করার জন্যই ব্যয় করে। আত্মহননের জন্যই খরচ করে। সব সম্পদ ব্যয় করে মদ হেরোইন আফিম ইত্যাদিতে। এরা মুখে বলে, এগুলো সেবন করা খুবই খারাপ। অথচ এরা এগুলো খেয়েই বেঁচে থাকে। এভাবেই নেশার ঘোরে এরা মরে যায়।

মিশরের ঘটনা। আমি একবার এক গাড়িতে যাচ্ছি। ড্রাইভার সিগারেট টানছে। মনে হল লোকটি শালীন ভদ্র। বললাম, তুমি মাসে কত উপার্জন কর। বলল, সাতাইশ জুনাইহা। আমি বললাম, ধুমপানে মাসে কত খরচ কর? বলল, বার জুনাইহা। তার কথা শুনে মনটা আমার ব্যাথায় ককিয়ে উঠল। বললাম, আরে তুমি এটা কর কি? এটা কি তোমার জন্য হারাম নয়? একেবারে বার জুনাইহাই ধোঁয়ার মত উড়িয়ে দাও?

আমার কথা শুনে সে বিস্মিত। বলল, শুধু এতটুকুই, আরো তো রয়েছে। আমি তার কথা শুনে থমকে গেলাম। বললাম, সে আবার কী! বলল, আফিম, হেরোইন। আমি বললাম, সেখানে কত ব্যয় কর? বলল, সেখানে ব্যয় করার পর আমার পরিবারের জন্য মাত্র দুই জুনাইহা থাকে। আমার কণ্ঠে তখন এক আকাশ বিস্ময়। বললাম, এগুলো কি তোমার জন্য হারাম নয়? তার কণ্ঠ আরো বিস্মিত। বলল, হারাম আবার কী? আমি তো নিয়মিত নামায পড়ি। এরপর আবার হারামের কী আছে? তার বিশ্বাস, ইসলাম হল শুধুমাত্র নামায। ব্যস, এতটুকুতেই ইসলাম শেষ। এরপর আর কোন বাঁধা নিষেধ নেই। নেশাখোররাই তাকে এ তা'লিম দিয়েছে। তারপর সে বলল, যদি আমি এগুলো না পাই তাহলে মরে যাব। আমি বাঁচব না।

একদা নেশাখোরদের একজনকে দেখলাম, জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঔষধ বিক্রেতার দোকানে গেল। সে ঔষধ বিক্রেতাকে হত্যা করতে চাচ্ছে। কারণ, সে তাকে নেশাকর ঔষধ দিচ্ছে না। সে বসতে পারছে না। একটি কাচ ভেঙে তা হাতে নিয়ে ঔষধ বিক্রেতাকে মারতে চাচ্ছে। আর সে বলছে, কোন ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন ছাড়া আমি তোমাকে তা দিতে পারব না।

দেখ, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের সম্পদ দ্বারাই শাস্তি দিচ্ছেন। এ ধরনের লোকদের তুমি কোথায় খুঁজে পাবে? তাদের দেখবে, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় হাজির। ব্যভিচারে পটু। নানা পাপ কাজে ডুবে আছে। এদের পরিপাকতন্ত্রী নষ্ট হয়ে গেছে। এরা গোশত খেতে পছন্দ করে না। দুধ খেতে ভাল লাগে না। কিন্তু নেশার বস্তুতে আহামরি অবস্থা। কেউ তাদের ফেরাতে পারে না। কোন উপদেশ তাদের কাজে আসে না। মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ডাক্তার নিষেধ করছে। তবুও তাদের একই সুর। এক গ্লাস মদ চাই। একটু হাশিশ চাই। একটু হেরোইন চাই। نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهم তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। প্রবৃত্তির টানে তারা ছুটে চলছে আর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ○

অর্থ : তাদের ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি দেখে আপনি বিস্মিত হবেন না। আল্লাহ তো তাদেরকে তা দ্বারা ইহজগতে শাস্তি দিতে চান। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের হেদায়াতের বিষয়টি ভুলে যান। অর্থাৎ তাদেরকে প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দেন। হেদায়াতের আলো থেকে তাদের বঞ্চিত করেন তখন শয়তান তাদের ছোঁ মেরে নিয়ে নেয়। এক দুর্বল হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

وُكِّل بكلِّ مؤمنٍ مأةٌ و سبعونَ ملكًا يذُبُّون عنه كما يَذُبُّ أحدُكم عن قصعتِه الذبابَ و لو وُكِّل المؤمنُ إلى نفسِه طرفةَ عينٍ لتَخَطَّفتْه الشَّياطينُ —

অর্থ : প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির হেফাজতের জন্য একশত সত্তরজন ফেরেশতা নিয়োজিত করা হয়েছে। তারা শয়তানকে তার থেকে তাড়িয়ে নিয়ে থাকে যেমনিভাবে তোমাদের কেউ তার পেয়ালা থেকে মাছি তাড়িয়ে থাকে। যদি মু'মিন ব্যক্তিকে চোখের পলকের জন্য তার নফসের নিকট সমর্পণ করা হয় তাহলে অবশ্যই শয়তান তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

শয়তান তোমাকে লক্ষ্য করে ওঁৎপেতে আছে। সকল অস্ত্র নিয়ে সে প্রস্তুত। অথচ তুমি তোমার ঈমান রক্ষার সকল অস্ত্র ফেলে মদমত্ত হয়ে আছো। তোমার মাঝে যিকিরের আমল নেই। কুরআন অধ্যয়নের আমল নেই। ইসতেগফার নেই। ওযু নেই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নেই। রাতের আঁধারে তাহাজ্জুদ নেই। বিনয় বিগলিত নেত্রে আল্লাহর দরবারে কোন দু'আ নেই। তাহলে যুদ্ধে তুমি কিভাবে তোমার শত্রুর সাথে পেরে উঠবে? কিভাবে বিজয় লাভ করবে? অথচ তোমার শত্রু মারণাস্ত্রে সজ্জিত। সাথে রয়েছে বিমান বিধ্বংসী কামান, বিমান বিধ্বংসী ট্যাংক ইত্যাদি। আর তুমি খালি হাতে রণাঙ্গনে উপস্থিত। প্রেমাস্পদ লায়লার বিচ্ছেদের গান গাচ্ছো। মাতাল হয়ে হেলে দুলে চলছো। তুমি মুহূর্তের জন্য ভেবেও দেখছো না। শত্রুর নিক্ষিপ্ত গোলা কোথায় এসে পড়ছে। হে আল্লাহ! আমাদের রক্ষা কর। আমাদের বাঁচাও। সুতরাং মনে রেখো এ জগতে ঈমানের চেয়ে বড় নেয়ামত আর কিছুই নেই। ইসলামের চেয়ে বড় নেয়ামত আর কিছুই নেই। আমার বন্ধুরা একবার এক বিচারকের ঘটনা শুনিয়েছিল। কিছু লোক একবার এক বিচারকের নিকট গিয়ে অভিযোগ তুলল, তাদের ছেলেরা আফগানিস্তান চলে গেছে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দাওয়াহ বিভাগের লোকেরা তাদের বিভ্রান্ত করেছে। বিচারক তাদের কথা শুনল। একবারে নীরব রইল। কোন উত্তর দিল না। এরপরই কিছু লোক এলো। তাদের অভিযোগ তাদের ছেলেরা নেশায় অভ্যস্ত। আরো অনেক কথা বলল, তাদের কথা শেষ হলে বিচারক পেশকারকে বললেন, এই ফাইলটা নাও, দেখলেন তাতে এক নেশাখোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বললেন, ঐ ফাইলটা নাও। দেখলেন, আরেক যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে ব্যাংকক চলে গেছে; নেশাখোর। এভাবে কয়েকটি ফাইল দেখিয়ে উত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন, এবার আপনারাই বলুন, কোনটা ভাল, আফগানিস্তানে গিয়ে শহীদ হওয়া ভাল, না ব্যাংককে গিয়ে মরা ভাল? নেশায় বিভোর হয়ে রাস্তাঘাটে পড়ে মরা ভাল? যান, আপনারা বেরিয়ে যান।

বিচারক কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে, তিক্ত অভিজ্ঞতার পর কথাটি বলতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি সব সময় সমাজের নানা সমস্যার সমাধান করে চলেছেন। বহু লোমহর্ষক ঘটনা তার নিকট আসছে। সুতরাং তার এ ফায়সালা ছিল এক ঐতিহাসিক ফায়সালা।

দেখা গেছে, যারাই সমাজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছেন, সমাজের গভীরে পৌঁছতে পেরেছেন, তারা হৃদয় দিয়ে মানবজীবনের জন্য ইসলামের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন। তারা বুঝেছেন, ইসলাম ধর্মে ফিরে আসা ছাড়া একদিনের জন্যও মানবতা আর শান্তি পাবে না। এজন্যই সাইয়্যেদ কুতুব বলেছেন–

الحياةُ تحتَ ظلالِ القرآنِ نعمةٌ، نعمةٌ لا عرفَها إلا مَنْ ذاقَها ، نعمةٌ ترفعُ العمَر و تُباركُه و تزكِّيه ، لقد خَلصتُ من الحياةِ في ظلالِ القرآنِ إلى يقينٍ جازمٍ قاطعٍ جاسمٍ إنَّ البشريةَ لا يُمكنُ أن تسْعدَ إلاَّ إذا رجعتْ لهذا الدينِ ، ثم قال: لقدْ كانتْ أكبر نكبةٍ قصَمتْ ظهرَ البشريَّة هي نتيجةُ هذا الدين عن الحياةِ ـــ

অর্থ : কুরআনের ছায়ায় জীবন-যাপন এক বিরাট নেয়ামত। এমন নেয়ামত যার স্বাদ শুধু সেই উপলব্ধি করতে পারবে যে তা আস্বাদন করেছে। এমন নেয়ামত যা আয়ুকে বৃদ্ধি করে, বরকতময় করে। পবিত্র করে। কুরআনের ছায়ায় জীবন যাপন করে আমি এমন এক মজবুত দৃঢ় ও অবিচল বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, মানবতা এ ধর্মে ফিরে আসা ছাড়া কিছুতেই ভাগ্যবান হতে পারবে না। অতঃপর তিনি বলেছেন– সবচেয়ে বড় বিপর্যয় যা মানবতার পিঠকে ভেঙ্গে দিয়েছে, তা হল, মানব জীবন থেকে এ ধর্ম দূরে সরে যাওয়া।

সুতরাং বলছি, ইসলামই দিতে পারে সব সমস্যার সমাধান। ব্যক্তির সমস্যার সমাধান, পরিবার, ছেলে-মেয়ে সামাজিক ইত্যাদি সব সমস্যার সঠিক ও বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাধান ইসলাম ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। ইসলামের সমাধান নিয়ে দয়াময় আল্লাহর ছায়ায় নিশ্চিন্তে নিরাপদে জীবন-যাপন করতে পারবে। তুমি তোমাকে এ শরী'আতের ছায়ায় সমর্পণ কর, প্রশান্ত চিত্তে ঘুমাও। আর যদি তা থেকে বেরিয়ে যাও তাহলেই শুরু হবে হতভাগ্যতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

অর্থ : পুরুষ ও নারীর মধ্য থেকে যদি কেউ ঈমান এনে নেক কাজ করে তাহলে আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর আমি তাদেরকে তাদের আমলের চেয়েও উত্তম পুরস্কার দান করব। (সূরা নাহল ঃ ৯৭)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ○ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ○

অর্থ : যে আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না, দুর্ভাগা হবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার জন্য রয়েছে কঠিন জীবন। আর আমি তাকে কিয়ামত দিবসে দৃষ্টিশক্তিহীন অবস্থায় উপস্থিত করাব। (সূরা ত্বহা ঃ ১২৩-১২৪)

ضَنْكٌ শব্দটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে, যেমন- ধ্বংস, বিপর্যয়, চিন্তা-ফিকির, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি। যারা পাশ্চাত্যে বসবাস করেছে তারাই মানবতার জন্য ইসলাম কত বড় নেয়ামত তা উপলব্ধি করতে পেরেছে। সুইডেন থেকে আমার এক আত্মীয় এল, বলল, আমি মানবতা ও মানুষের জন্য ইসলামের চেয়ে বড় নেয়ামত আর কিছু দেখিনি। আমি যখন তাদের যুবতীদের অবস্থা, সমাজের অবস্থা, তাদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী দেখি তখন আমার হৃদয় চিরে বেরিয়ে আসে, সুবহানাল্লাহ! এরা কীভাবে বসবাস করে। জীবন যাপন করে। এদের যুবতী মেয়েদের দেখি রোডের পাশে উদ্ভ্রান্তের মত শুয়ে আছে। মিলিয়নপতি অনেক যুবতীকে দেখবে, ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করছে।

কাউকে দেখবে, ঘোষণা করছে, আমি অমুক দিন আত্মহত্যা করব। তারপর একটি উঁচু ব্রিজের শীর্ষে গিয়ে উঠে। সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। কেউ আত্মহত্যা করতে বাঁধা দিলে বলে, আমি তো এ জীবন বয়ে চলতে পারছি না। কোথাও শান্তি পাই না, স্বস্তি পাই না। এভাবে অনেক মিলিয়ন ও বিলিয়নপতিরা আত্মহত্যা করছে।

বিশ্বখ্যাত এক লেখক। নাম আরনাসত হামনগুয়াই। একবার সে এক কাণ্ড করে বসল। নিজের মাথায় বন্দুকের নল রেখে গুলি করে আত্মহত্যা করল। তার মৃত্যুর পর তার এক নাতনী উত্তরাধিকার সূত্রে একশত মিলিয়ন ডলার পেল। এতো সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে জীবনের স্বাদ পেল না। نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে তাই আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন।

পাশ্চাত্যে এখন মরণব্যধির ছড়াছড়ি। স্নায়ুরোগ, হৃদরোগ, যৌনরোগ, এইডসসহ নানা রোগে আক্রান্ত পাশ্চাত্যের মানুষেরা। এ রোগগুলো এখন ভয়াবহ ভূতের আকার ধারণ করে ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষকে তাড়া করে ফিরছে। এখন তো এমন অবস্থা হয়েছে যে, কেউ কারো রক্ত পর্যন্ত গ্রহণ করে না এইডস মুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করার পূর্বে। বর্তমানে এ রোগ প্রাচ্যেও এসে পৌঁছেছে। আর সুইডেনের অধিবাসীরা মানসিক

রোগী। বাৎসরিক বাজেটের তিন ভাগের এক ভাগই মানসিক ও ব্রেনের চিকিৎসায় নিয়োজিত হাসপাতালগুলোতে ব্যয় করা হয়। অথচ আরব দেশগুলোতে এ ধরনের রোগী খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর। আর চুয়ান্ন মিলিয়ন আমেরিকান স্নায়ুবিক, মানসিক ও ব্রেনের রোগে আক্রান্ত। আমাদের সমাজে পাগল একেবারে নেই বললেই চলে। অথচ আমরা ইসলাম থেকে কত দূরে। তবুও খোদা আমাদের এতো প্রশান্তি, এতো সুখ দিচ্ছেন যা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। কোন মুসলমানের জানের বা মালের কোন ক্ষতি হলে সাথে সাথে তার মন আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। বলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহর নামের স্মরণে সে শান্তি খুঁজে পায়। ব্যস নিমিষে সকল পেরেশানী সকল মনস্তাপ দূর হয়ে যায়। আর পাশ্চাত্যের লোকেরা কোন উপায় না পেয়ে আত্মহত্যা করে। এভাবে দিনের পর দিন আত্মহত্যার প্রবণতা তাদের মাঝে বেড়েই চলছে, কেউ উঁচু টাওয়ার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কেউ ট্রেনের চাকার নিচে পড়ে খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে সুইডেনের আইন পরিষদের সদস্যরা আত্মহত্যার জন্য হাসপাতাল তৈরী করেছে। তারা দিশেহারা হয়ে বলছে, হে লোক সকলেরা, শুনে নাও। আমাদের সন্তানরা এভাবে মৃত্যুবরণ করবে তা আমরা চাই না। বরং তারা মরতে চাইলে আমরা তাদেরকে মেরে ফেলব। খুব সহজে মেরে ফেলব। একটি মাত্র ইনজেকশন দিব, ব্যস, সে মরে যাবে। তাই সে সভ্যতা আত্মহত্যার হাসপাতাল তৈরী করেছে। আহ! বড়ই কষ্ট হচ্ছে, ইসলাম ছাড়া মুক্তির কোন পথ নেই। কোন উপায় নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَظَنُّوْا أَنْ لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ আর তারা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোন আশ্রয় স্থল নেই। (সূরা তওবা ঃ ১১৮)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ○ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ وَاقٍ ○

অর্থ : আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে হিদায়াত প্রদানকারী কেউ নেই। পার্থিব জগতে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি আর পরকালের শাস্তি তো অত্যন্ত কঠিন। আর আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার তাদের কেউ নেই। (সূরা রাদ ঃ ৩৩, ৩৪)

পাশ্চাত্যে গিয়ে থাকলে দেখবে, তাদের চোখগুলো ক্লান্ত। রাস্তায় হাঁটছে তো হাঁটছে। জানেনা কোথায় যাবে। তাই আত্মহত্যা করছে। জীবনে প্রশান্তির স্বাদ পাচ্ছে না। অসহনীয় অস্থিরতা বিরাজ করছে মনে। তাদের এ অবস্থাকে তারা বিভিন্ন নামে ব্যক্ত করছে। কখনো দেখবে, পথের পাশে জড়ো হয়েছে একদল মানুষ। জিজ্ঞেস কর, ভাই তোমাদের কি হয়েছে? তারা নিঃসংকোচে নির্দ্বিধায় বলবে, আমরা সমকামিতার বৈধতা চাই। তারা এর জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। আমেরিকায় এক ব্যক্তি টেলিভিশনের পর্দায় এসে বলছে, আমি আমার মেয়ের সাথে মিলিত হই। তাতে আমি অধিক স্বাদ পাই। নাউযুবিল্লাহ।

একবার ভেবে দেখেছো, এ কেমন সমাজ। ধ্বংসের কোথায় গিয়ে তারা পৌঁছেছে? তাই তারা কুকুরের আশ্রয় নিয়েছে। তারা দেখেছে কুকুরই হল একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী। দেখছে, কেউ মারা গেলে পিতা-মাতার চেয়ে কুকুর বেশী দুঃখিত হয়। ব্যথিত হয়। পিতা দেখেছে, ছেলে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। মেয়ে চলে গেছে। স্ত্রী চলে গেছে। বয়স সত্তর বা আশি হয়েছে। চলাফেরা করতে পারে না। হয়তো একদিন বিছানায় পড়ে মরে থাকবে। কেউ জানবে না, পঁচে গলে দুর্গন্ধ ছড়ালে কেউ হয়তো মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনকে সংবাদ দিলে লোকেরা এসে লাশ নিয়ে যাবে। দাফন করবে। ব্যস, এই তো তাদের জীবন। এরা মৃত সমাজের লোক। একেবারে মৃত। কোন দীন নেই। কোন বিশ্বাস নেই। আল্লাহ তাদেরকে নফসের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যস, সমাজব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

আজকের ১৯৮৭ সালের ইরাককে যদি ১৯৬৭ সালের ইরাকের সাথে তুলনা করি, যখন ইরাক শাসন করত আব্দুস সালেম আরেফ (রহঃ)। হায়! যদি আমরা সেই ইরাকে ফিরে যেতে পারতাম! যদি আমরা মিশরকে বাদশাহ ফারুকের যুগে নিয়ে যেতে পারতাম!

আমরা তখন দামেস্কে ছিলাম। দামেস্ক ছিল দুনিয়ার জান্নাত। পৃথিবীর সবচে' সুন্দর শহর। সবচে' পবিত্র শহর। সবচে' ইলমী শহর। চারদিকে ছড়িয়ে ছিল আলেমদের দরস মজলিস। গোটা শহরেই ছিল আলেম আর আলেম। তালেবে ইলমরা ইসলামী সালতানাতের দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসত। দামেস্ক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত পৃথিবীতে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। কিন্তু এখন দামেস্কের একী অবস্থা? মনে হয়, জনশূন্য এক মরুভূমি। তার ফুলগুলো শুকিয়ে গেছে। তার মিনারগুলো, তার মিম্বারগুলো কেবলই কাঁদছে আর কাঁদছে। দামেস্কের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। কেন? কারণ, তারা এ সমাজকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে চাচ্ছে। সুতরাং এ সমাজ ভেঙ্গে যাবে। ইসলামী শরী'আতের ছায়া ছাড়া মানুষ কোথাও শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। তাকে তো ইসলামী শরী'আতের ছায়ায় থেকে থেকে জীবন যাপনের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। তাই এ ছায়া ত্যাগ করে আমরা কিছুতেই শান্তি পাব না। সুখ পাব না।

সমাজে দু'ধরনের মানুষ বসবাস করে। মু'মিন ও মুনাফিক। মুনাফিকের সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়। তার আত্মা শরীর চরিত্র ও সমাজের সাথে সুনিবিড় সম্পর্ক। পক্ষান্তরে মু'মিন থাকে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র। নীরবতা তার ধর্ম। নীরবে কাজ করতে থাকে আর সমাজের সামনে একটি শান্তি ও সুখের আদর্শ পেশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ○

অর্থ : তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিকরাই হল ফাসেক।

এই ফিসকই তাদের মুনাফিকীতে পৌঁছিয়েছে। ফিসক কী? ফিসক হল আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া। আর আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া শুরু হয় প্রবৃত্তির প্রেরণায় ছোট ছোট পাপ কাজ করার মাধ্যমে। আর প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করা কখনো সম্ভব হয় না। প্রবৃত্তি হল সমুদ্রের লবণাক্ত পানির মত। পিপাসা নিবারণের জন্য সমুদ্র থেকে এক আজলা পানি পান করবে তো দেখবে পিপাসা মিটে না। বরং আরো তীব্র হয়েছে।

এই মুনাফিকরা প্রবৃত্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যতই প্রবৃত্তিকে তুষ্ট করতে চেয়েছে ততই তার আগুন প্রজ্জলিত হয়েছে। যৌনতার আগুন জ্বালিয়েছে। খাহেশাতের আগুন জ্বালিয়েছে। পদমর্যাদা অর্জনের আগুন জ্বালিয়েছে। এবং আল্লাহর বিধানকে লঙ্ঘন করে এসব অর্জনের জন্য বিরামহীনভাবে চেষ্টা তদবীর করছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত শুদ্ধ পদ্ধতিতে, পরিচ্ছন্নতার সাথে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। উদরের জন্য খাবারের প্রয়োজন। তাই আল্লাহ হালাল ভাবে উপার্জিত খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে তা পূরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যৌন মিলন প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বিয়ের মাধ্যমে পবিত্রতার সাথে তা পূরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং আমরা যদি প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে চলতে থাকি তাহলে কিন্তু তার আর শেষ বলতে কিছু থাকবে না। প্রবৃত্তি হল পাগলা কুকুরের মত। যাকে সামনে পায় তাকেই কামড়ে দেয়। তার লালার বিষ অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ ○

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও নারীদের জন্য আর কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তারা দুনিয়াতে আগুনের মাঝে থাকবে। আর আখেরাতের আগুন তো আরো কঠিন। আরো মর্মন্তুদ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–

هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ○

অর্থ : শাস্তির জন্য জাহান্নামের অগ্নিই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।

জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জাহান্নামীরা কয়েকবার আল্লাহর নিকট বিনয় নিবেদন করবে। কিন্তু প্রত্যেকবারই প্রত্যাখাত হবে। মুক্তির পরিবর্তে তাদের শাস্তি কঠিন থেকে কঠিনতর করা হবে। তারা মাত্র একদিনের জন্য জাহান্নামের শাস্তিকে হালকা করা আবেদন করে বলবে–

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ○

অর্থ : জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষীদের বলবে, তোমরা তোমাদের রবকে বল, তিনি যেন একদিনের জন্য আমাদের আযাবকে লাঘব করে দেন। (সূরা গাফির ঃ ৪৯)

শুধুমাত্র এক দিনের জন্য আযাবকে লাঘব করার প্রার্থনা করবে। এক হাজার বৎসর পর তার উত্তরে বলা হবে–

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ○

অর্থ : রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেননি? তারা বলবে, হ্যাঁ, এসেছিল। রক্ষীরা বলবে, তোমরা দু'আ করতে থাক। আর কাফেরদের দু'আ নিষ্ফলই হয়।

(সূরা গাফির ঃ ৫০)

জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে মুক্তির পন্থা চেয়ে প্রার্থনা করে বলবে–

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ ○

অর্থ : জাহান্নামীরা বলবে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের দু'বার জীবন দিয়েছেন। এখন আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং মুক্তির কি কোন পন্থা আছে? (সূরা গাফির ঃ ১১)

এরপর এক হাজার বৎসর কেটে যাবে। তখন তার উত্তরে বলা হবে–

ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ○

অর্থ : তোমাদের এ শাস্তি এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত তখন তোমরা কাফের হয়ে গিয়েছিলে। আর যখন আল্লাহর সাথে শরীক করা হত তখন তোমরা তা বিশ্বাস করতে।

জাহান্নামীরা জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু কামনা করে প্রার্থনা করে বলবে–

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ○

অর্থ : জাহান্নামীরা ডেকে বলবে, হে মালেক! তোমার রব আমাদের চিরতরে শেষ করে দিন।

এর এক হাজার বৎসর পর উত্তরে বলা হবে–

إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ○

অর্থ : তোমরা চিরকাল এভাবেই থাকবে।

জাহান্নামীরা জাহান্নামের শাস্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে ছটফট করতে করতে বলবে–

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ○ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ○

অর্থ : কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর ফায়সালা করা হবে না যে তারা মরে যাবে। এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি প্রদান করি। সেখানে তারা আর্তচিৎকার করে বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের জাহান্নাম থেকে বের করুন, আমরা নেককাজ করব। পূর্বে যা করতাম তা আর করব না। (সূরা ফাতির ঃ ৩৬-৩৭)

প্রার্থনার এক হাজার বছর পর বলা হবে–

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ○

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এতটুকু আয়ু দেইনি যে আয়ুতে যা চিন্তা করার বিষয় ছিল তা চিন্তা করতে। তদুপরি তোমাদের নিকট সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর। জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাতির ঃ ৩৮)

অর্থাৎ আমি কি তোমাকে দুনিয়াতে ষাট বছরের আয়ু দেইনি? এ দীর্ঘ ষাট বছর কি তওবার জন্য যথেষ্ট ছিল না? এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَنْ بلغَ الستينَ و منْ بلغَ الأربعينَ أعْذرَ اللهُ إليه —

অর্থ : যে ব্যক্তি ষাট বছরে উপনীত হল, আর যে ব্যক্তি চল্লিশ বছরে উপনীত হল আল্লাহর নিকট তার আর কোন ওজর আপত্তি রইল না।

এরপরও জাহান্নামীরা নিরাশ হবে না। মুক্তির আশায় আল্লাহর নিকট করুণ প্রার্থনা করে বলবে–

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ○ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ○

অর্থ : জাহান্নামীরা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম। আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত। হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার কর। আমরা যদি পুনরায় তা করি তাহলে আমরা জালিম হব। (সূরা মু'মিনুন ঃ ১০৬-১০৭)

এ প্রার্থনার এক হাজার বৎসর পর আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিবেন। এ উত্তর পাওয়ার পর জাহান্নামীরা আর কোন প্রার্থনা করবে না। অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন–

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ○ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ○ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ○

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই থাক। আমার সাথে কোন কথা বলো না। আমার বান্দাদের একদল বলত, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদের ক্ষমা করে দাও। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। তুমিই তো শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী। তখন তোমরা তাদের সাথে তিরস্কার করতে। এমনকি তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। আর তোমরা তাদের দেখে পরিহাস করতে। (সূরা মু'মিনুন ঃ ১০৮-১১০)

সুতরাং বলছি, তোমরা কোথায় যাচ্ছো? তোমাদের সামনে হয় জান্নাত, না হয় জাহান্নাম। আমল কর। জান্নাতের পথকে সুপ্রশস্ত কর। জীবন তো একেবারে সংক্ষিপ্ত। কখন শেষ হয়ে যাবে বলতে পার না। আল্লাহ তা'আলাই তোমাকে এ জিহাদের ময়দানে নিয়ে এসেছেন। এখানে আকাশের দরজা সদা উন্মুক্ত। জান্নাতের দরজা খোলা। তোমার মাঝে জান্নাতের মাঝে এতটুকুই দূরত্ব যে, তুমি ইখলাসের সাথে তওবা করবে। তারপর একটি গুলি উড়ে আসবে আর তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে। তারপর চিরকাল সুখ আর সুখ। যার কোন অন্ত নেই। কোন শেষ নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

يُؤتى بالموتِ يومَ القيامةِ على شَكلِ كبشٍ أملحَ أبيضَ فيُذبحُ بينَ الجنةِ و النارِ ، فيُنادى يا أهلَ الجَنّةِ خلودٌ لا موتَ ،يا أهلَ النار خلودٌ لا موتَ —

অর্থ : কিয়ামত দিবসে মৃত্যুকে একটি শ্বেত সুন্দর লাবণ্যময় দুম্বার আকৃতিতে নিয়ে আসা হবে। তারপর জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে যবাহ করে দেয়া হবে। তারপর জান্নাতীদের আহবান করে বলা হবে, তোমরা চিরকাল জান্নাতে থাক। আর কোন মৃত্যু নেই। জাহান্নামীদের ডেকে বলা হবে, তোমরা চিরকাল জাহান্নামে থাক। আর কোন মৃত্যু নেই।

সুতরাং দুনিয়াতে আর কত বছর বাঁচবে? ষাট বৎসর। খুব বেশী হলে একশত বছর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

عِشْ مَا شِئْتَ فإنَّكَ ميِّتٌ و اعْمَلْ ما شئْتَ فإنَّكَ مجْزِيٌّ به و أحبَّ مَنْ شئْتَ فإنَّك مُفارِقُه —

অর্থ : যেভাবে খুশি তুমি জীবন যাপন কর অবশেষে কিন্তু তোমাকে মরতেই হবে।

যা তোমার ইচ্ছে তা কর, অবশেষে কিন্তু তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। যাকে ইচ্ছে তাকেই তুমি ভালবাস অবশেষে কিন্তু তাকে তোমার ছাড়তেই হবে।

সুতরাং এ মোহময় নশ্বর দুনিয়ায় তুমি কত কাল বাঁচবে? মৃত্যু তোমার পিছনে পিছনে ধেয়ে আসছে। তাই বলছি, আল্লাহর পথে এসো। জিহাদের ময়দানে এসো। এখানেই পাবে প্রকৃত শান্তি। চিরন্তন জীবন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا فَٱسْتَمْتَعُوا۟ بِخَلَٰقِهِمْ ○

অর্থ : এরা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মত। তারা শক্তিতে তোমাদের চেয়ে প্রচণ্ড ছিল, ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততিতে অধিক। তারা তাদের দুনিয়ার অংশ ভোগ করল।

বিস্ময়বোধ করলে তুমি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস পাঠ কর। সবকিছুই বাস্তব পাবে। তারা হাজার বছর বাঁচত। আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কে বলেন–

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَٰلِمُونَ ○

অর্থ : তিনি তাদের মাঝে সাড়ে নয়শত বছর বেঁচে রইলেন। তারপর মহাপ্লাবন তাদের পাকড়াও করল আর তারা ছিল জালিম। (সূরা আনকাবুত ঃ ১৪)

তারা দুনিয়ায় তাদের অংশ ভোগ করেছিল। কিন্তু দুনিয়ার কী মূল্য আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

لَوْ كَانتِ الدُّنيا تعْدِلُ عندَ اللهِ جَناحَ بعوضة ما سقَى منهَا كافرًا شربةَ ماء —

অর্থ : যদি দুনিয়া আল্লাহর নিকট একটি মশার ডানা পরিমাণ মূল্যও রাখত তাহলে আল্লাহ তা'আলা কোন কাফেরকে তা থেকে এক ঢোকও পানি পান করাতেন না।

হ্যাঁ, যদি দুনিয়া আল্লাহর নিকট সামান্য মূল্যও রাখত তাহলে কি সম্ভব যে আল্লাহ কাফেরদের তা দিয়ে দিবেন আর তার নেককার বান্দাদের তা থেকে বঞ্চিত করবেন? এটা সম্ভব নয়। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা হাফেজ আসাদকে রাষ্ট্রের কর্ণধার বানাতেন না। এটা সম্ভবও হত না।

বরং আমি তো দুনিয়াকে মৃত প্রাণীতুল্য মনে করি। যাকে পাহাড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তুমি কি মনে করো মৃত প্রাণী থেকে কোন কুকুর বেশী গোশত খেল তা তোমাকে চিন্তায় ফেলবে? তোমাকে পেরেশানিতে ফেলবে?

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন–

وَ ما هيَ إلاَّ جيفةٌ مستَحيلةٌ عليْهنَّ كلابٌ همُّهنَّ اجتذَامُها

إن تجتَنبْها كنتَ سمًّا لأهْلها و إنْ تجتذّ ها نازَعتْك كلابُها

অর্থ : দুনিয়া হল মূল্যহীন এক মৃত প্রাণী। অনেক কুকুর যার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের উদ্দেশ্য মৃত এ প্রাণীকে টেনে ছিড়ে খাওয়া। যদি তুমি তা থেকে দূরে থাক তাহলে তুমি দুনিয়াদারদের নিকট বিষতুল্য হয়ে যাবে। আর যদি তুমি তা অর্জন করতে চাও তাহলে দুনিয়ার কুকুররা তোমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه و سلم علَى جَدْيٍ أسكَّ ميِّتٍ و الصحابةُ كنفَيه ، فقالَ أيُّكم يُحبُّ أنْ يكونَ هذا له بدرهمٍ ؟ قالوا واللهِ لوْ كان حيًّا ما أخذْناه بدرهمٍ فكيفَ بميتٍ ! قال : الدنيا أهونُ على اللهِ من هذه عليكُم ـــ

অর্থ : একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট কানওয়ালা মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাহাবীরা তাঁর চারপাশে ছিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কে চায় যে, এই মৃত প্রাণীটি এক দেরহামের বিনিময়ে নিবে? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি তা জীবিত হত তাহলেও আমরা এক দেরহামের বিনিময়ে তা নিতাম না। সুতরাং মৃতটিকে নেয়ার তো কোন প্রশ্নই আসেনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই মৃত প্রাণীটি তোমাদের নিকট যেমন মূল্যহীন আল্লাহর নিকট এই দুনিয়া তার চেয়ে আরো বেশী মূল্যহীন।

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার উপমা দিয়ে বলেছেন–

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ○

অর্থ : পার্থিব জীবনের উপমা হল কিছু পানি, আমি আকাশ হতে তা বর্ষণ করছি। তারপর তার কারণে পৃথিবীর উদ্ভিদ ঘনসন্নিবেশিত হল। যা থেকে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু খায়। তারপর যখন পৃথিবী তার শোভা ধারণ করল ও সুসজ্জিত হল আর তার মালিকরা মনে করল যে, তারা তার ফসল কেটে আনতে সক্ষম তখন আমার ধ্বংসের নির্দেশ রাতে বা দিনে এসে পৌছল আর আমি তাকে কর্তিত শস্যের ন্যায় বানিয়ে ফেললাম যেন তা গতকাল ছিল না। (সূরা ইউনুস ঃ ২৪)

মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট উদ্ভিদ, ফলমূল খায়। তারপর তা কী হয়? সব গিয়ে জমা হয় ডাষ্টবিনে। মলমূত্র ফেলার স্থানে। একদা এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল। এক বুযুর্গ ব্যক্তি বাজারে গিয়ে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগল, হে ভাইয়েরা! এসো দেখে যাও, আমি তোমাদের দুনিয়াদারদের শেষ পরিণতি দেখাব। কিছু মানুষ উৎসাহী হল। তার পিছু পিছু গেল। তিনি তাদের মলমূত্র ফেলার স্থানে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, ঐ দেখ, সেটাই হল দুনিয়াদারদের দুনিয়ার শেষ পরিণতি। দেখ, সেখানেই আছে তাদের স্বাদের খাবারের বর্জ্য। আছে গোশত, মাংস, পোলাও, কোরমা ইত্যাদি। আহ! এই হল আমাদের দুনিয়া। এই হল তার শেষ পরিণতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ ○

অর্থ : তারা তাদের দুনিয়ার অংশ ভোগ করছে। তোমরা তোমাদের দুনিয়ার অংশ ভোগ করছো। যেমন, তোমাদের **পূর্ববর্তীরা** তাদের অংশ ভোগ করেছে।

আমাদের অবস্থা তো এই যে, আমরা সব কিছুই ভোগ করছি। প্রত্যেক দিনই ভাত, গোশত, দুধ খাচ্ছি। পেপসি, **কোকাকোলা,** স্প্রাইট তো থাকেই। খাবারের মেনুতে ফলমূল থাকে। মিষ্টান্ন দ্রব্যও থাকে। আল্লাহ **তা'আলা বলেন–** خُضْتُمْ كَالَّذِيْنَ خَاضُوْا তোমরা কাঁদা মাটিতে ঝাঁপ দিয়েছো। যেমনি তারা ঝাঁপ দিয়েছে। **তোমরা প্রবৃত্তি আর** অন্যায়ে ডুবে গেছো। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

অর্থ : আপনি তাদের ছেড়ে দিন, তারা খেয়ে নিক, ভোগ করুক আর আশা আকাঙ্খা তাদের গাফেল করে **রেখেছে। সত্বর তোমরা** জানবে। (সূরা হিজর ঃ ৩)

এদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أُوْلٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ○

অর্থ : দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে আর তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।

এদেরকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী জাতিদের আলোচনা করে বলেন–

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيْمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ○

অর্থ : তাদের নিকট কি পূর্ববর্তীদের সংবাদ পৌছেনি, নূহ, 'আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের, ইবরাহীমের **সম্প্রদায়ের এবং মাদায়েন**বাসীদের আর সে সব সম্প্রদায়ের সংবাদ যাদের উল্টে দেয়া হয়েছিল?

নূহ (আ.) এর সম্প্রদায়ের লোকেরা উত্তর ইরাকে ছিল। জূদী উত্তর ইরাকে অবস্থিত। 'আদ সম্প্রদায়ের **লোকেরা হাযরামাও**তে বসবাস করত। আল্লাহ এদের সম্পর্কে বলেন–

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ○

অর্থ : যখন তারা তাদের উপত্যকার অভিমুখে একটি মেঘখণ্ড আসতে দেখল, তারা বলল, ঐতো মেঘ **এসে গেছে।** **আমাদের** উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। বরং তা তো উহা যার তোমরা ত্বরা কামনা করছো। তা **ঝঞ্ঝাবায়ু, তার মাঝে মর্মন্তু**দ শাস্তি রয়েছে।

ইয়েমেনের দক্ষিণে ছিল 'আদ জাতির বসবাস।

তুমি কি জান সামূদ জাতির লোকেরা কোথায় বসবাস করত। তারা তাবুকের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস **করত। তাবুকের যুদ্ধের** সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামূদ জাতির বস্তির পাশ দিয়ে **গিয়েছিলেন। তিনি তার সাথী**দের নির্দেশ দিলেন, তোমরা এখান থেকে কিছুই খেয়ো না এবং পান করো না। **এখনো সেখানে সেই বিশাল** পাত্র বিদ্যমান যে পাত্রে উষ্ট্রীর দুগ্ধ দোহন করত। যে কূপ থেকে উষ্ট্রীটি পানি পান **করত আজো তা বিদ্যমান**। দুগ্ধ দোহনের পাত্রটি এতো বিরাট ছিল যে, তার মাঝে রক্ষিত দুধ শহরের সবাই **পান করত।**

যে নরাধম আল্লাহর সেই কুদরতী উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল তার নাম কুদার ইবনে সালেফ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَأَمَّا ثَمُوْدُ فَأُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ○ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ○ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوْمًا ○

অর্থ : আর সামূদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রলয়ংকারী বিপর্যয় দ্বারা। আর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। যা অবিরাম সাত রাত আট দিন তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন।

ইবরাহীম (আ.) এর সময় বাদশাহ নমরুদকে ধ্বংস করে দিলেন একটি মশা দিয়ে। আমার মনে হয় তা মাথার কোন রোগ হবে। তাই জুতা দিয়ে মাথায় আঘাত না করলে সে শান্তি পেত না।

আর লূত (আ.) এর সম্প্রদায় ছিল বস্তি উল্টে ফেলে ধ্বংস করা জাতি। তারা সাদুম ও আমুরা নামক স্থানে বসবাস করত। এখন সেখানে মৃত সাগর বিদ্যমান। হে আল্লাহ! মৃত সাগর থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। পৃথিবীতে এই একমাত্র সাগর যাতে কোন প্রকার প্রাণী নেই। তার পানিতে শতকরা ২০ ভাগ লবণ। কেউ গোসল করে উঠে এলে মনে হবে তার শরীর ঝলসে গেছে। অবশ্যই তাকে ভাল পানি দিয়ে পুনরায় গা ধুতে হবে। সে জায়গাটি বিশ্বের সবচেয়ে নিচু এলাকা। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে তা ৩৯৪ মিটার নিচু।

জিবরাঈল (আ.) যখন এ জনপদকে ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছে করলেন তখন সাদুম ও আমুরা অঞ্চলের নিচে তার এক পাখা রাখলেন। তারপর তাকে উঁচুতে তুললেন। আকাশের ফেরেশতারা কুকুরের আওয়াজ পর্যন্ত শুনল। তারপর তাকে উল্টে দিলেন। ফলে সেখানে সমুদ্র সৃষ্টি হলো। তার নাম মৃত সাগর। এ সব বিধ্বস্ত জনপদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

অর্থ : তাদের নিকট রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল। তবে আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি তাদের উপর জুলুম করবেন। তবে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছিল।

হ্যাঁ, মু'মিন আর মুনাফিকের জীবন ধারায় ভিন্নতা রয়েছে। মু'মিন সৎ কাজের আদেশ দিবে। অসৎ কাজ থেকে মানুষদের বারণ করবে। নামায কায়েম করবে। যাকাত প্রদান করবে।

আর মুনাফিকের জীবনে রয়েছে সমঝোতা আর তোষামোদ। মু'মিন শাসকের সামনে স্পষ্টভাষায় তার অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করবে আর মুনাফিক ভাল কাজ করতে বারণ করবে। অশ্লীল অন্যায় কাজ করতে আদেশ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إنَّ من أعظَمِ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عندَ سلطان جائرٍ —

অর্থ : নিশ্চয় জালিম বাদশার সামনে সত্য ও ন্যায় কথা বলা এক বিরাট জিহাদ।

কারণ, এ পথে ধনসম্পদ আর ছেলে সন্তানদের উপর বিপদ নেমে আসে। জেল জরিমানা হয়। চাকুরিচ্যুত হওয়া ইত্যাদি সমূহ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

তাই বলছিলাম, সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধ সমাজে অনেক প্রয়োজন। এটা এতো প্রয়োজন যে, পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরও অসৎ অন্যায় কাজ থেকে বারণ করা উচিত।

আলেমগণ বলেছেন– যারা মদের বোতল পরিবেশন করে তাদেরও উচিৎ মদপান থেকে বারণ করা। অশ্লীল অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া। এমনকি মদ পান রত ব্যক্তির জন্য উচিত অন্যকে মদ খাওয়া থেকে বারণ করা। তাহলে দু'টি অন্যায় কাজ মিলিত হবে না। অন্যায় কাজ করা। অন্যায় কাজ করতে দেখে নিরব থাকা। তবে মানুষের প্রকৃতিগত বিষয় হল, মানুষ অন্যায় কাজে লিপ্ত ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করে না। কবি বলেন–

يا أيُّها الرجلُ المعلِّمُ غيرَه هلاَّ لنفسك كان ذا التعلُّم

إبدأْ بنفسك فانْهها عن غيِّها فإذا فعلتَ ذا فأنتَ حكيمٌ

لا تنهَى عن خُلُقٍ و تأتي مثلَه عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمٌ

অর্থ : অন্যকে শিক্ষা দিতে ব্যস্ত হে ব্যক্তি! কেন তোমার জন্য সেই শিক্ষা হয় না। সুতরাং তুমি তোমার নিজের দ্বারা শিক্ষা দান শুরু কর। এবং নিজেকে ভ্রষ্টতা হতে বারণ কর। যদি তুমি তা কর তাহলে তুমি হবে প্রজ্ঞাবান। এমন কাজ থেকে তুমি লোকদের বারণ করো যা তুমি নিজেই করে থাক। যদি তুমি তা কর তাহলে তা তোমার জন্য মহাকলঙ্ক হল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

অর্থ : তোমরা কি লোকদের ভাল কাজের নির্দেশ দিবে আর নিজেদের কথা ভুলে যাবে অথচ তোমরা কিতাব পড়ছো? তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (সূরা বাকারা ঃ ৪৪)

শুধু কি তাই! আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার সমাজকে আল্লাহর অভিশাপ ও আযাব-গযব থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ○

অর্থ : বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের হয়ে গেছে তারা দাউদ ও ইসা ইবনে মরিয়মের কণ্ঠে অভিশপ্ত হয়ে। তা এ কারণে যে তারা অবাধ্যতা করত আর সীমালংঘন করত। তারা একে অপরকে মন্দ কাজ থেকে বারণ করত না। (সূরা মায়েদা ঃ ৭৮-৭৯)

হাদীসে বর্ণিত আছে–

لَمَّا وقعتْ بنو إسرائيلَ في المعاصي نهتْهم علمائهم فلم ينتهوا فوَاكلوهم و شَارَبواهم ، فضَرَبَ اللهُ قلوبَ بعضِهم ببعضٍ و لعنَهم على لسانِ داوُدِ و عيسى بنِ مريمَ ثم تلا الأيه.. لُعن الَّذينَ كَفرُوا مِن بني إسرائيلَ... ثم قال: كلاًّ و اللهِ لتأمرُونَّ بالمعروفِ و لتنهوُنَّ عن المنكرِ و لتأخذُونَّ على أيدِي الظالمِ و لتأطِرنَّه على الحق أطْرًا و لتقصرِنَّه على الحق قصْرًا أو ليضْرِبنَّ اللهُ قلوبَ بعضِكم من بعضٍ و يلعنَكم كما لعنَهم .

অর্থ : বনী ইসরাঈল পাপাচারে লিপ্ত হলে তাদের আলেমরা তাদের নিষেধ করল। কিন্তু তারা বিরত হল না। তারপর তারা একসাথে পানাহার করল, খাওয়া-দাওয়া করল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে একাকার করে দিলেন এবং দাউদ ও ইসা ইবনে মারইয়ামের কণ্ঠে তাদের অভিশপ্ত করলেন। তারপর রাসূল এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ○

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সাবধান.....সাবধান.......আল্লাহর শপথ করে বলছি তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করতে থাকবে ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করতে থাকবে। জালিমকে হাত ধরে জুলুম থেকে বিরত রাখবে। তাকে সত্যের উপরই বহাল রাখবে ও সত্যের উপরই অবিচল রাখবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হৃদয়কে একাকার করে দিবেন। এবং তোমাদের অভিশাপ দিবেন যেমন তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন।

উল্লেখিত আলোচনায় এ কথা প্রমাণিত হল যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করা সমাজকে আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ থেকে রক্ষার চাবিকাঠি। আর লা'নত বা অভিশাপ অর্থ- আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

অর্থ : তোমরা কেন এমন সম্প্রদায়কে উপদেশ দিচ্ছো, আল্লাহ তো তাদের ধ্বংস করে দিবেন বা কঠিন শাস্তি দিবেন। তারা বলল, তোমাদের রবের নিকট ওজর আপত্তি পেশ করার জন্য। হয়তো তারা আল্লাহকে ভয় করবে। (সূরা আরাফ ঃ ১৬৪)

এরা ছিল আইলার অধিবাসী। আইলা কোথায় অবস্থিত তা কি জান। হ্যাঁ, লোহিত সাগরের উত্তরে একেবারে শেষ মাথায় যে সরু অংশটি চলে গেছে তাকে আইলা বলা হয়। সেখানে গিয়ে মিশেছে মিশর, জর্দান ও ইসরাঈল। সেখানে ইহুদীদের এক সম্প্রদায় বাস করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করলেন। তখন তারা আল্লাহর সাথে ফাজলামো শুরু করল। জুম'আর দিন তারা উপকূলে আসত। ছোট ছোট নালা তৈরী করে তা জলাশয়ের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করত। তারপর শনিবারে আল্লাহর হুকুমে মাছ সমুদ্রে ভেসে ভেসে আসতো। পানির সাথে জোয়ারের সময় নালা দিয়ে মাছ এসে জলাশয়ে নিপতিত হত। ভাটার সময় পানি চলে যেত কিন্তু মাছ জলাশয়ে আটকে থাকত। শনিবারে তারা আর সে মাছ ধরত না। রবিবারে সে মাছ ধরত। ধর্মের বিধানের সাথে, আল্লাহর হুকুমের সাথে পণ্ডিতি দেখাতে লাগল।

তখন মু'মিনদের একটি দল, যারা বুঝতো, যারা বুদ্ধি রাখত, তাদেরকে উপদেশ দেয়া থেকে বিরত রইল না, তারা উপদেশ দিতেই থাকল। তারা তাদের এ কাজের বিনিময়ও পেল। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন–

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ○

অর্থ : তারপর তারা তাদের উপদেশের কথা ভুলে গেলে আমি তাদের আযাব থেকে মুক্তি দিলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। (সূরা আরাফ ঃ ১৬৪)

সুতরাং আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার তোমার দৃষ্টিতে যতই তুচ্ছ ও ছোট আমল হোক তার একটি উপকার অবশ্যই আছে, তা হল আল্লাহর নিকট ওজর আপত্তির পথ থেকে যায়। ফলে মুক্তির আশা করা যায়।

এ কারণেই হযরত উমর (রাঃ) কে আহত হওয়ার পর যখন গৃহে নেয়া হল তখন এক আনসারী যুবক তার নিকট গিয়ে খুব চমৎকার কথা বলল। তারপর ফিরে আসার সময় উমর (রাঃ) দেখলেন, তার পরনের কাপড়টি বেশ ঝুলে আছে। তাই ডেকে বললেন, অথচ তিনি তখন মুমূর্ষু অবস্থায়–

يا غلامُ! قصِّر ثوبَك فإنَّه أطهرُ لثوبِك و أرضَى إلى ربِّك —

অর্থ : হে যুবক! তুমি তোমার কাপড়কে খাটো করে পরিধান কর। কারণ তা তোমার কাপড়ের জন্য অধিক পবিত্র, আর তোমার রবের নিকট অধিক পছন্দনীয়।

একটু ভেবে দেখ, উমর (রাঃ) মৃত্যু শয্যায় থেকে, মুমূর্ষু অবস্থায় থেকেও কিন্তু আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের বিষয়টির গুরুত্ব ভুলে যাননি।

মদীনায় একজন ইহুদী যুবক বণিক ছিল। রাসূলের খেদমত করত। রাসূল শুনতে পেলেন, সে গুরুতর আহত। মৃত্যুশয্যায় শায়িত। রাসূল ছুটে গেলেন। দেখলেন, সত্যই তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। রাসূল মায়া ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। বললেন–

يا غلام! قل أشهدُ أنْ لا إله إلا الله و أنَّ محمدًا عبدُه و رسولُه —

অর্থ : হে যুবক! তুমি বল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

বালকটি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পিতার দিকে প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকাল। তার পিতা বলল, হে ছেলে, তুমি আবুল কাসেম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য কর। তারপর ছেলেটি কালিমা পাঠ করার পর মৃত্যুবরণ করল। রাসূল তখন আনন্দে আপ্লুত হয়ে বললেন–

الحمدُ لله الذي نجّاه بي منَ النَّار —

সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাই কখনো আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না। খাটো চোখে দেখা যাবে না। এ কারণেই আইলার মু'মিনদের মধ্য হতে যারা বিজ্ঞ, আল্লাহর বিধান সম্পর্কে সমধিক অবহিত তারা বলেছিল–

معذرةً إلى ربِّكم لعلَّهم يتَّقُونَ —

আমরা আল্লাহর নিকট ওজর আপত্তি পেশ করতে পারব এ আশায়ই তাদের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি। নসীহত করে যাচ্ছি। হয়তো তারা আল্লাহকে ভয় করবে।

আর যারা তাদের উপদেশ দেয়া থেকে বিরত ছিল তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

و أخذْنا الَّذين ظَلموا بعذابٍ بئيسٍ بما كَانوا يَفسقُونَ —

অর্থ : আর আমি জালেমদেরকে তাদের কৃত পাপাচারের কারণে পাকড়াও করলাম। (সূরা আরাফ ঃ ১৬৫)

ইকরামা (রহঃ) বলেন, আমি বনী ইসরাঈলের এই তৃতীয় দলটি সম্পর্কে চিন্তিত ছিলাম। যাদেরকে বলা হয়েছিল–

لِم تَعظُون قومًا ، اللهُمَّ مُهلِكُهم أو معذِّبُهم عذابًا شديدًا ، —

তাই আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলা এ তৃতীয় দলটির সাথে কী মু'আমালা করেছেন? তিনি বললেন, তোমরা কী আল্লাহ তা'আলার এ কথা শোননি। তিনি বলেছেন–

و أنْجينا الذين ينهَون عن السُّوء —

অর্থ : আর যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত আমি তাদের মুক্তি দিলাম।

সুতরাং মূলনীতি হল, যে অন্যায়-অশ্লীল কাজ দেখে নিরব থাকে সেও পাপী বলেই গণ্য হয়। আর আযাব আসলে সেও আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পায় না।

এ উম্মতের মহান আকাবিরদের অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা আছে। তারা সবকিছুকে উপেক্ষা করে, মৃত্যুর পরওয়া না করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় উপদেশ দিয়েছেন। অন্যায় কাজ থেকে বারণ করেছেন।

বর্ণিত আছে, একদা খলীফা ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেক তার প্রহরীকে বললেন, যাও দরজায় দাড়িয়ে থাক। কোন মুহাদ্দিস এদিক দিয়ে গেলে তাকে হাদীস বর্ণনা করার জন্য আমার নিকট নিয়ে আসবে।

প্রহরী দরজায় দাড়িয়ে রইল। বেশ সময় কেটে গেল। ইতোমধ্যে আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) সে পথ দিয়ে এলেন। প্রহরী তাকে চিনতে পারল না। তিনি কৃষ্ণ বর্ণের ছিলেন। নাক ছিল চ্যাপ্টা। তবে তিনি তার যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন।

কিছু সময় পর প্রহরী মনে করতে পারল, হায়! এতো বড় মুহাদ্দিস! তাই ছুটে গিয়ে বলল, হযরত আপনি আমীরুল মু'মিনীনের সাথে সাক্ষাৎ করুন। তিনি দেখা করতে বলেছেন।

আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) ওলীদের নিকট গেলেন। উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) তার নিকট বসা ছিলেন। আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) ওলীদের নিকটবর্তী হয়ে বললেন– السلامُ عليكَ يا وليدُ হে ওলীদ! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ওলীদ তখন প্রহরীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, নির্বোধ গাধা কোথাকার! আমি বলেছি, এমন একজন লোককে নিয়ে এসো যে আমার সাথে গল্প করবে, আমাকে আনন্দ দিবে আর তুমি

এমন এক লোককে নিয়ে এসেছো যে ঐ উপাধি নিয়েই ডাকে না যে উপাধি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। বরং আমাকে ওলীদ বলে ডাকে।

প্রহরী ভয়ে কম্পমান। বলল, মাফ চাই হে আমীরুল মু'মিনীন। ইনি ছাড়া আর কেউ তো এদিক দিয়ে যায়নি। তারপর আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) কে বললেন, বসুন, আমাকে হাদীস শুনান। আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন। প্রতিটি হাদীস বর্ণনা করে তিনি বলছিলেন–

بَلغنا أنَّ في جهنمَ واديًا يقالُ له هَبْهَبُ أعدَّه الله لكُلِّ إمامٍ جائرٍ في حكْمِه —

অর্থ : আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, জাহান্নামে একটি উপত্যকা আছে যাকে হাবহাব বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা তা প্রত্যেক ঐ শাসকের জন্য প্রস্তুত করেছেন, যে শাসন কার্যে জুলুম করে। অন্যায় অবিচার করে। ওলীদ তার কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তার কাঁধের উপর ঝাপিয়ে পড়ল।

এ অবস্থা দেখে উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) বললেন, তুমি তো আমীরুল মু'মিনীনকে মারাত্মক আঘাত করলে। এ কেমন কথা বলতে শুরু করলে? তখন আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ)-এর বাহু ধরে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দিলেন। বললেন–

يا عمر! إنَّ اللأمر جِدٌّ فَجِدٌّ

অর্থ : হে উমর নিশ্চয় বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। মারাত্মক কঠিন।

এরপর আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) দাঁড়ালেন এবং মজলিস ছেড়ে চলে গেলেন।

বর্ণিত আছে, হাতীত নামক এক তৈল বিক্রেতাকে একদা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নিকট আনা হল। হাজ্জাজ তার কক্ষে প্রবেশ করে বললেন, তুমি কি হাতীত? হাতীত বলল, হ্যাঁ.....আমি হাতীত। আপনার মনে কোন প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। আমি এখানে পৌঁছে আল্লাহর নিকট তিনটি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি সত্য বলব। আমি পরীক্ষার মুখোমুখি হলে ধৈর্যধারণ করব। আমাকে শাস্তি প্রদান করা হলে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব।

হাজ্জাজ বলল, আমার সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কী? হাতীত বলল, আমি বলছি, পৃথিবীতে আল্লাহর শত্রুদের তুমি একজন। হারাম কাজ নির্দ্বিধায় কর। সন্দেহ হলেই লোকদের হত্যা কর।

বলতে পার এই হাতীতের বয়স কত হবে? মাত্র আঠারো বছর। কিন্তু ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান তার হৃদয়। ঈমানে টগবগ করছিল তার অন্তর।

হাজ্জাজ বলল, আমীরুল মু'মিনীন আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কী?

হাতীত বলল, তার ব্যাপারে আমার অভিমত হল, সে তোমার চেয়ে আরো বেশী পাপী। আর তুমি তার পাপের চিহ্ন।

হাতীতের এ শক্ত ও কঠিন কথাগুলো হাজ্জাজ সহ্য করতে পারল না। গর্জন করে উঠল। বলল, তাকে শাস্তি দিতে থাক। শাস্তি দিতে দিতে যখন শাস্তির চূড়ান্ত স্তরে গিয়ে পৌঁছল তখন তার জন্য বাঁশ কাটা হল। তার মাংসের পেশীতে পেশীতে বাঁশের ফলা ঢুকানো হল। তারপর তাকে রশি দিয়ে বাঁধা হল। তারপর একেকটি শলা টানা হলো। ফলে তার শরীর থেকে গোশত ছিঁড়ে আসতে লাগল। এতো শাস্তি দেয়া হল। কিন্তু কেউ তার মুখ থেকে কোন প্রকার আওয়াজ শুনতে পেল না। তারপর হাজ্জাজকে বলা হল, সে এখন মরণোন্মুখ হয়ে পড়েছে।

হাজ্জাজ নির্দেশ দিল, তাকে নিয়ে বাজারে নিক্ষেপ কর। তাকে বাজারে নিক্ষেপ করা হলে তার দু'জন সাথী এসে জিজ্ঞেস করল, হে হাতীত! তোমার কী কোন কিছুর প্রয়োজন আছে? সে বলল, হ্যাঁ, একটু পানি চাই। পানি দেয়া হলে তা পান করে শহীদ হয়ে গেলেন।

আরেকটি ঘটনা বলছি। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমার চাচা মুহাম্মদ ইবনে আলী বলেন, একদা আমি আমীরুল মু'মিনীন আবু জা'ফর মনসুরের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে তখন ইবনে আবী যুয়াইব ও মদীনার শাসক হাসান ইবনে যিয়াদ উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন, তখন গিফারী বংশের কিছু লোক উপস্থিত হয়ে আবু জা'ফরের নিকট হাসান ইবনে যিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। হাসান বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এদের ব্যাপারে আপনি ইবনে আবী যুয়াইবকে জিজ্ঞেস করুন।

তখন আবু জা'ফর তাদের ব্যাপারে ইবনে আবী যুয়াইবকে জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, হে ইবনে আবী যুয়াইব! এদের ব্যাপারে তোমার মতামত কী?

ইবনে আবী যুয়াইব বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এরা মানুষের ইজ্জত-সম্মানে আঘাত করে। মানুষের গীবত করে বেড়ায়। সমালোচনা করে। বিনা কারণে মানুষদের কষ্ট দেয়।

আবু জা'ফর বললেন, তোমরা কি তাঁর কথা শুনলে? গিফারী বংশের লোকেরা বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তাকে হাসান ইবনে যিয়াদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন।

আবু জা'ফর মনসুর বললেন, হে আবী যুয়াইব! হাসান ইবনে যিয়াদ সম্পর্কে তোমার কী মত?

ইবনে আবী যুয়াইব বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি অন্যায় শাসন করেন। প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন। আবু জা'ফর বললেন, হে হাসান! তুমি তো শুনলে, ইবনে আবী যুয়াইব তোমার ব্যাপারে কী বললেন, আর তিনি তো সবার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

এবার হাসান ইবনে যিয়াদ বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। দেখুন তিনি কি বলেন।

আবু জা'ফর মনসুর বললেন, আচ্ছা আমার ব্যাপারে কি বলেন?

ইবনে আবী যুয়াইব বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন। আবু জা'ফর মনসুর বললেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে। ইবনে আবী যুয়াইব বললেন, আপনি আল্লাহর কসম দিয়ে বলেছেন। মনে হচ্ছে আপনি নিজেকে চিনেন না। নিজের সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেন না।

আবু জা'ফর আরো শক্ত হয়ে গেলেন। বললেন, আমি আবারো আল্লাহর শপথ করে বলছি, অবশ্যই তা বলতে হবে।

তখন ইবনে আবী যুয়াইব বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অন্যায়ভাবে সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছেন এবং অযোগ্য ব্যক্তিকে তা দিচ্ছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনার দরজায় প্রকাশ্যে জুলুম হচ্ছে। তখন আবু জা'ফর তার স্থান থেকে উঠে এলেন এবং ইবনে আবী যুয়াইবের ঘাড় চেপে ধরলেন।

ইবনে আবী যুয়াইব সাহস হারালেন না। বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আবু বকর ও উমর শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। তারা সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন। ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন করেছিলেন। তখন আবু জা'ফর মনসুর তাকে মুক্ত করে দিলেন। বললেন, আমি জানি, আপনি সত্যবাদী। তাই ছেড়ে দিলাম। অন্যথায় হত্যা করতাম।

আরেকটি ঘটনা বলছি, মালেক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু জা'ফর মনসুর আমার নিকট ও ইবনে তাউসের নিকট লোক পাঠাল। আমরা তার নিকট গেলাম। গিয়ে দেখি তরবারি হাতে জল্লাদ দাড়িয়ে আছে। আর জমিনে লম্বা চামড়া বিছানো আছে। তাতে শিরচ্ছেদ করা হয়। আমরা তাকে সালাম দিলাম। তারপর বসলাম। মনসুর বললেন, হে ইবনে তাউস! আমাকে উপদেশ দাও। তখন ইবনে তাউস কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তাতে জালিমদের জন্য হুঁশিয়ারি রয়েছে, শিক্ষা রয়েছে। মালেক (রহঃ) বলেন, আমি তখন আমার কাপড় গুটিয়ে নিলাম। আমার ভয় হচ্ছিল যে, তাকে হত্যা করা হবে আর তার রক্ত আমার কাপড়ে লাগবে।

তখন মনসুর কিছুক্ষণ শির নত করে রাখল। তারপর মাথা তুলে বলল, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তখন ইবনে তাউস কিছু হাদীস বর্ণনা করে শোনালেন তাতে তাদের জন্য হুঁশিয়ারি রয়েছে যারা মুসলমানদের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে অথচ তাদের কল্যাণ কামনা করে না।

মালেক ইবনে আনাস বলেন, আমি তখন তার রক্ত আমার শরীরে লেগে যাওয়ার ভয়ে আমার কাপড় গুটিয়ে নিলাম।

এদিকে আবু জা'ফর কিছুক্ষণ মাথা নত করে রাখল, তারপর বলল, হে তাউস! আমাকে ঐ দোয়াতটি দাও। কিন্তু ইবনে তাউস একটুও নড়াচড়া করলেন না। আবু জা'ফর আবার তাকে দোয়াতটি দেয়ার কথা বলল, কিন্তু ইবনে তাউস একটুও নড়াচড়া করলেন না। আবু জা'ফর আবার তাকে দোয়াতটি দেয়ার কথা বলল, কিন্তু ইবনে তাউস সাড়া দিলেন না।

আবু জাফর মনসুর বললেন, হে ইবনে তাউস। কেন কোন উত্তর দিচ্ছ না? ইবনে তাউস বললেন, আমার ভয় হচ্ছে তা দ্বারা কোন পাপ কাজের নির্দেশ দেয়া হবে। তাই আমি তাতে শরীক হতে চাচ্ছিনা।

এরপর মনসুর কিছুক্ষণ মাথা নত করে রইল। তারপর বলল, তোমরা চলে যাও।

ইবনে তাউস বললেন, দীর্ঘদিন যাবৎ আমি তাই চাচ্ছিলাম। মালেক (রহঃ) বলেন, সেদিন থেকে আমি ইবনে তাউসের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি অনুধাবন করলাম।

ত্রিংশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(৭১) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ (৭২) وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

অর্থ : মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা একে অপরের সহায়ক। তারা সৎকাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামাজ কায়েম করে। যাকাত প্রদান করে। আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ তাদের উপর দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য এমন কানুন-কুঞ্জের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পাদদেশ দিয়ে নহর মালা প্রবাহমান। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। কানন-কুঞ্জের মাঝে থাকবে উত্তম নিবাস। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হল সবচেয়ে বড় নেয়ামত। এটিই হল মহান সফলতা। (সূরা তওবা ঃ ৭১-৭২)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন পুরুষ ও নারী সম্পর্কে আলোচনা করছেন। মু'মিন কারা? যারা আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকাল, ভাল-মন্দ তাকদীরে বিশ্বাস করে তারা হল মু'মিন। এ ছয়টি বিষয়ে বিশ্বাসী মু'মিন পুরুষ ও নারীরা একে অপরের ওলী। ওলী (ولى) শব্দের অর্থ কি? যে সাহায্য করে, ভালবাসে; দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাকে ওলী বলা হয়। তাই ওলী হলে সাহায্য করতে হবে। ভালবাসতে হবে। বিপদে আপদে পাশে দাঁড়াতে হবে। এজন্য আল্লামা ইবনে কাইয়্যুম (রহঃ) বলেছেন– ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কারণে প্রত্যেক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানকে সাহায্য সহযোগিতা করা, তাকে অপমান না করা, তার দোষকে ঢেকে রাখা অবশ্য কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে যাকে সাহায্য করবে সে তোমার দলবদ্ধ কিনা তা দেখলে চলবে না। তোমার সাথে তার বন্ধুত্ব আছে কিনা তা দেখলে চলবে না। সুতরাং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবী, এক মু'মিন আরেক মু'মিনকে সাহায্য করবে। মহব্বত করবে। দোষ ঢেকে রাখবে। দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। এর জন্য সাহায্যের পূর্বচুক্তি থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

المسلمُ أخو المسلمِ لا يُسلمــه و لا يُخذلــه و لا يَظلمُــه —

অর্থ : মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তাকে শত্রুর নিকট সমর্পণ করবে না, তাকে লাঞ্ছিত করবেনা। তার উপর জুলুম করবে না।

অন্যত্র বলেন–

كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ دمُـه و عرضُه و مــاله و أن يَظُنَّ به إلا خيرًا —

অর্থ : মুসলমানের সবকিছু অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। তার রক্ত, তার ইজ্জত, তার সম্পদ আর তার সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখবে। সুতরাং মুসলমান যখন মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে তখন অবশ্যই একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে সে দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকুক।

আজ যদি তোমার ব্যবসায়িক পণ্যসামগ্রী সমুদ্রে থাকতো আর যদি জানতে জাহাজটি ডুবতে বসেছে, তাহলে নিশ্চয় তুমি জাহাজটি রক্ষার সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে। তোমার ব্যবসায়িক পণ্য রক্ষার জন্য সবকিছু করতে।

যদি তুমি জানতে, আমেরিকার জনৈক চিকিৎসক তোমার সমুদয় অর্থের বিনিময়ে তোমার অসুস্থ স্ত্রীকে রোগমুক্ত করতে পারবে, তাহলে নিশ্চয় তুমি তোমার সমুদয় সম্পদের বিনিময়ে তোমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে রক্ষা করতে। অথচ তুমি কিন্তু তোমার দীনের জন্য তা করতে পারছো না। এর কারণ, আল্লাহর দীনের চেয়ে তোমার ব্যবসায়িক পণ্য ও তোমার স্ত্রী তোমার নিকট অধিক মূল্যবান। অধিক দামী। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٢٤) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

অর্থ : বলুন, যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, আর তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ তা'আলা ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (সূরা তওবা ঃ ২৪)

আজ বিভিন্ন মুসলিম দেশে নিরপরাধ অসহায় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। মুসলমানদের কোন ব্যবসায়ী এগিয়ে এসে বলে না, আমি দু'জন আহত ব্যক্তিকে নিজ খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। আমি তিনজনের জিম্মা নিলাম। আমি এদের চোখের চিকিৎসার জিম্মা নিলাম। আমি এদের কৃত্রিম পা সংযোজনের দায়িত্ব নিলাম।

পক্ষান্তরে, যদি তার পাপাচারী ফাসেক ভাইয়ের, যে আল্লাহর দীনের উপর ঈমানও রাখেনা–কোন আঙ্গুল আক্রান্ত হত, তখন দেখতে তৎক্ষণাত তাকে বিমানে করে ইউরোপে নিয়ে যেত। এ ধরনের হাজারো ব্যক্তির চিকিৎসায় মিলিয়ন বিলিয়ন টাকা খরচ হচ্ছে যারা মুজাহিদদের হাতের আঙ্গুলেরও মর্যাদা রাখে না। উল্লিখিত আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– 'আল্লাহ তা'আলা ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।'

সুতরাং আমাদের ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে, কুরআনের ভাষ্যের আলোকে আমরা ফাসেক হয়ে গেলাম কি না? আমাদের প্রায় সবারই এ অবস্থা যে, আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিজন, ভাই বোন ও সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আল্লাহর দীনের উপর, আল্লাহর রাহে জিহাদের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। সুতরাং আমরা ফাসেক। আমরা পাপাচারী। আমরা অপরাধী। যদি তোমার ভাই পা কাটা থাকত। আর সে নড়াচড়া করতে না পারত। চলাফেরা করতে না পারত। অথবা পিঠে হাড়ে সমস্যার কারণে বা প্যারালাইসিস হয়ে ঘরে পড়ে থাকত। তাহলে কি তুমি এই বলে তার চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে যে সে ফাসেক? ফাসেকের চিকিৎসায় তুমি অর্থ ব্যয় করতে রাজি নও? নিশ্চয় তুমি তা করতে না। সে যত বড় ফাসেক ও পাপী হোক না কেন। সে কমিউনিষ্ট বাহিনীর সেনাপতি হলেও তুমি তা করতে না। অথচ আল্লাহর পথে লড়াই করে যে অঙ্গ হারাল। তার চিকিৎসার ব্যাপারটি উত্থাপিত হলেই ঠুনকো কারণ তুলে ধরে তা থেকে বিরত থাক।

নির্দ্বিধায় বলে ফেল, এ ধরনের আহত ব্যক্তি অনেক। আমি কয়জনের চিকিৎসা করব? অথবা আরেকটু বাড়িয়ে হয়তো বলবে, এরা তো চিকিৎসা পাওয়ার যোগ্য নয়। এরা ফজরের নামাযে বাড়াবাড়ি করে। অথবা বলবে, দেখ এখনো তারা শিরক থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এখনো গলায় তাবিজ ঝুলছে। সুতরাং কিভাবে

এদের সাহায্য করতে পারি? এ ধরনের আচরণ কেন সম্ভব হচ্ছে? কারণ, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবী আমাদের নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ। একেবারে নগণ্য। ঈমানী মহব্বত আমাদের মাঝে নেই বললেই চলে।

যদি প্রত্যেক আরব ছাত্র, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসররা যারা তাদের গ্রীষ্মকালীন ছুটি বিভিন্ন দেশে ঘুরে ফিরে আনন্দ উল্লাসে কাটায়, তাদের অনেকেই তুরস্কে চলে যায়। কারণ, সেখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা তখন শীতল থাকে। উন্নত খাবারও প্রচুর পাওয়া যায়। তিন মাস সেখানে কাটিয়ে দেয়। আমরা পাশ্চাত্য থেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার তা'লিমই পেয়েছি। ধ্বংসাত্মক একাকী জীবন পন্থাকেই আমরা বেছে নিয়েছি। সারাদিন ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী করছি। আর বলছি তোমার পকেট তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এটা হল কৃপণ আর কঞ্জুসদের দর্শন। এ দর্শনের কারণেই আমাদের সোনালী গৌরবময় জীবন থেকে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের নির্মল বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ○

অর্থ : মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা একে অপরের সহায়ক। তারা সৎকাজে আদেশ করে ও অসৎ অন্যায় কাজ থেকে বারণ করে।

হ্যাঁ, সৎকাজের আদেশ অবশ্যই করতে হবে। আর অসৎ কাজ থেকে অবশ্যই বারণ করতে হবে। এটা সামাজিক জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। সত্যি করে বলছি, যদি মুসলমানরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের বিষয়টি আফগান সমস্যার ক্ষেত্রে করত যা আরব দেশগুলোর মাঝে কোন অশান্তি সৃষ্টি করছে না; যা তাদের সিংহাসনের জন্য কোন আশঙ্কা সৃষ্টি করে না; বরং তা তাদের রাজ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। কারণ, আফগান যুদ্ধই হলো কমিউনিস্টদের অগ্রযাত্রার শেষ বাঁধা। শেষ প্রাচীর। যদি এ প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ে তাহলে তা আরব উপসাগরে গিয়ে পৌঁছবে। কেউ তাদের রোধ করতে পারবে না। একদিনেই তারা আরব উপসাগর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে।

আল্লাহর শপথ করে বলছি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী মুসলমানদের উচিৎ আফগান রণাঙ্গনে ট্যাংক, কামান, যুদ্ধ বিমান ইত্যাদি পাঠানো। এরা এসব কিছু খুব সহজেই আঞ্জাম দিতে পারে। কিন্তু মুসলিম জনতার পক্ষ থেকে তাদের উপর কোন চাপ নেই। দায়িত্বশীলরাও এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ফিকির করছে না।

ইরাকের কথা চিন্তা কর। পাঁচজন ইরাকী যুবক গোপনে আফগান জিহাদের জন্য যুবকদের তৈরী করছিল। শেষে তাদের ফাঁসি দিয়ে দিল। একেবারে ফাঁসি দিয়ে দিল। তাদের অপরাধ তারা আফগান জিহাদের জন্য জনমত গড়ে তুলছে। তাই আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে। তবে এ কাজের জন্য কিছু বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রথমত ইখলাস।

এ বিষয়টি বুঝতে হলে শয়তান আর আবেদের ঘটনাটিই যথেষ্ট। এক গ্রামে এক গাছ ছিল। লোকেরা বরকতের জন্য সেই গাছের নিকট নজরানা পেশ করত। এক আবেদ ব্যক্তি এ অবস্থা দেখে ক্ষেপে গেল। সে একটি কুঠার নিয়ে সেই গাছটি কাটতে গেল। পথে শয়তান এসে তার সামনে দাঁড়াল। বলল, কোথায় যাচ্ছো? আবেদ বলল, আমি ঐ বৃক্ষটি কাটতে যাচ্ছি। শয়তান বলল, না, তুমি তা কাটতে পারবে না। আবেদ বলল, অবশ্যই আমি তা কাটব। এরপর দু'জন দ্বন্দ্বে লিপ্ত হল। একেবারে মল্লযুদ্ধে লেগে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শয়তান পরাভূত হয়ে গেল।

শয়তান তখন বলল, আচ্ছা আমরা একটা সমঝোতায় আসি। আমি তোমাকে প্রত্যেক দিন একটি করে দিনার দিব। তুমি তা গরীব মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করে দিবে। তুমি তা তোমার বালিশের তলায় পাবে। এর বিনিময়ে তুমি গাছ কাটবে না। আবেদ বলল, ঠিক আছে। তাই হবে।

প্রথম দিন সত্যই তার বালিশের তলে একটি দিনার পেল। দ্বিতীয় দিনও বালিশের তলে একটি দিনার পেল। কিন্তু তৃতীয় দিন ফাঁকা। কিছুই খুঁজে পেল না।

এবার আবেদ রাগে গজগজ করতে করতে কুঠার নিয়ে সেই বৃক্ষের দিকে ছুটতে লাগল। তখন শয়তান এসে সামনে দাঁড়াল। বলল, কোথায় যাচ্ছো? আবেদ বলল, আমি সেই গাছটি কাটতে যাচ্ছি। শয়তানের কণ্ঠে এবার দারুণ দৃঢ়তা। বলল, না, তুমি কিছুতেই তা কাটতে পারবে না। তর্ক বিতর্কের এক পর্যায়ে তারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হল। কিন্তু এবার শয়তানের শরীরে প্রচুর শক্তি। সে আবেদকে চোখের পলকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর বলল, প্রথমে তুমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গাছটি কাটতে যাচ্ছিলে। তাই তোমার সাথে আল্লাহর রহমত ছিল। সন্তুষ্টি ছিল। তুমি ছিলে শক্তিশালী। আর এবার তুমি তোমার নফসের তাড়নায় যাচ্ছো। দিনার পাওনি বলে যাচ্ছো। তাই এবার আমি তোমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী। তুমি কিছুতেই আর আমার সাথে পারবে না।

সুতরাং সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। ইখলাসের সাথে হতে হবে। ইখলাস ছাড়া কোন কাজ আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয় না। মকবুল হয় না।

দ্বিতীয় শর্ত হল, আমর বিল মা'রুফকে অর্থাৎ সৎকাজে আহবানকারীকে অবশ্যই তার কৃতকর্মের বিধান সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। ফকীহদের ইখতেলাফ সম্পর্কেও অবহিত হতে হবে।

যদি কোন ব্যক্তি তুমি যে ফকীহের অনুসরণ করছো তাঁর অনুসরণ না করে অন্য কোন ফকীহের অনুসরণ করে, তাহলে তুমি তাকে বাঁধা দিতে পার না। এ ব্যাপারে উম্মত একমত। যেমন তুমি হয়তো কোন ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে দেখলে তখন তুমি তাকে কড়া ভাষায় একথা বলতে পারবে না, বস বস.... অথবা দাঁড়িয়ে পান করতে দেখে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলতে পারবে না, এই মিয়া! বসে পান কর। তাহলে হয়তো হিতে বিপরীত হতে পারে। হয়তো সে বলবে, কেন? কী হয়েছে? তুমি হয়তো বলবে, ভাই তুমি মুসলমান হলে দাঁড়িয়ে যা পান করছো তা বমি করে দাও। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ شَرِبَ قَائِمًا فَلْيَسْتَقِئْ —

অর্থ : যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পান করবে সে যেন তা বমি করে ফেলে দেয়।

বেশ ভাই! তুমি ভাল করেছো। তবে এসো, তোমার একটু লেখাপড়া করতে হবে। তোমার আগে হাদীসের মর্ম যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে। জানতে হবে, দাঁড়িয়ে পান করা কী হারাম, না মাকরুহে তাহরীমী? খুব বেশী হলে তা মাকরুহে তানজীহী হবে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী এ কথাই বলেছেন– হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) এর কাজ দেখলে তো বিস্মিত হবে। একদা আলী (রাঃ) কুফায় দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পান করছিলেন আর বলছিলেন, কিছু মানুষ আছে তারা দাঁড়িয়ে পান করতে কড়াভাবে নিষেধ করে। তাই আমি তাদের বিরোধিতা করার জন্য তা করছি। আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখেছি। তাই আমি রাসূলের কাজ অনুযায়ী আমল করছি।

তাই আমর বিল মা'রুফ করার আগে আমাকে জানতে হবে, আমি কী আমল করতে যাচ্ছি। ইসলামী শরী'আতে তার কি বিধান আছে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি সেই কুর্দীর মত আচরণ করো না- একদা রাস্তায় এক কুর্দীর সাথে এক খৃস্টানের দেখা হল। কুর্দী খৃস্টানকে বলল, এসো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর। খৃস্টান বলল, বেশ ভাল কথা। তাহলে এসো আগে আমরা তর্কালোচনায় লিপ্ত হই। কিন্তু কুর্দী কোন কথা শুনতে নারাজ। বলল, মুসলমান হও। আর তা না হলে কিন্তু আমি তোমাকে যবাহ করে ফেলব। খৃস্টান বলল, বেশ ভাল কথা। পথে দাঁড়িয়ে কেন? এসো আগে বাড়িতে যাই তারপর যা হবার তা হবে। কিন্তু একগুঁয়ে কুর্দী এতো কিছু শুনতে রাজি নয়। সে বলল, মুসলমান হও, অন্যথায় তোমাকে মেরে ফেলব। তখন খৃস্টান ব্যক্তিটি বলল, আচ্ছা তাহলে আমি মুসলমান হবো। এখন আমার কী করতে হবে? এবার সেই কুর্দীর অবস্থা লাচার। কাচুমাচু করে বলল, আরে ভাই! আমি তো তা জানি না।

তাই হেকমতের সাথে আমর বিল মা'রুফের কাজ করতে হবে। কঠোরতার সাথে করলে হবে না। কারণ যে ব্যক্তি অন্যায় বা খারাপ কাজ করছে সে অসুস্থ। আর তুমি চাচ্ছো, তার চিকিৎসা করতে। তাই সদাচরণের মাধ্যমে, উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে, দয়া ও মহব্বতের সাথে তার চিকিৎসা করতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে কি কেউ কখনো মেরে চিকিৎসা করে? দুর্ব্যবহার করে চিকিৎসা করে? নিশ্চয়ই তা করে না। তাহলে তোমারও তা পরিহার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ○

অর্থ : তুমি তোমার রবের দিকে হেকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দাও। (সূরা নাহল ঃ ১২৫)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন–

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ○

অর্থ : আর যদি আপনি রুঢ় ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন। এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

একবার ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ তা'আলা কাকে এ হুকুম দিচ্ছেন? তাঁর নির্বাচিত রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন। একদা এক ব্যক্তি খলীফা হারুন অর রশীদের নিকট গিয়ে বলল, আমি আপনাকে উপদেশ দিতে এসেছি। আমি কিন্তু আপনার সাথে কঠিন আচরণ করব। খলীফা হারুন অর রশীদ বললেন, না, তুমি তা করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমার চেয়ে অনেক উত্তম মানুষকে আমার চেয়ে অনেক খারাপ মানুষের নিকট পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ মূসা (আ.) কে পাঠিয়েছেন যিনি তোমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ, ফেরআউনের নিকট যে আমার চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। তারপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে বলেছেন–

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ○

অর্থ : তার সাথে কোমল কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা আল্লাহকে ভয় করবে।

(সূরা ত্বহা ঃ ৪৪)

তবে সব মানুষের দৃষ্টিতে কিন্তু তুমি সমান মর্যাদা পাবে না। অনেকে তোমাকে পছন্দ করবে না। তোমার কথা তাদের নিকট ভাল লাগবে না। তবে তোমার সফলতার জন্য মু'মিনের ছিফাত আনতে হবে। প্রকৃত মু'মিন হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ○

অর্থ : তারা মু'মিনদের প্রতি বিনয়-নম্র আর কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ○

অর্থ : তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মাঝে পরম সহানুভূতিশীল। (সূরা ফাতহ ঃ ২৯)

এক মুজাহিদ ভাই একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এক যুবক এক বর্ষিয়ান সম্মানী ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে রুঢ় আচরণ করছিল। তখন সেই বর্ষিয়ান ব্যক্তিটি বিস্মিত হয়ে বলল, সুবহানাল্লাহ! এটা কেমন আচরণ! আমরা তো বাথ পার্টির কাউকে উপদেশ দিতে চাইলে তার সাথে সুন্দর কোমল ভাষায় কথা বলতাম। তাদের অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কথা বলতাম না। তা পরিহার করে চলতাম। আর এরা কেমন দাঈ হল। মর্যাদাবান সম্মানী বর্ষিয়ান ব্যক্তিদের সাথে এরা কেমন আচরণ করে? এরা কি কুরআনে কারীমে পড়েনি-

ولو كُنتَ فظًّا غليظَ القلبِ لانفَضُّوا من حولك যদি অহংকারী প্রতাপশালী জালিম ব্যক্তি হয় তবে অবশ্য তার সাথে কঠোর আচরণ করতে হবে। তার অহংকারকে অহংকার দিয়েই প্রতিহত করতে হবে। কারণ নরম কোমল আচরণ তাদের কোন উপকার করবে না। কিছু কিছু জালিম তো এমন যে, তাদের সাথে ভাল আচরণ করলে তাদের জুলুমের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। তাদের ঔদ্বত্য উষ্ণ হয়ে উঠে। তাই তুমি যদি এমন ব্যক্তির মুখোমুখি হও যে মানুষের ইজ্জত নিয়ে খেলে, মানুষের সম্পদ ছিনিয়ে আনে, ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করে তাহলে তার অহংকারের মুকাবিলা তোমাকে অহংকার দিয়েই করতে হবে। তাহলেই তুমি তাদের বশে আনতে পারবে।

এক্ষেত্রে এ যুগের আদর্শ হয়ে থাকবেন যয়নাব গাজালী। আমি এ মহিলার আত্মমর্যাদাবোধকে সম্মান করি। বিস্মিত হই তার সাহসিকতা ও আল্লাহর উপর নির্ভরতা দেখে। তাঁকে একদা আদালতে পেশ করা হল। তার স্বামী ছিল মিশরের এক মিলিয়নিয়ার। নাম সালেম। ফুয়াদ রোডে তাঁর এক বিশাল এ্যাপার্টমেন্ট ছিল। যয়নাব গাজালী মুসলিম নারীদের নিয়ে একটি সংগঠন করেছিলেন। তাই মুসলিম নারীরা তার বাড়িতে সমবেত হত। দীনী মাহফিল হত। ধর্মের আলোচনা হত।

মিশর সরকার তা সহ্য করল না। তাকে গ্রেফতার করল। তার স্বামীর বিষয় সম্পত্তি সব তছনছ করে দিল। তার সকল সম্পদ, সকল ফ্যাক্টরী ও প্রতিষ্ঠান সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল। মিলিয়নিয়ার একেবারে কপর্দকশূন্য হয়ে গেল।

কোর্টে যয়নব গাজালীর স্বজনরা আইনজীবী নিয়োগ করল। বিচারকের নিকট আইনজীবী বলল, ওরা বলে তিনি নাকি তার ব্যাগে বিস্ফোরক বহন করে নিয়ে যেতেন। আইনজীবী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলল, এই ভদ্রমহিলা তার ভ্যানিটি ব্যাগে লিপস্টিক আর আইভ্রু বহন করতেন। কিভাবে সম্ভব একটি ভ্যানিটি ব্যাগে করে বোমা নিয়ে যাওয়া!

আইনজীবীর কথা শুনে যয়নব গাজালী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, হে ভদ্রলোক! তুমি মূক হয়ে যাও। গাধা! তুমি একি বললে, যয়নব গাজালী বুঝি তার ব্যাগে করে লিপস্টিক আর আইভ্রু বহন করবে? কে এ গর্দভকে আমার আইনজীবী নিয়োগ দিয়েছে? তুমি বেরিয়ে যাও। তোমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই আমার মামলা পরিচালনা করব। আমি সবকিছুর উত্তর দিব।

প্রতিপক্ষ বলল, আপনি কি প্রেসিডেন্ট আব্দুন নাসেরকে আবু জাহেল বলেছেন? যয়নব গাজালী বললেন, হ্যাঁ, আমিই বলেছি। তবে আমি তাকে আবু জাহেল বলে স্বস্তি পাচ্ছি না। বরং সে তো আবুল আজহাল। অর্থাৎ চরম মূর্খ ব্যক্তি।

প্রতিপক্ষ বলল, আপনি কি তাকে আরো অনেক নামে বিশেষায়িত করেছেন? তখন আব্দুন নাসের ছিল মিশরের অত্যন্ত প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট। তার ভয়ে সবাই কাঁপত। সেই আব্দুন নাসের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তাকে আরো কিছু নামে অভিহিত করেছি। আমি তাকে যুবাযা অর্থাৎ মাছি নামেও অভিহিত করেছি। তবে আমি তা প্রত্যাহার করে নিয়েছি। কারণ, সহীহ হাদীসে আমি পেয়েছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– মাছির এক ডানায় রোগ থাকে আরেক ডানায় তার আরোগ্য থাকে। তাই আমি ভেবে দেখেছি, সে সেই নামেরও যোগ্য নয়। বাঁদী বলল, তাহলে কি তার অন্য কোন নাম রেখেছেন? যয়নব গাজালী বললেন, হ্যাঁ, তার নাম দিয়েছি خيال المآتم অর্থ বাগানের প্রহরী। যার হাতে থাকে লাঠি। গায়ে থাকে স্বতন্ত্র পোষাক। পশুপক্ষীকে তাড়ানো তার কাজ। ফলমূল আর ফসল হেফাজত করা তার দায়িত্ব।

বাঁদী বলল, চল্লিশ মিলিয়নে তার লাঠি ঘুরে। যয়নব গাজালী বললেন, তার লাঠি রাষ্ট্রের বাইরে থেকে ঘুরানো হয়। আল্লাহু আকবার। ভেবে দেখেছো, সেই নারীর ঈমানী শক্তির কথা। অহংকারীর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দেয়ার দুঃসাহসিকতা। এরপর বাঁদী তার ফাঁসি দাবি করল। রায় হল যে, যয়নব গাজালীকে

২৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। সেদিন তিনি আল্লাহু আকবার বলে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, ইসলামের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখার জন্য, তাওহীদের পতাকাকে উড্ডীন করার জন্য এই সামান্য শাস্তি! আল্লাহু আকবার। তারপর আদালতে এক অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিলেন।

আর সাইয়েদ কুতুব তার ফাঁসির আদেশ শুনে বললেন–

الحمدُ لله لقدْ جاهَدتُ خمسةَ عشرَ عامًا للوصولِ إلى هذه النتيجة و هيَ الشَّهادةُ ـــ

অর্থ : আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘ পনের বৎসর এই ফলাফলে পৌঁছার জন্য অনেক মেহনত মুজাহাদা করেছি। আর তা হল আল্লাহর পথে শাহাদাত।

যেদিন যয়নব গাজালী মুক্ত হলেন, সেদিন জেল গেটে ক্যামেরাম্যানদের ভিড় জমে গেল। তারা তাঁর ছবি নিতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কিন্তু যয়নব গাজালী তাদের এ অবস্থা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাদের ক্যামেরা ভাঙ্গতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন–

يا آكلِيَن على كلِّ مائدةٍ... يا عابدي كلِّ طاغوتٍ ... يا منْ تعيشونَ تحت أقدامِ الظلامِ ، استحيُوا على أنفسِكم ـــ

অর্থ : হে দস্তরখানের নির্লজ্জ মেহমানেরা! হে তাগুতের পূজারীরা! হে অন্ধকারে বসবাসকারী জীবেরা! তোমরা লজ্জিত হও।

কিন্তু পুলিশ তাকে প্রতিহত করল ও প্রিজন ভ্যানে করে নিয়ে গেল।

যয়নব গাজালীর জীবনে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। সত্যই তা শুনলে অভিভূত হতে হয়। একদা গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান তাকে বলল, আমাদের কিছু উপদেশ দিন। যয়নব গাজালী বললেন, তাহলে আমি তোমাকে বলছি, ঐ যে তোমার চেয়ারটা যাতে তুমি বস, তা ত্যাগ কর। সোজা তোমার বাড়িতে চলে যাও।

সুবহানাল্লাহ! তারা তাঁকে কতো ভয় করত। অথচ তিনি একজন নারী। গোয়েন্দা প্রধান তার সামনে বসতে লজ্জা পেত। অথচ তারাই তাকে শাস্তির নির্দেশ দিত। তার বিরুদ্ধে হুকুম জারি করত। কিন্তু যয়নব গাজালীর সামনে তারা বসতেও ভয় পেত। লজ্জায় মাথা নত করে রাখত।

এ ধরনের আরেকজন নির্ভীক ব্যক্তির কথা না বলে পারছি না। তিনি হলেন শাইখ মারওয়ান হাদীদ। তিনি মিশরের গোয়েন্দাদের হয়রান পেরেশান করে ছেড়েছেন। একজন গোয়েন্দা তো রাতদিন তার পিছু লেগে থাকত। তিনি কোথাও গেলে তার পিছু পিছু যেত। সবারই জানা আছে যে, মিশরে বাসে চড়া কতো কঠিন ব্যাপার। ভিড়ের কারণে প্রায়ই বাদুরের মত ঝুলে ঝুলে যেতে হয়। দৌড়ে ধাক্কাধাক্কি করে উঠতে হয়। তাই মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয়ে যেত যে, শাইখ মারওয়ান হাদীদ ধাক্কাধাক্কিতে বাসে উঠতে না পারলে গোয়েন্দা ব্যক্তিটি তাকে টেনে তুলে নিত। অথবা বলত, এ বাসে করে যেতে পারবেন না। পরের বাসে যেতে হবে। তারপর পরের বাসে যেতেন। শাইখ মারওয়ান হাদীদ ভাড়া দেয়ার সময় বলতেন, আমার ভাড়া নাও আর ঐ গোয়েন্দা ব্যক্তিটির ভাড়া নাও। বাসের যাত্রীদের সামনেই তিনি তার দিকে ইঙ্গিত করে তা বলতেন। একটুও ভয় পেতেন না।

শাইখ মারওয়ান হাদীদ সিরিয়ায় চলে এলেন। আব্দুন নাসের এক রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামে সিরিয়ায় এল। সিরিয়া তাকে বিজয়ী বাহাদুরের মর্যাদায় অভ্যর্থনা জানাল। সে ছিল এক জমকালো অনুষ্ঠান। শাইখ মারওয়ান নাসেরের পাশে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আব্দুন নাসেরের গাড়িটি জনতার ভিড়ের মাঝে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। গাড়ি আসতে আসতে শাইখ মারওয়ান হাদীদের নিকট পৌঁছলে তিনি নাসেরকে বললেন, অভিশপ্ত, তোর বংশও তোকে অভিশাপ দেয়। আব্দুন নাসের ক্রোধে ভরা দৃষ্টি তুলে তাকাল। তারপর তার গাড়িটি জনতার মাঝে হারিয়ে গেল। পরের দিন কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ হল। তারা ধারণা করেছিল, শাইখ মারওয়ান একজন কমিউনিস্ট। কারণ, কমিউনিস্টদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নেয়ার কারণে তারা তখন যা তা বলছিল।

১৯৬৪ সালের কথা। আল বাথ পার্টি ও শিয়াদের কট্টরপন্থী নুসাইরীরা একাত্মতা ঘোষণা করল এবং ইসলামের উপর আক্রমণ শুরু করল। দামেস্ক রেডিও থেকে প্রায়ই সম্প্রচার করা হত–

آمنتُ بالبَعثِ ربًّا لا شريكَ له وبالعَروبةِ دينًا ما لــه ثَانِي

আমি বাথপার্টির উপর ঈমান আনলাম। এ পার্টি আমার রব। তার কোন শরীক নেই। আর আরব হওয়াকে আমি আমার ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে নিলাম যার দ্বিতীয় বলতে কিছু নেই। শাইখ মারওয়ান হাদীদ এ সব কিছু দেখছিলেন আর ছটফট করছিলেন। তিনি তখন সিরিয়ার হামা শহরে ছিলেন। তখন হামা শহরের এক স্কুলে এক ঘটনা ঘটল। স্কুলের এক ক্লাসে এক শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে ইসলামের শত্রুতামূলক বাক্য লিখল। সে শিক্ষক বাথপার্টি করত বা নুসাইরী ছিল। এর প্রতিবাদে তখন একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে গেল। বাকবিতণ্ডা হল। পরে ক্ষিপ্ত হয়ে ছাত্রটি শিক্ষককে মারতে শুরু করল। অন্যান্য ছাত্ররাও এসে যোগ দিল। ফলে সেখানেই তার মৃত্যু হল। পুলিশ এল। তারা সেই ছাত্রটিকে ধরে হত্যা করল।

শাইখ মারওয়ান তা সহ্য করতে পারলেন না। সোজা চলে গেলেন মসজিদ-ই সুলতানে। ঘোষণা করলেন, আমরা সেই পুলিশ অফিসারকে চাই। তাকে হত্যা করব। লোকেরা বলল, হত্যার বদলে হত্যা হয়েছে। সুতরাং বিচার তো হয়েই গেছে। এরপর আর কী করার আছে? তিনি বললেন, না, সেই শিক্ষক তো মুরতাদ। তাকে হত্যা করা বৈধ। আর এই ছাত্রটি তো মুসলমান। সুতরাং তাকে হত্যা করার কারণে পুলিশ অফিসারকে হত্যা করতে হবে। উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে লাগল। এদিকে রাষ্ট্রীয় শক্তি এগিয়ে এল। চারদিক থেকে ট্যাংক এল। ঘিরে ফেলল মসজিদ। অবশেষে কর্মকর্তারা বলল, আচ্ছা, আমরা পুলিশ অফিসারকে অর্পণ করব। এবার শাইখ মারওয়ান বললেন, এতটুকুতেই হবে না। তোমাদের ইসলামী বিধান মোতাবেক রাজ্য পরিচালনা করতে হবে। তারা তার এ দাবী প্রত্যাখ্যান করল। মসজিদ লক্ষ্য করে কামানের গোলা ছুড়তে লাগল। আর শাইখ মারওয়ান ও তার সঙ্গীরাও বোমা ছুড়তে লাগল। গুলী করতে লাগল। এরা সবাই ছিল ছাত্র। তবে ঈমানী বলে তারা বলিয়ান ছিল। কামানের আঘাতে আঘাতে মিনারসহ মসজিদ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল।

হামার প্রত্যক্ষদর্শী অধিবাসীরা আমাকে বলেছে, এ মর্মবিদারক ঘটনার কিছুদিন পর আমরা আমাদের শহীদ সন্তানদের লাশের তালাশে বিধ্বস্ত মসজিদের ভগ্ন দেয়াল ও ইট পাথর সরাচ্ছিলাম। তখন আমরা তার ভিতর থেকে তাকবীরের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তোমরা বিশ্বাস কর, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তা হামার অধিবাসীদের থেকেই শুনেছি। যা হোক আল্লাহর ফায়সালা মোতাবিক শাইখ মারওয়ান হাদীদ বেঁচে রইলেন। তাকে দামেস্কের কোর্টে উপস্থিত করা হল। প্রধান বিচারপতি ছিল এক নুসাইরী শিয়া। নাম সালাহ জাদীদ। কট্টরপন্থী নুসাইরী। সেই হাফেজ আসাদের ক্ষমতায় আসার পথ তৈরী করেছে। সেই সেনাবাহিনীর নুসাইরী সদস্যদের পরিচালনা করত। আরেকজন ছিল মুস্তফা তল্লাস। সে ছিল এক সেনা অফিসার। বলা হয় সে সুন্নী মুসলমান ছিল। আদালতে শাইখ মারওয়ান সালাহ জাদীদ নুসাইরীকে বললেন, তুমি তো সশস্ত্র বাহিনীকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছো। সালাহ জাদীদ বলল, কীভাবে? শাইখ বললেন, এক নুসাইরী কুকুর আছে, নাম সালাহ জাদীদ। আরেকজন কুকুর আছে তাকে লোকেরা সুন্নী বলে। নাম মুস্তফা তল্লাস। এরা ইসলামকে দেশ থেকে মুছে ফেলতে চাচ্ছে। আমরা তা মেনে নিতে পারি না।

তখন আদালত প্রাঙ্গনেই বিপ্লবী বাহিনীর সদস্যরা শাইখ মারওয়ানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু আদালত প্রাঙ্গণে বিদেশী সাংবাদিকরা ছিল। তারা এগিয়ে এসে বাঁধা দিল। বলল, এটা ব্যক্তি স্বাধীনতার খেলাফ। আদালতে তাকে সব কিছু বলার সুযোগ দিতেই হবে। বিচারপতি সালাহ জাদীদ নুসাইরী বলল, আপনি তো এজেন্ট। শাইখ মারওয়ান হাদীদ বললেন, হ্যাঁ, আমি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এজেন্ট। কিন্তু তোমার দলের প্রধান কার এজেন্ট তা কি জান? সে হল মিখাইল আফলাকের এজেন্ট। সে আব্দুন নাসের থেকে নিরানব্বই হাজার জুনাইহা নিয়েছে। সালাহ জাদীদ বলল, তোমরা বলে থাক, মুহাম্মদ হামেদ তোমাদের

সাথে আছে। কিন্তু তা কি জান, তিনি তোমাদের ঘৃণা করেন, তোমাদের মহব্বত করেন না। তখন শাইখ মারওয়ান হাদীদ বললেন, তাতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

অর্থ : যদি তারা বিমুখ হয়ে যায় তাহলে আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি তার উপরই ভরসা করলাম। আর তিনি আরশে আজীমের অধিপতি। (সূরা তওবা ঃ ১২৯)

আদালত তাঁকে ও তার সঙ্গী কয়েকজন যুবককে ফাঁসির হুকুম দিল। যাদের ফাঁসির হুকুম দিল তারা আনন্দে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাতে লাগল। আর কয়েকজনকে মুক্তির হুকুম দিল। যারা মুক্তির হুকুম পেল তারা কাঁদতে লাগল। অন্যান্য দেশের সাংবাদিকরা তো এ কাণ্ডে হতবাক। এ হাসি আর কান্নার কোন রহস্য তারা খুঁজে পেল না। জিজ্ঞেস করল, এরা কাঁদছে আর এরা হাসছে কেন?

লোকেরা বলল, হাসার কারণ হল এদের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। আর ফাঁসি কার্যকরী হওয়ার পরপরই তারা জান্নাতে চলে যাবে। আর এরা মুক্তি পাওয়ার কারণে জান্নাতে যেতে পারছে না। তাই তারা কাঁদছে। শাইখ মারওয়ান হাদীদ আমাকে নিজে বলেছেন– আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দদায়ক ছিল ঐ দিনগুলো, যখন আমি ফাঁসি কার্যকরী হওয়ার প্রত্যাশায় ছিলাম। আমরা অনুভব করতাম, আমরা যেন পরকালে জান্নাতে আছি। তিনি তখন ছোট্ট একটি ছন্দ আবৃত্তি করতেন আর তার সাথে অন্যরাও তা আবৃত্তি করত। ছন্দটি হল–

الروحُ ستُشرقُ من غدِها   و ستَلقَى الله بموعدِهـــا

অর্থ : আগামীকাল তো রুহ আলোকময় হয়ে যাবে। নির্ধারিত সময়েই তা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। অবস্থা যখন এই ঠিক তখন এগিয়ে এলেন শাইখ মুহাম্মদ আল হামেদ। তিনি প্রেসিডেন্ট আমীন আল হাফেজের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাকে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, একী করছেন? আপনি মারওয়ান হাদীদকে হত্যা করতে চাচ্ছেন? আপনি কি মনে করেন হামার অধিবাসীরা নিরবে থাকবে? দেখবেন, তারা দাঁড়ালে আর বসবে না।

একত্রিংশ মজলিস

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٩١) لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (٩٢) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا
أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ○ (٩٣) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

অর্থ : দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অক্ষম লোকদের কোন অপরাধ নেই, যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়। সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের উপর কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আর তাদের উপরও কোন অভিযোগ নেই যারা আপনার নিকট এসেছে যেন আপনি তাদের বাহন প্রদান করেন, আর আপনি বলে দিয়েছেন, আমার নিকট কোন বাহন নেই যার উপর আমি তোমাদের সওয়ার করাব। তখন তারা ফিরে গেছে আর এ দুঃখে তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল যে তারা খরচ করার মত কিছুই পাচ্ছে না। আর নিশ্চয় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যারা আপনার নিকট অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা সম্পদশালী। পশ্চাতে অবস্থানকারীদের সাথে থাকতে যারা পছন্দ করে। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। তাই তারা জানে না। (সূরা তওবা ঃ ৯১-৯৩)

আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার উক্ত আয়াতগুলোতে জিহাদের হুকুম ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিধান আলোচনা করেছেন। কারা জিহাদে না গেলে পাপী হবে না আর কাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। জিহাদে না যাওয়ার কারণে কাকে আল্লাহর নিকট জওয়াব দিতে হবে আর কার দিতে হবে না। এ বিষয়গুলোর বিধানের কথা আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– দুর্বল, রুগ্ন ও ব্যয়ভারে অক্ষম লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে তারা অপরাধী হবে না। তবে শর্ত হল তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হতে হবে। অর্থাৎ তারা মুজাহিদদের মহব্বত করবে। সর্বদা তাদের কল্যাণ কামনা করবে। তাদের ব্যাপারে উত্তম কথা বলবে। মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে তাদের পরিবার পরিজনের কল্যাণ কামনা করবে। তাদের সাহায্য সহযোগিতা করবে। অন্য কিছু করতে না পারলেও তাদের ব্যাপারে ভাল ও কল্যাণময় কথা বলবে। কবি বলেন–

لا خيلَ تُهديها و لا مالُ فليَسعد النطق إن لم تَسعدِ الحالُ

অর্থ : তোমার নিকট কোন ঘোড়া নেই, কোন সম্পদ নেই যে যা তুমি উপঢৌকন স্বরুপ প্রদান করবে। তা হলে অর্থ সম্পদে তাকে ভাগ্যবান করতে না পারলে অন্তত পক্ষে কথাবার্তায় তাকে ভাগ্যবান কর।

আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে তাদের কণ্ঠ চিরে কখনো ভাল কথা বের হয় না। জিহাদ ও মুজাহিদের প্রসঙ্গে কোন ভাল কথা তারা শুনতেই চায় না। জিহাদের প্রসঙ্গ এলেই সে সব খারাপ খারাপ সংবাদ পরিবেশন করে। কোথায় তাদের পরাজয় হয়েছে। কোথায় তারা ব্যর্থ হয়ে পিছিয়েছে। কোন মুজাহিদের মাঝে ইখলাস নেই-ইত্যাকার সংবাদ খুব তৃপ্তির সাথে পরিবেশন করাই তাদের অভ্যাস। এ ধরনের লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাহ্যিক অনুমতিপ্রাপ্ত না হলেও এদের ক্ষমা করা হবে না। কারণ, এরা আল্লাহ ও রাসূলের কল্যাণকামীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি মুজাহিদদের সম্পর্কে অন্তরে ভালবাসা রাখে, ভাল ভাল সংবাদ পরিবেশন করে। যেমন, কোন অন্ধ ব্যক্তি। সে মুজাহিদদের সম্পর্কে ভাল কথা বলে। তাদের বিজয় বার্তায় মুগ্ধ হয়। তাদের কীর্তিতে উল্লসিত হয়। তাদের বীরত্বে মন নেচে উঠে, এ ব্যক্তি মুহসিন। সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং তার জিহাদে অংশগ্রহণ না করার ব্যাপারে কোন প্রকার অভিযোগ থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকতে পারে না। আরেক ধরনের লোক আছে তাদের ব্যাপারেও কোন অভিযোগ থাকবে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ○

অর্থ : আর তাদের ব্যাপারেও কোন অভিযোগ নেই যারা আপনার নিকট এসেছে যেন আপনি তাদের বাহন প্রদান করেন আর আপনি বলে দিয়েছেন, আমার নিকট কোন বাহন নেই যার উপর আমি তোমাদের সওয়ার করাব।

এটা ছিল তাবুক যুদ্ধের ঘটনা। তুমি কি একবারও ভেবে দেখেছো তাবুক আর মদীনার মাঝে কত দুরত্ব? মদীনা থেকে তাবুক ছয়শত পঞ্চাশ কিলোমিটার। এ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদের নিয়ে তাবুকে পৌঁছেছেন। আর তখন ছিল গ্রীষ্মের মৌসুম। খেজুর পাকার মৌসুম। মরুর সেই উত্তাপকে উপেক্ষা করে যেতে হলে পরিধানের জন্য জুতা চাই। চলার জন্য বাহন চাই। উট বা ঘোড়া ছাড়া এ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার চিন্তা করাই মহাপাপ। তাই বিত্তহীন সাহাবীরা যখন তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বাহনের কথা বললেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার নিকট কোন বাহন নেই যার উপর আমি তোমাদের সওয়ার করাব। ফলে তারা তাদের বিত্তহীনতার দুঃখে অশ্রু ফেলতে ফেলতে ফিরে গেছেন।

হ্যাঁ, জিহাদে অংশগ্রহণ না করার কারণে ঐ সব ব্যক্তিদের উপর অভিযোগ আনা হবে যারা বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّما السبيلُ على الذينَ يستأذنُونَك و هم أغنياء হ্যাঁ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হবে, যারা বিত্তশালী হয়েও না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে।

আমাদের এ সময়ে কিছু লোককে জিহাদের কথা বললে, নানা ওজর পেশ করে। অথচ সে বিত্তবান সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অজুহাতে অথবা ব্যবসার কারণে বা অন্য কোন কারণে সে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। আসলে এসব ওজর কিছুই না। দুনিয়ার মায়াকে পশ্চাতে ফেলে আসতে পারছে না। এটাই আসল কথা। দুনিয়া, হ্যাঁ, দুনিয়াই তাদের সর্বনাশের মূল। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ○

অর্থ : পল্লীর কিছু লোক যারা তাবুকে অংশগ্রহণ না করে পশ্চাতে রয়ে গেছে তারা সত্ত্বর এসে বলবে, আমাদের ধন সম্পদ ও পরিজন আমাদের ব্যস্ত রেখেছিল তাই আমরা জিহাদে যেতে পারিনি। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (সূরা ফাতহ ঃ ১১)

এর পরপরই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

(৯৩) إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ رَضُوْا بِأَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

অর্থ : হ্যাঁ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও আপনার নিকট জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে আর তারা পশ্চাতে অবস্থানকারীদের সাথে থাকতে সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাই তারা জানে না।

তারা পশ্চাতে অবস্থানকারী নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধের সাথে থাকতে সন্তুষ্ট। যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের তিরস্কার করে বলেছেন– কি হল তোমাদের কি কোন আত্মমর্যাদাবোধ নেই? তোমাদের কি কোন পুরুষত্ব নেই? তোমরা দেখছি নারীদের সাথে থাকতে পছন্দ কর। অথচ শত্রুরা তোমাদের হত্যা করতে এগিয়ে আসছে। তোমাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছে। তোমাদের মান-সম্মান লুটাচ্ছে। তোমাদের নারীদের ইজ্জত নিয়ে উল্লাস করছে। তোমাদের নিষ্পাপ শিশুদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলায় মেতে উঠেছে আর তোমরা এখানে পশ্চাতে বসে আছো।

তুমি তো তোমার কচি শিশুদের নিয়ে বাসায় বসে আছো। আর সকালে তোমার স্ত্রী বিদ্যালয়ে সেজেগুজে যাচ্ছে। তারপর তুমিও যাচ্ছো তোমার বিদ্যালয়ে। দুপুরে আহারের টেবিলে বসে আহার করছো। তারপর আয়েশী ঘুমে বিকাল পার করছো। সন্ধ্যায় টেলিভিশন দেখছো। এই তো তোমার জীবন। এতেই তুমি সন্তুষ্ট। একবার কি ভেবে দেখেছো, তোমার এই জীবনের সাথে নারীর জীবনের কী পার্থক্য? তোমাকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– رَضُوْا بِأَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ -এরা পশ্চাতে অবস্থানকারীদের সাথে থাকতে সন্তুষ্ট। নারীদের জীবনই এদের বেশী প্রিয়। সেজেগুজে থাকবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে তার পোষাকটি ইস্ত্রি করা হয়েছে কি না। পায়ের জুতা জোড়া উজ্জ্বল কি না। আসলে এ সবের রহস্য কী? প্রকৃত কারণ কী? প্রকৃত কারণ হল আত্মার মৃত্যু। কবি বলেন–

لیسَ من ماتَ فاستراحَ بميِّتٍ إنَّما الميتُ ميِّتُ الأحْياءِ

অর্থ : যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে প্রশান্ত হয়েছে সে প্রকৃত মৃত নয়। আসল মৃত হল জীবিত ব্যক্তির মৃত হওয়া। আমাদের আত্মা, আমাদের হৃদয় মরে গেছে। আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে চলাফেরা করলেও আমরা মৃত। আর আমাদের ঘরবাড়ি হল কবর। যদিও তা রংবেরঙের শোভায় সুষমামণ্ডিত।

বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি একদা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলল, হে আমার রব! আমি প্রত্যহ কত পাপ করি। আপনার কত নাফরমানি করি। আর আপনি আমাকে শাস্তি প্রদান করেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা সে যুগের নবীর নিকট ওহী প্রেরণ করে তাকে এ কথা বলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন–

كمْ أُعاقِبُكَ و أنتَ لا تعلمُ ألمْ أُصِبْكَ بموتِ القلْبِ

অর্থ : আমি তোমাকে কত শাস্তি দিয়েছি অথচ তুমি তা জানো না। আমি কি তোমার অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেই নি?

সুতরাং হৃদয়ের মৃত্যু সবচেয়ে কঠিন শাস্তি। আমরা তা অনুভব করি না। কলব মরে গেলে মানুষের অনুভূতি, আত্মমর্যাদা কিছুই থাকে না। আল্লাহর জন্য ক্রোধে অধীর হয়ে উঠে না। চেহারা রক্তাক্ত হয় না। কিন্তু কলব মৃত না হলে আত্মমর্যাদার কারণে চেহারায় এসে রক্ত জড়ো হত। ফলে চেহারা লাল হয়ে উঠত। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন অপছন্দনীয় কাজ দেখলে মনে হত তার চেহারায় ডালিমের রস মেখে দেয়া হয়েছে। তাই আত্মমর্যাদা বোধই হল প্রতিরোধ শক্তি। আত্মমর্যাদা বোধ না থাকলে শরীর প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করতে পারে না। বাতিলের বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। সুতরাং যারা আত্মমর্যাদাকেই হারিয়ে ফেলেছে তারা এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির মত। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি যেমন প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে ফেলে; ফলে শরীরে নানা রোগব্যাধি দেখা দেয়। আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তিও প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে না। বাতিলের সামনে বুক টান করে দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং সে হৃদয়ের মৃত্যু হয়ে যায়। বিজ্ঞজনেরা বলেছেন– শুকরের গোশত খেলে হৃদয় মরে যায়। তাই তুমি পশ্চিমাদের দেখবে, তাদের চোখের সামনে মেয়েরা বয়ফ্রেন্ড নিয়ে বাসায় আসছে। একসাথে রাত্রি যাপন করছে। অথচ এতে তাদের আত্মমর্যাদা আহত বোধ করে না। তাদের অনুভূতি, আত্মমর্যাদাবোধ

সম্মানবোধ সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে। তুমি তাদের দেখবে অত্যন্ত ভীরু। মৃত হৃদয়ের অধিকারী। আত্মমর্যাদাবোধের লেশমাত্রও তাদের হৃদয়ে নেই। লজ্জা নেই। অনুভূতি নেই।

অপরদিকে মুসলিম দেশের যুবকদের দেখবে শীর্ণ দেহ। বিছানায় আরামে ঘুমাতেও পারে না। তার মাথায় **মুসলিম উম্মাহর** রাজ্যের চিন্তা। সে ছিনিয়ে নেয়া মুসলিম রাজ্যের পুনরুদ্ধারের চিন্তায় অধীর। ছিনিয়ে নেয়া **ইজ্জত ও সম্মান** ফিরিয়ে আনতে অস্থির। রক্তের প্রতিশোধ নিতে মারমুখী। অসহায় নির্যাতিত, নিপীড়িত শিশু-**কিশোর আর নারীদের** আর্তচিৎকারে স্বপ্নে ঘুম ভেঙে যায়। সুতরাং ঈমান হল হৃদয়ের জীবন আর কুফরী হল **হৃদয়ের মরণ। আল্লাহ** তা'আলা বলেন–

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۝

অর্থ : যে ব্যক্তি মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবন দান করলাম। আর তাকে নূর দিলাম সে তার **আলোতে চলে, সে** কি ঐ ব্যক্তির মত যে অন্ধকারে রয়েছে, তা থেকে বের হয় না? (সূরা আনআম ঃ ১২২)

জাহেলী যুগে আরবরা জুলুমকে মেনে নিত না। লাঞ্ছনাকে সহ্য করত না। আবু সুফিয়ান যখন বদরের যুদ্ধে **পরাজিত হল তখন সে** প্রতিজ্ঞা করল, বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ না নিয়ে সে গোসল করবে না। তের মাস সে **গোসল করল না।** উহুদে বিজয় লাভ করার পর সে গোসল করল। উহুদের যুদ্ধে সে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে **বলল, জয় হোবল।** বদরের যুদ্ধের আজ প্রতিশোধ নেয়া হল। যুদ্ধ এমনই চলে।

তেমনিভাবে প্রাচীন আরবের লোকেরা যুদ্ধ ছেড়ে বসে থাকাকেও পছন্দ করত না। তাই একাধারে জিলক্বদ, **জিলহজ্জ ও মুহাররাম** এই তিন মাস যুদ্ধ ছাড়া থাকাকে তারা দীর্ঘ দিন মনে করত। তাই সম্ভবত কুলুসুম নামের **এক ব্যক্তি হজ্জের** সময় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিল, আমি মুহাররাম মাসের যুদ্ধ বিরতির বিধানকে সফর মাসে **নিয়ে গেলাম। সুতরাং** মুহাররাম মাসে যুদ্ধ চলবে আর সফর মাসে যুদ্ধ করা যাবে না।

কারণ, একাধারে তিন মাস যুদ্ধহীন অবস্থা। সে তো দীর্ঘ সময়। এত দিন যুদ্ধ ছাড়া থাকা যায় না। তারা **যুদ্ধ না করতে পারলে** অস্বস্তি বোধ করত। আর আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধ ত্যাগ করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য **করেছেন। তাই ইসলামের** সোনালী যুগে মুসলিম রাজ্যের অবস্থা এমন ছিল যে, কাউকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে দেয়া **ছিল সবচেয়ে** বড় শাস্তি।

সুতরাং বর্তমান সময়ে সৈনিকের জীবন থেকে যুবকদের অব্যাহতি দেয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং জিহাদী **জীবন তাদের মাঝে** শৃঙ্খলা, বীরত্ব, কৃচ্ছতা ইত্যাদি ভালগুণ সৃষ্টি করবে। উল্লাস আর ভোগবাদীতা থেকে **তাদের দূরে রাখবে।**

ইহুদী-খৃস্টানরা যারা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে তাদের ইসলামী মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করার **কোন সুযোগ নেই। কারণ,** তা এক ইজ্জতের বিষয়। যার যোগ্যতা সে রাখে না। তাই তাকে তার বিনিময়ে **জিযিয়া কর প্রদান করতে** হবে। তেমনিভাবে যদি কোন মুসলমান সব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একবার বা দু'বার **জিহাদে না যায় তাহলে** রাষ্ট্রপ্রধান তাকে শাস্তি স্বরূপ জিহাদে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন।

সুতরাং সার কথা হল, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ করেছেন। তবে তিন **শ্রেণীর মানুষকে অক্ষম বলে** ঘোষণা করেছেন। এক. দুর্বলদের। কারা দুর্বল? এদের পরিচয়ে আল্লাহ পাক **বলেছেন–**

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ فَأُولَٰئِكَ
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

অর্থ : তবে পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল, যারা কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং পথও চিনে না। অতএব, আশা করা যায় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। (সূরা নিসা ঃ ৯৮-৯৯)

বয়স্ক পুরুষ যারা যুদ্ধ করতে অক্ষম। যুদ্ধ করতে অক্ষম নারী আর ছোট শিশু বালকরা। এরা দুর্বল শ্রেণীর মানুষ। এরা যুদ্ধের দায়মুক্ত। এরা যুদ্ধের উপায় অবলম্বন করতে পারে না। ঘোড়ার পিঠে সোজা হয়ে বসতে পারে না। অস্ত্র চালনা করতে পারে না।

দুই. অসুস্থ ব্যক্তিরা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى আর অসুস্থদের উপরও বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন, অন্ধ, পঙ্গু। তবে ইসলামের সোনালী যুগে আল্লাহ তা'আলা এদের অক্ষম বলে বাধ্যবাধকতা রহিত করলেও এরা কিন্তু স্থির বসে থাকতে পারতো না। জিহাদ শুরু হলে ঘরে বসে থাকতে পারতো না। ছুটে যেত জিহাদের ময়দানে। আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)। এক অন্ধ সাহাবী। রাসূলের অত্যন্ত প্রিয় সাহাবী। উহুদের দিবসে তিনি পতাকা ধারণ করার দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু রাসূল তাকে তা দেননি। বরং মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ) তা বহন করছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে মা'যুর ঘোষণা করলেও তার হৃদয় জিহাদের ময়দানে যাওয়ার জন্য ছিল অস্থির বেকারার। তাই তিনি মদীনায় বসে থাকতে পারেননি। তার শানেই নাযিল হয়েছে-

عَبَسَ وَتَوَلّٰى ○ أَن جَاءَهُ الْأَعْمٰى ○

অর্থ : সে মুখ মলিন করল। মুখ ফিরিয়ে নিল, এ কারণে যে তার নিকট অন্ধ লোকটি এসেছে।

এক জিহাদের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মদীনার শাসক বানিয়েছিলেন। আর কাদেসিয়ার যুদ্ধে তিনি অগ্রসর হয়ে পতাকা ধারণ করার দায়িত্ব নিতে চাইলেন। তখন সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) সে দায়িত্ব তাকেই অর্পণ করলেন। একবার ভেবে দেখেছো, একজন অন্ধ ব্যক্তি কিন্তু জিহাদে যাওয়ার জন্য, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হওয়ার জন্য কতো আবেগাপ্লুত। কতো ব্যাকুল।

আরেক পঙ্গু সাহাবী হলেন আমর ইবনে জামুহ (রাঃ)। ওহুদের দিবসে তিনি ও তার ছেলেরা জিহাদে বের হয়ে গেলেন। ছেলেরা তার পিতাকে বলল, হে পিতা! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে অক্ষম ঘোষণা করেছেন। সুতরাং জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে আপনার উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। উত্তরে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি চাই, আমার এই অচল পা দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করব।

আমের ইবনে জামুহ (রাঃ) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর মামা ছিলেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ এর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম (রাঃ) ও জিহাদে গিয়েছেন। তাই জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর মা আমর ইবনে জামুহ (রাঃ) এর বোন ছিলেন।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, উহুদের প্রান্তরে আমর ইবনে জামুহ ও আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম শাহাদাত বরণ করলে আমার ফুফু আমার পিতা ও আমার মামাকে একটি উটে তুলে নিলেন। মদীনায় পৌঁছলে, রাসূলের পক্ষ থেকে এক ঘোষক ঘোষণা করল, শহীদদের তাদের শাহাদাতের স্থানে দাফন কর। তাই আমরা তাদেরকে উহুদে ফিরিয়ে আনলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- أَدْفِنُوا الْمُتَحَابِّيْنَ فِي قَبْرٍ وَاحِد তোমরা দুই মহব্বতকারীকে এক কবরে দাফন কর। আমর ইবনে জামুহ ও আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম একে অপরকে খুব মহব্বত করতেন। তাই তাদের দু'জনকে একই কবরে দাফন করা হল।

এরপর ছেচল্লিশ বছর চলে গেল। হঠাৎ উহুদের প্রান্তরে প্রবল প্লাবন দেখা দিল। শহীদ সাহাবীদের কবর ভেঙে গেল। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে জাবের (রাঃ) কে বললেন, তোমার আব্বার কবর তো ভেঙে গেছে। তখন আমি ছুটে গিয়ে তাদের লাশ কবর থেকে বের করলাম। আমি তাদের অবিকল আগের মতই পেলাম। তাদের লাশ বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। তবে আমার পিতার নাকটি একটু পরিবর্তিত দেখতে পেলাম। এর কারণ আমার জানা ছিল না। সুবহানাল্লাহ। এই হল শহীদদের মর্যাদা। আমাদের ভাই আব্দুল্লাহ মিশরীর হুবহু

একই ঘটনা ঘটেছিল। শাওয়ালের শুরুতে সে শহীদ হল। আমরা তার লাশ তালাশ করলাম। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একমাস একদিন পর জিলকদ মাসের দ্বিতীয় দিনে পেলাম। তার দেহ একেবারে নরম। ঘুমন্ত ব্যক্তির মত যেন ঘুমিয়ে আছে। যারা স্পটে ছিল তারা আমার সাথে যোগাযোগ করল। বলল, আমরা আব্দুল্লাহ মিশরীর লাশ পেয়েছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন ধরনের পরিবর্তন হয়েছে কি? তারা বলল, না, তার নাকের ও মুখের এক পাশ ছাড়া শরীরের কোথাও কোন পরিবর্তন হয়নি। আমি বললাম, তাহলে তো তার ঘটনাটি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর পিতার মতই হল। এর চেয়ে আরো বিস্ময়কর ঘটনা হল, তার রক্ত তখনও জমাট বাঁধেনি। এক মাস একদিন পরও একেবারে টাটকা রক্ত তার শরীর থেকে ঝরছিল। এই হল আফগান রণাঙ্গনের মুজাহিদদের নিত্যদিনের কাহিনী। এ ধরনের বহু ঘটনা ছড়িয়ে আছে আফগানিস্তানের এখানে সেখানে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে।

এই তো উমর হানীফ। সে আমাকে বলেছে। আমি একদা বারজন মুজাহিদের কবর উন্মুক্ত করলাম। যদিও কবর উন্মুক্ত করা হারাম বা মাকরুহ তবুও বিশেষ প্রয়োজনে তা করতে হয়েছিল। তাও আবার দু'তিন বছর পর। আফগানিস্তানের লোকেরা মৃতব্যক্তিদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। তাই পথচারী লোকেরা জড়ো হয়ে বলতে লাগল, ভাই মৌলভী সাহেব! আমরা আমাদের শহীদ ভাইদের একটু দেখতে চাই। আমি বললাম, ভাই! এটাতো জায়েয নাই। তারা বলল, আরে ভাই! এক নজর দেখব মাত্র। যাক দু'তিন বছর পর কবরগুলো উন্মুক্ত করলাম। তাদের লাশে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। বরং এমন ঘটনা ঘটেছে যে, কেউ একজন দাড়ি মুণ্ডানো ছিল। দেখলাম, কবরে তার দাড়ি বেশ লম্বা হয়ে গেছে। কতক এমন ছিল যাকে আমি নিজ হাতে আফগানদের ঢিলেঢালা পোষাকে দাফন করেছিলাম। তারা জামা ছিল রক্তে লাল। কিন্তু এখন দেখতে পেলাম, তারা গায়ে কালো রেশমী আলখেল্লা। পৃথিবীর বুকে এতো সুন্দর চমৎকার ও বিস্ময়কর আলখেল্লা আর দেখিনি। যেমন তুলতুলে তেমনি সুগন্ধময়। উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেল। তাদের একজন ছিল সাইয়্যেদ শাহ। সে ছিল হাফেজে কুরআন। কবরে তার চুল, তার নখ বড় হয়ে গিয়েছিল। মিশকের সুগন্ধিতে ভরে ছিল তার কবর। আর দেহ আবৃত ছিল রেশমী আলখেল্লায়। নিশ্চয় তা জান্নাত থেকে এসেছে। পৃথিবীতে কেউ কোথাও এতো সুন্দর চমৎকার ও বিস্ময়কর কাফন দেখেনি। কিছু কিছু মানুষ এমন আছে, তারা এ সব কারামতকে বিশ্বাস করে না। আমি অবশ্য তাদের তিরস্কার করি না। ভাবি, মানুষ এখন অতি বিজ্ঞানী হয়ে গেছে। তারা শিখেছে, লাশ দু'তিন দিন পরই পঁচন ধরে। সুতরাং কিভাবে তারা তা বিশ্বাস করবে? চোখে না দেখলে তারা তা বিশ্বাস করে না।

ডাক্তার বাবর শাহাদাত বরণ করল। পেশোয়ারে তার লাশ আনা হল। উদ্দেশ্য তার পরিবারের লোকেরা শেষ বারের মত তাকে দেখবে। তারপর পেশোয়ারেই তাকে দাফন করবে। তিনি একজন অত্যন্ত মুখলিস ব্যক্তি ছিলেন। একাধিক ব্যক্তি শপথ করে আমাকে বলেছে, তার ছেলেরা যখন মাদরাসা থেকে এসে তার লাশের সামনে দাঁড়াল তখন তিনি কেঁদে ফেললেন আর তার অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। যারা ঘটনাস্থলে ছিল আমি আমার পুস্তক بصائرٌ و عبرٌ ও آياتُ الرحمان এ তাদের নাম লিখেছি। তার মা এসে তার সামনে দাঁড়াল। বলল, হে বৎস! তুমি তো দীর্ঘ সফরে রওয়ানা হয়ে গেছ। সুতরাং তুমি তোমার হাত বাড়াও আমি মুসাফাহা করব। তোমাকে শেষ বিদায় জানাব। তখন সে তার হাত প্রসারিত করে মায়ের সাথে মুসাফাহা করল। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে শহীদ জুল মুহাম্মদের ব্যাপারেও। জুল মুহাম্মদ পাকতিয়া প্রদেশে শাহাদাত বরণ করেন। উমর হানীফ ছিলেন কমান্ডার। তিনি আমাকে বলেছেন– আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি জুল মুহাম্মদের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তার পিতা এসে তার লাশের সামনে দাঁড়াল। আবেগাপ্লুত হয়ে রোরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, হে ছেলে! তুমি যদি সত্যই শহীদ হয়ে থাক তাহলে আমাকে তার নিদর্শন দেখাও। সাথে সাথে সে হাত প্রসারিত করে তার পিতার সাথে মুসাফাহা করল। সে প্রায় পনের মিনিট তার পিতার হাত ধরে রাখল। এতো কিছুর পরও একদল লোক এসব কিছু মানতে নারাজ। এসব ঘটনাকে নানাভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বিকৃত রুপে পেশ করে।

একদা কিছুলোক শাইখ বিন বাযের নিকট লিখল, آيَاتُ الرحمن في جهاد الأفغان পুস্তকটির প্রকাশনা বন্ধ করে দিন। এটা বিদ'আত ও কল্পকাহিনীতে ভরা। এ পুস্তকটি সুফী মতবাদ ছড়াচ্ছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শাইখ বিন বায একজন জ্ঞানী মানুষ। একজন বুদ্ধিমান ও পরিপক্ক মানুষ। তিনি আক্বীদা বুঝেন। তিনি জানেন, অতীতে এ ধরনের অনেক ঘটনা আকাবিরদের জীবনে ঘটেছে। আর কারামত প্রকৃতির সকল নিয়মকে ভঙ্গ করে আত্মপ্রকাশ করে যা দেখে মানুষ হতবাক, হতবুদ্ধি হয়ে যায়। মু'জিযা আর কারামতের মাঝে পার্থক্য হল মু'জিযা নবী রাসূলদের দ্বারা প্রকাশিত হয় আর কারামত আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। সুতরাং এ যুগেও আল্লাহ তা'আলার কামেল বান্দা থেকে কারামত প্রকাশিত হতে পারে।

শাইখ আব্দুল আযীয বিন বাযের প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাকে বলেছেন– তারা চিঠি লিখল, অমুক পাতায় এমন কথা আছে, অমুক পাতায় এমন কথা আছে, অমুক পাতায় এই কল্পকাহিনী আছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এ বিষয়গুলো তাওহীদের ফিকিরের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। বিশুদ্ধ আকীদাকে বিনষ্ট করে। আমাদের ভয় হচ্ছে, দেশে সূফীদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

একদা এক ফরাসী সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাৎ হল। সে আফগানিস্তানে তার পেশায় নিয়োজিত ছিল। আমি তাকে বললাম, তুমি কি আল্লাহকে বিশ্বাস কর? সে বলল, আমি মনে করতাম এ নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা আছেন। সেই স্রষ্টা যে একজন এ কথা সে ইশারায় বুঝালো। তারপর বলল, আমি আফগানিস্তানে এসে এখন আল্লাহকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি। আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি।

আমি তার কথায় বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন? কেন তুমি বাধ্য হচ্ছো? সে বলল, কারণ স্বচোখে দেখছি, একেবারে সাধারণ বন্দুক নিয়ে অত্যাধুনিক ট্যাংকের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের মুজাহিদরা যুদ্ধ করছে। ট্যাংকগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এটাই তো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সাহায্য করছেন। সহায়তা করছেন।

আরেকবার আরেকজন ফরাসী সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে এতো প্রভাবিত হয়েছিল যা বলে ব্যক্ত করা যাবে না। অবশেষে সে একটি বই লিখল। বইটির নাম দিল, 'আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি'। আরেকজন সাংবাদিক বলেছিল, এটা তো চির সত্য কথা। তবে আমি তা ব্যক্ত করতে পারছি না। এই তো দেখছি রাশিয়ার বাহিনী একের পর এক পরাজিত হচ্ছে। কিন্তু এ পরাজয়ের কারণ খুঁজে পাচ্ছিনা।

এইতো গত কয়েকদিন আগের ঘটনা। শাইখ তামীম শহরে গেলেন। কিন্তু রাশিয়ার সৈন্যরা পথ বন্ধ করে দিয়েছে। কাউকে শহরে ঢুকতে দিচ্ছে না। কোন গাড়িও প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। ড্রাইভার টহলরত সৈন্যকে বলল, ইনি কারী সাহেব। আরে কারী সাহেব চিনেন না, যিনি নামাজ পড়ান। টহলরত সৈন্য বলল, না এখন কাউকে যেতে দেওয়া যাবে না। উপরের নির্দেশ। এখন শাইখ তামীম আসবে বলে সংবাদ পৌঁছেছে। আমরা তাকে খুঁজছি। অথচ কী অবাক ব্যাপার। শাইখ তামীম তখন চোখে চশমা দিয়ে গাড়িতে দিব্যি বসে আছেন। সৈন্য বলল, এখন যেতে পারবেন না। বিকাল পাঁচটার পর যেতে হবে।

ড্রাইভার বলল, নিশ্চয়ই সেনাপতি সাহেব ক্যাম্পেই আছেন। আচ্ছা, কারী সাহেব তার সাথেই কথা বলবেন। শাইখ তামীম সেনাপতির সাথেই কথা বললেন। শাইখ তামীম তো আর পশতু ভাষা জানেন না, তাই ইনিয়ে বিনিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। তখন ড্রাইভার বলল, আমাদের কারী সাহেব ফারসী ভাষায় কথা বলেন। পশতু ভাষা জানেন না। সেনাপতি আর কিছু চিন্তা করল না, বলল, এদের ছেড়ে দাও। পথ ছেড়ে দিলে তাদের গাড়ি ছুটে চলল। কিছুদূর যাওয়ার পর সেনাবাহিনীর আরেকটি ক্যাম্পের নিকট পৌঁছলেন। এবার তো আরো মহা সমস্যা। একেবারে পাথর ফেলে রাস্তা বন্ধ করে সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। সৈন্যরা বলল, এখন তোমরা যেতে পারবে না। কিন্তু টহলরত সৈন্যদের প্রধান এগিয়ে এসে বলল, কেউ যাওয়ার অনুমতি দিলে আমি তাকে কুত্তার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা বলে গালি দিতাম। কিন্তু আমি আপনাদের চিনি। আমি আপনাদের যাওয়ার রাস্তা

খুলে দিচ্ছি। তারপর রাস্তা থেকে পাথর সরিয়ে ফেলা হল। তাদের নির্বিঘ্নে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। এটা কি শাইখ তামীমের কারামত নয়? যদি এটা কারামত না হয় তাহলে কোনটা কারামত হবে?

তাই আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বলি, এখন সব মুসলমানের উপরই জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে। এটা ফরজে আইন। পৃথিবীর যে সব অঞ্চল মুসলমানদের অধীনে ছিল তা আবার মুসলমানদের নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত জিহাদ চলতেই থাকবে। আমরা আফগানিস্তানকে মুক্ত করার পর ইনশাআল্লাহ ফিলিস্তিনে যাব। সেখানে ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আমাদের বোখারা স্বাধীন করতে হবে। তাশখন্দ স্বাধীন করতে হবে। লেনিনগ্রাদে আমাদের বিজয় পতাকা নিয়ে পৌঁছতে হবে। মস্কোকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। কারণ, মস্কো দু'শত বৎসর যাবত মুসলমানদের জিযিয়া কর প্রদান করেছে। স্পেন বিজয় করতে হবে। ফ্রান্সের রাইন নদীতে আমাদের পৌঁছতে হবে। বুলন্দোরিয়া, সার্চ, ইউনানকে দখল করতে হবে। এসব অঞ্চল মুসলমানদের অধীনে ছিল। মুসলমানরা সেখানে শাসন করত।

মনে রাখতে হবে, আফগানিস্তানের জিহাদ শুরুর পর কিন্তু জিহাদ ফরজে আইন হয়নি। বরং স্পেন পতনের পর থেকেই মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে আছে। সুতরাং আমাদের সেখানে যেতে হবে। স্পেনে যেতে হবে। ফ্রান্সে যেতে হবে। এটাই শরয়ী বিধান। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। মুসলমানদের অধীনস্ত ভূমির কিয়দংশ যদি কাফেররা দখল করে নিয়ে নেয় তাহলে সকল মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। মহিলাদের উপর জিহাদ ফরজ নয়। কিন্তু এ অবস্থায় মহিলারাও স্বামীর অনুমতি ছাড়াই জিহাদে বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ, মাহরাম কোন পুরুষের সাথে তাদের যেতে হবে। দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বেরিয়ে যাবে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করেই বেরিয়ে যাবে। ছেলে পিতার অনুমতি ছাড়া বেরিয়ে যাবে। যদি উক্ত অঞ্চল উদ্ধারের ব্যাপারে সে দেশের বা সে অঞ্চলের মুসলমানরা অলসতা করে জিহাদ থেকে বিরত থাকে, বা অন্য কোন কারণে জিহাদে না যায় তাহলে তাদের পরবর্তী অঞ্চলের মুসলমানদের উপর ফরজ হবে। তারা ব্যর্থ হলে তাদের পরবর্তী অঞ্চলের বা দেশের লোকদের উপর জিহাদ ফরজ হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে গোটা পৃথিবীর লোকদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হবে। নামায আর রোযার মতই হয়ে যাবে জিহাদের বিধান। কিছুতেই তা ত্যাগ করা যাবে না।

এখানে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়া দরকার। এখানে জিহাদ দ্বারা কোন জিহাদ উদ্দেশ্য। এখানে জিহাদ দ্বারা সেই জিহাদই বুঝানো হচ্ছে যা আমাদের ফিকাহ শাস্ত্রের চার ইমাম বুঝেছেন। তাহল ক্বিতাল ফী সাবীলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। তাই জিহাদ সবার উপর ফরজে আইন। যদি তোমার ঋণ মিলিয়ন রিয়াল থাকে তবুও অবশ্যই তোমাকে জিহাদে যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ তুমি শহীদ হলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তোমার সেই ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। তোমার পক্ষ থেকে ঋণদাতাকে তা দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, সেই ঋণ ক্ষমা করা হবে না যা পরিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আদায় করেনি।

আর যদি জিহাদ শুরু হয়ে যায় আর তুমি ঋণ আদায় করতে পারছো না, ঋণ আদায় করার মত অর্থ তোমার নেই তাহলে তুমি জিহাদে চলে যাবে। আল্লাহর পথে বেরিয়ে যাওয়া তখন তোমার উপর ফরজ হয়ে গেছে। তাই কিয়ামত দিবসে ঋণদাতারা যখন তোমার থেকে ঋণ চাইতে আসবে তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা তোমাদের পশ্চাতে ফিরে তাকিয়ে দেখ। তারা তাকিয়ে বিশাল বিস্ময়কর প্রাসাদ দেখতে পাবে। তারপর বলবে, হে আমাদের রব! এগুলো কাদের? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এগুলো তোমাদের যদি তোমরা তোমাদের ভাইদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং পরকালে সে এক লক্ষ রিয়াল দ্বারা কি করবে? সেখানে কি আর তা দ্বারা মার্সেডিস গাড়ি ক্রয় করতে পারবে? তাই সে তোমাকে ক্ষমা করে দিবে। আর আল্লাহ তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন।

হ্যাঁ, যে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ করে না তা মাফ করা হবে না। তবে ঋণ আদায়ের ক্ষমতা না থাকলে ঋণের দোহাই দিয়ে জিহাদ থেকে বিরত থাকা যাবে না। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে অধিকাংশ সাহাবী ঋণগ্রস্থ অবস্থায়ই জিহাদে গিয়েছিলেন।

যে দিন খুবাইব ইবনে আওয়া (রাঃ) শাহাদাত বরণ করলেন সে দিন সকালে তিনি তার ছেলেকে ডেকে বললেন, হে বৎস! আমি শহীদ হয়ে গেলে আমার সম্পত্তি বিক্রি করে দিবে। বাগান এবং আরো যা যা আছে তা বিক্রি করে দিয়ে আমার ঋণ পরিশোধ করবে। যদি তাতেও ঋণ শেষ না হয় তাহলে দু'আ করে আল্লাহকে বলবে, হে খুবাইরের অভিভাবক! তুমি খুবাইরের ঋণ পরিশোধ করে দাও।

একদা এক যুবক এসে আমাকে বলল, আমি মেডিকেল কলেজে পড়ছি। আমি বললাম, কোন বর্ষ শেষ করেছো? সে বলল, প্রথম বর্ষ শেষ করেছি। তারপর বলল, আমি আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি মেডিকেলের কোর্স শেষ করব, না এখনই জিহাদে চলে আসব। তখন আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۝

অর্থ : জিহাদে যাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বল, অসুস্থ এবং যারা খরচ করতে কিছু পায়না তাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়। (সূরা তওবা ঃ ৯১)

তাহলে তুমি কি সেই তিনজনের একজন? নিশ্চয় নয়।

আর আল্লাহ তা'আলা তো এমন করে বলেননি–

ليسَ على الأطِبَّاءِ و لاَ على المُهندِّسينَ حَرَجٌ إذا نَصَحُوا للهِ و رسولِه —

অর্থ : চিকিৎসকদের উপর ও ইঞ্জিনিয়ারদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়।

সুতরাং এখনই তোমার জিহাদের ময়দানে চলে আসা দরকার। এটাই তোমার জন্য ভাল। মেডিক্যাল কলেজ কি তোমাকে তোমার জিহাদে না যাওয়ার অপরাধ ক্ষমা করতে পারবে? কিয়ামত দিবসে কি আল্লাহর দরবারে হিসাব নিকাশ থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে? নিশ্চয় পারবে না। মনে রাখবে, প্রত্যেক ব্যবসায়ীর উপরই জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হয়ে জিহাদ করা ফরজ। কারণ নামায রোযার মত জিহাদও ফরজে আইন। কখনো তা রহিত হয় না। তবে রোযার মত মাঝে মাঝে রহিত হয়। রোযা যেমন অসুস্থ হলে, মৃত্যুর হালতে, সফরের সময় রহিত হয়ে যায়। নামায যেমন মৃত্যুর সময় রহিত হয়ে যায়। তেমনিভাবে জিহাদও নির্দিষ্ট কিছু সময়ে ব্যক্তি বিশেষের জন্য রহিত হয়ে যায়। অন্যথায় জিহাদ ফরজে আইন। কারো উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাওয়ার পর জিহাদে যাওয়ার কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্ত্বেও যদি জিহাদে না যায় তাহলে সে পাপী হবে। গোনাহগার হবে। জিহাদ ফরজ হওয়ার পর যদি কেউ জিহাদে অংশগ্রহণ না করে তাহলে দুনিয়াতে সে বিপদের ও পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, আর পরকালে তাকে হিসাব দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَنْ ماتَ وَ لم يغزُ و لم يُجهِّزْ غازيًا أصابَه اللهُ بقارعةٍ قبلَ يومِ القيامةِ —

অর্থ : যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল আর জিহাদ করল না এবং কোন মুজাহিদকে জিহাদের অস্ত্রদান করে সজ্জিত করল না তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামত দিবসের পূর্বেই বিপদে আক্রান্ত করবেন।

দ্বাত্রিংশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(٩٣) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلَى
قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ (٩٤) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ
مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○
(٩٥) سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○ (٩٦) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ○

অর্থ : নিশ্চয় অভিযোগের পথ তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে যারা সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও আপনার নিকট অব্যাহতি কামনা করে। যারা পশ্চাতে বসে থাকা লোকদের সাথে থাকতে সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। তাই তারা জানে না। তোমরা যখন তাদের নিকট ফিরে আসবে তখন তারা তোমাদের নিকট ওজর-আপত্তি পেশ করবে। আপনি বলে দিন, তোমরা ওজর-আপত্তি পেশ করো। আমরা কখনো তোমাদের কথা বিশ্বাস করব না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের খবরাখবর জানিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের আমল দেখবেন। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে এমন সত্তার নিকট যিনি গোপন প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তিনি তোমাদের বলে দেবেন তোমরা যা করতে। তোমরা তাদের নিকট ফিরে গেলে তারা আল্লাহর নামে শপথ করবে- যেন তোমরা তাদের ব্যাপারে রাজি হয়ে যাও। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে বিমুখ হয়ে থাক। কারণ তারা অপবিত্র। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে তাদেরকে তা দেয়া হয়েছে। তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে- যেন তোমরা তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। যদি তোমরা তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যাও তাহলে আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবেন না।

(সূরা তওবা ঃ ৯৩-৯৬)

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা প্রকৃত মা'যুর, অক্ষম, জিহাদে অংশগ্রহণ করতে অপারগ তাদের আলোচনা করেছেন। আর যারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করার কারণে পাপিষ্ঠ হবে, পাপাচারী হবে তাদের কথাও বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেছেন– দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভারে অক্ষম ব্যক্তিদের কোন অপরাধ নেই– যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে মুখলিস হয়– একনিষ্ঠ হয়। আল্লাহর ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার অর্থ হল– কুরআনের অনুসরণ করা, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া। ইসম, ইলাহ ও রব হওয়ার ক্ষেত্রে তার একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া। আর রাসূলের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার অর্থ হল– রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ করা। যারা শরয়ী বাই'আতের মাধ্যমে মুসলমানদের ইমাম হয়েছেন, শাসক হয়েছেন, যারা আল্লাহর জমীনে আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়নে সদা তৎপর তাদের অনুসরণ করা। তাদের কল্যাণ কামনা করা। তারা ভুল করলে তা জানিয়ে দেয়া। তাদের সঠিক উপদেশ দেয়া। তাদের দোষের কথা জনগণের মাঝে প্রকাশ না করা। হ্যাঁ, যদি তারা তাদের অন্যায়-অপরাধের কথা না মানে, অস্বীকার করে- তাহলে অন্য কাউকে বলতে কোন বাঁধা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ০

অর্থ : মজলুম ছাড়া কারো জন্য মন্দ কিছু প্রকাশ করা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। (সূরা নিসা ঃ ১৪৮)

সাধারণ মুসলমানদের ব্যাপারেও কল্যাণকামী হতে হবে। তার অর্থ হল, তাদের মহব্বত করবে, নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তা তাদের জন্য পছন্দ করবে আর নিজের জন্য যা অপছন্দ করবে অন্যের জন্যও তা অপছন্দ করবে। তাদের গোপন বিষয় লুকিয়ে রাখবে। ভয়ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ রাখবে। তাদের বিপদে সাহায্য করবে। তাদের অপমান করবে না। লাঞ্চিত করবে না।

অন্ধ, পঙ্গু আর দুর্বলদের কল্যাণকামী হওয়ার বিবরণ হল- তাদের কেউ শিক্ষিত থাকলে তাকে মুজাহিদদের ক্যাম্পে নিয়ে আসবে। সে এসে মুজাহিদদের শিক্ষা দিবে। তাদের হিম্মত বৃদ্ধি করবে। তাদের ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করবে। এভাবে একে অপরের কল্যাণকামী হতে হবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন– مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ

অর্থ : সৎকর্মপরায়নদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কোন জওয়াবদিহিতা নেই। অর্থাৎ যদি কোন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি তার কর্মে কোন ত্রুটি করে তাহলে তাতে তাকে ধরপাকড় করা হবে না। যদি ত্রুটি হওয়ার ক্ষেত্রে সে অপারগ হয়। যেমন, কেউ চুরি করলে হাতের কব্জি কেটে দেয়, তারপর তা সংক্রামিত হয়, ফলে চোর মারা যায়। তাহলে তাতে বিচারকের বা জল্লাদের কোন অপরাধ নেই। তাকে দিয়াত দিতে হবে না। এটা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মাযহাবের বিধান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

الصائلُ الذي يُفسِدُ الدينَ و الدنيا ليسَ أوجَبَ بعد الإيمان من دفعه —

অর্থ : যে-আক্রমণকারী দীন ও দুনিয়াকে ধ্বংস করে– ঈমান আনার পর তাকে প্রতিহত করাই সবচেয়ে গুরুতর দায়িত্ব। এখানে তো এই পুলিশ– যে তোমাকে গ্রেফতার করতে চাচ্ছে– সে তোমার ইজ্জত-সম্মান, তোমার পরিবার-পরিজন এবং তোমার প্রাণের শত্রু। সে তোমাকে যালিম শাসকের নিকট সমর্পণ করে দিতে চায়। সে তোমাকে সমর্পণ করে মাস-শেষের বেতন নিরাপদে হাতে পেতে চায়, তার বেতনটা তোমার ইজ্জত-হুরমত, তোমার ধর্ম, তোমার পরিবার-পরিজনের চেয়েও তার নিকট অধিক মূল্যবান– অধিক প্রিয়। এতে কে মরল আর কে বাঁচল তা নিয়ে তার ভাবার সময় নেই। তাই তোমাকে তার যুলুম থেকে বাঁচতে হবে। হ্যাঁ, যদি তাকে হত্যা না করে কোন উপায়ে পালিয়ে যেতে পার তাহলে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ

অর্থ : সৎকর্মপরায়ণদের ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই।

হ্যাঁ, অভিযোগ রয়েছে তাদের ব্যাপারে যারা বিত্তশালী হয়েও জিহাদে না যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। কিভাবে বিত্তশালীরা জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। অথচ তাদের অর্থ, তাদের বিত্ত তো তাদের জিহাদে টেনে নিয়ে যাওয়ার কথা। কারণ তাদের জীবনে তো কোন পিছুটান নেই। রণাঙ্গনে থাকাকালে তো তার পরিবার-পরিজন নিশ্চিন্তে জীবন-যাপন করতে পারবে। অথচ বিস্ময়ের বিষয়, এদের বিত্তই এদেরকে ময়দান থেকে দূরে রাখছে। এটা কি ইনাগাফির কথা? অথচ বিত্তহীন দরিদ্রকে দেখবে সে কোন কিছুর পরওয়া না করেই জিহাদের ময়দানে ছুটে যাচ্ছে। আর তুমি মিলিয়নিয়ার-বিলিয়নিয়ার হয়ে পশ্চাতে পড়ে আছ। সুবহানাল্লাহ! এটা কোন ইনগাফির কথা নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ ০

অর্থ : নিশ্চয় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে- যারা বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে না যাওয়ার জন্য আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। এদের জন্যই রয়েছে পাপ। এদের জন্যই রয়েছে শাস্তি।

এদের আছে অর্থ-বিত্ত। স্বাস্থ্য হৃষ্টপুষ্ট। প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। শরী'আতের বিধান জানে। জিহাদের বিধানও নখদর্পণে। তা সত্ত্বেও তারা কীভাবে অনুমতি প্রার্থনা করে!

আজকের মানুষ হয়তো তোমাকে বলবে, আরে ভাই, আমি তো স্কুলে পড়ি, তাই আমি স্কুলে যাচ্ছি। তুমি কী করছো? অথবা বলবে, আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি। আমার তো ছুটি শেষ তাই আমি আমার কাজে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি কী করছো, তোমার কী কাজ? অথবা বলবে, আমি তো অমুক কোম্পানির হিসাবরক্ষক। প্রত্যহ আমার হিসাব করতে হয়। আমি তো অমুক টাওয়ারের প্রহরী। আমাকে কড়া ডিউটি পালন করতে হয়। আমি মাদরাসায় ছাত্রদের পড়াই। দরস দিই। কিন্তু তুমি কী কর? কী তোমার কাজ? তখন আমি বলব, সুবহানাল্লাহ, তুমি মাদরাসায় পড়াও। তাহলে সূরা তওবায় তুমি ছাত্রদেরকে কী পাঠ দাও? কী বল, যখন তুমি এ-আয়াতের তরজমা তাদের শোনাও- اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا

অর্থ : তোমরা অস্ত্রহীন অবস্থায় বা সশস্ত্র অবস্থায় যেভাবেই থাক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেরিয়ে যাও।

কী বল, যখন তুমি কুরআনের এ আয়াতের পাঠদান কর-

(٢٤) قُلْ إِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهٖ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ○

অর্থ : আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতামাতা, তোমাদের সন্তান,তোমাদের ভাই, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসা- যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর, তোমাদের বাসস্থান- যা তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়- তাহলে তোমরা আল্লাহর চিরায়ত বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। (সূরা তওবা ঃ ২৪)

এখানে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। তোমরা তাহলে একটু অপেক্ষা কর। তাহলে আল্লাহর কী আযাব নেমে আসে তা অবলোকন করতে পারবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তোমাকে একটি মোহরকৃত পত্র দিচ্ছেন। তোমাকে একটি সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। তুমি তো সার্টিফিকেটের পাগল। সব ছেড়ে তুমি সার্টিফিকেটের জন্য স্কুলে, বিদ্যালয়ে, ইউনিভার্সিটিতে ছুটে যাচ্ছ। তাই আল্লাহ তোমাকে একটি সার্টিফিকেটে ভূষিত করতে চাচ্ছেন। এটা এমন সার্টিফিকেট যা অস্বীকার করলে তুমি জাহান্নামে যাবে। সেই সার্টিফিকেটে লেখা আছে- وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ 'আর আল্লাহ তো ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' আল্লাহ তা'আলা তোমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তুমি ফাসেক। তিনি তোমাকে হিদায়াতের পথ, কল্যাণের পথ দেখাবেন না, যদি না তুমি জিহাদের পথে ফিরে আসো। তুমি যখন সারাক্ষণ তোমার দুনিয়া, তোমার চিত্ত, তোমার সম্পদ, তোমার ছেলেমেয়ে আর স্ত্রী-পরিজন নিয়ে ডুবে আছো- তাহলে তুমি আল্লাহর দেয়া সার্টিফিকেট নিয়ে নাও। তুমি একজন ফাসেক। আল্লাহ তোমাকে কল্যাণের পথ দেখাবেন না।

এটা হল জিহাদ পরিত্যাগকারীর বিধান। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা। আমি যেকোন সভা, সেমিনার বা সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতা করি- তখন আমি আমার বক্তৃতা এ আয়াত দ্বারা শুরু করি। اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا

'তোমরা অস্ত্রহীন অবস্থায় বা সশস্ত্র অবস্থায় যেভাবেই থাক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেরিয়ে যাও।' কারণ এতে শ্রোতাদের মাঝে চেতনা ফিরে আসে। হৃদয়ে আফসোসের যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে আরেকটি আয়াত তেলাওয়াত করি-

(٤٤) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ○

অর্থ : যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে- তারা জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে বিরত থাকতে আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে না। (সূরা তওবা ঃ ৪৪) কারণ এতেও শ্রোতাদের মনে চেতনা ফিরে আসে। হৃদয়ে আফসোসের ক্ষত সৃষ্টি হয়। জিহাদের জন্য হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠে।

আরেকটি আয়াত তিলাওয়াত করি। আয়াতটি হল–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ

অর্থ : হে মু'মিনরা! তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয় তোমরা আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড় তখন তোমরা মাটি আঁকড়ে ধর? আরো একটি আয়াত তিলাওয়াত করি। তাহল–

(٧٥) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ○

অর্থ : তোমাদের কী হল, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না দুর্বল সেই নারী, পুরুষ ও শিশুদের পক্ষে- যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের এ জনপদ থেকে উদ্ধার কর। এর অধিবাসীরা জালিম, অত্যাচারী।
(সূরা নিসা ঃ ৭৫)

এ ধরনের আয়াতসমূহে শ্রোতাদের চেতনা সহজেই ফিরে আসে। বিশ্বাস কর, সূরা তওবা ও সূরা নিসার প্রত্যেকটি আয়াতের মাঝে এমন প্রতিক্রিয়া রয়েছে যে, জিহাদের ব্যাপারে কাফের ব্যক্তিদের জন্য তা আগুনের শিখার মত কাজ করে।

তোই আমি কোন মজলিসে, কোন সভা-সেমিনারে কথা বললে জিহাদের বিষয়কেই প্রাধান্য দিই। কারণ, আফগানিস্তানের জিহাদের ময়দানে আজ 'দায়ী'র প্রচণ্ড দরকার। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের খুব প্রয়োজন। মুজাহিদদের খুব প্রয়োজন। সব ধরনের শক্তির খুব প্রয়োজন। আমি যখন কথা বলতে শুরু করি তখন দেখি কিছু লোক চলে যায়। কারণ, আমার কথায় সে মনে করে- আমি তাকে লক্ষ্য করে বলছি। আসলে ব্যাপারটি এমন নয়। কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষণই এমন যে, তা তার দিকে চলে যায়। এ ক্ষেত্রে আমার কিছুই করার থাকে না।

এর মূল রহস্য হল, সূরা তওবায় আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের মুজাহিদের কথাই আলোচনা করেছেন। منهم و منهم و منهم و বলে বলে তাদের গতি-প্রকৃতির, অভ্যাস-চরিত্রের নিপুণ চিত্রায়ন করেছেন। কখনো বলেছেন– ومنهم من عاهد الله কখনো বলেছেন– و منهم الذين يؤذن النبي কখনো বলেছেন– و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا। এ কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন– সূরা তওবা অবতরণকালে যখন বলছিল– منهم و منهم و তখন আমরা বললাম, এ সূরাতো কাউকে ছাড়বে না। তাই কুরআন বলছে–

إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ○

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্নটি হল, তাহলে কি জিহাদে অর্থের প্রয়োজন হয় না? যদি প্রয়োজন হয়েই থাকে, তাহলে কেন ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে না এবং তারা তাদের অর্থ জিহাদের ময়দানে পাঠাবে না? চাকরিজীবীরা চাকরি করবে এবং অর্থ পাঠাবে। শিল্পপতিরা অর্থ উপার্জন করবে এবং অর্থ পাঠাবে। কৃষকরা

কৃষি কাজ করবে এবং অর্থ পাঠাবে। আর আপনি চাচ্ছেন সব কিছু বন্ধ করে দিতে। শিল্পপতি জিহাদের ময়দানে চলে আসবে। ব্যবসায়ীরা চলে আসবে। কোটিপতি, লাখপতি, মিলিয়নিয়ার আর বিলিয়নিয়াররা সব জিহাদের ময়দানে চলে আসবে। মিল ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে? সব কিছু অচল হয়ে যাবে। এর উত্তরে আপনি কী বলতে চান? আপনি কি দুনিয়া অচল করে দিতে চান?

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, আরে ভাই, এখন তো আমি চাচ্ছি না। এখন আল্লাহ চাচ্ছেন। আর কেউ যদি আল্লাহর হুকুম পালনার্থে জিহাদে চলে আসে তবে তাকে তো অবশ্যই কষ্ট করতে হবে। সহনশীল হতে হবে। ময়দানে এসে ট্রেনিং নেবে। সকালে শুধু রুটি খাবে। দুপুরে রুটি আর ডাল খাবে। আর রাতের কথা তো আল্লাহ জানেন। অর্থাৎ প্রয়োজনে ব্যবসা-বাণিজ্য ফ্যাক্টরি সব কিছু বন্ধ করে জিহাদে চলে আসবে। কুরআন এটাই চায়। তবে জিহাদের প্রয়োজনে আমীর তার থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা নেবেন। কাউকে বাবুর্চি বানাবেন। কাউকে ড্রাইভার বানাবেন। কাউকে পেশোয়ারে পাঠাবেন, পেশোয়ারের দফতরের দায়িত্বশীল বানিয়ে। কাউকে জিহাদের স্বার্থে ব্যবসায় নিয়োজিত করবেন। যদি আমীর তাকে নিয়োজিত করেন তবে তাতে বলার কিছু নেই।

তবে এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য একেবারে ভিন্ন। আমি বলি, যদি মুজাহিদের এই পুণ্যময় কাফেলায় সেই ব্যবসায়ী, শিল্পপতি আরো অন্যান্য দুনিয়াবি কাজে ব্যস্ত ব্যক্তিরা চলে আসে তাহলে কি তাদের সেসব প্রতিষ্ঠান,তাদের শিল্পকারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে? নিশ্চয় যাবে না। বরং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যদি পাঁচ শত মিলিয়ন বা এক হাজার মিলিয়ন মানুষও জিহাদের ময়দানে যোগদান করে তাহলে কোন মিল-ফ্যাক্টরি একদিনের জন্যও বন্ধ হবে না। বরং তা চলতেই থাকবে। তার উৎপাদন বাড়তেই থাকবে।

এরপর আমি পাল্টা প্রশ্ন করে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা একবার ভেবে দেখ তো, তাদের এক হাজার মিলিয়নের মধ্য হতে কি এক মিলিয়ন জিহাদের ময়দানে এসেছে? আসে নি। এক মিলিয়নের এক দশমাংশও আসে নি। তাহলে তার অর্থ হলো তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করেও জিহাদ করছে না। সশরীরেও জিহাদ করছে না। তাহলে কি তার অর্থ এ হয় না যে, আমরা তাকে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি দিয়েছি। শুনে নাও যদি তারা জিহাদের ময়দানে আসতো তাহলে অবশ্যই জিহাদের মাহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো।

তারা মিলিয়ন বিলিয়ন টাকার মালিক এ কারণে কি আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা ঘোষণা করেছেন যে, তাদের আর রোজা রাখতে হবে না? কারণ, রোজা রাখলে ব্যবসায়িক কাজে ক্ষতি হবে। লাভ কম হবে। আর ইসলাম তো তাদের লাভ ও ব্যবসার প্রতি মুহতাজ! বিষয়টি এমন নয়। বরং যদি তার গোটা ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায় তবু ইসলাম তাকে রোজা ত্যাগ করার অনুমতি দেয় না। জিহাদেরও সেই একই বিধান। জিহাদ আর রোজার মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি হযরত উসমান (রাঃ) কে তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন? রাসূল ঘোষণা করেছিলেন–

مَنْ جهَّزَ جيشَ العُسرةِ فله الجنّـــةُ —

'যে ব্যক্তি তাবুক যুদ্ধে প্রস্তুতির সামগ্রী দান করবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত।' একথা শোনার পর উসমান (রাঃ) তাবুক যুদ্ধের বাহিনীকে বিভিন্ন সরঞ্জাম সজ্জিত করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে মুগ্ধ হয়ে ঘোষণা করলেন, اللهم ارْضَ عنْ عثمانَ فإنِّي عنه راضٍ অর্থ : 'হে আল্লাহ আপনি উসমানের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যান। কারণ আমি তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট।' তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রদান করেন নি। রাসূল তো মদীনার অধিবাসীদের দু'ভাগে ভাগ করেন নি। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণী। কৃষক, মজুর, শ্রমিক শ্রেণী। আর কৃষক, মজুর শ্রেণীর

লোকদের বলেন নি যে, তোমরা জিহাদের ময়দানে বেরিয়ে যাও। তোমরা দরিদ্র। তোমাদের মৃত্যুতে কোন ক্ষতি নেই। আর উসমান ও আবু বকরের রক্ত তো অনেক মূল্যবান। কারণ তারা প্রভুত সম্পদের অধিকারী। আবু বকর (রাঃ) বা উমর (রাঃ) কি কোন জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত ছিলেন? হিজরতের সময় আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) কি জিহাদে যোগদান করা থেকে কখনো বিরত ছিলেন? তারা তো মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আজারবাইজানের জিহাদে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। প্রবল বরফপাতের কারণে সামনে অগ্রসর হতে পারছিলেন না। ছয় মাস পর্যন্ত রামাহুরমুজে অবস্থান করেছিলেন। কাবুলে দুই বছর অবস্থান করেছিলেন। তারা কখনো এ চিন্তা করেন নি, হায় হায় আমার ব্যবসা তো এবার লাটে উঠবে? এখন উপায় কী?

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যেকটি ময়দানে সহযোগিতা করে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনার পর যখন বলতে লাগলেন, এবার ইসলাম যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে গেছে। আমরা আমাদের ব্যবসায় ফিরে যাই। বাগানের পরিচর্যায় ফিরে যাই। কৃষি কাজে ফিরে যাই। এ বিষয়গুলো তো আমাদের দেখতে হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন–

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ তোমরা স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।

সুবহানাল্লাহ! রাসূলকে রণক্ষেত্রে সহযোগিতা করার পর ব্যবসায় ফিরে যাওয়া, কৃষি কাজে ফিরে যাওয়া, ক্ষেত-খামারে ফিরে যাওয়া মানে ধ্বংসের দিকে ফিরে যাওয়া!!! হ্যাঁ, ধ্বংসের দিকেই ফিরে যাওয়া। সাহাবায়ে কিরাম যদি জীবনকে জিহাদের পথে নিয়োজিত না করে মদীনায় কৃষি কাজে, ব্যবসায় নিয়োজিত করতেন তাহলে আমরা কাবুল, বোখারা, তুর্কিস্তান ও ইউনানে বিজয়দীপ্ত পদবিক্ষেপে পদচারণা করতে পারতাম না। কাবুল, বোখারা আর তুর্কিস্তানের উদ্যানগুলো আমাদের হতো না। তারা একশ বাগান পরিত্যাগ করেছেন আর আল্লাহ তাদেরকে মিলিয়ন মিলিয়ন বাগান দান করেছেন। ব্যবসায়ী কিসের জন্য ব্যবসা করে? ব্যবসায়ী কতো লাভ করে? ইহুদিরা তো একদিনের যুদ্ধে নাবলুস, কুদস, খলীলের ধন-সম্পদ লুটে নিয়েছে। নাবলুসের মিলিয়ন মিলিয়ন সম্পদ তারা দখল করে নিয়েছে। অবশ্য কিছু স্বদেশপ্রেমী লোক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। তবে সংখ্যায় তারা একেবারে নগণ্য।

আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই, রাসূল কি কখনো বলেছেন যে, আমার রিজিক অমুক আমদানি কোম্পানির সাথে রয়েছে? শিল্প-কারখানা তৈরিতে রয়েছে। ফসল উৎপাদনের মাঝে রয়েছে। তিনি বলেছেন–

جُعِل رِزْقِي تحتَ ظلِّ رُمْحِي —

আমার রিজিক আমার বর্শার ছায়ায় রয়েছে। অর্থাৎ বর্শাই তোমার রিজিক উপস্থিত করবে। রিজিকের জন্য অন্য কোন চিন্তা করার দরকার নেই।

তখন হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসনকাল। তিনি আমীরুল মু'মিনীন। তার যুগেই সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণ ফিলিস্তিন জয় করলেন। শাম থেকে রোমান সাম্রাজ্যকে চিরতরে হটিয়ে দিলেন। তখন হিরাক্লিয়াস ফিরে যাওয়ার সময় বেদনাপ্লুত কণ্ঠে বললেন–

وِداعًا لكَ يا سُورِيَا، وِداعًا لا لقاءَ بعدَه —

বিদায় হে সিরিয়া, চিরদিনের তরে বিদায়। আর দেখা হবে না।

তখন কিছু সাহাবী ও তাবেঈ ফিলিস্তিনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। তারা হাওলা, হাওলার পার্শ্ববর্তী সমভূমি ও তারবিয়ার গম দেখে মুগ্ধ হলেন। তারা সেখানে গম রোপণ করলেন। সেখানে গম গাছ খুব উঁচু হতো। অশ্বারোহীকে দেখা যেতো না। গমের বড় বড় দানা হতো।

হযরত উমর (রাঃ) শুনতে পেলেন যে, মুজাহিদরা হাওলায় গমক্ষেত করেছেন। তিনি এতে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। বেদনাহত হলেন। একজন লোককে পাঠিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিলেন, যাও, আগে তাদের ফসল পুড়ে ফেল। তারপর তাদের নিকট আমার চিঠি দিও। লোকটি ফিলিস্তিনে পৌঁছে চকমকি পাথর ঘষে আগুন জ্বালিয়ে তাদের গমক্ষেত পুড়ে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম তার এই কাণ্ড দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এলেন। লোকটি বললো, আমার সাথে হযরত উমর (রাঃ) এর নির্দেশনামা আছে। তার নির্দেশে আমি তা পুড়েছি।

উমর (রাঃ) এর নাম শুনে সবাই চমকে উঠল। বলল, আচ্ছা উমরের নির্দেশেই যদি তুমি পুড়িয়ে থাক তাহলে আমাদের বলার কিছু নেই। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব ক্ষেত শেষ করে দেওয়ার পর তিনি উমর (রাঃ) এর পত্র পড়ে তাদের শোনালেন। তিনি তাতে লিখেছেন–

إِنَّما قوتُكم مَا تأخذُونَ من أفواهِ أعْدائِكم، فإذا تركتُم الجهادَ و اشتَغَلْتُم بالزَّرعِ ضُربتْ عَليكم الجزيةُ و عاملنَاكم معاملةَ أهلِ الكتابِ —

অর্থ : শত্রুর মুখ থেকে তোমরা যা ছিনিয়ে আনবে তাতেই তোমাদের শক্তি নিহিত রয়েছে। তাই তোমরা যদি জিহাদ ছেড়ে দিয়ে কৃষি কাজে লিপ্ত হয়ে যাও তাহলে আমি তোমাদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করবো। এবং তোমাদের সাথে আহলে কিতাবদের মতো আচরণ করবো।

একটু দাঁড়াও। চিন্তাকে শাণিত করো। এবার ভেবে দেখ, মুজাহিদের একটি কাফেলা জীবনকে বাজি রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করল। তারপর জিহাদ করতে করতে হাওলাতে পৌঁছল। মদীনা থেকে এক হাজার আট শ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হাওলা। পথে পথে তারা রোমানদের বিশাল বিশাল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করলো। এতো অবদান থাকার পর তারা যখন কিছু গমক্ষেত করল তখন উমর (রাঃ) তাদের ওপর জিযিয়া কর আরোপ ও আহলে কিতাবদের মতো আচরণ করার হুমকি দিলেন। কতো মর্যাদাপূর্ণ আমল ত্যাগ করার কারণে উমর (রাঃ) এতো ক্ষিপ্ত হলেন। আসল কথা হলো, এ ধর্মে জিহাদ থেকে নিশ্চিন্তে বসে থাকার কোন পথ নেই। الجهاد ماض إلى يوم القيامة কিয়ামত দিবস পর্যন্ত জিহাদ চলতেই থাকবে। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকার জন্য আল্লাহ তাদের পাঠান নি।

হিমস শহরের শাসক ছিলেন আনবাসা ইবনে আসওয়াদ আনাসী (রাঃ)। তিনি হিমস শহরে একটি সুন্দর বাগান তৈরি করলেন। উমর (রাঃ) একথা শুনে তার নিকট পত্র পাঠালেন। উমর (রাঃ) এর পত্র লম্বা হতো না।

عَمدتُ إلى ذلٍّ في أعناقِ الكفارِ فوضعتَه في عنقِك ، إنَّما إقواتُنا مما تأخذُون من أعدائِكم

অর্থ : আমি ইচ্ছে করেছি লাঞ্ছনা কাফেরদের ঘাড়ে স্থাপন করবো। তারপর দেখলাম তুমি তা তোমার ঘাড়েই রেখে দিলে। মনে রেখ, শত্রুদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সামগ্রীতেই তোমাদের খাবার রয়েছে।

এখন স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কি এই দিগন্তবিস্তৃত ফসলের জমিন এভাবেই পড়ে থাকবে? তাতে কি কিছুই ফলাব না? এ আবার কেমন কথা? তাহলে ইসলাম কি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা সবকিছু বন্ধ করে দিতে চায়? তাহলে পৃথিবী চলবে কিভাবে? এর উত্তরে বলব, না, ইসলাম কখনো এটা চায় না। ইসলাম বলে এই কৃষিকাজ মুসলমান করবে কেন? এ কাজ করবে কাফেররা। ইহুদি খৃস্টানরা করবে। খেরাজ দেয়ার শর্তে তারা কৃষিকাজ করবে। এটাই তাদের কাজ। মুজাহিদদের এই কাজ নয় যে, সে সারা বছর ধরে জমিন থেকে আগাছা দূর করবে। সেচ দিবে। সার দিবে। এটা তো রণাঙ্গন থেকে পশ্চাতে পড়ে থাকা ব্যক্তিদের কাজ। মুজাহিদদের কাজ হলো–

لئن عُمِّرت جعلتُ الحربَ والدةً و السمهريَّ أخًا و المشرفيَّ أبـًا

অর্থ : যদি আমি আয়ু পাই তাহলে যুদ্ধকে আমার মাতা বানাবো আর সামহারি বর্শাকে আমার ভাই বানাবো আর মাশরাফি তরবারিকে আমার পিতা বানাবো।

এটা হলো মুজাহিদদের জীবনের সরল ও সাধারণ চিত্র। এটা হলো মুসলমানদের ইজ্জতের সাথে জীবন যাপনের মূল রহস্য। আল্লাহ আমাদেরকে তা অনুধাবন করার তাওফিক দান করুন।

বর্তমানে আমরা জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে লাঞ্ছনার জীবন দান করেছেন। ইজ্জতের চিন্তা করাও আজ সুদূর পরাহত। যখন জাজিরাতুল আরব ছিল ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। শাম ছিল মুসলমানদের করতলগত। মুসলমানরা ছিল স্বাধীন। শাসক জাতি। অথচ এখন আমরা পরাধীন। অধীন। কাফেরদের হাতের মুঠোয়। স্বাধীন কোন চিন্তা করারও আমাদের অধিকার নেই। এরপরও কি কোন মুসলমানের জন্য জিহাদ থেকে দূরে থাকার কোন ওজর থাকতে পারে? আমাদের পূর্ব পুরুষরা একের পর এক দেশ স্বাধীন করে ইনসাফির রাজ্য কায়েম করেছিলেন। আর আমরা পৃথিবীতে নিকৃষ্ট জীব হিসাবে কাফির মুশরিকদের অধীনে নতজানু হয়ে থাকছি। আমেরিকানরা আমাদের শাসন করছে। নীল চোখ আর সোনালি চুলের কোন ইংরেজ বা আমেরিকানকে দেখলে আমরা ভয় পাই। মন দুরু দুরু করতে থাকে। অথচ এক সময় তারাই আমাদেরকে ভয় করতো। পথ ছেড়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতো। আজকের এই ইংরেজরা, এই ফ্রান্সের লোকেরা আগে তুর্কীদের দেখলে ভয়ে কাঁপতো। ফিসফিসিয়ে বলতো, সাবধান, ঐতো তুর্কীরা আসছে। আর এখন আমেরিকান, রাশিয়ান বা ইংরেজদের দেখলে আমরা নত হয়ে থাকি। তাদের সাথে কথা বলাকে সৌভাগ্য মনে করি। কেন? কীসের জন্য এই পরিণতি? আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ○

অর্থ : তাদের পর কিছু অযোগ্য লোক তাদের উত্তরাধিকারী হলো। তারা নামাজকে নষ্ট করে দিল। প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সত্বর তারা– মুসলমানের সন্তানরা আজ দেখতে মুসলমান মনে হলেও তারা প্রকৃতপক্ষে আর মুসলমান নেই। ওরা নকল মুসলমান। মনে করো, তুমি এক শ টাকার একটি নোটকে ফটোকপি করে হুবহু আরেকটি এক শ টাকা বানালে, তা কি বাজারে চলবে? কেউ কি তার বিনিময়ে তোমাকে পণ্য দিবে? নিশ্চয় দিবে না। কারণ ফটোকপির কোন মূল্য নেই। আজ দুনিয়াতে মুসলমানরা সংখ্যায় বহু। বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা এখন সকল ধর্মের চেয়ে বেশি। কিন্তু আসল মুসলমান নেই। সব ফটোকপি। বাজারে তা চলে না। এর কোন মূল্যই নেই। কদর নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, رَضُوا بِأَنْ يَكُونَ مَعَ الْخَوَالِفِ অর্থ : তারা পশ্চাতে অবস্থানকারীদের সাথে থাকতে সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদের অধিক তিরস্কার করার জন্য এ কথা বললেন। তার মর্ম হল, তাহলে কি তারা ছোট ছোট শিশু আর অবলা নারীদের সাথে থাকতে চায়? অর্থাৎ ইসলামী দেশ কাফের শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে আর তোমরা শিশু আর নারীদের সাথে নিরাপদে থাকতে চাও এটা কি দোষণীয় নয়? তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে তোমরা নারীদের মত নিশ্চিন্তে আছো, কোর্তার ঝুল টেনে টেনে পথঘাটে চলছো, অথচ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মুসলিম নারী ধর্ষিতা হচ্ছে।

أَتُسبى المسلماتُ بكلِّ ثغرٍ و عيشُ المسلمينَ إذنْ يطيبُ

প্রত্যেক সীমান্তেই মুসলিম নারীদের বন্দী করে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে আর মুসলিম পুরুষদের জীবন যাপন কি তাহলে আরামদায়ক হবে?

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেছেন–

كيف القرارُ و كيف يهدأُ مسلمٌ و المسلماتُ مع العدوِّ المعتدِي

অর্থ : কীভাবে মুসলমান স্বস্তি ও শান্তিতে থাকতে পারে যখন মুসলিম নারীরা আক্রমণকারী শক্রদের হাতে বন্দী রয়েছে?

আল্লাহ তা'আলা خَوالف শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ শব্দটির উৎস কি আমাদের জানা আছে? ইমাম নাহহাস বলেছেন– আরবরা خلفَ اللبَنُ বলে, যখন দুধ টক হয়ে যায় এবং বেশী সময় থাকার কারণে তার স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

আরবরা বলে, خَلوفُ فمِ الصَّائم রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ।

অর্থাৎ রোযাদার দীর্ঘক্ষণ খাবার থেকে ও মুখ ব্যবহার করা থেকে বিরত থেকেছে তাই তার মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে।

এই দু'টি অর্থের বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যারা জিহাদ থেকে দীর্ঘ দিন দূরে থেকে নারী-শিশুদের সাথে অবস্থান করছে তাদেরও এক প্রকার দুর্গন্ধ আছে। সুতরাং টক দুধ বা পানি দীর্ঘ দিন আবদ্ধ থাকলে তার উপর এক প্রকার শ্যাওলা পড়ে যায়। আর যে সমাজ দীর্ঘদিন পর্যন্ত জিহাদ থেকে বিরত থাকে তাও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। আর তাতে শ্যাওলা পড়ার পর মশা-মাছি ডিম পাড়ে। আমাদের এ সমাজও জিহাদ থেকে দীর্ঘদিন দূরে থাকার কারণে তাতে মশা-মাছি ডিম দিয়েছে। এখানে মশা-মাছির অভাব নেই। আমাদের দেশের মশা-মাছিগুলো আজ বাজপাখি হয়ে গেছে। কারণ এ সমাজে জিহাদ নিষেধ। জিহাদের প্রশিক্ষণ নেয়া নিষেধ। রেডিও, টিভি, পত্রিকায় এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করা হয়। করলে শাস্তি দেয়া হয়। ফাঁসি দেয়া হয়। বলা হয়, এরা মুজাহিদ। ক্ষণিকের তরেও কি একবার ভেবে দেখেছো, আমাদের এ সমাজ কতো পাল্টে গেছে। জিহাদ আজ ভীষণ পাপের কাজ। জিহাদে অংশগ্রহণ করলে তাকে শাস্তি দেয়া হয়, ফাঁসি দেয়া হয়।

আমাদের এই ঘুণে ধরা স্থবির সমাজে অসংখ্য শ্যাওলা সৃষ্টি হয়েছে। সমাজপতিদের দিকে তাকাও দেখবে তারা ভীতু। সাহস বলতে তাদের মাঝে কিছুই নেই। এরা ইসলামের বিরুদ্ধে খুব পটু। পাপ কাজে খুব পারদর্শী। বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথম শ্রেণীর। এদের দেখবে প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে। এদের মেয়েরা টেলিভিশনে নাচগান করে। এ ধরনের সব পাপেই তারা অগ্রগামী, আবার তারাই সমাজপতি। সমাজের কর্ণধার। এরাই শাসক। এরাই মন্ত্রী মিনিস্টার। গোটা সমাজকে এরা পরিচালনা করছে। জিহাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এসব সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমাজ আজ আগাছা আর শ্যাওলায় ভরে গেছে। যদি আমাদের সমাজে জিহাদের কার্যক্রম চলত। তাহলে সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের মশা-মাছির, শ্যাওলার হাতে কিছুতেই সমাজ নির্ভর করত না।

এখন আমরা যুদ্ধে আছি। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ জালিম কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আমাদের এ যুদ্ধ চলছে। কিন্তু কারা এ যুদ্ধে এগিয়ে আসবে? কারা জালিমদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ করবে? নিশ্চয় বীর, সাহসী ব্যক্তিরাই করবে। আর ভীরু, সাহসহীন ব্যক্তিদের এখানে কোন স্থান নেই। রাসূলের ইন্তেকালের পর কীভাবে সবাই একমত হল যে, আবু বকরই হবে রাসূলের খলীফা? কারণ জিহাদের প্রত্যেক আহবানে তিনিই ছিলেন অগ্রগামী। তাই জিহাদের ময়দানে রাসূলের পাশে তুমি আবু বকর (রাঃ) কে দেখতে পাবে। বিপদে-আপদে, কঠিনে-কোমলে সর্বদা আবু বকর রাসূলের পাশে ছায়ার ন্যায় ছিলেন। তাই তার বীরত্ব, তার সহনশীলতা, তার দানশীলতা, তার উদারতা তাকে খলীফা হওয়ার যোগ্য করে তুলেছে। আর স্থির জমাটবাঁধা সমাজে, যেখানে জিহাদ নেই, সেখানে শ্যাওলা ছাড়া আর কিছুই ভেসে উঠে না।

তাই আমি প্রায়ই বলি, আমরা আল্লাহর কাছে অপাঙক্তেয় হয়ে গেছি। এর কারণ আমরা আল্লাহর বিধান পালনে অবর্ণনীয় দুর্বল। তাই আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর লাঞ্ছনা, অপদস্ততা চাপিয়ে দিয়েছেন। আর তা না হলে কি হাফেজ আসাদের মত মুরতাদ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হতে পারে?

একদা আমি এক ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের বলেছিলাম, যদি আমাদের সমাজ ইসলামী হত তাহলে সে কয়টি ভোট পেত। ছাত্ররা বলল, মনে হয় সে কেবল তার ভোটটিই পেত। আমি বলেছিলাম, সে তার ভোটটি পেলেও তা গ্রহণীয় হত না। কারণ ফাসেকের সাক্ষী গ্রহণ করা হয় না। তাই আমাদের সমাজ যখন স্থির নির্জীব হয়ে গেছে। তখন উম্মতও পাল্টে গেছে। আপাদমস্তক পাল্টে গেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের লাঞ্ছিত ব্যক্তিদের আমাদের নেতা বানিয়ে দিয়েছেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لتأمُرنَّ بالمعروفِ و لتَنهونَّ عن المنكرِ أو ليسَلّطنَّ الله عليكم شِرارَكم فيدعُو خيارُكم فلا يُستجاب لكُم —

অর্থ : তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করবে অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের উপর নিকৃষ্ট লোকদের চাপিয়ে দিবেন। তখন তোমাদের ভাল লোকেরা দু'আ করবে আর তাদের দু'আ কবুল হবে না।

ঘটনা এমনই হয়েছে। তা না হলে কীভাবে গাদ্দাফী লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট হয়? এটা কি আল্লাহর নিকট এ জাতির অগ্রহণযোগ্যতা ও অপদস্থতার প্রমাণ নয়? সে তো কোন আলেম, কোন লেখক, কোন দাঈ বা কোন সম্মানী লোককে ছাড়েনি। সবাইকে অপদস্ত করেছে। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন–

لا يُسلم الشرفُ الرفيعُ مِن الأذى حتّٰى يُراق عَلى جوانبِــه الدمُ

শুধু কষ্টের মাধ্যমেই উঁচু মর্যাদা অর্জিত হয় না। বরং তার চারপাশে রক্ত প্রবাহিত করতে হয়।

সুতরাং জিহাদে অংশগ্রহণ না করা, পশ্চাতে পড়ে থাকার মানসিকতা এক বিরাট মুসিবত। এদের অন্তরে এমন এক বুঝ সৃষ্টি হয় যা তারা নিজেরাও বুঝে না। হৃদয় মরে যায়। তুমি যখন এদেরকে জিজ্ঞেস করবে, এরা নানা আপত্তি পেশ করবে। কারণ এরা আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং এরা এখন মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে। ধিক এসব মুনাফিককে! ধিক, এসব ভীরু ব্যক্তিকে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ ماتَ و لم يغزُ و لم يحدِّث نفسَه بغزوٍ ماتَ على شُعبةٍ مِنَ النِّفاق —

অর্থ : যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ সে জিহাদ করল না, জিহাদের চিন্তাও করল না সে একস্তরের মুনাফিকিতে মৃত্যুবরণ করল।

মুনাফিকদের চরিত্র হল, এরা সর্বদা মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে। এরা মানুষের নিকট গিয়ে নিজের আপত্তি তুলে ধরে নিজেকে অসহায় প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু তাদের এসব চেষ্টা আল্লাহ ও মানুষের নিকট গ্রহণীয় হয় না। আর মানুষ তার ওজর গ্রহণ না করলেই সে কসম খেয়ে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে।

এদের চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ ○

অর্থ : তোমরা তাদের নিকট ফিরে এলে তারা তোমাদের নিকট নানা ওজরের কথা বলবে। আপনি বলে দিন, আমরা কিছুতেই তোমাদের কথা বিশ্বাস করব না। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

অর্থ : আর আল্লাহ তো তোমাদের সব খবর বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখছেন আর তাঁর রাসূল দেখছেন। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে দৃশ্য-অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত মহান রবের নিকট। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন–

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ ○

অর্থ : তোমরা তাদের নিকট জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে এলে তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে। মুনাফিকদের এটাও একটা আলামত। তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে মানুষদেরকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করবে। বলবে, আসমান-জমিনের রবের কসম, স্রষ্টার কসম। যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, এভাবে তারা ধোঁকা দিতে চেষ্টা করবে। এর উদ্দেশ্য হল– لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ তাদের থেকে তোমাদের বিমুখ করা। সুতরাং তোমরা তাদের ব্যাপারে বিমুখ হয়ে থাক। অর্থাৎ তাদের সাথে কোন কথা বলো না। সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও। আল্লাহর রাসূল তাদের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর কারণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

অর্থ : নিশ্চয় তারা অপবিত্র আর তাদের অবস্থান হল জাহান্নামে। তাদের কৃতকর্মের কারণেই তাদেরকে তা বিনিময় স্বরূপ প্রদান করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক থেকে ফিরে এসে বললেন,

لا تُجالسُوهم و لا تكلّموهم —

তোমরা তাদের সাথে উঠাবসা করো না। তাদের সাথে কথাবার্তা বলো না। এর কারণ তারা তো নাপাক। তাদের সাথে বসলে তুমিও নাপাক হয়ে যাবে। এরা একেকজন একেকটি পঁচা ফল। মনে কর তোমার সামনে যদি একটি পঁচা আপেল থাকে তাহলে কি তার দুর্গন্ধের কারণে সেখানে স্থির হয়ে বসতে পারবে? নিশ্চয় তুমি তোমার নাক চেপে ধরে সেখান থেকে উঠে পড়বে। সুতরাং তুমি মুনাফিক থেকেও দূরে থাক। তার সংশ্রবে যেয়ো না। তার দুর্গন্ধ তোমাকে দূষিত করবে।

কবি বলেন–

يُعطيكَ من طرفِ اللّسانَ حلاوةً و يَروغُ عنكَ كما يَروغُ الثعلبُ —

অর্থ : সে তোমাকে জিহ্বার পাশ দিয়ে মিষ্টতা দেয় আর শৃগালের ন্যায় তোমার থেকে ফসকে বেরিয়ে যায়।

মুনাফিকদের সম্পর্কে রাসূল বলেছেন–

السنتُهم أحْلى من العَسَل و قلوبُهم قلوبُ الذّئابِ —

অর্থ : তাদের কথাবার্তা মধুর চেয়ে আরো বেশি মিষ্ট আর তাদের হৃদয় শৃগালের হৃদয়।

তাই এই মুনাফিকরা মুসলিম সমাজে লাঞ্ছিত অপদস্থ হয়ে থাকবে। সবাই তাদের দিকে তুচ্ছতার দৃষ্টিতে তাকাবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ○

অর্থ : তারা তোমাদের নিকট কসম খাবে যেন তোমরা তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। যদি তোমরা তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যাও তাহলে হতে পার, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ফাসিক সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবেন না।

সুতরাং তুমি ক্ষণিকের তরে একবার চিন্তা করে দেখ, কার ব্যাপারে তুমি সন্তুষ্ট হবে। তুমি কি একজন অমানুষের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে? পৃথিবীতে তার কী মূল্য আছে? সে এই সৌরজগতে এমন কী মহামূল্যবান বস্তু হয়ে গেল যে, তার জন্য তুমি তোমার রবকে ত্যাগ করবে? হে আল্লাহ! হে রহমান! আপনি আমাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমরা আপনার সন্তুষ্টি কামনা করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إِذَا أحبَّ اللهُ عبدًا نادَى جبريلَ إِنِّي أحببتُ فلانًا فأحبَّه ، ثم يُنادى جبريلُ في السَّماء أنَّ اللهَ يحبُّ فلانًا فأحِبُّوه ، ثم يُوضع له القبولُ في الأرضِ —

অর্থ : আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, আমি আমার অমুক বান্দাকে মহব্বত করি সুতরাং তুমিও তাকে মহব্বত কর। তারপর জিবরাঈল (আ.) আকাশে ঘোষণা করে দেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে মহব্বত করেন, সুতরাং তোমরাও তাকে মহব্বত কর। তারপর পৃথিবীতে সে একজন মকবুল ব্যক্তি হয়ে যায়। সম্মানী ব্যক্তি হয়ে যায়।

সুতরাং সৃষ্টির মাঝে কারো মহব্বত তৈরি হওয়া এক বিশাল ব্যাপার।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَأَلْقَيْتُ عليك محبَّةً مِنِي

অর্থ : আমার মহব্বত তোমার উপর ঢেলে দিলাম। আরেক জায়গায় বলেছেন–

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۝

অর্থ : দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্য মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন।

উল্লেখিত হাদীসের অপর অংশ হল–

وإذَا أبْغضَ اللهُ عبْدًا نَادَى جبريلَ إِنِّي أبْغضتُ فلانًا فأبْغضْه —

অর্থ : আর আল্লাহ যদি কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, অমুক বান্দাকে আমি অপছন্দ করি, সুতরাং তুমিও তাকে অপছন্দ কর।

فيُنادي جبريلُ في السَّماء : إنَّ اللهَ أبغضَ فلانًا فأبْغضوه، ثم يُنادي في أهْلِ الأرْضِ : إنَّ اللهَ أبغضَ فلانًا فأبغِضوه ، فيَزوعُ بعضُه في قلوبِ الخلقِ —

অর্থ : তখন জিবরাঈল আকাশে ঘোষণা করে দেয়, নিশ্চয় আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন তাই তোমরা তাকে অপছন্দ কর। তারপর পৃথিবীবাসীদের মাঝে ঘোষণা করা হয়, নিশ্চয় আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমার তাকে অপছন্দ কর। তারপর সৃষ্টির হৃদয়ে হৃদয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব রোপন করে দেয়া হয়।

ফলে পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যে, সে যতই ভাল কাজ করুক, যা কিছুই করুক মানুষ আর তাকে পছন্দ করে না। কারণ হৃদয় তো আল্লাহর হাতে। মানুষের হাতে নয়। তিনি অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করেন আবার হিংসা-বিদ্বেষভাবও সৃষ্টি করেন।

দেখা যায়, কোন ব্যক্তি রাজার মন্ত্রী হয়ে বিশ বৎসর রাজার সেবা করেছে। নিষ্ঠার সাথে রাজ্য পরিচালনায় রাজাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। তারপর এক সময়ে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করেছে। কে এভাবে রাজার মনকে ঘুরিয়ে দিল? নিশ্চয় তা হৃদয়ের মালিকের কাজ। সুতরাং হৃদয়ের মালিক আল্লাহর হুকুম মত চল। সকল সমস্যার সমাধান তিনিই করে দিবেন। আর তা না করলে পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে।

সে কালে মদীনার আশেপাশে কিছু মুনাফিক বসবাস করত। তারা মদীনার পার্শ্ববর্তী মরুভূমিতে থাকত। এদের أعراب বলা হত। এরা ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এরা তিন ধরনের ছিল, একদল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا ۝

গ্রাম্য এ সব লোকেরা কুফরী ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর।

দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলেন–

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۝

অর্থ : কিছু গ্রাম্য লোক আছে তারা যা খরচ করে তা জরিমানা মনে করে আর তোমাদের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করে। আর নিকৃষ্ট বিপর্যয় তাদের উপরই রয়েছে।

আর তৃতীয় দল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبٰتٍ عِندَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ۝

অর্থ : আর কিছু গ্রাম্য লোক আছে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে। সুতরাং গ্রাম্য বেদুইনদের অধিকাংশই অত্যন্ত কঠিন ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী। কথাবার্তা, চাল-চলনে এরা সীমাহীন উগ্র। এরা এমন প্রকৃতির যে মসজিদে প্রবেশ করে পেশাব করে দেয়। এজন্যই বলা হয়– مَنْ سَكَنَ البادِيةَ جَفَا যে ব্যক্তি গ্রামে মরুবাসীদের পরিবেশে বসবাস করে সে উগ্র কঠিন প্রকৃতির হয়ে যায়। তাই যারা উট পালে, মরুও রুদ্র পরিবেশে উটের মাঝেই থাকে, উটের গোশত খেয়েই বেঁচে থাকে তারা রুক্ষ স্বভাবের হয়। মেজাজ অত্যন্ত কড়া থাকে। আর যারা ছাগল প্রতিপালন করে, শহরের স্নিগ্ধ পরিবেশে থাকে, তারা শান্ত মেজাজের হয়। কোমল স্বভাবের হয়। এটাই আদিকাল থেকে প্রাকৃতিক নিয়ম।

এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কয়েকজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে কি আমরা উটের খোঁয়াড়ে নামায আদায় করব? রাসূল বললেন, না। তারা বললেন, তাহলে কি আমরা ছাগলের খোঁয়াড়ে নামায আদায় করব? রাসূল বললেন, হ্যাঁ। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, কেন? রাসূল বললেন, উট শয়তানের অন্তর্ভুক্ত। আরেক জায়গায় রাসূল এক হাদীসে বর্ণনা করেছেন–

مَنْ أَكَلَ لَحمَ الجزُورِ فَلْيَتَوَضَّأْ —

যে ব্যক্তি উটের গোশত খাবে সে যেন ওজু করে। কেন ওজু করবে? কারণ তার শরীরে আগুনের কিছু অংশ প্রবেশ করেছে। তা হল উটের দ্রুত ক্রুদ্ধ হওয়া। আর কিছু নিষ্ঠুরতা প্রবেশ করেছে। তাও এক ধরনের আগুন। তাই এ আগুনকে নেভাতে হলে ওজুর প্রয়োজন। এ কারণে রাসূল উটের গোশত খাওয়ার পর ওজু করার নির্দেশ দিয়েছেন। ওজু করার এ নির্দেশটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর মাযহাব মতে ওয়াজিব। আর অন্যান্য ইমামদের নিকট তা মুস্তাহাব। এজন্য রাসূল ক্রুদ্ধ হলে ওজু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সেই নিষ্ঠুর গ্রাম্য লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ○

অর্থ : গ্রামীণ মরুবাসীরা কুফরী আর মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ তার রাসূলের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখা তারা জানবে না।

এ কারণেই সকল ফকীহ একমত যে, ফাইয়ের মধ্যেও বেদুইনদের কোন অংশ নেই। গণীমতের মালের মাঝেও তাদের কোন অংশ নেই। কারণ, এক ঃ তারা মুসলমানদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করে না।

দুইঃ গ্রামীণ বেদুইন ব্যক্তিরা শহুরে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষী দিলে তা গ্রহণ করা হবে না।

তিনঃ কোন গ্রামীণ বেদুইন শহুরে মানুষের ইমাম হতে পারবে না। এটা নিষেধ।

ত্রয়স্ত্রিংশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(৯৯) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (১০০) وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

অর্থ : কিছু বেদুইন আছে, যারা ইমান আনে আল্লাহর ওপর, পরকালের ওপর, নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনে রাখ, তাই হল তাদের জন্য নৈকট্য। আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। আর যারা সর্বপ্রথম হিজরত করেছে আর আনসারদের মাঝে যারা সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যারা তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন এমন কাননকুঞ্জ যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরমালা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হল মহান সফলতা। (সূরা তওবা ঃ ৯৯-১০০)

আল্লাহ তা'আলা বেদুইনদের আলোচনা করার পর তাদের দু'টি দলের আলোচনা করেছেন, যারা কুফরী আর মুনাফেকীতে অত্যন্ত প্রবল ও প্রচণ্ড। এরা যাকাতকে জরিমানা ও ট্যাক্স মনে করে। তাই তারা মুসলমানদের পরাজয় কামনা করে। তাদের বিপদাপদের প্রত্যাশায় থাকে। যেন তারা যাকাত প্রদান থেকে মুক্তি পায়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বেদুইনদের তৃতীয় আরেক প্রকারের আলোচনা করেছেন, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে। যাকাত, সদকা ও আল্লাহর রাস্তায় যে অর্থ ব্যয় করে তা দ্বারা শুধু আল্লাহর নৈকট্য লাভেরই প্রত্যাশা করে। এবং আল্লাহর রাসূলের দু'আর প্রত্যাশায় অধীর হয়ে থাকে। এখানে صلوات শব্দের একবচন হল صلاة আর অর্থ হল দু'আ। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ○

অর্থ : নিশ্চয় তাদের জন্য আপনার দু'আ তাদের প্রশান্তি ও স্থিরতার কারণ। তাই তারা জিহাদে খরচ করে, যাকাত প্রদান করে, সদকা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের প্রত্যাশা করে। আল্লাহর রাসূলের দু'আ প্রত্যাশা করে। যা তাদের হৃদয়ের প্রশান্তি ও স্থিরতার কারণ। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ○

তোমরা শুনে নাও, নিশ্চয় তাদের এ আমলগুলো তাদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে এক মহা সুসংবাদ দিয়ে বলেন—

سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ○

সত্তর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর রহমতে প্রবেশ করাবেন। রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

এ সুসংবাদ যে কত বড় সুসংবাদ তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা আমাদের সম্ভব নয়। মনে করো, কোন মানুষ দুনিয়াতে চলাফেরা করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। সবকিছুই করছে আর সে জানে সে জান্নাতী। তাহলে

তার হৃদয় কত প্রশান্ত হতে পারে। কোন ধরনের নিশ্চিত জীবন যাপন সে করতে পারে? ঐ ব্যক্তির জীবনে এরচে' বড়, মহা আর কোন সৌভাগ্য, আর কোন নেয়ামত হতে পারে?

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে হাত রেখে বাই'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে কুরআনে ঘোষণা করলেন–

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ○

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষের নিচে বাই'আত গ্রহণ করেছে। (সূরা ফাতাহ ঃ ১৮) বাই'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা পৃথিবীতে কাজ-কর্ম, চলাফেরা, সবকিছুই করতেন। তারা জানতেন যে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এরচে' উঁচু মর্যাদা আর কী হতে পারে? এই নির্মল আনন্দ, প্রশান্তি আর সুখের চেয়ে বড় আর কী হতে পারে?

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন–

مَنْ أرادَ أن ينظرَ إلى شهيدٍ يَمشي على الأرضِ فلينظُرْ إلى طلحةَ بنِ عبيدِ الله —

অর্থ : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে বিচরণশীল কোন শহীদকে দেখতে চায় সে যেন ত্বলহা ইবনে উবায়দুল্লাহকে দেখে।

এরচে' সুখের, আনন্দের আর প্রশান্তির কী হতে পারে যে, পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে, অথচ সে শহীদদের মাঝে পরিগণিত। মৃত্যুর পরই সে শাহাদাতের উঁচু মর্যাদা লাভ করবে। উহুদের যুদ্ধে যখন ত্বলহা (রাঃ) রাসূলের সামনে দাঁড়িয়ে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করছিলেন, তখন কাফেরদের তীরের আঘাতে তার একটি আঙ্গুল অবশ হয়ে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিমুগ্ধ হয়ে বললেন–

أوجب طلحة —

অর্থ : 'ত্বলহা তার জন্য জান্নাতকে অবধারিত করে নিয়েছে।' ব্যস সে তো কামিয়াব হয়ে গেল। নিশ্চিত জান্নাতের অধিবাসী বিঘোষিত হয়ে দুনিয়াতে চলাফেরা করছে।

কাইস ইবনে সাবেত (রাঃ) এর ঘটনা আরো বিস্ময়কর। তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু ছিল। সর্বদা উঁচু কণ্ঠেই কথা বলতেন। যখন নাযিল হল–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ○

অর্থ : হে মু'মিনরা! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপরে তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না। এবং তোমরা পরস্পরে যেরুপ উঁচুস্বরে কথা বল তার সাথে সেরুপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে। (সূরা হুজুরাত ঃ ২)

তিনি তখন পরিবারের নিকট চলে এলেন। বললেন, হায়, হায়, আমার সকল আমল তো নিস্ফল হয়ে গেছে। আমি তো রাসূলের কণ্ঠস্বরের উপর আমার কণ্ঠস্বরকে উঁচু করতাম। তারপর তিনি রাসূলের মজলিসে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুপস্থিত দেখে তালাশ করতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কাইস কোথায়, তাকে তো দেখছি না?

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (উল্লেখিত) আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি একটি ঘরে বসে বসে শুধুই কাঁদছেন। রাসূল বললেন, কাউকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আন। তিনি এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

أما تَرضى أن تَعيشَ سَعيدًا و تُقتل شهيدًا و تَدخُل الجنةَ ؟ قال : بلى يا رسولَ الله —

'হে কাইস, তুমি কি পছন্দ করো না যে তুমি সৌভাগ্যবান হয়ে জীবন যাপন করবে। শহীদ হয়ে নিহত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

কাইস (রাঃ) ইয়ামামার যুদ্ধের সময় শাহাদাত বরণ করেন। তিনি তো পূর্ব থেকেই জানতেন, তিনি আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণ করে জান্নাতবাসী হবেন। তখন তার হৃদয়ে কত আনন্দ, কত উল্লাস তরঙ্গায়িত হত, এটা আমাদের ভাবাও অসম্ভব। একজন অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মহিলা সাহাবী ছিলেন উম্মে আইমান (রাঃ)। তিনি ছিলেন উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) এর মাতা। তিনি ছিলেন হাবশী। কালো কুচকুচে ছিল তাঁর দেহের বর্ণ। আর যায়েদ (রাঃ) এর দেহবর্ণ ছিল শ্বেত। তিনি উম্মে আইমান (রাঃ) কে বিয়ে করলেন। তাদের একটি সন্তান হল উসামা। তার দেহের বর্ণও ছিল কালো। তিনিই ইসলামের ইতিহাসে উসামা ইবনে যায়েদ নামে খ্যাত।

যদিও উম্মে আইমান (রাঃ) কৃষ্ণ বর্ণের ছিলেন। পরিস্কার ভাষায় কথা বলতে পারতেন না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। তাকে জান্নাতী নারীদের মধ্যে গণ্য করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) কে বললেন, চল আমরা উম্মে আইমানকে দেখে আসি। তাঁর খবরাখবর নিয়ে আসি। উম্মে আইমান (রাঃ) তাঁদের দেখেই কেঁদে ফেললেন। উম্মে আইমান শৈশবে রাসূলকে কোলে কাঁধে নিয়েছিলেন। তিনি রাসূলের বাঁদী ছিলেন। রাসূল তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে যায়েদ (রাঃ) এর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন।

আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এ অবস্থা দেখে বিচলিত হলেন। বললেন, হে উম্মে আইমান, আপনি কাঁদছেন কেন? রাসূল তো তাঁর রবের নিকট চলে গেছেন।

উম্মে আইমান বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচ্ছেদের কারণে কাঁদছি না। আকাশ থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণেই আমি কাঁদছি। এই ছিল উম্মে আইমানের বেদনা। এই ছিল তাঁর দুঃখ। মক্কা থেকে মদীনা সাড়ে চারশত কিলোমিটার পথ। উম্মে আইমান একা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওনা হয়ে গেলেন। আকাশ থেকে আগুন ঝরছে। রৌদ্রের প্রখরতায় মরু পথের ধুলাবালি পুড়ে লাল হয়ে গেছে। বাতাসের ঝাপটায় নরকের আগুনের উত্তাপ। পিপাসায় গলা শুকিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত। হঠাৎ আল্লাহর রহমত দৃষ্টিগোচর হল। দেখলেন, আকাশ থেকে এক বালতি পানি নেমে এসেছে। তিনি সাথে সাথে সেই শীতল পানি পান করে পিপাসা দূর করলেন। সেই পানি পান করার পর তিনি জীবনে আর কখনো পিপাসার্ত হননি। তাই উম্মে আইমান (রাঃ) প্রখর গ্রীষ্মের দিনগুলোতে অত্যন্ত আনন্দের সাথে রোযা রাখতেন। তাই বলছি, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত সজাগ ও সচেতন অবস্থায় জীবন যাপন করতেন। কারণ, তারা ভয় করতেন কখন হয়তো তাঁর ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়ে যেতে পারে। নবম হিজরীতে যখন আবু বকর (রাঃ) হজ্জ আদায় করতে মক্কা মুয়াযযমায় এলেন, তখন আলী (রাঃ) সূরা তওবার শুরুর সদ্য অবতীর্ণ চল্লিশটি আয়াত নিয়ে মক্কায় এলেন। আবু বকর (রাঃ) এ সংবাদ শুনে আতংকিত হয়ে বললেন–

أمامورٌ أم آمرٌ 'তোমাকে কি কোন হুকুম দেয়া হয়েছে, না তুমি কোন হুকুম দেবে?' আলী (রাঃ) বললেন, বরং আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর হৃদয় প্রশান্ত হল। তাই বলছি, সাহাবীরা সর্বদা ভীত শংকিত অবস্থায় থাকতেন।

এখন আমরা রাসূলের যুগের মু'মিনদের আলোচনায় ফিরে যাই। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলছেন–

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ○

অর্থ : যারা সর্বপ্রথম হিজরত করেছে আর আনসারদের মাঝে যারা সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছে আর যারা তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট।

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, সন্তুষ্টি। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাই শ্রেষ্ঠ সার্টিফিকেট যে, তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট আর আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তাঁরা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট মানে সকল বিষয়ে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট। বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করে, আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إنَّ فِي الجنةِ لأناسًا مُجنَّحِينَ يَطيرُون فِي الجنة حيثُ يَشاءُون ، يَسألُهم أهلُ الجنةِ مَا بَالكُم، أنتم بأجْنِحةٍ و نَحنُ بدون أجنحةٍ ؟ قالوا : كنَّا نَرضى بالقَضَاء و نَصبرُ على البلاءِ و نَشكُر في الرَّخاء ـــ

অর্থ : জান্নাতে কিছু ডানা বিশিষ্ট লোক থাকবে। তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়ে যাবে। জান্নাতীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কী হল? তোমাদের ডানা আছে আর আমাদের ডানা নেই।উত্তরে তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট ছিলাম। বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতাম আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতাম।

তাই বলছি, আল্লাহর সব ধরনের ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এক বিশাল নেয়ামত। এ নেয়ামতের কোন তুলনা হয় না। বিজয় এলে সন্তুষ্ট, পরাজয় হলে সন্তুষ্ট, দরিদ্রাবস্থায় সন্তুষ্ট, স্বচ্ছলতা আর নেয়ামত পেয়ে সন্তুষ্ট। এভাবেই মানুষ মর্যাদার উঁচু পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আল্লাহর অতি নৈকট্যশীল বান্দা হয়ে যায়। উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) বলেছেন–

أصْبحتُ و مالي سُرورٌ إلاَّ في مواقعِ القَضَاءِ و القدْرِ ـــ

অর্থ : আমি মুজাহাদা করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছি যে এখন আল্লাহর ফায়সালা আর তাকদীরের উপরই আনন্দিত হই।

আর উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন–

لو كانَ الصبرُ و الشكرُ جَوادَين ما باليتُ أن أكربَ أحدَهما ـــ

অর্থ : যদি সবর আর শোকর দু'টি ঘোড়া হত, তাহলে আমি তার একটিতে আরোহণ করতে একটুও চিন্তা-ফিকির করতাম না।

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) ছিলেন এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। তিনি বলতেন–

الفقرُ أحبُّ إليَّ مِنَ الغِنَاءِ و المَرضُ أحبُّ إلي مِنَ الصِّحَّة ـــ

অর্থ : দারিদ্র্য আমার নিকট স্বচ্ছলতার চেয়ে অধিক প্রিয় আর অসুস্থতা আমার নিকট সুস্থতার চেয়ে অধিক প্রিয়।

তিনি একাই ছিলেন এক ব্যক্তিত্ব। একাকী জীবন যাপন করেছেন। একাকী মৃত্যুবরণ করেছেন। আবার একাকী উত্থিত হবেন- এই ছিল তার সম্পর্কে রাসূলের ভবিষ্যৎবাণী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে বলেছেন–

مَا أظَلَّ الخَضْراءُ و أقلَّت الغَبراءُ رَجلاً أصْدقَ لهجةً مِن أبي ذرٍّ ـــ

অর্থ : আবু যরের চেয়ে সত্যবাদী কোন মানুষকে গাছ ছায়া দেয়নি এবং পৃথিবী ধারণ করেনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তিনি যা দেখেছেন তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সহ্য করতে পারতেন না। অনুভূতির এই প্রচণ্ডতার কারণে তিনি হযরত উসমান (রাঃ) এর শাসনামলে মদীনার পথে পথে লাঠি নিয়ে ঘুরতেন। যাকে একটু শিথিল পেতেন তাকেই লাঠিপেটা করতেন। উসমান (রাঃ) তাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, হয় আপনি মানুষের ব্যাপারে মননশীল হন, না হয় একাকী থাকার ব্যবস্থা করুন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, এদের মাঝে পরিবর্তন এসে গেছে। আমি এদের সাথে থাকতে পারব না। তারপর তিনি রাবজায় চলে গেলেন। রাবজা হল মদীনার বাইরে যাকাতের উট রাখার একটি জায়গা। নির্জন প্রান্তর। মানুষের আনাগোনা সেখানে নেই। তার সাথে রইলেন তার স্ত্রী।

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তার স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কে আপনাকে দাফন করবে? কে আপনার জন্য কাফনের কাপড় কিনে আনবে? আর কারা আপনার জানাযার নামায পড়বে? তিনি তখন অত্যন্ত স্থির কণ্ঠে বললেন, কিছু লোক আসবে। আল্লাহর রাসূল আমাকে এভাবেই বলেছেন।

তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁর পাশে স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। তখন ছিল হজ্জের মৌসুম। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সেদিক দিয়েই একটি কাফেলা নিয়ে হজ্জে যাচ্ছিলেন। দূরে একটি তাঁবু দেখে তিনি সেখানে গেলেন। বললেন, হে আল্লাহর বান্দী, তুমি কে? উত্তর এল, আমি আবু যরের স্ত্রী। আর এইতো আবু যরের লাশ।

এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর কাফেলার সাথীদের নিকট ফিরে এলেন। বললেন, রাসূলের সাহাবী আবু যর এর লাশ। চল। তারা সেখানে গেলেন, গোসল দিলেন, কাফন পড়ালেন. জানাযার নামাজ আদায় করলেন।

বলছিলাম, ইসলামের প্রথম যুগের মানুষেরা মানুষের পোশাকে ফেরেস্তা ছিলেন। বরং ফেরেস্তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাদের প্রত্যেকে শুধু একটি বিষয়ের জন্যই জীবনযাপন করতেন, তা হল তার দীন-ধর্ম, আক্বীদা-বিশ্বাস। স্ত্রী, পরিবার-পরিজন, খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাকার কোন কিছুই তার সমতুল্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা হিজরত কর। ব্যস, দুনিয়ার সব সম্পর্ক, সব সম্পদ, সবকিছু পশ্চাতে ফেলে শূণ্য হাতে মক্কা ত্যাগ করতে একটুও দ্বিধা করলেন না। এক বিস্ময়কর পদ্ধতিতে, এক অবিশ্বাস্য পন্থায় আল্লাহর রাসূল তাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন। যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাবে না।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফতকালের কথা। তিনি হযরত উমর (রাঃ) কে মদীনার বিচারপতি নিযুক্ত করলেন। এক বৎসর কেটে গেল কিন্তু কোন অভিযোগ, কোন বিচার তার নিকট এল না। ক্ষণিকের তরে ভেবে দেখ, সে কেমন সমাজ ছিল? এক বৎসরে একটি বিচার পর্যন্ত এল না। এক বৎসর পর উমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট এসে বললেন, হে আবু বকর! আমার এ দায়িত্ব আপনি প্রত্যাহার করে নিন। আবু বকর (রাঃ) বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললেন, কেন? কী হয়েছে? উমর (রাঃ) বললেন, আমি তো হারাম খাচ্ছি। কোন কাজ ছাড়াই আমি বাইতুল মাল থেকে ভাতা নিচ্ছি। এটা হতে পারে না।

সে সমাজ কত আদর্শবান ছিল। কতো সুখময় ছিল। সে সমাজেরই এক কাহিনী। এক ব্যক্তি এক মহিলার দিকে বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক দেয়ালের সাথে গিয়ে আঘাত পেল। নাকে ব্যাথা পেল। নাক থেকে রক্ত প্রবাহিত হল। লোকেরা তার অবস্থা দেখে বলল, রাসূলের নিকট গিয়ে ঘটনাটি বলে তওবা না করলে, ক্ষমা প্রার্থনা না করলে এ রক্ত আর বন্ধ হবে না। লোকটি রাসূলের নিকট এসে সব কিছু খুলে বলে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তখন নাযিল হল–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ○

অর্থ : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মু'মিনদের বলে দিন তারা যেন তাদের চোখকে অবনমিত করে রাখে এবং তাদের লজ্জা স্থানকে হেফাজত করে। (সূরা নূরঃ ৩০)

আরেকটি ঘটনা বলছি। এক ব্যক্তি যিনা করল। তিনি আল্লাহর রাসূলের একজন সম্মানিত সাহাবী। তার নাম মায়েয। কেউ তাকে দেখেনি। কেউ তা জানে না। আর তিনি জানেন, যে পাপ তিনি করেছেন তার শাস্তি হল প্রস্তর আঘাতে হত্যা করা। কী নির্মম এ শাস্তি! হায় যদি গুলি করে হত্যা করা হত, এ কেমন কঠিন শাস্তি! চারদিক থেকে পাথর মারতে মারতে তাকে পাথরে ঢেকে ফেলবে। এ অবস্থায় তার মৃত্যু হবে। কিন্তু মায়েয আসলামী (রাঃ) সব কিছু জানা সত্ত্বেও এ শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। ভাবলেন, এ কলুষিত নাপাক দেহ নিয়ে কীভাবে তিনি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। তাই তাকে পবিত্র হতেই হবে। রাসূলের নিকট এসে বললেন, طَهِّرنِي يا رسولَ الله হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো যিনা করে অপবিত্র হয়ে গেছি আপনি আমাকে পবিত্র করুন। রাসূল তাকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু মায়েয আসলামী ফিরে গেলেন না। চার বার এসে নিজের পাপের কথা স্বীকার করে পবিত্র করার আবেদন করলেন।

রাসূল তখন সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তার মাঝে কি উন্মাদনা আছে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, সে তো সুস্থ। রাসূল বললেন, হে মায়েয! হয় তো তুমি তাকে স্পর্শ করেছো। হয়তো তুমি তাকে চুমু খেয়েছো। ইনিয়ে বিনিয়ে আরো অনেক সম্ভাবনার কথা বললেন। কিন্তু মায়েয আসলামী (রাঃ) তার কথায় একেবারে অনড় অবিচল। তিনি বললেন– زَنيتُ فطَهِّرنِي يا رسولَ الله হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পবিত্র করুন। তারপর রাসূলের নির্দেশে তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হল। তারপর তার জানাযার নামায হল ও তাকে দাফন করা হল।

এ ঘটনার পর রাসূল সাহাবীদের নিয়ে এক যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। এ কাফেলার সবশেষে ছিলেন দু'জন সাহাবী। তারা পরস্পরে কথা বলছিলেন। তখন তাদের একজন বললেন, এই মায়েযের পাপের কথা তো আল্লাহ তা'আলা গোপন করে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তো নিজেই তার পাপের কথা স্বীকার করে নিজেকে অপমান করলেন।

ওহীর মাধ্যমে রাসূল তাদের আলোচনার কথা জেনে ফেললেন। কিন্তু কাউকে কিছু বললেন না। পথ চলতে চলতে দেখলেন, পথের পাশে একটি মরা গাধার দেহ পড়ে আছে। পঁচে গলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। রাসূল বললেন, অমুক অমুক কোথায়? তাদের উপস্থিত করা হল। বললেন, যাও তোমরা ঐ মরা গাধার গোশত খাও। তারা দারুণ বিস্মিত হল। বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেমন কথা বলছেন? মরা গাধার গোশত কি খাওয়া যায়? তখন রাসূলের কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে এল। বললেন–

مَا نِلْتُما آنِفًا مِن صاحِبِكما أشدُّ مِن هذه الجيفةِ و الذِي نفسِي بِيَدِه إنَّه لفِي أنهارِ الجنَّة يَغتسلُ بها الآنَ —

অর্থ : তোমরা কিছুক্ষণ পূর্বে তোমাদের সাথীদের পরচর্চা করে যে পাপ করেছো তা এই মরা গাধার গোশত খাওয়ার চেয়েও গুরুতর। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, সে এখন জান্নাতের নহরে গোসল করছে।

গামেদী গোত্রের সেই নারীটিও জানে, সে যে পাপ করেছে তার শাস্তি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। মৃত্যুই তাকে পূত-পবিত্র করতে পারে। একবার, দু'বার, তিন বার সে রাসূলের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যিনা করে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছি। আমাকে পবিত্র করুন। রাসূল বললেন, যাও, প্রসব করার পর এসো। প্রসবের পর সন্তান নিয়ে ছুটে এলেন। রাসূল বললেন, যাও, দুধ ছাড়িয়ে তারপর এস। দুধ ছাড়িয়ে রাসুলের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন। এই তো তার হাতে রুটি।

তখন রাসূল তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার নির্দেশ দিলেন। বুক পর্যন্ত গর্ত করে তাতে তাকে রেখে বুক পর্যন্ত মাটি দিয়ে ভরাট করে ফেলা হল। তারপর তাকে প্রস্তর মেরে হত্যা করা হল। হযরত খালিদ (রাঃ) তাকে পাথর ছুড়ে মারলেন। তখন রক্ত ছিটকে তার শরীরে এসে লাগল। তখন খালিদ (রাঃ) তাকে অভিশাপ দিলেন। রাসূল তা শুনে বললেন–

مهلاً يا خالدُ، لقد تابتْ توبةً لو قُسِمَتْ علَى أهلِ المدينةِ لَوَسِعَتهم —

অর্থ : থাম হে খালিদ, থাম। অভিশাপ দিয়ো না। সে আজ এমন তওবা করেছে যদি তা মদীনাবাসীদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয় তাহলে তা তাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

একবার কি ভেবে দেখেছো? এর চেয়ে বড় কুরবানী আর কী হতে পারে যে নিজের জীবনকে পর্যন্ত জেনে শুনে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করে বিলিয়ে দিয়েছে। তবুও তারা পাপের বোঝা নিয়ে দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে নারাজ।

এই ছিল ইসলামের প্রথম যুগের অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের অবস্থা। কুরবানীর ইতিহাস। তারা যেন আল্লাহকে নিজ চোখে দেখতেন। ইসলামের প্রথম সময়ের কথা। আবু বকর (রাঃ) দেখলেন মক্কার কাফেররা কা'বা চত্ত্বরে রাসূলকে মারছে। রাসূলের শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। তিনি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহকে বললেন–

رَبِّ ما أحْلَمَك ... رَبِّ ما أحْلَمَك ...

'হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! তুমি কতোই না ধৈর্যশীল, কতোই না সহনশীল। এমনই আরেক ঘটনা ঘটেছে উমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে। তিনি তখন রাতের অন্ধকারে মদীনার সাধারণ মানুষদের অবস্থা স্বচোখে দেখছেন। পর্যবেক্ষণ করছেন। অলিতে গলিতে ঘুরছেন। হঠাৎ দেখলেন, একটি জীর্ণ ঘরের মধ্য থেকে এক মহিলার কণ্ঠ ভেসে আসছে। বলছে, দুধে পানি দিয়ে দাও। তাড়াতাড়ি কর। সকাল হয়ে গেছে। তারপর এক কিশোরীর নিস্পাপ কণ্ঠ ভেসে এল। কিশোরী বলছে, আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনে খাত্তাব তো দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আমি তা পারব না।

মহিলার কণ্ঠে ক্রোধের আভা। বলল, এই সাত সকালে তো উমর আমাদের দেখবেন না। কিশোরী বলছে, যদি উমর আমাদের নাও দেখে তাহলে কোন দুঃখ নেই। কারণ উমরের রব তো আমাদের দেখছেন। সুবহানাল্লাহ! এ কেমন দীক্ষা! কেমন প্রতিপালন! ইতিহাস কি কখনো এ ধরনের ঘটনা দেখেছে?

উমর (রাঃ) সেই বাড়িতে একটি চিহ্ন দিয়ে এলেন। পরদিন সেই মেয়ে ও তার মায়ের নিকট লোক পাঠিয়ে তাদের উপস্থিত করালেন। তার ছেলে আসেমকেও ডেকে আনলেন। বললেন, 'হে আসেম! আমি একজন সৎকর্মপরায়ণ কিশোরীকে তোমার সাথে বিয়ে দিচ্ছি। এই কিশোরী এক মেয়ে জন্ম দিয়েছিল। সেই মেয়েকে বিয়ে করেছিল আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান। আর তার গর্ভে জন্ম লাভ করেছেন উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)। যাকে ঐতিহাসিকেরা খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য করেন।

তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম সংস্কারক বা মুজাদ্দিদ।

ইসলামের প্রথম যুগের লোকেরা, সাহাবীরা এমনই বিস্ময়কর ছিলেন। তাই তারা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তারা বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনাও দেখিয়ে ছিলেন।

রাসূলের যুগে বাহরাইন ছিল এক বিরাট ভুখণ্ড। কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, ইইসা অর্থাৎ আরব উপদ্বীপের গোটা পূর্বাঞ্চলকেই বাহরাইন বলা হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে হাজরামী (রাঃ) কে সেনাপতি বানিয়ে বাহরাইন প্রেরণ করলেন। পথে মরুঅঞ্চল অতিক্রমকালে তারা ভীষণ পানি সংকটে পড়লেন। তৃষ্ণায় মরে যায় যায় অবস্থা। এ অবস্থা দেখে আলা ইবনে হাজরামী (রাঃ) বললেন, এসো আমরা দু'রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর নিকট দু'আ করি। তারা তাই করলেন। বিগলিত নয়নে দু'আ করলেন আর অমনি

বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। মুষল ধারায় বৃষ্টি ঝরতে লাগল। সাহাবায়ে কেরাম পিপাসা দূর করলেন। পাত্রগুলো পানি দ্বারা পূর্ণ করলেন। ঘোড়া ও উটগুলোকেও পান করালেন। তারপর তারা সমুদ্রের তীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এবার উপায়? বিশাল জলরাশি কীভাবে পাড়ি দিবেন? সমুদ্রের বিশাল বিশাল তরঙ্গমালা একের পর এক বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে। না, আলা ইবনে হাজরামী (রাঃ) কোন চিন্তা করলেন না। তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর দু'আ করলেন। বললেন–

يا حليمُ ... يا عظيمُ .... يا كريمُ .... أجزنـــا ــــ

অর্থ : হে মহানুভব, হে মহান, হে দয়াময় আল্লাহ! আপনি আমাদের সমুদ্র অতিক্রমের ব্যবস্থা করে দিন। এভাবে চারবার বললেন। তারপর সমুদ্রের পানির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটালেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন–

وَ اللهِ مابتلّ لنا قدمٌ و لا خُفٌ لإبلٍ و حافرٍ لحصانٍ أو بغلٍ و كنّا أربعةَ ألآفٍ ــــ

অর্থ : আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমাদের পা পানিতে ভিজেনি। উট, ঘোড়া এবং গাধার খুর পর্যন্ত পানিতে ভিজেনি। আর আমরা ছিলাম চার হাজার যোদ্ধা।

ঠিক একই রকমের ঘটনা ঘটেছে পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েন বিজয়ের সময়। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এর নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী দজলা নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছল। সাথে ছিলেন সালমান ফারসী (রাঃ)। দজলা নদীতে তখন জোয়ারের পানি। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ অবস্থা। এ অবস্থায় মাঝি মাল্লারা পর্যন্ত পাড়ি দিতে সাহস করে না, কিন্তু আল্লাহর সৈনিকদের কে প্রতিহত করে? সালমান (রাঃ) বললেন, نَهرٌ من أنهار الله يَمنعُ جندَ الله অর্থ : 'আল্লাহর বাহিনীকে আল্লাহর এক সৃষ্টি নদী প্রতিহত করবে?' তা কিছুতেই হতে পারে না। সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ) এর হাত ধরলেন। তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে ঘোড়া ছুটালেন। দজলার বুক চিরে তারা ছুটতে লাগলেন। তাদের অনুসরণ করে তাদের পশ্চাতে ত্রিশ হাজার মুজাহিদও ঘোড়া ছুটালেন। বর্ণিত আছে, এ সময় তারা কিছুই হারাননি। এক সাহাবী একটি গ্লাস হারিয়ে ফেললে বাহিনীর যাত্রা বিরতি দিয়ে গ্লাস খুঁজে বের করে তারপর তারা আবার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আসেন। এদিকে নদীর অপর পারে পারস্য সাম্রাজ্যের সৈন্যরা মুসলমানদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য প্রহরা দিচ্ছিল। বহু মানুষ মুসলমানদের কাণ্ড দেখার জন্য অপর পাড়ে জমায়েত হয়েছিল। তারা যখন দেখল, মুসলমানরা নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে ও ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে তখন ভয়ে চিৎকার দিতে দিতে পালাতে লাগল। তারা বলতে লাগল– دیو آمد.. دیو آمد.. দানব আসছে। দানব আসছে। পালাও, পালাও।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এতো কিছু করার পরও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি শিক্ষা ও আদর্শকেও হারাননি।

কিসরা সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে গেল। আর সালমান ফারসী (রাঃ) সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সিংহাসন হারিয়ে কিসরা খুব কাঁদতে লাগল। জিজ্ঞেস করা হল, হে মহান সম্রাট! আপনি এতো কাঁদছেন কেন? জবাবে কিসরা বলল, আমি কিভাবে বাঁচব, অথচ আমার সাথে তো আমার মাত্র এক হাজার বাবুর্চি ও এক হাজার বাজপাখি পরিচর্যাকারী রয়েছে। আহ কতো অসহায়! কতো বিপন্ন! সাথে মাত্র এক হাজার বাবুর্চি ও এক হাজার বাজ পাখি পরিচর্যাকারী আছে! এ দুঃখে কাঁদছে।

অপর দিকে কিসরার সিংহাসনে বসে সালমান ফারসী (রাঃ) দিনে মাত্র এক দেরহাম খরচ করতেন। দিনে বাঁশ কিনে আনতেন। রাতে তা দ্বারা ঝুড়ি তৈরী করতেন আর সকালে তা তিন দেরহামে বিক্রয় করতেন। এক দেরহাম দান করে দিতেন, আরেক দেরহাম খরচ করতেন। আরেক দেরহাম দিয়ে আরেকটি বাঁশ কিনে আনতেন। এই ছিল তার জীবনযাত্রার মান। এই ছিল কিসরার স্থলাভিষিক্ত শাসকের জীবনের চালচিত্র।

সালমান (রাঃ) বসবাসের জন্য একটি ঘর বানাতে ইচ্ছে করলেন। একজন মিস্ত্রি নিয়ে এলেন। বললেন, আমি এখানে একটি ঘর বানাতে চাই। তুমি বলতে পারবে ঘরটি কেমন হবে? মিস্ত্রি বলল, হ্যাঁ, পারব। আপনি দাঁড়ালে যতটুকু উঁচু হন ঠিক ততটুকু উঁচু হবে। আর শয়নকালে আপনি যতটুকু লম্বা হন ততটুকু লম্বা হবে। এবার ভেবে দেখ, রাসূল যাদের তৈরী করে ছিলেন, তারা কেমন ছিলেন। সত্যিই তারা দুনিয়াতে মানুষের বেশে ফেরেশতা ছিলেন। নিষ্পাপ ছিলেন। নির্মোহ ছিলেন। দুর্বলতা থেকে উর্ধ্বে ছিলেন। তাই আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্টি ও জান্নাতি হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

নিশ্চয় তোমরা মুহাম্মাদ জালাল কাশকের নাম শুনেছো। একজন প্রসিদ্ধ শিয়াবাদী লেখক ছিলেন। তারপর তিনি সুন্নী হয়েছেন। তার লেখা বেশ কয়েকটি প্রসিদ্ধ পুস্তক রয়েছে। তার রক্তের তরঙ্গে তরঙ্গে ছিল জিহাদের স্পৃহা। শাহাদাতের অমীয় তৃষ্ণা। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ সাল পযন্ত সে জর্দানের ফ্রন্টে জিহাদে রত ছিলো। একবার সে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এল। আমাদের সেখানেও একটা নিয়ম ছিল। কোন মেহমান এলে তার দায়িত্ব হত পাহারা দেয়া। আর খাবারের ব্যাপারে সবাই সমান। মুজাহিদদের জন্য যে খাবারের ব্যবস্থা হত, মেহমানকেও তাই দেয়া হত। এখন তো আফগানিস্তানে আমরা বিগত দিনগুলোর চেয়ে অনেক ভাল খাচ্ছি। আর সেখানে প্রায়ই ডাল আর যাইতুনের ব্যবস্থা হত। এগুলো দিয়েই আমাদের জীবন কেটে যেত। অত্যন্ত তৃপ্তির সাথেই আমরা তা খেতাম।

নিয়মানুযায়ী সেদিন জালাল কাশকের প্রহরার দায়িত্ব পড়ল। ঘটনাক্রমে সেদিন ওমান থেকে আমাদের এক বন্ধু এল। যারা মুজাহিদ ক্যাম্পে ছিল তাদের জন্য উপঢৌকন স্বরুপ এক বাক্স আপেল নিয়ে এল। সবাইকে তা ভাগ করে দেয়া হল। জালাল কাশকের ভাগেও একটি আপেল এল। যখন তাকে ডাল আর একটি আপেল খাবারের জন্য দেয়া হল। দেখে তো বিস্ময়ে হতবাক। বলল, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি কোন একটি আরব দেশ আমাদের মত বসবাস করত তাহলে আমরা গোটা পৃথিবী পরাজিত করতে পারতাম।

আসলেও, বাস্তব কথাই সেদিন জালাল কাশক বলেছিল। একটু ভেবে দেখ, কেন আমরা আজ নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছি? কেন আমরা অপদস্ত-লাঞ্ছিত হচ্ছি? কীসের কারণে আজ আমরা নতশিরে আছি? কেন আমরা শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারছি না? এর একটাই কারণ, আমরা দুনিয়ার পিছনে পড়ে গেছি। দুনিয়া হয়েছে আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য।

বিলাসবহুল গাড়ি, বাড়ি, টাওয়ার বানানো আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে গেছে। ব্যাংকে চলে যাচ্ছি। সুদের ওপর অর্থ আনছি। কেন? কীসের প্রয়োজনে? হ্যাঁ, ছেলের জন্য একটি বাড়ি তৈরী করতে হবে তাই। আয় বৃদ্ধি পাবে তাই। কী দরকার ছিল এসব কিছুর? আমরা যে এখানে আছি আমাদের দৈনিক খরচ কত? একদিনে তিন রিয়াল বা পনের রুপিয়া। আমার দৈনিক পাঁচ রুপিয়া খরচ হয়। তাহলে মাসে খরচ মাত্র নব্বই রিয়াল। স্ত্রীর জন্য নব্বই রিয়াল। হল একশত আশি রিয়াল। ছেলে মেয়েদেরও তো এমনই খরচ হবে। তাহলে মাসে তিনশত থেকে চারশত রিয়াল খরচ হবে। ব্যস এতেই তো মহাসুখে আমাদের সময় কেটে যাচ্ছে। আমাদের কেউ যদি তিনশত, চারশত রিয়ালে জীবন যাপন করতে পারে তাহলে সে কেন নিজেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবে? কেন সে অন্যের চাহিদা পূরণে নিজেকে বিক্রয় করে দিবে? কেউ যদি সৎ কাজে আদেশ দেয়া আর অসৎ কাজ থেকে বারণ করার পূর্বে নিজেদের বিপূল বেতনের কথা চিন্তা করে, তাহলে তো সে কিছুই করতে পারবে না। কোন কিছু করতে গেলেই হাজার হাজার রিয়াল বেতনের লোভ তাকে হাতছানি দিয়ে বারণ করবে। ব্যস, তার জীবনের গতি এখানে এসেই থেমে যাবে।

সুতরাং অভিজ্ঞতার কথা বলছি, যারা বিলাসবহুল মার্সেডিস গাড়িতে চলাফেরা করে, বিলাসবহুল ভিলায় বসবাস করে তারা আমাদের মত তুচ্ছতার সাথে জীবন যাপন করতে পারবে না। তাই তারা সর্বদা নিজেদের অপদস্থ আর অপমানিত করবে। তারা কখনো তাদের স্যারদের কথার ব্যতিক্রম কিছুই করতে পারবে না। এমন কি পুলিশ দেখলেই তারা কম্পমান হয়ে পড়বে। এসব ব্যাপারে তারা আল্লাহর ক্রোধ আর গযবের কোন পরওয়া করবে না। তারা সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা আল্লাহর নাফরমানিতে ডুবে থাকবে।

তাই বলছিলাম, সাহাবায়ে কেরাম মানুষের পোশাকে আচ্ছাদিত ফেরেশতা ছিলেন। আদব-আখলাকে, পূত-পবিত্রতায়, পরিচ্ছন্নতা-পবিত্রতায়, বীরত্ব-সাহসিকতা ইত্যাদি গুণাবলীতে তাঁরা ধূলির ধরায় ফেরেশতা। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন–

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ○

অর্থ : আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে যারা অগ্রগামী আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তারাও তাঁর ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আহ কী সৌভাগ্যের কথা! কী কামিয়াবীর কথা! আল্লাহ সন্তুষ্ট তাদের কোরবানীতে আর তারাও আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে সন্তুষ্ট। এরা হল অগ্রগামী সাহাবায়ে কেরাম। যাঁরা হুদায়বিয়ার সন্ধির আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। উমর (রাঃ) এভাবে পড়তেন, السابقون الأوَّلونَ من المهاجرينَ অর্থ : 'পূর্ববর্তী অগ্রগামী মুহাজিরদের মধ্য হতে।' তিনি মনে করতেন, মুহাজিররাই পূর্ববর্তী অগ্রগামীদের মধ্যে গণ্য। তখন সাহাবায়ে কেরাম বলে দিলেন, না বিষয়টি এমন নয়। আপনি ভুলে আছেন। বরং পূর্ববর্তী অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার উভয় শ্রেণী থেকেই বিদ্যমান। আর– و الذينَ اتَّبعوهم بإحسان، এরা তাবেঈ। এরা অন্য শ্রেণীর। এরা পূর্ববর্তীদের মত নয়।

তাই সাহাবীরা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত হলেন। এক শ্রেণীর সাহাবীরা হলেন, পূর্ববর্তী অগ্রগামী শ্রেণী। এদের অন্তর্ভুক্ত যারা হুদায়বিয়ার সন্ধির আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এদের সংখ্যা দু'হাজারের চেয়ে কম। যারা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন এক বর্ণনা মতে তাদের সংখ্যা ১৪শত, আরেক বর্ণনা মতে ১৫শত। খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ও আমর ইবনে আস (রাঃ) সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়েছে ষষ্ঠ হিজরীতে। তাই তারা পূর্ববর্তী অগ্রগামী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত নন।

একবারের ঘটনা। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এর মাঝে মলোমালিন্য হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদ শুনে রাগ করলেন। বললেন, হে খালেদ! সাবধান! আমার সাহাবীদের গালমন্দ করো না। তাহলে বুঝা গেল সাহাবায়ে কেরাম দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ হল পূর্ববর্তী অগ্রগামী। এদের কুরবানী, মেহনত ও আত্মোৎসর্গের কারণেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলছিলাম, রাসূল খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) কে ধমক দিয়ে বললেন–

مَهْلاً يا خالدُ ، لا تَسُبُّوا أصْحَابِي ، فوَالذي نَفسِي بِيَده لوْ أنفقَ أحدُكم مثلَ أُحُدٍ ذَهبًا ما بَلغَ مُدَّ أحَدِهم و لا نِصْفَه —

অর্থ : থাম হে খালিদ! শান্ত হও। আমার সাহাবীদের গালমন্দ করো না। আমার জান যাঁর হাতে তাঁর কসম খেয়ে বলছি; তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তবে তাদের এক মুদ বা তার অর্ধেক পরিমাণেও পৌঁছতে পারবে না।

কেন এই পার্থক্য? কেন এই বিভেদ? হ্যাঁ, অগ্রগামিতার এক বিশেষ মূল্য রয়েছে। কারণ এরাই অবিশ্বাস্য কুরবানী দিয়েছেন। হিজরতের পথের সকল কষ্ট সয়েছেন। পরিবার-পরিজনদের ছেড়ে, ধন-সম্পদ পশ্চাতে ফেলে শুধুমাত্র দীনের জন্য, ইসলামের জন্য হিজরত করেছেন। সুতরাং দু'শ্রেণীর মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। মর্যাদায় পার্থক্য রয়েছে।

এখন আফগান রণাঙ্গনে দুই থেকে আড়াই লাখ মুজাহিদ জিহাদরত। তারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। আফগানিস্তানের শহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে আছে। এক ফ্রন্টে যুদ্ধ করছে। বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনছে। আরেক ফ্রন্টে ছুটে যাচ্ছে।

শাইখ সাইয়াফের নিকট এতো হাজার মুজাহিদ, হেকমতিয়ারের অনুগত এতো হাজার মুজাহিদ, রব্বানীর অনুগতও বহু মুজাহিদ। এরা তিনজনই সর্বপ্রথম আফগানিস্তানে সশস্ত্র জিহাদী কার্যক্রম শুরু করেছেন। অথচ তখনো আফগানিস্তানে একটি গুলিও ছোঁড়া হয়নি।

সত্য কথা বলতেই হয়। সত্যকে মেনে নিতেই হয়। বলা হয়ে থাকে, যদি আল্লাহ ও যুবক হেকমতিয়ার না হত তাহলে আফগানিস্তান ধ্বংসস্তুপে পরিণত হত। বোখারা আর সমরকন্দের মত আফগানিস্তানও রাশিয়ার অংশ বলে গণ্য হত।

হেকমতিয়ারই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি দাউদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অবিচল ছিলেন। তাঁর বয়স তখন ছিল মাত্র চল্লিশ বছর। তার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা বলল, একটু সবুর কর। পরিস্থিতি দেখ। আমরা তো প্রতিরোধ যুদ্ধে ঠিকতে পারবো না। তিনি বললেন, না, সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ ছাড়া কোন উপায় নেই। তারা বলল, বরং আমরা গোপন হত্যার মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাই। তিনি বললেন, না তা হবে না, বরং সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনই মুক্তির একমাত্র পথ। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, শোন হেকমতিয়ার! তোমার সাথে কতজন যোদ্ধা আছে? বললেন, আমার সাথে ত্রিশজন যোদ্ধা আছে। ব্যস, এ ত্রিশজন যোদ্ধা নিয়ে তার জিহাদী কার্যক্রম শুরু করলেন। তাদের অনেকেই এখন আর নেই। শহীদ হয়েছেন। কিন্তু বাছাই করা এই ত্রিশজন ব্যক্তি তাদের পবিত্র রক্তের বিনিময়ে জিহাদের এ আলোকময় পথ আলোকিত করেছেন, যে পথে আজ মুজাহিদরা এগিয়ে যাচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমানের নাম কে না জানে। ঐ মসজিদটি আজ তার নাম বুকে ধারণ করে সগৌরবে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বলতে পারো, কে ছিলেন এই ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমান? তিনি ইসলামী আন্দোলনের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। এই ইঞ্জিনিয়ার থাকাকালীন সময়েই তার হৃদয় এতো পরিচ্ছন্ন, নির্মল ছিল যে গাছ আর পাথরের তাসবীহ শুনতে পেতেন। এটা আজ আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। সাইয়াফ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি তার হৃদয় পাষাণ হয়ে যাওয়ার কথা বলে আফসোস করতেন। অথচ ছাত্ররা বলত, তিনি যখন কথা বলতেন মনে হত সাইয়্যেদ কুতুব কথা বলছেন বা হাসানুল বান্না কথা বলছেন। ইসলামী ফিকির, দাওয়াহ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করতেন। এই ছিল ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমানের ছাত্রকালীন সময়ের কথা। তিনি পরিপূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করতে পারেননি। মাত্র দু'বছর পড়েছিলেন। আর হেকমতিয়ার দেড় বৎসর পড়েছিলেন। কিন্তু সাহসিকতা ও উচ্ছল প্রাণবন্ততায় তাদের হৃদয় ছিল টইটুম্বুর। একদা সঙ্গী সাথীরা বলল; তুমি কেন তোমার হৃদয় পাষাণ হওয়ার কথা বল? উত্তরে তিনি বললেন, আমি আগে গাছের আর পাথরের তাসবীহ শুনতে পেতাম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর যখন বাধ্য হয়ে মেয়েদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হতে লাগল তখন থেকে আমার হৃদয়ের সেই অবস্থা দূরীভূত হয়ে গেছে। এখন আর তা শুনতে পাই না। দেখতে পাই না। আর কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় তো এ ব্যাপারে ছিল বেশী অগ্রগামী। বরং মেয়েরা কোন ব্যাপারে ছেলেদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না।

আসল কথা হল, এরা ছিলেন অত্যন্ত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী। নির্মল নিষ্পাপ ব্যক্তিত্ব। তা না হলে সাধারণ মানুষের পক্ষে এ জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে নেয়া কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। আল্লাহ তা'আলা পাপাচারীদের কাজে বরকত দান করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ○

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পাপাচারীদের কাজকে সংশোধন করেন না। তাতে বরকত দেন না।'

হেকমতিয়ারের অবস্থা তো এমন ছিল যে, তিনি সর্বদা মাত্র দেড় হাজার রুপিয়া দিয়ে সংসার চালাতেন। যদি কোন মাসে তা দু'হাজারে পৌঁছত, তখন তিনি পরিজনদের ভর্ৎসনা করতেন। দুই হাজার রুপিয়া মানে চারশ রিয়াল। আমি একদিন তাকে বললাম, এটা কি সম্ভব? তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, তাহলে খরচের খাতা দেখুন। সত্যই দেখলাম, তার প্রত্যেক দিনের খরচ ৩০-৬০ রুপিয়া মাত্র।

তিনি বলেছেন– আরব মেহমান এলে তাদের সম্মানার্থে কিছু কোমল পানীয়ের ব্যবস্থা করি। পেপসি, মিরাণ্ডা ক্রয় করি তখন তা দু'হাজারে পৌঁছে।

এই যে সাইয়াফকে দেখছো, যাও তার বাসায়। খোঁজ খবর নাও। দেখবে, ছেলেমেয়েদের মাঝে কী ভালবাসা আর সম্প্রীতি। তখন তারা সাধারণ গৃহে বাস করছেন। প্রচণ্ড গরম। এয়ারকন্ডিশন ব্যবহার করেন না। এক আরব তাঁকে একবার বলল, হে শাইখ সাঈয়াফ! আমার নিকট দু'টি এয়ারকন্ডিশন আছে। আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি। এ দু'টি আপনি নিয়ে নিন। ব্যবহার করুন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি। আমার লজ্জা হয় যে, আমি এয়ারকন্ডিশন রুমে থাকব আর উদ্বাস্তু আফগানরা তাবুর গরমের মধ্যে থাকবে। ওদের কাছে পাখাও থাকবে না। তাই কিভাবে আমি এয়ারকন্ডিশন ব্যবহার করব?

আর বর্তমানে আমাদের অবস্থা দেখলে তো বিস্মিত হতে হয়। একজন দু'তিন দিনের জন্য জিহাদের নামে আসে। পেশোয়ারেই থাকে। আর তার নিকট আফগান জিহাদের সব রহস্য বিকশিত হয়ে যায়। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে বলতে থাকে। এরা সবাই বিদ'আতী। হেকমতিয়ার, সাইয়াফ, রব্বানী এরা সবাই বিদ'আতী। গোটা আফগানিস্তানের কোথাও জিহাদ নেই। এক কবি ভারি চমৎকার এক চরণ রচনা করেছেন। বলেছেন–

أَقِلُّوا عَلَيهِم و لا أَبًا لكُم مِنَ اللَّومِ أَو سُدُّ المَكانَ الذي سَدُّوا —

'হে জারজ সন্তানেরা! তাদের ব্যাপারে তিরস্কার একটু কম কর। আর যদি তা না কর তাহলে তারা যে শূণ্য স্থান পূরণ করেছে তা পূরণ করে দেখাও'।

যুদ্ধের ময়দানে ছুটতে ছুটতে এদের দীর্ঘ তেরটি বৎসর কেটে গেছে। তুমি পেশোয়ারে কয়দিন কাটিয়েছো? তুমি সম্মানিত বন্ধু, মর্যাদাবান মেহমান। তিন দিন কাটিয়েই ছুটলে সত্য কথা প্রচার করতে। একবারও কি ভেবে দেখেছো, যখন আফগান যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন তুমি ছোট্ট শিশু। মাত্র ছয় বৎসর তোমার বয়স। নিড়ু দুধ পান করতে। আর কিছু দিন যেতে না যেতেই এতো বড় কথা বলছো। যাও ফিরে যাও মুজাহিদদের পাশে। জিজ্ঞেস কর, তার পরিবার পরিজন থেকে যারা শহীদ হয়েছে তাদের সংখ্যা, তাদের অবস্থা। দেখবে একেকজনের পরিবারের বিশ পঁচিশজন করে শহীদ হয়েছেন। তারাই জানে আফগান জিহাদের হাকীকত কী। এর স্বরূপ কী।

ভাইয়েরা, আমি একবার হজ্জে গেলাম। একদল যুবক এল। কণ্ঠে তাদের গভীর বেদনা। হৃদয় তাদের বিষণ্ন। বলল, আমরা জিহাদে যেতে চাই কিন্তু কিছু যুবক আমাদের বলছে, যেয়ো না। সেখানে জিহাদ নেই। সব বিদ'আত আর শিরকে ভরা। আপনি তাদের অন্যতম। এ হল অবস্থা। আমি তাদের বললাম, ঠিক আছে, তাহলে স্বচোখে দেখে এসো। এসো আমাদের সাথে। দেখে, শুনে, বুঝে তারপর সিদ্ধান্ত নাও। দেখ আমরা কিভাবে এই সুপার পাওয়ারের সামনে আট বৎসর যাবৎ লড়াই করছি। কিভাবে আমরা এখনো দাঁড়িয়ে আছি। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর কথা। এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

একবার আমি শাইখ বিন বাযকে বললাম, হে শাইখ! আলহামদুলিল্লাহ, এ বৎসর আমরা এতোটি বিমান, এতোটি ট্যাংক ধ্বংস করেছি। তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা ধারণা করেছিলাম, তোমরা সাত দিনও রাশিয়ান বাহিনীর সামনে টিকে থাকতে পারবে না। এখন কীভাবে সাত বৎসর কেটে গেল তা ভেবেই পাচ্ছি না।

দেখুন বুদ্ধিমান আর বুদ্ধিহীন ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য। কতো ব্যবধান। নির্বোধ আর বুদ্ধিহীন ব্যক্তির উপমা হল ঐ ভল্লুকের ন্যায় যে তার মালিককে খুব মহব্বত করে। একবার তার মালিক ঘুমিয়ে আছে। একটি মাছি এসে তার মালিকের চেহারায় বসল। মাছিকে তাড়িয়ে দিল, আবার এসে বসল। আবার তাড়াল। তৃতীয়বার যখন এসে বসল তখন আর দেরি করল না। একটি বিরাট পাথর এনে মাছিকে লক্ষ্য করে মালিকের মাথায় মারল। ব্যস, মাছির সাথে সাথে মালিকেরও অক্কা সংগঠিত হল।

চতুস্ত্রিংশ মজলিস

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(١٠١) وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ
نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝ (١٠٢) وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا
صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ (١٠٣) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ (١٠٤) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ
التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

অর্থ : তোমার আশেপাশে কিছু গ্রাম্য-ব্যক্তি মুনাফিক আর মদীনাবাসীদের মধ্য হতে কিছু লোক মুনাফেকীতে কঠোর। তুমি তাদের জান না; আমি তাদের জানি। আমি তাদের দু'বার শাস্তি দিব। তারপর তাদের মহা আযাবে নিয়ে যাওয়া হবে। আর কিছু লোক রয়েছে তারা তাদের পাপের কথা স্বীকার করেছে। তারা নেক কাজ ও বদ কাজকে মিশ্রিত করে ফেলেছে। শীঘ্রই হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর যেন তুমি তার মাধ্যমে তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পার। আর তুমি তাদের জন্য দু'আ কর। নিশ্চয় তোমার দু'আ তাদের জন্য সান্ত্বনা। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তারা কি জানে না যে, আল্লাহ নিজেই বান্দার তওবা কবুল করেন এবং যাকাত গ্রহণ করেন। আর আল্লাহই তওবা কবুলকারী, করুণাময়। (সূরা তওবাঃ ১০১-১০৪)

এখানে আল্লাহ তা'আলা তিন শ্রেণীর মানুষের আলোচনা করেছেন। বরং একথা বলা যায় যে, পুরো তওবা জুড়ে আল্লাহ তা'আলা এই তিন শ্রেণীর লোকের আলোচনা করেছেন। মদীনার সমাজে প্রথম শ্রেণীর এই লোকেরাই হলেন ইসলামের ভিত্তি। ইসলামের দুর্ভেদ্য দুর্গ। ইসলাম এদের মাঝেই আশ্রয় নেয় যেমন সাপ তার গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এই প্রথম শ্রেণীর লোকেরা কারা? আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন–

(١٠٠) وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

অর্থ : মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা সর্ব অগ্রগামী আর যারা তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাদের জন্য এমন জান্নাত তৈরি করেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহরমালা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হল মহান সফলতা।

এখন প্রশ্ন আসে, তাঁরা কারা? হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রহঃ) বলেন, তারা ঐ সব সাহাবী যারা দুই কিবলার দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। অর্থাৎ যারা হিজরতের পর ষোল বা সতের মাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

আবার কেউ বলেছেন– যারা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন তারা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর হুদায়বিয়ার সন্ধি ষষ্ঠ হিজরীর যিলক্বাদ মাসে হয়েছিল। সুতরাং যারা এর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। আসল কথা হল, তুমি যদি মর্যাদার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বিন্যাস সৃষ্টি করতে চাও তাহলে বলতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। তারপর হযরত উমর (রাঃ)। তারপর হযরত উসমান (রাঃ)। তারপর হযরত আলী (রাঃ)। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস।

এরপর হলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত অপর ছয়জন। তারা হলেন, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ), ত্বলহা (রাঃ), যুবাইর (রাঃ), আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), আবু উবায়দা আমর ইবনে জাররাহ (রাঃ)। এই দশজনের সবাই ছিলেন মুহাজির। এরা সবাই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

এর পরের অবস্থান হল যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আশারায়ে মুবাশশারা দশজন সাহাবীর পরেই হল এদের স্থান। এদের মর্যাদা। হযরত উসমান (রাঃ) ছাড়া আশারায়ে মুবাশশারার সকলেই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাসূলের নির্দেশে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেননি। কারণ তার স্ত্রী রাসূলের কন্যা রুকাইয়া (রাঃ) তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তার পরিচর্যায় রাসূল তাকে পশ্চাতে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসমান (রাঃ) কে গনীমতের মালের অংশ দিয়েছিলেন।

এদের পরের অবস্থান হল যারা ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে ৩১৩ জন, মতান্তরে ৩১৯ জন বা ৩১৭ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর ওহুদের যুদ্ধে প্রায় সাতশত সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এদের পরের অবস্থান হল যারা খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর পরের অবস্থান হল যারা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন। তার পরের অবস্থানে আছেন ঐ সব মুসলমানেরা যারা তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ যাদের ক্ষমার ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ○

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন নবীকে, মুহাজির ও আনসারদেরকে, যারা কঠিন সময়ে (তাবুকের যুদ্ধে) তার অনুসরণ করেছেন।

এটা হল মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে সাহাবায়ে কেরামের বিন্যাস। সুতরাং যেসব হতভাগ্য লোকেরা আবু বকর, উমর আর উসমান (রাঃ) কে হিংসা করে, তাদের মন্দ বলে, তাঁদের সমালোচনা করে তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত। তারা অভিশপ্ত। তারা তাদের সমালোচনা করে যেন একথা বলতে চায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অতি নিকটতর ব্যক্তিদেরকে দীক্ষা দিতে, তরবিয়ত দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এবার তুমি ভেবে দেখ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাস আর শিয়াদের আকীদা-বিশ্বাসের মাঝে কতো পার্থক্য। কতো ব্যবধান।

মনে করো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সাহাবী নিয়ে পরিবৃত্ত হয়ে আছেন। তখন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলছে, রাসূলের পাশে যারা আছে তারা এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। এদের হাতেই আল্লাহ তা'আলা ইসলাম নামক বৃক্ষকে সুজলা সুফলা করেছেন। ফলবান করেছেন। এরা সবাই পূত-পবিত্র, নিষ্পাপ, পুণ্যবান।

পক্ষান্তরে শিয়া সম্প্রদায়ের কেউ থাকলে বলবে, এই যে রাসূলের পাশে বসে আছে আবু বকর, সে তো জিন্দীক। পাপাচারী। আর ঐ যে উসমান (রাঃ) কে দেখা যাচ্ছে সে তো একজন ব্যর্থ মানুষ। এভাবে একজন বা দু'জনকে বাদ দিয়ে সবাইকে অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে কাজেব, ফাসেক, জিন্দীক, কাফের বলতে থাকবে। এ কথাগুলো আমি বানিয়ে বলিনি। শিয়াদের কিতাবেই লেখা আছে, 'নিশ্চয় আবু বকর, উমর ও উসমান

জিন্দীক।' জিন্দীক বলা হয় যারা গোপনে কাফের অথচ প্রকাশ্যে নিজেদের মুসলমান বলে জাহির করে। শিয়ারা বলে, এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর মুরতাদ হয়ে গেছে। এই হল শিয়াদের ইসলাম প্রীতি! এই হল তাদের আকীদা-বিশ্বাস!!

যদি বিষয়টি এমনই হত তাহলে কেন জিবরাঈল (আ.) এসে রাসূলকে একবারও বললেন না যে, এই উসমান তো আপনার পর কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং, তার সাথে আপনার কন্যার বিয়ে দিবেন না। কেন জিবরাঈল (আ.) এসে রাসূলকে জানালেন না যে, আবু বকর আর উমর (রাঃ) জিন্দীক হয়ে যাবে। কুরআনের বিধান মানবে না। মুরতাদ হয়ে যাবে। আপনি তাদের বিশ্বাস করবেন না। সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর তারা রাসূল থেকে কী দীক্ষা পেলেন? কী শিখলেন? আসল কথা হল শিয়াদের উদ্দেশ্য নবুওয়াতের অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়া। রাসূলের মর্তবাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়া।

যদি শিয়াদের কথাই ঠিক হত তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সতর্ক করে বলে দিতেন, হে রাসূল! আপনার ইন্তেকালের পর যেন আপনার উম্মত কিছুতেই আবু বকর, উমর আর উসমানকে খলীফা না বানায়। আপনি তাদের দূরে সরিয়ে দিন। আপনার মেয়েকে উসমানের সাথে বিয়ে দিবেন না। আর আপনি আবু বকরের কন্যা আয়েশাকে বিয়ে করবেন না। এভাবে নানা ভাবে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সতর্ক করে দিতেন। অথচ ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের কথা কী বলব স্বয়ং আয়েশা (রাঃ) এর ব্যাপারে, তাঁকে পূত-পবিত্র ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা দশটি আয়াত অবতীর্ণ করে বলেছেন– " إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ " অথচ এই শিয়ারা এত গোমরাহ, এত বিভ্রান্ত যে তারা তা অস্বীকার করে বলে, এ আয়াতগুলো হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি। আর ইফকের ঘটনাটি আয়েশা (রাঃ) কে কেন্দ্র করে ঘটেনি। আর আবু বকর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ○

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আবু বকর এর সাহাবী হওয়ার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। আর ঘোষণা করেছেন যে আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের সাথে রয়েছেন। সুতরাং ভেবে দেখা দরকার শিয়ারা কী ভাবছে। তারা কোথায় যাচ্ছে, কী বলছে আর কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কী বলছেন। হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর সম্পর্কে কী বলেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস হল, হযরত আলী (রাঃ) একজন শ্রেষ্ঠ সাহাবী। হযরত আলী (রাঃ) জান্নাতীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ নারী হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে বিয়ে করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "জান্নাতী নারীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ নারী চারজন। মুফহিম তনয়া আসিয়া, ইমরান তনয়া মরিয়ম, খুয়াইলিদ তনয়া খাদীজা ও মুহাম্মদ তনয়া ফাতেমা।" তবে সবার মাঝে কে শ্রেষ্ঠ ফাতেমা না মরিয়ম, না অন্য কেউ, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

আসল কথা হল, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ। যদি কুরআন রাসূলের বানানো হত তাহলে অবশ্যই প্রাণপ্রিয় সহধর্মিনী আয়েশা (রাঃ) এর নাম এখানে বলতেন। অথচ আমরা দেখতে পাই, কুরআনের কোথাও আয়েশা বা খাদীজা (রাঃ) এর নাম নেই। অথচ মরিয়ম বিনতে ইমরানের নাম কুরআনে বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ○

অর্থ, হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাকে নির্বাচন করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং তোমাকে বিশ্বের নারীদের মাঝে নির্বাচন করেছেন। যদি এ কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রচনা করতেন তা হলে হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ) এর নাম কুরআনে উল্লেখ

করতেন। অথচ তা না করে হযরত যায়েদ (রাঃ) এর নাম কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তাই আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় নতশিরে বলি, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী বানিয়েছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট রহমত। এটা আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট নেয়ামত। একবার এক হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটল। আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম। তখন সহসা এক শিয়া মতাবলম্বীকে দেখলাম, উচ্চস্বরে আবু বকর আর উমর (রাঃ) কে গালমন্দ করছে। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের কারণে দেখা যায় কেউ অল্প আমল করে অথচ বহু নেকীর অধিকারী হয়। এই শিয়ারা রাসূলের পাশে অবস্থিত বিশিষ্ট সাহাবীদের চার পাঁচজনকে বাদ দিয়ে সবার সম্পর্কে বলে, এরা দুষ্ট প্রকৃতির, পাপাচারী, এরা জিন্দীক। এরাইতো একাজ করেছে, একাজ করেছে। এগুলো তারা ইহুদীদের সবক অনুযায়ী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার মতামতকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে বলে। ফলে এ যুগের শিয়ারা রাসূলের পার্শ্ববর্তী সকল সাহাবীকে অপছন্দ করে। ঘৃণা করে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ ○

অর্থ : মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা অগ্রগামী আর যারা তাদের অনুসরণ করেছে। এই তিন শ্রেণীর মানুষ মুহাজির, আনসার, আর তাদের অনুসারী তাবেঈরা হল উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠ। হযরত উমর (রাঃ) এ আয়াতটিকে প্রথমে এভাবে পড়তেন–

"وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ" এখানেই বাক্য শেষ করে দিতেন। তারপর বলতেন– "وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ" তখন তাকে বলা হল, আপনি তো ভুল পড়ছেন, কুরআনে আয়াতটি হল এভাবে....। এ কথা শুনে উমর (রাঃ) তার মত ত্যাগ করলেন এবং জের সহকারে পড়তে শুরু করলেন।

এটা আল্লাহ তা'আলার মহা নেয়ামত যে, তিনি আনসার সাহাবীদেরকে মুহাজির সাহাবীদের সমমর্যাদা দান করেছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার অশেষ নেয়ামত। কারণ তারা সেই কঠিন পরীক্ষা আর অমানুষিক নির্যাতন-নিপীড়নের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন আর মুহাজির সাহাবীরা তা অম্লান বদনে সহ্য করেছেন। অবশেষে জন্মভূমি ত্যাগ করে মদীনায় চলে গেছেন। তারা এসব দীনের জন্য সয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা অগ্রগামী আনসারদের মুহাজিরদের সেই মর্যাদা দান করেছেন। অগ্রগামী আনসার ঐসব সাহাবীদের বলা হবে যারা কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে বা বাই'আতে রিদওয়ানের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বা বাই'আতে রিদওয়ানে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন।

এভাবেই সাহাবীদের মর্যাদা বিন্যাস করা হবে। পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রাঃ), বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ), গোলামদের মধ্যে হযরত বিলাল (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ গোলামদের মধ্যে যায়েদ (রাঃ) এর নাম বলেছেন। সুতরাং বলা যায় সর্বপ্রথম এ চারজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আবু বকর (রাঃ), খাদীজা (রাঃ), আলী (রাঃ) ও যায়েদ (রাঃ)।

আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের কারণ হল তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিপালনে ছিলেন। মক্কার অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চাচা আবু তালেব থেকে আলী (রাঃ) এর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন থেকেই আলী (রাঃ) রাসূলের গৃহে প্রতিপালিত হয়ে আসছিলেন। ওহী নাযিল হলে রাসূল তার নিকটাত্মীয় সবাইকে ডেকে তাদের ইসলামের আহবান জানালেন। তখন নিকটাত্মীয় সবাই তার প্রতিবাদ করলে রাসূল বললেন, কে আমাকে সাহায্য করবে? তখন আলী (রাঃ) এর বয়স মাত্র সাত বৎসর। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে সাহায্য করব।

যুবাইর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অষ্টম ব্যক্তি ছিলেন। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) সপ্তম ব্যক্তি ছিলেন। এভাবে একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন।

আসল কথা হল সাহাবায়ে কেরামের মূল্য হল আল্লাহর কাছে। মানুষ কী মূল্য দিল বা না দিল তা দেখার কোন প্রয়োজন নেই।

একদা কূফার লোকেরা সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এল। এরা ইরাকের লোক। ইরাকের অনেক লোকই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাদের অধিকাংশের মাঝেই ভেজাল। যতো বিদ্রোহ বিশৃংখলা ইরাকেই হয়েছে। সবশেষে এসেছে সাদ্দামের হিজবুল বা'আস। এরা দুর্গন্ধ ছড়ায়।

বাথপার্টির এরা গোবরে পোকার ন্যায়। নাক দিয়ে নাপাকী ধাক্কিয়ে নিয়ে যায়। সাদ্দামের এই দল আরব জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবনের প্রবক্তা। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لَيَنتهِيَنَّ أقوامٌ يفْخرونَ بآبائِهم الَّذينَ هم فَحْمُ جهنَّم —

'অবশেষে এমন একদল লোক আসবে যারা তাদের এমন পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করবে যারা জাহান্নামের কয়লা।' অন্যত্র বলেছেন–

ليكونَنَّ أهونَ على اللهِ مِن الجُعلِ الذي يُدهدهُ الخرءَ بأنْفه —

তারা আল্লাহর নিকট গোবরে পোকার চেয়েও অধিক তুচ্ছ হবে, যে গোবরে পোকা গোবরকে নাক দিয়ে ঠেলে নিয়ে যায়।

সুতরাং এই বাথপার্টির লোকদের পরিণতি ভাল নয়। মিখাইল ও তার পার্শ্ববর্তী লোকেরা, সাদ্দাম ও তার অনুসারীরা জাহান্নামের পথে ছুটছে। উলামাদের সর্বসম্মত রায় হল বাথপার্টির লোকেরা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। তাদের যবাহ করা পশু খাওয়া যাবে না। বাথপার্টির সমর্থক লোকদের বিয়ে করা যাবে না। এদের সালামের উত্তর দেয়া যাবে না। এর কারণ, এক. এরা মুসলমানদের চেয়ে কাফেরদের মর্যাদা বেশী দেয়। এরা মিখাইল আফলাককে সমস্ত তুর্কী ও সমস্ত আফগানদের চেয়ে বেশী মর্যাদা দেয়।

দুই. কুফরের মতবাদকে তুলে ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কুফরী মতবাদের অর্থাৎ আরব জাতীয়তাবাদের শিরকী মতবাদের পাশে সমবেত হওয়ার আহবান জানায়। যা জাহেলী যুগের আবু জাহেলের মতবাদেরই আধুনিকায়ন। তাই তারা বলে–

آمنتُ بالبعْثِ ربًّا لاَ شَريكَ لــه و بالعَرُوبــةِ دينًا ما لَــه ثَاني

অর্থ : আমি বাথপার্টিকে রব হিসাবে মেনে নিলাম যার কোন অংশীদার নেই আর আরব জাতীয়তাবাদকে ধর্ম হিসাবে মেনে নিলাম যার কোন দ্বিতীয় নেই। হ্যাঁ, ইরাকের কুফার কথা বলছিলাম। কুফার লোকেরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রাঃ) এর নিকট সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। বলল তিনি সমতা বজায় রেখে বণ্টন করেন না। প্রজাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করেন না। জিহাদে বের হন না। এমনকি নামায পড়তেও জানেন না। এরা ছিল বনু আসাদের কিছু লোক। অভিযোগ শুনে হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, হে আবু ইসহাক! কী ব্যাপার তোমার সম্বন্ধে এ আবার কী শুনলাম? সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মু'মনীন! বলুন কী শুনেছেন। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, তুমি নাকি নামায পড়তে জান না? একথা শুনে সা'দ (রাঃ) হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি আমি সর্ব প্রথম ব্যক্তি যে ইসলামের ইতিহাসে সর্ব প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিল। রাসূলের পাশে অবস্থিত সাত ব্যক্তির মাঝে আমিই ছিলাম সপ্তম। গাছের পাতা ছাড়া আমাদের খাওয়ার আর কিছুই ছিল না। ফলে আমরা বকরীর ন্যায় মল ত্যাগ করতাম। আর অবস্থা এমনই পাল্টে গেল যে বনু

আসাদের লোকেরা ইসলামের ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করছে। এইতো কিছু দিন আগে বনু সাআদের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর আজ তারা আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তাদের রাসূলের মত নামায পড়াই। প্রথম রাকাত দীর্ঘ করি, অমুক অমুক সূরা তাতে পড়ি। দ্বিতীয় রাকাত খাটো করি এবং তাতে ছোট ছোট সূরা তেলাওয়াত করি। এ ভাবে তিনি তার নিকট নামাযের বিবরণ দিলেন, যা সবিস্তারে ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। সব শুনে উমর (রাঃ) বললেন, হে আবু ইসহাক! তোমার ব্যাপারে আমরা এরকমই জানি। এর পর হযরত উমর (রাঃ) একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তা কুফায় প্রেরণ করেন। এ কমিটি কুফার প্রত্যেক মসজিদে মসজিদে গিয়ে মুসুল্লীদের জিজ্ঞেস করলেন। সা'দ (রাঃ) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ধরলেন, কিন্তু কেউ তা সমর্থন করল না। অবশেষে তারা বনু আবসের মসজিদে গেলেন। এ মসজিদেও সবাই সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের গুণকীর্তন করলেন। তবে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলো, নাম আবু সা'আদা। বলল, শুনুন, শুনুন। আপনারা যখন সা'দ সম্পর্কে জিজ্ঞেসই করলেন, আর না বলে পারছি না। হ্যাঁ, তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করেন না। জিহাদে গমন করেন না। সমভাবে গনীমতের মাল বণ্টন করেন না। এ কথা শুনে হযরত সা'দ (রাঃ) খুব দুঃখিত হলেন। অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তারপর বিষয়টি আল্লাহর দরবারে সমর্পণ করে বললেন–

اللهمَّ إنْ كانَ عبدُك قد وقفَ ابتغاءَ مرضاتِك فاغفرْ له و إنْ وقفَ رياءً و سُمعةً ، فاللّهم أطِلْ عمرَه و أطِلْ فقرَه و عرِّضه للفتنِ —

হে আল্লাহ! যদি আপনার এই বান্দা আপনার সন্তুষ্টি লাভের আশায় এ কথা বলে থাকে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিন। আর যদি মানুষদেরকে দেখানো আর শোনানোর জন্য বলে থাকে তাহলে, হে আল্লাহ! আপনি তার আয়ুকে দীর্ঘ করে দিন। তার দারিদ্র্যকে দীর্ঘ করে দিন আর তাকে ফেৎনায় ফেলে দিন। হাদিসটি বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস বলেন, আমি এই আবু সা'আদাকে দেখেছি, সে দীর্ঘায়ু পেয়েছিল। তার চোখের ভ্রু ঝুলে পড়ে তা চোখ ঢেকে ফেলেছে। আর সে পথে ঘাটে মেয়েদের সাথে তামাশা করে। একটু ভেবে দেখ, এ বয়সে এটা কত লজ্জাকর ব্যাপার। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার এটা কি? উত্তরে সে বলে, আমি একজন ফেৎনায় নিপতিত ব্যক্তি। আমাকে সা'দের বদ দু'আ পেয়ে বসেছে।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এর জীবনে এ ধরনের আরো কটি ঘটনা ঘটেছিল। সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এর জমিনের সাথে একেবারে লাগোয়া জমিন ছিল আরওয়া বিনতে হাকামের। এক খন্ড জমিন নিয়ে দুজনের মাঝে বিবাদ হল। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বললেন, এ জমিন আমার। কিন্তু তবুও এ বিবাদ শেষ হল না। অবশেষে হযরত উসমান (রাঃ) এর খেলাফতকালে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বললেন, (জমিনের দাবী ছেড়ে দিয়ে) তোমরা কি মনে কর আমি তার জমিন জোরপূর্বক নিয়ে নিব? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি–

مَنْ اغتصبَ شبرًا مِنَ أرضِ أخيه طوَّقه اللهُ يومَ القيامةِ مِنْ سبْعِ أراضينَ —

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের এক বিঘত জমিন জোরপূর্বক নিয়ে নিবে কিয়ামত দিবসে সাত তবক জমিন তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। এরপর বললেন, হে আল্লাহ তার চোখকে অন্ধ করে দিন, এবং তাকে তার জমিতেই মৃত্যু দান করুন। ঘটনাও তাই। এক দিন আরওয়া তার জমিনে হাঁটছিল, তখন সে ছিল অন্ধ। হাঁটতে হাঁটতে জমিনের কূপে গিয়ে পড়ল এবং মারা গেল।

আমরা আজ সাহাবায়ে কেরামের পুণ্যের ফসল ভোগ করছি। তাঁরা যদি দীনের পথে অবিচল না থাকতেন, যদি অমানবিক, অসহনীয় নির্যাতন নিপীড়নকে অম্লান বদনে মেনে না নিতেন তাহলে আমরা মুসলমান হতে পারতাম না। তুমি এ কথাটি খুব ভাল করে বিশ্বাস করে নাও, হৃদয়ের গহীনে গেঁথে নাও, যদি আবু বকর, উমর,

উসমান আর আলী ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) কুরবানী ও মুজাহাদা না হত তাহলে ইসলাম মক্কা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারত না। দুনিয়াতে ইসলাম আর ঈমান বলতে কিছু থাকত না। অবস্থার ভয়াবহতার কথা বদর প্রান্তে রাসূলের দু'আর দ্বারাই স্পষ্টভাবে বুঝে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেছিলেন–

اللهمَّ إنَّكَ إنْ تُهلكْ هذه العصابةَ فلا تُعبدْ في الأرضِ أبدًا —

"হে আল্লাহ! যদি আপনি এই দলটিকে ধ্বংস করে দেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে আর কখনো আপনার ইবাদত-বন্দেগী করা হবে না।" সুতরাং তাদের পর যত মুসলমান কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেছে ও করবে, তাদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। অপর এক হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাতে ধৈর্যের দিবস রয়েছে। সে দিন দীনকে আঁকড়ে ধরে রাখা জ্বলন্ত অঙ্গার আঁকড়ে ধরে রাখার মত হবে। সে সময় প্রতিটি আমলের বিনিময়ে পঞ্চাশ গুণ সওয়াব দেয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, তারা কি আমাদের মধ্য হতে, না তাদের মধ্য হতে? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন বরং তারা তোমাদের মধ্য হতে।" তবে তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও কিয়ামত দিবসের পূর্বে ফিৎনার দিনগুলোতে এমন কিছু মানুষ ছিল ও হবে যারা সাহাবায়ে কেরামের চেয়েও বেশী সওয়াব পাবে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের সওয়াব যেমন ছিল তেমনই থাকবে। একই ধারায় তাদের সওয়াব বাড়তে থাকবে। মুসলমানদের প্রত্যেক প্রজন্মই সাহাবায়ে কেরামের সওয়াব বৃদ্ধি করতে থাকবে। তাই সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার সমতুল্য হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এ কারণেই যখন খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এর মাঝে ঝগড়া হল অথচ তারা দু'জন সাহাবী, খালিদ (রাঃ) সপ্তম হিজরীতে ইসলাম করেছেন। তাকে সাইফুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর তরবারি বলা হত। আল্লাহ তাঁর দ্বারা রোম আর পারস্য বিজয় দান করেছেন। এ তো মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

مَهْلاً يا خالدُ ، لا تَسُبُّوا أصْحَابِي ، فوَالذي نَفسِي بِيَده لوْ أنفقَ أحدُكم مثلَ أُحُدٍ ذَهبًا ما بَلغَ مُدَّ أحدِهِم وَلا نَصِيفَه —

"হে খালেদ! থাম, বিরত থাক। আমার সাহাবীদের গালমন্দ করো না। আমার প্রাণ যার হাতে তার নামে শপথ করে বলছি তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তবুও সে তাদের এক মুদ পরিমাণ বা তার অর্ধেক পরিমাণ দানের কাছেও পৌছতে পারবে না।"

সুতরাং হে আফগান রণাঙ্গনের মুজাহিদ ভাইয়েরা! তোমার এ জাতির অগ্রগামী মুজাহিদ। সংখ্যায় তোমরা একশত হবে। তোমাদের পর যে একশত নতুন মুজাহিদ আসবে তাদের পূণ্যের সওয়াব সমপরিমাণে তোমরাও পাবে। আর তাদেরকে তাদের আমলের সওয়াব কম দেয়া হবে না। এমনিভাবে তাদের পরবর্তীদের সওয়াব, তাদেরও পরবর্তীদের সওয়াব, এ ধারায় তোমরা এ জিহাদী ধারার সওয়াব পেতেই থাকবে। তারপর যখন তোমাদের কারণে ফিলিস্তিনে, বোখারায় ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের রক্ষার জন্য জিহাদী কার্যক্রম শুরু হবে এ সকল কাজের সওয়াব তোমরা পেতে থাকবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তিই তোমাদের কারণে, তোমাদের চরিত্রে ও আলোচনায় প্রভাবিত হয়ে জিহাদে উজ্জীবিত হবে তার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা কবরে থেকে পেতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ سنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حَسنةً فله أجرُها و أجرُ مَن عَمِلَ بِها يومَ القيامة —

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোন পুণ্যময় কাজের ধারা চালু করবে তা হলে সে তার সওয়াব পাবে এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা আমল করবে তাদের সওয়াবও সে পাবে।" আমরা আজ আব্দুল ওয়াহহাব গামেদীর কথা

লিখি, তার সম্পর্কে আলোচনা করি। তার আলোচনা শুনে উজ্জীবিত হই। সুতরাং যে যুবকই তার কারণে উজ্জীবিত হয়ে জিহাদে আসবে তার আমলের সওয়াব আব্দুল ওয়াহহাব গামেদী (রহঃ) পাবেন।

এমনিভাবে যারা আহমদ যাররানীর কাহিনী শুনবে, প্রভাবিত হবে অথবা আবু আসেম ইরাকী, আবু দুজাগ মিসরী, যাবিহুল্লাহ সূরী, আবু হাফস, ফিলিস্তিনী মুজাহিদদের জীবন কাহিনী শুনে আল্লাহর রাহে জীবন দিতে উদ্বুদ্ধ হবে, উজ্জীবিত হবে তাদের আমলের সওয়াব তারা পরিপূর্ণভাবে পাবে। আমরা আজ মুস'আব ইবনে উমাইর, হামযা ইবনে আবু তালেব, হারেস, কা'কা, আসেম, মুসান্না, খালেদ ইবনে ওয়ালিদ প্রমুখ সাহাবীদের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত। আমি শৈশবে নিজেকে প্রশ্ন করতাম, আমি কি মুস'আব ইবন উমায়েরের মত হতে পারব না? আমার মাঝে ও তাঁর মাঝে পার্থক্য কী? তিনি একজন মানুষ আমিও একজন মানুষ! কেন আমি তার অনুস্মরণের চেষ্টা করব না? সুতরাং মুস'আব ইবনে উমাইর (রাঃ) এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে আমার সকল কাজের সওয়াব পরিপূর্ণভাবে তিনিও পাবেন। এমনি ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তাই ইসলাম ধর্মে অগ্রগামী ও অনুসৃতদের মর্যাদা প্রসারিত। এ কারণে হযরত মুসা (আ.) এর যুগে যাদুকররা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে যখন ফেরাউন তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাইল তখন তারা ফেরাউনকে বললেন–

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (١٢٦) ○

"তুমি এ কারণেই আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চাও যে, আমাদের নিকট আমাদের রবের নিদর্শন আসার সাথে সাথেই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্য ধরার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দান করুন।" অন্য এক আয়াতে যাদুকররা বলেছেন–

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (٥١) ○

"আমরা আশা করি, আমাদের রব আমাদের ক্ষমা করে দিবেন এ কারণে যে আমরা প্রথম মুসলমান হয়েছি।" তাই বলছিলাম অগ্রগামীদের মর্যাদার সমতুল্য হওয়া কখনো সম্ভব নয়। মক্কা বিজয়ের পর সফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর হিজরতের ফজিলত শুনে তার মনেও হিজরতের ইচ্ছে উদয় হল। ছুটে এলেন মদীনায়। একেবারে রাসূলের কাছে। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আর কিছুই চাই না, আমি হিজরত করতে চাই। হিজরতের মর্যাদা অর্জন করতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে বললেন, "হে সফওয়ান! হিজরতের সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন হিজরতের পথে নির্যাতন নেই, নিপীড়ন নেই, মেহনত-মুজাহাদা নেই। মক্কা এখন ইসলামের আওতাধীন শহর। দারুল ইসলাম। যাকাতের পথ এখন নিরাপদ। সুতরাং হিজরতের সময় চলে গেছে। لاَ هجرةَ بعدَ الفتحِ و لكنْ جهادٌ و نيةٌ মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়ত বাকি আছে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মুহাজির নামে অভিহিত করা হবে। এখন আর কেউ মুহাজির হতে পারবে না।"

সাহাবী কে?

ঐ ব্যক্তিকেই সাহাবী বলা হবে, যিনি মুসলমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন এবং মুসলমান অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং কেউ যদি রাসূলের যুগে ইসলাম গ্রহণ করে আর রাসূলকে না দেখে থাকে তাহলে তাকে সাহাবী বলা যাবে না। এদেরকে 'মুখাযরাম' বলা হবে। যেমন আবু আমর শাইবানী, সুয়াইদ ইবনে গাফলাহ, আমর ইবনে মাইমূনা, আবু উসমান নাহদী, আবু মুসলিম খাওলানী, আব্দুল্লাহ ইবনে সাউর, আহনাফ ইবনে কাইস প্রমুখ ব্যক্তিরা। এরা রাসূলের যুগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু রাসূলকে দেখতে পারেননি। আর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সাহাবী হওয়ার মর্যাদার সমতুল্য অন্য কোন মর্যাদা নেই। একদা এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করল, মুআবিয়া (রাঃ) ও

উমর ইবনে আব্দুল আযীয, এ দু'জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তখন উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেছিলেন–

إنَّ الغُبارَ الذي طارَ مِن قَدَم رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم و دَخَلَ أنْفَ مُعاوية أفضلُ مِن عُمر بنِ عبدِ العزيزِ و آله —

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদধুলি যা উড়ে এসে মুআবিয়া (রাঃ) এর গায়ে প্রবেশ করেছিল তাও উমর ইবনে আব্দুল আযীযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সাহাবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ হতে পারে না। আর মুআবিয়া (রাঃ) ছিলেন রাসূলের গোপন কথা হেফাজতকারী, ওহীর লেখক, রাসূলের শ্যালক। আর তুমি চাচ্ছো, আমি এতো মর্যাদার অধিকারী এক সাহাবীর উপর এক তাবেঈকে মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ বলি। এটা কিছুতেই হতে পারে না। হওয়ার নয়।' আর তাবেঈ হলো তারা যারা ইসলাম অবস্থায় সাহাবীদের দেখেছেন আবার ইসলাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। ইতিহাসে এমন হতভাগ্য ব্যক্তিও আছে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, দু'চোখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছে। কিন্তু মুসলমান অবস্থায় ইনতেকাল হয়নি। কাফের অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। যেমন উকবা ইবনে আবী মুয়িত। সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর বন্ধু উবাই ইবনে খলফের নিকট এল। বলল, আমি তো মুসলমান হয়ে গেছি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছি। তখন উবাই ইবনে খলফ বলল, তোমার চেহারা দেখা আমার জন্য হারাম হয়ে গেছে যদি না তুমি মুহাম্মদের নিকট গিয়ে তোমার কুফরীর কথা ঘোষণা কর, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর সে রাসূলের নিকট ফিরে এসে মুখে থুথু দিল। (নাউযুবিল্লাহ) তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন–

(٢٧) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ○ (٢٨) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً ○ (٢٩) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ○

অর্থ : ঐ দিনের কথা স্মরণ করুন, যে দিন যালিম ব্যক্তিটি তার হাত কামড়ে বলবে, হায় আফসোস! যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করতাম। সে তো আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে, আমার নিকট হিদায়াত আসার পর। নিশ্চয় শয়তান মানুষকে লাঞ্ছিত, অপমানিত করে। (সূরা ফুরকানঃ ২৭-২৯) এই উকবা ইবনে মুয়ীত তো ইহকাল ও পরকালে চির ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। কাফের হয়ে মৃত্যু বরণ করল। বদর থেকে মদীনায় ফেরার পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যা করেছিলেন। সে ছিল বন্দী, রাসূল তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন সে বলেছিল, হে মুহাম্মদ! বিপদের দিনের জন্য আর কে রইল? তখন রাসূল বলেছিলেন, তাদের জন্য জাহান্নাম। এখন আমি প্রায়ই এ চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যাই, এই যে জিহাদের নেয়ামত যা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রদান করেছেন। যখন দেখি কিছু লোক এখানে আসে অথচ জিহাদের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে না। তখন মনে হয় এসব লোকেরা তাদেরই মতো যারা রাসূলের সময় তার আশেপাশেই ছিল, থাকত। তা সত্ত্বেও তাদের কাজ ছিল রাসূলকে কষ্ট দেয়া, রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা। একবার কি ভেবে দেখেছো এরা কী বিরাট নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হল? এরা হতভাগ্য। আমাদের সময়েও কিছু লোক আফগান রণাঙ্গনে আসে। জিহাদ দেখে। কিন্তু তার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহর পথে একটি গুলি ছুঁড়েও দেখে না। এটা কত বড় মুসীবত! কতো বড় বিপদ! এর পর যদি তারা জিহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়; নানা ধরনের অপপ্রচার করে তাহলে কেমন হবে? একদা এক যুবক আমাকে বলল, সে ছিল সাইয়্যেদ কুতুবের ছাত্র। বলল, যদি আমি তাবেঈদের যুগে থাকতাম তাহলে আক্ষেপে মরে যেতাম। আমি বললাম, কেন? সে বলল, যেহেতু আমি রাসূলকে দেখতে পারি নাই তাই এ আক্ষেপেই আমার মৃত্যু হত। আজকে আমাদের এ সময়ে,

জিহাদের কার্যক্রম চলছে, মানুষ দেখছে, শুনছে। মুজাহিদ নেতাদের দেখছে। আফগানের পবিত্র ভূমি থেকে উদ্ভাসিত এই মুবারক নূরের ছটা তারা অবলোকন করছে। যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা দীনের মর্যাদাকে বুলন্দ করেছেন। ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন করছেন। এতো কিছু দেখা ও শুনার পরও তারা নানা কথা বলে। আজে বাজে মন্তব্য করে। জনৈক কবি এক চমৎকার কথা বলেছেন–

قد تُنكِرُ العينُ ضوءَ الشَّمسِ من رَمَدٍ و يُنكِرُ الفمُ طعمَ الماءِ مِنْ سَقَمٍ —

"কখনো চোখের ময়লার কারণে চোখ সূর্যের আলোকে অস্বীকার করে। কখনো মুখের রোগের কারণে মুখ পানির স্বাদকে অস্বীকার করে।" সুতরাং আমি আবারো জোর দিয়ে বলছি, ইবাদতের স্বাদ উপলব্ধি করতে না পারা এক বিরাট মুসীবত, বিরাট আযাব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ আযাব থেকে রক্ষা করুন।

পঞ্চত্রিংশ মজলিস

(١٠٦) وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ (١٠٧)
وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ
وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنٰى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ○ (١٠٨) لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى
التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ○ (١٠٩)
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ
جَهَنَّمَ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ (١١٠) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ
قُلُوْبُهُمْ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

অর্থ : আর কিছু লোক এমন রয়েছে যাদের বিষয়টি আল্লাহর নির্দেশে বিলম্ব করা হচ্ছে। হয়তো তিনি তাদের তওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর যারা ক্ষতি করার জন্য ও মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য আর ইতোপূর্বে যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের ঘাঁটি স্বরূপ মসজিদ বানিয়েছে তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। আর আল্লাহ সাক্ষী তারা সবাই মিথ্যুক। আপনি কখনো সেখানে দাঁড়াবেন না, যে মসজিদের প্রথম দিন থেকে ভিত্তি রাখা হয়েছে তাক্বওয়ার উপর সেটিই আপনার দাঁড়াবার প্রকৃত স্থান। সেখানে এমন লোক রয়েছে যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন গর্তের কিনারায় যা ধ্বসে পড়ার নিকটবর্তী। অতঃপর তা তাকে নিয়ে দোজখের আগুনে নিপতিত হয়। আর আল্লাহ জালেমদের পথ দেখান না। তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করবে যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (সূরা তওবা ঃ ১০৬-১১০)

এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত সমাজের লোকদের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। মদীনার সমাজে মু'মিনরা আছে, মুনাফিকরা আছে। মু'মিনদের মর্যাদা বিভিন্ন ধরনের। আর মুনাফিকদের অবস্থাও বিভিন্ন ধরনের। সূরা তাওবায় আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সব অজানা বিষয়গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাই এ সূরাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এর নাম অনেকগুলো। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন– সূরা তাওবা অবতীর্ণ হচ্ছিল আর 'ওয়া মিনহুম' 'ওয়া মিনহুম' বলে মুনাফিকদের শ্রেণীর কথা বর্ণনা করছিল আর আমরা বলছিলাম, এ সূরাতো কাউকে বাদ দিবেনা। তাই সকলেই ভীত ছিল হয়তো এই বুঝি 'ওয়া মিনহুম' বলে তার কথাও বলে দিবে। এ সূরার একটি আয়াত হল–

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ○

অর্থ: "আর কিছু লোক এমন রয়েছে যারা নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করেছে। তারা নেক কাজ ও বদ কাজকে মিশ্রিত করে ফেলেছে। হয়তো আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিবেন।

বর্ণিত আছে, এ আয়াত হযরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযির (রাঃ)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বনু কুরাইযার নিকট প্রেরণ করলেন। তখন তারা তাঁকে

জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবেন? তখন তিনি গলার দিকে ইঙ্গিত করে বুঝালেন যে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। সাথে সাথে মসজিদে নববীতে ফিরে এসে নিজেকে বেঁধে ফেললেন। ঘোষণা দিলেন, আল্লাহর রাসূল এসে না খুললে তিনি আর মুক্ত হচ্ছেন না। তাঁর বিশ্বাস যে তিনি রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তখন আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করে এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন "আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়"। এরা ছিল এক শ্রেণীর মুসলমান, আরেক শ্রেণী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন–

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

"অর্থ : আর কিছু লোক এমন রয়েছে যাদের বিষয়টি আল্লাহর নির্দেশে বিলম্ব করা হচ্ছে হয়তো তিনি তাদের শাস্তি দিবেন না হয় তিনি তাদের তওবা কবুল করবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"। সেখানে ইঙ্গিত করে যে (আল্লাহু গাফুরুর রাহিম দ্বারা) আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এ কথা ইঙ্গিত করে যে আল্লাহ তা'আলা এখনো কোন ফায়সালা করেননি। শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তাদের বিষয়টি ফায়সালা করবেন। তারা হলেন, মুরারা ইবনে রবী, হিলাল ইবনে উমাইয়া ও কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)। এরা তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এলে মুনাফিকরা রাসূলের নিকট এসে নানা ধরনের ওজর আপত্তির কথা বলতে লাগল। কিন্তু এ তিনজন কোন ছলচাতুরীর আশ্রয় নিলেন না। তারা সত্যের আশ্রয় নিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কোন ওজর আপত্তি ছিলনা। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এ যুদ্ধের ন্যায় অন্য কোন যুদ্ধে এতো সচ্ছল ছিলাম না। আমার কোন ওজর আপত্তি ছিলনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

أَمَّا أنتم فاذْهَبُوا حتَّى يَقضيَ اللهُ فيكم أمرَه —

"তোমরা চলে যাও আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে ফায়সালা করা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করতে থাক।" এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম সমাজের সবাইকে আমার সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। এভাবে চল্লিশ দিন বিগত হয়ে গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের স্ত্রীদের নিকট লোক পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন যেন তারা তাদের স্বামীদের বাড়ি ছেড়ে পিতাদের বাড়িতে চলে যায়। এভাবে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত গোটা মুসলিম সমাজ তাদের সাথে বয়কট করল, সম্পূর্ণ বয়কট করল। তাদের সাথে কোন লেনদেন নেই, ক্রয়-বিক্রয় নেই, কথাবার্তা নেই, সালাম-কালাম নেই। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদে যেতাম, রাসূলকে সালাম দিতাম। তারপর আগ্রহ ভরে তাকিয়ে দেখতাম আমার সালামের উত্তরে রাসূলের ওষ্ঠধর কেঁপে উঠেছে কিনা। আমি যখন নামাযে দাঁড়াতাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে তাকাতেন। আর নামায শেষ করে আমি রাসূলের দিকে ফিরে তাকালে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। ব্যস এভাবেই চলতে লাগল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বয়কট। এমন কি স্ত্রীও পিত্রালয়ে চলে গেছে। এ সব কিছুর কারণ কি? তা হল একটি। তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করা।

কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলের সাথে প্রত্যেকটি যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছি। তবে বদরে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আর এটা অনুমতি সাপেক্ষে হয়েছিল, রাসূল তখন যুদ্ধের জন্য যাননি। বরং কাফেরদের বাণিজ্য কাফেলাকে ধাওয়া করতে গিয়েছিলেন। আমি বাই'আতুল আকাবায় উপস্থিত ছিলাম। আর এটাকে আমি বদরের চেয়েও বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকি যদিও বদরের খ্যাতি ও সুনাম বাই'আতে আকাবার চেয়ে অনেক বেশী। বাই'আতুল আকাবায় তিহাত্তর জন মদীনার অধিবাসী উপস্থিত ছিলেন, এদের দু'জন নারী আর বাকিরা সবাই পুরুষ। তারা রাসূলের হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করেছিল যে, রাসূল মদীনায় হিজরত করে

গেলে তারা রাসূলকে হেফাজত করবে যেমন তারা তাদের ছেলে মেয়ে ও স্ত্রী-পরিজনকে হেফাজত করে। সুতরাং কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) শুধু মাত্র তাবুকের যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেননি। এ ভুলের কারণে, এ অপরাধের কারণে তার শাস্তি হল যে, মদীনার গোটা মুসলিম সমাজ তার সাথে বয়কট করল। তাহলে এবার ভেবে দেখ, যে ব্যক্তি কোন যুদ্ধেই যায়নি তার কী শাস্তি হওয়ার ছিল, যে দশ বছরে একবারও জিহাদের অঙ্গনে পা ফেলেনি তার কী শাস্তি হওয়ার কথা ছিল? যে জিহাদে যাওয়া আর ঘরে বসে থাকাকে এক মনে করে তার বিধান কী হবে? হায়! তাবুকের যুদ্ধে না যাওয়ার কারণে রাসূল তিনজন সাহাবীর উপর যে বিধান দিয়েছিলেন তা যদি আমরা বর্তমান মুসলিম সমাজে প্রয়োগ করি তাহলে মুসলিম সমাজ কিয়ামত পর্যন্ত বয়কটের মাঝে থাকবে। মুক্তির আর কোন সুযোগ থাকবে না। তাহলে যারা কখনো যুদ্ধেই যায়নি আর কখনো যুদ্ধের ফিকিরও করেনা তাদের কী শাস্তি হওয়া দরকার? আফগানিস্তানে জিহাদ চলছে দশ বৎসর হয়ে গেল। বহু মুসলিম আছে যারা আন্তর্জাতিক, স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় আফগান সম্পর্কে অনেক সংবাদ পড়েছে, শুনেছে। বহু সচিত্র ফিচার পাঠ করেছে। সচিত্র সংবাদ দেখেছে অথচ তারা আফগান জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আসেনা, তার কোন চিন্তাও করে না। আর যদি কোন যুবকদলকে দেখে তারা আফগান জিহাদে যাচ্ছে যারা বিভিন্ন দেশের মুসলিম যুবক; কেউ সিরিয়া, কেউ ফিলিস্তিন, কেউবা জর্দান, মিশর থেকে এসেছে; তখন তারা আর সহ্য করতে পারেনা। বলে, আরে ভাই তোমরা কেন আফগানিস্তানে যাচ্ছ? ফিলিস্তিন কি তোমাদের নিকটে নয়? কেন তোমরা ফিলিস্তিনের জিহাদে অংশগ্রহণ করছো না? আসল কথা হল, এ ধরনের লোকেরা কখনো জিহাদ সম্পর্কে ভেবে দেখে না। এ নিয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা নেই। কোন ফিকির নেই, চাই তা আফগানিস্তানে হোক বা অন্য কোথাও হোক। এরা কখনো এ নিয়ে ভাবেনা আর কেউ এ নিয়ে ভাবলেই তাদের গা জ্বালা শুরু হয়ে যায়। যারা এ ধরনের মুখরোচক কথা বলে তারা কোথায় ছিল যখন ফিলিস্তিনে জিহাদ শুরু হয়েছিল? ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের সীমান্ত একেবারে উন্মুক্ত ছিল। জর্দান, সিরিয়া হয়ে ফিলিস্তিনে মুজাহিদদের প্রবেশে কোন বাঁধা ছিল না। আমি তখন জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে পিস্তল নিয়ে যেতাম। প্রকাশ্যে পিস্তল বহন করতাম। ক্লাসিনকভ হাতে নিয়ে বক্তৃতা করতাম। ক্লাসিনকভে ভর করে দাঁড়িয়ে জুম'আর নামাজের খুতবা দিতাম। কিন্তু তখন এই দার্শনিক ভাইয়েরা কোথায় ছিল? কেন তারা তখন ফিলিস্তিনের জিহাদে যোগ দেয়নি? আল্লাহর শপথ করে বলছি ১৯৬৯ সালের কথা, কুয়েত থেকে ফিলিস্তিনী যুবকরা আসলে আমরা কতো আবেগ নিয়ে তাদের বলতাম, ভাইয়েরা! আমাদের মাঝে থাক, ফিলিস্তিনে থেকে যুদ্ধ কর, তখন তারা উত্তরে বলত, মজবুত নেতৃত্ব চাই। এখনো মজবুত নেতৃত্ব হয়নি। এ উত্তর দিয়ে তারা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু আমার প্রশ্ন, তাদের সেই অজানা কাঙ্খিত মজবুত নেতৃত্ব কোথায় সৃষ্টি হবে? মানাখ মার্কেটে, না সালিমিয়া মার্কেটে? কোথায় সৃষ্টি হবে মজবুত নেতৃত্ব। হায়রে বোকা, জিহাদের ময়দানে যদি মজবুত নেতৃত্ব সৃষ্টি না হয় তাহলে কোথায় তা হবে? যদি তুমি তাকে আরো চেপে ধর তাহলে হয়তো বলবে, এখনো ইসলামী জিহাদের পতাকা তুলে ধরা হয়নি। আমরা কি কিছু অজ্ঞ অর্বাচীন লোকদের নেতৃত্বে জিহাদ করব? আমরা কি ফাতাহ গ্রুপের নেতৃত্বে জিহাদ করব? সুস্পষ্ট ইসলামী পতাকার নেতৃত্বে জিহাদ করতে চাই। হায়! কবে সেই নেতৃত্ব ইসলামী বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে? ১৯৪৮ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কেটে গেছে। তুমি কি একবারের জন্য জিহাদের ময়দানে এসে একটি গুলি করেছিলে? তুমি কি এক সকাল বা এক বিকাল জিহাদের ময়দানে যাওয়ার চিন্তা করেছিলে? তা তো কখনো করনি, বরং যখনই তুমি দেখলে কিছু মানুষ জিহাদের নিভে যাওয়া প্রদীপকে জ্বালিয়ে দেয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে আফগানিস্তানে যেতে চাচ্ছে তখনই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি এবার তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে শুরু করেছো। তোমার দাবী, তোমার ধারণা, আফগান জিহাদের কারণে ফিলিস্তিনের জিহাদ চাপা পড়ে যাচ্ছে। হে ফিলিস্তিনের সন্তান! তুমি তো চিন্তার জগতে মিসকিন, অসহায়। তুমি কি ভেবে দেখনি, আফগানিস্তানের রণাঙ্গন থেকেই ফিলিস্তিন জিহাদের ডাক পুনরুজ্জীবিত হবে? ফিলিস্তিনের

জিহাদ আবার তার প্রাণ খুঁজে পাবে। তুমি একবার ভেবে দেখেছো কি, যে ফিলিস্তিনী যুবক আফগান রণাঙ্গনে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্বের অপরাজেয় শক্তিকে, সুপার পাওয়ার কে অল্প কয়েকজন পুণ্যবান লোকের সামনে ধরাশায়ী হতে দেখছে; যাদের পায়ে জুতা নেই; শরীরে কাপড় নেই; খাবার আর পানীয়ের সংকটই যাদের নিত্য দিনের সঙ্গী; তারা কি একথা ভাববে না কী ভাবে আল্লাহ প্রদত্ত এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তা দিয়ে ফিলিস্তিনকে বর্বর ইহুদীদের হাত থেকে মুক্ত করবে? অবশ্যই অবশ্যই সে তা চিন্তা করবে। বুখারা, আফগানিস্তানে তাই হচ্ছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের মুক্তির সনদ তৈরি হচ্ছে। জালিম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সিংহশাবকরা আবার জেগে উঠছে। তুমিও এসে শরিক হও এই মুক্তির রণাঙ্গনে।

কুয়েতের 'القبس' নামক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। গাজী নামের এক ফিলিস্তিনী তা লিখেছিল। বড়ই বিস্ময়ের ছিল প্রবন্ধটি। সে লিখেছিল, ওই ব্যক্তিরা যারা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আফগানিস্তানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে, তাদের চেয়ে একজন ইহুদী বেশ্যা অনেক ভাল। এ ধরনের গা জ্বালা কথায় তার প্রবন্ধটি ভরা ছিল। শেষে সে ওয়াকফ ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আহবান জানিয়েছিল, তারা যেন এ ধরনের কাজ বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যা কুরুচীপূর্ণ ও ন্যাক্কারজনক।

এ ধরনের কথা বড়ই খারাপ। এগুলোকে কথাই বলা ঠিক নয়। আমার প্রশ্ন, ভাই তোমার গায়ে এতো জ্বালা কেন? ফিলিস্তিনের অর্থ কি কম হবে? তুমি কি আফগান মুজাহিদদের হিংসে করছো? সে হয়তো এ অর্থ সংগ্রহ করে মুজাহিদদের পরার জন্য বুট জুতা তৈরি করে দেবে।

অথচ তোমার প্রতিবাদী কণ্ঠ কোথায় থাকে, যখন রাশিয়ায় সাহায্য দেয়ার জন্য মসজিদে মসজিদে অর্থ সংগ্রহ করা হয়? কুয়েত সরকার যখন রাশিয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে এর সুদভিত্তিক ব্যাংককে সহায়তা করার জন্য দুইশত মিলিয়ন ডলার সাহায্য করে তখন তো তুমি দুঃখিত হও না। তার প্রতিবাদে কিছুই বল না। আরো কত শত অন্যায় অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে সে ব্যাপারে তো তোমাকে সোচ্চার দেখি না। আফ্রিকার দরিদ্র মানবতার জন্য কেউ অর্থ সংগ্রহ করলে তো তুমি নিরব। তাহলে এশিয়ার দরিদ্র উদ্বাস্তু মানবতার ক্ষেত্রে তোমাকে এতো তৎপর কেন দেখা যায়? ফিলিস্তিনের মূল সমস্যা কি অর্থের সমস্যা? অর্থের কোন সমস্যা নেই। প্রচুর অর্থ এখানে বিদ্যমান। পৃথিবীতে যত বিপ্লব-বিদ্রোহ চলছে তার মধ্যে ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামের মতো আর কারো এতো অর্থ সম্পদ নেই। এখনো পাশ্চাত্যের ব্যাংকগুলোতে চৌদ্দ মিলিয়ন ডলারেরও বেশী অর্থ স্তুপীকৃত হয়ে আছে।

তোমরা কি জান, কিসের অর্থে আল হারাম রাজপথটি তৈরি হয়েছে? মুসলমানদের যাকাতের অর্থে তা তৈরি হয়েছে। যাকাতের অর্থ দিয়েই তারা বিভিন্ন অট্টালিকা আর প্রাসাদ তৈরি করেছে। শুধু কি তাই, সিনেমা আর নাচঘরগুলোও এসব অর্থে তৈরি হয়। ফিলিস্তিনের জিহাদের পথে যাকাতের যে অর্থ যাচ্ছে এর চেয়ে বড় ক্ষতিকর বিষয় আর নেই। এখন বলছি, হে গাজী নামের লেখক, কুয়েতের মসজিদগুলো থেকে ভুখা-নাঙ্গা অসহায় মানুষগুলোর জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাতে তোমার এতো জ্বালা কেন?

তুমি এখন কুয়েতে আফগানিস্তান সম্পর্কে কিছু বল। দেখবে তোমার আলোচনা মজলিস থেকে প্রতিবাদমুখর কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে। বলতে পার তারা কারা? তারা হল ফিলিস্তিনের অধিবাসী। আরে ভাই, তোমাদের কী হল? আমরা একটি চলমান জীবন্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি। আর তোমরা তাতে বাঁধা দিচ্ছো? তোমরা তো তোমাদের সমস্যাকে গলাটিপে মেরে ফেলেছো। আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরাও চাই পুনরায় ফিলিস্তিনে জিহাদী কার্যক্রম শুরু হোক। তোমরা এখানে কুয়েতে বসে কী করছো? এখানে তোমাদের এতো ব্যস্ততা কিসের? তোমরা তোমাদের কেনা ফ্ল্যাটের মূল্য পরিশোধের ধান্ধায় ব্যস্ত আছো। তোমরা যদি সত্যিই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা চাও তাহলে কেন জর্দানে ফিরে যাচ্ছো না? যেখানে বিশ দিনারে

ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া যেত সেখানে ১শত পঞ্চাশ দিনার হয়েছে তার ভাড়া, তারপরও তোমরা এখানে কিসের সন্ধানে আছো? তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের এখন লেখাপড়া করতে দিচ্ছো না। তুমি এখন কী করবে? আঠারো বছর বয়স হলে তারা কুয়েত ছেড়ে চলে যাবে। আর তখন তোমার ছেলেরা থাকবে এক দেশে আর তুমি তোমার স্ত্রী নিয়ে থাকবে আরেক দেশে। যদি অবস্থা এমনই ভয়াবহ হয়, তাহলে তোমরা কী করতে চাও? আমার কিছুই বুঝে আসে না। কতো উপার্জন করেন? বলল, দেড়শ বা দু'শ দিনার। আমি বললাম, গাড়ি নিয়ে জর্দানে চলে এসো। সেখানে তিনশ দিনারের চেয়ে বেশী উপার্জন করতে পারবে।

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা!

জিহাদ ছাড়া ইসলামী সমাজ টিকে থাকে না। জিহাদ ছাড়া দীন টিকে থাকে না। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর পর জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। জিহাদ নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের চেয়ে অগ্রগণ্য।

শুনে রাখো, মদ পান করার পাপ জিহাদ ত্যাগ করার চেয়ে কম। যে ব্যক্তি সুদ খায় তার গুনাহ জিহাদ বর্জনকারীর চেয়ে কম।

শুনে রাখ, যে ব্যক্তি রমযানের দিবসে কোন কারণ ছাড়াই রোজা রাখে না, তার পাপ জিহাদ ত্যাগকারীর চেয়ে কম। কারণ যে রোজা রাখল না সে নিজের ক্ষতি করল আর যে জিহাদে গেল না, সে গোটা মুসলিম জাতির ক্ষতি করল। এটা হারাম, এটা হারাম।

জিহাদ চলাকালীন সময়ে প্রয়োজনে রোজাও বিলম্বিত করা যায়। জিহাদ চলাকালীন সময়ে নামাযও বিলম্বিত করা যায়। হজ্জ ফরজ হয়ে গেলেও তা বিলম্বে আদায় করা সবার নিকট বৈধ। আর উম্মত একমত যে, জিহাদকে রোযার উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় প্রবেশের সময় আসরের পর রোজা ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।

তিনি বলেছেন– إِنَّكم مُصبِحُوا عدوَّكم فافْطِرُوا তোমরা এখন তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হবে আর রোযা ভাঙ্গলে তোমাদের শক্তি বাড়বে। তাই তোমরা রোযা ভেঙ্গে ফেল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের পর এক গ্লাস পানি নিয়ে পান করলেন। সাহাবীরাও পান করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কিছু লোক রোযা ভাঙ্গেনি। অতঃপর বললেন, أُولٰئِكَ العصاةُ তারাই অবাধ্য।

হয়তো তুমি চিন্তা কর জিহাদ ত্যাগ করা এক ধরনের খেলাধুলা ত্যাগ করা। অথবা মনে কর জিহাদ হল একটি দর্শন। আর বল, হে ফিলিস্তিনী ভাই, তুমি আফগানিস্তানে না গিয়ে কুয়েতে অবস্থান করা জিহাদের জন্য বেশি উপকারী। আমার প্রশ্ন, যারা এ ধরনের কথা বলে বিভ্রান্তি ছড়ায় তারা কোন ধর্ম অনুসরণ করছে? কোন কিতাব অনুসরণ করছে? কোন আয়াত বা হাদীসের আলোকে এসব কথা বলছে? কিসের ভিত্তিতে কি ধরনের ফতওয়া দিচ্ছে? আর মানুষের কথা কিবা বলব! তারা কী এতোই নির্বোধ হয়ে গেছে। তারা ফতওয়ার জন্য কোন শাইখের নিকট যায়। তারপর বলে, আমি আফগানিস্তানে জিহাদে যেতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তখন সেই শাইখ বলে দেয় তুমি যে এখানে এই মসজিদে থেকে যুবকদের টাকা দিচ্ছো বা প্রত্যেক সপ্তাহে এক বা দু'বার তাদের উপদেশ দিচ্ছো এটা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ ধরনের লোকদের ক্ষেত্রে এ আয়াতের ভাষ্যই প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন–

لِيَحْمِلُوٓا۟ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ○

অর্থ : যেন তারা তাদের পাপের বোঝা পরিপূর্ণভাবে বহন করে এবং তাদেরও পাপের বোঝা, যাদের তারা পথভ্রষ্ট করেছে। তারা যে পাপের বোঝা বহন করছে তা কতোই না নিকৃষ্ট।

আরে ভাই, তুমি তোমার রবের ইবাদত করতে কার নিকট অনুমতি চাও? যদি ফজরের নামায পড়তে যাও তাহলে কি তুমি অনুমতির জন্য তোমার পিতামাতার নিকট যাও? এজন্য তুমি কি তোমার দলের প্রধানের নিকট যাও? না তুমি মসজিদের ইমাম বা কোন মুফতির নিকট যাও? কে তোমাকে এ কথা বলেছে যে, আল্লাহর হুকুম পালনে মানুষের থেকে অনুমতি নিতে হবে?

ভাইয়েরা আমার!

প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের চিহ্নিত করতে হবে, আমরা কি চাই। কী আমাদের উদ্দেশ্য। কী আমাদের লক্ষ্য। আর তাগুতী শক্তি ও বিশ্বের শাসক গোষ্ঠি কি চায়। কী তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আমাদের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর হককে আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে আনা। বিধান প্রদান ও আবদিয়্যাতের হক একমাত্র আল্লাহর। যা তাগুতী শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমাদের লক্ষ্য হল, তাগুতী শক্তি থেকে তা ছিনিয়ে এনে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা। কোন বস্তু হালাল আর কোন বস্তু হারাম তার বিধান দাতা আল্লাহ। অন্য কেউ তার অধিকার রাখে না। তবে কোনটি ফরজ, কোনটি ওয়াজিব আর কোনটি নফল তা নির্ণয় করা বা চিহ্নিত করা রাসূলের দায়িত্ব। তাই রাসূলের সমালোচনা করার অধিকার কারো নেই।

আসল কথা হল, লোকেরা দীন সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। বান্দার উপর আল্লাহর কি কি হক রয়েছে তা অনুধাবন করে না। জিহাদের ফজিলত জানে না। তার মর্যাদাও দিতে পারে না। তারা ভাবে তোমার বেতন এক দিনার বেড়ে যাওয়া দেশ স্বাধীন হওয়া থেকে উত্তম। এক হাজার রিয়ালের কোন চাকুরী হয়ে যাওয়া তা থেকে উত্তম। বরং এ কথা বলা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে উত্তম। তুমি তাকে কি দিবে? প্রত্যেক মাসেই প্রচুর বেতন উপস্থিত। গাড়ী-বাড়ী-আয়েশ উপকরণ উপস্থিত। সুতরাং সাধারণ মানুষ এগুলো ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারে না। এ হল জীবন। তাগুতী শক্তি যা তৈরি করেছে। যা সৃষ্টি করেছে তা কতোই না নিকৃষ্ট। এক আরব কবি চমৎকার বলেছেন–

نحنُ موتَى و إنْ غَدوْنا و رُحْنا   و القصورُ المزوذَّقاتُ قُبورٌ

نحنُ موتَى يُسِرُّ بعضٌ لبعضٍ   مُستريًا متَى يكونُ النُّشورُ

অর্থ : আমরা একদিন মরে যাব যদিও আমরা যাতায়াত করছি। আর সুসজ্জিত প্রাসাদগুলো একদিন সমাধিতে পরিণত হবে। আমরা তো মরে যাব আর একে অপরকে সংশয় নিয়ে জিজ্ঞেস করে, পুনরুত্থান কখন হবে?

একটি কথা খুব ভালভাবে বুঝতে হবে। নামায আদায় না করা আর জিহাদ ত্যাগ করা উভয়টিই সমান। এর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তবে হাম্বলী মাযহাবের কারো কারো নিকট এতে মতানৈক্য রয়েছে, যারা মনে করেন নামায ছেড়ে দেয়া কুফরী। আর অন্যান্য ফরজ ত্যাগ করা কুফরী নয়। এদের ছাড়া বাকী তিন ইমামের সবাই এ কথায় একমত যে, জিহাদে অংশগ্রহণ না করা আর নামায রোযা না করার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এগুলো সব ফরযে আইন। কোন অবস্থায়ই এগুলো ত্যাগ করা যাবে না। সন্তান পিতার অনুমতি ছাড়া, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া, দাস মনিবের অনুমতি ছাড়া, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণদাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে অংশ নিতে পারবে। এগুলো ফকীহদের ভাষ্য। তাদের কথা।

মনে করো, তুমি রোযা রাখবে। তাহলে কি তুমি তোমার পিতা-মাতার অনুমতির অপেক্ষা করবে ? নিশ্চয়ই না। যদি তাই হয় তাহলে জিহাদের বেলায় ব্যতিক্রম হবে কেন ? কেন অনুমতির প্রয়োজন হবে ?

আল্লামা ইবনে রুশদ (রহঃ) বলেন,

طاعةُ الأميرِ لازمةٌ و إنْ كانَ غيرَ عدلٍ، و إنْ كان فاسقًا إلا إذا أمرَ بِمعصيةٍ، و إنْ أمرَ بمعصيةٍ فلاَ طاعةَ و منَ المعصيةِ الأمر بتركِ الجهادِ المتعَّين ـــ

অর্থ : সরকার প্রধান অর্থাৎ আমিরুল মু'মিনীনের আনুগত্য করা অত্যাবশ্যকীয়। যদিও তিনি ন্যায়পরায়ণ না হন, যদিও তিনি ফাসেক হন। তবে যদি তিনি কোন পাপ কাজের নির্দেশ দেন তবে তার আনুগত্য করা যাবে না । আর জিহাদে অংশগ্রহণ না করতে নির্দেশ দেয়া এক প্রকার পাপ।

সুতরাং জিহাদ না করার ব্যাপারে কখনো কারো আনুগত্য করা যাবে না। যদি তোমাকে তোমার পিতা বা অন্য কোন ব্যক্তি সূদের কারবার করতে বলেন, তাহলে কি তা তোমার জন্য বৈধ হয়ে যাবে? কেউ ফতওয়া দিলেও কি তা জায়েয হয়ে যাবে? কোন কোন মুফতি ফতওয়া দেন যে, ব্যাংকের সুদ হালাল, হারাম নয়। এ ধরনের কথা শুনে তোমার মন কি তাতে সায় দেয়?

কারণ তুমি জান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

دِرهمٌ مِنَ الربا أشدُّ عِنْد اللهِ مِن ستٍّ وَّ ثَلاثِيْنَ زِينَةً —

অর্থ : সুদের এক দিরহাম আল্লাহর কাছে ছত্রিশবার যিনা করার চেয়ে কঠিন। অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

الربا بضعةٌ و سبعونَ بابًا ، أقلُّها أنْ يزنِيَ أحدُكم بأمِّه —

অর্থ : সুদের সত্তরের অধিক শ্রেণী রয়েছে, স্তর রয়েছে। সবচে' নিম্নস্তরের সুদ হল কেউ তার মায়ের সাথে যিনা করা।

যদি তোমার পিতা তোমাকে বলে, হে ছেলে! এসো রোযাটি ভেঙ্গে ফেল এবং আমার পক্ষ হয়ে আমার কাজগুলো আদায় কর। কারণ আমার আজ কোন সাহায্যকারী নেই। তাহলে কি তোমার জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয হবে ?

মনে কর তুমি একটি আমেরিকান বা ফ্রান্সের ফার্মে চাকুরি কর। তোমার বেতনও ভাল। এখন যদি যোহর ও আসর নামায মসজিদে এসে আদায় কর তাহলে তোমার চাকুরিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এমন অবস্থায় যদি তোমাকে বলা হয়, শিয়া ইমামিয়াদের মাযহাব অনুযায়ী তুমি যোহর ও আসর নামায বাসায় এসে একত্রে পড়ে নাও। তাহলে কি তুমি তা করবে ? আর এটা কি তোমার জন্য জায়েয হবে ? নিশ্চয়ই না। তাহলে ঐ ব্যক্তির কথা তুমি কিভাবে গ্রহণ করবে যে বলে জিহাদে না গিয়ে তোমার বরং এখানে থাকাই উত্তম?

তাই আমি বলছি, নিশ্চয়ই বিশ্বের দিকে দিকে ইসলামী আন্দোলন ও দাওয়াতী কার্যক্রম চলছে আল্লাহর হককে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আল্লাহর হককে ছিনিয়ে এনে কোন আমীর বা শাসকের নিকট পৌঁছে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাইনা আমাদের মাঝে এমন ব্যক্তির উত্থান ঘটুক যে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানুষের বিধান বাস্তবায়ন করবে। নিজস্ব মনগড়া বিধান মুসলিম উম্মাহর উপর চাপিয়ে দিবে। তাহলে তো আমরা তাদেরকে রব হিসেবে মেনে নেয়ার শামিল হব।

এমনি পরিস্থিতিতে হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রাঃ) কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন–

بلى أحلُّوا لهم الحرامَ و حرَّموا عليهم الحلالَ فأطاعُوهُم ، فتلك عبادتُهم إيَّاهم —

তারা তো হারামকে তাদের জন্য হালাল করেছে। আর হালালকে তাদের জন্য হারাম করেছে। আর তারা তা অবলীলায় মেনে নিয়েছে। এটাই হল তাদের ইবাদত। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোন মাখলুকের আনুগত্য করা কি বৈধ?

উস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ) বলতেন–

إنَّ الضُّعفَ ليسَ عذرًا عندَ اللهِ ، إنَّ الضعفَ جَرِيمَةٌ يَستحقُّ جهنمَ بنصِّ القرآنِ الكريمِ —

আল্লাহ তা'আলার নিকট দুর্বলতা কোন প্রকার ওজর-আপত্তি নয়। বরং দুর্বলতা তো এমন এক অপরাধ যার কারণে কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী দুর্বল ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। ভাই! আল্লাহর দুনিয়া বিশাল, বিস্তৃত। কে তোমাকে লাঞ্ছিত অবস্থায়, দুর্বল হয়ে থাকতে বলে? আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(٥٦) يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ○

অর্থ : হে আমার মু'মিন বান্দারা! নিশ্চয় আমার জমিন বিশাল বৃিত।

সুতরাং পৃথিবীর কোন প্রান্ত যদি তোমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে তাতে কোন দুঃখ নেই। আল্লাহ তোমার জন্য আরো বহু স্থান খুলে রেখেছেন। উন্মোচিত করে রেখেছেন। সেখানে তুমি হিজরত করে চলে যাও। কেন তুমি এক সংকীর্ণ স্থানে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছো? কেন তুমি নিজেকে একটি সংস্থায়, একটি অফিসে আবদ্ধ করে রেখেছো? তাহলে কি তুমি এ স্থানেই মরতে চাও? মনে হয় তুমি তোমার অফিস ছেড়ে দিলে তোমার রিযিক বন্ধ হয়ে যাবে আর তুমি না খেয়ে মরবে। মনে রাখ, খুব ভাল করে মনে রাখ, আল্লাহ তোমার রব। যিনি কুকুরকে রিযিক প্রদান করেন তিনি তোমাকেও রিযিক প্রদান করবেন। তোমাকে আহার দিবেন। তোমাকে তো তিনি দুনিয়াতে চলার জন্য জ্ঞান-বুদ্ধি, আকল দান করেছেন। আমি আমার চোখে কাউকে না খেয়ে মরতে দেখিনি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○

অর্থ : আর যারা ক্ষতি করার জন্য, বিদ্রোহভাবে, মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশে এবং ইতোপূর্বে যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের ঘাঁটিস্বরূপ মসজিদ নির্মাণ করেছে তারা শপথ করে বলবে, আমরা সৎ উদ্দেশ্যে তা করেছি। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। মাঝে মাঝে আমাকে এসে কেউ কেউ বলেন, অমুক ব্যক্তি জিহাদের ময়দান থেকে চলে যেতে চায়। অথবা বলে, অমুক শাইখকে জিজ্ঞেস করেছি, বা অমুক শাইখ ফতওয়া দিয়েছেন, তারা তো আফগান যুদ্ধে যেতে বারণ করেন। তারা একে জিহাদ মনে করেন না।

আমি বলতে চাই, কে সে শাইখ যার কাছে তোমরা ফতওয়া চেয়েছো, তিনি কি কখনো আফগানিস্তানে এসেছেন? তিনি কি কখনো আফগান জিহাদের বাস্তব চিত্র স্বচক্ষে দেখেছেন? তিনি কি আফগানিস্তানের সীমানা জানেন? নাকি তোমরা এমন শাইখকে জিজ্ঞেস করো যিনি জানেন না আফগানিস্তান কোথায় অবস্থিত? এশিয়ায়, ইউরোপে না আফ্রিকায়?

আমি নিশ্চিত, তিনি তা জানেন না। শোন তাহলে, আমি টেপ রেকর্ডারে এক বিশ্ববিখ্যাত শাইখকে ফতওয়া দিতে শুনেছি। লোকেরা জিহাদ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, জিহাদ ফরজে আইন। কিন্তু তোমরা আফগানিস্তানে কিভাবে জিহাদ করবে? শাসকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে তোমরা সেখানে জিহাদের ট্রেনিং নিবে? তোমরা কি আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে পারবে? নাকি সীমান্তেই তোমাদের গুলি করে শেষ করে দেয়া হবে? যেমন ফিলিস্তিনে সচরাচর হচ্ছে। আচ্ছা না হয় তোমরা তাতে প্রবেশ করলে, কিন্তু রাশিয়ান অত্যাধুনিক ট্যাংকের বিরুদ্ধে কীভাবে তোমরা দা-ছুরি নিয়ে যুদ্ধ করবে? তারপর তোমরা আফগান বাহিনীর বোঝা হয়ে থাকবে।

দেখ, একটু ভেবে দেখ, শাইখ মনে করছেন, আফগান বাহিনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এভাবেই শাইখ অবাস্তব কথা বলে যাচ্ছেন। তখন উপস্থিত যুবকদের একজন দাঁড়িয়ে বলল, আমি একজন ডাক্তার।

আপনার কথা থেকে বুঝলাম, আমরা যেন আফগান জিহাদে না যাই। এ ব্যাপারেই আপনি আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন। সুতরাং আমি স্পষ্টভাবে আপনার মতামত জানতে চাই। তখন শাইখ বললেন, যে কেউ আমার কথা শুনবে সেই এর উত্তর দিতে পারবে।

কিন্তু যুবক বলল, না, আমি আপনার থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতে চাই। আমি কি আফগানিস্তানে যাব, না যাব না। শাইখ বললেন, যেয়ো না।

এরপর ১৪০৬ হিজরীতে আমি শাইখকে জিদ্দায় দেখেছি। আর তার সে বক্তব্যের ক্যাসেট তৈরি হচ্ছে আর বিক্রয় হচ্ছে। গোটা পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু আসল কথা হল, শাইখ আফগান জিহাদ সম্পর্কে কিছুই জানে না। এ ব্যাপারে তার কোন জ্ঞান নেই।

এ কারণেই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) বলেছেন–

لا تَسْأَلِ العلماءَ بالأمورَ الدينيةَ عنِ الأمورِ الدنيويةِ و عنِ الجهادِ إذَا لم يَكونوا مُطَّلعينَ عَليه —

আলেমদেরকে দুনিয়ার কোন বিষয় সম্পর্কে বা জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা যাবে না, যদি তারা তা সম্পর্কে কিছু না জানে। তাই বিজ্ঞ আলেমরা বলেন–

لا تسأَلِ العُلماءَ الّذين لَيسُوا فِي أَرْضِ الجهادِ عن الجهادِ —

যে সব আলেম জিহাদের ময়দানে নেই তাদেরকে জিহাদ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করো না।

সুতরাং যারা কখনো আফগানিস্তানে আসেনি, আফগানীদের সাথে কিছু সময় কাটায়নি, তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে কিছুই জানে না, আফগান জিহাদ সম্পর্কে তাদের সঠিক কোন জ্ঞান নেই। তাদেরকে আফগান জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা যাবে না। তারা কোন ফতওয়া দিলে তা মানাও যাবে না।

সার কথা হল, যে বলে আফগান জিহাদে আরবদের কোন প্রয়োজন নেই; সে হয় মুনাফিক, না হয় জাহেল মূর্খ। এর বাইরে তৃতীয় কিছু হতে পারে না। হে শাইখ সাঈদ! ব্যাপারটি কি এমন নয়? আপনি তো আহমদ শাহ মাসউদের নিকট থেকে এসেছেন। ত্রিশ দিন বরফের মাঝে থেকে আফগানীদের সাথে ট্রেনিং দিয়ে এসেছেন। দেখ, ইনি আহত অবস্থায় মদীনা মুনাওয়ারা থেকে জিহাদে এসেছেন। মদীনায় থাকলে আর তেমন কী বা করতেন। অথচ দেখ, সুস্পষ্ট কারামত, বরফাবৃত পাহাড়ে ত্রিশ দিন থেকে ট্রেনিং দিয়ে এসেছেন। শীতের মৌসুমে সাধারণ শীতে মাথা ঢেকে চাদরাবৃত হয়ে থাকতেন আর এখানে বরফের মাঝেও কষ্ট অনুভব করছেন না। আশ্চর্য, মদীনার শীত তাকে কষ্ট দেয় আর আফগানিস্তানের বরফ তাকে কষ্ট দেয় না। এটাই পার্থক্য জিহাদ ও অজিহাদের মাঝে।

এই যে আবু বুরহান! সব সময় পেটের পীড়ায় আক্রান্ত থাকত। ডাক্তাররা তার কোন কারণ খুঁজে পায়নি। মাঝে মধ্যেই সে এমন অসুস্থ থাকত যে নড়াচড়াও করতে পারত না। তারপর যখন আফগানিস্তানে এল; জিহাদে যোগদান করল; তার রোগ চিরতরে ভাল হয়ে গেল। সবার জীবনেই এ ধরনের হাজারো বিষয় ছড়িয়ে আছে। এক যুবক রণাঙ্গনে আক্রান্ত হল। তারপর চিকিৎসার জন্য কুয়েতের এক সংস্থায় এলে তারা তার দু'পায়ের এক্সরে করল। তারপর বলল, শীঘ্রই তাকে চেয়ারে বসাও। কিছুতেই তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয়। তখন মুজাহিদ বলল, আরে কী আশ্চর্যের কথা। আমি এই ভাঙা পায়ে হেঁটেই তো বিশ দিন পর এলাম। কিন্তু ডাক্তার তা বিশ্বাস করতে রাজি না। বিস্মিত হয়ে বলল, আমার তো বুঝে আসছে না কীভাবে তুমি এ ভাঙা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছো?

এই তো আবু ইয়াহইয়া আব্দুস সালাম উপস্থিত। একবার তারা শত্রুদের এক ক্যাম্পে আক্রমণ করল। তখন সে গুলী বিদ্ধ হল। গুলীটি শরীরের এক দিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সে কোন ব্যাথা বা কষ্ট অনুভব করেনি। তাই সে মনে করল হয়তো বোমার স্প্রিন্টার

তাতে প্রবেশ করেছে। তাই হাত দিয়ে তা থেকে শরীরের হাড়ের গুড়া বের করতে লাগল। এতো কিছু হচ্ছে আফগান জিহাদে। এতো কারামত দিব্যচোখে দেখা যাচ্ছে অথচ কিছু মানুষ এখনো অন্ধকারে আছে। তারা বলে, আফগানিস্তানে যেও না। সেখানে কোন জিহাদ নেই। এ ধরনের লোকদেরকেই লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ○

অর্থ : তারা অন্যদেরকে বারণ করে আর নিজেরাও তা থেকে দূরে থাকে। তারা জিহাদ থেকে নিজেরা দূরে থাকে আবার লোকদের জিহাদে আসতে বারণ করে। এরা হল অজ্ঞ, মূর্খ। আরেকটি দল আছে তারা হল মুনাফিক। এদের উপমা হল তারা যারা মুসলমানদের ক্ষতির জন্য মদীনায় মসজিদ বানিয়েছিল। যা মসজিদে যেরার নামে খ্যাত।

তৎকালীন সময়ে মদীনায় আবু আমের নামে এক লোক ছিল। কাফেররা তাকে আবু আমের রাহেব (পাদ্রী) বলত। আর মুসলমানরা তাকে আবু আমের ফাসেক বলত। জাহেলী যুগে সে খৃস্টান হয়ে গিয়েছিল। উহুদের যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিল। সে যুদ্ধেই তার ছেলে হানযালা (রাঃ) শহীদ হয়েছিলেন। যাকে 'গাসীলূল মালায়িকা' নামে অভিহিত করা হয়। পিতা হচ্ছে কাফের আর ছেলে হল গাসীলুল মালায়িকা। ফেরেশতারা তাকে শাহাদাত বরণ করার পর গোসল দিয়েছিল।

সেই আবু আমের রোম সম্রাটের নিকট গেল এবং মদীনার মুনাফিকদের নিকট পত্র লেখল, তোমরা একটি মসজিদ বানিয়ে তাতে মুহাম্মাদকে ডেকে আন। তারপর মসজিদটি তার উপর ভেঙ্গে ফেলে দাও ও তাকে হত্যা কর। আমি শীঘ্রই রোম সম্রাটসহ মদীনায় আসছি। মদীনা দখল করে নিব। তখন মদীনার মুনাফিকরা মসজিদ বানানো শুরু করল।

মসজিদ বানানো শেষ হলে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা অসুস্থ দুর্বল লোকদের জন্য এই মসজিদটি বানিয়েছি। সুতরাং আপনি এসে তাতে নামায পড়ে বরকত দিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাবুক যুদ্ধের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। বললেন–

إنِّي على سفرٍ و حال شغلٍ، فلو قدمنا لآتيناكُم وصلَّيناالكُم فيه —

অর্থ : ঠিক আছে, আমি এখন জিহাদের কাজে ব্যস্ত আছি। ফিরে এসে সেখানে গিয়ে নামায আদায় করব।

রাসূল তাবুক থেকে ফিরে এসে দেখলেন, তারা মসজিদ বানিয়ে তাতে জুম'আর নামায আদায় করছে। তারপর শনি ও রোববারেও নামায পড়েছে। তখন মুনাফিকরা রাসূলের নিকট এলে তিনি যাওয়ার জন্য জামা আনতে বললেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) মসজিদে যেরারের এ আয়াতগুলো নিয়ে অবতরণ করলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালেক ইবনে দাখশাম, মাআন ইবনে আদী, আমের ইবনে সাকান ও হামযা (রাঃ) কে হত্যাকারী ওয়াহশি ইবনে হরবকে ডাকলেন। বললেন, যাও, এখনই তোমরা ঐ ষড়যন্ত্রকারীদের তৈরী মসজিদে যাও। তা ভেঙ্গে জ্বেলে নিঃশেষ করে দাও।

বারজন ব্যক্তি সেই মসজিদ বানিয়েছিল। খাযাম ইবনে খালেদ, মু'তার ইবনে কুশাইর, আবু হাবীবা, আসাদ ইবনে হানীফ, জারিয়া ইবনে আমের, তার দুই ছেলে মাজমা ও যায়েদ, ইবনে হারেস, বাখরাজ, বুজাদা ইবনে উসমান, উদীয়া ইবনে সাবেত ও ছালাবা ইবনে হাতেব।

তবে ছালাবা ইবনে হাতের সম্পর্কে ঐতিহাসিক আবু আমের ইবনে আব্দুল বার বলেছেন– ছালাবা ইবনে হাতেব তাদের মধ্যে হতে পারে না। কারণ তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বদরী সাহাবীরা জান্নাতী। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এদের আলোচনা প্রসঙ্গে কুরআন বলেছে–

(١١٠) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

অর্থ : তারা যে গৃহ নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (সূরা তওবা ঃ ১১০)

এর পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

(১০৯) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

অর্থ : যে ব্যক্তি তার গৃহকে আল্লাহভীতি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সেই উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে পতন প্রায় ধ্বংসের কিনারায় এবং যা তাকে সহ দোযখের আগুনে পতিত হয়? আর আল্লাহ অনাচারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

সুতরাং মসজিদে যেরারে নামায পড়া বৈধ নয়। এমনিভাবে যদি কোন শহরে কোন কেন্দ্রীয় মসজিদ থাকে; এমন অবস্থায় কেউ মুসলমানদের ঐক্যের মাঝে ফাটল সৃষ্টির জন্য, নেতৃত্ব অর্জনের জন্য, মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য সেখানে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করে তবে সেই মসজিদে নামায পড়া বৈধ হবে না।

এমনিভাবে যদি কোন শহরে ইসলাম প্রচারের জন্য কোন সংস্থা থাকে, তখন সে শহরে আরেক ব্যক্তি এসে পূর্ববর্তী সংস্থার বিরুদ্ধাচরণের জন্য মুখোমুখী আরেকটি সংস্থা স্থাপন করে তাহলে দ্বিতীয়টি হবে মসজিদে যেরারের মত। দ্বিতীয়টির সাহায্য সহযোগিতা করা বৈধ হবে না।

আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং শুনেছি, ইন্দোনেশিয়ায় আরবরা দীনের প্রচার ও প্রসারে কাজ করে। সেখানে তারা দাওয়াতের মারকাজ খুলে। কারণ ইন্দোনেশিয়ার খৃস্টানরা মুসলমানদের কৌশলে খৃস্টান বানাচ্ছে। তখন দেখা গেল আরবদেরই আরো কিছু লোক গিয়ে তাদের পাশেই আরেকটি সংস্থা খুলে বসল। তাদের কাজ হল, পূর্ববর্তী মারকাজের কাজে ক্ষতি করা। তাহলে এ তুচ্ছ মারকাজটি মসজিদে যেরার।

মিসরে এ ধরনের ব্যাপার হয়েছে খোদ সরকারের পক্ষ থেকে। মিসরের সরকার যখন ইসলামী আন্দোলনকে বন্ধ করে দিল, তখন ধর্ম মন্ত্রণালয় মানুষকে ধোঁকায় ফেলার জন্য বিভিন্ন নামে ইসলাম প্রচার সংস্থা খুলে দিল যেগুলো ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা ব্যবহার করত। এগুলোও মসজিদে যেরার। ধর্ম মন্ত্রণালয় করলেও এসব কিন্তু মসজিদে যেরার। তাতে চাকুরী করা বৈধ হবে না।

কোন স্থানে যদি সাধারণ মুসলমানরা একত্রিত হয়ে কোন ইফতা বোর্ড কায়েম করে অথবা দাওয়াতী কার্যক্রমের জন্য কোন সংস্থা স্থাপন করে। এ অবস্থায় রাষ্ট্র তার মুকাবিলায় আরেকটি ফতওয়া বোর্ড স্থাপন করে এর পূর্ববর্তী বোর্ডকে বাতিল করার জন্য ষড়যন্ত্র করে তবে তা মসজিদে যেরার। তাতে অংশগ্রহণ করা বৈধ হবে না।

বর্তমান সময়ে ইরাকে বা মস্কোতে সরকারী তত্ত্বাবধানে যেসব ইসলামী সংস্থাগুলো হচ্ছে এ সবগুলোই মসজিদে যেরার। কারণ এগুলো দ্বারা তো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য নয়। শুরু থেকেই এগুলো ধ্বংসের কিনারায় স্থাপন করা হয়েছে। ইরাকে যে সব সংস্থা স্থাপন করা হচ্ছে এ গুলোর উদ্দেশ্য হল খোমেনীর অগ্রসরতাকে প্রতিহত করা। হ্যাঁ, খোমেনীর এ শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ আমরা করব, তবে সাদ্দামের ঐ ইসলামী সংস্থার নেতৃত্বে নয়। আমরা আমাদের ঈমানী দাবীর কারণে তা করব। সাদ্দাম ইরাকে ইসলামের কী বাকি রেখেছে? ইসলামের সবকিছু ধ্বংস করে এখন তার ইসলামী সংস্থা তৈরীর সাধ হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নেই বা ইসলামের কী বাকি আছে? বাকুতে তো কোন মসজিদ বাকি রাখেনি। নামায আদায় করার কোন স্থান সেখানে নেই। তবে লেনিনগ্রাদে একটি মসজিদ আছে তা সর্বদা তালাবদ্ধ থাকে। প্রত্যেক রোববারে তা খোলা হয়। জুম'আর দিনে তা খোলা হয় না। তাই মুসলমানরা রোববারেই জুম'আর নামায আদায় করে। কারণ রোববার ছাড়া অন্য কোন দিন তাতে প্রবেশ নিষেধ। এর বিনিময়ে সরকারকে প্রত্যেক বৎসর প্রায় সতের

হাজার রুবল দিতে হয়। এতো কিছুর পরও সে দেশের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের লোকেরা আসে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলামের স্বাধীনতার কথা বড় গলায় বলে বেড়ায়।

প্রত্যেক বৎসরই তারা লেনিনের সমাধিতে ফুলের তোড়া দিয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করে। এগুলো কুফরীর আলামত। যারা পৃথিবীতে নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠা করল, নাস্তিকতার স্থায়িত্বের জন্য রাষ্ট্র কায়েম করল। এটাইতো তাদের কুফরীর জন্য যথেষ্ট।

তোমাদের মনে আছে, আমি দু'দিন আগে বলেছিলাম, একমাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে নাসীফই সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ইসলামের স্বপক্ষে কথা বলে এসেছিলেন। তখন তার কণ্ঠ ছিল অবাধ। সুউচ্চ। বিস্ময়ে ভরা। তিনি বলেছিলেন, তোমরা আমাদেরকে কোন ইসলামের দিকে আহবান করছো? তোমরা তাহলে আফগানে হত্যালীলা চালাচ্ছো কেন? কেন তাতে আক্রমণ করলে? আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে এসো তাহলে আমরা বিশ্বাস করবো, তোমরা আমাদেরকে সাচ্চা ইসলামের দিকে ডাকছো।

সে দেশের ধর্ম মন্ত্রণালয় ভাবতেই পারেনি যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে বসে কেউ এ ধরনের কথা বলতে সাহস করতে পারে। এখানে তো সবাই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রশংসা করে। গুণকীর্তন করে। ইসলামের ও মুসলমানদের স্বাধীনতা দেখে বিস্ময়ভাব প্রকাশ করে।

সেখানে মুসলমানদের স্বাধীনতা মানে কেউ যদি অনুমতি ছাড়া কুরআন বহন করে তাহলে তাকে চার বৎসর জেলে রাখা হয়। ফাঁসিতে দেয়া হয়। এটা হল তার স্বাধীনতার নমুনা। এটা হল ইনসাফ ও ন্যায়নীতি।

এ সম্পর্কে এক চমৎকার ঘটনার কথা মনে পড়ল। একদা এক সোভিয়েত মুসলিমকে এক আরব দেশ থেকে গ্রেফতার করে দেশে নিয়ে যাওয়া হল। তার অপরাধ সে নাকি প্রেসিডেন্টকে গালমন্দ করে। বিচারালয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি নাকি প্রেসিডেন্টকে গালমন্দ কর? লোকটি অস্বীকার করে বলল, না তো, আমি একাজ করিনি। তখন তাকে ফাঁসির হুকুম দেয়া হল। তখন লোকটি কাঁদতে লাগল। বলতে লাগল, আমি কখনো প্রেসিডেন্টকে গালমন্দ করিনি। কখনো করিনি। তার বিলাপ শুনে বিচারকের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হল। বলল, আচ্ছা তাহলে তোমার শাস্তি লাঘব করা হল। ফাঁসির হুকুম রহিত করে তোমাকে এ শাস্তি দেয়া হল যে, তোমার পরিহিত সকল বসন ও তোমার সমুদয় ধনসম্পদ নিয়ে নেয়া হবে। তখন তার শরীরের সকল বসন খুলে নেয়া হল। টাকা-পয়সা যা ছিল সব নিয়ে নেয়া হল এবং দিগম্বর বানিয়ে তাকে পথে ছেড়ে দেয়া হল। লোকটি তখন দিগম্বর বেশে রাস্তায় নেমে চিৎকার করে বলতে লাগল, ন্যায় বিচার দীর্ঘজীবী হোক। আদল-ইনসাফ দীর্ঘজীবী হোক। দীর্ঘজীবী হোক। এটা হল সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলামের অবস্থা।

পৃথিবীতে এ ধরনের যত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে সবগুলোই মসজিদে যেরার। এসব সংস্থায় কোনরকম সাহায্য সহযোগিতা করা বৈধ নয়। এসব সংস্থাগুলোতে চাকুরী করাও বৈধ নয়।

পরবর্তী খণ্ডের অপেক্ষায়

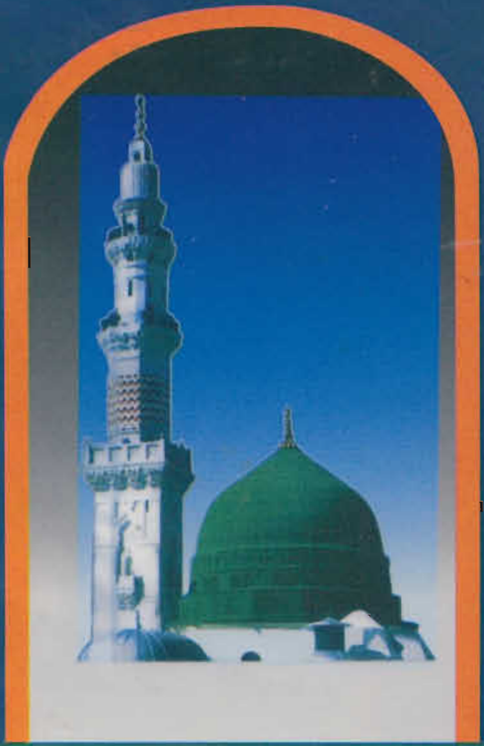

নানূতবী রহ. প্রকাশনী

المكتبة النانوتوية الاسلامية